সমর সেন বিশেষ সংখ্যা

সম্পাদনা

পুলক চন্দ

২ই নবীন কুণ্ডু লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয় নিবেদন

প্রথমেই কবুল করে নেওয়া ভাল, প্রায় সাড়ে ছয়শ' পৃষ্ঠার এই সংকলনের পরিসরে, চুয়ান্ন জন লেখকের মোট বাষট্টিটি নতুন ও পুরনো লেখায় এবং একশ' একান্নটি অন্তরঙ্গ চিঠিপত্রের ভিতরেও যদি কবি, সাংবাদিক ও ব্যক্তি-মানুষ সমর সেনের কোন পরিচয় শেষ পর্যন্ত ধরা না পড়ে থাকে, তাহলে. তা পূরণ করে দেবার স্পর্ধা বর্তমান 'সম্পাদকীয় নিবেদন'-এও নেই। সুতরাং, এখানে, সংকলন-সংক্রান্ত নিতান্তই কিছু প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা হবে।

এখন. এই মুহূর্তে, আমাদের রীতিমতন বিমর্ষ করে তুলছে 'বিশেষ সমর সেন সংখ্যা'র পুরনো খসড়া সূচিপত্রের এক অংশ : 'সমর সেন, একটি সাক্ষাৎকার : মহাশ্বেতা দেবী।' হ্যাঁ, কথা সেই রকমই ছিল। অবশ্য, প্রাথমিকভাবে, যথেষ্ট প্রতিরোধও সমরবাবু করেছিলেন—ভদ্রভাবে যতখানি তাঁর পক্ষে করা সম্ভব। বলেছিলেন, 'বিশেষ সংখ্যা বের করে কি হবে ? এ তো নিছকই কিছু শক্তি ও কাগজের অপচয়।' কিন্তু. সেই 'অপচয়'-এর কাজে আমাদের বদ্ধপরিকর দেখে, এবং, সম্ভবত সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী হিসেবে মহাশ্বেতা দেবীর নাম শুনে. তিনি সম্মতি জানিয়েছিলেন। মহাশ্বেতাদিও কথা দিয়েছিলেন, 'একটা দুর্ধর্ষ ইন্টারভিউ' উনি উপহার দেবেন।

সমরবাবুর এই সসঙ্কোচ অনুমোদনকেই ছাড়পত্র করে নিয়ে বিশেষ সংখ্যার কাজের শুরু। প্রথমেই চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল তাঁকে লেখা সাতটি চিঠি। কথা হয়ে গিয়েছিল দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। সমরবাবুকে একটিবার জিজ্ঞেস করে নিয়ে উনি জানিয়েছিলেন, সমস্ত চিঠিই দেবেন। যোগাযোগও শুরু হয়ে গিয়েছিল দু'একজন লেখকের সঙ্গে।

কিন্তু পরিস্থিতি হঠাৎই পাল্টে গেল। যে-সংকলন সমরবাবুর হাতে দিয়ে তাঁর মুখের স্মিত অস্বস্তি কিংবা ঠোঁটের কোণের চাপা কৌতুক ভরা হাসিটুকু পুরস্কার হিসেবে পাওয়ার কথা ছিল আমাদের, সেই সংকলনেরই সত্যিকারের কাজ শুরু হল তাঁর অবর্তমানে।

এরপর, অর্থাৎ গত তিন-চার মাস, যে-বিচিত্র, বহু-বর্ণময় অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে আমরা গেলাম—কোন কারণেই তা বিস্মৃত হবার নয়। প্রতি পদক্ষেপেই সেখানে নাটকীয়তা, 'সমর সেন'কে, তাঁর সুবিখ্যাত বন্ধুবর্গকে এবং সমর সেন-

অনুরাগী অসংখ্য খ্যাত-অখ্যাত মানুষকে নতুন নতুন করে প্রতিদিন জানবার রোমাঞ্চ। লণ্ডন থেকে আসা সুনীল জানা-র তোলা ছবি কিংবা বুদ্ধদেব বসু-বিষ্ণু দে'র কাছে লেখা চিঠিপত্রের অভাবিত-প্রাপ্তির বিহ্বলতার সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সুনীল জানা, অশোক মিত্র (অর্থনীতিবিদ), বিজয়কুমার চট্টোপাধ্যায়—প্রমুখ সমর সেনের পুরনো বন্ধু ও সহযোগীদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত-সহযোগিতা লাভের আনন্দ ও স্বস্তি। স্বীকার করতেই হবে, লেখার জন্য, তথ্যের জন্য প্রায় কোথাও-ই আমাদের প্রত্যাখ্যাত হতে হয়নি। প্রায় সর্বত্রই ছিল এই প্রচেষ্টার প্রতি অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা ও সমর্থন। যে-কোন সংকটে, সমস্যায়, পরামর্শের জন্য অসঙ্কোচে আমরা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, অলকা চট্টোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হয়েছি; রাম হালদার, মহাশ্বেতা দেবী, অবনীরঞ্জন রায়, শঙ্খ ঘোষ এবং স্বপন মজুমদারের মতন আমাদের নিত্যশুভার্থীদের দ্বারস্থ হয়েছি। এঁরা ছাড়াও, তথ্য দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, শ্রম দিয়ে নানাভাবে আমাদের প্রচেষ্টাকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেছেন কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, অশোক ঘোষ, অমিয়কুমার বাগচী, যশোধরা বাগচী, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, মীনাক্ষী দত্ত, তাপস চন্দ, কুনাল বসু, গৌতম ভদ্র, দেবব্রত পাণ্ডা, অরুণকুমার রায়চৌধুরী, সন্দীপ দত্ত, চিন্ময় ঘোষ, সাহানা আচার্য, উদয় রায়, রঞ্জিত সাহা, পূর্ণেন্দু কর, মলয় মুখোপাধ্যায়, অজয় দে, কুনাল চট্টোপাধ্যায়, অরূপ সেন, জয় দাশগুপ্ত, প্রভাতকুমার দাস, হিমিত পাল, সমীর রায় ও আশিস ঘোষ।

বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর কাছে লেখা 'চিঠিপত্র' প্রকাশের সুযোগ আমাদের দিয়েছেন প্রতিভা বসু, প্রণতি দে, রেখা চট্টোপাধ্যায়। আশা রাখছি, ভবিষ্যতে কামাক্ষীপ্রসাদকে লেখা আরো চিঠি এবং সমর সেনকে লেখা এঁদের ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের চিঠিপত্রও আমরা এর সঙ্গে যুক্ত করতে পারব। রবীন্দ্রনাথের লেখা ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিপত্র প্রকাশিত হল বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

সুনীল জানা ও মোনা চৌধুরী তাঁদের তোলা সমর সেনের ছবি ব্যবহার করতে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 'ফ্যামিলি এ্যালবাম'-এর ছবি দুটি আমরা পেয়েছি অনিল সেনের সৌজন্যে। প্রচ্ছদের জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রবীর সেনের কাছে।

যে বিরল-দৃষ্ট নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় 'প্যাপিরাস'-এর কর্ণধার অরিজিৎ কুমার ও তাঁর সমস্ত সহকর্মী সীমিত-সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই সংকলনের প্রতিটি পৃষ্ঠাকে সুমুদ্রিত করেছেন তার জন্য কোন ধন্যবাদই যথেষ্ট নয়।

'সমর সেন সংখ্যা' সম্পাদনার দুর্লভ সম্মান ও সুযোগ দেওয়ার জন্য 'অনুষ্টুপ' পত্রিকার কাছে বর্তমান সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। সম্পাদনার কাজে তাকে কোন মুহূর্তেই নিঃসঙ্গ বোধ করতে হয়নি, কারণ তার সমস্ত রকমের উৎপাত হাসি

মুখে মেনে নিয়ে, আগাগোড়া সহযোগিতা করে গিয়েছেন সোমেশ চট্টোপাধ্যায় ও অনিল আচার্য।

সংকলনে ব্যবহৃত তথ্য বা পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র প্রাথমিক উৎসের উপরই নির্ভর করা হয়েছে। একটি-দুটি জায়গায় তা সম্ভব হয়নি, ফলে সামান্য ত্রুটি রয়ে গেছে। 'অগ্রণী' পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত রচনা তিনটির জন্য আমরা নির্ভর করেছি ধনঞ্জয় দাশ-সম্পাদিত 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক' গ্রন্থটির উপরে। এছাড়া বলাই বাহুল্য, সংকলনে প্রকাশিত প্রতিটি রচনার মতামতের দায়িত্ব একান্তভাবেই সংশ্লিষ্ট লেখকের।

অপ্রতুল সময়ের চাপের মধ্যে কাজ করতে হয়েছে আমাদের। ফলে চিঠিপত্র-সম্পাদনার ক্ষেত্রেও প্রত্যাশিত সতর্কতা যেমন সর্বত্র অবলম্বন করা যায়নি, বানানের সমতা-রক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটেছে। থেকে গিয়েছে কিছু মুদ্রণ প্রমাদও। তবু বিশ্বাস করি, সহৃদয় পাঠক নিশ্চয় এই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতিকে, তাঁর প্রাপ্তির তুলনায়, শেষ পর্যন্ত, নগণ্য জ্ঞান করতে পারবেন।

পুলক চন্দ

উল্লেখযোগ্য সংশোধন :

'সীমান্ত পেরিয়ে' — সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রবন্ধটি ভুলক্রমে 'সীমান্তে পেরিয়ে' ছাপা হয়েছে।

পত্রিকার কথা

সমর সেন 'বিশেষ সংখ্যা'র পরিকল্পনা করেছিলাম বছর তিনেক আগে। সমর সেনের কাছে যখন প্রস্তাব করি তখন মনে মনে জানতাম তিনি বিরক্ত হবেন। হয়েছিলেনও। কিন্তু আমরা ছিলাম দৃঢ়নিশ্চয়। তিনি মেনে নিয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত, কেননা আমরা ততদিনে কাজ শুরু করে ফেলেছিলাম। শেষবার দেখা হয় 'ক্যালকাটা হসপিটাল'-এ। তখনো দেখেছি তার অস্বস্তি। রক্ত চলাচলে বাধা পড়ছিল। অপারেশনের কথা ছিল। তখনো তিনি ফ্রন্টিয়ার-এর 'অটাম নাম্বার'-এর কথা ভাবছেন, ভাবছেন রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর শরীরে রক্ত চলাচলের মতো বিঘ্ন ঘটার কথা। তার কিছুদিন বাদেই তিনি প্রয়াত হলেন। তাঁর হাতে এই সংখ্যাটি তুলে দেবার ইচ্ছা ছিল। হলো না। হয়ত তিনি পড়তেন না। অবহেলায় রেখে দিতেন। তাও আমাদের ভালো লাগত, কেননা সেটাও হতো তাঁর স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

বিশেষ সংখ্যার কাজ শুরু করার সময় মনে হয়েছিল, এ-সংখ্যার জন্য এমন একজন সম্পাদক দরকার যিনি দক্ষ গবেষক এবং সমর সেন সম্পর্কে আগ্রহ পোষণ করেন। পুলক চন্দ সে দায়িত্ব নিলেন। সংখ্যাটি ঈপ্সিত রূপ পেল তাঁর নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রমে। এ-সংখ্যার কৃতিত্ব তাঁর। যদি কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে থাকে তার দায়ভাগ আমাদের সবার এবং বিশেষত নিয়মিত সম্পাদক হিসেবে যার নাম ছাপা হয় তার।

অনুষ্টুপের সমর সেন সংখ্যা শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হলো। এই সংখ্যাটি বর্তমান বছরের যুগ্ম সংখ্যা। এর পর আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হবে আমাদের ২২তম বছরে।

ইংরাজি মে মাসের শেষ সপ্তাহে পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে, আশা করা যায়। আর তার পরে ২৩তম বর্ষের প্রথম সংখ্যা, অর্থাৎ আগামী শারদীয় সংখ্যা।

একজনের নাম কৃতজ্ঞতা স্বীকারে রাখতে চাই অনুষ্টুপের পক্ষ থেকে। অরিজিৎ কুমার আগ্রহ সহকারে এবং নিঃস্বার্থভাবে দায়িত্ব না নিলে এ-সংখ্যা হয়ত এমনভাবে এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হতো না।

অনিল আচার্য্য

প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হয়েছিল প্রথম সংস্করণটি, তাই অল্প সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো—এতে আমরা গৌরবান্বিত।

অনিল আচার্য্য

সূচি

স্মৃতিচারণ ১—১৩২

আলোচনা ১—১৩৬

চিঠিপত্র ১—১৫৯

পুনর্মুদ্রণ ১—১১৯

ইংরাজি রচনা ১—৬৬

কালের দর্পণে সমর সেন সংকলক : পুলক চন্দ ১—৩১

প্রবেশক : 'ফ্রন্টিয়ার'-এর দপ্তরে। (ছবি : মোনা চৌধুরী)

১ অরুণচন্দ্র সেন। (অনিল সেনের সৌজন্যে)

২ মা ও ভাইবোনদের সঙ্গে বালক সমর সেন, ডান দিকে, শেষে। (অনিল সেনের সৌজন্যে)

৩ উপরে, বাঁ দিক থেকে : চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র (আই. সি. এস.) সমর সেন। (প্রণতি দে-র সৌজন্যে)
নিচে, বাঁ দিক থেকে : শোভা জানা, তারা যাজ্ঞিক, সুনীল জানা, চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্য, সমর সেন। (ছবি : সুনীল জানা)

৪ উপরে, বাঁ দিক থেকে : সমর সেন, সুনীল জানা, অশোক মিত্র (আই.সি.এস.), চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, শোভা জানা, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
(ছবি : সুনীল জানা)
নিচে, বাঁ দিক থেকে : রেখা চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, সুলেখা সেন।
(রেখা চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

৫ বাঁ দিকে : সমর সেন ও কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।
(রেখা চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)
ডান দিকে : সমর সেন ও অরুণ মিত্র। (অরুণ মিত্রের সৌজন্যে)

৬ সমর সেন (ছবি : সুনীল জানা)

৭ একটি চিত্র-পত্র। (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে)

কাঁথি কলেজে কাজ করবার সময় (১৯৪০ সালে) বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে বেড়াতে আসতে আমন্ত্রণ জানিয়ে পাঠানো। শিরোনাম : 'জীবনবীমার প্রয়োজনী[য়]তা।' কাঁথি যাওয়ার পথে তখন হরেক ঝুঁকি। কী কী ঝুঁকি, পরের পর ছবিতে তারই বিবরণ : বেলদার রাস্তায় নৌকো, সমুদ্রের রাস্তায় সাপ, বালিয়াড়িতে 'কুকবাঘ', 'আপাতত গোদাক্রান্ত' কাঁথির লোক ইত্যাদি। সবশেষে, দাঁড়িপাল্লা হাতে আত্মপ্রতিকৃতি এবং সুখবর : 'সের দরে আমি', অর্থাৎ, প্রচুর আয় করছি (৬০ কি ৭০ টাকা হবে), চলে আসুন।

৮ একটি কবিতার খসড়া। (প্রতিভা বসুর সৌজন্যে)

স্মৃতিচারণ

রাধারমণ মিত্র

সমর

সমর সেনের ঠাকুর্দা ড. দীনেশচন্দ্র সেন তখন থাকতেন কাঁটাপুকুরে, এখনকার বিশ্বকোষ লেনে, প্রাচ্যবিদ্যার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসুর বাড়ির লাগোয়া দক্ষিণে। আমি ছিলাম কাছেই, গোপীমোহন দত্ত লেনে। সুতরাং প্রায়ই ঐ বাড়িতে যেতাম। অনেকদিনই দেখেছি, দুই বুড়োর মধ্যে সেখানে বেজায় তক্কাতক্কি হচ্ছে। কায়স্থ বড় না বৈদ্য বড়, এই তাঁদের তর্কের বিষয়।

সমরের বাবা অরুণের সঙ্গে আমার ওখানেই আলাপ। আলাপ থেকে বন্ধুত্ব। ক্রমশ সেটা গভীর হতে থাকে। এক সময় আমি ওদের পরিবারের প্রায় একজন হয়ে পড়ি। এতখানিই যে, তখন আমাকে বাদ দিয়ে ও-বাড়ির কোন অনুষ্ঠানই হোত না। আমি যে শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দেই তারও কারণ ছিল অরুণ।

দীনেশ সেনের বড় ছেলে কিরণ সেন কাজ করতেন ইউনিভার্সিটিতে, অরুণ মেজ। অরুণের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ছিল পরমাসুন্দরী, নাগপুরের প্রবাসী বাঙালী-কন্যা। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঐ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্রনাথই তাদের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন।

অরুণ ও আমি মিলে একটা পত্রিকাও প্রকাশ করি, নাম 'অনাগত'। আমি সম্পাদক, অরুণ তার ম্যানেজার। পত্রিকা প্রকাশের খরচ যুগিয়েছিল অরুণেরই স্ত্রী, নিজের গায়ের গয়না বিক্রি করে। অবশ্য সে পত্রিকা টেঁকেনি। তিন মাস মাত্র চলেছিল। অরুণ খুবই বন্ধুবৎসল ছিল। কিন্তু লোকে ওকে বলত ক্র্যাঙ্ক। ওর কোন কন্‌সিস্‌টেন্সি ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গেও ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। আগে ও ছিল দারুণ কমিউনিস্ট, পরে, লীলা রায়ের মারফৎ, হয়ে উঠল ভীষণ সুভাষপন্থী।

সমরের যখন জন্ম আমি তখন বি. এ. পড়ি। কিন্তু ওকে, সেই অর্থে, প্রথম দেখি ১৯৩৬ সালে। দীনেশ সেন ততদিনে বাড়ি নিয়েছেন বেহালায়। রাস্তার ধারে, গাছপালা পুকুর নিয়ে তাঁর বাগান বাড়ি। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা থেকে ছাড়া পেয়ে এসে আমি তখন উঠেছি অরুণের কাছেই। সমর সে সময় এম. এ-র জন্য প্রিপারেশন করছে। একদিন ওর একটা লেখা পড়ে আমি অবাক, দেখি অসাধারণ ইংরেজি। এমনিতে তো ও ছিল, বরাবরের মতন, কিছুটা বাউণ্ডুলে। কথা বেশি বলত না কোনদিন। লেখায় যেমন, কথাবার্তাতেও ওর সংযম ছিল তেমনি চোখে পড়বার মতন। অদ্ভুত সেন্স অব্ হিউমার, কুটুস করে কিছু কিছু মন্তব্য—সব দিক থেকেই ও ছিল আর পাঁচ জনের থেকে আলাদা।

প্রতি শনিবার শনিবার সমরের বন্ধুরা আসত বেহালায়। তাদের মধ্যে থাকত

অশোক মিত্র (আই. সি. এস.)। ওদের দুজনকেই আমি মার্কসিজম বুঝিয়েছিলাম। তবে, আমার সংস্পর্শে এসেই সমর কমিউনিস্ট হয়েছে একথা ঠিক নয়। কারণ, ১৯৩৫-এ বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা বেরুলে তার প্রথম সংখ্যাতেই ছিল সমরের কয়েকটি কবিতা। আর তখন থেকেই, অর্থাৎ আমার সংস্পর্শে আসার আগে থেকেই, কমিউনিস্ট কবি হিসেবে সে পরিচিত হয়ে গেছে। অবশ্য এটা হতে পারে, মুজফ্ফর আহ্মদের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় হয়েছিল আমারই মাধ্যমে। হয়ত আমারই প্রভাবে সে তার প্রথম কবিতার বই ('কয়েকটি কবিতা') মুজফ্ফর আহ্মদকে উৎসর্গও করেছিল। কিন্তু তাকে কমিউনিস্ট করার পিছনে তাই বলে আমার কোন কৃতিত্ব নেই।

এম. এ পাশ করে অল্প কিছুদিন কাঁথি কলেজে পড়াল সমর। তারপর দিল্লি চলে গেল, রামযশ কমার্সিয়াল কলেজে চাকরি নিয়ে। বিয়ে করল সেখানে। সংসারচন্দ্র সেন জয়পুর রাজ-এর দেওয়ান। তাঁর পরিবারের এক অংশ ছিল দিল্লিবাসী। তাঁদেরই এক মেয়ে সুলেখার সঙ্গে বিয়ে হল। বিয়েতে আমি গিয়েছিলাম। অরুণই নিয়ে গিয়েছিল আমাকে। এরপর কলেজের চাকরি ছেড়ে কয়েক বছরের জন্য আকাশবাণীতে কাজ। ১৯৪৯ নাগাদ সমর চলে এল কলকাতায়। ঢুকল স্টেটসম্যান-এ। সেখান থেকে গেল মস্কোয়। তর্জমার কাজ নিয়ে। বছর চারেক ছিল ওখানে। ফের কলকাতায় এসে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের চাকরি নিল সে। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নীতিগত কারণে ঐ চাকরিও সমর ছাড়ল। হুমায়ুন কবীর সেই সময় বের করলেন 'নাউ'। সমরকে তার এডিটর করলেন, বললেন, 'তোমার এডিটরিয়াল পলিসিতে আমি নাক গলাবো না, খুশি মতন তুমি পত্রিকা চালাও।' সমর তো বরাবরই বামপন্থী, কাজেই পত্রিকাও ক্রমশ গরম গরম লেখা ছাপতে লাগল। এই নিয়ে শেষ পর্যন্ত হুমায়ুন কবীরের সঙ্গেও মত বিরোধ হল। পত্রিকা উঠে গেল।

নতুন পত্রিকা বেরুল এবার 'ফ্রন্টিয়ার'। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা তার জন্য চাঁদা তুললেন। আমিও দিয়েছিলাম একশ টাকা। যেতামও মাঝে মাঝে মট লেনের আপিসে। দেখতে দেখতে বামপন্থী কাগজ হিসেবে নাম ছড়াল 'ফ্রন্টিয়ার'-এর। অনেকেই বলতে থাকল, সমরের কাগজ নকশালপন্থীদের সমর্থক। কিন্তু কারো কিছু বলাকে সে মোটেই পরোয়া করত না। কোনদিনই অন্যায়ের কাছে, কারো দাবড়ানিতেই সমর মাথা নত করেনি। অন্যের কথায় নিজের মতও ছাড়েনি কখনও, তাতে তাকে কেউ ভালই বলুক আর মন্দই বলুক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র

সমর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

সব মানুষই কিছু না কিছু ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যায়, কিন্তু সমর ছিল আমাদের সময়ের একটা উদ্ভাসন। আমরা প্রত্যেকেই অভিভূত হয়েছি, তবে সেটাকে বিশ্লেষণ করে বলে দেওয়া সহজ নয়। অনেক স্মরণীয় লেখক আমাদের সময়ে এসেছিলেন। প্রতিভা ছিল তাঁদের সকলের। তবু যেন সমর সেনের মধ্যে একটু বেশি কিছু ছিল—একটা উজ্জ্বল উপস্থিতি। কবি হওয়া বা লেখক হওয়ার দাম নিশ্চয় তার কাছেও ছিল। এ-গুলোকে যে সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করত তা নয়, তবে ব্যক্তিত্বটাই যেহেতু অন্যরকমের তাই লক্ষ্যও ছিল আরো বড় কিছু হওয়া। এ যুগের মানুষ, ভাবী যুগের মানুষ হওয়ার সাধনা ছিল তার। আমাদের সময়টাই প্রথমত আলাদা, উপরন্তু সমরের মূল্যও একটু আলাদা বলে এখন মনে হচ্ছে যেন বড় অকালে তাকে হারালাম।

সমরের সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক বরাবরের। ওকে জানি সেই ১৯২৬ সাল থেকে, যখন ওর একেবারেই বাচ্চা বয়স। ওদের বাড়ির সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক সম্বন্ধের মতন ছিল। সমরের ঠাকুর্দা দীনেশ সেন, রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ স্কলার, আমাকে তার সহকারী হিসেবে নিয়েছিলেন। সেই সুবাদে প্রায়ই বিশ্বকোষ লেনের বাড়ি যেতে হত। আমি আবার স্কটিশচার্চের ছাত্র, ওর বাবা অরুণচন্দ্র সেন মশাইয়ের কাছেও পড়েছি। তাছাড়া, ওর কাকা, ইতিহাসের বিনয় সেন, ছিলেন আমার অতি বড় হিতৈষী বন্ধু।

একটি বিশেষত্ব সমরের মধ্যে ছোটবেলা থেকেই আমি দেখেছি। সহজে ও কারো সঙ্গে মিশতে পারত না, অথচ ওর মধুর উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব লক্ষ করতেই হত সকলকে। লেখক হিসেবে তখন আমার কিছু নামডাক হয়েছে। অনেকেই এসে গায়ে পড়ে গল্প করে যায়, আলাপ জমাবার চেষ্টা করে—সমর কিন্তু সে-রকম কোনদিনই করেনি। তাই, কী সব ক্ষমতাটমতা ছেলেবেলায় ওর ছিল তার কথাও বিশেষ জানার সুযোগ পাইনি। কিছুটা পেলাম যখন 'কবিতা' পত্রিকায় সহকারী হিসেবে ও যোগ দিল।

আমার ও বুদ্ধদেবের এক সময় মনে হচ্ছিল, বড় বড় কাগজে কবিতা বের হয় বটে কিন্তু সেটা অনেকটাই পাদপূরণ গোছের। কবিতার নিজস্ব সম্মানের জায়গা যেন সেখানে মোটেই নেই। আমরা তাই গতানুগতিকতার মধ্যে না গিয়ে নতুন কিছু করবার কথা ভাবলাম। ভাবলাম, কবিতা কবিতারই জোরে, নিজেরই অধিকারে তার স্থান করে নেবে। অতএব, চাই শুধুই কবিতার ও কবিতা-বিষয়ক একটি কাগজ। ত্রৈমাসিক 'কবিতা'র পরিকল্পনা হল। বুদ্ধদেবই বলল, সমর সেন

আমাদের সহকারী হচ্ছে। কথাও হল একদিন। ব্রাইট ইয়ং ছেলে। শেষ বয়সেও ওকে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা লক্ষ করেছেন, ওর ভিতরে কোথাও একটা তারুণ্য ছিল, দীপ্তি ছিল—যেটা একাত্তর বছরেও হারায়নি। মজার কথা এই, প্রথম যখন ও কবিতা লিখতে শুরু করে তখন বয়স যে ওর অত কম সেটা যেমন বোঝার উপায় ছিল না তেমনি আবার যখন সত্যি অনেক বয়স হয়েছে তখন ওর লেখা পড়ে বোঝা যেত না যে বয়স অত বেশি। ভেতরে ভেতরে সেই সতেজ ভাব—যাকে বলা চলে মনের তারুণ্য, সবসময় ওর ছিল।

যাই হোক, আমি তখন নিজে নানা বিষয়ে ভীষণ ব্যস্ত, ওর দিকে তত মন দিতে পারিনি। পত্রিকার সঙ্গে ছিলামও মাত্র বছর দুয়েক। তাহলেও, সবদিক থেকেই যে ও বিশিষ্ট সেটা বোঝা যেত সহজে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা বের হওয়ার পর এমন একটি ঘটনা ঘটল (এর উল্লেখ এ-পর্যন্ত কেউ সমর-প্রসঙ্গে করেছেন বলে আমার জানা নেই) যার মধ্যে তারই প্রমাণ কিছুটা পাওয়া গেল। খ্যাতনামা সমালোচক এডোয়ার্ড টম্‌সন রবীন্দ্রনাথের উপর যাঁর বই আছে, তখন এসেছিলেন এখানে। 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা দেখে তিনি এতদূর অভিভূত হলেন যে দেশে ফিরে Times Literary Supplement-এ এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখলেন, যাকে বলে তার মুখ্য প্রবন্ধ। এখনকার কথা জানিনা, তখনকার দিনে বিশ্ব-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই কাগজের মূল্যই ছিল আলাদা। T.L.S-এ কিছু বের হওয়া মানে—সারা পৃথিবীতে সাহিত্য-রসিকদের মধ্যে তা ছড়িয়ে যাওয়া। টমসন তাঁর প্রবন্ধে 'কবিতা' পত্রিকা নিয়ে অনেক কথা লিখলেন, তারপর আমাদের কবিতা বিষয়ে একটু আধটু উল্লেখ করলেও গুরুত্ব দিলেন সমরকেই সব চাইতে বেশি, ওর দুটো কবি গার অনুবাদ-সহ আলোচনা করলেন। তার ঐ বয়সের পক্ষে (তখনও সে কলেজের ছাত্র!) এটা একটা বড় মাপের সম্মান ও স্বীকৃতি, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। অন্য কারো হলে ঐ থেকেই হয়ত তার জীবনের পথ নির্দিষ্ট হয়ে যেত। ওখান থেকেই হয়ত সে সংগ্রহ করে নিত বাকি জীবনের রসদ, এন্তার কবিতা লিখত, নাম করত, বিদেশ যেত—ইত্যাদি। অথচ, সে-সবের কিছুই সমর করল না। যারা তাকে চেনে তারা জানে এসব ও গ্রাহ্যই করত না। কোন লোভই ছিল না ওর স্বভাবে। কোথায় যেন ছিল একটা ছাড়া ছাড়া ভাব। যেন সব কিছুর মধ্যেই আছে, আবার নেই-ও। এখন তাই মোটেই অবাক হইনা যখন শুনি যে সমরের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরও অনেকে এই T.L.S-এর সংবাদটি জানেনা, কিংবা আত্ম-জীবনী 'বাবু বৃত্তান্ত'-য় এর কোন উল্লেখ সমর করেনি।

'কবিতা'তে একসঙ্গে অল্প কাল কাজ করলেও সমরের সঙ্গে প্রকৃত ঘনিষ্ঠতা আমার কিন্তু হয়েছে আরও অনেক পরে, কামাক্ষীপ্রসাদ-দেবীপ্রসাদরা যখন 'রংমশাল' বের করল, তখন। কামাক্ষী-দেবীর সঙ্গে আমার স্নেহের, বন্ধুত্বের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। ওদেরই ভালবাসার টানে সেখানে নিয়মিত যেতাম। ওদিকে, দেবীর

সঙ্গে সমরেরও তখন থেকেই একটা গভীর বন্ধুত্ব—কাজেই সমরও প্রায়ই আসত। আরো আসত সুনীল (জানা), চঞ্চল (চট্টোপাধ্যায়) এবং তাদের অনেক বন্ধু-বান্ধব। সবাই মিলে আমরা আড্ডা জমিয়েছি দিনের পর দিন, জড়ো হয়েছি এখানে ওখানে, হরেক জায়গায় এবং এই সবের ভিতর দিয়ে, তিল তিল করে আমাদের মধ্যকার প্রীতির সম্পর্কটুকু এক সময় গড়ে উঠেছে।

সমরের লেখা পড়ে প্রথম থেকেই আমার মনে হয়েছিল, হুজুগের ধাক্কায় তৈরি কবি এ নয়। চমকে দেবার চেষ্টা নেই, নিজস্বতা আছে, কোন প্রলোভনে যেন কখনো সে বিচ্যুত হবে না। এক রকমের লেখা ও কোন সময় লেখেনি। কিছু লিখে নাম হয়ে গেলে যেমন অনেকে সেটাকেই একটা ধারা হিসেবে দাঁড় করাতে চায়—সে রকম ও করেনি। সব সময়ই নতুন পথ খুঁজেছে। কোথাও যেন ওর ভিতরে একটা যন্ত্রণা ছিল।

এমনিতে তো সব কবিই কম বেশি নিঃসঙ্গ। কিন্তু সমরের কাছে নিঃসঙ্গতাটা কোন দুর্ভাগ্য নয়; সেটা ওর সম্পদ। তারই ভূমিতে দাঁড়িয়ে নিজেকে এবং নিজের চারপাশকে ও দেখেছে। তীর্যক ভাষা, তীর্যক প্রকাশ ভঙ্গী ছিল প্রথম থেকেই। ওর কাব্যভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : এতে কোন বাহুল্য নেই, উপরন্তু শব্দের ব্যবহারে রয়েছে অসম্ভব পরিমিতি আর তীর্যক-ভাষণের মুন্সিয়ানা,—শেষ এই বৈশিষ্ট্যে তখনকার কিছু বিদেশী কবির সঙ্গে তার মিল।

সমরের কবিতা বুদ্ধিদীপ্ত, কিন্তু অর্থহীনতার গোলক-ধাঁধা মোটেই নয়—রীতিমতন তার মানে হয়। অন্যদিকে, মূলত বুদ্ধিমার্গের শাসনে কবিতা লিখলেও সমরের কবিতায় আবেগ নেই বলা চলে না। আছে, একদম ছাঁকা এবং চাপা আবেগ আছে। যেন, একজন মানুষ তার বুদ্ধি, অনুভূতি—সমস্ত কিছু নিয়ে হারিয়ে যায়নি—রয়েছে, এবং কবিতার মধ্য দিয়েই সে প্রকাশ করেছে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব। সেখানেও আছে খোঁজা, নিজস্ব ভাষা খুঁজে নেওয়া। সমর তার কবিতার ক্ষেত্রে আবেগ ও বুদ্ধির একটা মিশ্রণ, দুটো মিলিয়ে নতুন একটা মাত্রা এনেছিল। সব কবিতাতে যে সে উত্তীর্ণ হয়েছে তা হয়ত বলা যাবে না, কিন্তু সব সময়ই কবিতাগুলো বিশেষ কবিতা হয়ে উঠেছে, আলাদা হয়েছে। জীবনানন্দর মতো ওর কবিতার ভাষা এখান-ওখান থেকে সংগৃহীত বা কারো অনুকরণ-অনুসরণ নয়। ও যেন সত্যি একটা নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব বক্তব্য, বেশ নিজস্ব একটা 'মুড্' প্রায় প্রথম থেকেই পাব পাব করেছে। সেদিক দিয়ে ও একদম স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। তবে সেটাও খুব চড়া স্বাতন্ত্র্য নয়। এলিয়ট-পাউণ্ড-এর প্রেরণা হয়ত কোন সময় অল্পবিস্তর ছিল, হয়ত এলিয়টের চাইতে পাউণ্ডই বেশি—আমার নিজের যেমন পাউণ্ডকেই বেশি বড় কবি মনে হয়। কিন্তু তাদের অনুকরণ সে কখনও করেনি। একটা নতুন সুর, নতুন বক্তব্য ছিল ওর কবিতার মধ্যে। চেষ্টা ছিল, নতুন যুগের কথা স্পষ্ট করে বলবার। কিন্তু দুঃখের কথা, এর জন্য প্রাপ্য গুরুত্ব বা স্বীকৃতি

বাংলা কবিতার পাঠকদের কাছ থেকে ও পায়নি। তবে এটাও লক্ষ করার বিষয়, তার সম-সাময়িক অনেক কবিইতো অনেকদিন ধরে অনেক অনেক রকম লিখেছে, এক নাগাড়ে লিখে গেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমরের স্বীকৃতিটাই ধোপে টিকল। নিয়মিত কবিতা লেখা ও বন্ধ করেছে প্রায় চল্লিশ বছর—কিন্তু আজ এতকাল বাদেও যে ওর কবিতার আবেদন সমানই রয়ে গেছে তার কারণ নিশ্চয় এই যে তার ভিতরে সত্যিকারের কাব্যগুণ আছে, যা অন্য অনেকেরই লেখায় ছিল না।

আবেগ-সর্বস্ব কবি সমর কখনোই নয়। ভিতরে ভিতরে ও দার্শনিক; রাজনৈতিক দার্শনিকতার কথাই বলছিনা শুধু। বাইরের সাজানো কোন পোশাকী দর্শনও নয়, জীবন সম্পর্কে, জীবন ধারার সঙ্গে মেলানো একটা ফিলজফি ছিল ওর। ধীরে ধীরে সেটাকেই সমর চেয়েছিল বিকশিত করতে। যেটুকু ও লিখে গেছে তার মধ্যে কোথাও এমন একটা বিশেষত্ব আছে, একটা পরিণত ভাব আছে, যা নজর কাড়ে, আমাদের সাহিত্যবোধকে তৃপ্ত করে। তবে ওর ভিতরের যে গুণ সেটা খুব স্পষ্ট বা তৎক্ষণাৎ বোঝার মতনও নয়। আমি যেমন লিখলাম, 'আমি কবি যত কামারের···', তাতে অর্থটা পৌঁছে গেল সোজাসুজি, যা বোঝবার বোঝা হয়ে গেল এক নিমেষে। দরকার নিশ্চয় এ ধরনের কবিতারও আছে, কিন্তু সমর এরকম কিছু লেখেনি। বেশির ভাগ কবিতায় ও যেন নিজেই নিজেকে খুঁজছে, সেটা একদিক থেকে হয়ত অসম্পূর্ণ, অন্যদিকে আবার তার মূল্য অনেক বেশি।

মানুষ হিসেবেও যে সমর একেবারে অন্যরকমের ছিল সেটা 'বাবু বৃত্তান্ত' পড়ে সহজেই বোঝা যায়। এ রকম আশ্চর্য আত্মজীবনী, নিজেকে নিয়ে এরকম ব্যঙ্গ, আর কে-ই বা করতে পারত? আমি পারতাম না, বুদ্ধদেবও পারত না; জীবনানন্দর পক্ষেও হয়ত সম্ভব হত না।

সামান্য যে-টুকু সমর লিখেছে তাই দিয়েই নিশ্চয় কোথাও সে আমাদের ভিতরের সাহিত্যচেতনাকে নাড়া দিয়ে গেছে, যার জন্য তাকে এই নতুন করে বোঝার চেষ্টা। জীবনানন্দর কবিতায় বাইরের এমন একটা চটক ছিল যা নিয়ে হৈ হৈ হতে পারে, হয়েছেও। কিন্তু সমরের কবিতাতো, মানুষটিরই মতোন, চিরকাল নিরুচ্চার, মিতবাক। সেই অর্থে, কোনদিনই ওর খুব জনপ্রিয় হবার কথা নয়। ওকে নিয়ে তাই কোন হৈ চৈ না করলেও কিছু আসত যেত না। তা সত্ত্বেও তার কবিতাকে যে ভোলা যাচ্ছে না, ফেলা যাচ্ছে না, কবি সমর সেনকে যে স্মরণ করতে, বিচার করতে হচ্ছে বারবার—এটা নিশ্চয় বাংলাসাহিত্যের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সমর সেন প্রসঙ্গে

লজ্জার মাথা খেয়ে শুরুতেই একটা কথা স্বীকার করি। ইতিপূর্বে বাংলায় এবং বাঙালিসুলভ ইংরেজিতে ঢের লিখেছি। গোনবার ধৈর্য নেই; আন্দাজে মনে হয় হাজার তিন-চার পাতার কম হবে না। অবশ্যই এ নিয়ে কম-বেশি অনুতাপও আছে। কিন্তু কলম ধরতে গিয়ে হাত কাঁপে নি। বুক দুরদুর করে নি। এখন করছে।

সমর সেন সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ফরমাসি লেখা ধরতে গিয়ে এমন হাল কেন? একটা কারণ নিশ্চয়ই এই যে বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। যতোদূর মনে পড়ে, ছত্রিশ কি সাঁইত্রিশ সালে প্রথম আলাপ। শেষ যেদিন দেখতে যাই সেদিন ওঁর পরমায়ুর মাত্র দিনকয়েক বাকি। গুনতি করলে প্রায় বছর পঞ্চাশ দাঁড়ায়। এই পঞ্চাশ বছর ধরে নানা অবস্থায় যাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গতা, তাঁর অভাবে অতি বড়ো অমানুষেরও মন ভেঙ্গে যাবার কথা। ফাঁকা তো লাগবেই।

কিন্তু আরো একটা বড়ো রকমের ঝামেলায় পড়তে হয়। যদি নেহাতই একটা মানুষ হোতো তাহলে সে-ঝামেলা থেকে হয়তো রেহাই পাওয়া যেতো। কিন্তু পঞ্চাশ বছর ধরে অতো কাছ থেকে যে-মানুষটিকে দেখেছি, তাঁকে কিছুতেই শুধু একটা মানুষ বলে মনে করা কঠিন। কবি—বাংলা কবিতার ঐতিহ্যে যিনি তোলপাড় এনেছিলেন। নির্ভীক মতাদর্শের প্রতিনিধি—এবং এমনই এক মতাদর্শ সমাজের উচ্চমহলে যার প্রতি বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-সুলভ মনোভাবের প্রতি বীতরাগী, অতএব কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পদ ও উপার্জনের প্রতি নিস্পৃহ। বিদ্যার মানদণ্ডে এমনই প্রতিভার পরিচায়ক যে কৈশোরের বহু কিংবদন্তির কেন্দ্র। সর্বোপরি বোধ হয় মনুষ্যত্ববোধের প্রতীক—সংসারের সংকীর্ণ কেন্দ্র ছাড়িয়ে সারা দুনিয়ায় সব মানুষের প্রতি যেন অসীম মমতা। একই মানুষের মধ্যে এতোগুলো মানুষ! হয়তো আরো বেশি। শোকসভা-টভা বেশ কয়েকটা অবশ্যই হয়েছে। লেখা-লিখিও। অনেকেই তাঁর নানান দিকের কথা তুলে ধরেছেন। তবু অন্তত আমার কাছে মনে হয়েছে ঢের কথা এখনো বলা বাকি। এই বাকিগুলো ভরাট করা সহজ নয়। কেননা চেষ্টা করতে গেলে অনেকগুলো মানুষ মনের সামনে এগিয়ে আসতে চায়। তাদের মধ্যে কখনো বা মিল আছে, কখনো নেই। এতোগুলো মানুষ মিলে একটা ছোটোখাটো যুগের কথা তৈরি হয়। অন্তত আমার বুদ্ধিতে আর অনুভূতিতে যুগটা সময়ের মাপে যাই হোক না কেন, তাৎপর্যর দিক থেকে মস্ত বড়ো।

তাই ভয় লাগে। ঠিকমতো বোঝাতে পারবো কিনা। না পারলে শুধু যে

তাঁকে অবমাননা করা হবে, তাই নয়। পুরো যুগটার একটা বিকলাঙ্গ ছবি দাঁড়িয়ে না যায়।

হাঙ্গামা আরো আছে। যদি অতো কাছের মানুষ না হতেন তাহলে নিজেকে বাদ দিয়ে লেখার চেষ্টা না হয় করা যেতো। কিন্তু আমার পক্ষে তা যে সম্ভব নয় একথা ফলাও করে ব্যাখ্যার দরকার নেই। পাঠকেরা কি তা সহ্য করবেন? করুন আর নাই করুন, আমার অবস্থা নেহাতই অসহায়। সাধ্যমতো চেষ্টা করেও নিজের কিছু অভিজ্ঞতা বাদ দিয়ে লেখা সত্যিই অসম্ভব।

আপনাদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে নিশ্চয়ই দেখেছেন। খালি গায়ে কেউ দেখেছেন কিনা জানি না। জিরজিরে হাড়ের শরীরটা অন্তত খানিকটা ঢাকা দেবার জন্যে সাধারণত জামা খুলতেন না। নিদেনপক্ষে একটা গেঞ্জির আড়াল নিতেন। এ-হেন মানুষটির কিন্তু একটা বড়ো রকমের গর্ব ছিলো। ছোটোবেলায় নাকি বাগবাজারের বক্সিং চাম্পিয়ন ছিলেন। কবি হিসেবে যখন নামডাক বড়ো কম নয়, তখনো ওঁর সামনে ওঁর কবিতার কথা তোলা সহজ ছিলো না। খিস্তি—অনেক সময় কাঁচা খিস্তি—করে থামিয়ে দিতেন। কিন্তু সেই তুখোড় বক্সিং চাম্পিয়নটির কথা উঠলে প্রবল উৎসাহ। মারকুটে ছেলে বলে নাকি পাড়ায় অনেকে রীতিমতো ডরাতো।

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা বলি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার কথা। চৌরঙ্গি-পাড়া গোরা পলটনে গিজগিজ করছে। দুজনে হাঁটছি; মনে হয় ও পাড়ার একটা দোকান থেকে কিছু গিলেছিলুম। এক পল্টন আমাদের পেরিয়ে যাবার সময় সমর সেনের সঙ্গে গায়ে কিছুটা ঠোকাঠুকি লাগে। ইচ্ছে করে কিনা, কী করে বলবো? কিন্তু সমর সেনের মাথায় ঢুকলো লোকটা ইচ্ছে করে ধাক্কা মেরে গেলো। বাগ-বাজারের বক্সিং চাম্পিয়নটি আমায় পিছনে ফেলে হনহন করে এগুলো এবং রীতিমতো ইচ্ছে করে পল্টনের গায়ে এক ধাক্কা লাগালো। লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে রুষ্ট গলায় বললো, 'What do you mean?' সমর সেন পাল্টা রোষে আরো চড়া গলায় বললেন, 'What did you mean?'

হাতাহাতি বাধলে কতোদূর পর্যন্ত গড়াতো, আন্দাজ করতে পারবো না। কিন্তু, ভাগ্যি ভালো, অতোটা গড়ায় নি। লোকটা অবাক বিস্ময়ে বাগবাজারের বীর-পুরুষটির দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে নিজের পথে পা বাড়ালো। বললাম, 'ব্যাপারটি কী? যে-বাজারের চাম্পিয়ন হন না কেন, অমন দশাসই চেহারার লোকটা হাত চালালে তো পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিতো।' সমর সেনের মেজাজ তখনো একেবারে ঠাণ্ডা হয় নি। বললেন, 'তা দিক আর না-ই দিক, অন্তত এক-হাত লড়ে তো যেতাম; মার খেলেও অপমান গিলতে হতো না।'

ঘটনাটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারি নে। সেদিন চৌরঙ্গির ফুটপাতে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিলো, সমর সেনকে এর আগে পর্যন্ত ঠিক পুরোপুরি বুঝি নি। মার খেতে

অরুচি নেই ; কিন্তু তাই বলে মাথা নোয়ানো ধাতে নেই একেবারে। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বারবার এই একই ব্যাপার দেখেছি। অমন জিরজিরে হাড় বের-করা মানুষটার বুকের পাটা মাপজোকের বাইরে। কবি হিসেবেও তাই। ছাত্র হিসেবেও। চাকুরি জীবনেও। অনেক কিছু জানতেন। অনেক কিছু শিখেছিলেন। কেবল, কোনোমতেই মাথা নোয়াতে শেখেন নি। যখন প্রথম কবিতা ছাপা হলো তখন একদিকে যেমন দারুণ হৈ চৈ আর একদিকে তেমনি খিস্তির বন্যা। চলতি কথায় যাকে বলে, ব্যাঙ-এর গায়ে ঠাণ্ডা জল ঢালার মতো। পরোয়া নেই। যেটা ঠিক পথ বলে মনে করেছেন তা থেকে এতোটুকুও হটানো অসম্ভব। ইচ্ছে করলে চাকরির ধাপ বেয়ে কোথায় উঠতে পারতেন, কে জানে ! তুলনায় ঢের ঢের চুনো-পুঁটিকে উঠতে দেখেছি। কিন্তু তার জন্য কমবেশি রফা করতে হয়েছে। সমর সেন রফা করতে শেখেন নি। আর একদিনের কথা বলি। আইন-আদালত জানিনে বলে নামধাম করতে পারবো না। শুনেছি, মানহানি-টানহানি বলে রকমারি হাঙ্গামা আছে। তাই রয়েসয়ে বলবো ! সমর সেন তখন একটা পত্রিকার সম্পাদকের চাকরি করেন। অনেকের মতে সম্পাদনার সার্থকতাতেই কাগজটার বিক্রি হুড়্হুড় করে বেড়েছিলো। কাগজের যিনি মালিক দিল্লির দরবারে তখন তাঁর রীতিমতো রমরমা ব্যাপার। একদিন সন্ধ্যায় সমর সেনের ঘরে আমরা ক'জন ইয়ারবক্সি একটু নেশাভাঙ করছি। এমন সময় মালিকের টেলিফোন। প্রশ্ন করলেন, পত্রিকার জন্য তিনি স্বয়ং যে-লেখাটা পাঠিয়েছেন সেটা কেমন লাগলো। সমর সেন সাঁটে জবাব দিলেন, 'ছাপাবার মতো হয় নি।' মালিক ঠাট্টা করে বললেন, 'সন্ধের পর শুনেছি তুমি প্রায়ই একটু রঙে থাকো ; এখন আলোচনা করে লাভ নেই ; কাল সকালে যখন প্রকৃতিস্থ থাকবে তখন আবার ফোন করবো।' 'তথাস্তু', বলে সমর সেন টেলিফোন রেখে আড্ডায় মন দিলেন। আড্ডা অনেক রাত পর্যন্ত গড়িয়েছিলো বলে বাকি রাতটুকু ওঁর বাড়িতেই থেকে গিয়েছিলাম। পরদিন সকালে চা খাবার সময় দেখি লেখাটা আবার উল্টেপাল্টে দেখছেন। ছোট্ট করে শুধু বললেন, 'বাজে লেখা'। এমন সময় মালিকের আবার টেলিফোন, 'এখন তো প্রকৃতিস্থ আছো ; লেখাটা আবার পড়ে দেখলে না কি ?' সমর সেন অম্লান বদনে বললেন, 'অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তবু পড়া যায়, প্রকৃতিস্থ অবস্থায় তা-ও কঠিন।' সম্পাদনার চাকরি সমর সেন নিজে ছেড়েছিলেন না বরখাস্ত হয়েছিলেন—ঠিক জানি না। তবে এটুকু জানি যে রচনার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে অমন বিদগ্ধ বাক্যালাপের পর খুব বেশিদিন সমর সেনের সঙ্গে সে-পত্রিকার সম্পর্ক টেঁকে নি। পত্রিকা জগতে অন্য চাকুরির কথাও জানি। কিন্তু তা প্রায় একই রকম শোনাবে। এই মেজাজের লোক চাকরির সিঁড়ি বেয়ে বেশিদূর এগোতে পারে না।

আমাদের মতো গেরস্থ-জীবনের পিছুটানে বাঁধা খাটো ধরনের লোক যাকে সাফল্য বলি, সমর সেনের মতো লোক তার অনেক উপরের স্তরের। এই প্রসঙ্গে

একটা কথা না তুলে পারছি না। যাঁর কবিতা নিয়ে সাহিত্য-জগতে অমন তোলপাড় দেশ ছেড়ে দেশান্তরের কাগজেও ছাপিয়ে পড়েছিলো, তিনি কোনোদিন কোনো প্রাইজ পান নি। অথচ প্রাইজের অভাব নেই। প্রাইজ পেতে গেলে প্রতিভা ছাড়াও আরো কিছু লাগে নাকি? সমর সেনের সেই বাড়তি গুণের অভাব ছিলো? যাই হোক, এ-ও একটা কারণ যার দরুণ তাঁর তুলনায় নিজেকে বড্ডো খাটো লাগে। কেননা আমি দুবার প্রাইজের চেক রাখা পকেট সামলাতে সামলাতে দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেছি। সমর সেন কিন্তু চেক দেখে খুশিই হয়েছিলেন। বোধ হয় এই ভেবে যে তার কল্যাণে বাজে লিখে বা ছাত্র ঠেঙিয়ে সংসার চালাবার দায় কমবে।

যাই হোক, সমর সেন সম্বন্ধে কিছু লেখা অন্তত আমার পক্ষে বড়ো কঠিন। প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে যাঁর প্রতিভার কিনারা খুঁজে পাই নি, তাঁর কথা লেখা চারটিখানি ব্যাপার নয়। তবে, আর শুধু একটা কথা না লিখলে নেহাতই বেইমানি হবে। অনেকবার অবশ্যই অনেক রকম ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে; ছোট্ট কথায় নিদারুণ খোঁচা দেবার তাঁর যে সহজ-সরল ক্ষমতা—তা থেকে রেহাই পাই নি। প্রধান কারণটা অবশ্য রাজনীতি বা রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে রণকৌশল। এই নিয়ে সমর সেন, বিশেষত পরের দিকে, যা ভাবতেন-মানতেন, আমার বুদ্ধির বা অভিজ্ঞতার —বা হয়তো ভাবালুতার—সঙ্গে তার মিল হতো না। কে ঠিক, কে বেঠিক, তার বিচারক অবশ্যই আমাদের দুজনের কেউই নই। তবে খোঁচা দেবার অধিকারটা যেন তাঁর একচেটে, আর খোঁচা খাবার অধিকারটুকু আমার। বুদ্ধির দীপ্তিতে তাঁর তুলনায় নিজেকে নগণ্য বলেই জানতাম, তাই তর্ক করার প্রাণপণে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। না-মেনেও চুপ করে থাকতাম। কথাগুলো বিশেষ করে বলে রাখলাম এই কারণে যে রণকৌশল ছাড়াও রাজনীতির ব্যাপারে বৃহত্তর মতাদর্শ বলে একটা কিছু আছে। এবং সমর সেনের সান্নিধ্যে না-এলে আমি হয়তো সেটুকুও শিখতে পারতাম না।

ব্যাপারটা গোড়ার থেকে না বললে বুঝিয়ে বলা যাবে না। ওঁর প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা'-র প্রথম ক্রেতা না-হলেও আমি নিশ্চয়ই প্রথম দলের ক্রেতাদের একজন। কিন্তু ছাপা বইটা খুলে আমি রীতিমতো অবাক হয়ে যাই। উৎসর্গপত্র দেখে। মুজাফ্‌ফর আহমদ-কে। লজ্জার মাথা খেয়ে স্বীকার করছি, তুলনায় কিছুটা অবস্থাপন্ন পরিবেশে কৈশোর কেটেছে বলেই তখনো রাজনীতির ধার বড়ো একটা ধারতাম না। সমর সেনকে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কাকে উৎসর্গ করেছেন?' বললেন, 'একদিন নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দেবো'। দিলেনও। সেই আমার জীবনে প্রথম প্রত্যক্ষ কমিউনিস্ট দর্শন। তারপর সমর সেন পরপর আরো অনেকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়। রাধারমণ মিত্র। এঁদের দুজনকেই তাঁর উৎসর্গ-করা কবিতার বই আছে। সমর সেনের আগে আর কোনো

বাঙালি সাহিত্যিক এ-রকম মানুষকে বই উৎসর্গ করেন নি। আলাপটা কিন্তু শুধু আলাপ নয়। আমার সামনে মূল্যায়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচন। ক্রমে বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে জলপানির যে টাকা পেতুম তার অনেকটাই খরচ হতে লাগলো মার্কসবাদের বই কেনায়। সেকালে ওসব বই কেনা সহজ ব্যাপার ছিলো না। খিদিরপুর ডকের কাছে কুখ্যাত গলিতে পাওয়া যেতো। সমর সেন একদিন পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। মলাটের উপর প্রায়ই উলঙ্গ বা অর্ধ-উলঙ্গ মেয়ের ছবি সাঁটা। পুলিসের চোখে ধোঁকা দেবার কায়দা। কিন্তু মলাট যেমনই হোক না কেন, বইগুলো গোগ্রাসে পড়তে শুরু করি। বোঝবার অসুবিধে হলে সমর সেনের দ্বারস্থ হতাম। সমর সেন আবার নিয়ে যেতেন রাধারমণ মিত্রর কাছে।

যাই হোক এইভাবে গুটিগুটি এগিয়েই আমার ব্যক্তিগত জীবনে সত্যবোধের হাতেখড়ি। ক্রমশ বুঝতে শিখলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের জলপানি সত্ত্বেও তখন পর্যন্ত মূর্খই ছিলাম। আমার পাঠ্য বিষয় ছিলো দর্শন। পরীক্ষায় নম্বর যাই মারি না কেন, এর আগে পর্যন্ত দর্শনের বিশেষ কিছু শিখি নি। অ আ ক খ থেকে আবার নতুন করে শেখা। গুরুদেবটি মিটিমিটি হাসতেন, স্বভাবসুলভ খিস্তি করতেন। কিন্তু দর্শন বুঝতে শেখালেনও। কবিতার খেই ধরে যার দিকে এগুনো তাঁর সংস্পর্শে না এলে দর্শনের ব্যাপারেও মূর্খ হয়ে থাকতে হতো। কথাটা কোনোদিন ভুলতে পারবো না বলেই রাজনীতির রণকৌশল নিয়ে পরের জীবনে যখন ওঁর কাছে কাঁচা খিস্তিও হজম করতে হয়েছে তখনো কৃতজ্ঞ ভাবেই করেছি। তবে, মানুষের ইতিহাস তো ঢের বাকি। যেটুকু কেটেছে তা চোখের পলক-মাত্র। অতএব শেষের দিকের মতান্তরে কে ঠিক আর কে বেঠিক তার বিচার এখনো বাকি, বিশেষত এই মতান্তর যখন মূল আদর্শগত ব্যাপার নয়। তাছাড়া, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমাকে খানিকটা ঢোঁড়া সাপের মতো অবজ্ঞা করতেন বলেই বোধ হয় তিনি তেমন বিচলিত হন নি। বরং—বাড়িয়ে বলছি না—ভারতীয় দর্শন নিয়ে আমার লেখায় মাঝে মাঝে উৎসাহও দিয়েছেন। কারণটা বোধহয় এই যে রণকৌশল ছাড়াও বৃহত্তর মতাদর্শ বলে বড়ো ব্যাপার রয়েছে। বিশেষত ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রে সেই মতাদর্শের পক্ষে আমার যেটুকু কাজ সেটুকু তাঁর চোখে কাজের কাজ। এই কারণেই, ভারতীয় দর্শন নিয়ে আমার লেখা তাঁর কাছে অল্পবিস্তর উৎসাহও পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শুধু একটা কথা বলে শেষ করবো। ওঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে বেশ কিছুটা ভয়ে ভয়েই আমার সদ্য-প্রকাশিত ভারতে বিজ্ঞান ও কলাকৌশলের ইতিহাস সংক্রান্ত বইটা দিয়ে এসেছিলাম। দিন কয়েক পরে বললেন, পড়তে ভালোই লাগছে; তবে শরীরের এখন এমন দশা যে বিশেষ কিছু লেখবার ক্ষমতা নেই; রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে আমার হয়ে অনুরোধ জানাবেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ বইটার একটা সমালোচনা লিখতে। রামকৃষ্ণকে বলেছিলাম। সমালোচনা বোধ হয়-

বের হয় নি। নাই হোক। কিন্তু মস্ত বড় উপহার আমার মনে গাঁথা হয়ে রইলো। মতান্তরের সমস্ত খোঁচা সত্ত্বেও সমর সেন আমাকে মস্ত বড়ো সান্ত্বনা দিয়ে গেলেন। তাঁর দেওয়া শিক্ষা অন্তত আংশিকভাবে তাহলে কাজে লাগাতে পেরেছি!

যাই হোক, আত্মকথা বলতে বসি নি। সমর সেনের কথা কিছুটা বলবার চেষ্টা করছি। তাই আর একটু না-লিখে পারছি না। খুব চলতি ভাষায় বললে বোধ হয় বলা যায়, কবি হিসেবে তাঁর খ্যাতি যাই হোক না কেন, ওঝা হিসেবেও তাঁর বেশ কিছুটা মর্যাদা প্রাপ্য। সমর সেন ভূত তাড়াতে পারতেন, অন্তত আমার কাছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে। কথাটা খুলেই বলি। আমাকে একবার যাকে বলে ভূতে পেয়েছিলো। সমস্ত দিন আর সমস্ত রাত মাথার মধ্যে শুধু একটা কথা। এমন অসম্ভব ভাবাবেগের দুর্যোগ যে বুঝিয়ে বলা কঠিন। সমর সেন কিন্তু বুঝেছিলেন। আমায় বললেন, তাঁর জীবনেও অমন গভীর অবসাদের সংকট বারকয়েক এসেছিলো। কিন্তু সে-রোগ সারাবারও তিনি নাকি একটি কায়দা আবিষ্কার করেছিলেন। বললেন, ওই রকম অবস্থায় পড়লে তিনি আর একবার কমুনিস্ট ম্যানিফেস্টো পড়েন। পড়লে ব্যক্তিগত ভাবাবেগের ব্যাপারটা যে কতো তুচ্ছ তা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। মানুষের গোটা ইতিহাসটার বোধ মনের সামনে ভেসে ওঠে। সত্যি বলতে কি, আমি ওঁর পরামর্শ মেনে আবার নতুন করে চটি বইটা পড়লাম। আবার পড়লাম। আবার পড়লাম। যতোই পড়ি ততোই ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতির কথাগুলো তুচ্ছ হয়ে আসে। শেষ পর্যন্ত সেগুলোর কথা ভাবতে গেলে অবসাদের বদলে লজ্জাই হয়। দিন কতকের মধ্যে সত্যিই ভূত ছাড়লো। আপনাদের কারুর জীবনে ওই রকম গভীর সংকট যদি কোনোদিন আসে তাহলে সমর সেনের মন্তরটা দিয়ে ভূত তাড়াবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন।

প্রতিভা বসু

সমর সেন

এই দীর্ঘ জীবনে আমি যতো পথ হেঁটেছি এবং মাত্র কিছুদিন আগে পর্যন্তও সমর সেন যতো পথ হেঁটে গেছেন এই জগতে, আমাদের দেখা সাক্ষাতের গণ্ডিটা সেই তুলনায় হ্রস্বই বলা যায়। তবে একটা সময়ে একাদিক্রমে দিনের পর দিন উনি আমাদের তাঁর প্রাত্যহিক সঙ্গ দিয়ে অন্তরের এমন একটা স্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিলেন যে সেই বয়সের সেই বন্ধনটা কালপ্রবাহে হয়তো কিছু শিথিল হয়েছে কিন্তু অটুট থেকে সমৃদ্ধ করেছে। তরুণ বয়েস থেকে পরিপূর্ণ যৌবনে পৌঁছতে পৌঁছতে আমাদের সকলেরই মত পথ জীবিকা সংসার সঙ্গ চরিত্র এমন একটা বাঁকে জীবনকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয় যে তাকিয়ে আর অতীতকে খুঁজে পাই না।

কর্মোপলক্ষে দিল্লিপ্রবাসী হবার পর থেকেই সমরের সঙ্গে আমাদের সেই বিচ্ছেদ শুরু হয়। তার আগে পর্যন্ত আমি, সমর আর বুদ্ধদেব এক নৌকারই যাত্রী ছিলাম। ঋতুর পরে ঋতু আমরা কী শরৎ কী বসন্ত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষা বালিগঞ্জের লম্বা লম্বা রাস্তা ধরে হেঁটেছি, লেকের তীরে গিয়েছি, সাড়ে ন'টার শোতে সিনেমা দেখেছি। বালিগঞ্জ আসবার পূর্বে যখন ভবানীপুরে ছিলাম তখনও তাই। তখন আমরা রসা রোডের মোড় ঘুরে বড়ো পার্কে যেতাম। এখন সেটার নাম দেশপ্রিয় পার্ক। বালিগঞ্জের এই পার্কটির নতুন চেহারা নন্দনকাননের মতো সুকোমল এবং সুদৃশ্য ছিলো। ঘাস এতো সবুজ আর পুরু ছিলো যে দর্শন স্পর্শন—দুই-ই ছিলো স্বর্গীয়। সেই সুন্দর জনবিরল পার্কে বেড়িয়ে কতো সময় কেটেছে তার ঠিক নেই। রসা রোডে গোলাম মহম্মদ ম্যানসনের একটি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা ছিলাম বলেই এই পার্ক ছিলো আমাদের 'প্রমেনাদ'। আমার সঙ্গে সমর সেনের সেই বাড়িতেই আলাপ। ১৯৩৪, আজকের কথা নয়, যদিও এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই তো সেদিন!

সমর সেনের ছাত্রজীবন—অতি উজ্জ্বল। ইংরিজিতে তুখোড়। আমার সঙ্গে যেদিন আলাপ বুদ্ধদেব বসুর কাছে উনি সেদিন কয়েকটি ইংরিজি কবিতা এবং বুদ্ধদেব বসুরই একটি কবিতার ইংরিজি অনুবাদ পকেটে করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি তখন সেখানে একান্ত নতুন মানুষ। নির্বাক দর্শক হিসেবে যা দেখেছি তা হলো বাঙালির তুলনায়, অত্যধিক ফর্সা রং, উজ্জ্বল চোখ, তীক্ষ্ণনাসা এক বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার তরুণ; এক নির্বাক শ্রোতা হিসেবে যা শুনেছি তা হলো, তাঁর ইংরিজি তর্জমা ও রচনার উচ্চৈঃস্বরে প্রশংসারত এক গুণগ্রাহী যুবকের অনিন্দিত কণ্ঠস্বর। বুদ্ধদেব তাঁকে বাংলা রচনার জন্য প্ররোচিত করলেন। তার সার্থকতা বিষয়ে যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার করলেন। এবং তা যে ফলবতী হয়েছিলো ১৯৩৫ সনের ১লা অক্টোবর বেরুনো 'কবিতা' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি পাঠ করলেই জানা যায়।

'হিংস্রপশুর মতো অন্ধকার এলো' 'আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে' আর 'বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে তোমাকে পাবার বাসনা' এই তিনটি কবিতা বেরিয়েছিলো সেই সংখ্যায়, সঙ্গে সঙ্গে তা সংবর্ধিত হলো। অবশ্য সংবর্ধনাকারীর সংখ্যা মাত্রই দু'চারজন; সেটাই স্বাভাবিক। নতুন প্রতিভাকে হৃদয়ঙ্গম করে স্বাগত জানাবার মতো প্রাণ মন শিক্ষা বোধ সর্বকালে সবসময়েই খুব কম মানুষের থাকে। তার উপরে গদ্য কবিতার লেখক। রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' এবং 'পরিশেষ' নামক গদ্য কবিতার বইদুটি বলা যায় প্রায় সদ্য সদ্য বেরিয়েছে তখন। বয়েস বছর দু'য়েকও নয়, সেটাই পাঠককুল হজম করে উঠতে পারেন নি, নতুন লেখক সমর সেনকে গ্রহণযোগ্য ভাবা তো নিতান্ত কঠিন।

কবিতা পত্রিকার সহকর্মী হিসেবে বুদ্ধদেব নিজের সঙ্গে যুক্ত হতে যাঁকে যাঁকে নির্বাচন বা আমন্ত্রণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে সমর সেনই ছিলেন যোগ্য সহকর্মী। একাত্ম হয়ে যাবার মতো মেজাজ শুধু সমরেরই ছিলো। পাঁচ টাকা চাঁদা তুলে চারজনের কাছ থেকে সবমোট কুড়িটাকা সংগ্রহ করে এই পত্রিকার জন্ম হয়। তারপরে এঁকে ওঁকে খোসামোদ ক'রে দু'চারজনকে গ্রাহক করা, এক একটি সংখ্যা পঞ্চাশ পয়সায় বিক্রি করা এইসব দুঃখময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার আর বুদ্ধদেবের মতো একমাত্র সমরেরই একান্ত সংশ্রব ছিলো। মনে আছে মাত্র তিনজন ক্রেতার মধ্যে আমার বিবাহের পূর্বে পরিচিত একজন ধনী ক্রেতা সমরকে একটি অচল আধুলি দিয়েছিলেন। রাত বারোটা পর্যন্ত বসে তিনমাথা একত্র করে ভাবা হলো আধুলিটা তাঁর কাছে গিয়ে বদলে আনা সঙ্গত হবে কি না। একটা আধুলির দাম তো আমাদের কাছে বড়ো সোজা নয়, অনেক! শেষ পর্যন্ত সমর রায় দিলেন, 'না, আর কোনোদিন এর কাছে যাবো না, একে আমরা মন থেকে ছেঁটে ফেললাম।' বুদ্ধদেব চেঁচিয়ে হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন, Excellent, very good, চমৎকার Decision, নাহ্ সমরের মতো হয় না। রানু আবার রাগ করলে না তো? তোমার বন্ধু।'

আট আনার ক্ষতি সেই সন্ধ্যায় আমাদের সুখের প্রতীক হয়ে রইলো।

আসলে দুঃখ অভাবে নয়, দুঃখ দীনতায়। আমাদের সেই জীবনে অভাবের কোনো অভাব ছিল না কিন্তু আনন্দেরও কোনো অভাব ছিল না। আনন্দের উৎস টাকা এটা মনে হয়নি আমাদের আনন্দের উৎস ছিল বন্ধুতা। বন্ধুতার মতো সুখ আর কিসে? সমর ছিলেন আমাদের সেই সুখের বন্ধু।

ঠিক কবে দিল্লি গিয়েছিলেন মনে নেই। ১৯৪১ বা ৪২ সনে উত্তর ভারত ভ্রমণে কয়েকদিন বেরিয়ে, আমরা দিল্লিতে ছিলাম। সমর তখনই দিল্লিনিবাসী এবং সদ্য সদ্য বিবাহও করেছেন। সেই সময়েও সমর সারাদিন আমাদের সঙ্গী। উচ্চকণ্ঠে কথা বলা সমরের অভ্যাস নয়, উচ্চস্বরে হেসেও ওঠেননা কখনো। কিন্তু সদাই হাসিমুখ। ছোটো ছোটো রসিকতা করেন, বুদ্ধদেব অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন। সমরের মতো

ওরকম একটি নির্মোহ নির্বিবাদী অম্লান মানুষ কম দেখেছি। উনি যখন স্বদেশ বিদেশ নানাদেশ পরিভ্রমণের পরে পুনরায় কলকাতা এসে স্থায়ী হলেন তখন তাঁর বয়েস অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমাদের কনিষ্ঠ সন্তান শুদ্ধশীল তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেপরেটারির ছাত্র। শুনলাম ক্লাশে তার একটি সহ-পাঠিনী আছে, যার সঙ্গে তার বন্ধুতা প্রবল, প্রতিযোগিতাও প্রবল। পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেল প্রতিযোগিতায় শুদ্ধশীল হেরেছে। মেয়েটি ফার্স্ট, শুদ্ধশীল সেকেণ্ড। মেয়েটির নাম বীথি। পরে শুনলাম বীথি সমরের মেয়ে। এতো অবাক হয়েছিলাম। সমরের সঙ্গে পূর্বের মতো প্রাত্যহিক যোগাযোগ না হলেও দেখা হয়েছে অনেকবার, কিন্তু একথা তিনিও বলেননি। হয়তো আমাদের মতোই জানতেন না। ইতাবসরে মাঝে আমরা একবার ভারতের বাইরে গেলাম, কিছু-কাল বাদে ফিরে এলাম, আবার গেলাম, এই করে করে বছর পাঁচেক কেটে গেল। তারপরে চলে এলাম নাকতলার বাড়িতে। সমরের সঙ্গে আর দেখাশুনো হয়নি। অর্থাৎ সমর আর আসেননি আমাদের বাড়িতে। শুধু একদিন এসেছিলেন ছোটো কন্যার বিবাহে নিমন্ত্রণ করতে। অবশ্য নাকতলায় নয়, রাসবিহারী এ্যাভি-নিউর বাড়িতে। নাকতলায় চলে আসার বছর সাতেক বাদে এ্যান্টিরেবিস ইনজেকসনের প্রতিক্রিয়ায় আমি শারীরিক ভাবে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হয়ে যাই, লোকপরম্পরায় কোনোভাবে সংবাদটা সমর জেনেছিলেন, তৎক্ষণাৎ ছুটে এলেন নাকতলায়। অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলাম সন্দেহ নেই। প্রায় আট বছর বাদে দেখলাম। আর দেখলাম মৃত্যুর কয়েকদিন আগে এই সেদিন। আমিই গিয়ে-ছিলাম। শুনেছিলাম ওঁর শরীর ভালো নেই। জ্যেষ্ঠা কন্যা বীথির মৃত্যুই হয়তো ওঁর শরীরকে ভেঙে দিয়ে থাকবে। মাঝে মাঝেই শুনতাম সমর অসুস্থ। কিন্তু সেই অসুস্থতা এই অবসানে পৌঁছে দেবে তা কখনো ভাবিনি। আমি যেদিন গেলাম, সেদিন উনি সম্পূর্ণভাবেই সুস্থ ছিলেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক ছিলাম, খুব ভালো কেটেছিলো সময়। আমি ওঁকে আমার কবিতা ভবন বার্ষিকী ৩০ নভেম্বর কাগজে আমাদের পুরোনো জীবনের কথা কিছু লিখতে বলেছিলাম। উনি বলেছিলেন, ওঁর কোনো কথাই ঠিকমতো মনে আসে না। লিখতে বসলে এক-দু'লাইনের বেশি আর কী লিখবেন ভেবে পান না। ওঁর কবিতার মৃত্যু ঘটেছিলো অনেক আগেই, কী মানসিকতার দরুণ আবার কিছু মনে আনতে না পারার অসহ্য যন্ত্রণা ওঁকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে দিল কে জানে। অত্যন্ত বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ে ফিরে এসে-ছিলাম। উনি বলেছিলেন খুব শীগ্‌গীরই একদিন একটা ট্যাক্সি করে নাকতলা এসে আমার সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়ে যাবেন। তা আর হয়নি। আমি শান্তি-নিকেতনে গিয়েছিলাম সেখানেই যা জানবার জেনেছিলাম। মোটঘাট নিয়ে জাহাজের অপেক্ষায় আমিও তো বসে আছি, ভেঁপু আর বাজে কই? আরো কিছু প্রিয় বন্ধুর মতো সমরও চলে গেলেন। 'ঠাঁই নেই ঠাঁই নেই ছোটো সে তরী, আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি', সেই সোনার ধানের জাহাজে আমার আর ঠাঁই হচ্ছে না। শুধু ভাবছি একটা জীবনই একটা ইতিহাস।

প্রণতি দে

আমার স্মৃতিতে সমরবাবু

আমাদের বিয়ের পরই — ডিসেম্বর ১৯৩৪ সালে — আমি "কবিকুলে" এসে পড়লুম ! অবশ্য, তার আগেই আমাদের সহপাঠী — জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সঙ্গে এক বিকেলে ক্লাসের Social জলসায় সামান্য আলাপ হয়েছিলো। ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরের আগে আমার শ্বশুরবাড়ির পরিবার থাকতেন উত্তর কলকাতার সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে — আমাদের বিয়ের সময়ে দক্ষিণ কলকাতায় উঠে এলেন — প্রথম শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোডের উপর একটি বাড়িতে, ১৯৩৫ থেকে দেশপ্রিয় পার্ক রোডের কাছে একটি বাড়িতে। কারণটা অবশ্য "আমি" নয়, (পরে আমি জেনে আশ্বস্ত হয়েছি)। পিসিমার বাড়িও রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এ উঠে এসেছে কলেজ স্কোয়ার থেকে, পিসিমা রোজ ওঁর ছোট ভাইকে (আমার শ্বশুর মহাশয়কে) কাছে চাইতেন। চঞ্চলবাবু, ওঁর একান্ত বন্ধু, আমাদের পাড়াতেই থাকতেন, তাই রোজই দেখা হতো, জ্যোতিরিন্দ্র বাবুদের বাড়িও বেশি দূরে নয়। কাজেই কবিতার আড্ডা ভালোই হতো। চঞ্চল বাবুর সহপাঠী সমরবাবুর কবিতার আলোচনা হতো (আমার নিজেরও সমরবাবুর কবিতা ভালো লাগতো, বিশেষ করে মেয়েদের বিষয়ের কবিতাগুলি)। সমরবাবুর কবিতা কি একটু "কাটা-কাটা" হতো ? আমার স্বামী তখন "গদ্য-কবিতা" বেশি লিখতেন না, কিন্তু সমরবাবুকে দেখাবার জন্য একটি লিখেছিলেন — টপ্পাঠুংরি — সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, 'ইরা' — আমাদের বড় মেয়ের জন্মের ৬-৭ দিন পরে। চঞ্চলবাবু সমরবাবুকে নিয়ে আসেন আমাদের বাড়িতে — ১৯৩৬-এর গোড়ায়। সমরবাবু নিজেও তাই লিখেছেন : The first time I met Bishnu Dey was in 1936. The visit left mixed impresssions. Mr. Dey looked a sick man, with his nose and eyes, so remarkable when he is normal, having almost a mephistophelian flavour. He was then the victim of some chronic shomach trouble and was undergoing ayurvedic treatment. তখন আমার স্বামী biliary colic থেকে সেরে উঠছেন, gall bladder অপারেশন করা যায়নি, কারণ ডিসেম্বর ১৯৩৪-এর শেষদিক থেকে ১৯৩৫ জানুয়ারি পর্যন্ত কঠিন rheumatic fever হার্টটি খারাপ করে দিয়েছিলো। ওই যে mephistophelian flavour কথা দুটিতেই (জানিনা, কী দেখে সমর বাবু এই expressionটি ব্যবহার করেছেন) — সমর বাবুর সঙ্গে ওঁর ভালো সম্বন্ধ ছিলো না, এই ধারণাটা কি ছড়িয়েছে ? আসলে, চঞ্চলবাবু, সমরবাবু অশোকবাবু (অশোক মিত্র, পরে আই. সি. এস) — এই তিনজনেই তখন ওঁর জীবনে এসে গেছেন এবং উনি খুব পছন্দও করতেন। এঁদের সঙ্গে এসে গেলেন

কামাক্ষীবাবু, দেবীবাবু এবং ওঁদের বন্ধুর দল। ১৯৩৮ সালে আমার শ্বশুরমহাশয় মারা গেলেন, আমরা পার্কের কাছে বড় বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে ১৯এ, প্রিন্স গোলাম রোডের ছোট একটা বাড়িতে উঠে গেলুম। এই সময়েই আমি একটি কাছের স্কুলে কাজ পেয়ে যাই। তখনও, বোধহয়, সমরবাবুরা ওঁর ঠাকুরদাদার বাড়ি—বেহালায়—থাকতেন। একদিন সমরবাবুর বাবা প্রফেসর অরুণ সেন ১৯এ-র বাড়িতে এসেছিলেন, আমার স্বামীর কাছে। আমাকে হঠাৎ বললেন—"দিন না, মিসেস দে, আপনাদের পাড়াতে একটা বাড়ি খুঁজে। বেহালা থেকে স্কটিশে যাওয়া বেজায় কষ্টকর।" আমি রোজ গোলাম মহম্মদ রোড দিয়ে যেতুম—একটা বিরাট পুকুরের পাশ দিয়ে, আর দেখতুম পুকুরের উত্তর-প্রান্তে একটি ছোট্ট বাড়ি তৈরি হচ্ছে। বাড়িটার ছায়া জলে পড়তো—"জলে ছায়া ছবি সৃজনে"—ভারি সুন্দর দেখাতো। একদিন আমি আমার দুই মেয়েকে নিয়ে, বাড়িটির খবর নিতে গেলুম। তখন তো কলকাতার এ "হাল" হয়নি—একটু জায়গা জমি ছিলো—এতো বড় পুকুর—দীঘিই বলা চলে, তার সংলগ্ন অনেকটা জমি—বাগান ভর্তি পাতাবাহারের গাছ, বুনো গোলাপ, টিপুসুলতানদের বংশের প্রাচীন কবরখানা—দেখে পছন্দ হতে হবেই—আর কী পরিষ্কার, লালমাটির রাস্তা, রোজ সকাল বিকাল পাইপে করে গঙ্গার জল দিয়ে রাস্তা ধোয়া হতো, কতো ঠাণ্ডা—স্বপ্নের মতো মনে হয়! আর, কালোবাজার তো তখন আমাদের এ দিকের কলকাতায়, অন্তত, এতো প্রভাব ছড়াতে পারেনি—বাড়িতে মাঝে মাঝে "To let" লেখা টাঙানো দেখা যেতো! ছোট্ট বাড়িটাতে তখনও মিস্ত্রি কাজ করছে—১/১০ নম্বর—১/৯ বাড়িটি আরো বড়, শেষ হয়ে গেছে। মিস্ত্রিরা বললো—দুটি বাড়ি একই ভদ্রলোকের, এবং ভাড়া দেবেন। আমি কাগজ কলম নিয়েই গিয়েছিলুম—নাম ঠিকানা নিয়ে এলুম। আমরা যে বাড়িতে ছিলুম সেটাতে একটু অসুবিধা ছিলো—মা (আমার শাশুড়ী)-এর বিশেষ করে—এই নতুন বাড়িতে মা ব্যবস্থা করে নিতে পারবেন—মিস্ত্রিরাই আমায় উপদেশ দিলো। ফলে, অরুণবাবু যখন আমায় বললেন বাড়ির কথা, তক্ষুনি আমি ওঁকে বাড়ির মালিকের নাম ঠিকানা দিয়ে দিলুম,—উনিও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা করে উঠে এলেন। আমরা ১/১০-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৯-এ এসেছি, তখন অরুণবাবুরা বেশ কয়েক মাস ওখানে বসবাস করছেন। ফলে, অরুণবাবুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেলো—অমলবাবুর সঙ্গে তো বটেই, পরে উনি আমার স্বামীর অনেক চিকিৎসা করেছেন—ওঁর ডাক্তারখানায় গিয়ে বসে বিকেলে আড্ডা দেওয়া তো নিয়মই হয়ে গিয়েছিলো পরে,—সমরবাবু, গাবুবাবু আর ওঁর—অমলবাবু বোধহয় বেশিদিন ১/৯ বাড়িতে থাকেননি, গাবুবাবুও অল্প কিছু দিন পর নিজের পৃথক ব্যবস্থা করে নিয়েছিলেন, অন্যত্র। এঁরা ভাইয়েরা এক তলায় থাকতেন, বঙ্কিম মুখার্জিও মাঝে মাঝে থাকতেন, বোধহয় রাধারমণ মিত্রও—আরো অনেকে—অরুণবাবু এসব বিষয়ে খুব অমায়িক ছিলেন—এবং বন্ধুদের সব

সময়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত (এ বিষয়ে আমি পরে অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি), অরুণবাবু নিজে সস্ত্রীক ছেলেমেয়ে নিয়ে দোতলায় থাকতেন। সমরবাবু তো রোজই আমাদের বাড়ি আসতেন, তখন কি পড়ছেন ভুলে গিয়েছি—কিন্তু ওঁকে এসে প্রায়ই বলতেন—এ বইটা পড়তে হবে, বলুন তো, এর উপর minimum কী পড়লে চলবে! বোধহয় এম-এ পরীক্ষার সময়েই একটি লিষ্ট দিয়েছিলেন, বইগুলি প্রয়োজন এবং তার উপরে পড়ার বই—সব থেকে সংক্ষিপ্ত লিষ্ট চাই! অন্য ছাত্ররা ওঁর কাছে এসে বই-এর নাম চাইতেন যত বেশি হয় ততই ভালো—সমরবাবু কিন্তু ঠিক বিপরীত—যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই ভালো! সমরবাবু modern বই খুঁজতেন, আমার স্বামীরও সেইদিকে মন ছিলো, কাজেই মিলেছিলো ভালো! সমরবাবুর তো অসম্ভব স্মরণশক্তি ও মেধা, লেখারও অসাধারণ ক্ষমতা কিন্তু সব কিছুই সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা! সেইজন্য আমার স্বামী ওঁর নাম দিয়েছিলেন 'ফুক্‌ফুক্' সেন! এমন কি সিগারেট খেতেন, খেতে ভালোবাসতেন, কিন্তু এমনই স্বভাব করেছেন যে সেটাতেও ফাঁকি, কোনোরকমে শটকাটে ফুঁকে নেওয়া। আমার স্বামী এই স্বভাবের এবং অন্য অনেককিছুর জন্য ক্ষ্যাপাতেন, তাই সমরবাবু মাঝে মাঝে চটে যেতেন ওঁর উপর। যেমন, আমি একটা ঘটনা বলছি—আমার স্বামীরই দুষ্টুবুদ্ধি, আশাকরি কেউ কিছু মনে করবেন না, একেবারে ছেলেমানুষী! সমর বাবু মাঝে মাঝে কোথায় যেতেন, উনি জানতেন। একবার ওকে ক্ষ্যাপাবেন বলে (এ স্বভাবটি আমার স্বামীর বেশ ছিলো!) চঞ্চলবাবুকে নিয়ে উনি সমরবাবুকে শিয়ালদা ষ্টেশন পর্যন্ত 'ফলো' করে, টিকিট কেটে, ট্রেনে চেপে বসলেন! সমরবাবু ট্রেন ছাড়ার সময়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন—রসিকতা অনেক হয়েছে—এবার নামুন—ট্রেন ছাড়বে! উনি টিকিট দেখিয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আমরা যাবো! তখন সমরবাবু বিপদে পড়ে কী বলেছিলেন, কী করেছিলেন জানিনা, এঁরা দমদম্ ষ্টেশনে এসে ফিরতি ট্রেনে উঠে সমরবাবুকে রেহাই দিলেন।

আমি একটু এগিয়ে গিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ ক'জন কবিকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন, শান্তিনিকেতনে—এপ্রিলমাসে, বছরটা ১৯৩৭ না '৩৮ ঠিক স্মরণে নেই। আমার স্বামী, চঞ্চলবাবু, সমরবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, কামাক্ষীবাবু একসঙ্গে গিয়েছিলেন। বুদ্ধদেব বাবু স্ত্রী-কন্যা সহ গিয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় রায়ও গিয়েছিলেন অল্প কিছু দিন পরে এবং বেশীদিনও ছিলেন। এঁরা বোধহয় দু'তিন দিন ছিলেন। তখন নতুন Guest House হয়নি electricityও ছিলো না, রথীবাবু dynamo চালিয়ে আলো-পাখা দিতেন, কিন্তু রাত ১০টার পর বন্ধ করে দিতেন। শান্তি-নিকেতনে তখনই গরম পড়েছে—সেবারের বর্ণনা আমার স্বামীর কাছে যা শুনেছিলুম লিখছি। চঞ্চলবাবু আমার বিবরণ সঠিক কিনা বলতে পারবেন। চাঁদিনী রাত, ওঁর খাট দেওয়া হয়েছিলো খোলা ছাদে, আর চঞ্চলবাবু, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, সমরবাবু, কামাক্ষীবাবুদের খাট দেওয়া হয়েছিলো—ভিতরের বড় ঘরে। কিন্তু ওঁরা
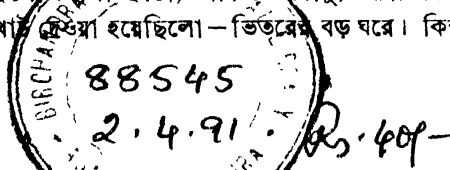
কেউ মশারি আনেননি, মশাও বেশ, গরম তো আছেই। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু এসে ওঁকে বললেন : ভাই, তোমার তো খোলা আকাশে চাঁদিনীরাতে শোয়া অভ্যাস নেই তুমি ভিতরে গিয়ে শোও, আমি বাইরে শুই! বলাই বাহুল্য, ঘুমোতে কেউই পারবেন না, ঠিকই, কিন্তু যা পেয়েছেন বদল করতে রাজি হননি। পরের দিন সকালে, রবীন্দ্রনাথ ওঁদের সঙ্গে কথা বলবেন—স্নান করে তৈরি হয়ে যাওয়া চাই। কামাক্ষীবাবু একটা "অগুরু"র শিশি এনেছিলেন—স্নানের জলে দিয়ে স্নান করবেন বলে। সেটা খুলতে গিয়ে শিশিটা ভেঙে গেলো—কাপড় চোপড় সব কিছুতে পড়ে গেলো, ঘরময় কড়া গন্ধ—কেউ আর কামাক্ষীবাবুর কাছে দাঁড়াচ্ছেন না! তারপরই রবীন্দ্রনাথ ডেকে পাঠালেন! সবাই তো কবির সামনে দাঁড়িয়ে, কার সঙ্গে প্রথমে কথা বলেছিলেন মনে নেই। ওঁর তখন 'চোরাবালি' বেরিয়েছে—প্রথমে রবীন্দ্রনাথ 'ঘোড়-সওয়ার' কবিতাটিকে পছন্দ করেছিলেন, তারপর সুধীনবাবুর মন্তব্য, "ঘোড়সওয়ার" রিরংসার কবিতা, জানাতে শান্তিনিকেতনে তখন 'চোরাবালি' নিয়ে খুব মতদ্বৈধ চলছিলো। আমার স্বামী বলেছিলেন—প্রশান্ত মহলানবিশ-কে দেখলুম 'চোরাবালি' হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—ওঁকে দেখেই বইটি পিছনে লুকিয়ে সংক্ষিপ্ত "ভালো?" জিজ্ঞাসা করে সরে গেলেন। ওঁর তাই কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল। ফলে, বোধহয় ওঁকে বেশি কিছু প্রশ্ন করা হয়নি—সহজেই ছাড়া পেয়ে গিয়েছিলেন। তারপর বোধহয় চঞ্চলবাবু—উনিও সহজে ছাড়া পেলেন। তারপর জ্যোতিরিন্দ্রবাবু। পদ্মা নদী, এক পাড়ে শিলাইদা, অন্য পাড়ে পাবনা—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর পৈতৃক বাড়ি। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর বাবার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুব ভালো সম্পর্ক ছিলো—জ্যোতিরিন্দ্রবাবুদের বড় হাউসবোটে করে রবীন্দ্রনাথ অনেক বেড়িয়েছেন—এইসব কথা মনে করে খুশি হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলছিলেন। রবীন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করেছিলেন—আছে? তোমাদের সেই বড় হাউসবোটটা। কতো বেড়িয়েছি ওটাতে। তাতে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু স্বভাবতই উত্তর দেন—আছে। বাবা খুব খুশি হবেন—আপনি আবার আসুন না। তাতে বুঝি, রবীন্দ্রনাথ জবাব দেন—আর কি পারি? এইতো, দেখোনা, চোখ গেছে, কান গেছে! জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ভুল করে বলে ফেলেছিলেন—আজ্ঞে, বয়স তো হোলো! এই কথা বলেই জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বুঝেছিলেন ভুল করেছেন, আমার স্বামীর দিকে মুখ ফিরিয়ে জিভ্ কাটলেন! রবীন্দ্রনাথ তখন কিন্তু চুপ হয়ে গেছেন। তারপর সমর সেনের পালা। সমরবাবুকে বললেন, আপনার বাবা আমাদের ছাত্র ছিলো! (অরুণবাবু শান্তিনিকেতনে পড়াশোনা করেছিলেন)। আমার স্বামী বলেছিলেন, মনে পড়ে, সমর ফর্সা লোক, রংটা লাল টক্‌টকে হয়ে উঠলো! পরে বেরিয়ে এসে ও জ্যোতিরিন্দ্রবাবুকে বলল—আপনি করলেন ভুল—আর আমি তার শাস্তিটা পেলুম! এরপর ওঁরা সবাই ফিরে এলেন। ওঁর তো কলেজ ছিলো, ফিরতে হতোই—আর এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়নি। এ গল্পটা আমরা অনেকবার শুনেছি।

১৯৩৭ এর মে মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা সদলবলে পুরীতে যাই—আমরা-মানে, আমার স্বামী, আমার দুই দেওর কেশব, মাধব, ওঁদের মামাতো ভাই কানু (চন্দ্রনাথ বোস)-এর বাড়িতে, একেবারে সমুদ্রধারেই গিয়েছিলুম, আমাদের বড় মেয়ে ইরাও ছিলো। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, রথীবাবু, চঞ্চলবাবু, সমরবাবু এঁরা ছিলেন Sea View Hotel-এ। আমার স্বামী তখন রিপন কলেজে কাজ করতেন। ওঁদের ইংরিজি ডিপার্টমেন্টেই কাজ করতেন ডাঃ নৃপেন চ্যাটার্জি—তিনিও গিয়েছিলেন, এই দলেই ছিলেন। আমাদের প্রফেসার, ও রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—প্রফেসার রবীন্দনারায়ণ ঘোষ তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে দিন কয়েক Inspection Bungalow-তে ছিলেন। আমরা সকলে সদলবলে সমুদ্রে স্নান করতে যেতুম, রবিবাবু আর আমার স্বামী আমাদের হুল্লোড় তদারক করতেন! এতো মজা হতো! আমার একটা portable gramophone ছিলো, আর অনেক রেকর্ড নিয়ে গিয়েছিলুম। সমুদ্রধারের বাড়িতে বসে রেকর্ড শুনলে, তারপর কলকাতায় শুনলে সমুদ্রের আওয়াজটা শোনা যায় না বলে প্রথম প্রথম মনে হয়—কী যেন একটা অভাব হচ্ছে! কান এমনই অভ্যস্ত হয়ে যায় সমুদ্রের আওয়াজে—এটা আমরা সবাই অনুভব করেছিলুম কলকাতায় ফিরে এসে! রবিবাবুকে ও ওঁর ছেলে 'বেস্ত'কে আমরা আমাদের বাড়িতে খেতে আসতে বলতুম। রবিবাবু মাঝে মাঝে আসতেন, 'বেস্ত' রোজই আসতো। সেবার রবিবাবু আমাদের সকলকে তিনটে ট্যাক্সি করে কোনারকে নিয়ে গিয়েছিলেন—আমরা ওখানে খিচুড়ী রান্না করেছিলুম 'চাট্‌নিটা বাড়ি থেকে করে নিয়ে গিয়েছিলুম, আর কিছু ভাজাভুজি। ডাঃ সুরেন দাশগুপ্ত Inspection Bungalow-এ সেই সময়ে ছিলেন, উনি আমরা যাবার আগেরদিন গরুর গাড়ি করে সমুদ্র-পাড় দিয়ে কোনারক গিয়েছিলেন ও ফিরেছিলেন; আমাদের বলেছিলেন অনেক হরিণ-দেখেছেন। আমরা কিন্তু হরিণ দেখতে পাইনি—সমরবাবুরা বাছুরকে হরিণ বলে রথীবাবুকে দিয়ে ছবি আঁকিয়েছিলেন। সন্ধ্যাবেলা ফিরলুম, রবিবাবু সারাদিন ট্যাক্সি তিনটে রেখেছিলেন। সেবার আমার স্বামী ঘড়ি পেছিয়ে রেখে জ্যোতিরিন্দ্রবাবুদের ফিরে যাওয়া একদিন পেছিয়ে দিতে পেরেছিলেন। কিন্তু একই খেলা তো দুবার হয় না, ফলে চঞ্চলবাবুরা ও সমরবাবুরা ঠিক সময়েই ট্রেন ধরতে পেরেছিলেন। পুরী থেকে ফেরার তখন একটি গাড়ি ছিলো—বিকেলে ছাড়তো।

১৯৩৮-৩৯ নাগাদ আমার স্বামী খুব মেতেছিলেন যামিনীদার ছবি নিয়ে। তখন নিজেও কিনতেন, এবং ওঁর বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলকে ছবি কিনতে বলতেন। সমরবাবু বলেছিলেন—আমি কিন্তু আপনার যামিনীবাবুর ছবি কিনবো না, যদিও যামিনীবাবু আমার ঠাকুরদাদার বন্ধু ছিলেন। কিছুদিন পরে, একদিন উনি সমরবাবুকে বললেন—সমর, আমাকে ২৫টা টাকা ধার দেবে? সমরবাবু অবাক হয়ে বললেন—আপনাকে ধার, কেন? উনি বললেন, ফিরিয়ে দেবো টাকা, চিন্তা

করো না। সমরবাবু টাকা দিতেই উনি যামিনীদার একটি সাঁওতাল ছেলে ঢোল বাজাচ্ছে—ছবিটা কিনে এনে সমরবাবুর ঘরে টাঙিয়ে দিলেন। তারপর খেলা সুরু। সমরবাবু ছবিটা উল্টো করে, বা খাটের তলায়, বা অন্য কোথাও লুকিয়ে ফেলতেন, আর ওঁর কাজ ছিলো, রোজ সেটা খুঁজে বার করা, আবার ঠিক জায়গায় সমরবাবুর দেয়ালে টাঙিয়ে দেওয়া। অনেকদিনই এ খেলাটি চলেছিলো—শেষে হার মেনে হাল ছেড়ে দিতে হয়, সমরবাবুকেই। এবং তারপরে কিন্তু সমরবাবু যামিনীদার বাড়িও যেতেন—এবং খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আমরা যখন বেলেতোড়ে, যামিনীদার গ্রামে দু'মাস ছিলুম, তখন উনি লিখেও ছিলেন সমরবাবুকে ওখানে যেতে। সমরবাবুর যাওয়া হয়নি, অবশ্য।

১৯৩৯-এর পুজোর ছুটিতে আমরা গিয়েছিলুম দেওঘরে—কারস্টেয়ার্স টাউনে আমার ঠাকুরদাদা একটা বাড়ি করেছিলেন আমার নামে—প্রণতি কুটির। একই কমপাউণ্ডে আমার ঠাকুরদাদার আরেকটা বাড়ি ছিলো। চঞ্চলবাবু, দেবীবাবু আমাদের বাড়িতে ছিলেন, আর আমার ভাই প্রস্থান, ওর এক বন্ধু আর আইয়ুব অন্য বাড়িটতে থাকতেন—আমাদের সঙ্গেই রান্না-খাওয়া। সেই সময়ে সমরবাবু সাঁওতাল পরগণার কাছাকাছি জায়গায় ছিলেন। আমরা সেজন্য ওঁকে বারবার আসতে লিখেছিলুম। কলকাতা থেকে বলেছিলেন যাবেন—শেষ পর্যন্ত যাননি। তারপর দিল্লি যান, নিয়মিত মজার চিঠি লেখেন। সুলেখাকে বিয়ে করে সমরবাবু সত্যি, অনেক steady হয়ে গেলেন। এখানে সুলেখাকে আনলেন—ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে—আমাদের মেয়েদের সঙ্গে, ইরা-তারা ছোটো হলেও—খুব ভাব হয়ে গেলো, ছাদে চোরচোর খেলতো। সুলেখার তখন খুব সুন্দর চুল ছিলো। একদিন বিকেলে চুল খুলে সুন্দর শাড়ী পরে আমাদের বাড়িতে এসেছে—খুব ভালো দেখাচ্ছিল। আমরা তাই বলেছি, আর উনি স্নেহভরে সুলেখার চুলের উপর হাত বুলিয়ে দিয়েছেন। অমনি সমরবাবুর 'হিংসা' হয়েছে (অন্তত আমার মনে হলো কী রকম করে যেন দেখলেন। আমি হেসে উঠেছিলুম) আর সমরবাবু জোরে জোরে বললেন—কিচ্ছু মনে করো না, সুলেখা—বিষ্ণুবাবু তোমার ঠাকুরদাদার বয়সী! সুলেখা ও আমরা সবাই খুব মজা পেয়েছিলুম—আসলে সমরবাবুরই বেশ হিংসা—বিদেশী সংজ্ঞায় 'jealousy' যাকে বলে—হচ্ছিল, উনি ওর মাথায় হাত দিয়েছেন বলে!

১৯৩২ নাগাদ বোধহয়, একটা মজার ঘটনা মনে পড়ছে। এঁরা কয়জন মিলে ঠিক করলেন একবার আমার স্বামীকে বিব্রত করবেন। সেজন্য ওঁরা এসে বসতেন, নীরবে, (বাক্যহীন ভাবে), আমাদের ঘরে। কিন্তু কে যে কাকে 'bore' করবে, বোঝা গেলো না, কারণ উনি তো ওঁর বিরাট গ্রামোফোনে একটার পর একটা রেকর্ড বাজিয়ে ওঁদেরই প্রায় nervous breakdown করে দিয়েছিলেন। তাই ওঁরা অন্য কৌশল বার করলেন! ওঁরা ঠিক করলেন ওঁকে 'বাবা' বলে ডাকবেন।

উনি বিনা বাক্যব্যয়ে সেটা সহ্য করে গেলেন। এর থেকে কঠিন একটা কিছু করতে হবে বলে একদিন খুব ভোরে দেবীবাবু আমাদের বাড়ির গেটের কাছে এসে 'বাবা! বাবা!' বলে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। তখন এতো ভোর যে আমরা কেউ তখনও ঘুম থেকে উঠিনি—শুধু মা (আমার শাশুড়ী) তাঁর পূজা-আর্চা সেরে নেমে আসছিলেন—উনিই গিয়ে গেটটা খুলে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হয়েছে, বাবা? কিছু বিপদ কি?' তারপর, এই ভাবে অপদস্ত করার কায়দাটাও ছেড়ে দিতে হলো।

আমি যখন "যাদবপুরে" কাজ করছি, কিছু সময়ের জন্য বীথি ওঁদের বড় মেয়ে আমার ছাত্রী ছিলো। তারপর ও চলে গেলো আমেরিকায়। ঠিক সালটা মনে নেই, কিন্তু তখন বোধহয় ভালো চালের অভাব হচ্ছিল কলকাতায়। আমার যুদ্ধের সময় থেকে অভ্যাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো, আমার স্বামীর জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ আর উনি যে চাল খেতেন সে চাল জমিয়ে রাখা! একদিন সমরবাবু তাঁর সুন্দর নাতনীকে নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি—মিসেস দে, আপনার কাছে ভালো চাল আছে? আমাদের নাতনী "সাদা ভাত" না হলে খায় না। অপরূপ দেখতে বাচ্চাটি! আমি ওকে আমাদের কাঁচের আলমারির ক'টা মূর্তি দেখিয়ে বললুম—"দেখো, এই মূর্তিগুলির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে"। ছোট্ট মেয়ে এতো খুশি হয়ে গেলো—pose দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল আলমারির পাশে! আমি সবাইকে বললুম—দেখুন—একে ঠিক মূর্তিগুলির মতো সুন্দর লাগছে না? সবাই সমস্বরে বললেন—হ্যাঁ ঠিক! তখন সে উঠে আমার সঙ্গে চাল আনতে গেলো। গিন্নির মতো আমার পাশে পা ঝুলিয়ে বসে বললো—আমি চাল বের করছি যখন—জানো, আমি সাদা ভাত খেতে ভালোবাসি—নোংরা ভাত আমার ভালো লাগে না। আমি চাল দেখিয়ে বললুম—এটাতে সাদা ভাত হবে কি, মনে হয় তোমার? চাল হাতে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে বললো—হ্যাঁ, ঠিক হবে। তারপর নিজে হাতে চালের থলি নিয়ে সমরবাবুর কাছে এসে বললো—আমি সাদা চাল পেয়েছি—তুমি ঠিক করে রাখো তো—হারিও না। তুমি তো যাঃ! জানিনা, কেন ও সমরবাবুকে এ রকম বললো—নিশ্চয় সমরবাবু খুব ক্ষ্যাপাতেন ওকে—কিছু রাখতে দিলেই হারাতেন (?) বা ভুলে যেতেন! এই বারও তাই করলেন। ও আমার সঙ্গে একটু অন্য ঘরে গেছে, ফিরে এসেই কিন্তু চালের থলির খোঁজ করেছে। সমরবাবুও ইতিমধ্যে ওটাতো "হারিয়ে" ফেলেছেন! তারপর নাতনীর কি বকুনি—"বলেছিলুম ঠিক করে রাখো—এখন হারালে তো! আমি কোথায় পাই আবার সাদা চাল!' আমরা সকলে মজা দেখে হাসছি। সমরবাবুকে চেয়ার থেকে তুলিয়ে—খোঁজো খোঁজো করে ব্যতিব্যস্ত করে সে চালের থলিটি বার করালো! সমরবাবু, দেখলুম, নাতনীর সঙ্গে কি মজার খেলাই না খেললেন! কিন্তু নাতনী ওঁকে জব্দ করে রেখেছিলো বেশ!

এই বছর খানেক আগে—অশোকবাবু ও আভা আমাদের সকলকে ডেকেছিলেন ওদের বাড়িতে—চঞ্চলবাবু-অমিতা, সমরবাবু-সুলেখা, আর আমাকে—তখন উনি নেই। আমি যখন রিখিয়া থেকে ফিরি ১৯৭৭ সালে, তখন সমরবাবু এসেছিলেন, ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, এবং ওঁকে বলেন ওঁর ছেলেবেলার জীবনবৃত্তান্ত লিখতে—আনন্দবাজারে—রবিবারে, রবিবারে। "বেশ লাগে", উনি বলেছিলেন, আমার মনে পড়ে। আর "ওঁরা ভালো payment করেন"—সমরবাবু হেসে বলেছিলেন ওঁকে। আমি "বাবু বৃত্তান্ত" জোগাড় করেছিলাম আমাদের ছোট জামাতা সঞ্জিতের কাছ থেকে। সেটাতে পড়লুম—সমরবাবু এক জায়গায় লিখেছেন—একদিন আমাদের ঘরে ভীষণ ভীড় ছিলো, সমরবাবু ওঁর একটা কবিতার বই এনেছেন আমার স্বামীকে দিতে। আমার স্বামী বইটি দেখেছেন। আমি নাকি চেয়েছিলুম—দেখবো বলে—তাতে আমার স্বামী নাকি পা দিয়ে বইটি তুলে আমার হাতে দিয়েছেন। সমরবাবু লিখেছেন—পায়ের কাজ দেখাবার জন্য বিষ্ণুবাবু এই রকম করেছেন—আর আমাকে সাক্ষী মেনেছেন। আমার কিন্তু খুব দুঃখ হয়েছিলো এটা পড়ে। কারণ আমি জানি—সমরবাবুকে উনি শ্রদ্ধা করতেন, স্নেহও করতেন—সমরবাবুর বইতো ওঁর কাছে মূল্যবান বস্তু, তুচ্ছ করবার জিনিষ নয়। তাছাড়া, এ রকম কোন ঘটনার কথা আমার মনেও পড়ে না। সে যাই হোক, সমরবাবু আমাদের বন্ধু ছিলেন, সারাজীবন—কি সুখে কি দুঃখে। আমার স্বামী যেদিন চলে গেলেন—৩রা ডিসেম্বর সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে, সেদিন প্রথম যাকে আমি দেখেছিলুম আমাদের ঘরে ঢুকতে, তিনি হলেন—সমর সেন। আমার মনে আছে, আমি শুনেছিলুম সমরবাবু খুব অসুস্থ—তাই নিজের কথা ভুলে আমি সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—"আপনি ভালো আছেন?"

মহাশ্বেতা দেবী

সমর সেন

সমর সেনের বিষয়ে কিছু লেখাই বড় কঠিন। বরঞ্চ প্রথমেই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই ডাক্তার কমল জালানকে, যিনি বারবার ওই দুর্মূল্য প্রাণকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন, শেষবারও তিনিই। আমি বুঝতে পারি সমরবাবুর মৃত্যু তাঁকে কতটা রিক্ত করে রেখে গেছে। আমরা যখন বলতাম "একমাত্র সমর সেন" এবং আসলে সমরবাবুর ফ্রন্টিয়ারের জন্য কিছু করতাম না, তখন ওই চিকিৎসক মানুষটি সমর সেনকে বাঁচাবার জন্য কত না চেষ্টা করেছেন, আগে আগে তো মেরামত করে ফিরিয়েও দিয়েছেন তাঁকে। ডাক্তার জালানকে চোখে দেখিনি কোনোদিন। আজ এই সুযোগে তাঁকে জানালাম অজস্র কৃতজ্ঞতা। তিনি কি "অনুষ্টুপ" পড়বেন?

"অনুষ্টুপ" কি যাবে লণ্ডনে রঞ্জনা অ্যাশ ও বিল অ্যাশের কাছে? ওঁদের কাছে সমরবাবু ও ফ্রন্টিয়ারের কথা শুনেছি যত, বলেছি তার বেশি। বিল অ্যাশ সত্তর পেরিয়েও তরুণ। তিনি আমাকে লণ্ডনে কিছু মিউজিয়াম দেখিয়েছিলেন। আর টেমসের ধারে হাঁটতে হাঁটতে আমিই সমরবাবুর কথা বলেছি বেশি। ওঁদের মতো মানুষই হোন, বা বিদেশে দেখা ভীষণ জীবন্ত ও জিজ্ঞাসু ভারতীয়, অভারতীয় ছাত্রছাত্রী গবেষক হোন, বলার বিষয় তো সমরবাবু ও ফ্রন্টিয়ার। শেষ অবধি। সমরবাবু ও ফ্রন্টিয়ার, আমাদের না হোক, আমার কাছে বাইরের পৃথিবীকে, ভারতের অন্যত্র, বলার মতো ব্যাপার তো এই, "আমাকে দেখছ, আমরা কিন্তু সব নই, আসলে জানো, সমর সেন ফ্রন্টিয়ার সম্পাদনা করেন"। এ সব কথাও বলব যাদের, তেমন মানুষও সংখ্যায় কম। আসলে এ ব্যাপারটা বোঝানো যাবে না, শব্দের প্রকাশ ক্ষমতা এমন সময়ে খুবই সীমিত; আর জোর করেই লিখছি যখন আমিও খুব অসুস্থ, দীর্ঘকাল বাদে শয্যাশায়ী; হঠাৎ, মাস দুই ঝোড়ো সফরের পর,—বলতে চাইছি, শহরে সমর সেন আছেন, ফ্রন্টিয়ার বের হয়, এতেই যেন নিজেদের অনেক প্রতিশ্রুতি-না-রাখার পাপস্খালন হতো। এখনো হয়। ফ্রন্টিয়ার তো বেরোচ্ছে। আসলে একটা কথা আমরা কেউ বুঝতে পারছি না। কলকাতা কলকাতাই থাকবে, তার কারণ এ শহর থেকে আজও ফ্রন্টিয়ার বেরোয়। মেইন-স্ট্রীমের বাইরে, মানুষের বিপ্লব ও প্রতিবাদ নিয়ে বিমূর্ত কচকচি—পণ্য ও বাণিজ্য করা—প্রচণ্ড শক্তিতে বিরোধিতা করা। এগুলো চলবে। কিন্তু ফ্রন্টিয়ার এ সবের বাইরে তার স্বল্প সামর্থ্য ও দীন চেহারা নিয়ে প্রতি সপ্তাহে পৌঁছে যাবে, যাচ্ছে। ভারতের আর কোনো শহরে এটা সম্ভব নয়। যে সব জায়গায় আন্দোলন হয়, সেখানেও নয়। কাগজের চেহারা ও চরিত্র সম্পাদকেরই মতো। ক্ষীণকায়, ক্ষীণবল নয়, বিশ্বাসে অদীন অটল। সমরবাবু এ সব কথা লিখেছি দেখলে হাসতেন

এবং তারপর সুলেখা, সমরবাবু ও আমি অন্যরকম আলাপচারিতা করতাম। কি অসম্ভব হাসতেন। "অনেকদিন আসেন নি এবং কোনো লেখা পাঠান নি। দেখা হলে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সুস্থ মনে হয়। আপনার শরীর কেমন? নিকষিত ভালোবাসা নেবেন। —সমর সেন। ১৪।২।৮৬।" হ্যাঁ, ওটা পারতাম। আমরা তিনজনই অসম্ভব হাসতাম। যেখানে আমি নিজের মতো, সেখানে আমার ভাষা ভদ্দরলোকের মতো নয়। সমরবাবু হাসতেন কেন? মনে হয়, সব সময়ে ভদ্র, মার্জিত, পরিশীলিত কথা ওঁকে ক্লান্ত করতো হয়তো বা নিজেও দিব্যি মুখ ও মন খুলে কথা বলতে পারতেন।

সমরবাবু ও সুলেখার সঙ্গে এমন সমানে সমানে বন্ধুত্বের ব্যাপারটা কিন্তু ১৯৭৬ সাল থেকে শুরু। আর বাড়াবাড়িটা হয় দ্রুত লয়ে। তার আগে সমর বাবুর ভাই গাবু সেন, রাধামোহন ভট্টাচার্য, সম্ভবত দেবী বাবু ও কামাক্ষী বাবুও, এঁদের একটা আড্ডা ছিল আমার মেজমামা দেবু চৌধুরীর ২১৭, ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি চল্লিশের সেই সময়ে, যখন ১৯৪৬ দাঙ্গার আগে আমি কিছুদিন এম. এ. পড়ার জন্যে ওখানে থেকেছি। ওঁদের দেখছি তার আগে থেকেই, কেননা ১৯৪২ থেকে আমরাও থাকতাম খুব কাছে। কত রকম আড্ডা দেখেছি ভাবলে অবাক লাগে। মায়ের মামাত ভাই অজিত চক্রবর্তীর রাসবিহারী অ্যাভেনিউর বাড়িতে (ইনি কবি অমিয় চক্রবর্তীর অনুজ) প্রত্যহ আসতেন প্রমথ চৌধুরী, "ব্রাউনিং পঞ্চাশিকা" অনুবাদক সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, মাঝেমাঝে সুরেন দাশগুপ্ত, সামান্ত গান্ধীর ছেলে গণি। ইনি ছিলেন আঁকিয়ে। VAT 69-এর বোতলের ছবির ওপর অজিত মামার বয়স্ক প্যান্ সদৃশ মুখ এঁকে বাবাকে উপহার দেন। মনীশ ঘটক ও অজিত চক্রবর্তী সব বিষয়েই ছিলেন গভীর অন্তরঙ্গ, বিশেষ পানাভ্যাসে। বাবার পিছন পিছন আমিও যেতাম, হাঁ করে কথা শুনতে। তা, মেজমামার বাড়ির আড্ডায় শব্দ—ধাঁধা খেলা হতো। রাধামোহন বাবু সবদা জিততেন। সেখানে সমর বাবুকে দেখিনি।

পঞ্চাশের দশকে সমরবাবুর ভাই অমলবাবুর ছেলেকে পড়াতে যাই। তা অমলবাবুর স্ত্রী বলছেন, টবে ক্যাকটাস তৈরি করছি সুলেখাকে দেব। শুনে নিজেকে অন্য গ্রহের মানুষ মনে হল। পঞ্চাশের দশকে কম্যুনিস্ট পরিবারগুলিতে কি বিপর্যয়, সকলে আমরা ভীষণ গরিব, দশ টাকার নোট এক দুর্লভ প্রাপ্তি। ক্যাকটাস তৈরি যার শখে, সেই না-দেখা সুলেখা সম্পর্কে মনে খুব সমীহ হল। আমি তখন পদ্মপুকুরে থাকি। চিত্ত বিশ্বাস ও সুলেখা বিশ্বাস (সান্যাল) ও বাড়ি ছাড়লেন, আমরা ঢুকে গেলাম। যাঁদের বাড়ি তাঁরা জাত ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁদের এক ভাই বর্ধমানে ইংরেজির অধ্যাপক সুরেশ সরকারের সৌজন্যে বাড়িটি পাই। আমাদের বাড়িতে ছোট্ট নবারুণের জন্যে একটা কাচের ব্যাটারি কেসে কয়েকটা রঙিন মাছ ছিল। ক্যাকটাস ছিল না।

সুলেখা ও সমর বাবুকে কাছ থেকে দেখি ষাটের দশকের শেষে ও সত্তরের

দশকের গোড়ায় মাঝে মাঝে ভানু ঠাকুর ও সন্ধ্যা ঠাকুরের বাড়ির সান্ধ্য আড্ডায়। সমরবাবুরা বরাবরই পুরনো বন্ধু বান্ধবদের বৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। একেকজন একেক রুচির মানুষ। ভানুদার বাড়ির আড্ডা ছিল জমজমাট। সেখানেই শুনেছিলাম দীপ সেনের (আই. এ. এস.। "রামকৃষ্ণ কথামৃত" রচয়িতা মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের নাতি) গলায় আশ্চর্য দক্ষ সুরেলা প্রাচীন বাংলা গান। ভানুদার হালিশহরে গঙ্গার ধারে লঞ্চ বানাবার কারখানা ও আবাসনে, বা ভানুদার শ্যালক পরিতোষ (লালু) গাঙ্গুলীর বারাসত-নবগ্রামে "খেয়ালী" বাড়িতে একবার করে গেছি, তখন ওঁদের দোশান। ফ্রন্টিয়ার কিনি ও পড়ি প্রথম থেকেই, সমর সেনের কবিতার সম্পর্কেও অপরিচিত নই, আর বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু-দের কাছে ওঁর নামও শুনেছি। সমর বাবু আর কবিতা লেখেন না বলে বুদ্ধদেব বসু দুঃখ করতেন। এ সব বিভিন্ন সময়ের কথা।

সমর সেন ও সুলেখার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব নতুন করে ১৯৭৬ থেকে। আমার স্বভাব যা, জীবন যেমন বদলেছে, পরিচিত মানুষদের বৃত্তও ত্যাগ করে এসেছি। ভানুদার বাড়িও যাই না, আর লালুদা ১৯৭১-এই বোধহয়, নিহত হন, একথা সবাই জানেন।

কবি সমর সেন বনাম ফ্রন্টিয়ারের সমর সেন, এই পরিচয় নয় ওইটে, এটা কিঞ্চিৎ দুঃখে দেখে যাচ্ছি। এটা প্রত্যাশিত যে শুধু কবি সমর সেনকেই প্রজেক্ট করবেন কিছু মানুষ, যাঁরা ফ্রন্টিয়ার ও সমর সেন ব্যাপারটিকে "না" করতে চান। প্রত্যা-শিত। ফ্রন্টিয়ার ও সমর সেন যে সমরবাবুর স্বনির্বাচিত শেষ ও চূড়ান্ত ভূমিকা, এটা স্বীকার করলে ফ্রন্টিয়ার যে সব ব্যাপারের প্রতিনিধিত্ব করতে চেষ্টা করে, সেই প্রতিবাদী আন্দোলন, প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির কপটতা উন্মোচন, এ-গুলোকেও স্বীকার করতে হয়। তা তাঁরা করতে পারেন না। কেন না কেন্দ্রীয় সরকারকে ন্যায্যত সমালোচনা করা নিরাপদ, কিন্তু এ রাজ্যে বাম রাজনীতির শাসন যে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তার কর্মপন্থা কাগজী ঘোষণায় যতটা সার্থক, বাস্তবে জমিতে ও মানবমানচিত্রে তার প্রতিফলন যে তুলনায় ব্যর্থ, তা তো তাঁরা বলতে পারেন না। কেউ বিশ্বাস থেকে, কেউ বাঁচবার জন্য, কেউ নিছক স্বার্থের জন্য রাজবাড়িতে দাঁতের মাজন বেচছেন। এটা তাঁদের করে চলতে হবে, প্রত্যাশিত। কেন না এ পথটা নিরাপদতরো। নিরাপত্তা কে না চায়। কিন্তু এ কথাটা তাঁরা বোঝেন না, রাজ্য সরকারের কাছে প্রত্যাশা বিপুল বলেই প্রত্যাশা কানায় কানায় পূর্ণ না হলে প্রত্যাশী সমালোচনা করে। এটা সরকার বিরোধিতা নয়। এটাও তো সত্যি যে এ রাজ্যেই বামস্থ বাম বুদ্ধিজীবী হয়েও বাঁচা যায়। এঁরা কেন কবি সমর সেনকেই চূড়ান্ত বলতে চাইছেন তা নিয়ে ক্ষোভ-ক্রোধ-সমালোচনা দেখছি। যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা কী প্রত্যাশা করেছিলেন, এবং কিসে প্রত্যাশা ব্যর্থ হল? এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, এক সময়ে বোধহয় লিখেও থাকব, সত্তরের

আন্দোলন নিয়ে কিছু প্রতিষ্ঠানিক লেখক সমর্থনে কেন লেখেন নি, নিয়ে বহু গাল-মন্দ। প্রথমত, যাঁদের সমালোচনা করা হয়েছিল, তাঁদের সাহিত্যচিন্তায় ও প্রকাশে কোথাও কি এ-প্রতিশ্রুতি ছিল, যে তাঁরা ওই আন্দোলনকে সমর্থন করে লিখবেন? আমার জিজ্ঞাস্য ছিল, আজও জিজ্ঞাসা আছে, (কেননা, কি-লিখি-নি তা নিয়ে বহু কথাই শুনি) হে লেখক, কবি, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার, ক-খ-গ লেখেন নি, বুঝলাম। কিন্তু তুমি কি লিখেছ? তুমি কি বত্রিশ বছর ধরে লিখে চলেছ সাধ্যমতো?

কবি সমর সেন, ফ্রন্টিয়ারের সমর সেন। সমর বাবু থাকলে ব্যাপারটা সহজেই বুঝতেন এবং এমনই যে হবে সে বাস্তবতা স্বীকার করেই ফ্রন্টিয়ার চালাতেন।

আরেকটি সত্যও স্বীকার করতে হবে। সমর সেনের অনুরক্ত বেশ কিছু জেলার কাগজ সমর সেন সংখ্যা প্রকাশ করেছেন, করছেন। তাঁদের শ্রদ্ধায় কোনো খাদ নেই। কিন্তু তাঁরা অনীক বা অনুষ্টুপের সম্পাদকমণ্ডলীর মতো well equipped নন। তাঁরা মূলত বাংলাই পড়েন ও বোঝেন। এঁদের বেলায় সমর সেনের কবিতা ও "বাবু বৃত্তান্ত" ব্যতীত গত্যন্তর কি? ফ্রন্টিয়ার সবাই পড়েন না, কাগজটির ভাষা ইংরেজি। সমর বাবু দীর্ঘকাল, "বাবু বৃত্তান্ত" ব্যতীত বাংলা লেখেন নি। "সমর সেন ও ফ্রন্টিয়ার" ব্যাপারট এঁদের কাছে শ্রদ্ধার, কিন্তু বাংলায় তার লেখা পাচ্ছেন না। অতএব কবি সমর সেন।

কত গণ্ডগোলই না সমরবাবু পাকিয়ে গেছেন।

নাও বা ফ্রন্টিয়ারের সব সম্পাদকীয়ও তাঁর লেখা নয়, নয় সব লেখা স্বাক্ষরিত। যে সব খুঁজে বেছে বঙ্গানুবাদে বই না বেরনো অবধি মূলত বাংলা পাঠক-সম্পাদক-দের অপেক্ষাই করতে হবে।

সমরবাবুর জীবনটাও তো এমন সব অ্যাবসার্ড বাস্তবতা দিয়ে ঘেরা ছিল। আগেই বলেছি, তাঁর বাড়িতে আসতেন পুরনো বন্ধু বান্ধব। সমরবাবু এই সব বন্ধুত্বকে খুব মূল্য দিতেন। এঁরা অনেকে হয়তো পুরনো বন্ধুর কাছেই আসতেন; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমরবাবুর নিজস্ব জীবনের বহু বিপর্যয় ও সেই সঙ্গে ফ্রন্টিয়ার চালানোর দুর্মর চেষ্টা, মানুষটাকে ক্রমেই সাধারণ মাপের চেয়ে অনেক বড়ো করে তুলছিল, সেই আকাশ ছোঁয়া মানুষের কাছেও তাঁরা আসতেন। ফ্রন্টিয়ার নিয়ে পড়ে আছেন সে জন্য অশেষ শ্রদ্ধা তাঁদের, অথচ ফ্রন্টিয়ার বলতে যা বোঝায় তার প্রকাশ্য সমর্থন বা কাগজটিকে মদতদান সকলের পক্ষে অসম্ভব। মজা হচ্ছে, সমরবাবু ব্যাপারটা বুঝতেন, এঁদের নিয়েই কেটেছে তাঁর শত শত সন্ধ্যা। তাঁর চেয়ারে তিনি, মুখে স্মিত হাসি, মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা, অন্যেরা কত রকম বর্ণাঢ্য মানুষ। কত রকম কথা। কিন্তু কি বিশ্বস্ত বন্ধু উনি তাঁদের, তা তো দেখেছি। তাঁরাও সমর সেনের অত্যন্ত আপনজন। সমর সেনের সঙ্গে সুখেদুঃখে অন্তরঙ্গ।

ভীষণ, ভীষণ অসুস্থ অবস্থায় নিজেকে কি অসহায় লাগে। খুব ভালো সময়ে তাঁর কথা লিখছি। ঠিক এই রকম অসহায়, অদ্ভুত অবস্থায় তিনি তো বারবার

পড়েছেন। বড় মেয়ে বীথির মৃত্যুর পর তিনি হাসপাতালে, গেলাম। চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না, একটাই প্রশ্ন ছিল, ওঁর চোখে কেন ?

কেন এমনই সব অভিজ্ঞতা হবে তাঁর, সুলেখার। কেন সুলেখাকে সর্বাবস্থায় স্থির থাকতে হবে। কেন জীবন, এই বর্বর জীবন ওঁদের তিলেক রেয়াত করবে না, কিমা বানিয়ে ছাড়বে ? সমরবাবুর বাড়িতেই কেন জল ঢুকে ডোবায় বার বার। এ প্রসঙ্গে পূর্ণিমার কথাও বলি। রানীর মতো সুন্দরী, কৃষ্ণা দ্রৌপদী যেন, সুলেখা ও সমরবাবুর আপনের চেয়েও আপনজন, সমরবাবুর নাতনি। কমল জালান যদি চিকিৎসা করে থাকেন, পূর্ণিমা করেছে সেবা। আমি কে, লেখবার ! কমল জালানের চোখে সমরবাবু, পূর্ণিমার চোখে তার "দাদু" এ সব কেউ জেনে নিয়ে লিখবেন ? সুলেখাকে দেখে নিশ্চিন্ত হলাম, বিয়ের পরেও পূর্ণিমা স্বামী নিয়ে ও বাড়িতেই থাকছে। থাকুক। ওর মতো ওঁদেরকে কম জনই জানে।

বীথির মৃত্যুর পর ওঁর চোখে প্রশ্ন ছিল "কেন ?" এই "কেন"-র সম্মুখীন বার-বার হতে হয়েছে তাঁকে ও সুলেখাকে। একান্ত ব্যক্তিজীবনে তাঁদের যে-সব অভিজ্ঞতার মধ্যে পড়তে হয়েছে, সে সম্বন্ধে উল্লেখ অসৌজন্য। একান্ত আপনজনেরা ছাড়া আর কারো সঙ্গে সমর ও সুলেখা সে দায়িত্ব ভাগ করে নেন নি। আর সব সময়েই বাইরে সমরবাবুরা স্মিত, সহিষ্ণু, সৌজন্যশীল। কিন্তু দু রকম থেকে চলা, ফ্রন্টিয়ার চালানো, এর চাপে তো মানুষ ভিতরে ভিতরে ভাগ হয়ে যায় বাঁচবার জন্যই। বেদনা, ব্যক্তিদায়িত্ব, প্রাত্যহিকতার সংগ্রাম রাখতে হয় অন্তরতম কক্ষে। সেখানে ওঁরা দুজনে। সুলেখার কথা সমরবাবু প্রসঙ্গে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সর্বাবস্থায় অটল, সহিষ্ণু, কর্তব্যে অবিচল, সমর সেনের স্ত্রী হওয়া খুব সহজ নয়। এই সুকঠিন কাজটা সুলেখা করে চলত বলেই সমর সেনকে আমরা পেতাম। জীবনের দুর্বোধ্য প্রহেলিকাও সমর সেনকে শরীরে দীর্ণ করেনি কম। সুলেখার চোখের অসুখ। সমরবাবুকে যেমন উদ্বিগ্ন ও কাতর দেখলাম, তেমন আগে দেখি নি। আমাকে এগিয়ে দিতে এসে বলছেন নিচু গলায়, বোধহয় গ্লকোমা, ও কিন্তু জানে না।—আর কিছু বললেন না। গভীর, গভীর সান্ত্বনা যে সমরবাবুর আশঙ্কা সম্পূর্ণ সত্য হয়নি। আর একথা খুবই সত্য যে সমর সেনের জীবনকালে, ওঁদের যখন থেকে দেখেছি, আমার মনে হয়েছে সুলেখাই ওঁর চলার শক্তি জোগাত। জীবনটি তো সহজ ছিল না ওঁদের। শখ করে নিজের খরচে যে কোনো লোক ভ্রমণে যায়। সমর সেন পারতেন না। প্রয়োজনের সংজ্ঞা বেড়েছে। মানুষ কত সহজে সে সব কেনে। ওঁদের সে ধারণা ছিল কি না জানিনা, সামর্থ্য ছিল না। "একমাত্র সমর সেন" বলে যারা বলেছি, সেই আমাদের অনেকেরই সামর্থ্য একমাত্র নামটির চেয়ে বেশি ছিল। মৃত্যুর পর মনে হচ্ছে না একথা, আগেও মনে হয়েছে। ফ্রন্টিয়ারে লেখা দিয়ে হোক, ফ্রন্টিয়ারকে সাহায্য করে হোক, তার সদস্য বাড়িয়ে হোক। তাঁর জীবিতকালে যদি এগোনো যেত, উনি ভালবাসার সহায়তা প্রত্যাখ্যান

করতেন না। এই যে অদ্ভুতত্ব, ফ্রন্টিয়ার বহুজনের কাছে প্রয়োজনীয় কিন্তু ফ্রন্টিয়ারের দায়িত্ব শুধু সমরবাবু ও তাঁর সহকারীদের, অন্যদের নয়,—এটাতেও উনি কম অবাক হন নি। বহু অভিজ্ঞতা ওই একতম মানুষটিকে ক্রমে জীবনে আগ্রহী করেছে। তার মধ্যে ফ্রন্টিয়ার বিষয়ে আমাদের ভূমিকা এক প্রধান অপরাধী। দেখুন, আমি আমাকে বাদ দিয়ে অন্যদের সমালোচনা করছি না, যা আজকাল হরদম দেখি। সমর সেন প্রসঙ্গেও একই কথা আমার, কারা কি করছেন বা করছেন না সেজন্য অন্যদের সমালোচনা করুন। সেই সঙ্গে ফ্রন্টিয়ারের জন্য নিজেরা কি করতে পারি বা করছি, সেটা বিচার করুন ও কাজ করুন।

তাঁকে বেষ্টিত নানা জন, ফ্রন্টিয়ারের জন্য তাঁরা বিজ্ঞাপন জোগাড় করেন না কেন এ প্রশ্ন অনেক করেছি। স্মিত হাসি, কখনো উত্তর পেতাম কারা কি সাহায্য করেন। আবার এটাও স্পষ্টই নাম করে বলতেন, কিছু লোকের কাছ থেকে সাহায্য তিনি নেবেন না কখনো। ওঁর মনে ফ্রন্টিয়ার এমনই ছিল, "দেখুন, সকলকে বলা যায় না, বলবও না" কতদিনের কত কথা। কত রকম মানুষের প্রতি অকপট স্নেহ। এম. জে. আকবরকে ওঁরা দুজনেই দীর্ঘদিন ধরে ভালবেসেছেন। আকবর ও তাঁর স্ত্রী ওঁদের কত ভালবাসতেন সে কথা শুনেছি কতবার। এ পরিস্থিতে অনেকেই পড়েন।

আমি তো ঢুকে গিয়েছিলাম ওঁর ঘরে স্বভাবজ সহজ ভাবে। স্নেহ পেয়েছি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের, "ভগিনী" বলে চিঠি লিখতেন। হেমাঙ্গ বিশ্বাস এ বাড়িতে এক লোডশেডিংয়ের গ্রীষ্ম সন্ধ্যায়, আমি যখন এক বিশাল ল্যাম্প জেলে "চোট্টি মুণ্ডা" লিখছি, হঠাৎ এসে শঙ্খচিলের গান শুনিয়েছিলেন আর কয়েকটি যোগাসন দেখিয়েছিলেন। তবে অধিক বন্ধুত্বটা সমরবাবুদের সঙ্গেই হয়। বাড়ি কাছাকাছি, যখন তখন যাওয়া যায়। আর ও ঘরে ঢুকলে সময় তো হিসেব হারাত। জীবনে প্রথম বিদেশ গেলাম প্যারিস। ফিরে এসে গল্প হচ্ছে।—"জানেন, অনেক আগে লণ্ডন থেকে প্যারিস গিয়েছিলাম চার দিনের জন্যে। কিন্তু আপনি একবার অবশ্যই লেনিনগ্রাদ দেখবেন।" "নোব্‌লেস্ট সিটি" শব্দটা বারবার বললেন। লেনিনগ্রাদে সমরবাবু মিউজিয়াম দেখতেন দিনের পর দিন। "আর ওখানেই তো সেই মহান যুদ্ধ হয়।" সমববাবুর জন্যে লেনিনগ্রাদ দেখতে ইচ্ছে করে, নোবলেস্ট সিটি।

যূথীর কাছে দিল্লিতে (বম্বেতেও কি?) যতবার গেছেন দুজনে, বেশ তাজা হয়ে ফিরে আসতেন। সিংভূমে রোড়োতে সুলেখার দিদি ও ভগ্নীপতির কাছে গিয়ে খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। রোড়ো অ্যাসবেস্‌টস খনি শ্রমিকদের অ্যাস-বেস্‌টোসিস নিয়ে আমি এক লেখা লিখি, উনি পড়েছিলেন। সব সময়ে বলতেন, সব শারদীয়া পাই না, দামও খুব। কিন্তু আমার বিরল সৌভাগ্য যে উনি আমার লেখাও পড়তে ভালবাসতেন। শারদীয়াতে কোথায় কি লিখছি, বিষয়বস্তু, সব বলতাম আর শারদীয়াগুলি ওঁদের পৌঁছে দিয়ে পড়িয়ে নিতাম।

বর্তিকার ব্যাপারে ওঁর পরমোৎসাহ ছিল। বারবার বলতেন, আপনার কি সুবিধে জানেন। আপনি লিখতে পারেন। আমি পারিনা।

—কেন লেখেন না?

—ভাল লাগে না, জানেন?

লিখতেই ভাল লাগত না। ভাল লাগা হারিয়ে যাচ্ছিল। নকশাল রাজনীতির মধ্যে এত দল ভাগ তাঁকে উদ্বিগ্ন করত। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসাতে তিনি প্রথমে উৎসাহিতই হয়েছিলেন। পরে যখন বোঝেন যে ঘোষণা ও কর্মপন্থায় সাযুজ্য থাকছে না, সেটাও তাঁকে পীড়িত করে। সমর সেন ইতিবাচক ব্যাপার দেখতে চাইতেন। সে জন্যই ছিল তাঁর অপেক্ষা, কিন্তু তিনি শারীরিক অবস্থানে যেখানে ছিলেন, হয়তো নেতিবাচক ব্যাপারটাই তাঁর গোচরে পৌঁছত। প্রচণ্ড বিশ্বাসে যেন একটা গাছ মাটি আঁকড়ে ধরেছিল, আর চারপাশে বহু স্রোতের আঘাতে মাটি থেকে তার শিকড় ছেড়ে যাচ্ছিল ক্রমে ক্রমে। অথচ একই সঙ্গে বিশ্বাসের মাটিতে সমর সেন বদ্ধমূলই ছিলেন। এ রকমই ভাবি। আবার এও ভাবি, সবই যদি ঠিক ছিল, তবে কেন নির্বেদ তাঁকে আচ্ছন্ন করছিল। এ নির্বেদ. কিন্তু তাঁব সেই শ্লেষহীন ব্যঙ্গ সহ কৌতুক তো ছিল।

টেলিগ্রাফ কাগজে রবিবারের পত্রিকার মলাটে তাঁর ছবি, যখন "বাবু বৃত্তান্ত" ইংরিজি অনুবাদে বেরোচ্ছে।

—জানেন, ট্র্যামে যেতে যেতে পাশের এক অবাঙালী ভদ্রলোক বারবার তাকাচ্ছেন। ভাবছি, কালকের টেলিগ্রাফ ম্যাগাজিন দেখেই কি চিনেছেন? ভদ্রলোক নিজেই আলাপ্ করলেন, চেনা চেনা লাগছে, আপনি তো আমাদের পাড়াতেই থাকেন, আসতে যেতে দেখেছি।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্রের সম্পাদনায় ওঁর প্রতি শ্রদ্ধায় বই বেরোনোর পরে গেছি। এরকম বই বেরোনো তো খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু কেন যেন সে কথা বলা গেল না। নানা কারণে ওঁর চারদিকে যে শূন্যতা জমে উঠছিল,—দিনের চিন্তা+ফ্রন্টিয়ারের চিন্তা+অসুস্থতার অবসাদ+চারপাশের কাণ্ডবাণ্ড, এ সবের চাপ সেদিন যেন খুব বেশি ছিল, হঠাৎ ওঁকে খুব একথা মনে হচ্ছিল। ওঁর যদি নিজেকে একাকী মনে হয়ে থাকে, প্রতিকূল পরিবেশ যদি ওঁকে ক্লান্ত করে থাকে, সে অপরাধ আমাদেরও। আরেকটু এগোলে হয়তো উনি খুশি হতেন।

যে কয়বার লিখেছি, আমি তো সরাসরি মাটির খবরই লিখতাম, কেন ওঁর ভালো লাগত,—বর্তিকা কেন ওঁর ভালো লাগত,—এ সব নিয়ে কত কথা বলেছেন। বর্তিকা চালাবার ব্যাপারটাই ওঁর কাছে খুব ভালো লাগত। ৩০.১.৮৭ লিখছেন, "গতবার বলেছিলেন মাঝে মাঝে আসবেন, কিন্তু বহুদিন কোনো খবর পাইনি। হঠাৎ আবার বাইরে যাননি তো? শরীর কেমন আছে?

কাকদ্বীপ সংখ্যাটি বেশ তথ্যমূলক ও মূল্যবান। কিন্তু দু'তিনটি প্রবন্ধ শেষ করার পরই সুমন্ত নিয়ে গিয়েছে। আশা করি রিভিউটা পাঠাবে।

আপনি অনেকদিন ফ্রন্টিয়ারে লেখেন নি। আপনার ভাইও চুপচাপ।

আমাদের খবর বিশেষ কিছু নেই। সুলেখার দৃষ্টিশক্তি অল্প বেড়েছে। অন্তত চিঠিপত্র পড়তে পারে। বাণ্ডিল মাস আড়াই *Telegraph*-এ কাজ করছে। আমার শরীরও ভালো যাচ্ছে না, জর সর্দিকাশি। জরটা ছেড়েছে সর্দিকাশি লেগে আছে। একদিন আসবেন। ভালোবাসা নেবেন।" আবার ২৫.১১.৮৫-তে দেখছি, "বর্তিকার বিশেষ সংখ্যার সঙ্গে ছোট্ট লেখাটা, পাতা ওলটাতে গিয়ে আজ চোখে পড়লো। ওটা খামে আলাদাভাবে দিতে পারতেন। যাহোক, বেশ দেরী হয়ে গেলেও ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে (৩০শে নভেম্বর সংখ্যার কাজ আজ হয়ে গেছে —আপনার লেখাটা সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম) বের করবো।

কবে লেখা পাঠাবেন? শরীর কেমন? বুড়ো হাঁসের দিন একরকম কাটছে। ভালোবাসা নেবেন। উদ্বৃত্ত সংখ্যা আছে তো? যদি না থাকে, রবিবারের (১লা ডিসেম্বরের) স্কুলে জানাবেন?"

১৯৮৪ না ৮৫ সালেই তাজ্জব করে দেন ১৪ই জানুয়ারি সকালে আমার জন্মদিনে ঘোরানো সিঁড়ি ধরে উঠে এসেছেন সমর সেন। ওই যে নিজেকে বুড়ো হাঁস বলছেন। সুলেখা, সমরবাবু, মূর্ণী তার স্বামী, সবাই মিলে যে আড্ডা হত, আমি তো যা তা বলতাম। সবাই হেসে গড়াগড়ি। কালই পূর্ণিমা সুলেখাকে বলেছে, দিদিমা! মহাশ্বেতা দিদা দাদুকে কেমন বলত, গুরু! ভাল থেকো। তোমার জন্যে আমি বড়ি ফেলে দেব।

এ সব তো বলতামই। সমরবাবু সেই বিরল লোকদের একজন, যিনি নিজেকে নিয়ে হাসতে পারেন। বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা যেমন প্রজ্ঞা, তত্ত্ব, লোকে যথেষ্ট ওজনদার ভাবছে কি না, এ সব নিয়ে প্রপীড়িত, নিজেকে নিয়ে ঠাট্টা করতে অপারগ, সমর বাবু মোটেও তা ছিলেন না। তাঁকে আমাদের মাপে ফেলা খুব মুশকিল। তাঁর ব্যক্তিত্ব অসম্ভব অন্যরকম। কথাবার্তা শুনলে কে বলবে লোকটা ইন্টারমিডিয়েট থেকে এম. এ. অবধি প্রথম। জগত্তারিণী ও আরো আরো স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত। আমলই দিতেন না। মস্কোতে রুশ ভাষার পরীক্ষাতেও প্রথম হন। সেখানে কয়েক বছর থাকার সময়ে টলস্টয়, চেখভ, বুনিন, এমন সব বড় সাহিত্যিকদের লেখা রুশ থেকে বাংলা করেন। চেখভের "থ্রি সিস্টার্স" তার অন্যতম। বইগুলো এখনো কি লভ্য? জানি না। কিন্তু রুশ জানেন তাই বা কে বুঝবে। ওঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে "অনীক" কাগজেও লিখেছি, মানসিকতায় অসম্ভব রকম খাঁটি নির্বাণ মানুষ। গ্রামীণ ভারত প্রত্যক্ষ জানেন না তা সব সময়ে বলতেন। সাহিত্য, শিল্প, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সংগীত, নানা বিষয়ে সজীব আগ্রহ থেকে মন ঋদ্ধ। অতীব কোমল-হৃদয় মানুষ, কিন্তু মানসিক অ্যাপ্রোচ ও বিচার খাঁটি সেরিব্রাল। অন্যমত-মানুষ-রাজনীতি অপছন্দ

হতে পারে কিন্তু সে জন্য তিনি রুক্ষ বা সংকীর্ণ নন। অভিজাত সৌজন্যের সীমারেখা কখনো ছাড়াননি। পরিশীলিত, মার্জিত, তীক্ষ্ণমনা, ভীষণভাবে বিশ্লেষণ ও বিচারশীল, জাগতিক মাপকাঠিতে সাফল্য-ব্যর্থতা বিষয়ে রক্ত থেকে নির্মোহ, মার্জিত কৌতুক বোধে উজ্জ্বল, য়ুরোপীয় বুদ্ধিজীবী চরিত্রের অনেক কিছুর সঙ্গে তবু মেলে। পাঠকরা আশা করি এর মধ্যে আমার এক লহমা য়ুরোপ বুড়ি ছোঁয়াটা জড়াবেন না। সমর সেন সমর সেনেরই অর্জিত ব্যক্তিত্ব। ছোটখাট মানুষটা মাপে কী বড়ো না ছিল।

আমি তো বলতাম গ্রামে ঘোরার কথা, বলতাম, আপনাকে নিয়ে যাব। আর ওঁর মধ্যে ক্রমশ যে অনীহা গড়ে উঠছিল (লিখতে পারি না, লিখতে ভাল লাগে না), আমি সেটাকে আক্রমণ করতাম বারবার। বলেছি, এমন মনে হয়, তার কারণ আপনার জীবন খুব শহর ও মধ্যবিত্ত-কেন্দ্রিক। চিন্তায়-সক্রিয় মানুষ, মাটি ও নগ্ন জীবনের কাছাকাছি যেতে না পারলে অবসাদ একটা আসে। নিজে যেমন বুঝি তাই বলতাম। এও বলতাম, পারি না পারি, এ জন্যেই দৌড়ে বেড়াই। এটা কিন্তু উনি স্বীকার করতেন ! অতঃপর ? কেন কী, তাও তো আলোচনা হল। আন্দোলন যে করছে মানুষ, প্রতিবাদ যে করে, তা যেমন দেখতাম, সফরের পরই জানাতে ছুটতাম। ওই যে সেবার অবাক, অবাক করে জন্মদিনে এলেন, ১৪.২.৮৬ লিখছেন, "জানুয়ারির মাঝামাঝি একটা দিন উপলক্ষ্য করে যাবো ভেবেছিলাম, কিন্তু বাৎসরিক রুটিন মাফিক আবার অসুখ—এবারে বিকোলাই। অনেকদিন আসেন নি এবং কোনো লেখা পাঠান নি। দেখা হলে কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে সুস্থ মনে হয়। নিকষিত ভালোবাসা নেবেন।" এ চিঠিটা দ্বিতীয়বার উল্লেখ করলাম যাতে আপনারা বোঝেন, আমি শুধু অনাথ ও শোকার্ত নই, আমি মহা পাপী, আমি অপরাধী। ব্যস্ত নিশ্চয় থাকতাম, ব্যস্ততা থেকে গেল, সমরবাবু থাকলেন না। সুলেখার কাছে গিয়ে বসে থাকি। সুলেখা কি বোঝে, যে আমি অপরাধবোধে কত কষ্ট পাচ্ছি !

এম. জে. আকবরের বই (স্মৃতিশক্তি গেছে, নাম মনে পড়ছে না, চোখও নোটিশ দিচ্ছে, অক্ষরগুলো সমরবাবুর লেখার মতো ছোট ছোট হচ্ছে, আর উচ্চ রক্ত-চাপ ঘাড় থেকে মাথায় ঝিমঝিম অনুভূতি আনছে, শরীর অপটু হওয়ার বিড়ম্বনায় সমর-বাবুর কেন অসহায় মনে হতো, তার এক অণু বুঝতে পারছি) প্রকাশ উপলক্ষে এক পার্টি হয়। সমরবাবু, সুলেখা ও আমি একসঙ্গেই ফিরেছিলাম। ১৭.৩.৮৫ লিখছেন, "সেই পার্টির পর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, হলে বলা বাহুল্য, অত্যন্ত পুলকিত হতাম। শরীর কেমন আছে ? অনেকদিন কিছু লেখেন নি। শরীরের অবস্থা কেমন ?

আমাদের দিন কাটছে কোনো রকমে—নিরানন্দ নিরালোক। পায়ের ব্যথার জন্যে বেরোতে পারি না—কিছুক্ষণের জন্য অফিস ছাড়া—ফলে সময় কাটতে চায় না।—লেখা পেলে খুশি হবো। চেষ্টা করে একদিন আসবেন ?"

লেখা যে সব সময়ে হত না, তার কারণ তো এ নয় যে ফ্রন্টিয়ার পয়সা দিতে

পারে না। অনীক, অনুষ্টুপ, এক্ষণ, প্রস্তুতিপর্ব, ম্যানিফেস্টো থেকে শুরু করে জেলার কত কাগজে লিখেছি, যতজন চান সকলকে আর খুশি করতে পারি না, তবু কয়েক শত কাগজে নিশ্চয় লিখেছি, পয়সার জন্য লিখি নি। আসলে হয়েই উঠত না। তবু এ চিঠির পরেই লেখা পাঠাই। ২৪.৩.৮৬ লিখছেন, "লেখাগুলো পেয়ে খুব খুশি হয়েছিলাম, তিমিরবাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হলো, তার কারণ ক্রমাগত ভুগছি, অনেকদিন অফিসে যেতে পারি নি। যাঁরা সচল, তাঁদের কথা ভেবে আজকাল হিংসে হয়। আপনার শরীর কেমন ? অনেকদিন দর্শন পাইনি। মাঝে মাঝে লিখবেন আশা করি।"

এই যে সব চিঠিতে আমি অনেকদিন যাইনি লিখছেন, এর মধ্যে মধ্যেই চলে যেতাম, ভীষণ বকতাম। পায়ের ব্যথা জেনে তো গিয়েইছিলাম। সেদিন হঠাৎ ই. এম. ফর্স্টারের ও জেরোম. কে. জেরোমের,—দুজন দু'রকম লেখকের কথা হল। ফর্স্টারের একটা গল্প উল্লেখ করে বললাম, আপনিও খানিকটা গ্রেট গড প্যানের মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছেন, সে রকম Impish ভাবটা তো আছেই।—সেদিনই বললেন, একুশের দশক হয়তো আপনি দেখবেন।

আমি বললাম, একশো বছর বাঁচতে হবে। ব্যাগ পাইপ বাজিয়ে সেণ্টেনারি করব। অন্যরকম ব্যবহার করলে ভীষণ আন্দোলন করব।

তিন জনেই হাসলাম। সমরবাবু আর তেরো বছর থাকেন নি। আমিও একুশ শতক দেখব না। তবে আমরা যারা বিগত হচ্ছি, হব, কেউই সমর সেনের মতো মহীরুহ নই। বাবা লিখেছিলেন কবিতা, "একটি বিশাল গাছ, মাথা যার আকাশে ঠেকেছে।" আমরা কোনো ভ্যাকুয়াম রেখে যাব না। "শূন্য স্থান পূর্ণ করো" গল্প লিখেছিলাম, কিন্তু ফ্রন্টিয়ারের সমর সেনের শূন্যস্থান শূন্যই থাকবে। এখনো যা দেখছি। কে নিজের জীবন জ্বালিয়ে একটি কাগজকে একটি কক্ষ করে চলবে ? অত বড়ো মাপের আর কে ?

নকশাল আন্দোলনের বিশ বছর পূর্তিতে লেখা দিতে পারিনি। ১৯৮৬-র গোড়া থেকেই আদিবাসী ঐক্য ফোরাম, আদিম জাতি ঐক্য পরিষদ গড়ার কাজে যে ঝোড়ো সফর শুরু হয়, ১৯৮৮-র জানুয়ারিতে তা বন্ধ করল অসুস্থতা। ১৯৮৭-র অটাম নাম্বার। ৫ ৬. ৮৭ লিখছেন, "পর পর দুটো P. C.র উত্তর পেলাম না, লেখা তো দূরের কথা। কোনো কারণে চটে আছেন না কি ? আজকের *Statesman* পড়ে বুঝলাম (আদিম জাতি ঐক্য পরিষদের বিষয়ে লেখা বেরোয়) শারীরিক ভালো আছেন।

যাইহোক, Autumn Number-এর জন্য একটা লেখা দিতে পারবেন ? অগাস্টের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই। এখনো অনেক সময় আছে। আপনি স্বশরীরে একদিন এলে অত্যন্ত ভালো লাগবে। MAY 30-র সংখ্যায় সুমন্তর লেখাটা (কাকদ্বীপ সংখ্যার আলোচনা) বেরিয়েছে, পেয়েছেন নিশ্চয়ই।"

১৯৮৭-র মতো নানা যন্ত্রণায় দীর্ণ দুর্বৎসর কখনো জানিনা বহু দুঃখে পোড় খাওয়া আমিও। ঐ লেখা, অনেক ক্ষমা চেয়ে তাঁর মৃত্যুর পর তিমির বসুকে পাঠাই। আর ৪. ৮. ৮৭ ওঁর শেষ চিঠি। "Autumn Number এর জন্য লেখা পাঠাবেন আশা করি, কয়েক দিনের মধ্যে। চিঠিটা লিখছি Calcutta Hospital (Diamond Harbour Road) থেকে। দিন দশেক হয়ে গেলো, কবে বাড়ি ফিরবো জানি না। সুলেখারা রোজ বিকেলে, ট্রামে করে এলে, সাড়ে তিনটে নাগাদ বাড়ি ছাড়ে, ফেরে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ।—আপনি কেমন আছেন? অনেকদিন দেখা হয়নি।" এই প্রথম ইন্‌ল্যাণ্ডের চিঠি। ওপরে লেখা, "surgeryটা খুব সম্ভব পরে হবে।"

চিঠিটা বারবার পড়ি। নিজের হাত মেলে দেখি। কি অশুচি, কি পাপী, কি অপরাধী হয়ে গেছি। কেন তখনি গেলাম না, তার লক্ষ ব্যাখ্যা আছে। আমার বাড়িতে সাত বছর আগে চার বছরের ছেলে নিয়ে বীরভূমের গ্রাম থেকে এসেছিল এক দুঃখী মেয়ে মিলন। স্বেচ্ছাতেই অন্যদের যোগাযোগে ও ওর ছেলেকে লবণহ্রদে S. O. S. হোমে দেয়। ৪. ৮. ৮৭ সন্ধ্যায় হোমের ডিরেক্টর ও তাঁর স্ত্রী এসে জানান, যে-ছেলেকে মানুষ করবে বলে মিলনের এত স্বপ্ন, সেই ছেলে ২.৮ রবিবার সন্ধ্যায় গাছ থেকে পড়ে যায়, বিধানচন্দ্র শিশু হাসপাতালে ৪.৮ সকালে সে মারা গেছে। এই মৃত্যুর যে কত রকম Version, তা কি বলব। সাংবাদিক বরুণ ঘোষ বলল তদন্ত করে লিখবে, কিছু তো করল না। আর ৪.৮ থেকে আমি মিলনকে নিয়ে কি ভাবে মাসাধিক কাটালাম, তা অকল্পনীয়। তারপর ওর বোন ও বোনের তিন সন্তানকে বীরভূমের গ্রাম থেকে আনলাম। এ সব ঝড় চলছে, চলছিল, সকালের কাগজে সমরবাবুর ছবি। না, কেন যাইনি তার কারণ আছে, তবু নিজেকে আমি ক্ষমা করি নি, করব না। বাকি জীবন একটু একটু করে পুড়ব। সমরবাবু যে কতটা অনাথ করে রেখে গেলেন তাও বলে বোঝাবার নয়। এমন করে কম মৃত্যুই নিঃস্ব করতে পারে।

ফ্রন্টিয়ারের সমর সেন। দেবব্রত ও অন্যদের চেষ্টায় ওই যে ফ্রন্টিয়ার সংকলন, তা ছাড়া কাজ চলবে কার? সমর সেনকে কাছে আনুন, বাংলা পাঠকদের কাছে। ওই অ্যানথোলজির বঙ্গানুবাদ থেকে। "মাস্টার সাব" পড়ে খুশি হন, উৎস ও উপাদান যে ওই অ্যানথোলজি, "কি যে বলেন!" এদিকে তো তাঁর আপনজন, অন্তরঙ্গ, এঁদের মহলে মৃত্যুর আনাগোনা চলছিল। সমরবাবুরা প্রথম পক্ষে ছয় ভাই, তিন বোন। সমরবাবু তৃতীয়। এখন আছেন দুই ভাই, তিন বোন। দ্বিতীয় পক্ষে সাত ভাই বোন। সুলেখা বলল, সকলে আছেন কিনা মনে করতে পারি না। বন্ধুদের মৃত্যু, সহোদর ভাইদের মৃত্যু, সমরবাবু ভিতরে বারবার আঘাতে দীর্ণ হচ্ছিলেন। বস্তুত বড় মেয়ের মৃত্যুর প্রচণ্ডতা উনি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। সুলেখাকে সর্বাবস্থায় উঠতে হয়েছে, সংসার ও স্বামীর হাল ধরতে হয়েছে।

মৃত্যুর কারণও তো দুরূহ রোগ, রক্ত চলাচলে বাধা, হার্ট রক্ত পাম্প করে দেহে সঞ্চালন করে। AORTA শব্দটি স্ক্র্যাব্‌লে খেলেছি। হার্ট-এর বাঁ ভেন্‌ট্রিকুল থেকে AORTA=Great artery or trunk of the arterial system বেরিয়েছে। সেই AORTA বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এ সবই সুলেখার কাছে শোনা। পায়ের ব্যথাও সেজন্য। নিজে তো তাহলে জানতেন, দেহে রক্ত চলাচলের উৎসই যদি বিকল হয় তাহলে হাঁটাচলার ক্ষমতা সীমিত হয়ে আসবে। কোনো কথায় কখনো জানতে দেননি যে এই ভয়ঙ্কর পরিণাম তিনি জানেন। অন্তরঙ্গরা জানতেন হয়তো, আমি জানিনি। এই সময় সেনকেই ডাক্তার কমল জালান, অন্তত তিনবার তো বটেই, নিয়ে যান, চিকিৎসা করেন। ওঁর চিকিৎসা. প্রথমে সুলেখা, দ্বিতীয়ে পূর্ণিমার সেবা ওঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

সুলেখার কাছে সব শোনা, আমার যেটুকু সামান্য দেখা। সুলেখার অনুমতি নিয়েই লিখছি. পঁচিশ বছরের রোগা. আগুনের মতো উজ্জ্বল সমর সেন দিল্লিতে ওদের বাড়ির সামনেই থাকতেন। ক্যাকটাস বিষয়ে আমি যতই মুগ্ধ হই না কেন, গাছপালা ফুল ভালবাসা সুলেখার সহজাত। তখন ও ক্লাস নাইনে পড়ে। বড় বোনের বিয়ে হয়েছে। "জানো. অনেক দিন অবধি খুব ছেলেমানুষ ছিলাম। মাকে বলেছিলাম. দিদির বিয়ে যেমন করে দিয়েছ, তেমন করে দিলে বিয়ে করতে পারি।" ছোট মেয়ে, বড়ই নরম, বড় আদরিনী। তা সুলেখার বাবা মা সমরবাবুকেই সুপাত্রের খোঁজ দিতে বলেন, আর সমরবাবু যেসব পাত্রের খবর আনেন, তাদের সঙ্গে বিয়ে তো দেয়া চলে না। একদিন সমরবাবু বললেন, আমার সঙ্গে বিয়ে দিলে হয় না?—বলেই সবেগে প্রস্থান।

এমনি করেই বিয়ে হয়েছিল। সমরবাবুর ডাক নাম "খোকা" আর সুলেখার ডাক নাম "খুকু"। বিয়ের পর সমরবাবু কলকাতা গেছেন। প্রথম চিঠি. "খুকু কেমন আছ? শীঘ্রই ফিরব।" সুলেখার তো খুব অভিমান হয়েছিল। এমনি সব কত কথা। বুঝি বছর চারেক বাদে বীথি হয়. বছর চারেক বাদে যূথী। দিল্লিতেই থাকা। সময় নষ্ট করে নি সুলেখা. লেখাপড়া করে চলেছিল। সম্পন্ন ধনী কন্যা, সংসারের কিছু জানত না। আমি বলি, "সুলেখা আমি তোমায় যবে থেকে দেখেছি…"

"মস্কোতে সব নিজেদের করতে হত, সব শিখে শক্ত হয়ে গেলাম।"

নিজের কথা ও বলতেই চায় না। আমার বিশ্বাস. সব সম্ভাবনাই ওর ভিতরে ছিল, যেমন দরকার পড়েছে তেমন ও প্রমাণ রেখেছে—সমরবাবুর সমর সেন হয়ে ওঠার জন্যে ও কি ভাবে বন্ধু ও সহযাত্রী হতে পারে, আক্ষরিক অর্থে কমরেড। এটা আমার কথা।

সমরবাবুর লেখালেখি! সুলেখার মতো কে জানবে সব? ছোট ছোট যে কোনো কাগজে নাকি লিখতেন। "বাবু বৃত্তান্ত" বইয়ের পাণ্ডুলিপি কেমন ভাবে

ছাপাতে যায় জানি না, তাও ওঁর ঘরে আধশোয়া অবস্থায় (অসুস্থ ছিলেন) ছোট ছোট কাগজেই লেখা। বিয়ের পর সোনার বোতাম বিক্রি করে নিজে ছাপিয়েছিলেন তৃতীয় কবিতার বই "নানা কথা।" "কয়েকটি কবিতা" এখন কি পাওয়া যায়? সুলেখা কোনোদিন ধারাবাহিক না লিখলে অনেক কথা জানা যাবে না। কাল নবারুণ, আমার ছেলে বলল, হাত ভেঙে ও যখন শয্যাশায়ী, কৈশোরের বড় এক দুঃখের দিনে বাড়িতে যখন ও আর ওর বাবা, মন যখন হতাশায় অবসন্ন, বিজন ওকে কিনে এনে দেন "মানুষের মতো মানুষ", বরিস পোলেভয়ের স্টোরি অ্যাবাউট এ রিয়েল ম্যানের অনুবাদ। অনুবাদক সমর সেন। সে বইয়ের সবচেয়ে বড় গুণ আশ্চর্য অনুবাদ। মনেই হয় নি যে অনুবাদ পড়ছে। উৎকৃষ্ট সজীব ভাষায় কোনো বাংলা বই যেন। নবারুণ বইটি পড়ে সে সময়ে খুব লাভবান হয়। অনেককে পড়িয়েছিল।

ওই বই যাঁকে নিয়ে লেখা সেই আলেকসেই মেরেসিয়েভ তো মনোবলে, সাহসে, দেশপ্রেমে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব আর ফ্যাসিবিরোধী যুদ্ধে তাঁর ভূমিকাও অনন্য। সমরবাবু কেন ওই বই অনুবাদ করেছিলেন আজ বুঝি, যখন লেনিনগ্রাদ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য "নোবলেস্ট সিটি" মনে করি। শুধু হার্মিটেজ নয়, লেনিনগ্রাদ (নবারুণ দেখে এসেছে, বলে যাচ্ছিল) থিয়েটার, মিউজিয়াম, গ্রন্থশালা নিয়ে সংস্কৃতির এক আশ্চর্য সমন্বয়। সমরবাবু বলতেন, যুদ্ধের সময়ে সেই নোবল প্রতিরোধ!—সত্যিই তো ৯০০ দিনের ব্লকেড, নগরে খাদ্য ছিল না, বন্ধ থাকেনি কোনো সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক, অপেরা, ব্যালে। মানুষ সেখানে ভিড় করেছে। এমনি করেই বুঝিয়ে দিয়েছে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কতখানি। এই বীরত্ব, মৃত্যুকে উপেক্ষা করা, এই দেশপ্রেম সমর সেনকে অভিভূত করেছিল।

সুলেখাকে "ডাইনি সংখ্যা বর্তিকা" দিয়ে এলাম। বইপত্র ও গুছিয়ে ফেলেছে। সমস্ত বাড়ি জুড়ে সমর সেন। সুলেখা ছিল, বাণ্ডিল (বৃন্দা) এল। অমন ডাক নাম থাকলে কে ডাকে ভালো নামে। সুলেখার যখন লোকজন থাকত না, ঘর সংসারের কাজ করত, সমরবাবু বড্ড কাতর হতেন, বার বার গিয়ে দাঁড়াতেন। খাওয়াদাওয়ায় তেমন প্রবণতা কখনো ছিল না। শেষের দিকে সুলেখার তৈরি একটু পুডিং, "সেই যে তুমি কি একটা করো?" কোনোদিন কাস্টার্ড, কোনোদিন অন্য কিছু।

সুলেখা দুটি একটি পাতাবাহারের ডাল রেখেছে ঘরে। বলল, "জানো, এটার শিকড়ও বেরিয়েছে।" এক সময়ে সত্যিই নিজেই চমৎকার ক্যাকটাস করেছিল অনেক। এখনো গাছ, ফুল, পাতা সুলেখাকে খুব আনন্দ দেয়।

এই তো আমার সমর সেন বিষয়ে বলাবলি। ফ্রন্টিয়ারের সমর সেন। ফ্রন্টিয়ার সম্পাদনাই তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিচয়। কিন্তু এই সম্পাদকের মনে শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত, দেশপ্রেম, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, আড্ডাপ্রেম, কৌতুকবোধ, নানা বিষয়ে যে

ভালোবাসা ও জানাজানি ছিল, সেখানে ভূগোল বা রাজনীতির সীমারেখা নেই। কোনো কট্টর প্রেমিস থেকে অন্যদের আঘাত করে তাঁকে বড়ো করতে গেলে সমর সেন নামটির প্রতি অকারণ অবিচার করা হবে, সে অধিকার আমাদের নেই। দীর্ঘদিন ধরে কারা তাঁদের বন্ধু, সেটা দেখলেই বোঝা যাবে মানুষ বিষয়েও তাঁর মনোভঙ্গি একই ছিল। যে কোনো রকম সংকীর্ণতাই তাঁকে পীড়িত করত। বলতে ভুলে গেছি। ওঁর মৃত্যুর ২।৩ মাসের মধ্যে সোভিয়েট লিটারেচার Representative Indian Poetry-র মধ্যে সমর সেনের কবিতার অনুবাদ বেরিয়েছে, এটি জানতাম না। যেখানে যে খবর পাচ্ছি দিয়ে যাচ্ছি।

তাঁর জীবনের পথ পরিক্রমা করে ফ্রন্টিয়ারে পৌঁছনো, এসব বিষয়ে আমি বলতে অনধিকারী। আমি সেই সমরবাবু ও সুলেখার কথা বললাম (যদিও কিছুই বলা হল না), যাঁরা ভালবাসায় অকৃপণ, যাঁদের দরজা অবারিত, অনীশ, বাবা, ফল্গু, মা, এঁদের মৃত্যুতে ওখানে গিয়েই কেঁদেছি নিঃসংকোচে। এখন নিজেকে অনাথও মনে হয়, সেই সঙ্গে বড় অপরাধী। সুলেখার দরজা খোলা আছে, যাই, যাব। সমর সেনকে আমি কি চোখে দেখতাম তাও প্রকাশ করার চেষ্টা ব্যর্থই হবে। বরঞ্চ কৃতজ্ঞ হয়ে থাকলাম তিমির বসু ও দেবব্রতর কাছে যেমন, তেমন নাও-এর দিন থেকে শেষ অবধি যাঁরা কাগজকে বাঁচাতে তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের, যাঁদের সাহচর্য ও বন্ধুত্ব তিনি শেষ অবধি পেয়েছেন। যে যেখানে তাঁদের ও ফ্রন্টিয়ারের জন্য একটুও করেছেন, সকলকে।

আর এখন, যাঁরা সদস্য বা গ্রাহক হয়ে, বিজ্ঞাপন দিয়ে, লেখা দিয়ে ফ্রন্টিয়ারকে সাহায্য করবেন তাঁরা যেন দেরি না করেন। সমরবাবুর বেলায় দেরি হয়ে গেল, ফ্রন্টিয়ারের বেলায় সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেরি হলে সমর সেন নামকে শ্রদ্ধা জানানোর কোনো মানে থাকবে না।

এই তো !

কমলা রায়

আমাদের বাড়ি, আমাদের খোকাদা

১৯৮৭-র ২৩শে আগস্ট আমাদের বংশের সবচেয়ে প্রিয় সন্তান আমাদের খোকাদা চলে গেলেন। তাঁর যাওয়াটা ঠিক অপ্রত্যাশিত ছিল না আমাদের কাছে, কারণ বহুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। কল্পনা (বোস) এসে যখন বলল, মাসিমা চলুন আপনার দাদার বাড়ি—আমি যেতে পারি নি। কী হবে গিয়ে, দাদাকে তো দেখতে পাবো না। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছে, খোকাদার সম্বন্ধে কিছু লিখতে। লেখা আমার আসে না, বিশেষ করে খোকাদার কথা। ওঁর কথা লিখতে গেলে আমাকে আমার বাড়ির কথা লিখতে হয়; লিখতে হয় দাদা আর গাবুদার কথাও—এঁরা তিনজন ছিলেন অভিন্ন। আমাদের বাবা অরুণচন্দ্র সেন ছিলেন স্কটিশের ইতিহাসের অধ্যাপক। ভাল মানুষ বলতে যা বোঝায় আমার বাবা ছিলেন সেই রকম। আমরা অনেক ভাই-বোন। আমাদের ছোটবেলাতেই আমার মা মারা যান। বাবা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এই মায়ের কাছেই আমরা তিন ভাই-বোন মানুষ হই। সৎমা বলতে যে বিভীষিকা বোঝায় ইনি ছিলেন তার বিপরীত। ছোটবেলার কথা আমার সামান্যই মনে আছে। আমরা তখন ছিলাম বিশ্বকোষ লেনের বাড়িতে। বাবা কলেজে চলে গেলেই অবাধ রাজত্ব। পরপর সব বাড়ি। এ-ছাদ থেকে ও-ছাদে যাওয়া যেত। খোকাদার তখন এগারো কি বারো বছর বয়স হবে; কালুদা আর লালুদাকে (কেশব সেন আর অনিল সেনকে) নিয়ে এ-ছাদ থেকে ও-ছাদ থেকে আচার নিয়ে আসতেন। বেচারা বাবা কলেজ থেকে ফিরলেই পাড়ার লোক এসে নালিশ করতেন। রাস্তায় কাকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়েছেন—এসব তো আছেই। বাবার এক বন্ধু আমাদের বাড়ি থাকতেন। নামটা আমার ঠিক মনে আসছে না। তিনি খোকাদা আর গাবুদাকে নিয়ে গঙ্গায় রোজ সাঁতার কাটা শেখাতে নিয়ে যেতেন। গাবুদা একদিন ভয় পেয়ে কাপড়-জামা না পরেই বাড়িতে চলে আসেন। তখন আমাদের মা বেঁচে ছিলেন। মাকে সকলে যেমন ভালোবাসতেন, ভয়ও করতেন খুব। এমনকি আমাদের দাদু দীনেশচন্দ্র সেনও। মা খুব ভালো গান করতেন। রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুর নাকি আসতেন। মা'কে অনেক গানও শিখিয়েছিলেন। বাবার আর এক বন্ধু ছিলেন কালিদাস নাগ। ওঁকে আমরা দেখেছি।

খোকাদা, শুধু খোকাদা নয়, আমরা সব ভাই-বোন সন্ধ্যাবেলায় খুব ভয় পেতাম; তার কারণ একজন পানওয়ালী মুখোশ পরে টিনের হাত লাগিয়ে আমাদের বাড়ি আসতো। শুধু আমাদের বাড়ি নয়, সব বাড়িতেই যেতো। গলিতে ঝমঝম শব্দ হলেই যে-যেখানে পারতো লুকিয়ে পড়তো। একমাত্র দাদাকে

দেখতাম, হীরামতি রাক্ষুসীকে পান দেওয়ার জন্য পয়সা দিতেন। দাদাকে আমাদের খুব বীর মনে হতো। দাদু বেহালায় থাকতেন ; তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে একটা বাগানবাড়ি কিনেছিলেন ১০ কাঠা জমির ওপর। সেটা জঙ্গল হয়ে পড়েছিল, তাই বাবাকে ওখানে গিয়ে থাকতে বলেছিলেন। একটা কথা আমার সব সময় মনে হতো, দাদা কেন আমাদের সাথে থাকেন না। দাদা থাকতেন J. N. Mazumder-এর বাড়িতে। তাঁর ছেলে অতুল মজুমদার ছিলেন দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অতুলদাকে দেখতে খুব সুন্দর ছিল। আমি বলতাম, অতুলদাকে আমি বিয়ে করবো। সেই থেকে অতুলদা আমাকে wife বলে ডাকতেন। যাই হোক, বাবা দাদুর কথা মতো বেহালাতে চলে আসেন। আমার মনে আছে, এক সন্ধেবেলায় একটা পোড়ো বাড়িতে আমরা ঢুকি, ঘাসগুলো ছিল আমার মাথার ওপরে। অনেক গাছ—নারকেল, সুপারি, তেজপাতা গাছ পর্যন্ত ছিল। বাঁধান পুকুর-ঘাট। বাড়িটা তেতলা ছিল। নিচে বাইরের ঘর, ভাঁড়ার ঘর—ভেতরে মস্ত উঠোন, তার পাশে রান্নাঘর, গোয়াল। বাড়িতে দুটো গরুও রেখেছিলেন। তবে বাবা আর গাবুদা-খোকাদার যাতায়াতের অসুবিধা হতো, অনেকটা পথ যেতে হতো তাঁদের ট্রাম ধরতে। সাপের উৎপাতও ছিল। খোকাদা তো হেলে সাপ ধরে খুব ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিতেন। সাপে যদি ব্যাঙ ধরত, খোকাদা সাপের মাথায় লাঠি মারতেন যতক্ষণ না সাপটা ব্যাঙকে ছেড়ে দেয়। ভেতরে চানের ঘর থাকলেও কিন্তু আমরা পুকুরে চান করতাম। আমার সব দাদারাই খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারতেন, বিশেষ করে খোকাদা আর আমার ছোটোভাই ভুলু ছিল ওস্তাদ। আমরা বোনেরা কেউ সাঁতার কাটতে পারতাম না। আমি কলাগাছ ধরে এপার-ওপার করতে পারতাম। বেহালায় বাবা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তখন বেহালার মেয়েদের জন্য কোন স্কুল ছিল না। বাবা মেয়েদের স্কুল করেছিলেন। বাজারে কোন টিনের শেড্ দেওয়া ঘর ছিল না। বাবার চেষ্টায় সেটা হয়েছিল। আমাদের বাড়ির সামনের দিকে ফুল-বাগান ছিল আর ছিল খেলার মাঠ। সব রকম খেলাই হতো। খোকাদা, গাবু আর তাঁদের কলেজের বন্ধুরা সকলেই খেলতে আসতেন। লালুদা আর কালুদা তখন বেহালা হাইস্কুলে পড়েন। একবার একটা ম্যাচ হয়েছিল। কলেজের ছাত্ররা আর বেহালা স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে বেহালা স্কুলই সেই খেলায় জিতেছিল। খোকাদা খুব ভালো খেলতে পারতেন। এরপর বেহালায় স্মরণীয় দুটো ঘটনার কথা আমার মনে আছে। খোকাদা পরীক্ষার আগে পড়াশোনা করতেন না, তা নিয়ে বাবা খুব চিন্তায় পড়তেন। মা খোকাদাকে মাকাল ফল বলতেন। মা বেঁচে থাকলে তাঁর ধারণা যে ভুল সেটা প্রমাণিত হতো। বি.এ. পরীক্ষায় খোকাদা ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছিলেন ইংলিশে। এবার আমার দিদির বিয়ে। ১৬ বছর বয়স ছিল তখন দিদির। জামাইবাবু ছিলেন ছোটকাকা শ্রীচন্দ্র সেনের বন্ধু। দাদুর বাড়িতেই দিদিকে দেখেছিলেন

এবং বিয়ের জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন। ওঁরা ছিলেন চট্টগ্রামের বড়ুয়া—দাদু এ-বিয়েতে মত দিয়েছিলেন। কাজেই বিয়েটা হয়ে গেল। দিদিকে নিয়ে জামাই-বাবু বছর দুয়েক আমাদের বাড়িতেই ছিলেন। ওই বাড়িতে, দিদির দুই ছেলে, রবি আর শ্যানু হয়। খোকাদাদের খুব প্রিয় ছিল রবি—অসম্ভব দুরন্ত। আর দুই মামাতে ওকে এমন সব অশ্লীল কথা শিখিয়েছিলেন যে মাঝে মাঝে বাইরের লোকের সামনে দিদিকে খুব মুস্কিলে পড়তে হতো। ভাগ্যিস খুব কম লোক ওর ওই আধো আধো খারাপ কথা বুঝতে পারতো! বাবা কিন্তু রবির খারাপ কথা-গুলো খুব উপভোগ করতেন। জামাইবাবু কোয়েটাতে চাকরি পেয়ে দিদিকে নিয়ে চলে গেলেন। দাদু আমার অন্য সব কাকাদের কথায় বেহালার বাগানবাড়ি ছাড়তে বলেন। ১৯৩৬ কি '৩৭-এ আমরা বেহালা ছাড়ি।

এর পর আমরা গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে আসি। বাড়িটা ছিল লেক মার্কেট-এর কাছে। দোতলা দক্ষিণ দিক খোলা। পেছনে একটা কবরখানা ছিল। গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়িতে খোকাদা খুব বেশিদিন থাকেন নি। এম. এ. পরীক্ষার পর কাঁথিতে চলে যান। আমাদের বাড়িটাকে লোকে অরুণ সেনের হোটেল বলতেন। হোটেলে থাকতে হলে পয়সা লাগত, কিন্তু বাবার হোটেলে পয়সা লাগত না। তাই এখন ভাবি, বাবা কেমন করে সংসার চালাতেন। কম করেও তখন ২০-২৫ জন খেতেন রোজ। আমরা ছাড়া বাইরের দু-একজন থাকতেনই। বাবা স্কটিশে মাইনে পেতেন তিনশো। ১৯৩৯-এ দাদু দীনেশচন্দ্র মারা যান; সালটা ঠিক আমার মনে নেই। বঙ্কিমবাবুকে আমাদের খুব ভালো লাগত। তাঁর গল্প বলার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এক একটা গল্প ৭/৮ দিন ধরে বলতেন। আমরা, ছোটরা, মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম; এমন কি বাবা-মা পর্যন্ত। বাবা খুব বিরক্ত হতেন। আধ-ঘণ্টা গল্প বলে বঙ্কিমবাবু বাথরুমে যেতেন। আধ সেরি গ্লাসের চার গ্লাস জল খেতেন; তারপর পান-জর্দা। বাবা বলতেন, 'আচ্ছা বঙ্কিমবাবু, গল্পটা শেষ করে এসব করলে চলত না!' একদিন পুলিস এল বাড়িতে বঙ্কিমবাবুকে অ্যারেস্ট করতে। নিচের ঘরে দারোগাবাবু বসেছিলেন। খোকাদাও ছিলেন। খোকাদাকে দেখে ভয় পেয়েছিলেন। খোকাদা খুব গম্ভীর হয়ে বলেন, 'বয়েস হয়েছে, এখন মারামারিটা করি না। দুঘণ্টা বসে থাকুন, বঙ্কিমবাবু নিচে নামবেন।' ভদ্রলোক নাকি বিশ্বকোষ লেনে থাকতেন। খোকাদার কাছে ছোটবেলায় খুব মার খেতেন। এরপর গাবুদার বিয়ে হয়। বৌদি আশুতোষ কলেজে বি. এ পড়তেন। আমাদের জেঠিমার ভাইয়ের মেয়ে। গাবুদার বিয়েতে অনেকেই এসেছিলেন। সুরেন গোস্বামীর সঙ্গে তখন আমার পরিচয় হয়। এক তলা থেকে ছাদে লোকজন যাঁরা আসছিলেন তাঁদের আমি নিয়ে যাচ্ছিলাম। তাই তখন থেকে উনি আমাকে দারোয়ান বলে ডাকতেন। শুনলাম, উনি বঙ্গবাসী কলেজে পড়ান। যুদ্ধ তখন শুরু হয়েছে, আমাদের বাড়িতে জোর আড্ডা-তর্ক

চলেছে। বাবার একটা দল, দাদাদের আর একটা। গুজব ছড়ালো কলকাতায় বোমা পড়বে। সব লোক পালাতে লাগল। অনেকে পূর্ব বঙ্গেও গেলেন—যেন ওখানে গেলে বোমার হাত থেকে বাঁচবেন। বাবা আমাদের তিন ভাই-বোনকে রাজসাহীতে সেজকাকার (বিনয় সেন) কাছে পাঠিয়ে দিলেন, মা-কে রংপুরে পিসিমার কাছে। ইতিমধ্যে খোকাদা দিল্লি চলে গেছেন। আমরা প্রায় মাস ছয়েক রাজসাহীতে ছিলাম। '৪০, '৪১-এ দাদা আর খোকাদার বিয়ে হয়। আমাদের বাড়িতে তখন দুরকম মতবাদ চলছে। নিচে বাবা তখন ভীষণ হিটলার-ভক্ত, ওপরে স্ট্যালিন ভক্ত। হিটলার তখন রাশিয়া আক্রমণ করেছে। সুভাষ বোস তখন বোধহয় বার্লিনে; রেডিওতে ওঁর বক্তৃতা শোনা যাচ্ছে। বাবা ভেবেই নিয়েছিলেন, ইংরেজ হারবে। আর হিটলার ভারতবর্ষে জাঁকিয়ে বসবে। বলতেন, ইংরাজি আর পড়তে হবে না এখন থেকে জার্মান ভাষা পড়তে হবে। গাবুদা কেন জানি না গোলাম মহম্মদ রোডের বাড়ি ছেড়ে বৌদিকে নিয়ে অন্য বাড়িতে উঠে গেলেন। লালুদাও ওঁদের সঙ্গে গেলেন। কালুদা তখন কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। বাড়ি একদম ফাঁকা হয়ে গেল। বোনদের মধ্যে এক আমিই বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারতাম। আমার কোন কিছু খারাপ লাগলেই বাবার মুখে মুখে তর্ক করতাম। দিদি তো বাবাকে ভীষণ ভয় করতেন। বাবার কাছে কিছু দরকার হলে আমাকে বলতে বলতেন। দিদিটা চিরদিনই শান্ত আর ভীতু। এখন মনে হয়, তখনকার দিনে আমরা ছোটরা গুরুজনদের কতটা মান্য করে চলতাম। আমরা ছোট থেকেই একটা আদর্শের মধ্যে বড় হয়েছি। পারিবারিক সম্মানবোধ ছিল। আর এখন ঠিক এর বিপরীত দেখি। নেই আদর্শবোধ, নেই সেই পারিবারিক সম্মানবোধ। এরা কোথায় কোন্ অতলের দিকে চলেছে, কে বলবে। '৪২-র শেষের দিকে আমাকে খোকাদার কাছে দিল্লিতে লালুদার সঙ্গে পাঠানো হল, যদিও আমার যাবার একটুও ইচ্ছে ছিল না। বাবা আর দাদা যা ঠিক করবেন, তার ওপর কোন কথা বলা চলবে না। ওঁরা আমার কতটা উপকার করেছিলেন দিল্লিতে পাঠিয়ে তা পরে বুঝেছি, নাহলে খোকাদাকে চিনতে পারতাম না। খোকাদার ভেতর যে অমন স্নেহ আছে, তা ভাবতেই পারি নি; কারণ চিরদিন আমরা ছোটরা খোকাদা আর গাবুদাকে দূর থেকে দেখেছি, কাছে যাবার সাহস আমাদের হয় নি। দিল্লিতে আমি প্রায় দু'বছর ছিলাম। সুলেখার সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ও ছিল আমার থেকে দু'বছরের ছোটো। ওর আপত্তি সত্ত্বেও ওকে আমি নাম ধরেই ডাকতাম। বাবা-মায়ের ছোট মেয়ে বলে ও খুব আহ্লাদী ছিল। খোকাদা আমাকে বল্লেন, 'সুলেখা যা হালুয়া করে খাইয়েছিল তা খেয়ে আমার দম আটকে গিয়েছিল। এমন আঠালো!' ওঁদের ঝগড়টাও খুব মজার ছিল। ঝগড়াটা হত একতরফা। সুলেখাই বকে যাচ্ছে, খোকাদা চুপ করে শুনছে। একা একা বকে যাওয়া যায় না—তাতে রাগ আরো বাড়ে। খোকাদা

চুপ করে ঘর ছেড়ে বাগানে গেলেন, সুলেখাও সেখানে গেল। নেহাৎ না পারলে খোকাদা জুতো পরে রাস্তায় ঘুরতেন, ঘণ্টাখানেক ঘুরে বাড়ি ফিরতেন। খোকাদা তখন দিল্লির কমার্শিয়াল কলেজে পড়াতেন। দু-একজন ছাত্রও বাড়িতে পড়তে আসতো। তাদের চেহারা দেখে ভাবতাম, আমার এই ছোটখাট সুন্দর দাদাটা এই দৈত্যের মতো ছেলেদের কী করে পড়ান! খুব অদ্ভুত লাগত আমার। আমার ওপর খোকাদার স্নেহ কতভাবেই না দেখেছি। আমার স্বাস্থ্য নিয়েও খোকাদার চিন্তা ছিল। তখন আমি খুব রোগা ছিলাম। খাওয়াটা যাতে ঠিকমতো হয় সেদিকে নজর ছিল খুব। দিল্লিতে তখন মাছ খুব কমদিন পাওয়া যেতো। একদিন রাতে মাছ হয়েছিল। খোকাদার আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে পুরণ (খোকাদার কাজের লোক) আমাকে খেতে দিল। বাইরের ঘরে বই পড়ছিলাম, খাবারটা রেখে পুরণ বলল, 'বিবিজী, খানা খেয়ে নিন।' আমি খাবারে হাত লাগাবার আগেই কোথা থেকে একটা হুলো এসে মাছটা মুখে নিয়ে চলে গেলো। আমরা দুজনেই হতভম্ব! চুপ করে বসে আছি। এরমধ্যে কখন খোকাদা এসেছেন খেয়াল করি নি। আমাকে বসে থাকতে দেখে খোকাদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' ভাবলেন হয়ত পুরণ এমন রান্না করেছে যা আমি খেতে পারছি না। পুরণ বলল, 'বাবুজী, বিল্লী মাছ নিয়ে গেছে।' খেতে বসে বই পড়ার জন্য খোকাদা আমাকে বকলেন, তারপর বললেন, 'তুই খেয়ে নে, তারপর দেখছি।' কী আর দেখবেন! এতক্ষণে মাছ বেড়ালটার হজম হয়ে গেছে। কিন্তু বেড়ালটার অদৃষ্ট মন্দ, না হলে আবার কেন সে এখানে ফিরে আসবে। সুলেখা তখন শুয়ে পড়েছে; বাইরের ঘরের সব জানলা-দরজা খোকাদা বন্ধ করে নিজে খেতে বসলেন একটা ছাতা নিয়ে। আমি ভাবতে পারছিলাম না, খোকাদা কী করে জানলেন বেড়ালটা আবার ফিরে আসবে। খোকাদার অনুমান মিথ্যে হলো না। বেড়ালটা ঢুকতেই সেকি ছাতারবাড়ির মার! আমিও খুব উত্তেজিত হয়ে বেড়ালটার পেছনে ছোটাছুটি করতে লাগলাম। পাশের ঘর থেকে সুলেখাও চিৎকার শুরু করে দিয়েছে। কে কার কথা শোনে; আমরা ভাইবোন তখন বেড়াল মারতে ব্যস্ত।

এইরকম আর একটি ঘটনাও আমার মনে পড়ছে। গরমকালে দিল্লিতে কুলপি মালাই তখন বিখ্যাত। সিদ্ধিও পাওয়া যেত। ওখানকার কুলপিতে কিসমিস-বাদাম পেস্তা দেওয়া থাকতো। এখন পাওয়া যায় কিনা জানি না। সামনের উঠোনে বসে আমরা তিনজন কুলপি খাচ্ছিলাম। পাঁচিলের গায়ে একটি নিমগাছ ছিল। খোকাদার নজর গেল নিমগাছের মগডালে একটা বেড়ালের দিকে। ছোট্ট একটা পাথর তুলে ছুঁড়ে মারলেন। আমাদের ধারণা ছিল অত উঁচুতে মারতে পারবেন না। বেড়ালটা উঠোনে পড়ে যেতে বুঝলাম, খোকাদার লক্ষ্য নির্ভুল।

সুলেখার জেঠতুতো দাদা দিল্লিতে এলে খোকাদার রাত্রে ফিরতে দেরি হতো। সেদিনও রাত হচ্ছিল। আমি আর সুলেখা বসে ছিলাম। রাত বাড়ছিল। ভয়

পেয়েছিলাম খুব। সুলেখা বলল, 'বাবার ওখানে খবর দেবো?' আমি আর একটু দেখার কথা বললাম। রাত প্রায় বারোটার সময় সুলেখার ড্রেসিংরুমের দরজায় টুকটুক করে শব্দ হল। দরজা খুলে দিতে একমুখ হেসে খোকাদা ঢুকলেন। বুঝলাম, ব্যাপারটা সুবিধের নয়। জামা-কাপড় ছাড়িয়ে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হলো। তারপর খোকাদার হাসি আর লেকচার শুরু হলো। মাঝে মাঝে বীথি বীথি (খোকাদার বড় মেয়ে) বলে ডাকতে লাগলেন। সুলেখা আমাকে বলল, 'বাবাকে ডাকলে হতো না!' তখন কিন্তু পুরো জ্ঞান আছে বাবুর! আমি বললাম, 'না না ডেকো না।' আমি একটু দুধ দিতে বললাম, বেশ বাধ্য ছেলের মতো দুধ খেলেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যে বমি শুরু হলো। সে রাতে আমার আর সুলেখার ঘুম হলো না। আমি জল ঢেলেছি আর সুলেখা ঝাঁট দিয়ে বমি পরিষ্কার করেছে। পরদিন খোকাদার দুই বন্ধু খুড়ো আর খুচুবাবু এলেন খোকাদা কেমন আছে দেখতে। সুলেখা ওঁদের সব কথা জানালে ওঁরা খুব হাসতে লাগলেন। দুধ খাইয়েই নাকি বমি হয়েছে, বললেন তারা। খোকাদা ওঁদের বাড়িতেই ছিলেন।

দিল্লিতে দোলের সময় সকালের দিকে সবাই খুব দোল খেলেন, আর বিকেলে সবাই সিনেমায় যান। হাউসফুল থাকলে ক্ষতি নেই, বাড়তি চেয়ার দিয়ে দেয়। সুলেখার বাপের বাড়িতে খুব রং খেলা হয়, মা-ছেলে-মেয়ে সবাই রং খেলেন। শুধু সুলেখার বাবা আর খোকাদা রং খেলেন নি। অবশ্য রং-এর হাত থেকে খোকাদা শেষ পর্যন্ত রেহাই পান নি। ওর ছাত্ররা এসেছিল। ওঁদের আসতে দেখে খোকাদা আমাকে বললেন, 'বলে দিস বাড়িতে নেই।' বলে দরজার পাশে চলে গেলেন। ওরা এসে প্রফেসরের খোঁজ করলো; এমন ভাব করলাম যে ওদের কথা আমি বুঝতে পারছি না। গোলমাল বাঁধাল সুলেখার কুকুর তুতু। ও ভেবেছিল, খোকাদা যেমন ওর সাথে লুকোচুরি খেলেন তেমনি খেলছেন। তুতু গিয়ে ছাত্রদের হাতে খোকাদাকে ধরিয়ে দিল। হৈ-হৈ করতে করতে তারা প্রফেসরকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে চলে গেল। আমরা ছোটো থেকে শীতকালে গরম জামা ব্যবহার করতাম না, একটা চাদর হলেই চলে যেত। দিল্লির ওই প্রচণ্ড শীতেও আমি একটা চাদর গায়ে দিতাম, ঠাণ্ডা জলে চান করতাম। খোকাদা একদিন খুব রেগে গিয়ে নিজের গায়ের গরম জামা খুলে ফেলে দিলেন। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই হাঁচি শুরু হল। পরপর অনেকবার হাঁচার পর আমি খোকাদার গরম জামাটা এনে দিয়ে বললাম, 'এটা পরে নাও। তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে।' আজ লিখতে বসে শুধু মনে পড়েছে তাঁর স্নেহভরা মুখের কথা। শুধু খোকাদার কথা নয় আমার দাদা গাবুদার কথাও। দিল্লির স্মৃতি আমি কোনদিনও ভুলি নি। ওখানে না গেলে আমি খোকাদাকে চিনতে পারতাম না।

১৯৪৪-র আগস্ট-এ আমার বিয়ে হয়ে যায়। দাদাই ভদ্রলোকের সন্ধান পান

আমার এক মাসীর কাছে। পরবর্তীকালে তিনি আমার জা হন। ওঁরই ভাসুর শিল্পী সূর্য রায়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়। ছুটি পাননি বলে খোকাদার আমার বিয়েতে আসা হয় নি। যোগাযোগটা এরপর ক্ষীণ হয়ে আসে : তবুও কলকাতায় এলে দেখা করতে যেতাম। আমাদের বাড়িতে অনেক বিখ্যাত লোক তখন আসতেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের বাড়ির সবাই ঘনিষ্ঠভাবেই মেশেন। তবুও আমি জানি, আমার কাছে আমার দাদাদের মতো বিখ্যাত আর কেউ নয়। আমার স্বামী যখন বলতেন. 'তোমাকে বিয়ে করেছি তুমি সমর সেনের বোন বলে' তখন গর্বে আমার চোখে জল আসত। লোকে আমাকে অহংকারী বলে, বাড়ির লোককেও বলতে শুনেছি। আমারই তো অহংকার করা সাজে—আমার কাছে কিছুই হারিয়ে যায় নি। আজও চোখ বুজলে আমি যেন দেখতে পাই সুইন হো স্ট্রিটের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়তেই খোকাদা দরজা খুলে আমাকে দেখেই একমুখ হাসি নিয়ে বলেন, 'তুই ?' তারপর সুলেখাকে ডেকে বলেন, 'সুলেখা টুনু এসেছে।'

কিরণময় রাহা

সমর সেন

বহু বছর আগে সমরবাবু একটা উপকার করেছিলেন ; সেটার উল্লেখ করছি উপকৃত হয়েছিলাম বলে নয়, সেইসূত্রে ওঁর চরিত্রের সামান্য আভাস পেয়েছিলাম বলে। ছাত্রাবস্থায় পরিচয় ছিল না বললেই চলে। সিঁড়িতে বা করিডোরে বা কচিৎ-কখনো বসন্ত কেবিনে দেখা হলে 'কেমন আছেন', 'কী খবর' জাতীয় কথা বলে বা কিছু না বলে একটু হেসে এড়িয়ে গেছি, উনিও তাই করতেন। নাম করা ছাত্র, তার উপর কাবখ্যাতি, সুতরাং আমার পক্ষে এড়িয়ে যাবার যথেষ্ট কারণ ছিল।

আর পাঁচজন অল্পবয়সী ও স্বল্পবুদ্ধি বাঙালি মধ্যবিত্তর মতো যৌবনের চৌকাঠে কবিতা লেখার উদগ্র বাসনার বশে, মনে পড়ে, কাবতা লেখার চেষ্টা করতাম। হালফিলের বাংলা-ইংরাজি কবিতা পড়া ও না বোঝার বদহজমের ফলে মনে করতাম সেইসব লেখায় বেশ "আধুনিক" হওয়া যাচ্ছে। তার থেকে দুটো "কবিতা" পত্রিকার সম্পাদককে পাঠিয়েছিলাম প্রকাশের জন্য। সমর সেন সেই সময়ে সম্ভবতঃ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। কবিতা দুটোর সঙ্গে সমরবাবুকে কায়দা করে একটা চিঠি লিখেছিলাম। লেখা দুটোর উল্লেখ না করে, 'কেমন আছেন' জাতীয় অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখেছিলাম ; প্রকারান্তরে পরিচয় আছে বা ছিল জানিয়ে দিতে চাইছিলাম আর কি। সমরবাবু সে চিঠির কোন উত্তর দেননি, কবিতা দুটো ছাপা হয়নি বলাই বাহুল্য। এই নীরব উপেক্ষায় তখন সম্ভবতঃ রাগ হয়েছিল, কিন্তু পরে বুঝেছি কাব্যচর্চার চেষ্টা থেকে তখনই বিরত করে উনি অশেষ উপকার করেছিলেন।

তিরস্কার নয়, তাচ্ছিল্য নয়, উপদেশ নয়, কম বলে অথবা একেবারেই কিছু না বলে আর প্রয়োজনবোধে স্বল্পতম কথায় ব্যঙ্গোক্তি বা মূলে যাওয়া—অপছন্দ অথবা সমালোচনা করার এই ধরন, যার আঁচ চিঠির উত্তর না পাওয়ায় অস্পষ্টভাবে পেয়েছিলাম কতকাল আগে, সেটা শেষ অবধি বদলায় নি। গল্পে, আড্ডায় কখনো দেখিনি অধৈর্য বা উত্তেজিত হতে ; অথচ লেখায় যে শাণিত কশাঘাতের উদাহরণ পাই, তার গভীরে যে-মানসিকতার পরিচয় অনুমান করা অযৌক্তিক নয়, তাতে অধীরতা বা উত্তেজনা থাকারই কথা। অনেককিছু সম্পর্কে বিরক্ত এমন কি তিক্ত মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি বহুবার, বহু সময়ে। কিন্তু তার উচ্চগ্রাম প্রকাশ যে লেখায় বা কথায় হতো না তার ব্যাখ্যা হিসেবে সংযম, সাহিত্যবোধ, বুদ্ধি, আত্মপ্রত্যয়, স্বাভাবিক শালীনতা ইত্যাদি কথাগুলোকে বেশি সরল মনে হয়। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা বা কারণ খোঁজার চেষ্টা না করাই

ভাল। সমরবাবু সম্পর্কে শুধু এটাই মনে হয় যে সাধারণ কথায় এমন কি গম্ভীর আলোচনাতেও এত মৃদুভাষী ও পরমতসহিষ্ণু কোন লোককে লেখায় ও জীবনে নিজের জায়গায় ও প্রত্যয়ে স্থির থাকায় এত নির্মম হতে আমি কম দেখেছি।

সমর সেনের সাহিত্যদৃষ্টি বা রাজনীতি নিয়ে কিছু লেখার এক্তিয়ার আমার নেই। তবে যখন লিখতে শুরু করেন তখন ওঁর কবিতা (অবশ্যই যা প্রকাশিত হত) পড়তাম আর এই দীর্ঘ কালের মধ্যে মাঝে মাঝে পড়া কবিতা আবার পড়েছি। অনেকেরই অভিমত বাংলা কাব্যসাহিত্যে ওঁর স্থান যথেষ্ট উঁচুতে। ওঁর কবিতা নিয়ে কিছু লেখা হয়েছে, একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মনে হয় ওঁর কবিতা ও সাহিত্যপ্রতিভার, অপক্ষপাত মানদণ্ড ও নির্মোহ দৃষ্টিতে আলোচনার অবকাশ আছে। তা করার শক্তি ও অধিকার যাদের আছে তাঁদের কেউ যদি মনোনিবেশ ও সময় দিয়ে এটা করেন তাহলে মূল্যবান কাজ হবে। একই ভাবে সমরবাবুর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংবাদিকতার সবিস্তার পর্যালোচনাও মনে হয় প্রয়োজনীয় কাজ, সমসাময়িক বাঙালির সামাজিক ইতিহাসের জন্যই প্রয়োজন, সমর সেনকে মূলতঃ সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই পরের যুগের লোক মনে রাখবে আমার এই ধারণা যদি ঠিকও হয়, তাহলেও প্রয়োজন।

সমরবাবুর গুণগ্রাহীদের মধ্যে এতো বিভিন্ন আপাতবিরোধী চরিত্র, মতাবলম্বী, বয়স, সামাজিক অবস্থান ও স্বভাবের লোককে সমাবিষ্ট হতে দেখে অনেকেরই এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই মনে এসেছে, ওঁর অপ্রখর ব্যক্তিত্বর কোন্ গুণে আকৃষ্ট হয়ে এত বিচিত্র, বিপরীত স্বভাবের লোক ওঁর কাছে আসত? বন্ধুত্বর আকর্ষণে, শ্রদ্ধাশীল হয়ে, নানা কাজের জন্য, স্বার্থের প্রয়োজনে, নিছক সময় কাটানোর জন্য—ইত্যাদি কারণগুলো উত্তর হিসেবে সহজ কিন্তু তেমন সন্তোষজনক নয়। উনি কি ব্যবহারে বিন্দুমাত্র তারতম্য না এনে সবাইকে মেনে নিতে পারতেন যা করতে হলে ভান করতে হয় আর চারিত্রিক নিজস্বতা ও দৃঢ়তা বজায় রাখা মুস্কিল? অথচ জীবনের নানা অবস্থান্তর ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও তাঁর আচরণে কখনো দৃঢ়তার অভাব বা ভান দেখা গেছে এমন কথা নিশ্চয়ই কেউ বলবে না।

যুগ যেরকম ভাবে পালটে গেছে আর যাচ্ছে, তাতে যথেষ্ট ভবিষ্যৎ দৃষ্টি, চাতুর্য আর নিরাপদ দূরত্ব রেখে "প্রগতিশীল" হয়ে যারা আখের গুছিয়ে নিতে না পেরেছে সেই বর্ষীয়ানদের পক্ষে জীবনযাত্রা এমন কি জীবনধারনও বর্তমানে সহজ নয়। সমরবাবুর পক্ষে সেটা যে কত শক্ত ছিল তার মাত্রাটা সম্ভবতঃ অনেকেরই অনধিগম্য। মাঝে মাঝে সমরবাবুর কথাবার্তায় সেটা যে প্রকাশ পেত না তা নয়, কিন্তু সেটা প্রকাশ করতেন ছোটখাটো অসুবিধা বা তুচ্ছ কিছু ঘটনার উল্লেখ করে। মনে হয় যৌবন শেষ হবার আগে যিনি নিজের হতাশাকে ব্যঙ্গ করে অনেক অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তি লিখতে পেরেছিলেন অনবদ্য ভঙ্গিতে, তাঁর পক্ষে যৌবনোত্তর কালে, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যের সীমানায়, যখন জীবনযাত্রার আর

'ফ্রন্টিয়ার' চালানোর প্রতিকূল অবস্থা চরমে, তখন কেবলমাত্র কিছু তুচ্ছ অসুবিধার কথা মাঝে মাঝে বলাটা, সেই একই ভঙ্গিতে বর্তমান সমাজ ও ব্যবস্থা সম্পর্কে ওঁর মন্তব্য। এই রীতি ও ভঙ্গি, লেখায় ও জীবনে, একান্তই সমর সেন-এর। এবং অনন্য।

মৃত্যুর পর শোকসভা, পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা কতটা সমরবাবুর পছন্দের হতো বলতে পারি না। মনে হয় অপছন্দই করতেন। ওঁর জীবদ্দশায় ড. অশোক মিত্র তবু শ্রদ্ধাজ্ঞাপক প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে আমাদের সবাইকে ঋণবদ্ধ করেছেন, আমাদের বিবেকদংশন কিছুটা প্রশমিত করেছেন। বইটা বার হওয়ায় সমরবাবুর নিজের কেমন লেগেছিল জানতে ইচ্ছে করত। আমার ধারণা, অসুখী হন নি, আবার উচ্ছ্বসিতও হন নি। বেশ কিছুদিন পরে একবার জিগ্যেস করায় বলেছিলেন: "এত পরিশ্রম আর খরচা, এককালে কয়েকটা কবিতা লিখেছি আর একটা খুচরো সাপ্তাহিক চালাই বলে?" পরিশ্রম আর ব্যয়টা বেকার বা নিষ্প্রয়োজন বলেননি। কিন্তু বলার ধরনে মনে হয়েছিল হয়তো বলতে চেয়েছিলেন তাই। "খুচরো" শব্দটার ব্যবহার ভুলিনি কারণ পরে ওটার খেই ধরে কিছু অসংলগ্ন কথা মনে এসেছিল। সে যাক্, উত্তরে এটা বলা হয়নি যে প্রয়োজনটা কবিতা লেখা বা সাপ্তাহিক চালানর জন্যই নয়, আরো কারণ ছিল, দায় ছিল। প্রসঙ্গত, পরে একবার জিগ্যেস করেছিলাম বইটা কেমন লেগেছে। বলেছিলেন, মনে পড়ে, "বেজায় কঠিন সব প্রবন্ধ ; আজকাল এত শক্ত লেখা হয়, বুঝতেই পারি না তাই পড়াও হয় না"।

সমরবাবুর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সংখ্যা কম নয়। তাঁরা ওঁকে নিশ্চয়ই নানাভাবে দেখেছেন। যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না, তাদের সংখ্যাও কম নয়। তারাও, ধরে নিচ্ছি, ওঁর সম্পর্কে নানা ধরনের মতামত পোষণ করেছেন। সেইসব মতামত ও ধারণা যোগাড় করার চেষ্টা প্রশংসনীয় উদ্যম সন্দেহ নেই, কিন্তু কতটুকু বা জানা যাবে এই অসাধারণ লোকটিকে। একটা কথা নিশ্চিত বলতে পারি— কিংবদন্তী হওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা সমর সেন-এর ছিল না।

রাম হালদার

আমার দেখা সমর সেন

সে প্রায় পঞ্চাশ বছরেরও আগেকার কথা। প্রতিদিন সকাল সাড়ে ন'টায় প্রফেসর অরুণ সেন সিগারেট টানতে টানতে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ট্রাম রাস্তার দিকে যেতেন কলেজে যাবার জন্যে। ঠিক তার দশ গজ পিছনে একটি সুশ্রী যুবক বার্মা চুরুট মুখে দিয়ে যেতো। তখন সমর সেনকে আমি চিনতাম না। পাড়ার লোকেরা বলত বখাটে ছেলে।

পুরো বেহালাতেই তখন ছিল একটা গ্রাম্য পরিবেশ। মোটামুটি প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনত। ক'টা বাড়িই-বা ছিল! এই তো আমাদের বাড়ি, তারপর পুকুরপারে বাঁশবনের পশ্চিমে চ্যাটার্জী-দের বাড়ি। ঐ বাড়িতে আগে বিনোদ-বিহারী থাকতেন। ওঁরাই আর এক চ্যাটার্জীদের কাছে বাড়িটা বিক্রী করেন। তারপর ছিল দেবী রায়-দের লাল বাড়ি আর আরও দু-একটা এমনি বাড়ি। লাল বাড়িটার উল্টোদিকে এক রায় সাহেবের বাড়ি। চারদিকে খালি গাছপালা আর জঙ্গল। সেই সময়ের বহু বছর পরে সমর সেন বেহালায় পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে এসেছেন, ব্রাহ্ম সমাজ রোডের যে-বাড়িতে প্রফেসর অরুণ সেন থাকতেন সেই বাড়িতে। দীর্ঘদিন আগে বেহালা থেকে চলে গিয়ে অন্য অনেক জায়গায় বাস করেছেন। এদিকের সঙ্গে কোন যোগাযোগ, যাতায়াত একেবারেই নেই। বেহালার নতুন চেহারা দেখে আমাকে বললেন, 'এ কি করেছেন সেই বেহালার!' আমি বললুম, 'আমরা করেছি'? উনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'তবে কারা!' 'আপনারা, মানে বাঙালরা'—আমার সাফ জবাব।

স্কুলে যেদিন হাফ-ডে ছুটি হয়ে যেত সমরবাবুর দুই ভাই লালু ও কালুর সঙ্গে ওদের বাগানে গিয়ে পেয়ারা গাছে উঠতাম, জামরুল গাছে উঠতাম, মাছ ধরা হতো। একদিন পেয়ারা গাছে বসে পেয়ারা খাচ্ছি, এমন সময় সেই সুদর্শন যুবকটি বন্ধু লালুকে ফরমাস করলেন এক প্যাকেট সিগারেট এনে দিতে। লালু বলল, 'এই তো কিছুক্ষণ আগে এক প্যাকেট এনে দিয়েছি!' উনি বললেন, 'বাবা বার বার চাকর পাঠিয়ে আমার কাছ থেকে সব সিগারেট নিয়ে নিয়েছেন।' সেদিনই জানা গেল উনি সমর সেন ওরফে খোকাদা। আমি খোকাদা বলেই জানতাম।

তখন ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদের বেহালা হাই-ইস্কুলে দুপুরের দিকে প্রায়ই চলে আসতেন। আর যে-কোন ক্লাসে ঢুকে পড়াতে শুরু করতেন। দারুণ গ্রীষ্মেও গলাবন্ধ কোট, কম্ফর্টার, গরম মোজা, বুট জুতো পরে আসতেন ইস্কুলে। আমরা বোধহয় তখন ক্লাস সেভেনের ছাত্র। সে সময় তিনি একদিন আমাদের ক্লাসে ঢুকলে

ক্লাস-টিচার সঙ্গে সঙ্গে ওঁকে চেয়ার ছেড়ে দিলেন। উনি পড়াতে আরম্ভ করলেন। আমার যতদূর মনে আছে—'চন্দ্রাবতীর আখ্যান' পড়াতে শুরু করেছিলেন। কিছুক্ষণ পড়াবার পরই—ওঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকল। একে ঐ দুর্বোধ্য ভাষা, তার উপরে চোখের জল, ক্লাস-শুদ্ধ ছেলেরা হাসতে আরম্ভ করল। উনি সে সব দিকে নজরই দিতেন না, পড়েই চলতেন, আখ্যান শেষ না হওয়া পর্যন্ত। তারপরই উঠে চলে যেতেন। এইভাবে প্রায়ই ফার্স্ট ক্লাস থেকে ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত যে-কোন ক্লাসে এসে উনি পড়িয়ে যেতেন!

প্রফেসর অরুণ সেন তখন থাকতেন সাগর মান্না রোডের বাড়িতে যেটা সবাই জানত দীনেশ সেনের বাগানবাড়ি বলে। বেহালায় প্রথম এসে এইখানেই থাকতেন দীনেশচন্দ্র। পরে দীনেশচন্দ্র ডায়মণ্ড হারবার রোডের ধারে রূপেশ্বর বলে একখানা বাড়ি তৈরি করান। বাড়ির সামনে, মনে আছে, একটা বাঁসের বডি বসিয়ে দেন। তার ভিতরে বইপত্র থাকত আর নিজে পড়াশোনা করতেন।

দীনেশচন্দ্রের আর এক নাতি, যার ডাক-নাম গোপাল (অধ্যাপক বিনয় সেনের বড় ছেলে) দাদুর খুব প্রিয়পাত্র ছিল। গোপাল আমাকে প্রায়ই টিফিনের সময় বাঁসের বডি দিয়ে তৈরি রূপেশ্বর কুঞ্জে নিয়ে যেত ও বইপত্র দেখিয়ে বলত, 'কোন্‌টা নিবি, নে।' সেখানে ওর দাদুর বইই অধিকাংশ থাকত। আমি তার মধ্যে থেকে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'টা নেওয়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। গোপাল অমনি একটা কাগজে মুড়ে আমাকে বইটা দিয়ে বলেছিল, 'এক্ষুণি চলে যা।' এই বলে ঐ জায়গাটা অন্য বই দিয়ে ভরাট করে দিয়েছিল।

আমরা ম্যাট্রিক পাশ করার পর খোকাদারা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে উঠে যান। সেই সময় থেকে বহুদিন পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন। লালু-কালুর সঙ্গেও আজ তেমন যোগাযোগ নেই। সমর সেনের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ হলো—উনি তখন স্টেট্সম্যানের সঙ্গে যুক্ত। নতুন করে সম্পর্কটা তৈরি হলো। আমি যে লালু-কালুর বন্ধু সে-কথা তখন উনি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। আমাকে তখন উনি জানতেন কমলালয় স্টোর্স ও ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত বলে। আরও আশ্চর্যের কথা, আমি ওঁর থেকে বয়সে ছোট হলেও আমাকে সমানভাবে দেখতেন। তখন সমর সেনের কবিতার যুগ। আমি যদিও কবিতার কিছুই বুঝি না, কিন্তু লক্ষ করতুম সারা কলকাতা যেন সমর সেনের কবিতা নিয়ে মেতে উঠেছে। এমন কি বিনয় ঘোষের মত আপাতগম্ভীর মানুষের মুখেও শোনা যেত 'মধুপুরী মেয়ে' ও 'মহুয়ার দেশ' কবিতার পংক্তি। 'মহুয়ার দেশ' কবিতাটা এখনও আমার কিছু কিছু স্মরণে আসে। বিশেষত যেখানটায় আছে:

> অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
> সমস্ত ক্ষণ সেখানে পথের দু ধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,

আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

সমর সেনের কবিতা কলেজের ছাত্র থেকে সমস্ত বুদ্ধিমান পাঠকের কাছে আজও একই আবেদন নিয়ে আসে। এতটুকু ম্লান হয় নি। অথচ কতকাল আগে উনি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন! তাঁর কবিতার মূল্যায়ন কিংবা আলোচনা করা আমার সাধ্যের অতীত। সেই জন্যে কবিতা সম্পর্কে কিছু বলা উচিত মনে করি না। উনি আমাদের কমলালয় স্টোরের বইয়ের কিংবা চায়ের দোকানে কদাচিৎ আসতেন। ওঁদের আড্ডা ছিল সেণ্ট্রাল এভিনিউ-র কফি হাউস। ওখানে সে-যুগের অনেক বুদ্ধিজীবী ও প্রতিভাবান মানুষ একত্র হতেন। সেই জমায়েতের এককোণে বসে উনি কফি খেতেন। তাঁর টেবিলে যাঁরা বসতেন তাঁরাই কথা বলতেন। সমর সেন শুনতেন বেশি. বলতেন খুব কম। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ওই আসরে যোগ দিতুম।

সমর সেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয় উনি রাশিয়া থেকে ফিরে আসবার পর। স্টেটসম্যানের অত ভালো চাকরি ছেড়ে কেন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন প্রশ্ন করা হলে উনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে উত্তর দিয়েছিলেন—মদ খেতে। স্টেটসম্যানের কাজে আবার যোগদান না করার কারণ কি জানি না; তবে মনে আছে কিছুদিন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সে-কাজও ছেড়ে দেন।

সেই সময় বামপন্থীমহল ওকে খুব একটা ভালো চোখে দেখতো না। উন্নাসিক, ডেকাডেণ্ট, ইত্যাদি আখ্যা দিত। সরোজ দত্ত-র সঙ্গে এই নিয়ে লেখালেখি অনেকেরই জানা আছে। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন বলে মনে করি। মনে আছে, এই সময় সমরবাবু ও তাঁর অন্যান্য ভাইয়েরা প্রতি শনিবার অফিস ছুটির পর লাইট-হাউস ব্র্যাসারিতে মিলিত হতেন ও একসাথে বিয়ার খেতেন। মাঝে মাঝে সেই আসরে আমিও গিয়ে হাজির হতাম ওঁর ভাইদের অনুরোধে। ওঁদের ভাইদের মধ্যে যে-মিল, যে-বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দেখেছি তা আর কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। ওঁদের ভাইদের মধ্যে এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। সমরবাবুর বড় ভাই অমলদা ছিলেন অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। তিনি সব ভায়েদের বন্ধুভাবে দেখে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। ওঁর বাড়িতে রবিবার সকালে সব ভায়েরা ও কিছু বন্ধুবান্ধব গিয়ে জমায়েত হতো ও চলত প্রচণ্ড আড্ডা। বিনয় ঘোষ ও আমি মাঝে মাঝে সে-আড্ডায় যোগ দিতাম: অমলদা কী ধরনের মানুষ ছিলেন শুধু একটি দৃষ্টান্তের কথা বলি। একদিন সন্ধ্যের পরে আমি পার্ক স্ট্রীটের অলিম্পিয়াতে ঢুকি। ঢুকে দেখি একটা টেবিলে অমলদা, ওর মেজো ভাই গাবুদা

ও সমরবাবু বসে আছেন। আমি একটা ফাঁকা টেবিলে বসতে যাচ্ছি দেখে উনি আমাকে ডেকে ওঁদের টেবিলে যোগ দিতে বললেন। আমি যেতেই সমরবাবু অমলদাকে বললেন, 'ইনি হচ্ছেন বেহালায় লালু-কালুর ছেলেবেলার খেলার সাথী।' একথা শুনে অমলদা আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তুমিও তাহলে আমার ভাই। আমার পাশে বোস, কী খাবে বল।'

সমরবাবুর বন্ধুদের মধ্যে চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, অশোক মিত্র (I.C.S.), কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবদাসের দেবু চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে চঞ্চলবাবুর সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল. কারণ তাঁরা একসময়ে ছিলেন প্রতিবেশী। এঁরা দুজনে ওঁদের অপর প্রতিবেশী বিষ্ণু দে-র-বাড়িতে কিভাবে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শোনবার জন্যে হানা দিতেন তার বৃত্তান্ত সমরবাবু নিজেই 'বাবু বৃত্তান্তে' লিখেছেন। সেই সময়ের আরও সব ঘটনা যা চঞ্চলবাবুর মুখে শুনেছি, এখানে উল্লেখ না করাই ভালো। শেষ দিন পর্যন্ত সমরবাবু এঁদের সঙ্গে সু-সম্পর্ক রেখে ছিলেন।

'বাবু বৃত্তান্তে' তিনি নিজের পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত না বুঝতে পারার কথা যা লিখেছেন সেটা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আত্মপ্রচার বিমুখতার থেকে। আসলে পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর যথেষ্টই জ্ঞান। চঞ্চলবাবুর মত বোদ্ধা ও বিষ্ণু দে-র মত পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সুরসিক সমঝদারও জানতেন সেকথা। প্রথমবার রাশিয়া থেকে ফিরে আসবার সময় যেসব রেকর্ড তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তা রীতিমতো বোদ্ধা ছাড়া সংগ্রহ করতে সমর্থ হবেন না। বোধ হয় আমাদের দেশে খুব কম লোকের সংগ্রহেই ঐ সমস্ত কিংবা ঐ ধরনের রেকর্ড আছে।

মনে আছে প্রতি-শনিবার সন্ধ্যায় সমরবাবু ও আরও কয়েকজন সুনীল জানার বাড়িতে এই সময়ে মিলিত হতেন। সেখানে ওঁরা একসঙ্গে পান করতেন। বিনয় ঘোষের সঙ্গে আমি মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম। পি. সি. যোশী ও চিত্রশিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে ওখানে আমার পরিচয় হয়েছিল।

অনেকেরই হয়ত জানা নেই—বিশেষ করে সমরবাবুকে যারা উন্নাসিক বা ডেকাডেণ্ট মনে করতো সে-যুগে, তাদের—যে সমরবাবু সুইনহো স্ট্রিটে যে-বাড়িতে থাকতেন তার পাশের বাড়িতেই থাকতেন স্নেহাংশু আচার্য। সেখানে প্রতিদিন নাহলেও সপ্তাহে দু-একদিন কয়েকজন জমায়েত হতেন। তাঁদের মধ্যে সমরবাবু ছাড়া স্নেহাংশু আচার্য ও অশোক মিত্র (I.C.S)-এর কথা বেশ মনে পড়ে। রাধারমণ মিত্রের সঙ্গে ওঁরা মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করতেন, একথা রাধারমণ বাবুর কাছ থেকে আমি শুনেছি।

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকা ছাড়ার পর থেকেই সমরবাবুর ইচ্ছে ছিল একখানা পত্রিকা বের করবার। সেই সময় হুমায়ুন কবীর একটা ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে আগ্রহী হন। কবীর সাহেবই সমরবাবুকে সম্পাদনার ভার নিতে

বললে সমরবাবু রাজি হয়েছিলেন। পত্রিকাটি অধুনালুপ্ত *Now*। গণেশ এভিনিউ-এর যেখানে আতাউর রহমান থাকতেন সেখান থেকেই 'চতুরঙ্গ' প্রকাশিত হতো। *Now*-এর অফিস ওখানেই হয়েছিল। আতাউর আমাকে একদিন কমলালয় স্টোরে বলেছিলেন, 'আমরা একজন উপযুক্ত লোক পেয়েছি পত্রিকা-সম্পাদনা করার। সমরবাবু অফিসে বসছেন জেনে আমি একদিন দেখা করতে যাই। আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কবে থেকে পত্রিকা বেরোচ্ছে। উত্তরে বললেন, 'এখনও পত্রিকা প্রকাশের ডিক্লারেশন পাওয়া যায় নি। যে-নামই পাঠাই সে-নামই বাতিল হয়ে যায়। শেষে *Now or Never* এই নাম দিয়ে পাঠাই। *Now* নামটা গ্রাহ্য হয়েছে এবং প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে।' সমরবাবু যতোদিন *Now*-এর সম্পাদক ছিলেন, ততোদিন পত্রিকাটি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এক বছরের ওপর চলার পরে ক্রমশ কবীর সাহেবের সাথে সমরবাবুর মতবিরোধ হতে থাকে, ফলে তিনি *Now* থেকে বিদায় নেন। সমরবাবু ছেড়ে দেবার পর দু-তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েই কাগজটি বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় তিনি *Frontier* পত্রিকা প্রকাশের মনস্থ করেন। *Frontier* প্রকাশের ব্যাপারে ওঁকে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়েছিল, কারণ কাগজটির জন্য কোন ফাইন্যান্সার পাওয়া যায়নি। সমরবাবুর ভাইয়েরা ও কয়েক-জন বন্ধুবান্ধব পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে আর্থিক সাহায্য করেন। তারপর থেকে *Frontier* সাপ্তাহিক হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই *Frontier* নিয়েই উনি ব্যস্ত ছিলেন।

যে-সময়ে সমরবাবুকে উন্নাসিক ডেকাডেন্ট বলা হোত, বিনয় ঘোষ তখন একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন। পরে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর মত কাগজ বের হতে খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন ও সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করেন। সমরবাবু তাঁকে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখতে বললে বিনয় ঘোষ নিয়মিত লিখতে থাকেন। এমনকি জরুরি অবস্থা চলাকালীন—যখন অনেকেই নিজেদের গা বাঁচাতে 'ফ্রন্টিয়ার' থেকে সরে গেলেন—বিনয় ঘোষ তখনও নিয়মিত লিখেছেন। আমার কেমন যেন মনে হয়, সমরবাবুর 'বাবু বৃত্তান্ত' —এই নামটির পিছনে 'কালপেঁচার' প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

সমরবাবু অসুস্থ হয়ে পি. জি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শুনে একদিন দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি তিনি চোখ বুজে একা শুয়ে আছেন। কিছু না বলে আমি পাশে রাখা চেয়ারটাতে চুপ করে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে আমাকে দেখতে পেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কেমন আছেন?' বললেন, 'এমনিতে ভালোই আছি, কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে দারুণ যন্ত্রণা, সেই সঙ্গে মাথার ভেতরেও।' কী অসুখ জানতে চাইলে বললেন অম্লান বদনে, 'লিভার অ্যাবসেস্।' সেই সঙ্গে বললেন, 'কথা বলা নিষেধ।' আমি তখন বললুম, 'আর কথা বলবেন না, আমি কিছুক্ষণ থেকে চলে যাব।' তিনি একথা শুনেও বলে যেতে লাগলেন তাঁর বড় মেয়ের আমেরিকায় মৃত্যুর ঘটনা ও নাতনিকে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অশোক মিত্র ও

লণ্ডনের অমর্ত্য সেনের সাহায্যে কী ভাবে দেশে ফিরিয়ে আনা হলো ইত্যাদি। আমি তখন আবার মনে করিয়ে দিলুম বেশি কথা না বলার জন্য, কিন্তু উনি বলেই চললেন—'কয়েক সপ্তাহ *Frontier*-এর কাজকর্ম একদম দেখতে পারি নি, কী হচ্ছে না হচ্ছে কিছুই জানি না।' আমি বললুম, 'ওসব এখন থাক। আপনি আগে সেরে উঠুন তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে।' এই কথা বলে আমি চলে আসি।

প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড অশোক মিত্র সমরবাবুর চিকিৎসার জন্য ক্যালকাটা হসপিটালের কোঠারি সেণ্টার ও ডঃ কে এন জালানের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। সম্ভবত তাঁর কাছ থেকেই ডঃ জালান সমরবাবুর সম্যক পরিচয় পেয়েছিলেন। ফলে সমরবাবুর চিকিৎসার সমস্ত দায়িত্ব ডঃ জালান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রহণ করলেন। এ-কথা জেনে আমি খুবই আশ্বস্ত হই, কেননা এর আগে রামকিঙ্কর ও গোপাল ঘোষ অসুস্থ হলে এঁদের দুজনকেই ডঃ জালানের হাতে অর্পণ করেছিলাম। ডঃ জালান দুজনকেই সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলেছিলেন।

ক্যালকাটা হসপিটালে সমরবাবু ভর্তি হতে আসছেন শুনে আমি আমার স্ত্রীকে খোঁজ নিতে বলেছিলুম। তিনি কোঠারি সেণ্টারে গিয়ে জানলেন যে সমরবাবু সেইদিনই কিছুক্ষণের মধ্যে এসে পড়বেন। কোঠারি সেণ্টার থেকে আমার স্ত্রী আরও জেনেছিলেন যে ডঃ জালান ভর্তির সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এমন কি অ্যাডমিশন কাউণ্টারেও বলে রেখেছেন।

এমন সময় সমরবাবু তাঁর স্ত্রী ও ছোটমেয়ের সঙ্গে ক্যালকাটা হসপিটালে এসে পৌঁছলেন। আমার স্ত্রী এগিয়ে গিয়ে নিজের পরিচয় দিলেন ও সমরবাবুকে অ্যাডমিশন কাউণ্টারে নিয়ে গেলেন। ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে সমরবাবু তাঁকে বলেছিলেন, 'আমি তো টাকা-পয়সা নিয়েই এসেছি।' এই বলে তিনি পকেটের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। আমার স্ত্রী তখন সমরবাবুকে ব্যস্ত হতে মানা করেন এবং সস্ত্রীক সমরবাবুকে ডঃ জালানের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসান। ওঁদের ছোট মেয়ে তখন ভর্তির ব্যাপারে কাগজপত্র নিয়ে অ্যাডমিশন কাউণ্টারে ব্যস্ত।

ক্যালকাটা হসপিটালে ভর্তি হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই ইনভেস্টিগেশন সম্পূর্ণ হলো এবং সমরবাবুর কাছ থেকেই জানলুম যে ওঁর লিভার অ্যাবসেস হয় নি। শুনে আমরাও অনেকটা আশ্বস্ত হয়েছিলুম। ডঃ জালানের চিকিৎসায় সে-বার তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছিলেন। ডঃ জালান স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে মাঝে মাঝে বাড়িতে গিয়ে সমরবাবুকে দেখে আসতেন।

সমর সেনকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন বা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁর সঙ্গে মিশেছেন তাঁরা কেউই ওঁর গভীরতাকে অস্বীকার করতে পারবেন না। কথাবার্তায় তিনি অতি সাধারণ ও সহজ। তাঁর মনীষা শুধু যে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই ছিল তাই নয়, সবরকম শিল্পকলাতেই ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। তবু ফ্রণ্টিয়ার পত্রিকায় সিনেমা, থিয়েটার, চিত্রশিল্প ও অন্যান্য আর্ট সম্পর্কে যা কিছু লেখা হতো তা সবই অন্যরা

লিখত। নিজে কোনদিনই এইসব বিষয়ে লিখতেন না। একবার আমার অনুরোধে অধুনালুপ্ত সিনে ক্লাব প্রকাশিত *KINO* পত্রিকায় সত্যজিতের একটা ছবি নিয়ে লিখেছিলেন। ছোট্ট লেখা, কিন্তু সারগর্ভ। 'এস. এস.'—এই নাম দিয়ে লেখাটি ছাপা হয়েছিল। সে সময় লেখাটি নিয়ে অনেক আলোচনাও হয়েছিল। কে লিখেছে, এমনকি সত্যজিৎও জানতে চেয়েছিলেন সে কথা, কারণ লেখাটি বোধহয় তাঁর তেমন পছন্দ হয়নি। অনেকেই সমর সেনকে সিনিক বলে মনে করতেন। আবার কেউ কেউ বলতেন, অস্থিরচিত্ত, কারণ কোন একটা কাজে বেশিদিন তিনি লেগে থাকতে পারতেন না। গত পঞ্চাশ ষাট বছর ধরে আমি যতখানি দেখেছি তাতে মনে করি এরকম কোনভাবেই তাঁকে অভিহিত করা যায় না। তিনি ছিলেন এক অতি-সাধারণ, সরল মানুষ অথচ তাঁর মতো মানুষ আজ এদেশে বিরল।

দেবীভূষণ ভট্টাচার্য

সহপাঠী বন্ধু সমর সেন প্রসঙ্গে

ত্রিশের দশকে কবিতার জগতে সমর সেনের আচমকা আবির্ভাব, আর তৎকালীন সাহিত্যজগতে একটি আলোড়ন সৃষ্টি করে চল্লিশের দশকে নিঃশব্দ নিষ্ক্রমণ। তারপর সাংবাদিক হিসাবে পঞ্চাশের দশকে পুনরায় রাজনৈতিক চিন্তার হাটে একটি বোমা বিস্ফোরণের মতো আত্মপ্রকাশ। যেমন কবিতার বেলায়, তেমনি তার সম্পাদিত 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর বেলায় পাঠকসংখ্যা যত ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল সমালোচকের সংখ্যা। অবশ্য যুক্তিহীন বিদ্রূপকে যদি সমালোচনা আখ্যা দেওয়া যায়! ঐ ধরনের সমালোচক ছাড়া বহু সুস্থচিন্তার বুদ্ধিজীবী আছেন যাঁরা চিন্তাশীল এবং সমরের কবিতা ভালোবাসেন। কিন্তু তাঁদের কাছেও সমর ছিল একটি বিরাট জিজ্ঞাসাচিহ্ন। সমর সেন কি কমিউনিস্ট? সে কি অতিবাম বিচ্যুতির শিকার? অথবা জীবনযুদ্ধে পরাজিত হতাশার প্রতীক? সাহিত্যের জগতে, সুকুমার রায়ের ভাষায় "সব যেন বিচ্ছিরি, সব যেন খালি"-জাতীয়, অসুস্থ জীবনদর্শনের ফেরি-ওয়ালা? সমরের জীবদ্দশাতেই প্রশ্নগুলি ছিল। কোন সমালোচনা বা আক্রমণের জবাব তার কাছে পাওয়া যায়নি। আর এখন মৃত্যুর পর তো জবাব দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ওর হাতে ছিল একটি ঝকঝকে শাণিত তলোয়ার যা খাপে ঢাকা থাকত। কী কবিতায়, কী সম্পাদকীয়তে হঠাৎ হঠাৎ-ই সেটা ঝলসে উঠত এবং লক্ষ্যবস্তুর ওপর আঘাত করত। নির্মম ও অমোঘ ছিল সেই আঘাত। কিন্তু তারপর আহত লক্ষ্যবস্তুর দিকে সে ফিরেও তাকাতো না।

সাতের দশকের একেবারে শেষের দিকে একবার আমি অত্যন্ত বিরূপ এক সমালোচনার কথা তাকে জানিয়ে বলেছিলাম, 'এর উত্তর দেওয়া দরকার।' ও শুধু একটু হেসে ছোট্ট ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করল, 'whine'! তারপরই মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নেড়ে আমাকে অনুরোধ করল, 'কিছু লেখ্—আইন আদালত সম্বন্ধে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ ছাপাব।' তার সেই অনুরোধ রাখা হয়ে ওঠেনি।

আমার সঙ্গে সমরের প্রথম পরিচয় ১৯৩২ সালে। হাওড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজে এসে। ক্লাসের আলাপ কিভাবে বন্ধুত্ব ও তারপর নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হল সেটা আমার কাছেও একটা বিস্ময়। আর সে যুগের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আত্মীয়তার বন্ধনে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল হয়েছিল। সম্পর্কটা হত আমারই বোন অপর্ণার সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনি।

পরিচয়ের পর বছর দশেক কলকাতা থাকাকালীন ওর আর আমার ছুটিগুলি বেহালার বাগানবাড়ি নামে পরিচিত অরুণ সেনের বাড়ির দোতলায়, অথবা

হাওড়াতে—আমাদের বাড়িতে এবং বি. এ. পাস করার পর সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা-মার্কা একটা মেসে, একটু নড়াচড়া করলে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে, এমন-ই একটা জারুল কাঠের তক্তাপোষে কাটত। আর ছিল বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ, যার কিছুটা পরিচয় 'বাবু বৃত্তান্তে' আছে। আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতেও ও আসত প্রায়ই। লক্ষ করত নদীয়াব কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত তখনকার কৃষক আন্দোলন, যার সঙ্গে আমিও যুক্ত ছিলাম, এবং গ্রামে গিয়ে কৃষকদের ঘরে বসত।

আমাদের ছাত্রজীবনের যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সংক্ষেপে ছিল এই রকমের : ১৯২৯ নাগাদ ইংলণ্ডের প্রচণ্ড আর্থিক সংকট মুদ্রা-নীতির মারপ্যাঁচের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চেপে বসেছে। টাকার মূল্যে অস্থিরতা, দেশি কলকারখানাগুলি সব সঙ্কটাপন্ন, শহরাঞ্চলে বেকার সমস্যা ক্রম-বর্ধমান। কৃষকের ফসলের দাম তলিয়ে গেল—এর ওপর তাদের ঘাড়ে মহাজন ও জমিদারদের প্রচণ্ড বোঝা। দেনার দায়ে জমি বিক্রির হার অতীতের সমস্ত রেকর্ড ছাপাল। জাতীয় আন্দোলনের উপর তলায় চুলচেরা বিতর্ক—ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস, না পূর্ণ স্বাধীনতা! অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদী বলে পরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী যুবকদের বাংলা-জুড়ে দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, মেদিনীপুরে একের পর এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা, দার্জিলিং, কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিং, ভগৎ সিং-রাজগুরুর দুঃসাহসিক কার্যকলাপ, শোলাপুরে শ্রমিক ধর্মঘট, গাড়োয়ালী সৈন্যদের বিদ্রোহ। অন্যদিকে আতঙ্কিত ব্রিটিশ সিংহের মরিয়া আক্রমণ। বাংলাব প্রতিটি শহরে ও গ্রামে পুলিশী তাণ্ডব, প্রতি ঘরে যুবক ও ছাত্রদের ধরে অমানুষিক নির্যাতন আর গ্রামের পর গ্রাম কৃষকদের উপর পিটুনি কর। উৎপীড়নের সমস্ত মাত্রা ছাড়িয়ে যায় ১৯৩২ সালে। এই অবস্থায় কাটল আমাদের স্কুল জীবনের শেষ ক'টি বছর।

একটা ছাত্রের গুণাগুণ বিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল পরীক্ষাব খাতার নম্বর-গুলো। সেই মাপকাঠিতে আমি ভালো ছেলে ছিলাম। 'ভালো' বিশেষণটা পেতে গেলে তখন খুব একটা প্রতিভার দরকার হত না। ইউক্লিড, নেসফিল্ড, উপক্রমণিকা মুখস্থ করে উগরে দেওয়ার ক্ষমতা, আমাদের সুন্দর মাতৃভাষায় লেখা একটি প্রবন্ধের অংশবিশেষের ওপর যথেচ্ছ অস্ত্রোপচার করে সাহেবদের ভাষায় রূপান্তরিত করার ক্ষমতা, ইংলণ্ডের আলফ্রেড থেকে পঞ্চম জর্জ পর্যন্ত ও তস্য গুষ্টির বংশপরিচয় ও গুণাগুণ জানা, আমাদের দেশের ইতিহাসে অশোকের কটা হাতি ছিল, আকবর বাদশার হারেমে কটা বেগম ছিল, আওরঙ্গজেব কতগুলি হিন্দু কোতল করেছিলেন—এগুলির সঠিক বর্ণনা এবং আমরা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের গলা-কাটাকাটি করতে করতে যখন প্রায় ধ্বংসের মুখে পৌঁছেছি তখন শ্রীভগবানের কৃপায় সাহেবরা এসে দেশটাকে কী সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা করেছিল—তখনও করছে, এইগুলি লিখতে পারার ক্ষমতা, আর একটা ছয় অঙ্কের সংখ্যার সঙ্গে চার অঙ্কের সংখ্যা গুণ

করে তাকে তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে ভাগফল থেকে আবার তিন অঙ্কের একটি সংখ্যা বিয়োগ করে সঠিক উত্তরটি অল্প সময়ের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে বের করার ক্ষমতা। ব্যস! এই হলেই গেজেটে ছেলের নামের বাঁদিকে ছোট্ট একটা তারা, নামের ডানদিকে কয়েকটি অক্ষর আর তার কপালে চাঁদমামার টিপ দেওয়ার মতো 'ভালো ছেলে' ছাপ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ছেলেটাকে উঁচু ধরনের একটা আমলা হবার স্বপ্নে বিভোর করে তুলত। আর ছেলেটাও গল্পের গাধার মতো মূলোর পেছনে পেছনে আমলা হবার স্বপ্ন নিয়ে দৌড়ে বেড়াত। অবশ্য কয়েক-জনের ভাগ্যে মূলো জুটত। কিন্তু তাদের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। অধিকাংশ তারা-মার্কা ছাত্রেরই কপালে দৌড়-ঝাঁপ করাই সার হত।

আমার কপালে ঐ চাঁদমামার টিপটা থাকার জন্য কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপক মহলে একটু বিশেষ মর্যাদা পেয়েছি। দিন পনেরোর মধ্যেই অধিকাংশ ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সমর আমাদের বেঞ্চি থেকে কিছুটা দূরে বসত। রোজই তাকিয়ে দেখতাম একজন রোগা ফুটফুটে ছেলে—অত্যন্ত গম্ভীর, অত্যন্ত বিষণ্ণ ও নিঃসঙ্গ—অধ্যাপকদের বক্তৃতার দিকে কান রেখে আর হাতে একটা ছোট বইয়ের দিকে চোখ রেখে এককোণে চুপচাপ বসে আছে। আমার পাশের এক বন্ধুর কাছে ওর পরিচয় পেলাম—অধ্যাপক অরুণ সেনের ছেলে, আর রায় বাহাদুর দীনেশ সেনের নাতি। রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের নাম শুনে আমি খুব আগ্রহান্বিত হলাম ও ওর সঙ্গে আলাপ করার ইচ্ছা প্রবল হল। সুযোগও পাওয়া গেল গ্রে সাহেবের ক্লাসে। কলেজের খেলাধুলোর দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকায় তিনি প্রায়ই ক্লাস শেষ হওয়ার আগে চলে যেতেন—অবশ্য তাঁর পড়ানোর কাজটা পুরোপুরি করে। আমি একদিন নিজে থেকেই সমরের কাছে গেলাম ও নিজের পরিচয় দিয়ে পাশে বসলাম। কথা আরম্ভ করার জন্য জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি তো কিছু নোট করছেন না?' পাঠ্যপুস্তকটির নাম মনে পড়ছে না—বোধহয় Silas Marner। একটু হেসে সমর বলল, 'নোট করে আর কি করব? ওটা আমার দিন কতক আগেই শেষ হয়ে গেছে। বেশ সহজেই বোঝা যায়।' তার হাতের চটি বইটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা কি বই?' নিঃশব্দে বইটা এগিয়ে দিলে। দেখলাম এক ইংরেজ কবির বই। কবির নাম ডাবল্যু. বি. ইয়েটস। আমার দিকে তাকিয়ে সমর জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ইয়েট্‌স কেমন লাগে?' আমার দ্রুত উত্তর, 'আমি ত কবিতা-টবিতা পছন্দ করি না। এই ভদ্রলোকের নামে একটা গুজব শুনেছি—নাকি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি ইনি অনুবাদ করেছেন? আপনি কিছু জানেন?'

একটু চুপ করার পর ও উত্তর দিল, 'ওটা মনে হয় গুজবই। আপনি এই বইটা নিয়ে যান। গীতাঞ্জলির সঙ্গে কবিতাগুলো মিলিয়ে দেখবেন। দুটোর স্টাইল সম্পূর্ণ আলাদা। ভাষার জাতও আলাদা। দুটো এক হাতের বলে মনে হয় না। তবে ও ব্যাপার নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নি।'

বেশ বুঝতে পারলাম, একটা বিষয়ের অবতারণা হয়ে গেল যেখানে আমার বুদ্ধি নাগাল পাবে না। আমার কাছে তখন সব ইংরেজের লেখাই একরকম। যেমন সব চীনদেশবাসীর মুখই একরকম ঠেকে। তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গটা শেষ করার জন্যে বললাম, 'যাক্, যেই করুক, প্রাইজটা তো ঘরে এসেছে।'

প্রথম আলাপের পর ঠিকই করে ফেললাম সমর সেনের কাছ থেকে একটু দূরে থাকাই ভালো। বয়সে আমার চেয়ে একটু ছোট। কিন্তু দেখা গেল চিন্তার গভীরতা আমার চেয়ে অনেক বেশি। সে গভীরতায় পৌঁছানো আমার সাধ্যের অতীত। কিন্তু দূরে থাকা সম্ভব হলো না। সাতদিন পরে ও-ই এসে গায়ে পড়ে আলাপ করল—

'সেদিন তো বলেননি, অফিসে দেখলাম আপনি জলপানি পেয়েছেন। আপনি তো একজন 'ছাত্র তারকা'।'

কথাটা ভালো লাগার কথা। কিন্তু মোটেই ভালো লাগল না। তখন 'চিত্র-তারকা' কথাটি আমাদের ভাষায় আমদানি হয়েছে এবং সিনেমা জগতের শ্রীমতী সুলোচনা, শ্রীমতী উমাশশী দের নামের পাশে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'চিত্র-তারকা' ও 'ছাত্র-তারকা'র ধ্বনিগত মিলটা কানে কেমন যেন অস্বস্তিকর ঠেকল। কিন্তু সমর সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আমি ছাত্র-তারকাদের খুব পছন্দ করি।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন বলুন তো?' তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, 'আমার হাতখরচা প্রায়ই ফুরিয়ে যায়। তখন জলপানি-পাওয়া কোন ছেলে বন্ধু থাকলে ধার-ধোর পাওয়ার সুবিধে হয়।' এবার আমরা দুজনেই প্রাণ খুলে হাসলাম। তবে সঙ্গে সঙ্গে বেশ বুঝে গেলাম, এমন একটা ছেলের সঙ্গে, আর যাই হোক, বন্ধুত্ব হতে পারে না। কিন্তু প্রথম আলাপের বেশ কিছুদিন পর একটা ঘটনা ঘটল। যার ফলে এই ব্যবধানটা ঘুচে গেল।

আমাদের ইংরেজি ক্লাস যাঁরা নিতেন তাঁদের মধ্যে মাওয়াট সাহেব ছিলেন সবচেয়ে জনপ্রিয়। তাঁর সুন্দর বচনভঙ্গী, সুমিষ্ট কণ্ঠের পাঠ, মাঝে মাঝে অমনোযোগী দুরন্ত ছাত্রদের উদ্দেশে সরল মন্তব্য। আর ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার —যেটা স্কটিশের অধিকাংশ অধ্যাপকের মধ্যে দেখেছি—আমাদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল।

বছরে একটা দিন আমাদের কলেজের পাশ দিয়ে পরেশনাথের মিছিল যেত, দু-তিন ঘণ্টার গানবাজনাসহ এক বর্ণাঢ্য মিছিল। সে দিনটা ছিল আমাদের ক্যালেণ্ডার-বহির্ভূত ছুটির দিন। অধ্যাপকরা রোল কলের পর ছুটি দিয়ে দিতেন। আর ছাত্ররাও কলেজের আশেপাশে মিছিল দেখার জন্য ভিড় করত। তারিখটা ঠিক মনে নেই, তবে দিনটা ছিল শনিবার। আমরা কেউই বই আনিনি। ঐ দিন ছিল আমাদের টিউটোরিয়াল ক্লাস। সপ্তাহের পড়াটা লেখা এবং আলোচনা হত। অধ্যাপকরা লেখাগুলো খুব যত্ন করে সংশোধন করে খাতায় মন্তব্য লিখে দিতেন।

সেদিন আমরা মাত্র আট-দশজন ইংরাজির ক্লাসে উপস্থিত। একটু গল্পগুজব

করছি। এমন সময় হঠাৎ মাওয়াট সাহেব এসে উপস্থিত। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় বললেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, আজ আপনাদের মনটা রাস্তার দিকে পড়ে আছে। তবু আমি কিছুক্ষণের জন্য আপনাদের রাস্তার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করব। আজকে পাঠ্যপুস্তকের বাইরে কিছু একটা লেখা হোক। আপনারাই বলুন শেক্‌স্‌পীয়রের কোন্ গল্পটা আপনাদের সবায়ের জানা আছে আর ভালো লাগে ?'

সাত-আটজন একবাক্যে বললাম, 'মার্চেন্ট অব ভেনিস।'

অধ্যাপক বললেন, 'তার মধ্যে কোন সিনটা লেখার বিষয় হতে পারে ?' আমরা কয়েকজন বললাম, 'কেন, বিচারের দৃশ্যে পোর্শিয়ার যে চরিত্র পাওয়া যাচ্ছে, তাই।'

তখন অধ্যাপক মাওয়াট সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'মূল নাটকটা আপনারা কজন পড়েছেন ?'

চারজন ছাড়া সবাই হাত তুললাম। তখন তিনি লাইব্রেরি থেকে বইটা আনালেন এবং বললেন, 'একবার খুব ভালো করে শুনে নিন। তারপর লিখতে আরম্ভ করবেন। লেখার সময় আধ ঘণ্টা।'

এটা ছিল স্কুল থেকেই সকলের জানা প্রশ্ন। কুড়ি মিনিটের মধ্যেই সকলে খাতা দিলাম। সমরের লেখাটা সবচেয়ে ছোট, মাত্র দেড় পৃষ্ঠা। আমার লেখাটা ছিল তিন-সাড়ে তিন পৃষ্ঠা।

অধ্যাপক ডেস্কে বসে একটার পর একটা খাতা পড়লেন, সংশোধন করলেন, নোট করলেন। কেবল দুটি খাতা নিজের কাছে রেখে বাকিগুলো ফেরত দিলেন। প্রথম লেখাটি সমরের, তিনি সেটা পড়লেন। খুব সুন্দর ভাষায় পোর্শিয়া চরিত্রটির বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণ করে তার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলেছে। তারপর শেষ দু'লাইনে লিখেছে, 'আমরা ব্যাসানিওর জন্যে খুব দুঃখ বোধ করছি। এই রকম একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলার পাল্লায় পড়ে বেচারিকে সারাজীবন পোর্শিয়ার বাজারসরকার করতে হবে।' মাওয়াট সাহেব একগাল হেসে বললেন, 'আমিও আপনার সঙ্গে একমত।'

তারপর এল আমার লেখাটি। খুলেই বললেন, 'এই ভদ্রলোক লেখার মধ্যে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। সমস্ত বিচারের দৃশ্যটাকে বিচারের নামে একটা প্রহসন আখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, পোর্শিয়া হঠাৎ ওকালতি করতে এলেন, দয়া-ধর্ম সম্পর্কে ভালো ভালো বক্তৃতা দিলেন, তারপর আশ্চর্যের বিষয় নিজেই বিচারকের ভূমিকা নিয়ে মামলার রায় দিয়ে দিলেন। আইনের মারপ্যাঁচে চুক্তিটা বাতিল হল। তা হোক—কিন্তু শাইলকের ওপর যে শাস্তিবিধান হল তা বর্বরোচিত। এঁর সর্বশেষ মন্তব্য, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীদের বিচারের বেলাতেও এই ধরনের প্রহসনই করা হয়।' এবার অধ্যাপক সাহেব মন্তব্য করলেন, 'দুঃখের বিষয় আমি এঁকে কোন নম্বর দিতে পারছি না। কারণ উনি প্রশ্নটা ঠিকমত পড়েন নি।

কাজেই উত্তরটাও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে।' তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি কি আমার সঙ্গে একমত?'

আমি এইরকমটাই আশা করেছিলাম। কাজেই সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'আপনি ঠিকই বলেছেন, প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়নি।'

এমন সময় আমার পাশ থেকে মৃদুকণ্ঠের প্রতিবাদ শোনা গেল, 'আমি কিন্তু একমত হতে পারছি না।'

সকলে তাকিয়ে দেখি সমর সেন। মাওয়াট সাহেব তাকে প্রশ্ন করতে একটা কাগজে তিন-চার লাইন লিখে টেবিলে পাঠিয়ে দিল—

'নাট্যকার যদি দর্শকদের সন্তুষ্ট করার জন্য অপ্রাসঙ্গিক হন তাহলে সমালোচকের কি অধিকার নেই অপ্রাসঙ্গিক হবার? শাইলকের ওপর যে রায়টা দেওয়া হল শাস্তি হিসাবে, নাটকের জন্য তার কি প্রয়োজন ছিল?'

এবার অধ্যাপক চুপ হয়ে গেলেন এবং আমাদের দুজনকেই একটা তারিখ দিয়ে ডেকে পাঠালেন আলোচনা করার জন্য। মনে রাখবেন, সমরের বয়স তখনো ষোল বছর পূর্ণ হয়নি। শেক্‌স্‌পীয়র সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যের দাবি করার যোগ্যতাও হয়নি। শুধু মূল নাটকটা পড়েছিল দু-একবার অন্যান্য ছাত্রদের মতো।

এই একটি ঘটনার মধ্যে সমরের পূর্ণ পরিচয় পেয়ে গেলাম, যে সমরকে পরবর্তীকালে সবাই দেখেছে তার কবিতায়, তার 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজে। সেইদিন থেকে আমাদের সমস্ত দূরত্ব ও ব্যবধান ঘুচে গেল। পরিচয়টা বন্ধুত্বে পরিণত হলো। তারপর ঘনিষ্ঠতা! সাহিত্য, রাজনীতি যে-কোন বিষয়ে হোক, নিজস্ব মত গঠন করা আর সেইটে প্রকাশ করার সৎসাহস তার এটুকু বয়সেই যা দেখেছি তারই পূর্ণ পরিণতি হল 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজে, তার লেখায়।

তারপর অনেক বিষয়ে ওর অনেক মন্তব্য শুনেছি। সবই প্রায় বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। যে ক'টি মনে আছে তার মূল্যও নেহাৎ কম নয়। তবে সেইসব মন্তব্যগুলির সময় বা ক্রম নির্ভুলভাবে বলা যাবে না।

কলকাতায় প্রমথেশ বড়ুয়া-পরিচালিত ও অভিনীত দেবদাস সবাক চিত্রটি তখন দারুণ জনপ্রিয় হয়েছে। আমরা দুজনেই একদিন সিনেমা দেখতে গেলাম সিনেমার শেষে অধিকাংশ দর্শক বিশেষত মেয়েরা চোখ মুছতে মুছতে, কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসছে। আমার মনটা খুব ভারি। বাইরে এসে মন্তব্য করলাম; 'সত্যিই, কী দুর্ভাগ্য লোকটার!' এই বলে আমি হিন্দু সমাজের সংস্কার ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা ছোটখাট বক্তৃতা আরম্ভ করতে যেতেই সমর আমাকে খচ্ করে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'একটা সিগারেট খা।' তারপর চিমটি কাটার মতো মন্তব্য— 'দেবদাস ছেলেটা একটা "উদো"—ফ্রাসট্রেশনের রুগী, নিষ্কর্মা বড়লোকদের যখন এই রোগে ধরে তখন তার পরিণতি হয় আত্মহত্যা, নয় খুন।'

পরে ঠিক কোন্ সময় মনে নেই, একবার তার কাছে মন্তব্য শুনেছিলাম,

'শরৎ চাটুজ্জে একটাও পুরুষ চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি—'গৃহদাহের' সুরেশ ছাড়া।'

মনে রাখবেন, সমর কিন্তু কখনই সাহিত্য-সমালোচকরূপে আত্মপ্রকাশ করেনি বা সেরকম দাবিও তার ছিল না।

আর একটা ঘটনার কথাও না বলে পারছি না। মন্তব্যটা করেছিল সে রায় বাহাদুর দীনেশ সেন সম্বন্ধে। এটা মনে থাকার কারণ, ওটা শুনে আমি ও আমার ভাই বিজলী এত হেসেছিলাম যে খেতে বসে বিষম লেগে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল।

তখন দ্বিতীয় বর্ষের শেষের দিক। একদিন সমর হঠাৎ এসে বলল, 'লজিকের সিলজিজম সম্বন্ধে কিছু বল্ তো।' আমি ডিডাকটিভ ও ইনডাকটিভ লজিকে কিভাবে প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছবার কথা আছে, সেইটে বলে আমার নোটের খাতাটা তাকে দিলাম। গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করল, 'দার্শনিকদের মধ্যেও দু-একটা বুদ্ধিমান লোক আছে, কি বলিস?' সঙ্গে সঙ্গে বললাম, 'ছাই, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রীদের কাছে ওরা শিশু', এই বলে ন্যায়শাস্ত্রে ডিডাকটিভ ও ইনডাকটিভ দুটি ধারা মিলিয়ে যে-যুক্তির বিধানটা আছে সেইটে বলেছিলাম। তিনদিন পর এসে আমার নোটখাতাটা ফেরৎ দিল, আর খুব উল্লাসের সঙ্গে বলল, 'খাতাটা পড়ার দরকার হল না। সব বুঝে গিয়েছি। বুড়ো বাঙাল (অর্থাৎ রায় বাহাদুর দীনেশ সেন) একজন বিরাট নৈয়ায়িক।'

আমার প্রশ্ন, 'সে কি, জানতাম না তো?'

"কাল সন্ধেবেলায় বুড়োর বৈঠকখানায় চিড়ে ভাজা খাচ্ছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এমন সময় একটা ব্যাঙ থপ্ থপ্ করতে করতে ঘরের মধ্যে ঢুকে এল। সঙ্গে সঙ্গে বুড়ো পড়ি তো মরি করে উঠে চটি ফট্‌ফট করতে করতে বারান্দায়। আমাদের উদ্বিগ্ন প্রশ্ন, 'কি হলো, কি হলো?' একটু ভয়ে ভয়ে বললেন, 'দ্যাখছ না, ঘরে ভেক ঢুকছে?' 'আমাদের বিস্ময়, "সে কি ব্যাঙকে এত ভয় কেন?' 'বুঝস না? ভেক যখন ঢুকছে হর্প ত আইল বইল্যা।"

জানি না গল্পটা সমরের স্বরচিত কিনা। কিন্তু বহুদিন এই গল্পটা আমাদের বার লাইব্রেরির উকিলদের হাসির খোরাক জুগিয়েছে।

১৯৪৯ সালে Statesman কাগজে একটি বিজ্ঞাপন বেরোয় সাংবাদিক চেয়ে। তার পরের দিন আমার সঙ্গে সমরের দেখা। বলল, 'ভাবছি একটা দরখাস্ত করব।' আমি বললাম, 'ভাবাভাবি নয়, দরখাস্তটা আমার সামনেই লেখ, নইলে কালই ভুলে যাবি।' সঙ্গে সঙ্গে একটা খাতার রুলটানা কাগজ ছিঁড়ে নিয়ে পাঁচ লাইনের একটা দরখাস্ত লিখল। তাতে শুধু এই কথাগুলো লেখা থাকল—"আমি বি. এ. ইংরাজি অনার্সে ১৯৩৬ সালে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলাম। এম. এ. তেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়েছিলাম। একটা বিষয়ের ওপর আমার নম্বরটাকে কেউ

কেউ বলতেন যে সে সময় পর্যন্ত রেকর্ড। আর আমি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির কোন আত্মীয় নই।" (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য)। আমি বললাম, 'অবশ্যই এটা পাঠাস। আমি পরশু এসে খোঁজ নেব পাঠিয়েছিস কিনা।'

সেই দরখাস্তটাই ও পাঠিয়েছিল না কি পরে বদলেছিল, সেটা Statesman বলতে পারবে, কিন্তু তার কয়েকদিন বাদেই শুনলাম, চাকরিটা ওর হয়ে গিয়েছে।

ছাত্রজীবনে সমরের অসংখ্য মন্তব্যের মধ্যে মাত্র কয়েকটি তুলে দিলাম, কিন্তু সমরের সত্যিকারের পরিচয়টা আমি পেতাম কলকাতার বাইরে ভ্রমণের মধ্যে। এই ভ্রমণের হুজুগ আমিই তুলতাম আর ও পোটলা-পুঁটলি বেঁধে আমাদের সঙ্গে যেত। আই. এ. পরীক্ষার পর রাঁচীতে পনেরোদিন, তারপর বি. এ. পরীক্ষার পর দীর্ঘ আড়াই মাস ব্রহ্মদেশে, এম. এ. পড়ার সময় বেশ কয়েকদিনের জন্য ডালটনগঞ্জ, তারপর এম. এ. পরীক্ষার পর জামতাড়ায় আমাদের বাড়িতে, আর সেইখান থেকে মহেশমুণ্ডা, গিরিডি, মধুপুর এইসব জায়গাতে ছোটখাট ভ্রমণ।

এর মধ্যে দেখেছি সমরের আর একটি চেহারা, যার সঙ্গে সঙ্গে সকলের পরিচিত বিষণ্ণ গম্ভীর লোকটির কোন মিল পাওয়া যাবে না। একেবারে শিশুর মতো প্রাণচঞ্চল, হাল্কা রসিকতায় উচ্ছল, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতি আকর্ষণ কম হলেও স্থানীয় মানুষদের সম্পর্কে অসীম আগ্রহ। আমার মনে আজও পর্যন্ত সমরের এই ছবিটাই গেঁথে আছে, অন্য ছবিটা ঠিক দাগ কাটতে পারে না।

রাঁচী গেলাম, আমি, সমর আর দুজন স্কটিশের বন্ধু। ইম্পিরিয়াল হোটেল নামে একটি হোটেলে আশ্রয় নিলাম। সমর অত্যন্ত ঘুমকাতুরে ছিল। সাতটার আগে উঠত না। ওখানে সুন্দর পরিবেশের মধ্যে রোজ বিভিন্ন জায়গায় হাঁটা, সন্ধ্যাবেলায় ডুরাণ্ডা, তারপর বাজারের মধ্যে চায়ের দোকানে বসে কেক ভক্ষণ, কোনদিন মোরাবাদী হিল, কোনদিন কাঁকে—এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের সময় ফুরিয়ে এল। কলকাতায় ফেরার আগের দিন ঠিক করলাম, বিখ্যাত ঝরনাটা দেখে আসব। আমরা চারজন আর হোটেলের দুজন সহযাত্রী নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করা গেল। বেলা একটার সময় বেরোব ঠিক হলো। সকালবেলা চা জলখাবার খেয়ে 'একটু আসছি' বলে সমর সেই যে চলে গেল তারপর বারোটা বাজল, একটা বাজল, ওর পাত্তাই নেই। তখন অন্য চারজন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে বেরিয়ে গেল, আমি বসে থাকলাম। বেলা দুটোর সময় ভগ্নদূতের মতো ফিরে এল। আমি ওর সঙ্গে কথাই বললাম না। খাওয়া-দাওয়ার পর গোরুচোরের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করল, 'হ্যাঁরে, তোর মেজাজটা খারাপ কেন রে?' 'আর জীবনে কখনও আমি তোর সঙ্গে বাইরে যাব না। তোর জন্যেই ঝরনাটা দেখা হল না। কোথায় ছিলি এতক্ষণ?'

'কিছু মনে করিস না, ওরা যে কিছুতেই ছাড়তে চাইল না।'

'ওরা আবার কারা?'

'আমি কাঁকেতে গিয়েছিলাম। সেখানে কয়েকজন পাগলের সঙ্গে আলাপ হল। তারা আশ্চর্যরকম বুদ্ধিমান ব্যক্তি। এক ভদ্রলোক বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে ছিল। আমাকে দেখেই বলল, 'আপনি কি পাগল হয়েছেন? নইলে পাগলের খনি কলকাতা ছেড়ে পয়সা খরচ করে রাঁচী এসেছেন পাগল দেখতে?' সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ জমে গেল। একেবারে সুস্থ মানুষ। রোজ আটটা করে সিগারেট খায়। আমাকে ছাড়তেই চায় না। শেষে এই দুটো সিগারেট জোর করে গছিয়ে দিল। তুই একটা নে, আর আমি একটা।' বলে আমার দিকে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল। দেখলাম Craven-A মার্কা সিগারেট। তারপর সমর বলল, 'ভদ্রলোকের অবশ্য একটু দোষ আছে। দেশলাই বাক্স চাইলেই চোখ লাল করে খেপে গিয়ে লোককে মারধোর করে।' যাক, বিকেলের মধ্যেই আবার গল্পগুজবে মেতে উঠলাম। পরদিন কলকাতায়। রাঁচী গিয়েও রাঁচীর সবচেয়ে দর্শনীয় আকর্ষণ হুড্রু ফল্‌স্ দেখা হল না! আজও হয়নি।

ডালটনগঞ্জে অরুণবাবুর অতিথি হয়ে থাকার সময় একবার ওর পাল্লায় পড়ে বেড়াতে গিয়ে পথ হারিয়ে এক আদিবাসী খুপরিতে রাত কাটাতে হয়েছিল। তারপর ওদেরই দেওয়া ভুট্টাসেদ্ধ খেয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটিয়ে পরদিন বাড়ি ফিরলাম। পরদিনই আমি কলকাতা চলে আসি। আসার সময় সমরকে বার বার বলে এলাম, 'তুই আমাদের এই ভ্রমণকাহিনীটা ভালো করে লিখে কলকাতা পাঠিয়ে দিস। শ্রীহর্ষ পত্রিকায় ছাপানো যাবে। এবং তার ছোট ভাই কালুকে ভার দিয়ে আসা হল, সে যেন তাগাদা করে লিখিয়ে নেয়। পাঁচ-ছদিন পরে লেখাটা এল, পাঁচ লাইনের—"ডালটনগঞ্জে গিয়ে বুঝলাম 'বনে সুন্দর' ছেলে-মেয়েরা শহুরে ছেলেমেয়েদের মতো প্রেম করেনা কেন—কারণ ভুট্টাসেদ্ধ।"

গিরিডিতে উশ্রী জলপ্রপাত দেখতে গিয়ে একজায়গায় স্থির জল দেখে হঠাৎ আমাদের নুড়ি তোলার শখ হল। পাশে দুটি আদিবাসী মহিলার বারণ সত্ত্বেও লাফাতে লাফাতে গিয়ে একটা পাথরে দাঁড়িয়ে সমর যেই ঘাড় নীচু করেছে সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত পেছল পাথরে পা হড়কে একেবারে জলের মধ্যে। তাকে তুলতে গিয়ে আমারও সেই অবস্থা। জল সেখানে মাত্র হাঁটুসমান—হয়তো তারও কম। কিন্তু প্রচণ্ড স্রোতের টান। আর চারদিকে পাথরের টুকরো। আমরা যখন পেছল পাথরগুলো ধরে হাঁচোর পাঁচোর করে ওঠার চেষ্টা করছি তখন ঐ আদিবাসী মহিলার কড়াহাতের এক হ্যাঁচকা টানে আমরা ডাঙা পেলাম। তারপর সে কিড়মিড় করে তার ভাষায় বেশ কিছু মন্তব্য করে চলে গেল। আমরাও ভিজে জামাকাপড়ে বাড়ি ফিরলাম। বাড়ি এসেই সমরের মন্তব্য 'ভাগ্যিস পড়ে গেছিলাম, তাই তো হিড়িম্বার জ্ঞাতিভগ্নীর স্পর্শ পেলাম। ওঃ, কি দারুণ অ্যাডভেঞ্চার!'

আমাদের বর্মা ভ্রমণটা উল্লেখযোগ্য। আমার একজন কাকা (বাবার মামাতো

ভাই। সন্তোষকুমার চক্রবর্তী মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসের উঁচু পদে কাজ করতেন। ১৯৩৪ সালে ব্রহ্মদেশে মেমিও শহরে তিনি বদলি হয়ে যান। মেমিও ছিল উত্তর ব্রহ্মে একটা পাহাড়ি শহর, অনেকটা শিলং-এর মত। কাকা আমাদের হাওড়ার বাড়িতে আমাকে আর সমরকে নেমন্তন্ন করে যান যেন একটা বড় ছুটি পেলে মাসখানেকের মত আমরা বর্মায় ঘুরে আসি। সমস্ত উত্তর বর্মা যাতে দেখতে পারি সে ব্যবস্থা করে দেবার ভরসা দিয়ে সমরের রোগা পিঠের ওপর একটা মিলিটারি থাবা মেরে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন, 'এই ছেলেটির শরীরে অন্তত দশ পাউণ্ড মাংস যোগ করার ব্যবস্থা আমি করবো।' বি. এ. পরীক্ষার পর সুযোগ এসে গেল। কাকার চিঠিতে সাদর নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে জাহাজঘাটে কোথায় টিকিট কাটতে হবে, বিশাল ডেকের কোথায় বসলে পরে ঝড়ের সময় নিচে নামতে হবে না এবং তারজন্য সারেংদের কিভাবে 'ম্যানেজ' করতে হবে, রেঙ্গুন এবং 'মান্দালয়ে' কার বাড়িতে ওঠা হবে তার বিস্তৃত বিবরণ এবং ঐ সঙ্গে রেঙ্গুনের পুলিশের বড়কর্তার কাছে একটা ব্যক্তিগত পত্র যাতে আমাদের কোন হয়রানিতে পড়তে না হয়। আমরা তো একপায়ে খাড়া। সঙ্গে সঙ্গেই কলেজ অফিসে গিয়ে তিনমাসের জমা স্কলারশিপের টাকা তুললাম। টুকিটাকি জিনিসপত্র কিনলাম। তারপর ১৪ টাকা করে দিয়ে রেঙ্গুনের টিকিট কেটে 'এস. এস. এগরা' জাহাজে, কাকার নির্দেশমতো, ডেকের একেবারে পিছন দিকে যেখানে সারেংদের ঘর সেখানে আমরা নিঃশব্দে ঢুকে পড়লাম। ঐখানেই জাহাজঘাটে চীনা ফেরিওয়ালাদের কাছে ৪ টাকা দিয়ে ৪টে ডেকচেয়ার কিনে নিয়েছিলাম। আমরা চারজন ছিলাম। আমরা ছাড়া সমরের বন্ধু অজিত মুখার্জী। আর জাহাজঘাটায় আলাপ হওয়া একজন ফরাসী ছাত্র গেইতঁ ফুকে। জাহাজে আমাদের ঠিক উপযুক্ত স্থানটি নির্বাচন করা আর সেইজন্য সারেং 'ম্যানেজ' করার কাজটা সমরই করেছিল। এ-জন্য যাত্রার আগের দুদিন খিদিরপুরের নোংরা গলিতে সস্তা রেস্টুরেণ্টে যারা তাকে ঘুরতে দেখেছেন তারা যেন অন্যকিছু মনে না করেন।

যাত্রার প্রথম কয়েক ঘণ্টা খুবই আরামে কাটল। সংকট বাধল শেষ রাতে। তখন আমরা সমুদ্রের মধ্যে। একটা হট্টগোল চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল। দেখি ডেকচেয়ার থেকে পাটাতনের ওপর গড়াগড়ি দিচ্ছি। আর মনে হচ্ছে যেন চারদিকে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে। উঠে দাঁড়াতে গেলে পড়ে যাই। বাক্স প্যাঁটরা লণ্ডভণ্ড। সারেংদের দৌড়োদৌড়ি টুংটুং করে ঘন্টি বাজা। একজন সারেং বলল, 'একটু হাওয়া উঠেছে।' কুড়ি-পঁচিশ মিনিট পরে পরস্পরের চেষ্টায় সব গুছিয়ে যখন ডেকচেয়ারে বসলাম তাকিয়ে দেখি সমর সেন উধাও। চীৎকার করে নাম ধরে ডাকাডাকি। কোন সাড়া নেই। বাইরে ঢেউ ভাঙার শব্দ আর হাওয়ার গর্জন। রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শেষ পর্যন্ত কি রেলিং এর ফাঁক দিয়ে সমুদ্রেই পড়ে গেল? দু-ঘণ্টা উদ্বেগের মধ্যে কাটিয়ে ভোরবেলা নিচের ডেকে

নামতে হল, কারণ সেখানেই সব 'টয়লেট'। এই শব্দটি সবেমাত্র তখন আমদানি হয়েছে। নিচের ডেকে নেমেই দেখি কোণের দিকে একটা বিরাট দড়ার কুণ্ডলীর ওপর খুব সুখে নিদ্রা দিচ্ছে আমাদের কবি বন্ধুটি। তারপর টানা হ্যাঁচড়া করে ঘুম ভাঙানো, আমার জানা ইংরাজী-বাংলা চোখাচোখা বিশেষণ প্রয়োগ, সবশেষে সমরের ছোট্ট একটু উত্তর :

'তলপেট তোলপাড়
টয়লেট বারবার।'

এটা কি আপনাদের সমর সেনের কবিতা বলে মনে হচ্ছে? যদি না হয় ত' আমি নাচার।

চারদিন পর রেঙ্গুনে নামলাম। তারমধ্যে একটা পুরো দিন-রাত ডেক চেয়ারে শুয়েই কাটল। একমাত্র ফুকে ছাড়া সকলেরই 'তলপেট' তোলপাড়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে।

এরপর রেঙ্গুন। রেঙ্গুনে নেমে প্রথমে চোখে পড়ল, একেবারে সাজানো শহর। ঝকমকে সুন্দর সোজা সোজা রাস্তা, ট্রাম নেই, বদলে ট্রলি বাস। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখে আমরা ধাক্কা খেলাম। জাহাজঘাটে সমস্ত মুটেরাই মদ্রদেশীয়, বড় বড় রাস্তার দুপাশের দোকান সবই মারোয়াড়ি বা পাঞ্জাবির। অসংখ্য রিক্সা-চালক সবই বিহারী। স্কুলের শিক্ষক, পোষ্টাফিসের কর্মচারী সবই বাঙালি। রেলের গার্ড ইঙ্গ-বর্মী। রাস্তায় পথচারীদের মধ্যে পঞ্চাশের মধ্যে মাত্র একজন দেখা যায় ব্রহ্মদেশীয়। শেষে শুধু ব্রহ্মবাসী দেখার জন্যে আমাদের যেতে হল তিন মাইল দূরে সোয়েডাগন প্যাগোডায় এবং তারপাশের বস্তিতে। আপনারা কি কল্পনা করতে পারেন, দু'শো বছর ব্রিটিশ শাসনের পরেও কলকাতায় নেমে বাঙালি দেখা যাবে না?

আমরা প্যাগোডার চারদিকে ঘুরে বিশাল বুদ্ধমূর্তি দেখছি। কিন্তু দেখা গেল, সমরের মনে তা বিন্দুমাত্র রেখাপাত করেনি, ও একজন হিন্দী জানা ব্রহ্মদেশীয় ফুঙ্গির (বৌদ্ধমঠের শিক্ষার্থী) সঙ্গে ভাব জমিয়ে একেবারে বস্তির মধ্যে ঘুরতে বেরিয়েছে! এবারে অবশ্য ফিরতে দেরি হয়নি।

এরপর চারদিন রেঙ্গুনে বাস। শহরে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ ও ফুঙ্গি বন্ধুটির সঙ্গে অনেক আলাপ আলোচনা করে যা জানলাম তা কেতাবে পড়িনি। ব্রহ্মদেশের প্রতিটি ইঞ্চি চাষের জমি মাদ্রাজী মহাজনদের কাছে বাঁধা। তাই নিজদেশে পর-বাসী হয়ে তারা বাস করছে।

চারদিন পরেই মান্দালয়ের টিকিট কেটে মিটার গেজের ট্রেনে উঠি। পথে ব্রেকজার্নি। প্রতিদিনই আমরা একটা না একটা স্টেশনে নেমে হয় রেলের প্ল্যাট-ফরমে না হয় গ্রামের কোন জায়গায় রাত কাটাতাম, আর সুন্দর অতিথিপরায়ণ সর্বদা হাসিমুখ বর্মী মেয়েদের আতিথ্য গ্রহণ করতাম। ওদেশে গৃহকর্তা বলে কেউ

নেই, শুধু গৃহকর্ত্রী। কী বাইরে, কী ঘরে মেয়েদেরই প্রাধান্য। পুরুষের ভূমিকা ছিল সানাই বাজনার সঙ্গে পোঁ ধরার মত।

মান্দালয়ে যাই দুবার—প্রথম মেমিও যাবার পথে, পরে একবার ফেরার আগে, ফুকের দেখাদেখি সমরের ফোটোগ্রাফির শখ চাপল। একটা জাপানী দোকান থেকে একটাকা দিয়ে একটা নর্টন ক্যামেরা কিনে, সময় নেই, অসময় নেই, যার-তার সামনে দাঁড়িয়ে শাটার টেপা তারপর প্রিন্ট করতে গিয়ে শুধু শাদা ফিল্মটি দেখে হতাশা। ক্যামেরাটি এখনও আমার কাছে আছে। কিন্তু ছবি একটাও নেই।

মান্দালয়ে ফটো তুলতে গিয়ে একটা ঘটনা ঘটল, যা আমাদের রীতিমত ভীত করে তুলেছিল। রাজপ্রাসাদের পাশে একটা খোলা জায়গায় পোয়ে নাচ হত। নৃত্যরতা সুবেশা বর্মী সুন্দরীদের ফটো তুলতেই হবে, অতএব আমাদের নিষেধ সত্বেও দর্শকদের লাইন ছাড়িয়ে তড়বড় বড়বড় করে এগিয়ে গিয়ে সমর ক্যামেরা চোখে দিয়ে দুচারবার শাটার টেপার পরেই হঠাৎ দুজন বর্মী সুন্দরী প্ল্যাটফরম থেকে নেমে এসে ওকে বগলদাবা করে একেবারে স্টেজে তুলল। আমরা তখন ভয়ে কাঁটা। কারণ বর্মী মেয়েরা যেমন সঙ্গীতে পটু তেমনই আবার পা থেকে "ফানা" (চামড়ার খড়মের মত একরকম চটি) খুলে বেধড়ক প্রহার করতেও ওস্তাদ কিন্তু এখানে সেরকম ঘটনা ঘটল না। তারা ক্লাসের দুষ্টু ছেলেকে বেঞ্চিতে দাঁড় করানোর কায়দায় সমরকে পেছন দিকে দাঁড় করিয়ে প্রায় আধঘণ্টা পরে নাচ শেষ করল। উপস্থিত দর্শকদের হাস্যরসের খোরাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সমরের সেই বোকা বোকা মুখটা এখনও চোখের সামনে ভাসছে। পরদিন মেমিওতে কাকার কাছে পৌঁছে এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা ও নিজেই দিল একটা কথার মধ্যে—'আমাকে ধরে নিয়ে গেল টিকটিকি যেমন তেলাপোকা ধরে।' কাকা বললেন, 'ওখানে ভিড়ে পড়লে পারতে, তাহলে পরে কলকাতা গিয়ে চাকরির দরখাস্ত করে নাজেহাল হতে হতো না।'

মেমিওতে পৌঁছানোর তিন দিন পরে অজিত চলে গেল পাগানে, আর ফুকে চলে গেল সিঙ্গাপুরের দিকে। আমরা থাকলাম প্রায় দুমাস। মেমিওতে থাকার সময় এই দুমাস ধরে বর্মার সমগ্র উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে, যাকে বলা হত 'শোন স্টেট'—গ্রামের পর গ্রাম ঘোরা। গোটিক ব্রিজের কথা সমর নিজেই 'বাবু বৃত্তান্তে' বলেছে, তার বিস্তৃত বিবরণ দিলাম না। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অভিজ্ঞতা ছিল একটি নিষিদ্ধ এলাকায় ভ্রমণ।

এলাকাটি বর্মার উত্তর-পশ্চিমে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল চওড়া, প্রায় সত্তর-আশি মাইল লম্বা, তিন থেকে চার হাজার ফুট উঁচু মালভূমি এবং পাহাড় ও জঙ্গলের রাজত্ব। সেখানে থাকে একটি আদিম জাতি, তাদের নাম 'ওয়া'। সেই নাম থেকেই জায়গাটাকে 'ওয়া' স্টেট বলত। এদের আচার-ব্যবহার ছিল গারো পাহাড়ের আদিম উপ-

জাতিদের মতো। একমাত্র তফাৎ ছিল, এরা বুদ্ধ-পূজারী। ঠিক বৌদ্ধ বলব না। সেই কোন্ কালে, কত শতাব্দী আগে কোন দুঃসাহসী শ্রমণ ঐ জঙ্গলে বুদ্ধদেবকে নিয়ে গিয়েছিলেন সেটা ইতিহাসের বস্তু। তবে জায়গাটি কাঠ এবং খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। আইনত চীনের অধীনে, কিন্তু কার্যত ব্রিটিশ সরকারের দখলে। ভারত সরকার ১৯৩১ সালে ঠিক করে, ঐখান দিয়ে একটি রাস্তা তৈরি করবে। এই উদ্দেশ্যে স্বভাবতই গাছপালা কাটতে হয়, গ্রামগুলিকেও উৎখাত করতে হয়। সুতরাং বাধা আসবেই। সেই বাধা দূর করার জন্য ব্রিটিশ সরকার সবচেয়ে সহজ পন্থা ছিল—অর্থাৎ গোর্খা সৈন্যদের সাহায্যে গুলিবর্ষণ। তীর ধনুকের সঙ্গে বন্দুকের লড়াইয়ের ফলাফল বুঝতেই পারা যায়। গোটিক ব্রিজ দেখতে গিয়ে একজন ইঙ্গ-বর্মী ভদ্রলোকের কাছে এই সংবাদটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সমরের সিদ্ধান্ত—ঐ এলাকার অন্তত কিছুটা দেখতেই হবে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক, গুলি যদি না-ও খাই ফিরে আসার পরওয়ানা এবং সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-কর্তৃক ফেরৎ পাঠানো—এ কেউ ঠেকাতে পারবে না। কাজেই আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সমর নির্ভয় ' [illegible] শাল কাঠুরেকে সঙ্গে নিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকলাম। দুদিন ধরে পালিয়ে বেড়ানো ওয়াদের সঙ্গে মিশলাম। আশ্চর্য সরল অতিথিপরায়ণ জাতি, শাল কাঠুরে যেই পরিচয় করিয়ে দিল যে আমরা 'ফয়ার' সন্তান, আমাদের বোধহয় মাথায় করে নাচে, ওদের কাছেই রাস্তা তৈরীর কাহিনী শোনা গেল। ঐ কাঠুরে দোভাষীর কাজ করল। কিন্তু কাঠুরে আর বেশিদূর অগ্রসর হতে না চাওয়ায় আমাদের দ্বিতীয় দিন বিকেলে ফিরতে হল।

যথারীতি পুলিশের খপ্পরে পড়লাম মেমিওতে ফিরেই। কাকা যথেষ্ট তদ্বিরের ফলে আমরা বেরিয়ে এলাম বটে কিন্তু ফিল্মগুলো রেখে আসতে হল। অবশ্য ফিল্মে কিছু ছবি উঠেছিল কিনা, সেটা জানা নেই।

দেখতে দেখতে জুলাই শেষ, আগস্টের মাঝামাঝি ফেরার কথা। ঐ সময়ের কিছু আগে বর্মার একটি ঘটনা না বলে পারছি না।

আমাদের মেমিও থাকার সময়েই কাকীমার দ্বিতীয় সন্তানটি জন্মায়। প্রসবের সম্ভাব্য তারিখের দিন আস্টেক আগে কাকা একটি শিক্ষিতা বর্মী নার্সকে দেখা-শোনার জন্য নিয়োগ করেন। কিন্তু দুদিন পরই নার্সটি জানায় যে সে যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ যেন ঘি দিয়ে কিছু রান্না না হয়। ঘিয়ের গন্ধে ব্রহ্মবাসীদের বমি আসে। কাকার তৎক্ষণাৎ উত্তর, 'ঘি থাকবে, তুমি নাও থাকতে পারো।' তারপর একজন মাদ্রাজী আয়াকে নিয়োগ করা হলো, দুদিন বাদেও তাকেও বিদায় নিতে হলো। সে নাকি কাকার হিসাব অনুসারে যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়। কিন্তু তারপর যখন নির্ধারিত সময়ের আগেই কাকীমার প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি। হাসপাতালে পাঠানো কাকার সংস্কারে বাধে। বাধ্য হয়ে আমরা দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম। আমি মাদ্রাজীর কাছে, সমর বর্মীর

কাছে। মাদ্রাজীটি দ্রাবিড় ভাষায় বেশ কিছু বলে দরজা বন্ধ করে দিল। অত্যন্ত হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরলাম, দেখলাম সেই বর্মী নার্সকে সঙ্গে করে সমর এসে পড়েছে। খুব হাসিখুশি এবং সে তার কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।

'হ্যাঁরে, কি করে ম্যানেজ করলি ?'

'খুব সহজে, ওকে গিয়ে প্রথমেই বললাম, বাড়ী থেকে ঘি-এর টিনগুলো সব ফেলে দিয়েছি। এইবার 'আপ চলিয়ে'। আমি হিন্দী, ইংরাজী আর দু'একটা বর্মী কথা বলে তার মন ভিজানোর চেষ্টা করলাম। মন ভিজল না। ঐ মাদ্রাজী আয়ার কথা বলে প্রায় বিদায় করে দেয়, শেষে আমি রঙের তুরুপ দিলাম, বললাম 'আমাদের একটা সংস্কার আছে, শিশুটি জন্মের পর যার মুখ প্রথম দেখবে তারই মতন চেহারা ও বুদ্ধি পাবে। আমি চাই কাকীমার বাচ্চাটি যদি মেয়ে হয়, তোমার মত মুখ হোক, আর যদি ছেলে হয়, তোমার মত বুদ্ধি হোক, মাদ্রাজীর কোনটাই নেই।' ফলটা নিজের চোখেই দেখতে পাচ্ছিস।'

তারপর নার্সটির ব্যস্ততা, পাশের ঘর থেকে সমরের গরম জল, টিংচার আইডিন, ফরসা কাপড়, তুলোর যোগান দেওয়া। আমি আর কাকা তখন পাশের ঘরে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছি আর হাসির ফাঁকে ফাঁকে কাকার মন্তব্য 'কি ফাজিল ছেলেরে বাবা, ওকে কাল আমি কান ধরে ওঠবোস করাবো।'

এর পনেরো দিন পরেই আমাদের ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ শেষ হয়। সপরিবারে কাকার, আর তার সঙ্গে আমাদেরও, এস. এস. টালাম্বা জাহাজে প্রত্যাবর্তন, বলা বাহুল্য ফেরার পয়সা লাগেনি, আমি কাকার আত্মীয়, আর সমর কাকার আর্দালি। সপরিবারে কাকাদের অবস্থান জাহাজের তেতলায় দ্বিতীয় শ্রেণীতে খুপরির মত ঘরে। আর আমাদের স্থান নিচের ডেকের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় যেখান থেকে কাকার ঘরে যাওয়ার সোজা রাস্তা ছিল। প্রতিদিন টিফিন ক্যারিয়ারে তলাকার ডেক থেকে ভাত, ডাল, ভাজি পৌঁছে দিতে সমরের লাফা লাফির কথা নাই বা বললাম।

ফিরে এলাম আমরা। সেই একই জাহাজ ঘাট, যেখান থেকে আড়াই মাস আগে যাত্রা করেছিলাম। সেই ট্রাম বাস কর্মব্যস্ত মানুষের চলমান শহর কলকাতার কিছুই বদলায় নি। শুধু বদলেছি আমরা। যাত্রাকালে আমাদের মনে ছিল ব্রিটিশ-বিদ্বেষ, পরাধীন দেশের অন্যান্য ছাত্রদেরই মতো। ফিরে এলাম আর একটি বিদ্বেষ নিয়ে, সেটি ভারতীয়-বিদ্বেষ। চোখে দেখে এলাম যারা নিজের দেশে অবাধ লুণ্ঠন, অবমাননা লাঞ্ছনার শিকার, তারাই অন্যদেশে গিয়ে সুযোগ সুবিধা পেয়ে লুণ্ঠনকারীর ছোট শরিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আমার বর্মা দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যেত যদি না সমরকে সহযাত্রী পেতাম।

২

নিছক কোন ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার টুকরো টুকরো স্মৃতির মধ্যে খুঁজে-পেতে, মিলিয়ে নিতে চাইছি সত্তর দশকের সেই সমাজ সচেতন, সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক বুদ্ধিজীবীকে ঐ সময়কার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীর মত নিজেকে রাজনৈতিক থিওরির নিরাপদ আড়ালে লুকিয়ে রাখেনি—কঠোর সত্য প্রকাশের, সামাজিক দায়িত্ব পালনের কঠিন ও বিপদসঙ্কুল পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ফ্রন্টিয়ারের সমর সেনকে বুঝতে হলে তাই ফিরে যেতেই হবে আমাদের নিজেদের ছাত্রবয়সে, সমর সেনের বাড়িতে এবং ঐ সময়কার রাজনৈতিক পরিবেশে।

তিরিশ দশকের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে—তার অগ্রগতি আর পরিণতি সবারই জানা। সেই পরপর দুবার গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ, দুবার রাউণ্ড টেবিল বৈঠক, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন, হরিজন প্রশ্ন, কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী চিন্তাধারার প্রসার, গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট, ওপরের ঘরে ব্যারিস্টারি কায়দায় চুলচেরা বিতর্ক, সবশেষে পর্বতের মূষিক প্রসব—এ সব কথা আজকালকার স্কুলের ছাত্ররাও জানে। আমি চোখের সামনেই দেখলাম সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি প্রচণ্ড পুলিশী আক্রমণের মুখে ছিন্ন-ভিন্ন। বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, ছাত্রদের সংগঠন দ্বিধা-বিভক্ত; অন্যদিকে কৃষকদের চরম দারিদ্র্য, মহাজন ও জমিদারের ক্রমবর্ধমান নিষ্পেষণ দেখলায় 'ভোলা'য় থাকার সময়ে। দেখলাম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের নেতারা কৃষকদের কাছে পাচ্ছে বীরপূজা। কিন্তু তাদের ঘরের আপনার লোক পটুয়াখালিতে ফজলুল হক। এই সূত্রে আমার বাবার একটা কথা, 'যেটা নলিনী দাশ ১৯৭১ সালে আমাদের বাড়িতে এসে উল্লেখ করেছিলেন, তাৎপর্যপূর্ণ—'তোমাদের মধ্যে কোন মুসলমান নেই কেন? দেশটা কি কয়েকজন শিক্ষিত হিন্দুর? স্বাধীনতা বলতে ওদের কী চিন্তা বা কী চাহিদা—কখনো কি ওদের জিজ্ঞাসা করেছ?"

শহর এলাকায় অগণিত বেকার যুবকের মধ্যে চরম নৈরাশ্য ও হতাশা। দেশের মূল সমস্যাগুলি আগেও যেমন ছিল পরেও তেমনি আছে। রাজনীতি ব্যাপারটাই একটা গোলকধাঁধার মত মনে হতে লাগল। এই গোলকধাঁধার কোন জবাব পেতাম না যদি না সমরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হত। সমরদের বাড়িতেই আলাপ হল মীরাট ষড়যন্ত্রের একজন অংশীদার রাধারমণ মিত্র আর শ্রমিক আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা ও সংগঠক বঙ্কিম মুখার্জীর সঙ্গে। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আমাদের পরিচিত ধারাগুলির পাশাপাশি আমার অপরিচিত আর একটি ধারাও আস্তে আস্তে নিজের স্থান করে নিচ্ছিল। সেটি হলো কৃষক ও শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন আর তার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি, যেটা বে-আইনীভাবে কাজ করতো।

আমি মাঝে মাঝেই সমরের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতাম। আলোচনা মানে আমি বক্তা, ও নির্বাক শ্রোতা। একদিন কলেজে কয়েকটি কাগজ আমার হাতে দিয়ে বলল, 'যদি রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাস তো এগুলো

পড়বি। মরা ছেলে কোলে করে কান্নাকাটি করা কাজের কথা নয়।' আমি রাতের বেলা হোস্টেলে গিয়ে প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে কাগজগুলি পড়লাম। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার কাগজ। পরদিন কোন মন্তব্য না করে কাগজগুলো ফেরৎ দিয়ে বললাম, 'তোর কাছে আর কি কি আছে রে?' ও একটু হেসে বলল, 'এই ষড়যন্ত্রের একজন নায়ক আমাদের বাড়িতে আছে, শনিবার দিন যাস।'

তারপর থেকে আমার শনিবারগুলো কাটতে লাগল বেহালায় সমরদের বাড়িতে। রাধারমণবাবু আমাকে প্রচণ্ডভাবে আকৃষ্ট করলেন। তাঁর কাছেই প্রথম 'ডায়ালেকটিক বস্তুবাদের' জটিল দার্শনিক তত্ত্বটি শিখলাম। কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো যা আগে আমি কয়েকবার পড়েও বুঝতে পারিনি তা তিনি আমায় জলের মত বুঝিয়ে দিলেন। বঙ্কিমবাবু মার্কসীয় অর্থনীতির খটোমটো সূত্রগুলি ছবির মত করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। সমরের পিতা অধ্যাপক অরুণ সেন জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব কি ভূমিকা পালন করবে তা নিয়ে প্রায়ই কথাবার্তা বলতেন। প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা মুজফ্‌ফর আমেদ যাঁকে আমরা পরে কাকাবাবু বলতাম, সেখানে মাঝে মাঝে আসতেন। এইসব আলোচনাগুলো হত ঘরোয়া আবহাওয়ায়, চা খেতে খেতে ভাত, খাওয়ার পর রোদ পোয়াতে পোয়াতে। সমর কখনও আলোচনার অংশগ্রহণ করত না। কিন্তু তার দু-চারটে কথার মধ্যে বুঝতে পারতাম ও অনেক কিছু জানে, যা আমি নতুন শিখতে আরম্ভ করেছি।

এ ছাড়াও সমর যাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতো তাঁরা যে শুধু কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন তাই নয়, তাঁরা ছিলেন কলকাতার পণ্ডিত সমাজের মধ্যমণি। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন দত্তের ইংরাজি ভাষা, সাহিত্য, অলঙ্কার সম্পর্কে জ্ঞান তখন অক্সফোর্ডের অধ্যাপকদের ঈর্ষা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। আমি দু-একবার বিষ্ণু দে-র বাড়িতে গিয়েছি সমরের সঙ্গে। কিন্তু মোটেই ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। কারণ এঁদের পাণ্ডিত্যের নাগাল পাওয়া আমার পক্ষে দুষ্কর ছিল। তবে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে যে ইংরাজ সাহিত্যিক এবং কবিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরাই আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের পরিচয় সমরের মাধ্যমেই পেয়েছিলাম।

কল্লোল এবং কবিতা গোষ্ঠীর সাহিত্যিকরা শুধু বাংলা কবিতার আঙ্গিক নয়, তার বিষয়বস্তু নিয়েও নিত্য-নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন। প্রগতিশীল লেখক ও শিল্পী সংঘের সংগঠকদের মধ্যে সুধীন দত্তের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। এই সাহিত্যিক গোষ্ঠী চল্লিশের দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছিলেন এবং তাঁদেরই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার সঙ্গে সকলেরই পরিচয় আছে। বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা বাঙালির অপরিচিত নয়। তবে অনেকেরই হয়ত জানা

নেই, ঢাকাতে ফ্যাসি-বিরোধী কবি ও শিল্পী সংঘের সম্মেলনে যোগদান করতে আসার সময় গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে সোমেন চন্দ নিহত হবার যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল তাতে বুদ্ধদেব বসুও অংশ নিয়েছিলেন, সোমেন চন্দর রাজনৈতিক মতের সঙ্গে বিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও। এই হলো সেই পরিবেশ, যে পরিবেশ সমর সেন ও তার বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশীলিত এবং কবির সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন মানসিকতাকে গড়ে তুলেছিল। বুদ্ধিজীবীর সামাজিক ভূমিকা পালন করার জন্য সে ছিল সদা-প্রস্তুত এবং পুলিশী-হামলা গুণ্ডা-আক্রমণের আশংকা ও আর্থিক বিপর্যয়কে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার ক্ষমতায় বলীয়ান। তাই ত্রিশ দশকের কবি সমর সেন সেই সব অখ্যাত অবজ্ঞাত মানুষদেরই পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসেছিল যারা বাস করে কলকাতার নীচের তলার অন্ধকারে। অতি সহজে, কল্পনার প্রলেপ না লাগিয়ে বাস্তব জীবনের ছবি এঁকেছিল সে। এর মধ্যে কোন 'সৌখীন মজদুরি' ছিল না।

আর ৭০-এর দশকের সমর সেন তার ফ্রন্টিয়ার পত্রিকার পাতায় পাতায় সম্পাদকীয় ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে লাগল সেই সব ছাত্র ও যুবকদের কথা যাদের তদানীন্তন সরকারের নীতি 'আইন বহির্ভূত' বলে ঘোষণা করেছে; পেশাদার খুনে-বদমাশদেরও পর্যন্ত আদালতের বিচারের যে অধিকার থাকে সেই অধিকারও তাদের দেয়নি।

৭০-এর দশকের দুঃস্বপ্নের দিনগুলি ইতিহাসে তলিয়ে গিয়েছে। সেগুলি স্মরণ করা অত্যন্ত পীড়াদায়ক। কিন্তু সমর সেনকে পুরোপুরি বুঝতে গেলে তার প্রয়োজন আছে। নকশাল পন্থী নামে প্রচারিত ছাত্র যুবকেরা, যাদের মধ্যে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্ররাও ছিল, একটি রাজনৈতিক পথ বেছে নিল যা 'শ্রেণীশত্রু খতম' নামে পরিচিত। উদ্দেশ্য ছিল একটা সুস্থ সমাজ সৃষ্টি করা। কিন্তু আক্রমণের লক্ষ্য ছিল অনির্দিষ্ট। এর পরিণতি কি সবারই জানা। কিভাবে শত্রু-হননের নীতি প্রথমে আত্মীয়-হনন ও পরে আত্ম-হননে পরিণত হল, থিওরি দিয়ে গড়া একটি 'স্বপ্ন' জনগণের দুঃস্বপ্নে পরিণত হল সেটাও আজ অজানা নয়।

কিন্তু এর উত্তরে শাসকশ্রেণী যে খতম অভিযান শুরু করল, ভারতবর্ষে গত ১০০ বছরের ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত বিরল। সন্ত্রাসবাদী দমনের যুগে বিদেশী শাসকরা অন্তত আদালতে একটা বিচারানুষ্ঠানের প্রহসনও রাখতে বাধ্য হয়েছিল। তা না হলে হিজলী জেল থেকে পালানো ও পুলিশের ওপর গুলিবর্ষণকারী নলিনী দাশের মত বিপ্লবীর কোর্টের বিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হতো না। সেক্ষেত্রে সহকর্মী দীনেশ মজুমদার আদালতের সিঁড়ি বেয়ে ফাঁসীর মঞ্চে ওঠার বহু আগে হয়ত থানার মধ্যেই তাঁর ফাঁসি হয়ে যেত এবং অনেকদিন পরে বাইরে প্রচার রাখা হতো, সেটা আত্মহত্যা। অন্যদিকে, ১৯৩৩ সালে নলিনী দাশ-ভ্রমে হাওড়া স্টেশনে গ্রেপ্তার-হওয়া বিনয় চৌধুরী (বর্তমান ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী)-কে হয়ত 'মৃতদেহ' ব'লেই

সরাসরি মর্গে চলে যেতে হতো। বিদেশী শাসকদের মুখে কিছু পরিমাণ লাগাম দেওয়ার মতন শক্তিধর তখন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ছিলেন শিক্ষিত ও পণ্ডিত অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তি। এ প্রসঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নামও সবাই জানেন।

কিন্তু সত্তর দশকে আমাদের বুদ্ধিজীবী-কবি-সাহিত্যিকদের অধিকাংশ, যাঁদের মধ্যে অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী, চোখের সামনে মর্মান্তিক অনেক ঘটনা দেখলেও নিরাপদ দূরত্বে মৌনী হয়ে থাকাটাই পছন্দ করেছেন বেশি। ঐ সময় বাংলাদেশে খান সেনাদের অত্যাচার নিয়ে খবরের কাগজের পাতায় পাতায় রিপোর্ট, মন্তব্য লিখে তাঁরা বাঙালী পাঠকের মনোরঞ্জন করলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের নিজেদের দেশে বহু যুবক-ছাত্রের উপর যে একই ধরনের আক্রমণ চলেছে, সে সম্বন্ধে সামান্য দু-চারটি সহানুভূতির কথাও তাঁরা লিখলেন না। নকশালপন্থীদের রাজনীতি নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়ে গেছে এবং হওয়া উচিতও ছিল। কিন্তু তদানীন্তন শাসকশ্রেণী ঐ রাজনীতির সমর্থক যুবকদের ওপর যে খতম অভিযান চালাচ্ছিলেন, সেই খতম অভিযানের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছিলেন প্রশাসনের সেই অংশটিকে যা কিনা আইন ও শৃংখলার অভিভাবক। এর পরিণতি হিসাবে আমরা দেখেছি আমাদের শিক্ষিত সমাজের একটি অংশ আদালতে বিচার পাবার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কারারুদ্ধ হচ্ছে, খোলা রাস্তায় গুলি খেয়ে মরছে। এই রকম মর্মান্তিক ঘটনা তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীদের মনে বিন্দুমাত্র রেখাপাত করতে পারেনি। এটা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়?

একটি দৃষ্টান্ত হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। কবি সরোজ দত্ত সে-যুগের একজন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক। তাঁর রাজনৈতিক মতামত কী ছিল তা আমাদের বিচার্য নয়। তাঁর বিরুদ্ধে কী অভিযোগ ছিল সেটাও আমাদের অজানা। কিন্তু একদিন শোনা গেল, তিনি পুলিশের হেফাজত থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তাঁর কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক বন্ধুর অভাব ছিল না। কিন্তু একজন বন্ধুর মনেও ত কোন প্রশ্ন জাগলো না, তাঁর হঠাৎ নিখোঁজ হবার কারণটা কি? একমাত্র সমরই তাঁর ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় এই ঘটনা, তখনকার রাষ্ট্রপতি শাসনের ভীতি অগ্রাহ্য করে প্রকাশ করল। সন্দেহ নেই, তখনকার অন্ধকারের মধ্যে ফ্রন্টিয়ার কাগজ ছিল একমাত্র দীপাশিখা। এই শিখাটিকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টার তাই ত্রুটি ছিল না। সত্য কথা প্রকাশের অপরাধে সমরের বাড়িতে পুলিশ হামলা হয়েছিল শুনেছি। গুণ্ডা আক্রমণের ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছিল। ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে পত্রিকাটিকে আর্থিক বিপর্যয়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুই তাকে টলাতে পারেনি।

একথা নিশ্চয় কেউ বলবেন না যে সমর নকশালপন্থী ছিল। তার প্রমাণ ফ্রন্টিয়ার পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু তখন রাজনীতির চেয়েও বড় ছিল মানবতার প্রশ্ন, মানুষের মতপ্রকাশের অধিকার, আদালতে ন্যায্য বিচার পাবার

অধিকার, সাংবাদিকের সত্য প্রকাশ করার অধিকার। এই অধিকারগুলির উপর শাসকসমাজের আক্রমণ প্রতিহত করার ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার সামাজিক কর্তব্য ছিল তদানীন্তন বুদ্ধিজীবীদেরই। কিন্তু তারা যখন প্রায় সম্পূর্ণই বেপাত্তা তখন একমাত্র সমর সেনই ইস্পাত-দৃঢ়তা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, রাজনৈতিক মতামতের কোনো তোয়াক্কা করেনি। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা বার বার মনে পড়ে। হয়ত, একটা তুলনাও। কবি ও শিল্পীর সামাজিক কর্তব্যের পথ থেকে কখনও বিচ্যুত হননি রবীন্দ্রনাথ। সন্ত্রাসবাদীদের হত্যার রাজনীতির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না, কিন্তু হিজলী জেলে অসহায় বন্দীদের ওপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি-ই ভাষণ দিয়েছিলেন। তবে তাঁর ছিল একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতির বাতাবরণ। সমর সেনের কি ছিল? না ছিল তার সেই অর্থে কোনো আন্তর্জাতিক খ্যাতি বা স্বীকৃতি, না ছিল অর্থ কৌলীন্য। তার বন্ধুরা হয়ত অনেকেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। তাঁরা কি পারতেন না ঐ ফ্রন্টিয়ার পত্রিকাটিতে সাহস করে তাঁদের জানা ঘটনাগুলি প্রকাশ করতে? প্রতিবাদ না করুন, অন্তত প্রশ্ন তুলতে? বুদ্ধিজীবীদের সংগঠিত শক্তি তাঁদের কাছে অপরিচিত নয়। এই সেদিনও তো তথাকথিত শিক্ষা-বাঁচানোর দাবিতে তাঁরা মিটিং করেছেন, মিছিল করেছেন, অনশন ধর্মঘট পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু এই সংগঠিত শক্তি সত্তর দশকে ছিল নিস্তেজ ও নিষ্ক্রিয়।

সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ ও এককভাবে নিজের ভূমিকা পালন করে চলে গেল সমর। কবি সমর সেনের মধ্যে আমি বিশ্বকবিকে খুঁজে পাবার চেষ্টা কখনও করিনি। কিন্তু সত্তর দশকের সাংবাদিক সমর সেনের মধ্যে দেখেছি সত্যনিষ্ঠ সেই বিরাট পুরুষেরই ছায়া।

স্নমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

সীমান্ত পেরিয়ে

পঞ্চাশের দশকে যখন আমরা কলেজে পড়ি, সমর সেনের কয়েকটি কবিতার লাইন আমাদের কয়েকজনের মুখে মুখে ঘুরত। সমরবাবু অবশ্য তার অনেক আগেই কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। বোধ হয় ইঁচড়ে পাকা ছিলাম বলেই ঐ বয়সে আমাদের সবচেয়ে প্রিয় লাইন ছিল—"যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে। / বছর দশক পরে যাব কাশীধামে!" সন্ধ্যাব কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কতবার মনে মনে আউড়েছি—"কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও / লম্পটের পদধ্বনি / কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও / হে শহর হে ধূসর শহর!" কিংবা, অসময়ে কলেজের ক্লাস শেষ হ'য়ে গেলে কোনদিন মনে প'ড়েছে—"কাছা-কাছি কোনো বন্ধুর আড্ডা, কোনো হস্টেল / সেখানে উত্তেজনাহীন অশ্লীলতায় / কাটুক একটি সন্ধ্যা"।

তখন আমরা একটা রাজনৈতিক স্থিতাবস্থার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলাম। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি সদ্য আত্মগোপনতা থেকে বার হয়ে এসে নির্বাচনী রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে, এবং আমাদের পার্টির নেতারা এখন আমাদের বোঝাচ্ছেন কি ভাবে একটার পর একটা নির্বাচন জিততে জিততে আমবা দিল্লিতে ক্ষমতা দখল করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। যুক্তফ্রন্ট সরকাব, নকশালবাড়ি, থানায় পুলিশী উৎপীড়ন, রাস্তায় কিশোবদের মৃতদেহ—এ সব তখনও অনেক দূরে। তবুও, ঐ শান্ত-শিষ্ট বাজনীতি চর্চার দিনেও, সমাজতন্ত্রেব অবশ্যম্ভাবিতা স্বীকার করেও, মনের কোন এক অন্তস্থলে একটা অবিশ্বাসী হাওয়া ঘুরত। সন্দেহ হত—আমাদের দিয়ে কি কিছু হবে? নিজেদের তো হাড়ে হাড়ে চিনি! আর তখনই, মনে পড়ত সমর সেনের লাইনগুলি—"...ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস / অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি, / আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি: / আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই; / তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংশক মন / সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে / অতৃপ্তবতি উর্বশীর অভিশাপ।"

আরও পরে, সমরবাবু চলে যান মস্কোতে—বোধ হয় ১৯৫৭-এ। ইতিমধ্যে বিংশতি কংগ্রেস, নিঃস্তালিনীকরণ হয়ে গেছে; চীনের সঙ্গে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির বিবাদের অনুচ্চ ও অস্পষ্ট গুঞ্জন ১৯৬০-এর শুরুতেই আমাদের কানে আসছিল। সোবিয়েত ইউনিয়নের প্রতি আস্থায় চিড় ধরতে শুরু করেছে। এই মানসিক অবস্থায়, মস্কো থেকে সমর বাবুর নিয়মিত লেখা (বার হোত,

অধুনা বিলুপ্ত 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' ও 'ইকনমিক উইকলি' — পরে যা 'ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিক্যাল উইকলি'তে রূপান্তরিত) পড়তাম আগ্রহসহকারে। প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক বিশ্লেষণ না থাকলেও, তখনকার সোবিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক অবস্থার একটা চমৎকার ছবি পেতাম।

সমরবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯৬২তে। উনি তখন রাশিয়া থেকে ফিরে একটি বিজ্ঞাপন সংস্থায় কিছুদিন কাজ করার পর 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এ যোগ দিয়েছেন সহকারী সম্পাদক হিসেবে। আর আমি সবে 'স্টেট্সম্যান' পত্রিকায় সংবাদদাতার চাকরি পেয়ে ঢুকেছি। সে-সময় চিত্তরঞ্জন অ্যাভেন্যুর 'কফি হাউসের' 'হাউস অফ্ লর্ড্স' ছিল দৈনিক মধ্যাহ্নকালীন আড্ডার জায়গা— সাংবাদিকদের, বিজ্ঞাপন সংস্থার কর্মীদের, উঠতি চলচ্চিত্র পরিচালকদের, কবি, সাহিত্যিক-শিল্পীদের। দুপুর দেড়টা নাগাদ আমার আপিস থেকে রাস্তা পার হয়ে 'হাউস অফ্ লর্ডস্'-এ চলে আসতাম। সমরবাবুও ততক্ষণে পৌঁছে যেতেন। টেবিল ঘেরা জমায়েতে, স্বল্পবাক সমর বাবু কোনদিনই মধ্যমণি ছিলেন না। কিন্তু মাঝে মধ্যে প্রায়ই তির্যক কোন মন্তব্য, বা হঠাৎ একটা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, আমাদের সচকিত করে দিত ওঁর উপস্থিতি সম্বন্ধে! উচ্চরোলের হাসির খোরাক ছিল না এসব মন্তব্য; কিন্তু মনে রাখার মত।

সে সময়টা ছিল অস্বস্তিকর। অতীতের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থাটা ভাঙতে শুরু করেছে। ১৯৬২ চীন-ভারত যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। আনন্দবাজার পত্রিকার (যার ইংরেজি সংস্করণ 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' সমরবাবু কাজ করতেন) সাংবাদিক গোষ্ঠী 'স্বাধীন সাহিত্য সমাজ' বা ঐ জাতীয় কি একটা নামের সংগঠন তৈরি করে প্রচণ্ড কমিউনিস্ট বিরোধী প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছে। 'স্টেট্সম্যানে' আমরা কয়েকজন রিপোর্টার ছিলাম হয় পুরোন কমিউনিস্ট, হয় দরদী, নয় ঐ ভাবাপন্ন (আমি তখন সি. পি. আই পার্টির সভ্য ছিলাম। ফলে, আমাদের উপর 'আনন্দবাজারের' সাংবাদিকেরা প্রায় খড়্গ-হস্ত। ঠিক ঐ সময়-ই, কেন জানি না, হঠাৎ আমাদের 'রিপোর্টারদের' ঘরে একটা 'এয়ার-কণ্ডিশনার' বসানো হল। একদিন কফি হাউসে গেছি। দেখি, সমরবাবু মুচকি মুচকি হাসছেন। বললেন— "আপনারা এয়ার কণ্ডিশনার বসিয়ে আমাকে বিপদে ফেলেছেন।" জানতে চাইলাম কেন। বললেন—"হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডের রিপোর্টাররা আমার কাছে এসে বলছেন—স্টেট্সম্যানের রিপোর্টাররা 'এয়ার কণ্ডিশন্ড' ঘরে কাজ করছে; আমাদের ঘরেও 'এয়ার কণ্ডিশনার' দরকার।" জিজ্ঞেস করলাম—"আপনি কি বললেন?" কফির কাপে চুমুক দিয়ে সমরবাবু জবাব দিলেন—"বললাম— আপনাদের তো 'এয়ার কণ্ডিশনারে' চলবে না; 'গ্যাস চেম্বার' দরকার হবে।"

ঐ সময়ের-ই আর একটা ঘটনা। (এটা অবশ্য সমরবাবু আমাদের বলেন

নি ; ওঁরই কোন সহকর্মীর কাছে শোনা)। 'আনন্দবাজারের' পাতায় তখন দৈনিক দেশপ্রেমিকতার বাণী বার হচ্ছে ; উৎকট স্বাদেশিকতার আগুন ঝরছে। একদিন সমরবাবু, পত্রিকার তৎকালীন মালিক অশোক সরকারের ঘরে গিয়ে বই-এর তাক থেকে Dictionary of Quotation এর কপি বার করে পড়ছেন। অশোকবাবু জিজ্ঞেস করলেন—"কি ব্যাপার, সমরবাবু? কি খুঁজছেন?" নির্বিকার মুখে সমরবাবু জবাব দিলেন—"দেখতে এসেছিলাম Dr Johnson আসলে কি লিখেছিলেন—Patriotism is last resort of Scoundrels, না first resort of Scoundrels."

'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে' স্বভাবতই সমরবাবু বেশিদিন টিকতে পারেন নি। ১৯৬৪ সালে কলকাতায় সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা বাঁধে। ওঁর অজ্ঞাতসারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনামুখর খবর ছাপানোর প্রতিবাদে উনি 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' থেকে পদত্যাগ করেন। পরের দিন কফি হাউসে গেছি। দেখি সমরবাবু এক কোণে বসে আছেন। কি করবেন এবার জানতে চাইলে, মৃদু হেসে বললেন—"ভাবছি আপনাদের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেব—Old whore open to offers!"

তার পরবর্তী বছরগুলো সমরবাবুর পক্ষে অনেক সময়ই বেদনাদায়ক হয়েছিল। *Now* পত্রিকা শুরু করা, হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে মত পার্থক্যের পর *Now* থেকে বিদায় গ্রহণ, ***Frontier***-এর প্রতিষ্ঠা, সত্তর দশকের সেই অশান্ত আবহাওয়া, কংগ্রেসী গুণ্ডাদের উৎপাত, বন্ধুদের সঙ্গে মতানৈক্য, পত্রিকা চালনার দৈনন্দিন দুর্ভোগ, আর্থিক অনিশ্চয়তা, ব্যক্তিগত জীবনে আপনজনের মৃত্যু—এ সবের মধ্য দিয়ে সমরবাবু নিবাত নিষ্কম্প হয়ে যেন চলেছিলেন। নিন্দা ও প্রশংসা—কোনটাই তাঁকে বিচলিত করে'নি কখনও। নিষ্করুণ আত্মবিশ্লেষণ ও তিক্ত কৌতুকরস—এই দুটো গুণ বোধহয় ওঁকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করত। মনে আছে, কয়েক বছর আগে, প্রেসের অসুবিধা, ইনকাম ট্যাক্সের তাগাদা, কর্মচারীদের মাইনে দিতে গিয়ে আর্থিক অসঙ্গতি—এই সব মিলিয়ে এক নিদারুণ পরিস্থিতিতে সমরবাবু প্রায় কিছু কূল-কিনারা পাচ্ছেন না ; হঠাৎ সবকিছুকে এক প্রচণ্ড ঠাট্টায় পর্যবসিত করে বললেন—"জানেন? মহিলাদের জীবনে menopause একটা critical period। আমার জীবনে এটা brainopause। কিছু ভাবতে পারছি না আর!"

যৌবনে, সেই কবিতা লেখার সময়ই, বোধহয় উনি বুঝেছিলেন স্বপ্ন দেখাটা নিরর্থক, কিছু আশা করা বৃথা। নিয়মিত কবিতা-রচনা ত্যাগের পূর্বমুহূর্তে লিখেছিলেন—"রোম্যান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।" (জন্মদিনে, ১৯৪৬) হয়তো বুঝেছিলেন, মনের গভীরে, শেষ পর্যন্ত, লড়াইটা একাই চালাতে হবে। কিন্তু এই নিঃসঙ্গ যাত্রায় লড়াই-এর উদ্দেশ্য কি—সেটা বুঝতে কোনদিনই

ভুল হয় নি। যদিও আক্ষেপ করেছিলেন—"যদি বা পাঠালে পৃথিবীতে / তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর!" সেই অতীত যৌবনেও কবি সমর সেন চিনেছিলেন—"ধান জল বিদ্যুত কয়লা / আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে", এবং স্বীকৃত ছিলেন—"তাদের মিতালি খুঁজি / তাদের জীবন কর্কশ কঠিন, হয়তো মলিন / নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে, / তবু তারা কালের সারথি, / তাদের দোস্তি, তাদের গতি / আমার পরমা যতি।" (গৃহস্থবিলাপ)।

পরবর্তী যুগে, সম্পাদক সমর সেন তাঁর এই 'দোস্ত'দের সংগ্রামের সক্রিয় সাথি হ'তে পারেন নি বটে ("এ কথা বলেছি আগে, আবার বলি: / আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডূক, / ছাপোষা মানুষ…", 'লোকের হাটে'), কিন্তু তাদের লড়াই-এর ইতিহাস লিপিবদ্ধর ব্যবস্থা করেছিলেন *Frontier*-এর পাতায়। বামপন্থী রাজনীতির কূট তর্কে কোনদিন যান নি, কিন্তু একটা ব্যাপারে partisanship বা পক্ষপাতিত্ব ছিল—যখনই যারা উৎপীড়িত, তাদের সপক্ষে ছিলেন। মনে আছে, বোধহয় ১৯৭২ সালে, যখন নকশাল আন্দোলনে নানা ধরনের অস্বস্তিকর প্রবণতা, অস্পষ্ট তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, ও অর্থহীন ভ্রাতৃঘাতী কোন্দল আমাকে অস্থির করে তুলেছিল, আমি একটা কড়া সমালোচনা লিখে পাঠিয়েছিলাম। লেখাটা ফেরৎ পাঠিয়ে সমরবাবু আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন (আমি তখন দিল্লি-প্রবাসী—কলকাতার তৎকালীন উত্তপ্ত বাস্তব থেকে অনেক দূরে) যে আমার সমালোচনাটা সময়োপযোগী নয় কারণ তখনকার অবস্থায় নকশালপন্থীরা অত্যাচারের শিকার, সুতরাং, ওঁর ভাষায়—"যারা underdog এখন, তাদের বিরুদ্ধে এতটা তীব্র সমালোচনা ছাপানো সম্ভব নয়।" যদিও, বলে রাখা দরকার—এর আগে ও পরে—বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে (আমারও) নকশাল আন্দোলনের সমালোচনা করে।

চীনের সম্বন্ধে একটা দুর্বলতা ছিল ওঁর বরাবরই। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 'রেড্ গার্ডদের' অমিতাচার ওঁর সাহিত্যিক মননকে ব্যথিত করেছিল কিনা জানি না; পরবর্তী যুগে চৈনিক নেতাদের নানা ধরনের রাজনৈতিক ডিগ্‌বাজী সম্বন্ধে উনি কি ভাবতেন, তাও জানি না। আমি পারতপক্ষে এ সব আলোচনায় যেতাম না। দুজনের মধ্যে একটা অনুচ্চারিত ও অলিখিত চুক্তি তৈরি হয়েছিল—আমি চীনের বিরুদ্ধে কোন তীব্র সমালোচনা মুখর লেখা *Frontier*-এ পাঠাব না যাতে ওঁকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। এ ব্যাপারেও অবশ্য ওঁর মনে একটা Cynical ঠাট্টার স্বর ছিল। মনে আছে কয়েক বছর আগে যখন Jan Myrdal এ দেশে এসেছিলেন এবং সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করেন (Jan তখন উৎকট চীন প্রেমিক—ওঁর লেখাও *Frontier*-এ ছাপা হয়), পরে সমরবাবু বলেন—"Jan ১৫০ ডিগ্রি চীনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন!"

সমরবাবুর একক লড়াই-এর অনুপ্রেরণাতেই *Frontier*-এর জন্ম বলা যেতে পারে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক রাজনৈতিক অবস্থার প্রভাবে *Frontier* এক যৌথ মানসিকতার প্রতিফলন হয়ে উঠেছিল। ওঁর মৃত্যুর পর, আমার অধ্যাপক—অরুণ দাশগুপ্ত (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের) আমায় একটা চিঠিতে লিখেছিলেন—"সমর সেন তরুণদেব জন্য একটি সীমান্ত খুলেছিলেন। প্রথম স্তরে সেটা ছিল অতিক্রম করার সীমান্ত, আক্রমণের প্রস্থানভূমি। পরে ইতিহাসের অমোঘ চাপে হয়ে দাঁড়াল আত্মরক্ষার সীমান্ত। দলের ক্ষেত্রে বোধ হয় এটাই অনিবার্য। সমর সেনের সীমান্ত কিন্তু এক অর্থে ব্যক্তির প্রক্ষেপ। একক মানুষের প্রতিরোধ এবং নিভৃতি। এই অর্থে আমরা সকলেই একেকটি সীমান্ত রচনা করি আমাদের চারপাশে। এ যুগে বাঁচবার এটাই পথ। একমাত্র এই কৌশলেই নিরস্ত্র কবিও হতে পারেন সৈনিক।" আমার মনে হয় সমর সেন ও *Frontier* সম্বন্ধে এই মূল্যায়নটাই শেষ কথা।

নিত্যপ্রিয় ঘোষ

সম্পাদক সমর সেন

সমরবাবুর কাগজে আমার যে-ভাবে চাকরি হয়েছিল, সেটাতে আমার ক্ষুব্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু তখন না-বুঝে আহ্লাদিত হয়েছিলাম। শুনেছিলাম, নাও পত্রিকাতে এক পাতা লিখতে পারলে কুড়ি টাকা পাওয়া যায়। আমার তখন শিয়রে সমন। কলকাতার একটি অখ্যাত বেসরকারি কলেজে তখন পড়াই, আর কলেজের অধ্যাপক-দের তখন রমরমা অবস্থা নয়। ১৯৬৫ সালে কুড়ি টাকাও ভালো টাকা, এক পাতা লেখার জন্য বছর পাঁচেক কলকাতার বাইরে থাকার পর, শুনলাম কলেজের সহপাঠী শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় নাও পত্রিকার সহ-সম্পাদক হয়েছে। তার কাছে গিয়ে বললাম, লেখা যাবে? শ্যামলেন্দু আশ্চর্য হয়ে বলল, তোমার সঙ্গে সমরবাবুর আলাপ নেই? আমি না বলায়, সমরবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, এ আমার সঙ্গে পড়ত, সরকারি আমলার চাকরি ছেড়ে কলেজে পড়াচ্ছে। সমরবাবু হাসলেন, বললেন, লিখুন না। তখন পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ, কলকাতায় সিভিল ডিফেন্সের পাঁয়তারা চলছে। কিছুদিন আগে নাগপুরে সিভিল ডিফেন্সের একটা ট্রেনিং-এ গিয়েছিলাম, কাগজপত্রও ছিল, কেন যেন সেগুলো নাগপুর থেকে ফেরার সময়ই ফেলে দেই নি। কাগজগুলো কাজে লেগে গেল। মাসখানেকের মধ্যে কুড়ি টাকা পাওয়া গেল। খবরের কাগজের বা সাময়িক পত্রের পক্ষে লেখার জন্য অত তাড়াতাড়ি টাকা দেওয়া যে স্বাভাবিক নয় সেটা আমার জানা ছিল না। কয়েক দিন পরে শুনলাম, শ্যামলেন্দু চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কফি হাউসে কী শুঁড়িখানায় মনে নেই, চাকরিটা আমার হতে পারে কি না। বোধহয় শুঁড়িখানাতেই। কেননা শ্যামলেন্দু উত্তর দিয়েছিল ইংরেজিতে, যার মর্ম হলো, যদি তার ময়লা জুতো পরায় আমার আপত্তি না থাকে, তাহলে তারও নেই। সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম নাও-এর আপিসে, শ্যামলেন্দুর চাকরিটা আমার হতে পারে? সমরবাবু নিঃস্পৃহস্বরে বললেন, ঢুকে যান।

ঢুকে গেলাম। পার্ট টাইম চাকরি হলেও চাকরি এবং মাইনে তখনকার দিনের ফুলটাইম কলেজের চাকরির মতোই। এমন মসৃণভাবে চাকরিটা হয়ে গেল যে আমার ধারণা হয়েছিল যে সিভিল ডিফেন্স বিষয়ে আমার রচনাটি এতই আকর্ষণীয় হয়েছিল যে সেই সূত্রেই আমার চাকরিটা হলো।

ধারণাটি ভেঙেছিল বহুদিন পর, দুটো ঘটনায়। দুটো ঘটনাই বিচিত্র। যুক্তফ্রন্ট তখন ভেঙে গেছে, প্রফুল্ল ঘোষের আমল। শোনা গেল যাবতীয় বাম নেতাদের ধরা হচ্ছে, বাম সাংবাদিকদেরও। তবে প্রথম সারির নেতাদের ছেড়ে

দ্বিতীয় সারির নেতাদের। খবরটি কে যেন লালবাজার সূত্রে সমরবাবুকে জানিয়েছিলেন, বোধহয় কোনো সাংবাদিকই। সেই সাংবাদিক নাকি স্বকর্ণে আমার নাম শুনে এসেছিলেন ধরপাকড়ের লিস্টে। পরের দিন, সমরবাবু খুব ঠাণ্ডা গলাতেই আমাকে খবরটি জানালেন। বললেন, আমার কাগজে আমি এক নম্বর, আপনি দুনম্বর অতএব আপনাকেই ধরবে, আপনি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে যান। আর ধরা পড়লে বলবেন, কাগজের মতামত সম্পর্কে আপনার কোনো দায়িত্ব নেই। আপনি শুধু মেক-আপ করেন। পুলিশ আমাকে ধরতে পারে শুনে আমার রক্ত হিম হয়ে গেলেও, আমি শুধু মেক-আপ করি এমন বলার পরামর্শটা আমার কাছে তেমন সম্মানজনক ঠেকল না। সমরবাবু চাকরিতে ঢোকার সময় অবহেলাভরে আমাকে নিয়েছিলেন, বাড়ির ঝি নিয়োগের সময় গৃহকর্ত্রীরাও এত অবহেলায় ঝি নেন না! হঠাৎ সে-কথা মনে হলো, হয়তো আমার গুরুত্ব ওই মেকআপম্যানের মতোই। নাও তখন প্রত্যেক শুক্রবার বেরুত। বড়ো লেখাগুলো আগের সপ্তাহে সেটিঙ করিয়ে নিয়ে আসা হতো. প্রেসে সোমবার ছ-টি সম্পাদকীয় মন্তব্য যেত, মঙ্গলবার মেকআপ করা হতো. বুধবারে আমরা দুজন প্রেসে গিয়ে বসতাম। মঙ্গলবারটা সমরবাবু নাজেহাল হয়ে যেতেন, স্কেল দিয়ে লেখাগুলো মেপে মেপে কিছুতেই থৈ পেতেন না। লেখা বড়ো হলো কি মাপসই হলো, না সাদা জায়গা পড়ে রইল। এই কাজটা আমি ভালো পারতাম, সমরবাবু মৃদু হাসতেন. অর্থাৎ হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমিও নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ ভাবতাম. আমাকে ছাড়া নাও অচল এমন মনে করতাম। সমরবাবুর একবার হাত ভেঙে গেল, একবার জ্বর হলো. একবার স্পণ্ডিলিওসিস বেশ চাড়া দিল. পুজোর সময় দিল্লি যাবেন বা পুরী, একটু বেশি দিনের জন্য. আমি ছিলাম অগতির গতি। বর্ষাকালে তাঁর সুইনহো স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে ফ্লাড হতো, তিনি জলবন্দী অবস্থায় বাড়ি থেকে আর্তনাদ করতেন, প্রেসে ফোন করতেন. আপনি কী করে প্রেসে পৌঁছলেন, যাক তাহলে কাগজটা ঠিক দিনে বেরুবে। আমিও নিজেকে মহামূল্যবান মনে করতাম। একবার পুরী অথবা অন্য কোথায় যাওয়ার সময় বলে গেলেন, অন্য লেখা যা হচ্ছে তাই করবেন. কিন্তু সম্পাদকীয়গুলোতে একদম হাত দেবেন না, যাঁরা লেখেন তাঁরা হাত দিলে ভীষণ চ্যাঁচান। আর নীরদবাবুর লেখা যদি বেশি গণ্ডগোলের মনে করেন, তবে ছাপবেন না। গণ্ডগোলের অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীকে বাপ তুলে গালাগাল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে আমি যখন মগ্ন, সেই সময় আমাকে মেকআপম্যান বলার পরামর্শ অত্যন্ত ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। তবে সমরবাবু ক্ষোভের ইঙ্গিত পান নি। কারণ ক্ষোভ ছাড়া আমার ভয়ও ঢুকেছিল, দাদার শ্যামবাজার ফ্ল্যাটে আমি তখন আশ্রয় নিয়েছিলাম। কারণ সমরবাবু আমাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে বলেছিলেন। বলতে লজ্জা হয়, আমি আণ্ডারগ্রাউণ্ড কথাটার মানে জানতাম না, যদিও খুব লিখতাম।

আমার ধারণা ছিল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড মানে শহর ছেড়ে গ্রামে, পারলে জঙ্গলে এবং আরো পারলে কাঠুরিয়ার ছদ্মবেশে থাকা। তাই সমরবাবু আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যেতে বললে আমি যেমন খুব উত্তেজিতও, তেমনি রোমাঞ্চিতও। আবার ঘাবড়েও গিয়েছিলাম। আমি সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাব আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। সমরবাবু বললেন, আপনার দাদার ফ্ল্যাটে। এমনভাবে বললেন, যেন বছরে তিনবার তাঁর আণ্ডারগ্রাউণ্ডে যাওয়া অভ্যাস। তিনি নিজেও ভীতু প্রকৃতির লোক বলে আমার ধারণা। 'বাবু বৃত্তান্তে' তিনি এক জায়গায় লিখেছেন, পুলিশ তাঁর বাড়িতে হানা দিয়েছিল, সে কথা তিনি চেপে গিয়েছিলেন, কেননা সেটা জানাজানি হলে তার কাগজের লেখকেরা ঘাবড়ে যাবেন। এটা পড়ে মনে হয়েছিল, এ নিশ্চয়ই আমাকে উদ্দেশ করেই লেখা। বস্তুত, নাও কাগজের সম্পাদকীয়তে কী লেখা হবে, সেটা ছাপা না হওয়া পর্যন্ত আমি জানতে পারতাম না, প্রুফ দেখার সময়টা বাদ দিলে। এমন কি, কে লিখছেন, সেটাও জানতাম না, কেননা যারা লিখতেন তাঁরা সকলেই প্রায় বনেদী কাগজে চাকরি করেন, স্বনামে তো লিখতেনই না, আর সম্পাদকীয়তে নাম দেওয়ারও কোনো রেওয়াজ নেই। যেখানে কে লিখছেন, কী লিখছেন, জানাই আমার পক্ষে মুশকিলের ছিল, সেখানে সম্পাদকীয় মতামত নির্ধারণে আমার কোন ভূমিকা থাকবে না, সেটা বলা বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নাও-এর ম্যানেজার আতাউর রহমান সাহেব প্রায়ই এসে অনুযোগ করতেন, লেখায় অতো উগ্র কেন? সম্পাদকীয় অবশ্য আমিও লিখতাম, তবে নিরীহ বিষয়ে, অর্থাৎ ক্রিকেট খেলাধুলা নিয়ে, অথবা ঐ বিষয়ে, সাহিত্যের হতো কোনো ব্যাপার ঘটলে। তা সত্ত্বেও, উগ্রতা নিয়ে আতাউর সাহেবের অনুযোগ শুনলে আমি বেশ রোমাঞ্চিত হতাম, বুঝতাম, আমার মতো তিনিও জানেন না, কে কোনটা লিখছেন। আসলে, বৈষয়িক ব্যাপারে, এমন কি কাগজের অস্তিত্বের ব্যাপারে তিনিই ছিলেন হুমায়ুন কবীরের, যাকে বলে, [illegible]। কিন্তু মতামত নিয়ে সমরবাবুর সঙ্গে তর্ক করা তাঁর সাহসে কুলোত না, ফলে রাগের চোটটা আমার উপরেই পড়ত। বিজ্ঞাপনের ম্যানেজার মনীষ সরকারও আমার উপর চোটপাট করতেন, সম্পাদকীয় উগ্রতার জন্য তিনি বিজ্ঞাপন পাচ্ছেন না, কাগজটাই যদি উঠে যায় বিজ্ঞাপনের অভাবে, তাহলে মশাই উগ্র হবেন কীভাবে, এমন কথা প্রায়ই শোনাতেন। এই সব অনবরত শুনে, এবং অবশ্যই বন্ধু-পরিচিত মহলে, আমারও ক্রমে ক্রমে ধারণা হয়ে যাচ্ছিল, নাও-এর সম্পাদকীয় নীতি নির্ধারণে আমারও ভূমিকা আছে। এই যখন অবস্থা, তখন মেকআপম্যান বলাতে আমার ক্রোধ হতেই পারে!

দ্বিতীয়বার নিজের গুরুত্ব অথবা তার অভাব সম্পর্কে অবহিত হলাম, যখন সমরবাবুর 'বাবু বৃত্তান্ত' বের হলো। তখন ফ্রন্টিয়ার-এর যুগ। সেখানে আমি কখনোই

চাকরি করি নি এবং দু'তিন বছর পর লেখাও ছেড়ে দিয়েছি, আবার সরকারি চাকরি নেওয়ার জন্য। প্রকাশক জগতের এক পরিচিত ভদ্রলোক আমাকে রাস্তায় পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা শুনেছিলাম আপনি নাও-এ কাজ করতেন কথাটি কি সত্য নয়? অবাক হয়ে বললাম, কেন, একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? শুনলাম, সমরবাবু আত্মজীবনী লিখছেন, তাতে আমার কোনো উল্লেখ নেই। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হলো না। কেননা এক-বিঘৎ লেখার চাইতে বড়ো লেখা সমরবাবু আর লিখতে পারেন না সম্পাদকীয় লিখে লিখে, তার চাইতে বড়ো লেখার অভ্যাস তাঁর নষ্ট হয়ে গেছে। এমন দুঃখ তিনি প্রায়ই করতেন, এমন কি বাংলা লেখাও অভ্যাসের অভাবে তিনি লিখতে পারতেন না। আরো অবাক হলাম যখন শুনলাম, পুরো পাণ্ডুলিপিই প্রকাশক পেয়ে গেছেন।

খুবই মর্মাহত হলাম। পরের দিন, ফ্রন্টিয়ার-এর বিজনেস ম্যানেজার রবি সেনকে দুঃখটা জানালাম, সমরবাবুর জীবনে আমার কোনো অস্তিত্বই নেই। রবিদা বললেন, তাই নাকি, তুমি কেহে, তোমার কথা সমরবাবু লিখতে যাবেনই বা কেন? তুমি তো নাও-এর চাকর ছিলে। নিজেকে তখন আশ্বাস দিলাম, সমর-বাবু লিখছেন 'বাবু বৃত্তান্ত', আমি বাবুর দলে পড়ি না বলেই হয়তো আমার নাম নেই। কিন্তু কয়েক দিন পর রবিদা জানালেন, দুঃখ কোরো না, তোমার নামটা আমি ঢুকিয়ে দিয়েছি। আসলে বইটা ছাপা হয়ে গেছে, সেখানে তোমার কথা বলার জায়গা নেই, তবে থাকবে থাকবে, তোমার নামও থাকবে। যখন বইটা বেরুল, তাজ্জব হয়ে লক্ষ করলাম, বইটির ছ লাইনের একটি ভূমিকা আছে, তাতে সমরবাবু লিখছেন, নাও-এর সম্পাদনায় যাঁরা তাঁকে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম বাদ পড়ে গেছে, একজন নিত্যপ্রিয় ঘোষ আর একজন শ্যামলেন্দু বন্দ্যো-পাধ্যায়। সাপ্তাহিক কাগজে যে-পদ্ধতিতে তিনচার লাইন লিখে ভ্রম সংশোধন করতেন, ঠিক সেই পদ্ধতিতেই তিনি বইয়ে ভ্রম সংশোধন করেছেন: কোনো বইয়ের ভূমিকা যে এভাবে লেখা হতে পারে, আমার কাছে অকল্পনীয় ছিল।

'বাবু বৃত্তান্তে'র দ্বিতীয় সংস্করণে ভূমিকাটির বিষয় গ্রন্থের মধ্যে চলে গেল, আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম, ভূমিকাটি চক্ষুশূল হয়েছিল। শ্যামলেন্দুরও বাঁচার কথা, তবে জানি না, ও এসব বিষয় গ্রাহ্য করে কি না। এমনিতেই শ্যামলেন্দু মিতবাক্। একবার ফ্রন্টিয়ার-এ অথবা নাও, মনে নেই কোন্‌টায়, ওকে লিখতে বলেছিলাম। ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিল, পয়সা ছাড়া আমি লিখি না। নাও পয়সা দিত, হয়তো শ্যামলেন্দুর দাবি বেশি ছিল, অথবা অন্য কোনো কারণ ছিল। চাকরি করার সময় সমরবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, শ্যামলেন্দু নাও ছাড়ল কেন। দুঃখিত স্বরে সমরবাবু বলেছিলেন, আমি একবার economy drive-এর কথা বলে-ছিলাম, শ্যামলেন্দু সেটা নিশ্চয় কোনো ইঙ্গিত ভেবেছিল। শ্যামলেন্দুর সঙ্গে সমর-

বাবুর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল, কিন্তু সমরবাবুর কাগজে আর লেখে নি, তবে সমর-বাবুর মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকায় একটা ছোটো প্রবন্ধ লিখেছিল। শ্যামলেন্দুর লেখা কেমন ছিল, প্রশ্নের উত্তরে সমরবাবু বলেছিলেন, বড়ো উগ্র ছিল, লেখা খুব sub করতে হতো। আমি হেসেছিলাম। সমরবাবু নিজের লেখায় উগ্র ছিলেন, কিন্তু অন্যের লেখার উগ্রতা পছন্দ করতেন না। নাও-এ যাঁরা সমর-বাবুর অ্যাসিস্টান্ট ছিলেন, তাঁদের মধ্যে উৎপল দত্ত সম্পর্কে সমরবাবু ছিলেন উচ্ছ্বসিত। বেশিক্ষণ থাকত না, কিন্তু যেটুকু কাজ করত, একেবারে নিখুঁত—এত-বড়ো সার্টিফিকেট সমরবাবুকে অন্য কোনো লেখক সম্পর্কে দিতে দেখি নি।

প্রসঙ্গে ফিরে আসি। আমার নাও-এর কাজের জন্য সমরবাবুর কাছে যে বিশিষ্ট ছিলাম না, সেটা যখন টের পেলাম, পরবর্তী কালে, একবার ওই মেক-আপম্যান বলায় আর দ্বিতীয়বার বইয়ের ভূমিকা দেখে, তখনই ঠিক করেছিলাম, ফ্রন্টিয়ার-এ আর লেখা দেব না। পরে শুনেছিলাম কোনো পুরনো বন্ধু তাঁর কাছে গিয়ে লাগিয়েছিল, ফ্রন্টিয়ার-এ লিখে আমি কেরিয়ার নষ্ট করতে চাই না, এইজন্য লেখা ছেড়েছি। কথাটি একেবারেই সত্য ছিল না, কিন্তু সমরবাবু একথা বিশ্বাস করেছিলেন। রেগেও গিয়েছিলাম, কিন্তু সমরবাবু দুয়েকবার ফোন করে লেখা চেয়েছিলেন, এবং তাঁর অমর্যাদা হবে এই ভয়ে লেখা দিয়েও এসেছিলাম। লেখা ছাড়ার আর একটা কারণ ছিল ধরপাকড়ের ভয়। একজন আমাকে বুঝিয়ে-ছিলেন, সমরবাবুর অগুণতি ভক্ত আর বন্ধু। খোদ পুলিশ কমিশনারই তাঁর ভক্ত। যদি সরকার চাপ দেয়, পুলিশ লোক দেখানোর জন্য তোমাকেই প্যাঁদাবে, সমর-বাবুকে ছোঁবে না, যদি বাঁচতে চাও, কেটে পড়ো। আমার এক পুরনো বন্ধু, পুলিশে চাকরি করে, হঠাৎ আমার বাড়িতে আনাগোনা শুরু করল। সেও ইংরেজির ছাত্র এবং অধ্যাপক ছিল, মুসৌরি থাকার সময় তাকে নিয়ে খুব মস্করা হতো, আমার সঙ্গেও খুব ভাব ছিল। মনে হলো, বোধহয় এখন র-য়ে কাজ করে। তাকে বললাম, আমার ভয়ের কথা। চা খেতে খেতে আচমকা আমার ভয়ের কথায় সে বিষম খেল, তারপর ধাতস্থ হয়ে বলল, ফ্রন্টিয়ার-এর ইংরেজি দিয়ে কী বিপ্লব হয়, ওতো বোঝাই যায় না। আর ফ্রন্টিয়ার-এর আজ এই ফ্যাকশনের কথা বেরুচ্ছে, কাল ওই ফ্যাকশনের, আর ফ্রন্টিয়ার-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে মনে হয়, সব ফ্যাকশনই পাগল, তাহলে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ফ্রন্টিয়ার-এর পার্থক্য কোথায়? চটে গিয়ে বললাম, রাশিয়াও সাম্রাজ্যবাদী, আমেরিকাও সাম্রাজ্যবাদী, অতএব রাশিয়া আর আমেরিকা এক হলো?

সমরবাবুর কথায় ফিরে আসি। সমরবাবু আড্ডাপ্রিয় ছিলেন, তবে নিজে বড়ো বেশি কথা বলতেন না। নাও-এর দফতরে অবশ্য আমরা দুজন ছাড়া আর বেশি কেউ নেই। সম্পাদকীয় যাঁরা লিখতেন, তাঁদের বেশির ভাগই, on ship

না in ship, এই জাতীয় সংশয় প্রকাশ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতেন। এক-জন ছিলেন, টাইমস অফ ইণ্ডিয়ার করেস্পণ্ডেণ্ট, তিনিই কেবল বসতেন, আর সমরবাবু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রাইটার্স, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট, বেলতলার খবর জিজ্ঞাসা করতেন। অবশিষ্ট সময়, কাজ না থাকলে, আমাদের গল্পের বিষয় ছিল পুরনো দিনের ইংরেজি অধ্যাপনা। তারকনাথ সেন সম্পর্কে সমরবাবুর খুব উঁচু ধারণা ছিল, আমার ধারণা তেমন উঁচু নয়। ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী অধ্যাপক পড়াবেন, কিন্তু তারকবাবু ছাত্রদের বিদ্যাবুদ্ধির তোয়াক্কা করতেন না, তাঁর নিজের বিদ্যাবুদ্ধি অনুযায়ী পড়াতেন। তাতে খুব ভালো ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হতো, বাকিরা হাবুডুবু খেত। এটা আমার আদর্শ অধ্যাপকের ধারণা নয়। সমরবাবু অবশ্য তারকবাবুর ছাত্র নন। তাঁর উঁচু ধারণার কারণ, তারকবাবু সমরবাবুকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আসামী অবশ্য শ্যামলেন্দু। শ্যামলেন্দু তখন ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনে কাজ করে এবং বছরটা ১৯৬৪, শেক্‌সপীয়ারের চারশো বছর পূর্তি উৎসব। ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন স্মারকগ্রন্থ বের করবে, ভাবতে শেক্‌সপীয়ার পড়ানোর ধরনধারন নিয়ে। এ বিষয়ে সমরবাবু ইণ্ডিয়ান অক্সিজেনকে সাহায্য করবেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তখন তিনি হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ছেড়েছেন, আনন্দবাজারের সাম্প্রদায়িক সম্পাদকীয়ের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে। বেকার অবস্থায় যদি কিছু পারিশ্রমিক পাওয়া যায়, এই আশাতেই তিনি সম্ভবতঃ এই স্মারকগ্রন্থের সঙ্গে জড়িত হতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু তারক সেন কোনরকম লেখা, সাক্ষাৎকার, মন্তব্য দিতে অস্বীকার করেন এবং কোনোরকম ভদ্রতা না রেখেই। গল্পটি আমার সমরবাবুর কাছে শোনা। শ্যামলেন্দু নিশ্চয়ই জানে, ঠিক কী ঘটেছিল। যাই ঘটুক তারকবাবু সম্পর্কে সমরবাবুর দেখলাম খুবই উচ্চ ধারণা, এই অস্বীকারের জন্য।

সমরবাবু খুব ভালো ছাত্র ছিলেন, এটা সবাইই জানেন। এবিষয়ে দুটো মত আছে। একটা মত, তিনি সবসময়েই মনে রাখতেন, তিনি ভালো ছাত্র ছিলেন। আর একটা মত, তাঁর ফার্স্ট হওয়া নিয়ে মোটেই তিনি গর্বিত ছিলেন না। এ বিষয়ে আমার মত, দুটো মতই সত্য। তিনবার আমি তাঁর কাছে একই কথা শুনেছিলাম, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।—বি.এ.-তে আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম, অশোক সেকেণ্ড হয়েছিল। অশোক বলে ও আমার থেকে চার নম্বর কম পেয়েছিল। আসলে ও ছয় নম্বর কম পেয়েছিল। পরীক্ষায় কী করে ফার্স্ট হতেন, খুব কি পড়তেন? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ও কিছু নয়, আমি খুব মুখস্ত করতে পারতাম। শুধু পদ্য নয়, গদ্যও আমি গড়গড় মুখস্থ বলে যেতে পারতাম।

সম্পাদনা কাকে বলে দেখতাম সমরবাবুর কাজে। অত্যন্ত বাজে লেখাও তাঁর সম্পাদনার গুণে উতরে যেত। দু'একটা শব্দ কেটে, বাগ্‌বাহুল্য ছেঁটে, পরেরটা

আগে, আগেরটা পরে করে দিতেন, তার পর যুতসই একটা ক্যাপশন দিলে চেহারাটা পালটে যেত লেখার। আমার সম্পাদকীয় মন্তব্য তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে আমি আড়চোখে দেখতাম, কতটা কলম চালান। সাধারণত, লেখকের সামনে সেই লেখকের লেখা পড়তে বা সম্পাদনা করতে তাঁর সঙ্কোচ হতো, পাছে বলতে হয়, লেখাটা চলবে না। কিন্তু সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রেসে পাঠানোর তাড়ায়, আড়ালের বিলাসিতা চলে না, ফলে আমার সামনেই তিনি আমার লেখা সংশোধন করতে বাধ্য হতেন। আড়চোখে দেখতাম, ঘসঘস কলম চালাচ্ছেন, তারপর বাণ্ডিলে ঢুকিয়ে রাখতেন প্রেসে পাঠানোর জন্য। আমিও লেখাটা আবার দেখতে চাইতাম না, যেন ও বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। প্রুফ দেখার সময় আশ্চর্য হতাম, আমার সব কথাই আছে, কোথায় যে অতো ঘসঘস কলম চালালেন হদিশ পেতাম না। কখনো কোনো শব্দ বা শব্দবন্ধ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহ থাকলে তিনি কখনোই অভিধান ঘাঁটতেন না, ফট করে কেটে দিতেন, বলতেন কানে ঠিক শোনাচ্ছে না। তাঁর আপ্তবাক্য ছিল, হোয়েন ইন ডাউট, কাট আউট। নীরদবাবুর ল্যাটিনপ্রীতি তিনি সহ্য করতে পারতেন না, আবার কাটতেও পারতেন না, অন্যথা আবার চিঠি চালাচালি, ঝগড়ার সূত্রপাত হবে বলে। একজন বিখ্যাত সম্পাদকীয় লেখকের মুদ্রাদোষ ছিল, লেখাতে 'ইট মে ..., অর ইট মে নট...' এই ধরনের বাক্য লেখাতে। সমরবাবু বলতেন, এর স্কুলটা খুব বাজে ছিল নিশ্চয়, মে'র মধ্যে যে নট আছে এটা এখনও শিখতে পারল না। ওই সম্পাদকীয় লেখক অবশ্য তাঁর বিবিসি'র ইংরেজি উচ্চারণ আর কুইনস ইংলিশ লেখার জন্য গর্বিত ছিলেন, কিন্তু সমরবাবু প্রায়ই চেষ্টা করতেন, ভদ্রলোককে না চটিয়ে, লেখাটা শেষ সম্পাদকীয় হিসাবে ব্যবহার করতে। ওর লেখায় মজা আছে, কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানের অভাব—এই ছিল সমর-বাবুর মত।

রিভিউ-এর ব্যাপারে নানারকম মজা ঘটত। অনেক বই আসত, যার রিভিউ করার লোক পাওয়া যেত না। নাও টাকা দিত বটে, তবে সে আর কত টাকা। যেসব রিভিউয়ার টাকা এবং পাঠক দুটোই পর্যাপ্ত পরিমাণে চাইতেন, তাঁদের কাছে নাও-এ লেখা যথেষ্ট লোভনীয় ছিল না। কয়েকজন বিখ্যাত লেখক লিখতেন সমরবাবুর বন্ধুত্ব সূত্রে। ফলে বাজে বই গছানোর লোক পাওয়া যেত না, কিন্তু সমরবাবু সেগুলো গছাবেনই, নাহলে প্রকাশকেরা বই পাঠানো বন্ধ করবে। এমনই একটা বই, বেশ দামিই, আর্টের উপর, কাউকেই গছানো যাচ্ছে না, এমন সময়ে আমার সঙ্গে আড্ডা মারতে এলেন কমল মজুমদার। আমি খুব উৎফুল্ল হয়ে তাঁকে বইটা দিলাম, রিভিউর জন্য। তিনি চলে গেলে, আমি গর্বিতভাবে সমরবাবুর দিকে তাকালাম, কেমন উপযুক্ত লোকের হাতে বইটা দেওয়া গেল। সমরবাবু মুচকি হাসলেন, বললেন, বইটাও গেল, রিভিউও আসবে না। তাই ঘটেছিল।

একবার মৃগাঙ্কশেখর রায় অরুন্ধতী দেবীর 'ছুটি' বলে একটি ফিল্ম রিভিউ করে ফিল্মটি নস্যাৎ করে দিয়েছিল। ছবিটি আমার কী কারণে মনে নেই ভালো লেগে গিয়েছিল। বেনামে আমার একটি চিঠি বেরুল, মৃগাঙ্কের শ্রাদ্ধ করে, নাও-তেই। পরে সমরবাবুও ছবিটি দেখে এসে বললেন, ভালোই তো করেছে, মৃগাঙ্ক ওটাকে এমন ছিছি করল কেন? প্রশ্রয় পেয়ে আমি বললাম, অথচ ওই রিভিউটাই আপনি ছাপলেন। এবার সমরবাবু চটলেন, বললেন রিভিউয়ার ঠিক লিখেছে কিনা দেখার জন্য আমাকে যদি সিনেমা হলে দৌড়তে হয় তাহলে তো মহা মুশকিল!

তবে জব্দ হয়েছিলেন সমরবাবু একবার। তাঁর বিশেষ এক বন্ধুর লেখা, একটি বিশিষ্ট প্রকাশকের, বই রিভিউ করার জন্য আমাকে দিলেন। বইটি পড়ে মনে হলো বইটার পিছনে যথেষ্ট গবেষণা নেই, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে লেখা, বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে, কিন্তু প্রচুর ফাঁক থেকে গেছে। লেখককে আমিও চিনতাম, এবং জানতামও যে বিরূপ পর্যালোচনা হলে সমরবাবু বেকায়দায় পড়বেন। লেখকের সম্পর্কে আমারও শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য কারণে তাঁকে হেনস্তা করতে পারলে আমার আমোদ হবে, এই ভেবে বেশ কড়া রিভিউ পাঠিয়ে দিলাম। অন্য কারণটি ছিল, ভদ্রলোকের অতিরিক্ত সত্যজিৎ রায়-প্রীতি! শুনলাম, সমরবাবু তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে বিরক্ত হয়ে বলেছেন, নিত্যপ্রিয়ের কাণ্ডজ্ঞান নেই, জানে আমার বন্ধুর লেখা, একটু বুঝেসুঝে লিখবে তো! আমি ভেবেছিলাম, লেখাটি বেরুবে না। কিন্তু বেরিয়েছিল। সমরবাবু হয়তো ভেবেছিলেন, লেখক এতই ভদ্র যে এই নিতান্ত রূঢ় রিভিউ পড়েও সমরবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন না। করেনও নি। এমন কি আমার সঙ্গেও নয়। এখন দেখা হলে, প্রাণপণে আশা করি, ওই ব্যাপারটি তিনি ভুলে গেছেন। সবাই কিন্তু এমন উদারচেতা ছিলেন না। বিশেষ করে, বাঙালি ফিল্ম পরিচালকেরা। বিরূপ সমালোচনা তাঁদের ধাতে সয় না।

সম্পাদক হিসাবে সমর সেনের কথা আমার এখনও যেটা মনে হয়, সেটা তাঁর কর্তব্যবোধ। গ্যাসট্রিকের ব্যথায় আমি একবার শয্যাশায়ী। এক বিকেলে দেখি সমরবাবু আমার বেলগাছিয়ার ফ্ল্যাটে হাজির। সুইনহো স্ট্রীট থেকে বেলগাছিয়া বহু দূর, কিন্তু অসুস্থ সহকারীকে তাঁর দেখা উচিত, তিনি ঠেঙিয়ে গিয়েছিলেন। সমরবাবু অনেকবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। ছোটোখাটো অসুখে তাঁর বাড়িতে, হাসপাতালে গেছি, গেলে খুশি হতেন। কিন্তু শেষবার যা শুনলাম, আর কোনো আশা নেই—কিছুতেই যাওয়ার সাহস সঞ্চয় করতে পারি নি। শেষ সময়ে বেশি লোক ছিলও না, থাকলেও লাভ হতো না, তাঁর জ্ঞান ছিল না। নাও-এ চাকরি করার সময়, বিকেলে ট্রামে ভিড় বাড়ার আগে তিনি উঠে পড়তেন, বলতেন,

কেটে পড়া যাক। কুড়ি বছরের অনুজ সহকারীর সঙ্গে এমন ভাষা ব্যবহার করায় আমি প্রথম প্রথম অবাক হতাম। পরে, কোদালকে কোদাল বলার ধরনে আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পৃথিবী থেকে তিনি কেটে পড়েছেন, কিন্তু অসুখে কষ্ট পেয়ে।

নির্মলকুমার চন্দ্র

সমর সেন : টুকরো টুকরো স্মৃতি

আমাদের ছাত্রাবস্থায়, অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের শুরুতে, সমর সেন একটা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন—তাঁর ছন্দোময় কবিতার গুণে, তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনীতি-চেতনার জৌলুসে, আর চমকপ্রদভাবে কবিতা থেকে তাঁর বিদায় নেওয়ায়। কবিতা লেখার ইতি টানার পিছনে কতটা যুক্তি, কতটা সাহস, আর কতটা ছিল নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা, তার হদিস নেই।

বহু বছর বাদে, তখন উনি নাউ-এর সম্পাদক, যেদিন প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই, ততদিনে আমার আত্মপ্রত্যয় বেড়ে গেলেও বেশ খানিকটা আশঙ্কা ছিল, না জানি কত রাশভারি হবেন মানুষটি। প্রথম দর্শনেই সে দুশ্চিন্তা কেটে যায়। আমার সঙ্গে আলাপে একজন ভাবী লেখককে পেয়ে মনে হল যেন তিনি-ই ধন্য হয়ে গেলেন। তাঁর মুখে প্রায় সব সময়ে লেগে থাকতো একটা হাসি, যার তাৎপর্য বুঝেছি অনেক পরে। সে হাসিতে যেমন ছিল সাদর অভ্যর্থনা তেমনই ছিল অন্য একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত—আমি আমার নিজস্ব একটা কোণে থাকতে চাই, সেখানে বেশি ঘাঁটিও না। মাঝে মাঝে ব্যক্তি সমর সেন সম্পর্কে আমারও কৌতূহল হয়েছে, কিন্তু কখনই তাঁর নিজের টানা অদৃশ্য গণ্ডি ভেদ করার চেষ্টা করিনি। ফলে আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা থাকেনি বড় একটা।

সমরবাবু আড্ডা ভালোবাসতেন, এটা সবারই জানা। কলকাতায় আক্ষরিক অর্থেই দিকে দিকে, ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর আড্ডাস্থল—নিজের ও বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি, দু'টো কফি হাউস, আর কত জায়গা, তার কতটুকুই বা জানি! আমার সৌভাগ্য যে অনেকবার তাঁর সঙ্গে আড্ডায় বসেছি, ওঁকে টেনেও নিয়ে গিয়েছি অন্যত্র। সবচেয়ে যেটা আকৃষ্ট করতো, সেটা হচ্ছে ওঁর তরফ থেকে অত্যন্ত সহজভাবে অন্যদের সঙ্গে মিলে মিশে আনন্দ পাওয়ার ও দেওয়ার চেষ্টা। আড্ডা দেওয়া মানে দরবার করা নয়, জ্ঞান বর্ষণ নয়, গল্পগুজবের মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের ছোটখাটো সুখ দুঃখ থেকে কবিতা-শিল্প-রাজনীতি সব কিছু নিয়েই একটা মাত্রার মধ্যে ভাব-বিনিময়—এই ছিল তাঁর ধারণা। হঠাৎ কেউ প্রগল্ভ হয়ে উঠলে, উনি কখনই সরাসরি বাধা দিতেন না; মাঝে মাঝে চতুরভাবে কথাবার্তার মোড় ঘুরিয়ে দিতেন, আর সহ্যের বাইরে গেলে চুপ করে যেতেন। তর্কের ব্যাপারেও তাই। আমাদের সাবেকি শঙ্করাচার্যের ঐতিহ্যে বা আধুনিক ফরাসী ধাঁচে একই বিষয়কে নানান দিক থেকে নেড়ে চেড়ে অনেকক্ষণ ধরে তর্ক

জমিয়ে তোলাটা সমরবাবুর মেজাজে আসতো না, কিছুক্ষণ পরে হাঁপিয়ে উঠতেন। এর মানে এই নয়, তিনি ঐ ধরনের তর্কবাগীশদের অপছন্দ বা অশ্রদ্ধা করতেন। আসলে, তাঁর মনটাই ছিল লিরিক-ধর্মী, একই স্বর আর ভাবনার মধ্যে সেটা আটক থাকতে চাইতো না বেশিক্ষণ।

বাইরে থেকে বোঝা যায় না, কিন্তু আমার মনে হয়েছে যে সমরবাবু ছিলেন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির। বিশেষ করে নিজের সম্পর্কে কিছু বলার এমন অনীহা আমি খুব কম লোকের মধ্যেই দেখেছি। একাধিকবার নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ বা সমস্যার কথা তুলেছেন আমার সামনে, কিন্তু নিজের কৃতিত্বের কোনো কাহিনীই তাঁর মুখ থেকে শুনিনি। অন্য অনেকের মতো আমারও খুব ভালো লেগেছে 'বাবু বৃত্তান্ত'। আবার হতাশও হয়েছি এই কারণে যে সমরবাবু নিজেকে আড়ালে রেখেছেন অসামান্য চাতুর্যের সঙ্গে। উনি নিজে কী চাইতেন বা ভাবতেন, অন্যেরা তাঁকে কিভাবে দেখতো, তার কতটুকুরই বা ইঙ্গিত রয়েছে?

বেশ কিছুদিন আলাপের পর দু'একবার চেপে ধরেছি, বলুন, কবিতা লেখা কেন ছাড়লেন? মৃদু হেসে (সেই হাসি যার ব্যাখ্যা আগেই করেছি) বলতেন, 'লেখার তাগিদ কমে গিয়েছিল, চাকরি নিলাম, বিয়ে করলাম, বাজার-সংসার-চাকরি-আড্ডা নিয়ে দিনটা ভরে যেতো, সমাজ-রাজনীতি এসব ঠিক আগের মতো বুঝতাম না....' বিয়ে করায় কবিতা লেখা বন্ধ, এটা শুনলেই ওঁর স্ত্রী, সুলেখাদি, ন্যায়সঙ্গত কারণে চটে যেতেন, সমরবাবুও ঘাঁটাতেন না আর ব্যাপারটা। ব্যর্থ প্রেমের ধাক্কায় যারা কবিতা বা সঙ্গীতের আশ্রয় নেন, আর সেই শূন্যতা ভ'রে উঠলে অন্য দশজনের মতো সংসার-সরোবরে ডুবে থাকেন, সমর সেন সে গোত্রের মানুষ হতে পারেন না।

সমরবাবুর ব্যক্তিত্বের একটা দিক উল্লেখ করার মতো। নাউ বা ফ্রন্টিয়ার-এর পাঠকরা জানেন, এ দুটি পত্রিকার লেখকদের অনেকেই বিদেশী। তাছাড়া, সমর সেনের সঙ্গে আলাপ করতে বা তাঁর মতামত জানতে ভিন্‌দেশ থেকে এসেছেন এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। সমরবাবুর দিক থেকে বিদেশীদের নিয়ে খুব একটা ঔৎসুক্য ছিল না, বরং ভদ্রতা বাঁচিয়ে এড়িয়ে যেতে পারলেই খুশি হতেন বেশিরভাগ সময়ে। কিন্তু যে দু'একজনকে সত্যিই ভালো লেগে যেতো, যেমন Lawrence Lifschultz, বা Jim Boyce, তাদের সঙ্গে গড়ে উঠতো একটা গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক। বলা বাহুল্য, সমরবাবুর কাছে দেশকালের ব্যবধানটা বড় নয়, মনের সাযুজ্যটাই আসল।

দীর্ঘকাল ধরে ফ্রন্টিয়ার আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গিয়েছে, আজও তার অবস্থার খুব একটা হেরফের হয়নি। দুর্যোগের দিনগুলিতে স্বদেশ বিদেশ থেকে অনেকেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন, কিন্তু সমরবাবুর সেটা মনঃপূত হয়নি।

তাঁর একটাই ফর্মুলা—ফ্রন্টিয়ার যদি ভালো লাগে, গ্রাহক হও, অন্যদের গ্রাহক করো, অনুদান পাঠিও না। যে-পত্রিকার ক্রেতা কম, বিজ্ঞাপন সীমিত, টিঁকে থাকার জন্য দাক্ষিণ্যের প্রয়োজন, তার সম্পাদক হয়ে থাকতে তাঁর আত্মসম্মানে বাধতো।

এই আর্থিক দুর্দশার মূল কারণ, সবাই জানেন, রাজনৈতিক চাপ, যার ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিজ্ঞাপনের সংখ্যা খুবই কমে যায়। এদিক থেকে ইন্দিরা গান্ধির তুলনায় জ্যোতি বসুর সরকার খুব একটা উদারতার পরিচয় দেননি। বহুদিক থেকে প্রতিপত্তি-সম্পন্ন প্রচুর শুভানুধ্যায়ীর মিলিত চেষ্টা সত্ত্বেও এ সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি। অন্যদিকে পত্রিকা ছাপার ও প্রকাশনার খরচ ক্রমশ বেড়ে যায়। সমরবাবু একটা অভিনব সমাধানের রাস্তা বেছে নিলেন। গত বিশ বছরে মুদ্রাস্ফীতির দরুন যখন আমাদের মতো মাস্টার-কেরানীকুলের মাইনে বেড়েছে অন্তত চারগুণ, সেখানে সমববাবু নিজের পারিশ্রমিক প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে দিলেন, আর তাঁর সহকর্মী তিমিব বসুও নিতেন যৎকিঞ্চিৎ। চারপাশের আমরা কিছু লোক এর প্রতিবাদ করে বলেছি, পত্রিকার দাম বাড়ানো কেন দরকার, সেটা বুদ্ধিমান যে-কোনো পাঠক সহজেই বুঝবেন। কিন্তু পুরনো ধাঁচের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী সমর সেনের এতে ঘোর আপত্তি, কেননা তাঁর মতে দাম বাড়ানোটা হচ্ছে মুনাফাখোরদের কারসাজি। ফ্রন্টিয়ার কেমন করে সেই ফাঁদে পা দেবে? বাধ্য হয়ে একবার দুবার দাম অবশ্য তাঁকেও বাড়াতে হয়েছে, কিন্তু সেটা নেহাৎই নগণ্য এবং বাড়িয়েছেনও অনেক দেরিতে। আজও তিমির বসু সেই ট্র্যাডিশনে চলেছেন। ভারতবর্ষের কোথায় কোন্ সাপ্তাহিক আর আছে যেটা এক টাকার বিনিময়ে পাওয়া যায়?

নিজে কৃচ্ছ্রসাধন করলেও, এ নিয়ে সমরবাবুর কোনো দম্ভ ছিল না, অন্যদের কাছে একই জিনিস দাবিও করতেন না তিনি। তাঁর বন্ধুবান্ধবদের অনেকেরই অবস্থা খুব স্বচ্ছল, এজন্য তাঁর কোনো ঈর্ষা ছিল না। ফ্রন্টিয়ার-এ লেখা শুরু করে দু'চারজন পরে কর্মজীবনে উন্নতি লাভ করেন, সাংবাদিক হিসাবে বা অন্য পেশায়। এ নিয়ে সমরবাবু বেশ গর্ব বোধ করতেন। কিন্তু এঁরা যোগাযোগ না রাখলে, মাঝে মধ্যে ফ্রন্টিয়ার-এ লেখা না পাঠালে, সমরবাবু আবার বেশ ক্ষুণ্ন হতেন।

সম্পাদক সমর সেনকে কী ধরনের বিড়ম্বনায় পড়তে হয় তার দু'চারটে নমুনা দেবো। কোনো এক সেমিনারে-পড়া একটি লেখা আমি তুলে দেই ওঁর হাতে। যেহেতু লেখক প্রায়শই লিখেছেন ফ্রন্টিয়ার-এ, লেখকের অনুমতি ছাড়াই লেখাটি ছাপানো হয়। আমরা কেউ ভাবিনি যে, লেখক খুব রেগে যাবেন বা এই 'নীতি-বিরুদ্ধ' কাজের কঠোর সমালোচনা করে চিঠি দেবেন সম্পাদককে। দোষটা আমারও, কিন্তু সমরবাবু সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে ক্ষমা চাইলেন ফ্রন্টিয়ার-এর পাতায়। ঐ লেখকের প্রতি অবশ্য তাঁর ক্ষোভ রয়ে গিয়েছিল বহুদিন পর্যন্ত।

সম্পাদনায় একটা বড় ঝক্কি ছিল বাছাই-করা লেখা থেকে অপ্রয়োজনীয় অংশগুলি বাদ দিয়ে মূল বক্তব্য পাঠকের সামনে রাখা। এ-কাজ শাঁখের করাতের মতো। লেখার আয়তন ছাঁটলে লেখককুল চটে যান, আবার ভূষির পরিমাণ বেশি দেখলে পাঠকবর্গ বিরক্ত হন বা লেখাটি পড়েন না, যার ফলে পত্রিকার কদর কমে যায়। সমরবাবুর পক্ষপাতিত্ব যেহেতু ছিল পাঠকদেরও দিকে, তাই তিনি মাঝে মাঝে লেখকদের বিরাগভাজন হতেন। বিভিন্ন বিপ্লবী দল বা গোষ্ঠীর ইস্তাহার, প্রস্তাব ইত্যাদিও সম্পাদকের কলমের আঁচড় থেকে রেহাই পেতো না। বিপ্লবী কর্মীদের অনেকেই এ নিয়ে ভুল বুঝতেন তাঁকে।

নিজের অজান্তে আমিও সমরবাবুকে কিছুটা দোটানার মধ্যে ফেলেছিলাম একবার। ১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার গঠনের পর তাঁদের শিল্প-নীতি কী হওয়া উচিত, এ নিয়ে কিছুদিন ধরে ভাবছিলাম, একাধিকবার সমরবাবুর সঙ্গে আলোচনা করেছি, উনিও বেশ আগ্রহ দেখাতেন। কিন্তু শেষ করা লেখাটি ওঁর পছন্দ হল না, কেননা লেখাটি নাকি বামফ্রন্ট নিয়ে অত্যধিক আশাবাদী। অন্যদিকে লেখাটি ফ্রন্টিয়ার-এ ছাপানো যাবে না, সেটা জানাতেও সমরবাবুর খুব সঙ্কোচ। আমি কিন্তু মোটেই ক্ষুণ্ণ হইনি, যদিও ওঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমার দ্বিমত ছিল। ঐ লেখাটি অন্যত্র ছাপিয়েছি। কিন্তু তার জন্য পরবর্তীকালে ফ্রন্টিয়ার-এ অন্যান্য লেখা পাঠাতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি।

আবার ফিরে যাই ব্যক্তি সমর সেনের প্রসঙ্গে। আগেই বলেছি, তাঁর বন্ধুর সংখ্যা অজস্র। বন্ধুনির্বাচনে তিনি কোনোদিনই রাজনীতির সঙ্কীর্ণ বেড়াজালে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। 'বাবু বৃত্তান্ত'-য় তার ভূরি ভূরি নজির। নানা ব্যাপারে ভিন্নমত সত্বেও সবাই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন, নানাভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতেন। এ প্রসঙ্গে একটি মানুষের কথা না বলে পারছি না, যাঁর ওপর সমরবাবু শেষ জীবনে পুরোমাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। ইনি হলেন কৃতী চিকিৎসক, কমল জালান। কবে কীভাবে এ দুজনের পরিচয় হয় জানিনা, কিন্তু সমরবাবু প্রায়ই বলতেন, কমলের চিকিৎসাধীনে মরলে আমার দুঃখ নেই। শুধু নিজে নয়, কমল তাঁর সমস্ত সহকর্মীদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, যখনই সমরবাবু অসুস্থ হয়েছেন গত কয়েক বছরে। কমল ও তাঁর বিভিন্ন স্তরের সহকর্মীদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আলাদাভাবে, এর থেকে জানতে পারি যে এঁরা সবাই কমলের মতোই সমরবাবুর প্রতি অনুরক্ত হয়ে ওঠেন। এঁদেরই পরিচর্যাকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাক্তার-রোগীর এমন সম্পর্কের কথা বড় একটা শোনা যায় না।

সমর সেনকে আমি নিজে কি চোখে দেখতাম? যে-অল্প কজন মানুষের কাছে এসে নিজেকে ধন্য মনে করেছি, উনি রয়েছেন তাঁদেরই প্রথম সারিতে।

হীরেন গোহাঁই

সমর সেনকে যেভাবে দেখেছিলাম

সমর সেনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিল বললে বাড়িয়ে বলা হবে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর লেখা পড়ে মুগ্ধ হতাম, আর 'ফ্রন্টিয়ার'কে মাঝে-মাঝে মনে হত আধুনিক ভারতীয় সমাজের মরুভূমিতে একটি মরুদ্যান। 'বাবু বৃত্তান্ত' পড়ার আগে সমর সেন যে লঘু হাস্য-পরিহাস করতে পারেন, মনেই হয়নি আমার। মনে হত উনি আর 'ফ্রন্টিয়ার' একই জিনিসের এপিঠ-ওপিঠ। আসলে এরকম অতিরঞ্জিত ধারণার পেছনে একটা বাস্তব সত্য ছিল। ব্যক্তিগত জীবন আর মননকে কী কঠোর সাধনায় তিনি এক সামূহিক সংকল্পের সেবায় উৎসর্গিত করেছিলেন, আমার এই ভ্রান্ত ধারণাটিও তার অন্যতম সাক্ষ্য। শারীরিক অসুস্থতা আর দুর্বলতা, পরিবারিক তথা মানসিক দুর্যোগ, বাম আন্দোলনের অবক্ষয়—সব কিছু উপেক্ষা করে শেষ অবধি তিনি চেষ্টা করতেন 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে নিয়মিত যেতে। অথচ রাজনৈতিক মতবাদের আড়ালে আমরা যে-প্রচণ্ড অহংবোধকে প্রশ্রয় দিই, পোষণ করি, সমর সেনকে তা কখনও প্রলুব্ধ ও কলুষিত করতে পারেনি। মনে-মনে তাঁকে তাই প্রণাম জানিয়েছি।

দুঃখের বিষয় এই অহংবোধ আমার ভিতরে বেশ ভালো ভাবেই আস্তানা গেড়ে বসেছে। নিরাপদ মুহূর্তে মাঝে-মাঝে মৃদুস্বরে তাকে দূর-দূর করি বটে, কিন্তু সমর সেনের মতো চিরকালের জন্য তাকে তালাক দেওয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্য এক নবীন জাতি তথা মধ্যশ্রেণীর বাবুসন্তান হওয়ায় আমি এখনও হয়ত বড়ো-বড়ো পুরানো শহরের বাবুদের মতো "ভ্রষ্ট" হতে পারিনি। অন্তত সমর সেন তাই ভাবতেন। আমার প্রতি তার কিছুটা ব্যঙ্গের ভাব থাকলে আমি আশ্চর্য হবনা, কিন্তু সেটা কোনওদিন অবজ্ঞা-অবহেলায় অধঃপতিত হয়নি। যেটুকু পরিচয় হয়েছিল তার মধ্যেই তিনি আমার প্রতি স্নেহমাখানো বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কারণ আমি তাঁর চক্ষে ছিলাম 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একজন পাঠক এবং লেখক। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একনিষ্ঠ অনুরাগীদের মধ্যে—যাঁরা প্রায়ই তাঁকে ঘিরে থাকতেন—রাজনৈতিক মতাদর্শে অটল এবং মতাদর্শের প্রকাশে দৃঢ় লোকই বেশি থাকত। আমার নিজের বিশ্বাসের মধ্যে সংশয়ের উপাদান যথেষ্ট। উগ্র মতাবলম্বন এখনও আমার বরদাস্ত করতে কষ্ট হয়, তবুও যে তিনি দূরে সরিয়ে দেননি আমাকে, মধ্যে-মধ্যে উৎসাহ দিয়েছেন, তাতে মনে হয় আদর্শনিষ্ঠা আর মতান্ধতার মধ্যে উনি প্রভেদ উপলব্ধি করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর আদর্শনিষ্ঠা যে প্রচ্ছন্ন সুবিধাবাদ থেকে স্বমহিমায় কী রকম স্বতন্ত্র

ছিল, একটি উদাহরণে তা বোঝা যাবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন বিত্তমন্ত্রী অশোক মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। পরস্পরকে তাঁরা শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু মতাদর্শগত ব্যাপারে ছিলেন প্রায় বিপরীত মেরুতে। সমর সেনকে The Great Dissident অর্থাৎ মহান প্রতিবাদী হিসেবে সম্মান জানাতে অশোক মিত্র এক অভিনন্দন গ্রন্থ প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন কিছু দিন আগে। আমাকেও বলেছিলেন লিখতে। কথাটা নিয়ে আমি বিশেষ উৎসাহিত হতে পারিনি। "ডিসেন্ট" (Dissent) কথাটার মধ্যে এমন ব্যঞ্জনা আছে যে জিনিসটা কেন্দ্রীয় না-হয়ে সীমান্তবর্তী হয়ে পড়ে। আমার কিন্তু মনে হত সমর সেনই কেন্দ্রীয় স্থানে দাঁড়িয়ে, আর অশোক বাবুরা সীমান্তবর্তী এলাকায়। আমি সমর সেনকে লিখে জানালাম আমি ঐ সংকলনের জন্য কিছু লিখছিনা "ব্যক্তিগত কারণে"। তিনি যেন কিছু মনে না করেন। সমর সেন দেখলাম তাতে মোটেই বিব্রত হলেননা। উল্টে আমাকে লিখলেন: "তারা আমাকে সম্মান জানাতে চায়, ভালো কথা। কিন্তু আমার প্রতি সম্মান যদি থাকে, তাহলে ওরা আমার কাগজে লেখেনা কেন?" প্রশ্নটা rhetorical question কিনা পাঠকই নির্দ্ধারণ করবেন।

সমর সেনের সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়েছিল নিতান্ত অনাটকীয়ভাবে। "নাটুকে-পনার" প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা ছাড়াও ঘটনাটা নিতান্ত মামুলি গোছের হওয়ার অন্য কারণও ছিল এক অর্থনীতিবিদ্ বন্ধুর অনুরোধে ১৯৬১ সালে আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সংকোচে আমি আড়ষ্ট হয়ে ছিলাম ভিতরে, যদিও বাইরে ছুটিয়েছিলাম কথার তুবড়ি। সমর সেনের কত নামডাক, বিপ্লবীদের কত আপন— জানিনা আমার মতো নিরামিষভোজীদের কী চোখে দেখবেন! কিন্তু দেখলাম "ইম্প্রেস" করার কোন চেষ্টাই নেই তাঁর পক্ষ থেকে। নিতান্ত সাদা-মাটা অনাড়ম্বর কথাবার্তা, বেশিরভাগ আমার ভাষণই শুনলেন স্মিতমুখে। মাঝেমাঝে দু-একটা ধারালো উক্তিতে অবশ্য পেয়েছিলাম 'ফ্রন্টিয়ার'-এর খ্যাতিমান সম্পাদককে। কিন্তু বিপ্লবী আবেগের বান ডাকাতে ইনি দেখলাম একবারেই নারাজ। নিজেকে হঠাৎ খেলো মনে হল এই অনাড়ম্বর নিষ্ঠার সামনে। কিন্তু আমাকে উনি ইঙ্গিতেও কোন সমালোচনা করেননি।

সত্তর দশকের রক্তাভ দিগন্ত তখন আমাদের মন রাঙিয়েছিল। চেয়ারম্যান মাওয়ের চারটে লেখা—বিশেষ করে In Memory of Norman Bethune—খুব অনুপ্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ খুঁজে পেতাম তার সমধর্মী একটা সুর। মধ্যে-মধ্যে অবশ্য চড়া গলায় বাঁধা চীৎকার অথবা গালাগালও বেরুত। কিন্তু সে-সবের জন্য উনি ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেননা। দীর্ঘ অনুশীলনে সংযত-চিত্ত সমর সেন তাঁর কাগজে আমাদের মতো তখনকার অপরিণত-বুদ্ধি যুবকের

জন্যও জায়গা রাখতেন। "পরিপক্কতা"র অভাব ছিল সেসব লেখায়—কিন্তু সেই অভাব পূরণ করত সজীব কৌতূহল এবং সাহসিক চিন্তা।

আমি তখন আসামের শিশু সি.পি.এম সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত—যদিও সদস্য হইনি। আবার গুয়াহাটী শহরের এখানে-ওখানে গজিয়ে ওঠা "নকশালবাদী" গোপন চক্র কয়েকটাতেও যাতায়াত করতাম। এই চক্রের সদস্যরা সি.পি.এমের সংসদী রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করত এবং সশস্ত্র সংগ্রামের সপক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরত। কলকাতা থেকে M.C.C অথবা C.P.I.(ML) দলের কোনও দূত এসে চক্রকে মাঝেমাঝে চাঙ্গা করে যেত। সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে আমার মনে দ্বিধাসংশয়ের অন্ত ছিলনা—আসামের গ্রাম্যজীবনের যেটুকু জানতাম তা দিয়ে সশস্ত্র সংগ্রাম কোথায় কিভাবে শুরু করতে হবে ভেবে উঠতে পারিনি। সি.পি. এমের প্রাথমিক সাংগঠনিক কাজকর্মে তাই আমার স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ছিল। অন্য-দিকে তাদের সব বিপ্লবী উক্তি নির্বাচনের আয়োজনে শীর্ষবিন্দু খুঁজে পেত বলে আমার মনে আপশোষও ছিল। আবার আমার পরিচিত "নকশালবাদী" চক্র-গুলিতে আলোচনা বা লেখার দিকে যতটা উৎসাহ ছিল, আসল কাজকর্মের দিকে ততটা মনোযোগ ছিলনা। কিছুকাল পর চা-সিঙ্গাড়াসহযোগে নিভৃতকক্ষে বিপ্লবের প্রস্তুতি জোলো মনে হতে লাগল। কলকাতা থেকে আগত সংগঠকরা কিশোর আর তরুণকর্মী কিছু সংগ্রহ করতে পারলেও আসামের সামাজিক জীবনে বিশেষ নাড়া দিতে পারেনি। তাই সি.পি. এমের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা বাড়ল—কিন্তু সংসদী রাজনীতির সমালোচনা করার ফলে এবং "সন্দেহজনক ব্যক্তিদের" সঙ্গে ঘোরাফেরার দরুণ আমি "অনির্ভরযোগ্য উপাদান" (unreliable element) শিরোপা পেয়ে গেলাম। অবশ্য এই সময়ে সি.পি. এমের নিষ্ঠাবান কর্মীদের সঙ্গে গ্রামে-গ্রামে ঘুরে আসামের গ্রাম্যসমাজ সম্পর্কে আমার ধারণা কিঞ্চিৎ পরিষ্কার হল, মার্ক্সবাদী পদ্ধতিতে কিছু চিন্তা করতে শিখলাম এবং সামগ্রিকভাবে আসামের জনজীবনে মার্ক্সবাদের প্রভাবের পরিধিকে সবাই মিলে আমরা কিছুটা সম্প্রসারিত করতে পারলাম।

এসব ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করছি এজন্যই যে সি.পি. এমের সঙ্গে আমার সেই যোগাযোগ সুফলপ্রসূ বলে আজও মনে হয়। কিন্তু সি.পি.এমের ইতিবাচক কর্মসূচির মধ্যেও কোথাও এমন ফাঁক ছিল, যার জন্য মন ভরত না। 'ফ্রন্টিয়ার-এর মধ্যে যেন সেই অভাবের স্বরূপ সম্পর্কে একটা ধারণা পেতাম। কিয়দংশে সেটা ছিল উপরিসৌধের সংগ্রামের ব্যাপারে সীরিয়াস চিন্তা-চর্চা। তা-ছাড়া সি.পি. এমের কর্মসূচি যতই কার্যকর হোকনা কেন, তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ অথবা ব্যাখ্যার কোনও চেষ্টা তাদের ছিলনা। তাই মাও যে-অর্থে তত্ত্বকে বলেছিলেন 'অন্ধকার রাতে পথনির্দেশের মশাল—সে-অর্থে তাত্ত্বিক আলোচনা তাদের পত্র-পত্রিকায়

পাইনি। কিন্তু বলে রাখা ভালো ; মাঝে এক সময়ে বিভিন্ন ছোট-ছোট উপদল পরস্পরকে প্রতিবিপ্লবী বলে তাত্ত্বিক গালাগাল চালিয়ে আমার মত লোককে বেশ ধাঁধায় ফেলে দিয়েছিল।[১] (পরিশিষ্ট দেখুন)।

কয়েকটা উদাহরণ দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে। ১৯৭০-৭২ সালে আসামের যুবসমাজ মার্ক্সবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একাংশের মধ্যে এই মতাদর্শ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। ফলে যুবসমাজও সেদিকে ঝুঁকে পড়ে। আমরা অবশ্য বুঝতে পারিনি, এত তাড়াতাড়ি মার্ক্সবাদ একটা জনপ্রিয় শক্তি হয়ে পড়াটা দুর্বলতার লক্ষণ। তখন শাসকশ্রেণী গোপন সরকারী উদ্যোগে মধ্যবিত্ত ছাত্র আন্দোলনে সাম্যবাদবিরোধী এবং উগ্রজাতীয়তাবাদী উপাদানের অনুপ্রবেশ ঘটায়। শীঘ্রই একটা বহিরাগতবিরোধী তথা বাঙালি-বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি হয় এবং সি. পি. এম সমেত বাম দলগুলি রীতিমত বিব্রত বোধ করে। আসামে ব্রিটিশ আমলে একাংশ বাঙালি সরকারী কর্মচারী, উকিল এবং ব্যবসায়ী উগ্রজাতীয়তাবাদী বাঙালি মনোভাব পোষণ করতেন এবং দীর্ঘদিন ধরে অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি উন্নাসিক এবং বিদ্বেষপূর্ণ আচরণ করতেন। সেই সুবাদে অসমীয়ারাও আধুনিক জাতীয়তাবাদকে বাঙালি-বিদ্বেষ থেকে অভিন্ন মনে করতে থাকে। দুপক্ষই ভুলে যায় মধ্যশ্রেণীসুলভ চাকুরি প্রভৃতি প্রশাসনিক সুযোগ-সুবিধার প্রতিযোগিতা এতে ইন্ধন যোগায়, এবং পঙ্গু ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। যাই হোক, জাতিসমস্যা আসামে প্রগতিশীল চিন্তাধারার সামনে সবসময় একটা প্রতি-আহ্বান। অথচ তখন, কিংবা তারপর, এই সমস্যা নিয়ে সি.পি.এম মহলে দিগ্‌দর্শী বাস্তবানুগ তাত্ত্বিক গবেষণা দেখা গেলনা। আসামে সেই অভিজ্ঞতার পটভূমিতে নূতন তাত্ত্বিক চিন্তার বিকাশ হলে পরে পশ্চিমবঙ্গে গোর্খা আন্দোলন কিংবা ঝাড়খণ্ড আন্দোলন এতটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতোনা।

কিন্তু ফ্রন্টিয়ার-এ কলকাতার বৃহৎ পত্রিকাগুলির পাতায় সুলভ উৎকট বাঙালি-সংস্কার থেকে মুক্ত প্রগতিশীল চিন্তার উদ্যম ছিল স্পষ্ট। কেবল অসমীয়ার মতো ক্ষুদ্র জাতিই নয়, ছোট ছোট উপজাতিদের (tribes) সমস্যা নিয়ে—যারা আবার কখনও অসমীয়ার মতো ক্ষুদ্র জাতিদের হাতে নিপীড়িত—সি.পি.এম বিশেষ মাথা ঘামায়নি। নকশালপন্থীরা গোড়া থেকেই সাহস এবং দরদ নিয়ে তাদের সমস্যার কথা ভেবেছে এবং কর্মসূচিতে তাদের মুক্তির প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত করেছে। ফ্রন্টিয়ার-এও এসব ছোট ছোট দুর্বল নিপীড়িত জাতির মানুষদের সংকটের কথা নিয়মিত বেরোত এবং প্রগতিশীল পাঠকদের চেতনায় সে-সব লেখা বিশেষ পরিবর্তন আনতে সাহায্য করতো।

আসামে ১৯৭২ সালে শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নে প্রচণ্ড উত্তেজনা সঞ্চার হয়।

বামপন্থীরা অনুভব করে একতরফাভাবে সংখ্যালঘু জাতিদের উপর অসমীয়া মাধ্যম চাপিয়ে দেওয়াটা অন্যায়, অন্যদিকে অসমীয়া জনগণের উত্তাল ভাবাবেগ তাদের হতচকিত করে। কেবল মধ্যশ্রেণী সুলভ ক্ষমতার লড়াইয়ের ধারণা দিয়ে এই প্রচণ্ড আর ব্যাপক উত্তেজনা বোঝা ছিল দুষ্কর। সেই সময়ে আমি ***Roots of Xenophobia in Assam*** বলে একটা নিবন্ধ ফ্রন্টিয়ার-এ পাঠালাম। তাতে আসামের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা এবং পুঁজিবাদী উন্নয়নের জনবিরোধী রূপকে এই জাতীয় উন্মাদনার পটভূমি বলে উল্লেখ করলাম, এবং এই উন্মাদনাকে ঠিক উগ্রজাতীয়তাবাদ না-বলে "বিদেশীভীতি" বলে চিহ্নিত করলাম। পাঠকদের মধ্যে তা কিছু কৌতূহল জাগ্রত করল। সমর সেন চিঠি লিখে আমাকে আরও লেখা পাঠাতে বললেন। না-বলে পারা যায় না; কলকাতার কয়েকটা বহুল প্রচারিত কাগজের মালিক এবং পদস্থ সাংবাদিকের সঙ্গে আসামের কাগজের মালিক এবং পদস্থ সাংবাদিকদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। অথচ এরকম উত্তেজনার সময় দুপক্ষই বল্গাহীন গালাগাল এবং জাতিগত অপ-প্রচারে মেতে ওঠে। সমর সেনের চিঠি থেকে এরকম ব্যবসায়িক দেশপ্রেমের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থানের ইংগিত পেয়ে খুব ভালো লাগল।

এই সময়ে আমার মনের নানা রাজনৈতিক দ্বিধাদ্বন্দ্ব আর সংশয় নিয়ে তাঁকে চিঠি লিখতাম। আর দশজন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর মত আত্মপ্রকাশেরই তাগিদে হয়ত। কিন্তু পার্টিবাজ নেতাদের বাইরে আর কারও পরামর্শ পেলে আমি বর্তে যেতাম। তিনি এসব ব্যাপারে ছোট করে তাঁর মতামত জানাতেন। ভারিক্কি চালে আমাকে জ্ঞান দিতেন না, আমার দ্বিধাদ্বন্দ্বকে হেসে উড়িয়ে দিতেন না। আমার অপরিণত বুদ্ধি বিশ্লেষণকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না। কিন্তু অন্যদিকে নিজের অভিমতও জানাতেন না স্পষ্টভাবে। আমার মনে হয় নকশালপন্থীদের সঙ্গে স্পষ্টভাবে গাঁটছড়া বাঁধলেও তাঁর নিজের মনেও কিছু দ্বিধা-সংশয় ছিল—যেগুলো ধীরে-ধীরে সমাধান হতে পারে বলে হয়ত তিনি ধরে নিয়েছিলেন।

বিশ্ববিপ্লবের ধারা নিয়ে আমার এইসব অমূল্য মতামত তাকে জানিয়ে আমি কিছু শান্তি পেলাম এবং হঠাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর একটা প্রবন্ধ শেষ করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। (১৯৭১ সালে, যত দূর মনে পড়ে)। তাতে অনেক এলোমেলো কথার মধ্যে সার কথা ছিল দুটো :

১ "ভারতীয় নবযুগ" (Indian Renaissance) সম্পর্কে নকশালপন্থী শিবিরের মন্তব্য খুব ছককাটা (schematic) হয়ে যাচ্ছে—জিনিসটা মোটেই এত সরল ছিলনা।

২ রবীন্দ্রনাথের মতো অভিজাত উচ্চবিত্ত মানসিকতা বিভূতিভূষণের ছিলনা—বিমূর্ত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ ছেড়ে তিনি চলে আসছিলেন concrete

জীবনের দিকে, যেখানে সেই আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা তথা প্রতিক্রিয়া দ্বারা পরীক্ষিত তথা সীমাবদ্ধ হচ্ছে।

এবারে সমরবাবু মতামত দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। জানালেন আমার লেখাটা "very interesting" বলে তাঁর ধারণা। আজ মনে হচ্ছে ছোট্ট একটি বাক্যে তিনি প্রবন্ধের গুণ ও দোষ সূত্রবদ্ধ করেছিলেন। একটা কৌতূহলোদ্দীপক মৌলিক ধারণা প্রবন্ধটাতে পরিস্ফুট; কিন্তু তথ্যগত অনুসন্ধান ছিল স্বল্পপ্রমাণ। ফলে very interesting ছাড়া অন্য বর্ণনা সঠিক হতোনা। মনে হয় নকশালপন্থীদের বিপ্লবী রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্যয়ী হয়েও তাদের অন্য কথাবার্তা মাঝে মাঝে একদেশদর্শী বলে অনুভব করতেন। তাই হয়ত আমার সেই প্রবন্ধ তার মনে লেগেছিল। তার অনেককাল পরে ডঃ অমিয় বাগচীর সঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের সিনেমা নিয়ে আমার এক বিতর্ক হয় ফ্রন্টিয়ার-এর পাতায়। ডঃ বাগচী লিখেছিলেন ঋত্বিক ঘটক গ্রামীণ মানুষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন—সমাজবাদী বিপ্লব হলেই সেইসব সংস্কৃতি সঙ্গে সঙ্গে "ধর্মীয়" কুসংস্কার বলে মূল্যহীন এবং বর্জনীয় হবে বলে উনি মনে করতেন না। আমার মনে হয়েছিল এসব কথাবার্তার অন্তরালে আমাদের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তবাদী সংস্কৃতির প্রতি মোহ প্রকাশ পাচ্ছে। কিছুদিন কথা কাটাকাটি চলার পর সমর সেন নীরবে বিতর্কটা বন্ধ করে দিলেন। আমার শ্লেষোক্তিভরা একখানা চিঠি আমার উদ্বেগ সত্ত্বেও প্রকাশ করলেন না—আজ মনে হয়, ঠিকই করেছিলেন। কারণ আমার যা বলবার ছিল, ইতিমধ্যেই তা প্রকাশ হয়েছিল।

সত্তর দশকেই নকশাল আন্দোলন গ্রামে মার খেয়ে শহরে আশ্রয় নেয়। শহরের লুম্পেন সমাজদ্রোহীরাও "নাগরিক গেরিলা" (Urban Guerilla) পর্যায়ে নকশালপন্থী সংগ্রামে সামিল হয়ে গেল। কলকাতার কাগজে রোজ বের হতো হতাহতের পরিসংখ্যা। পুলিশ প্রহরায় সমাজের উচ্চপর্যায়ের লোকেরা চালিয়ে যেত তাদের বিলাস-ব্যসন—সাধারণ নাগরিকের জীবনযাত্রা হতো বিপর্যস্ত। আমার একদম ভালো লাগেনি। এটাকে শ্রেণীসংগ্রাম বলাই কঠিন ছিল। জনসাধারণের মাঝখানে তাদের অবস্থান থেকে সরে আসছিল নকশালবাদীরা। তাদের এই বিপর্যয়ের সময় নকশালবাদীদের খোলাখুলি সমালোচনা করতে সংকোচবোধ করেছিলেন সমর সেন। কিন্তু শেষ অবধি উনিও ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদকে মৃদু ভর্ৎসনা করে একটা সম্পাদকীয় লিখেছিলেন। একজন পরীক্ষিত বন্ধু আর শুভানুধ্যায়ীর এই সমালোচনা নকশালবাদীরা তো মেনে নিলই না, উল্টে সমর সেনকেই বিশ্রীভাবে আক্রমণ করল। দেশব্রতী কি লিবারেশন কোন এক সংখ্যায় তো সমর সেনকে "দালাল" বলে গালাগাল করল। তার মতো জ্যেষ্ঠ ও সম্মানিত লোক বালখিল্যদের এই অপমানে বিচলিত হলেন না, নীরবে সহ্য করলেন এই অন্যায় ও ঔদ্ধত্য। কতখানি মনোবল ও আদর্শনিষ্ঠা থাকলে মানুষ এরকম সংযম দেখাতে

পারে, ভাবলে অবাক লাগে। অনেকদিন পরে আমি তাঁর কাছে কী একটা ব্যাপারে উচ্চকণ্ঠে নকশালী অসহিষ্ণুতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সমালোচনার প্রতি উগ্রতার বিরুদ্ধে সবিস্তারে অভিযোগ জানাচ্ছিলাম। উনি হেসে বলেছিলেন "হ্যাঁ, আমরাও একবার ওদের কার্যপন্থা নিয়ে আপত্তি জানাতে গিয়েছিলাম, কিন্তু এমন ধমক খেলাম যে চুপ করে যেতে হল।" বাস, ঐ পর্যন্তই।

নকশালপন্থী আন্দোলন ভাটার মুখে আসতেই আদর্শগত বিবাদের সুযোগে অনেকগুলো গোষ্ঠী ফ্রন্টিয়ার-এর প্রতি সাহায্য ও সহযোগিতা তুলে নিল। সাধারণ পাঠকের ভিতরের ঔদাসিন্য এসে পড়ল। শুরু হল অর্থসংকটের যুগ। তখন তিনি নানা জায়গায় চিঠি লিখলেন আর্থিক দান কিংবা সাহায্যের জন্য। আমিও একটা পোস্ট কার্ড পেলাম—বুঝলাম সাহায্য চাইতে তার কত কষ্ট হচ্ছে। ফ্রন্টিয়ার-এর জন্য দানসংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলাম এককালে যারা ফ্রন্টিয়ারকে নিয়ে নাচানাচি করত তাদের অনেকেই সামান্য অর্থ দান করার ব্যাপারে বিস্তর গাঁই-গুঁই শুরু করল। এত সামান্য অর্থসংগ্রহ হল যে নিজের বেতন থেকে কিছু টাকা দিয়ে তাকে মোটামুটি সম্মানজনক অঙ্কেতে পরিণত করতে হল। সবসময় আমার মনে সংকোচ ছিল আরও কিছু করতে পারিনি বলে। অথচ উনি আমার সেই সামান্য উদ্যমের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছিলেন।

বাংলাদেশের "মুক্তিযুদ্ধ" নিয়ে আমি নিজেও যখন ভাবালু হয়ে গিয়েছিলাম তখন দেশে কেবল ফ্রন্টিয়ার-এই দেখেছিলাম ভিন্ন সুরের বক্তব্য। প্রথম-প্রথম খারাপ লাগত। (আরও-দু-একটি কাগজে সেরকম বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল হয়ত, আমার চোখে পড়েনি।) বাংলাদেশকে "হানাদারদের কবল থেকে" ত্রাণ করার পর ইন্দিরা গান্ধী এবার দেশের শাসকশ্রেণীকে "আভ্যন্তরীণ হানাদারদের কবল থেকে" ত্রাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিলেন। চারিদিকে ধন্য-ধন্য রব। তখন আরও ভালো করে বুঝলাম, বাংলাদেশের ঘটনায় দেশব্যাপী মাতলামোর বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রন্টিয়ার কি উচিত কাজটাই করেছিল।

বাংলাদেশ "মুক্ত" হওয়ার পরেই ব্যাপক নকশাল-ঠেঙানো ও নকশাল-নিধনের মাধ্যমে স্বৈরতন্ত্রের পরিবেশ রচনা হল। গুমোট হাওয়ায় স্বৈরতন্ত্রের প্রেতনৃত্য যখন শুরু হয়েছিল তখন শাসকশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা প্রথম ছিল নির্বিকার। পাড়ায় পাড়ায় যখন পুলিশ নকশাল-সন্দেহে যুবকদের টেনে বার করে পাইকারিভাবে হত্যা করত, তখন "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের" ধুয়া আজ যারা তুলছে তারা "ফ্লাওয়ার শো" "ডগ্ শো" প্রভৃতি গণতান্ত্রিক অনুষ্ঠান নিয়ে ব্যস্ত থাকত। সেই থেকে স্বৈরতন্ত্রের বোধন। রেল ধর্মঘট লৌহহস্তে নিবারণ করলেন দেবী। কালাকানুন এসে পড়ল একটার পর একটা। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের কেন্দ্রীকরণের প্রবণতা ভারতীয় বৃহৎ বুর্জোয়ার অংশ বিশেষকেও শেষে আঘাত করল কোন কোন ক্ষেত্রে। তারা

তখন দেশব্যাপী ইন্দিরা বিরোধী গণ-আন্দোলনকে মদত দিতে শুরু করল। কিন্তু তাদের তুলনায় ফ্রন্টিয়ার-এর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। সমর সেন তখন আমাকে কয়েকটা চিঠি লিখেছিলেন—স্বৈরতন্ত্র-বিরোধী ব্যক্তিদের সঙ্গে সেই তিমিরাচ্ছন্ন পরিবেশে তিনি হয়ত যোগাযোগ রাখতে চেয়েছিলেন। তাতে ইন্দিরা গান্ধীকে তিনি "Our fair lady" বলে উল্লেখ করতেন।

তখন ফ্রন্টিয়ার সাধারণ পাঠকদের কাছে গিয়ে পৌঁছাতে পারত না। সজাগ বামপন্থীদের মুখপত্র হয়েই ফ্রন্টিয়ার বেঁচেছিল তখন। সমর সেনের অননুকরণীয় শ্লেষোক্তি ("India's tryst with Inflation"—এমন সব বাক্যাংশ মনে গেঁথে যেত।) ভারতীয় গণতন্ত্রের দ্রুত অধঃপতন এবং স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রের অবিশ্বাস্য প্রবঞ্চনা এবং ছলনার স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর সংযত অথচ শাণিত বাক্‌ভঙ্গির কৃতিত্ব পত্রিকাটার মূল্য অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল আমাদের কাছে। জরুরি অবস্থার সময় প্রতিটি সংখ্যার জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতাম। আবার সেই সময় থেকেই কপট বন্ধুদের বিষনজরও তাঁর উপর বেশি করে পড়ল। (গুণ্ডাদের হয়রানির কথা আর বললাম না)।

১৯৭৪ সালে বোধহয় All India Kotnis Memorial Committee-র তরফ থেকে একটা ডেলিগ্যাশন চীনে যায়। আমাকেও তার সদস্য করা হল এবং দিল্লি থেকে তার-যোগে আমাকে তড়িঘড়ি প্রস্তুত হতে বলা হল। সমস্ত ব্যাপারটাই ভারত সরকার সাজিয়েছিল আসামে আমাকে লোকচক্ষুতে হেয় প্রতিপন্ন করতে। শেষ মুহূর্তে আমাকে বলা হল কংগ্রেস (আই)-এর একজন M. P. সঙ্গে না-গেলে ভারত সরকার ডেলিগ্যাশনকে ছাড়পত্র দেবে না। চীন সরকার আবার ডেলিগ্যাশনের সদস্যসংখ্যা কড়াভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই আমাকে ডেলিগ্যাশন থেকে শেষ মুহূর্তে বাদ দেওয়া হল। চীনের দূতাবাসে আবেদন করে কোনও সাড়া পেলাম না। আমি এখানে-ওখানে নিষ্ফল ছোটাছুটি করলাম সান্ত্বনা কিংবা সমর্থনের লোভে। সমর সেন ঠাণ্ডা গলায় বললেন, কয়েকবছর আগে একই কায়দায় তাঁকেও কিউবা-যাত্রা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। উনি বলেছিলেন ওদের (অর্থাৎ সরকারী গৃহদপ্তরকে) "লাই দেবেন না।" কথাটা মনে রাখার চেষ্টা করেছি। চীন থেকে আরও দুবার নিমন্ত্রণ এসেছিল, সরকারী উদ্যোগে বিনি পয়সায় বিদেশযাত্রার সুযোগ এখনও দু-একটা নাকের ডগায় এসে ঘুর-ঘুর করে। সমর সেনের নির্বিকার মুখচ্ছবি মনে পড়লে লজ্জা পাই। নানা ছুতোয় সেসব "নিমন্ত্রণ" প্রত্যাখ্যান করি।

পার্টির কড়া শৃঙ্খলায় যারা থাকে তাদেরও স্খলন হয়। পার্টির শাসনের বাইরে যারা রয়েছে, সেসব বুদ্ধিজীবীর আদর্শনিষ্ঠা সহজে নানা ব্যক্তিগত দুর্বলতার দরুন শাসকশ্রেণী ও সরকারের চক্রান্তের শিকার হতে পারে। আমার

নিজের ক্ষেত্রে দেখেছি সম্মান ও খ্যাতির লোভ কিছুটা দমন করতে পারলেও দুর্নামের ভয় জয় করাটা কঠিন ব্যাপার। তাই যখন কলকাতার একটা সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবী চক্র গুয়াহাটীর সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের যোগসাজসে আমার ভাব-মূর্তি কলঙ্কিত করতে শুরু করল, আমি বিচলিত এবং ক্ষুব্ধ হলাম। তাদের একটি কৌশল সুপরিচিত। আমার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অভিযোগ একটা কাগজে প্রকাশ করে, অথবা আমার বক্তব্য নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি করে. তারপর আমাকে উত্তরদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা। সেসব উপলক্ষে আমি সমর সেনের শরণাপন্ন হতাম। উনিও তৃতীয় কোনও পক্ষের সাহায্যে শেষে আমার উত্তর কিংবা স্পষ্টীকরণ প্রকাশ করাতেন। কিন্তু সম্পাদকদের "সম্পাদনা" (অথবা বিকৃতি) থেকে আমার বক্তব্যকে রক্ষা করতে পারতেন না। আমাকে বাঙালি বিদ্বেষী অথবা বাঙালি বিরোধী প্রমাণ করতে এসব সাংবাদিকনামধারী উচ্ছিষ্টজীবীদের ছিল প্রাণান্তকর চেষ্টা। (এদের সঙ্গে সি.পি.আই-এর অনুগ্রহধন্য বামবিলাসীরাও আছেন)। এদের বিরুদ্ধে আমার যুদ্ধ যতই ব্যক্তিগত হোক না কেন. তার একটি নৈর্ব্যক্তিক, সামাজিক দিকও ছিল। আসাম-আন্দোলনের আগে আসামের বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা কথাটা বুঝতে চাইত না। সমর সেন সবরকম ব্যক্তিগত দুর্বলতার প্রতি খড়্গহস্ত হয়েও এ ব্যাপারে আমার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। আসাম আন্দোলনের ফ্যাশিস্ট চরিত্রের প্রতি সজাগ থেকেও আসামে কেন্দ্রীয় সরকারের কূট চক্রান্ত ও দমননীতি সম্পর্কে ফ্রন্টিয়ার তথা সমর সেন ছিলেন সোচ্চার। কিন্তু কেন্দ্রীয় ফৌজদারি বাহিনীকে আসামে "গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠায় ব্যবহার করার ব্যাপারে বহু তথাকথিত বামপন্থী ছিল আবার সোৎসাহী।

কলকাতায় দীর্ঘদিনের জন্য গেলেই তাঁর খোঁজ নিতাম। দেখতাম আরও শীর্ণ হয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁর মার্জিত আচরণ. ঈষৎ উদাস. কখনও বা পরিহাস-চটুল কথাবার্তা, আসামের পরিস্থিতি সম্পর্কে কৌতূহল. এবং মতাদর্শের প্রতি তাঁর অপরাজেয় অথচ অনুচ্চারিত আনুগত্য সেই শারীরিক দুর্বলতার ভাব ছাপিয়ে মনের মধ্যে শ্রদ্ধা এবং গভীর আস্থার ভাব জাগ্রত করত। একবার দেখি mantel-piece-এর ওপর পারিবারিক ফটোগ্রাফ একটা। এক ভদ্রমহিলার ছবি দেখে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাঁর কন্যা কিনা। উনি উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, তাই।" তারপর স্বভাববিরুদ্ধ প্রগল্‌ভতা নিয়ে বলে উঠলেন, "সে কী interesting lady, আপনাকে কি বলব?" আমি বুঝতে পারিনি তাঁর পিতৃহৃদয়ের গৌরব আর স্নেহ সেই মন্তব্যে ঝরে পড়েছিল। বছর কয়েক পর কলকাতারই এক বান্ধবী বললেন, সমর সেনের সেই প্রিয়তমা কন্যা নিউইয়র্কে মারা গিয়েছেন। সমর সেন খুবই অসুস্থ। উদ্বিগ্ন হয়ে তাঁকে চিঠি লিখে-ছিলাম একটা—তাঁর শোকের গভীরে পৌঁছাতে পেরেছিলাম বলে মনে হয় না।

অনেক, অনেক দিন পরে পোস্ট কার্ডে-লেখা একটি চিঠিতে উনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেছিলেন, তখুনি উত্তর দেওয়ার মানসিক অবস্থা তাঁর ছিল না। নানা সাংসারিক-সামাজিক-সমস্যায় আমি তখন উদ্‌ভ্রান্ত—কিন্তু চিঠিটা পেয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চোখে জল এসে গেল।

সমর সেনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার শপথ না নিয়ে আমরা কি থাকতে পারি?

পরিশিষ্ট :

১ একটা ব্যাপার নিয়ে সমর সেনের সঙ্গে আমার মাঝে-মাঝে মতভেদ হত। ফ্রন্টিয়ার-এ যখন লিখতে শুরু করি তখন বামপন্থী সাহিত্য তথা সাংবাদিকতার চরিত্র কিরকম হবে তা-নিয়ে মনে কিছু সংশয় ছিল। লেনিনের Party Organization and Party Literature আর মাও-এর Talks at the Yenan Forum একদিকে আকর্ষনীয় লাগত অন্যদিকে সংকীর্ণ এবং মতান্ধ বলেও দুশ্চিন্তা হত। কিন্তু আমার মনে হত লেখকরা মধ্যবিত্ত গণ্ডীর ভিতরে না-থেকে ক্রমশঃ জীবনধারা পরিবর্তন করে শ্রমজীবী জনগণের সঙ্গে মেলা-মেশা করলে লেখার চরিত্র, ভাষা. লক্ষ্যের পরিবর্তন হবে, হয়ত নূতন ফর্মের জন্ম হবে। এই অনুশীলন করতে মধ্যবিত্ত ভয় পায়, তাই বৃত্তের ভিতরে ঘুরতে ঘুরতে নানা ধোঁয়াটে তত্ত্বের সৃষ্টি করে—যার শেষ কথা হল জনসাধারণের জন্য সাহিত্য সৃষ্টির কোনও প্রয়োজন নেই। তা-ছাড়া তারা ভাবে, জনসাধারণ থেকে বুর্জোয়া লেখকের যে বিচ্ছিন্নতা, সমাজবাদ প্রবর্তনের পূর্বে—এমনকি সাম্যবাদ প্রবর্তনের পূর্বে—তা দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বড় জোর বুর্জোয়া উপরিসৌধে বুর্জোয়া মাধ্যমে একটা Critical element (সমালোচনামূলক উপাদান) যোগ হতে পারে—যে মত লুকাচের।

আমি এখনও মনে করি বামপন্থী লেখকরা পার্টির নেতৃত্ব তথা উৎসাহে এই অনুশীলন শুরু করতে পারে। সামাজিক উত্তরণে বৈচিত্র্য থাকবেই, অন্যরকমের শিল্প-সাহিত্যও থাকতে পারে। কিন্তু এক নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি কল্পস্বর্গীয় (Utopian) সংকল্প নয়। আমার মনে হয় উপযুক্ত পরিবেশ ও উৎসাহ পেলে ব্রেষ্ট্‌ (Brecht) এ ব্যাপারে পথ দেখাতে পারতেন। এখন দেখছি হবিব তনবিরের প্রচেষ্টায় তার পক্ষে সমর্থন পাওয়া যেতে পারে—যদিও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাবে না থাকলে তার সেই প্রচেষ্টাও শেষে স্থবির হয়ে যেতে পারে। আমি তাই মাঝে মাঝে ফ্রন্টিয়ার-এর ভাষা ও "অ্যাপ্রোচ্‌" পরিবর্তন করতে তাঁকে অনুরোধ করতাম। তিনি এড়িয়ে যেতেন মৃদু প্রতিবাদ করে। আজ অবশ্য বুঝতে পারি, আমার এই পরামর্শ কার্যকরী করার কোন পরিবেশ ছিল না।

দীপেন্দু চক্রবর্তী

সমর সেন-কে যতটুকু চিনেছি

মৃত মানুষ বড় অসহায়। তার পছন্দ অপছন্দের তোয়াক্কা না করলেও চলে। যেমন সমর সেন এখন। আমরা তাঁকে নিয়ে এখন থেকে অনেক কিছু করতে পারি, বলতে পারি যা তাঁর নাপসন্দ। তিনি প্রেসের বিরোধিতা করলেও তাঁকে এখন বিগ প্রেসের মাতব্বররা শিরোপা দিতে পারে, স্মৃতিসভায় অশ্রুসিক্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারে সুদিনের বন্ধুরা, দুর্দিনের শত্রুরা, বঙ্গীয় ভাবালুতা যা তাঁকে স্পর্শ করে নি কখনো তারই পরাকাষ্ঠা এখন আমরা দেখাতে পারি ভক্তিগদগদ চিত্তে। সর্বোপরি যে-সংসদীয় গণতন্ত্রে তাঁর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তার বিধায়কেরা ঘটা করে শোকপ্রস্তাবও আনতে পারে।

এই অবস্থায় সমর সেনের মূল্যায়ন কিঞ্চিৎ কঠিন কাজ। কপটতার ঝুঁকি কম থাকে যদি প্রথম থেকেই স্বীকার করে নিই যে যা বলবো তা নিতান্তই আমার কথা, সমর সেনকে যতটুকু দেখেছি, যতটুকু চিনেছি তার প্রেক্ষিতে সত্য, তার বাইরে সত্য নাও হতে পারে। সুতরাং নিতান্তই ব্যক্তিগত কথা-বার্তা অনিবার্য এই মুহূর্তে। যে-বয়সে যে-মন নিয়ে যে-সময়ে সমর সেনের সংস্পর্শে এসেছিলাম তা হারিয়ে গেলেও এখনো স্মৃতিচারণায় শিহরণ জাগায়। 'মুক্তির দশকে' যখন আমরা হাতড়ে বেড়াচ্ছি সঠিক সংস্কৃতি ও সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য, তখন ফ্রন্টিয়ার-এর সম্পাদক সমর সেন ছিলেন আমাদের কাছে সেই পথের দিশারী। হঠাৎ একদিন তাঁর কাছ থেকেই চিঠি পেলাম, ফ্রন্টিয়ার-এ লেখার আমন্ত্রণ তাতে। সেই প্রথম সাক্ষাৎ ও আলাপ। এবং প্রথম আলাপেই এখন মনে হয় উভয় পক্ষই হতাশ না হয়ে পারে নি। সমরবাবু আমায় ফ্রন্টিয়ার-এ লিখতে বলায় সবিনয়ে জানালাম একটা বাংলা পত্রিকার সঙ্গে জড়িত থাকায় আমার এটুকু অভিজ্ঞতা হয়েছে যে সাধারণ বাঙালি পাঠকের জন্য এখন আমাদের আরো বেশি করে বাংলায় লেখা দরকার। সমরবাবু তর্কে আগ্রহ দেখান নি, তাঁর নীরবতা ছিল ব্যঞ্জনাময়। তাঁর লোকবল প্রয়োজন ছিল, আমি ইংরেজির অধ্যাপক, সুতরাং আমার কাছে তাঁর কি প্রত্যাশা তা বুঝে নিতে অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু সত্তরের প্রথমার্ধে যে-একরোখা মানসিকতা আমাদের অনেককেই আচ্ছন্ন করেছিল তারই প্রভাবে ইংরেজি-লেখার উগ্র বিরোধিতা আমাকে পেয়ে বসেছিল এমন কথা বলতে পারি না। কারণ ফ্রন্টিয়ার-এ একটু আধটু লিখেওছিলাম। আসলে বাম সাংবাদিকতার বাহন যে মাতৃভাষা হওয়া আবশ্যক এ উপলব্ধি আমার মজ্জাগত। সমরবাবু বাংলার বিখ্যাত কবি হওয়া সত্ত্বেও শুধু কবিতা লেখাই ছাড়েন নি, বাংলা লেখাও প্রায়

ছেড়ে দিয়েছেন তখন। অন্যপক্ষে তাঁর ইংরেজি লেখার প্রসিদ্ধ মুন্সীয়ানা তাঁকে আরো বেশি করে ইংরেজি-নবীশদের গণ্ডীতে আটকে রাখছিল। মজার কথা, সমরবাবু কেন ইংরেজিতে পত্রিকা বার করেন, বাংলায় নয়, তার কোনো আলোচনায় আগ্রহ না দেখিয়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ স্মিতহাস্য সহযোগে আমার এই উগ্র বাঙালিয়ানা বোধহয় নীরবে উপভোগ করতেন। এরপর থেকে ফ্রন্টিয়ার-এর দপ্তরে যাওয়া মানেই আমার কাজ হয়ে দাঁড়ালো সমরবাবুকে বাংলা-ইংরেজির প্রশ্ন তুলে অস্বস্তিতে ফেলা। তিনিও বোধহয় আমাকে উসকে দিয়ে আরাম পেতেন, তাই একবার বলে বসলেন, বাংলায় বানান ভুল হলে ততটা লজ্জা লাগে না ইংরেজিতে ভুল হলে যতটা লাগে। ফ্রন্টিয়ার-এ ভুল বানান ছাপায় তিনি বিচলিত হন, কিন্তু বাংলাকে ছোট করার মূঢ়তা তাঁর পক্ষে অভাবনীয়, এখন মনে হয় তিনি সজ্ঞানে আমাকে নাড়া দেবার জন্যই বলেছিলেন কথাটা। আমিও বাংলা ছেড়ে ইংরেজির ক্ষেত্রেই সমরবাবুকে আক্রমণ করলাম একটা চিঠিতে। সাহেবদের পত্রিকা 'ব্রডশীট'-এর ইংরেজি যদি এতটা সহজ সরল হয় তবে ফ্রন্টিয়ার-এর ইংরেজিতে এত মার প্যাঁচ, এত উইট আয়রনি, এত অপ্রয়োজনীয় কলোকুয়ালিজম কেন? কাদের জন্য এ পত্রিকা? পরবর্তী সাক্ষাতে সমরবাবু আর তাঁর স্বভাবসুলভ রসবোধ রক্ষা করতে পারেন নি, কারণ ঐ চিঠিতে আমি স্টেটসম্যানের সঙ্গেও ফ্রন্টিয়ার-এর ভাষার তুলনা করে দেখাতে চেয়েছিলাম ফ্রন্টিয়ার-এর ভাষা অতিরিক্ত আত্মসচেতন। তিনি ভ্রূকুঞ্চন করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, স্টেটসম্যানের সম্পাদকীয়তে আইরনি আর উইট কোথায় পেলেন?

এইভাবে একটা নাটকীয়তার সৃষ্টি হয়েছিল আমাদের সম্পর্কে। মতবিরোধ থেকে পারস্পরিক আকর্ষণ—এটা আমার দিক থেকে আগাগোড়া অনুভব করে গেছি, বোধহয় সমরবাবুও করতেন, কেননা তাঁর ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে তিনি আমার কাছে সাহায্য চেয়ে পাচ্ছেন না এমন আক্ষেপ করতেন। এইসব শুনে একবার এগিয়ে গেলাম জানতে কিভাবে সাহায্য করতে পারি। প্রেসের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় তার জন্য কিছু ছেলে পাঠাতে পারি এমন প্রস্তাবেও তিনি খুশি হলেন না। স্পষ্ট করেই জানালেন আমি সম্পাদকীয় লিখতে পারবো কিনা। এবারে ভয় পেলাম। সমরবাবুর মত ইংরেজি কি করে লিখবো? তা ছাড়া রাজনৈতিক বিষয়ে সম্পাদকীয় লেখার জন্য যেরকম তথ্য দরকার আমার আয়ত্তে তা নেই। ঢোক গিলে বললাম, নাটকের রিভিউ লিখতে দিলে ভালো হয়। তিনি রাজি হন নি। তখন ঠিক হলো পরীক্ষামূলকভাবে একটা সম্পাদকীয় লিখে ওঁকে দেখাবো। কিন্তু লিখে সেই যে তাঁর দপ্তরে দিয়ে এসেছিলাম তাতে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল আজও জানতে পারি নি। বোধহয় তিনি এতদিনে বুঝতে পেরেছিলেন ওকাজ আমার নয়। কিন্তু শিখিয়ে নিলেন না কেন? কি ত্রুটি ছিল

তা জানালেন না কেন? এখনো এই প্রশ্ন পীড়িত করে আমাকে। ঠিক যেমন করেছিল 'প্রস্তুতি' পত্রিকায় 'বুদ্ধিজীবীর পত্রিকা ও জনগণের পত্রিকা' প্রবন্ধটি লেখার পর। তাঁর সঙ্গেই একদিন আলোচনা হয়েছিল, সমাজের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষিতদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকা হওয়া উচিত। সেই আলোচনার প্রেরণায় প্রবন্ধটি লিখি। বলেছিলাম, প্রবন্ধটি পড়ে মতামত জানাবেন। মৌখিক বা লিখিত কোনো উত্তরই পাই নি। অথচ এ কথা বলা যাবে না যে সমরবাবু নবীন লেখকদের সম্বন্ধে উন্নাসিকতাহেতু উদাসীন ছিলেন। 'অনুষ্টুপ'-এ বিষ্ণু দে-কে আক্রমণ করে লেখা বেরলে তিনি তারিফ করেছেন, তারক সেনের প্রবন্ধ-সংকলনের রিভিউ লেখায় তিনি আমাকেই বাহবা দিয়েছেন, অজস্র তরুণ ছেলেকে কাছে টেনেছেন, এমন কি 'সীমানা' পত্রিকা বার করার দায়িত্ব দিয়েছেন নবীনদেরই হাতে। সুতরাং ব্যাপক বদান্যতার এই মানচিত্রে যদি কখনো বিন্দুমাত্র আকিঞ্চন দেখা যায় তবে তাকে ব্যতিক্রম হিসেবেই দেখা উচিত। কিন্তু সেভাবে দেখলেও সম্পাদক ও সাংবাদিক সমর সেনের একটি সীমানা ধরা পড়ে। বুদ্ধিজীবীদের পত্রিকা ও জনগণের পত্রিকা বিষয়টির প্রাসঙ্গিকতা যে-বামপন্থী সম্পাদক সত্তরের দশকে অগ্রাহ্য করতে পারেন তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন হলেও সজাগ দৃষ্টির অধিকারী নন। এটা প্রমাণ হয় সমরবাবুর লেখক নির্বাচনে। যেহেতু ইংরেজি লিখতে পারে এমন বামপন্থী লোকের সংখ্যা কম সেজন্য তাঁকে প্রায়শঃ শুধুমাত্র ইংরেজির মানদণ্ড দিয়েই লেখক নির্বাচন করতে হয়েছে। একজন লেখক তো আমাদের ইংরেজির হাল নিয়েই লিখে গেলেন, তার উত্তরে জনৈক পত্রলেখক জানালেন এ হলো সেই গল্পের মত— ভ্রমণরত রাজা শীতে কাতর ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভুল সংস্কৃতে জিজ্ঞাসা করেন কেন তিনি নগ্নগাত্রে ঘুরছেন; পণ্ডিতের উত্তর—শীতে যতটা না কষ্ট পাচ্ছি তার চেয়েও বেশি কষ্ট পাচ্ছি আপনার ভুল সংস্কৃত শুনে। পত্রলেখক দেখিয়ে দিয়েছিলেন ভাষাগত বিশুদ্ধতার প্রশ্ন যখন শারীরিক অভাববোধকে অগ্রাহ্য করে তখন তা এক অস্বাস্থ্যকর বিলাসিতা মাত্র। পত্রলেখকের অভিমতকে সমর্থন জানিয়ে সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম, এবং জেনে বিস্মিত হলাম যে ফ্রন্টিয়ার-এর আলোচ্য লেখকটির ইংরেজি-জ্ঞানই তাঁর কাছে বিবেচ্য ছিল, ভদ্রলোকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী বা তাঁর দক্ষিণপন্থী মনোভাবের কোনো খবর তিনি রাখেন না। আমার কাছ থেকে শুনে অবশ্য সমরবাবু সজাগ হলেন। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, বড় বড় বুদ্ধিজীবীর বাইরে তাঁর যোগাযোগ তেমন নেই। তাছাড়া, তিনি কিছুটা অসহায়ও বটে। ইংরেজি ভালো লিখতে জানে এমন লেখকের সংখ্যা কম বলে তাঁকে অনেক সময়ই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে গৌণ করতে হয়। তবে আবার এমনও দেখা গেছে তিনি ফ্রন্টিয়ার-এর বামপন্থী লেখককে বড় পত্রিকায় লেখার ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন, যা কিনা ফ্রন্টিয়ার-এর মত পত্রিকার পক্ষে ছিল আত্মঘাতী। পরে নিজেও

যখন কিছু কিছু বাংলা লিখলেন তখন ধারাবাহিকভাবে তা 'আনন্দবাজারে'ই লিখলেন এবং অনেকের মত আমিও খুশি হতে পারলাম না। বিগ প্রেসের সঙ্গে সমরবাবুর মত মানুষের এই সহযোগিতা একেবারে বেমানান।

আসলে সমরবাবু নিজেই আপসহীনতার এমন নমুনা গড়ে রেখেছিলেন যে তাঁর সামান্য বিচ্যুতি আমাদের ব্যথিত করতো। এর জন্য তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব যতটা দায়ী তার চেয়েও বেশি দায়ী ছিল সে-আমলে আমাদের বিশুদ্ধ তাত্ত্বিকতা। যে যা নয়, যে যা হতে চায় না আমরা অনেকেই তা বিস্মৃত হয়ে তাকে আমাদেব কাঙ্ক্ষিত মূর্তিতে গড়ে নিতে চেয়েছি। এর ফলশ্রুতি হলো সংসদীয় গণতন্ত্রবিরোধী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে চূড়ান্ত ভুল বোঝাবুঝি। আক্রান্ত হয়ে সমরবাবুকে তাই ঘোষণা করতে হয়েছিল, সম্পাদক নিজেকে মার্কসবাদী বলে দাবি করে না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সমরবাবুকে চল্লিশের দশকেও মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তীব্র আক্রমণ করা হয়েছিল। তাঁর কবিতা না লেখার পেছনে এই সমালোচনার কোনো ভূমিকা ছিল কিনা তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে পারে, কিন্তু ফ্রন্টিয়ার-এর সম্পাদক সমর সেন নানান সমালোচনা সত্ত্বেও যে সাংবাদিকতা চালিয়ে গেছেন তাতে প্রমাণ হয় মধ্যবিত্তের দ্বন্দ্বদীর্ণ অবস্থান থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে না পারলেও মধ্যবিত্তের অসহিষ্ণুতা ও পরাস্তভাবে আক্রান্ত হন নি। যিনি মূলত কবি তিনি কবিতা লেখা থামিয়ে দেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠান-বিরোধী পত্রিকা-পরিচালনা থামিয়ে দিতে পারেন না। এর ভেতরে ধরা পড়ে এমন একটা সংগ্রামী মনোভাব যার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নেই বললেই চলে। যাঁদের তুলনা মনে আসে তারা হলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হেমাঙ্গ বিশ্বাস। এঁরা দু'জনেই প্রাতিষ্ঠানিক ছত্রছায়ার বাইরে নিজেদের বৈপ্লবিক অবস্থান অটুট রাখার চেষ্টা করেছিলেন। তবু ওঁরা বামপন্থী সংগঠনের ভেতর থেকেই পুষ্টিলাভ করেছেন অনেকদিন পর্যন্ত, কিন্তু সমর সেন বড়ই স্বতন্ত্র, বড়ই একক। যেমন চল্লিশের দশকে তেমন সত্তরের দশকে তিনি নিজের মেজাজ ও মনন অনুসারে তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান ঠিক করে নিয়েছিলেন। যার অনন্যতা যেমন কট্টর মার্কসবাদীদের অস্বস্তিতে ফেলেছে, তেমনি কাছে টেনেছে খোলা মনের মার্কস-বিশারদদের। হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নকশালপন্থীদের বন্ধু হয়েও বামফ্রন্ট-বিরোধী ছিলেন সর্বস্তরে এমন কথা বলা যায় না, সমর সেন প্রয়োজনে আনন্দবাজারের সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি ছিলেন যদি তা বামফ্রন্টের মতাদর্শকে ধূলিসাৎ করার কাজে লাগে। এর ফলে সমর সেন না পেলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত বাম-পন্থী সরকারের পুরস্কার, না পেলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মত কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্থা দূরদর্শনের কাছ থেকে শোকযাত্রার দীর্ঘ অনুষ্ঠান। প্রচলিত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার বিরোধিতায় সমর সেন যে কতটা সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তা এ থেকেই বোঝা

যায়। কিন্তু অন্যদিকে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত সমর সেন সাধারণের নাগালে ছিলেন না। একটা বৌদ্ধিক আভিজাত্য পারিবারিক আভিজাত্যের সঙ্গে মিশে তাঁকে যে-স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল তাতে সাধারণের শ্রদ্ধাবৃদ্ধি হয়েছে, ঘনিষ্ঠতা বাড়ে নি।

একদিন সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি তিনি ডোরা-কাটা লুঙ্গির ওপর বেশ পুরনো দামি একটা ড্রেসিং গাউন পরে আছেন। সেদিনই মনে হয়েছিল এটা তাঁর পোশাকের অসামঞ্জস্য নয়, সামাজিক অবস্থানেরও। বিখ্যাত বংশের উত্তরাধিকারকে তিনি বিদ্রূপ করলেও তার আভিজাত্যের ঘোর কাটে নি। এ যেন বিষ্ণু দে ও ঋত্বিক ঘটকের সমাহার। বিষ্ণু দে'র ধ্রুপদী প্রশান্তি নিয়ে তিনি কটাক্ষ করতেন, কিন্তু তাঁর সান্নিধ্যলাভে যেমন আগ্রহ দেখাতেন তাতে মনে না হয়ে যায় না বন্ধনটা এখানে ঐতিহ্যগত। অন্যদিকে তাঁর ব্যবহার ও জীবন যাপনে যে নিয়ম-ভাঙার প্রবণতা দেখা যেত তাতে মনে হয় তিনি ছিলেন মেজাজে বিজন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটকদের সহযাত্রী। অবশ্যই খালাসিটোলার আড্ডায় সমর সেনকে মানায় না। কিন্তু বৈঠকখানায় মদ্যপানের বন্ধুতায় তিনি বাঘে গরুতে একঘাটে জলপান করিয়ে তৃপ্তিলাভ করতেন। একবার 'সানডে' পত্রিকায় 'পলিটিকস অব এ্যালকহল' নামে একটা প্রবন্ধে মদ্যপান কিভাবে বামপন্থী সংস্কৃতির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল তা রসিয়ে আলোচনা করেন। যথারীতি আমিও একটা চিঠিতে স্মরণ করিয়ে দিই সমরবাবুর উচিত ছিল নিজেকেও উদাহরণ হিসেবে রাখা, অন্তত কবি ও সাংবাদিক সমর সেনের অতি-পরিচিত আত্মসমালোচক ভাবমূর্তিটির পক্ষে সেটাই ছিল স্বাভাবিক (পরে তা পড়ে আমার এক তরুণ বন্ধু আমার একটি লেখার রিভিউ করার সময় আমাকেও এক হাত নিয়েছিল মনে আছে)। এখানে ঋত্বিকের কাছে সমর সেনের বলিষ্ঠতা ম্লান হয়ে যায় যে-বলিষ্ঠতার জন্যই আবার তার 'বাবু বৃত্তান্ত' এতটা আকর্ষণীয়। নিজেকে নিয়ে মস্করা করা, নিজের পারিবারিক মণ্ডলকে তাচ্ছিল্য করার মেজাজটা আদৌ ভারতীয় নয়, এটা একেবারে সাহেবি মানসিকতা, এবং বিশ শতকের (স্যামুয়েল বাটলারকে বাদ দিলে)। সমর সেন এই গুণটি অর্জন করেছিলেন। এক কথায় তাঁর কবিতা, তাঁর সাংবাদিকতা, তাঁর গোটা জীবনের নামই হতে পারে 'বাবু বৃত্তান্ত'। মেকলীয় সংস্কৃতির ওপর মার্কসীয় শীলমোহরের ছাপ মেরে যেখানে অধিকাংশ বামপন্থী বুদ্ধিজীবী রামগরুড়ের ছানার মত গুরুগম্ভীর বদনে চলাফেরা করে থাকেন, সেখানে সমরবাবু আত্মপরিচয়ের সংজ্ঞা দেন বাবু-সংস্কৃতি ও মার্কসীয় রাজনীতির সমীকরণে, এবং তা ইংরেজিতে যাকে বলে টাং-ইন্-চিক্ ভঙ্গিতে। নিজেকে নিয়ে মস্করা করার ভঙ্গিতে আত্মসমীক্ষার ধারাবাহিকতা সমর সেনের কবিতা ও সাংবাদিকতায় আগাগোড়া লক্ষণীয়। যিনি 'গৃহস্থবিলাপে' লেখেন—"যদি বা পাঠালে পৃথিবীতে

/ তবে কেন দিলে এত ব্যর্থতা ঠাকুর! / শুনেছি পঞ্জিকা মতে / শুভক্ষণে জন্ম অভাগার, /" তিনিই যে 'বাবু বৃত্তান্ত' লিখবেন সেখানেই সমরবাবুর চারিত্রিক সঙ্গতি। একদিকে 'ঘুণধরা আমাদের হাড়' এই চেতনা, অন্যদিকে "শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার" এই আশাবাদ—তিনি এ দুয়ের মধ্যে নানান ভাবে যাতায়াত করেছেন, কখনো তার প্রকাশে পাওয়া যায় আবেগের গভীরতা, কখনো বা ইচ্ছাকৃত হালকা চাল। খুঁটিয়ে দেখলে সম্পাদক সমর সেনের কর্মকাণ্ডেও এই দুই বিপরীতের টানাপোড়েন দেখা যায়। তাঁর সততা এইখানে যে তিনি তা গোপন করে তরুণদের মন জয় করতে চান নি। নিজের সীমানা সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ চেতনা ছিল বলেই বোধহয় তিনি এগিয়ে গিয়ে তাদের কাজে রায় দান করতেন না। সভাস্থলে চুপচাপ থাকতেন, ভাষণদানের বিশেষ আগ্রহ দেখাতেন না। অন্যদিকে যে-মানুষ যত বড়ই হোক, তার সীমানা সম্বন্ধেও তিনি ছিলেন সমানভাবে সচেতন।

মূর্তি-পুজোর দেশে তাঁর মূর্তি-ভাঙার দৃষ্টিভঙ্গিটা (আইকনোক্লাজম) শুধু একটা প্রতিক্রিয়া নয়, তাঁর ব্যক্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নকশালপন্থীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানে যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও তাকে অশ্রদ্ধেয় ভাবেন নি, বিষ্ণু দে-র প্রতি কটাক্ষ করেও তাঁর আকর্ষণ অস্বীকার করেন নি। তাঁর বৈঠকখানার আলমারিতে একটা ফটো দেখতাম—রবীন্দ্রনাথের একপাশে বুদ্ধদেব বসু, আর এক পাশে তিনি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এ এক ঘোরতর অসঙ্গতি—প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বুদ্ধিজীবীর বৈঠকখানায় এই ছবিটির উপস্থিতি। কিন্তু সমরবাবুর জগতে এটা অসঙ্গতি ছিল না, কারণ তাঁর কাছে সমালোচনা আর বর্জন সমার্থক নয়। অথচ এসব নিয়ে তিনি কখনই কোনো তত্ত্ব খাড়া করেন নি আমাদের সামনে, হেমাঙ্গ বিশ্বাস যেমন করতেন। তাঁর কাজ ছিল আর সবাইকে দিয়ে তত্ত্বটা করিয়ে নিয়ে লক্ষ রাখা ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়। তাঁর এই ভূমিকাটি আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের বদ্ধ ডোবায় যে-কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছে তা ভাবীকাল ফ্রন্টিয়ার-এর পাতায় পুনরাবিষ্কার করবে।

সমরবাবু যে শুধুই বড় বড় চাকরি ছেড়েছেন তাই নয়, বামপন্থী সাংবাদিক হিসেবেও আত্মপ্রচারের বড় বড় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এদিক থেকে তিনি প্রায় অদ্বিতীয় বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। যে-পেশাগত স্বার্থে তাবড় তাবড় মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের আপস প্রায় প্রাত্যহিক ব্যাপার, তিনি সেই ক্ষেত্রেই বিদ্রোহী হয়ে দেখিয়ে গেছেন শ্রেণীত্যাগ পুরোপুরি সম্ভব না হলেও স্বশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুজি-রোজগারের ক্ষেত্রেই রুখে দাঁড়ানো যায় এককভাবে।

আমরা যারা ছোট ছোট পত্রিকায় স্বশ্রেণীর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেই আত্ম-শ্লাঘায় দিন যাপন করেছি, আমাদের কাছে সমর সেনের আকর্ষণ ছিল দুর্নিবার এই

কারণেই। তাঁর অনেক কাজের অসঙ্গতি আমাদের আঘাত দিয়েছে, অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দুরূহ ঠেকেছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাঁর আবেদন ছিল অপ্রতিরোধ্য।

আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর খুব কাছে যেতে চেয়েছি। সমর সেনের ভাব-মূর্তিটা ভেঙে আমি মানুষ সমর সেনের কাছে পৌছনোর কথা ভাবতাম। তিনি তাতে খুশি হতেন না বুঝতে পারতাম। তাঁর অসঙ্গতি ধরিয়ে দিয়েও যে তাঁকে কতটা শ্রদ্ধা করি তা বোঝাতে চেয়েছিলাম শেষ সাক্ষাতের দিনটিতে। 'ওঁরা আর এঁরা' বইটি ওঁর হাতে দিয়ে বললাম. 'আপনাকেই উৎসর্গ করেছি।' বইটি উল্টেপাল্টে উনি বললেন, 'আপনি ইংরেজি লেখেন না কেন ?'

আমারও পাল্টা প্রশ্ন : 'আপনিই বা বাংলা লেখেন না কেন ?'

আশ্চর্য ! আবার শুরু থেকে শুরু হলো যেন আমাদের নাটকীয় ঠাণ্ডা লড়াই।

প্রত্যাশিত ভাবেই বইটি সম্বন্ধে তাঁর কোনো মতামত পাই নি। তবু মনে করি সমর সেনই সেই বুদ্ধিজীবী যাঁকে ছাড়া আর কাউকে আমার প্রবন্ধ সংকলন উৎসর্গ করা সম্ভব ছিল না। উনিশ শতকের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বর্তমান যুগের বুদ্ধিজীবীদের তুলনা করলে আমাদের পাল্লাটা তেমন ভারি ঠেকে না, কিন্তু তারি মধ্যে কেউ কেউ আছেন যাঁরা নিজস্ব সীমানার মধ্যে একটি অনুকরণীয় নজীর হয়ে থাকবেন। সমর সেন তাঁদের শীর্ষস্থানীয়। একটি স্তরে তিনি গত শতকের মনীষী-দেরও যেন ম্লান করে দিয়েছেন—তা হলো তাঁর চারিত্রিক নির্লিপ্ততা। তিনি কাজের মধ্যে ডুবে থেকেছেন. অথচ তার ঢাক পেটান নি, এলিট শ্রেণীর বন্ধুত্ব পেয়েছেন, কিন্তু নিজেকে ভি.আই.পি হিসেবে তুলে ধরেন নি, সমালোচনায় যেমন, প্রশস্তিতেও তেমন সমানভাবে তাঁর অভিজাত উদাসীনতা বজায় রাখতে পেরেছেন, সর্বোপরি আত্মবিশ্লেষণের সাহস ও সততা দেখিয়ে গেছেন আজীবন।

সমর সেনের জীবনে হয়তো তাঁর নমস্য মানুষদের মতো কর্ম আর চিন্তা হরিহর হয়ে ওঠে নি, কিন্তু 'দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ' যে-শ্রেণীর, তারই বৃত্তে বিচরণ করে আমরা ক'জন বলতে পেরেছি তাঁর মত—'বুঝি না নিজেকে' ?

তিমির বসু

৬১, মট লেন

61, Mott Lane, Cal-13
8. 6. 77.

Dear Mr. Basu.

Sorry for the delay in writing back. We 'll use the article—a little later. I hope you won't mind that.

Sincerely,
S. Sen.

সমরবাবু এই চিঠিতে যে লেখার কথা উল্লেখ করেছেন, সেটা ছিল 'শ্রমিকের পরিচালন-ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ'-এর উপর। 'Democracy of collaboration, দ্বিতীয় লেখা, বেরিয়েছিল '৭৭ সালের ৩ সেপ্টেম্বরের সংখ্যায়। প্রথম লেখা অবশ্য এমারজেন্সির মধ্যে, কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাইতে কমরত ঠিকা-মজুরদের উপর একটা ছোট্ট লেখা—'৭৫ সালের ২৩ আগস্ট সংখ্যায় বেরিয়েছিল। ডাকে আমাকে লেখা সমরবাবুর এটাই প্রথম এবং শেষ চিঠি। পোস্টকার্ডের দাম তখন ৫ পয়সা। এই চিঠি পাওয়ার পর আমার কখনও ভুল করেও মনে হয় নি একদিন আমাকেই লেখকদের এ ধরনের চিঠি লিখতে হবে এবং তা-ও 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে বসে।

এই লেখা বেরোবার পরও আমি 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে যাই নি; সমরবাবুর সঙ্গে আলাপও হয় নি। এরপর লেখা পাঠাতাম অনিরুদ্ধের হাত দিয়ে—অনিরুদ্ধ সিং। কমিউনিস্ট আন্দোলন যাদের নিরলস পরিশ্রম আর ত্যাগে বাড়তে পেরেছে অনিরুদ্ধ তাদেরই একজন। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি, পরে সি.পি.এম এবং তারও পরে এম-এল পার্টির প্রথম সারির নেতাদের ক্যুরিয়রের কাজ করেছে অনিরুদ্ধ বরাবর। ফলে পর্দার পেছনের অনেক খবরই সে রাখত। তালতলায় ওর হোটেল এ্যাণ্ড বার এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন-এর ঘরে আমাদের সি. ই. এস. সি. কনট্রাকটরস্ মজদুর সমিতির বসবার জায়গাও সে করে দিয়েছিল। ফলে সন্ধ্যে-বেলায় ওর সঙ্গে রোজই দেখা হতো। সেণ্ট্রাল এভিনিউ কফি হাউসে অনিরুদ্ধ ঠিক সাড়ে দশটায় ঢুকত, যাওয়ার পথে মট লেনে সমরবাবুকে আমার লেখা পৌঁছে দিয়ে যেত। সমরবাবুর সঙ্গে অনিরুদ্ধের বেশ ভাল পরিচয় ছিল। একদিন অনিরুদ্ধের সঙ্গে ৬১, মট লেনে গেলাম। সম্প্রতি কোন একটা দৈনিক কাগজ একে ফ্রন্টিয়ার-এর গলি বলেছে। এরপর মাঝে মাঝে গেছি লেখা নিয়ে। অনেক লেখাই ছাপা হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি তখন অনেক কিছু পাগলের

মতই লিখছিলাম। তবে লেবর নিয়ে বিশেষভাবে আমাকে লিখতে বলেছিল কৃষ্ণরাজ। ঠিকা মজুরদের উপর ফ্রন্টিয়ার-এ যে লেখাটা বেরিয়েছিল সেটা *EPW*-তে এক সপ্তাহ আগে বেরিয়েছিল, আর পরে RSP-র *Call* ওটার পুনর্মুদ্রণ করেছিল।

ট্রেড ইউনিয়ন করতে এসে বইতে না-পড়া সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছিল। কীভাবে স্থিতাবস্থা ভাঙা যায়, থোড় বড়ি খাড়া খাড়া বড়ি থোড়—এর বাইরে কীভাবে আন্দোলন করা যায়—এ সবের খোঁজ করতে গিয়েই লেখার সূত্রপাত। পরে দেখলাম 'ফ্রিল্যান্সিং' করার অনেক সুবিধে আছে। সামান্য কিছু রোজগারের ব্যাপারটা ছেড়ে দিলেও জায়গা বিশেষে পরিচয় দেবার মতো একটা ব্যাপার দাঁড় করানো যায় বটে। 'আপনি কী করেন'—এই প্রশ্নের একটা যুৎসই উত্তর দিতে না পারলে আইনরক্ষকদের কাছে বেশ মুশকিলে পড়তে হয়। এদেশে কাজ করবার অধিকার নেই কিন্তু বেকার থাকাটা নকশালী অপরাধ।

তখন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখার বেশ সংকট চলছিল, সংকট যে এখন মিটেছে ঘটনা এমন নয়। তবে অবস্থাটা তুলনামূলকভাবে কিছুটা আশাপ্রদ। সমরবাবু একদিন বললেন—'আপনি ছোট ছোট Comment লিখতে পারেন'। লিখতে শুরু করলাম। বোধ হয় কিছু বেশিই লিখেছিলাম। একদিন সমরবাবু তিনটে Comment-জাতীয় লেখা এক সঙ্গে জুড়ে *Calcutta Notebook* নাম দিয়ে Press-এ পাঠালেন। ভবানীবাবু তখন ফ্রন্টিয়ার অফিসে বসতেন। ভবানীবাবু বললেন, 'এবার প্রতি সপ্তাহে এই ফিচার চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এসে গেল।' আমি অবশ্য আর পেছন ফিরে তাকাই নি।

লেখার সঙ্কটের পেছনে 'এমারজেন্সি' যথেষ্ট কাজ করেছিল বলে সমরবাবুর ধারণা। আর একটা কারণ ছিল 'মার্কসবাদী'দের নির্বাচনী সাফল্য। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' বরাবর যেরকম স্বতস্ফূর্ততার উপর নির্ভর করে চলে আসছিল, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেইভাবে আর চলা সম্ভব নয়। সমরবাবুর ক্ষেত্রে এই উপলব্ধিটা মেনে নেওয়া বেশ কঠিন হচ্ছিল। লেখা যদি না আসে তাহলে নিজেদের লেখা তৈরি করতে হবে। 'দেশী-বিদেশী যে-সমস্ত কাগজপত্র অফিসে পড়ে থাকে সেগুলোর উপর ভিত্তি করেই কিছু করা যায়।' এই-জাতীয় কিছু একটা একবার বলেছিলাম, কিন্তু সমরবাবুর বক্তব্য ছিল: 'আমরা আজ অবধি কখনই এরকম করি নি।' এক সময়ের অনেক লেখক পরে যে আর 'ফ্রন্টিয়ার'-এ তেমন লেখেন নি তার অনেক কারণের মধ্যে একটা হচ্ছে—'কী লিখতে হবে এ সমস্যাই অনেককে অনেকভাবে বিব্রত করেছে'। হ্যাঁ, এটা অকপটে অনেকে স্বীকারও করেছেন। এদের মধ্যে একজন অমিত ভাদুড়ী।

আবার অনেকের ধারণা 'ফ্রন্টিয়ার' তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও দায়িত্ব হারিয়েছে। সুতরাং 'ফ্রন্টিয়ার' আর আগের অবস্থায় ফিরে আসতে পারে না। অতি সম্প্রতি সমরবাবুর শোকসভাতেও এ ধরনের বক্তব্য এসেছে। ভাবখানা এই, ইতিহাস যেন ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল। আর সত্তরের দশকে বিপ্লবী জোয়ার-ভাটার চেহারা নেওয়ায় ইতিহাস যেন ঐখানেই থেমে আছে। কোন্ ইতিহাস নিয়ে এদের ঘুম হচ্ছে না, এরাই জানে।

এ. বি. টি এ. হলের কনফারেন্সে বিমান বোস, দীনেশ মজুমদার, সুভাষ চক্রবর্তীদের কোণঠাসা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-ভিত্তিক পি. জি. এস. এফ-এর সি.পি.এম-এর আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সেদিন সোচ্চার হতে পারাটা ছিল ঐতিহাসিক। যদিও 'নকশালবাড়ি'র ঘটনা ঘটেছিল তার অনেক পরে। আজকে আর ঐ অবস্থার পুনরাবৃত্তি সম্ভব নয়। কিন্তু ভিন্ন পরিস্থিতিতে ইতিহাস ভিন্নভাবে রচিত হচ্ছে। সেদিনের প্রয়োজন একরকম ছিল, আজকের প্রয়োজন অন্যরকম। এর অর্থ এই নয় যে প্রয়োজন নেই।

নদীয়ার এক গ্রামে মিটিং করতে গিয়ে বিচিত্র এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল। ক্ষেতমজুররা সরকার-স্বীকৃত ন্যূনতম মজুরির দাবি নিয়ে আন্দোলন করতে অস্বীকার করল। এলাকার অধিকাংশ মধ্যচাষি কিম্বা অল্প কয়েকজন সামান্য-ধনী কৃষক এই দাবি মেটাতে অক্ষম বলেই তাদের ধারণা। নদীয়ার এই গ্রাম কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। এই ধরনের অবস্থা বহু জায়গাতেই রয়েছে। ফলে কৃষক-কর্মীর কাছে সমস্যা, ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করতে হবে অথচ সরকারের বেঁধে-দেওয়া নিম্নতম মজুরিও দাবি করা যাবে না। অথচ 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় কৃষিতে পুঁজি ঢুকছে—আর, বীজ কিম্বা মালটিন্যাশানাল—এসব নিয়ে আলোচনায় অনেকেরই উৎসাহ। কৃষিতে কতটা পুঁজি ঢুকছে তার হদিশ পাওয়া দরকার সন্দেহ নেই, ভবিষ্যৎ আন্দোলনের গতিমুখ কোন্ দিকে যাবে সেটা জানতেই দরকার। কিন্তু সার, বীজ কিম্বা ভর্তুকির বাইরেও অনেক কিছু জানার আছে, যারা অন্ধভাবে রাস্তা খুঁজে মরছে তারাই এটা জানতে চায় বেশি। কৃষি মজুরকে শিল্প-শ্রম আইনের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নিম্নতম কৃষি-মজুরি আবার সিমলা লেবার ব্যুরোর মূল্যসূচকের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর অর্থ এই মজুরি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটা সর্বভারতীয় বাতাবরণও ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে। প্রয়োগজনিত সমস্যার কথা চিন্তা করলে এসব নিয়ে লেখা দরকার। আজকের অবস্থায় ঐতিহাসিক প্রয়োজনের উপলব্ধিটাও একটা ঐতিহাসিক প্রয়োজন। বিপ্লবী দলিল-দস্তাবেজ, পত্র-পত্রিকা গোপনে কিম্বা প্রকাশ্যে যা প্রচারিত হচ্ছে তার মধ্যে ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটছে এমন দাবি কেউ কেউ করছেন। সবাই কোথাও একটা আটকে যাচ্ছে।

বিহারের গয়া-নওয়াদা অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন এমন একটা স্থিতাবস্থার শিকার হয়ে পড়েছে যে এই মুহূর্তে নতুন কিছু হওয়া সম্ভব নয়। যারা প্রধানত গোপন কৃষক-সংগঠনের পক্ষপাতী তাদের বক্তব্য অনুযায়ী—আন্দোলনের পরের ধাপ হিসেবে প্রশাসনের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ এসে যায়। এই সংঘর্ষ তারা আপাতত এড়াতে চায়। অথচ তারা তাদের সংগঠনের বৃদ্ধি চায়। উপায় হিসেবে তারা আংশিক খাজনা বয়কটের কথা ভাবছে। এর ফলে প্রশাসনেব সঙ্গে সাময়িকভাবে সরাসরি সংঘর্ষও এড়ানো যাবে আবার সংগঠনও ধরে রাখা যাবে। যদিও এই কর্মসূচির সাফল্য নিয়ে সংগঠকদের মধ্যেও মতবিরোধ রয়েছে। সুতরাং খাজনা বয়কট একটা ইস্যু হিসেবে আসছে। এ-সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিখতে পারলে আবার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রয়োজন বেশ বোঝা যাবে। কিন্তু এর জন্য যে ধরনের পরিশ্রম ও ঝুঁকি নেবার প্রয়োজন সেটাও বোধ হয় এক হিসেবে ঐতিহাসিক প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। সব থেকে সোজা হচ্ছে সি. পি. এম-কে গালাগালি দিয়ে কিছু লেখা দেওয়া। কিন্তু সে-ব্যাপারেও আর তেমন লেখাপত্তর পাওয়া যাচ্ছে না কারণ রেডিও পিকিং আর ঐভাবে কোন মালমশলাই দিচ্ছে না। চিরকাল 'চীন ইহা বলিয়াছে' বলতে যারা অভ্যস্ত তাদের পক্ষে ঐতিহাসিক প্রয়োজনের গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক।

ধান ভানতে অনেকটা শিবের গাজন। কিন্তু গাজনটা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমর সেনের মৃত্যুতে শোক ও সমবেদনা জানিয়ে যে সমস্ত চিঠিপত্র বা টেলিগ্রাম এসেছে, সর্বত্র একটাই অনুরোধ—সমর সেনকে স্মরণ কববার প্রকৃষ্ট উপায় 'ফ্রন্টিয়ার' বাঁচিয়ে রাখা। 'ফ্রন্টিয়ার' যেন তার ধারা অব্যাহত রাখে—এই অনুরোধ তাদেরও যারা কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার জন্য 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখতে পারেন না। লণ্ডনে কে বা কারা রটিয়েছে যে সমর সেনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকা উঠে গেছে অথবা হয়তো ভিন্ন রাজনৈতিক আবর্তে তা প্রকাশিত হবে ইত্যাদি। এসব শুনে উৎকণ্ঠিত হয়ে করিম ইসাক চিঠি দিয়ে জানতে চেয়েছে—'সত্যিই ফ্রন্টিয়ার তার ধারা পরিবর্তন করছে কিনা, আগের মতো লেখা পাঠাবে কিনা।' অথবা সম্প্রতি প্রকাশিত পাঞ্জাবের উপর একটা সম্পাদকীয় পড়ে জ্ঞান কাপুরের পত্রাঘাত—'পাঞ্জাবের ব্যাপারে 'ফ্রন্টিয়ার' কী তার পুরানো অবস্থান ছেড়ে দিচ্ছে ? পাঞ্জাবের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।' মনে হচ্ছে ইসাক বা কাপুব সাহেবদের কাছে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ঐতিহাসিক প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় নি।

একটা সময়ে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর আর্থিক সংকট সত্যিই ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছিল। সমরবাবু মাসের মাইনে (অঙ্কটা শুনলে অনেক বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীই আঁৎকে উঠবেন) নেবার আগে দুবার চিন্তা করতেন। কারণ প্রেস, বাইণ্ডার, পোস্ট অফিস—এই খরচাগুলো এক সপ্তাহও বাকিতে চালাবার কোন উপায় ছিল না। কেবলমাত্র

কাগজওয়ালার টাকাটা দিন পনের আটকে রাখা যেত। মুসকিল আসানের জন্ম 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় আবেদন প্রচার করে কিছু 'ডোনেশন' তোলবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস আবেদন প্রচার করা সত্ত্বেও বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যায় নি। সমরবাবু মারা যাওয়ার পর অনেকেই 'সাহায্য' করবার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অথচ সমরবাবু বেঁচে থাকতে 'ফ্রন্টিয়ার' নিয়ে এঁরা খুব বেশি ভেবেছেন বলেও মনে পড়ছে না। হ্যাঁ, 'আবেদনে' যারা সই করেছিলেন তাঁদের সবাই পয়সা দিয়ে কিনে 'ফ্রন্টিয়ার' পড়তেন তেমন ভাববারও কোন কারণ নেই। অনেকে আদৌ পড়তেন কিনা সন্দেহ। আবেদনকারীদের অনেকে নিয়মিত গ্রাহকও হননি। অথচ এঁরাই আবেদন করে অন্যদের 'ফ্রন্টিয়ার'কে সাহায্য করতে বলছেন। ভবানীবাবু অবশ্য অনেকবারই মন্তব্য করেছেন—'আবেদন প্রচার করে আসলে আবেদনকারীদেরই নামেরই প্রচার হচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।' আমরা তবুও আবেদন প্রচার করেছি দীর্ঘদিন, কিছু প্রাপ্তির আশা না রেখেই।

'ফ্রন্টিয়ার'-এর তরফে আবেদন করে অথবা তেমনভাবে আবেদন না করে 'ডোনেশন' তোলার ব্যাপারে দু'জন আপত্তি জানিয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই আজ মৃত। একজন চিত্র পরিচালক শান্তি চৌধুরি অন্যজন কে. সি. দাস। আসলে আমি তখন সবার বাড়ি যাচ্ছি, সবার সঙ্গেই আলোচনা করছি, কীভাবে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সামান্য আর্থিক উন্নতি ঘটানো যায়। শান্তি চৌধুরির সঙ্গে সমরবাবুই কথা বলতে বলেছিলেন। 'ফ্রন্টিয়ার' যখন কোন রাজনৈতিক দলে মুখপত্র নয়, তখন ঐভাবে 'ডোনেশন' সংগ্রহ অনুচিত, অন্য কোনভাবে টাকার তোলার কথা চিন্তা করতে হবে, এটাই ছিল শান্তিবাবুর বক্তব্য। কে. সি. দাস সম্পর্কে সমরবাবুর কাজিন। যতদিন বেঁচেছিলেন 'জার্মনাল' কোম্পানি সংক্রান্ত যাবতীয় খাতাপত্র নিজেই দেখেছেন। ব্যালান্সশিট তৈরি থেকে অডিট পর্যন্ত সবকিছুই দেখাশোনা করতেন। আসলে কোম্পানির উপরি কাঠামো তৈরিতে কে. সি. দাস-ই শুরুতে যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। ফলে অনেক ব্যাপারেই সমরবাবু একদম নিশ্চিন্ত ছিলেন। কে. সি. দাস মারা যাবার পর এই সমস্ত ঝামেলা সমরবাবুকেই মূলত সামাল দিতে হতো কারণ কোম্পানি ল-এর ব্যাপারটা আমি এড়িয়ে চলতাম। সমরবাবুর উপর কে. সি. দাস কোন কথা বলতেন না, কিন্তু উনি আমাকে সমরবাবুর বাড়িতেই বার-দুয়েক বলেছেন—কোম্পানি চলবে কোম্পানির মতো, সেখানে এইসব 'ডোনেশন' ইত্যাদি কীরকম বেখাপ্পা দেখায়। এই ব্যাপারটাতে ওঁর সায় ছিল না। কিন্তু তখন এমনই 'দিন আনি দিন খাই' অবস্থা যে অল্পবিস্তর 'ডোনেশন' তুলতে হয়েছে। তবে ওটাকে 'ডোনেশন' না বলে দীর্ঘস্থায়ী গ্রাহক চাঁদা বলাই ভাল—পরিমাণটা খুবই সামান্য।

কেবলমাত্র সার্কুলেশন দিয়ে কোন কাগজ বাঁচতে পারে না। বিশেষ করে

আজকের বাজারে বাঁচা সম্ভব নয়। অবস্থা-বিশেষে সার্কুলেশন বাড়লে লোকসান হয়। সেক্ষেত্রে সার্কুলেশন কম থাকাই কাম্য। ব্যাপারটা হেঁয়ালির মতো হলেও সত্যি। সরকারি বিজ্ঞাপন পাওয়া না-পাওয়ার উপর বিশেষ কিছু ইতর-বিশেষ হয় না, বিশেষ করে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ক্ষেত্রে তো নয়ই। একে রেট কম, তার উপর শাসকদের রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা বহুক্ষেত্রেই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

'ফ্রন্টিয়ার' তার রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য বিজ্ঞাপন পাবে না—এমন ধারণা অনেকেরই ছিল। অনেকে আবার পাবলিক রিলেশন্‌স্ সংক্রান্ত অলিখিত সব আদব-কায়দার কথা বলতেন। সমরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেবু চৌধুরির সঙ্গে একদিন কথা বললাম—সমরবাবুর বাড়িতেই। সেদিন রবিবার। সান্ধ্য আসর তখনও বসে নি। 'পাবলিক রিলেশন্‌স্'-এর লাইন আমার ঠিক জানা নেই, বিশেষ যোগা-যোগের ব্যাপারটাও কীভাবে করা যায় ঠিক বুঝছি না—আমি এইসব কিছু বল-ছিলাম। দেবী চৌধুরি বললেন—'ওসবের কোন মানে নেই। স্রেফ সিধে অ্যাপ্রোচ করে বিজ্ঞাপনের কথা বলতে হবে। সবসময় বিশেষ যোগাযোগের প্রয়োজন হয় না।' ব্যবসায়িক জীবনের শুরুতে ওঁকে কীরকম কষ্ট করতে হয়েছিল সেসবও কিছু বললেন। অনেকেরই ধারণা সমরবাবু বিজ্ঞাপনের জন্য বুঝি কাউকে কখনও বলেন নি। কথাটা ঠিক নয়। সমরবাবু অনেককেই অনেক ভাবে বলেছেন। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি বিজ্ঞাপন জগতের ডাকসাইটে কর্মকর্তা লাহিড়ীকেও সমরবাবু একবার বিজ্ঞাপনের জন্য বলেছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। অনেকে বিজ্ঞাপন দেন নি স্রেফ ভয়ে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ বিজ্ঞাপন দিলে পাছে পরিচালকরা অসন্তুষ্ট হন তাই তারা এড়িয়ে গেছেন। সমরবাবু দশবার হয়তো বলেন নি, কিন্তু চোদ্দবার বললেও কোন ফল হত না। সি. পি. এম. ক্ষমতায় আসার পর এই ভয়টা অনেকের হয়তো আরও বেড়েছে। দেবু চৌধুরি আসলে বলছিলেন—আমাদের 'প্রফেশনাল অ্যাটিচুড্' না থাকার কথা। কী বিজ্ঞাপন, কী লেখা, সবক্ষেত্রেই কিছুটা প্রফেশনাল অ্যাটিচুড্ থাকা দরকার।

E P W-তে দীর্ঘদিন কাজ করবার সুবাদে গৌতম নাভলাখার এক ধরনের অভিজ্ঞতা ছিল—আমাদের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন। নাভলাখাও যথেষ্ট পরিমাণে প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার'কে জোর করে EPW বানানো সম্ভব নয়। এতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'ফ্রন্টিয়ার' ফ্রন্টিয়ার-ই। তবে কিছুটা প্রফেশনাল দৃষ্টিভঙ্গি আনাটা একান্তই দরকার। 'দয়া-দাক্ষিণ্যে'র উপর নির্ভর করাটা বহুক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক হয়েছে।

'ফ্রন্টিয়ার' নিয়ে বিশাল সব পরিকল্পনার কথা কেউ বললে সমরবাবু ঘাবড়ে যেতেন। অনেকেরই ধারণা ছিল—কবি সমর সেন ব্যবসার খুঁটিনাটি কিছুই বোঝেন না। ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল। বাইরে থেকে অনেকটা ওরকমই মনে হয়।

তালপুকুরে ঘটি ডোবে না ঠিকই কিন্তু একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কুড়ি বছর মোটামুটি সহজভাবে চলল—এই ব্যাপারটা অনেকেই খেয়াল করেন না। আজ অনেকে আবার ট্রাস্ট ইত্যাদি গঠন করবার কথা বলছেন। এঁরা হয়তো ভাবেন—'সমরবাবু শুধুই সম্পাদকীয় লিখতেন।' বড় আকারে কিছু করবার প্রস্তাব প্রথম আসে গায়ত্রী স্পিভাকের কাছ থেকে, পরে আরও দু-একজন একই প্রস্তাব রাখেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর তখন বেশ দুর্দিন। 'ছোট আকারে এবং যথেষ্ট কষ্ট করে চালানো হয়েছে বলেই 'ফ্রন্টিয়ার' এতদিন চলেছে'—সমরবাবুর এ ধারণা ছিল বদ্ধমূল। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা দরকার। ইদানীং 'ফ্রন্টিয়ার' যারা ছাপে সেই মেঘদূত এবং দপ্তরি সহদুল—এরা সবাই 'ফ্রন্টিয়ার'-এর আর্থিক কষ্ট কিছুটা ভাগ করে নিয়েছিল শুরু থেকেই। এত কম পয়সায় প্রতি সপ্তাহে সময়মতো 'ফ্রন্টিয়ার' প্রকাশে এরা যেভাবে সহায়তা করে থাকে তাতে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর উপর এদের নৈতিক দাবি অনেক শুভানুধ্যায়ীর চাইতে বেশি। কলকাতায় বন্যা কিম্বা অন্য দুর্যোগের মধ্যেও মেঘদূত সময়মতো কাগজ বের করে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে (গ্রাহকরা যে কাগজ দেরিতে পান সেটা ডাক-বিভাগের 'সৌজন্যে')। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ এরাও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। এই অবস্থাটা রাতারাতি পাল্টানো মুশকিল। আবার সময়ের দাবি অস্বীকার করাও দায়।

লেখকরা যাতে আঘাত না পান সে-ব্যাপারে সমরবাবু দারুণ সতর্ক থাকতেন। আমার কিছু বেপরোয়া ভাব দেখে ওঁর বেশ ভয় হত, বুঝতে পারতাম। ফলে, ইদানীং সমরবাবু লেখার উপর মাঝে মাঝে নোট দিয়েছেন—'এটা আর ছোটো না করাই ভাল'। আসলে *Business Standard*-এ লেখার সময় ওদের অফিসে প্রায়ই যেতাম। আমার লেখা বেশিরভাগই মাথাই-এর হাত দিয়ে যেত। মাথাই-এর ওখানে বসে দেখতাম ওরা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে স্টোরি তৈরি করে, সবার উপর সার্বিক প্রোডাকশন কীভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়—এসব বোঝার চেষ্টা করতাম। লেখার সমস্যা, ভাল লেখার সমস্যা—এসব নিয়ে মাথাই-এর সঙ্গে একদিন আলোচনা হচ্ছিল। আমরা অন্য কাগজ থেকে কালেভদ্রে কিছু 'লিফট' করি শুনে মাথাই বেশ অবাক হয়ে গেল। এরপর লিফটিং-এর ব্যাপারটা আমি বেশ নিয়মিত করে ফেলেছি।

এবার সমরবাবু যখন হাসপাতালে তখন অশোক রুদ্র মহাশয়ের একটা লেখা (Book Review) সমরবাবুর বাড়িতে এলো। যূথিকা সমরবাবুকে দেখতে যাওয়ার সময় লেখাটা হাসপাতালে নিয়ে গেল। আসলে সমরবাবুর তখন লেখা-পড়ার শক্তি বা মানসিকতা কোনটাই নেই। অথচ লেখার সঙ্গে অশোকবাবুর যে চিঠি রয়েছে তাতে লেখা—'...আপনি লেখাটা ছাপলে খুশি হব'। মাত্র দু'সপ্তাহ আগে এই বইটার একটা রিভিউ 'ফ্রন্টিয়ার'-এ বেরিয়েছে, যদিও রিভিউটা আমার

তেমন ভাল লাগেনি। অশোকবাবুর 'মেজাজ' সমরবাবু আমার চেয়ে ভাল জানেন. আবার আমি লেখাটা না-ও ছাপতে পারি এই আশঙ্কাও ওঁর পুরোমাত্রায় ছিল। অগত্যা সমরবাবু অশোকবাবুর চিঠির নিচে একটা ছোট্ট নোট দিয়ে যূথিকার মারফৎ লেখাটা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—

'তিমিরবাবু,

একটা রিভিউ বেরিয়েছে ? কী করা যায় ? এটাও ছাপিয়ে দিলে পারেন —দু-এক সপ্তাহ পরে। অশোক রুদ্রকে একটা জবাব দিয়ে দেবেন ? কীভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ভেবে ভয়ানক খারাপ লাগে, কিন্তু নিরুপায়।

সমর সেন ১.৪ ৮৭.'

আমি দেখলাম রিভিউটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা. সুতরাং স্বচ্ছন্দে ছাপা যায়। শুরুতে একটা নোট দিয়ে ঠিক দু-সপ্তাহ বাদেই লেখাটা ছেপে দিলাম। লেখাটা যে ছাপা হয়েছে এটা সমরবাবু দেখে যেতে পেরেছিলেন।

আমার সঙ্গে দেখা না হলে সমরবাবু দরকারি কথাবার্তা চিরকুটে লিখে রাখতেন কিংবা কারও হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিতেন। শরীর যে ক্রমশই চিকিৎসার বাইরে চলে যাচ্ছে সমরবাবু এটা এবার বেশ বুঝতে পারছিলেন। ১৭.৭.৮৭ তারিখ দেওয়া, নবীর হাতে পাঠানো চিরকুটে লেখা—

'তিমিরবাবু,

অবস্থা খারাপের দিকে। হয়তো হাসপাতালে যেতে হবে। কী করবো বুঝে উঠতে পারছি না।'

নানা কারণেই হাসপাতালের নামে তাঁর আতঙ্ক হত। টাকা-পয়সার ব্যাপার ছাড়াও বাড়ির কথা চিন্তা করেই যেতে চাইতেন না। তাছাড়া প্রথম'বারের চিকিৎসা-বিভ্রাটের ঘটনাটা ভোলা সহজ নয়।

তারিখবিহীন আর একটা চিরকুটে দেখছি সমরবাবু এবারকার চিকিৎসা নিয়েও বেশ চিন্তিত—

'তিমিরবাবু,

কাল acupuncture করে যন্ত্রণা অসম্ভব বেড়েছে ; শুনছি Blood Clot (যার আরেকটা নাম vein thrombosis), অত্যন্ত pessimistic লাগছে, কবে অফিস যেতে পারবো জানি না।

ডঃ জালান এসে বললেন blood clot নয়। মঙ্গলবার একটা X-ray করতে হবে।'

সমরবাবু আর অফিসে আসতে পারেন নি। '৮৭ জুন মাস থেকেই শরীর দ্রুত ভেঙে যেতে থাকে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমরবাবু ভুগছিলেন বলা যায় বছরের

প্রায় শুরু থেকে। মাঝে মাঝেই অফিসে আসতে পারছিলেন না। ২৯/২ তারিখ দেওয়া, নবীর হাতে পাঠনো একটা চিরকুটে লেখা—

'তিমিরবাবু,

আজ জ্বর না এলে কাল যাবো। আবার যদি বিকোলাই হয় তাহলে মারা পড়বো।

মনে হয় Philippines সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছিল সেটা মেলেনি শেষ পর্যন্ত। এবারে সেটা স্বীকার করে একটা কিছু comment থাকলে ভালো হয়।

কোন কাজে concentrate করতে পারছি না।'

আসলে সমরবাবুর শরীর ক্রমশই ভেঙে আসছিল আরও ২/৩ বছর আগে থেকে। তখন সপ্তাহে ৩/৪ দিন অফিসে আসতেন। '৮৪ সালের কথা। তখনও দেখেছি ডাক্তার-বদ্যি সমানে চলেছে। একদিন একটু দেরিতে অফিসে এসে দেখি আমার টেবিলে ছোট্ট একটা চিরকুট—

'তিমিরবাবু,

কাল (শুক্রবার) খুব সম্ভব আসতে পারবো না, কেননা বেলা দুটো নাগাদ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

৩.৫.৮৪'

বিগত ৩/৪ বছরে এক নাগাড়ে তিন মাস সম্পূর্ণ সুস্থ কখনই থাকতে পারেননি সমরবাবু। ক্রমাগত শারীরিক অসুস্থতা অন্য কাজকর্মে অসুবিধা সৃষ্টি করছিল। মাঝে মাঝে নিজেই নিজে উপর বিরক্তি প্রকাশ করতেন।

গোটা দুয়েক চিরকুটে মহাশ্বেতা দেবীর নাম দেখছি, বিভিন্ন সময়ে লেখা। বলাই বাহুল্য, মহাশ্বেতা দেবীকে সমরবাবু বোধ হয় একটু ভয়ই করতেন। মহাশ্বেতা দেবীর লেখা বেরোতে দেরি হচ্ছে দেখে সমরবাবুর আশঙ্কা হচ্ছে আমি হয়তো লেখাটা নাও ছাপতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে চিরকুট—

'মহাশ্বেতা কাল একটা লেখা পাঠিয়েছে। ওটা 25th Feb-এর সংখ্যায় গেলে ভালো হয়'।

কিংবা

'মহাশ্বেতার ছোট একটা লেখা ড্রয়ারে আছে। ওটা গেলে ভালো হয়।'

'৮৭-র Autumn Number নিয়ে বেশ মুশকিল হয়েছিল। এবারকার Autumn Number গতবারের চেয়ে একটু ভাল করবার জন্যে সমরবাবু অনেক আগেই চিঠিপত্র ছেড়েছিলেন, দেশে এবং বিদেশে। অদ্ভুত ব্যাপার—তুলনায় এবারই সব থেকে কম সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আগস্টের প্রথম সপ্তাহ গড়াতে

চলল। সমরবাবু হাসপাতালে। হাতে তখন মাত্র একটা লেখা। প্রেস থেকে তাড়াতাড়ি লেখা দেবার জন্যে তাগিদ আসছে। আমি হাসপাতালে কয়েকটা খাম-পোস্টকার্ড পাঠিয়ে সমরবাবুকে লিখলাম—

> 'আপনি হাসপাতালের ঠিকানা দিয়ে লেখকদের কয়েকটা চিঠি পাঠিয়ে দিন। দেখি বাবুদের টনক নড়ে কিনা।'

সমরবাবু তাই করলেন। তবে খুব বেশি চিঠি লিখতে পারেন নি। বড় জোর খান-তিনেক চিঠি হয়তো লিখেছিলেন। হাসপাতাল থেকে লেখা চিঠি প্রাপকদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মহাশ্বেতা দেবী।

অশোক মিত্র

সমর সেন প্রসঙ্গে

(একটি কথোপকথন)

প্রশ্ন : সমর সেনের কবিতার কোন্ বৈশিষ্ট্য আপনাকে, আপনার প্রথম যৌবনে, আকৃষ্ট করেছিল সবচাইতে বেশি ? কোন্ কোন্ কারণে তাঁকে স্বতন্ত্র মনে হয়েছিল ? সমর সেনের কবিতায় গদ্যছন্দের অভিনবত্ব ও নিস্পৃহ বাচন-ভঙ্গির আপাত-চমকটুকু বাদ দিলে, বক্তব্যের বা কাব্যবস্তুর কোন্ অভিঘাত আপনাকে তখন বেশি অভিভূত করেছিল ? আর আজকের এই পরিণত বয়সে ও মানসে সমর সেনের কবিতাকে আপনি কীভাবে গ্রহণ করে থাকেন ?

উত্তর : তিনটি আলাদা বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। ষোলো সতেরো বছর বয়সে যে-কোনো বাঙালি তরুণের মন খানিকটা আবেগ ঘন থাকে। সুতরাং এমন কি যাঁরা স্বদেশ ও সমাজের চিন্তাতেও ভীষণ মগ্ন, তাঁরাও প্রেমের কবিতার প্রতি তাই ঐ বয়সে কিছু আগ্রহশীল হতে বাধ্য। কিন্তু সমর সেনের প্রেমের কবিতায়, আমার মতো সেই চল্লিশ দশকের তরুণের কাছে যা একেবারে নতুন স্বাদের মনে হয়েছিল, তা প্রেমের কবিতা, অথচ তার মধ্যেও অন্ধকার, কশাঘাত, বিদ্রূপ। অনুরাগের কথা বলা হচ্ছে কিন্তু সেই সঙ্গে মৃত্যুর কথাও। নিখাদ প্রেম, তাতে কোনো কপটতা নেই, অথচ, তাহলেও, এই প্রেম যেন একটি পোশাকি, সংস্কারগত ব্যাপার মাত্র। নির্দয়তা—প্রেমের কবিতা, আবেগের কবিতা, লিরিকে ঠাসা কবিতা, কিন্তু তাতেও নির্দয়তা কতটা প্রবল হতে পারে তা সমর সেনের কবিতা থেকে সেই সময়ে আমাদের কাছে অন্তত ভীষণ রকম প্রকট হয়েছিল। ইংরেজি পাঠ্যক্রমে একটি-দু'টি টিউডর কবির রচনায় এ ধরনের সংশ্লেষণ আমাদের চোখে পড়েছিল, কিন্তু সমর সেন পুরো জিনিশটা, তাঁর ভাষার সহজ সম্মোহনে, সরাসরি আমাদের সমসাময়িকতায় স্থাপন করলেন। সেই সঙ্গে আর যে দুটো কথা বলতে চাই, একটির উল্লেখ অবশ্য আপনি নিজেই করেছেন—গদ্য বাঁধুনী, গদ্যছন্দ, অথচ তাতে রবীন্দ্রনাথের ন্যূনতম প্রভাব নেই। আমরা তার আগে 'লিপিকা'র অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে গেছি, 'শেষ সপ্তক' পড়েছি। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ আলাদা পরিমণ্ডল, আমাদের নিজেদের ঘরোয়া পৃথিবী, যে-ছন্দে কবিতা লেখা হচ্ছে সেই ছন্দে আমরা কথা বলছি, যে-ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে তা আমাদের প্রাত্যহিকতার

ভাষা, আমাদের খিস্তি-খেউড় পর্যন্ত ঢুকে গেছে—অথচ কবিতা, অথচ লিরিক কবিতা। দ্বিতীয় যে-কথাটি এখন উচ্চারণ করতে পারি, সমরবাবুর জীবদ্দশায় হয়ত করতে পারতাম না : বাঙালি মধ্যবিত্ত কাপুরুষতা, অসাধুতা, লোক-ছাপানো লোক-দেখানো ব্যাপারাদি এ-সমস্ত কিছুর যে অনায়াস বেপরোয়া বিরুদ্ধাচরণ করা চলে এবং কবিতার মধ্যবর্তিতায়, তা তিনি দৃষ্টান্তিত করেছিলেন।

এটা হয়ত এখন লোকলজ্জার ব্যাপার হতে পারে, এই ঘোষণা বা স্বীকারোক্তি, কিন্তু পঁয়তাল্লিশ বছর বাদেও সমর সেনের কবিতা সম্বন্ধে আমার যে প্রাথমিক অনুরাগ, তা এখনো অব্যাহত। আমি এখনও সেই কবিতার অবয়বে অসম্ভব শক্তি খুঁজে পাই, সেই সঙ্গে অসম্ভব মমতাও খুঁজে পাই।

— সমর সেনের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিভিন্ন পঙ্‌ক্তির যে-ব্যবহার, সেটাকে কি কোনো প্রভাব বলা যাবে ?

— সেটা তো একেবারে উল্টো-বুঝলি-রাম হবে, এই ব্যবহার প্রভাব নয়, অতি স্পষ্টত প্রভাব-বিরোধিতা। সমর বাবু যে-প্রকরণ শুরু করেছিলেন তা এক অর্থে মৌলিক নয়, কারণ এলিয়টের কবিতাতেও ঠিক এই ধরনের ধ্রুপদী বাক্য বা পঙ্‌ক্তির ব্যঙ্গোচ্চারণ ছিল, তারই প্রতিধ্বনি আমরা সমরবাবুর কবিতায় পাই। যেহেতু আমাদের বাঙালি জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে তখন রবীন্দ্রনাথ, তাই ঐ জীবন ধারণকে ব্যঙ্গ করতে হলে রবীন্দ্রনাথের পঙ্‌ক্তি ধরেই ব্যঙ্গ করার সামাজিক প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছিলেন। সুতরাং রবীন্দ্রপ্রেম নয়, আমি বলব সেই সময়ে রবীন্দ্র-অপ্রেমের পরিচয় বহন করছিল উক্ত উদ্ধৃতিগুলি।

— 'নাগরিক কবি'—এই সুপরিচিত অভিধা সম্পর্কে আপনার মত কী ?

— নাগরিকতা সাদামাটা ব্যাখ্যায় শহুরেপনা, কিন্তু নাগরিকতা আবার সংস্কৃত, পরিশীলিত হওয়ার ব্যাপারও বোঝায়। সমরবাবুর কবিতায় আমি বলব, পরিশীলিত পরিবেশই অনেক বেশি ফুটে উঠেছে। তিনি 'বাংলার বধূ বুকভরা মধু' গোছের উচ্ছ্বাস রচনা করেননি, বরং বিদ্রূপে জর্জরিত করেছেন। কিন্তু সমাজ তো শহরের বাইরে যে-পরিবেশ তা বাদ দিয়ে নয় বিশেষ করে ভারতবর্ষের মতো দেশের পক্ষে। যখন তিনি ক্ষেত খামারের কথা লেখেন, মাঝি মেঝেনদের কথা, কলকারখানার শ্রমিকদের কথা, লেখেন গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধু ধু করে, সব কিছু জড়িয়েই লেখেন। তিনি উন্নাসিক শহুরে কবি ছিলেন এই অপবাদ মানতে আমি রাজি নই।

— এক সময় বামপন্থী মহলে, বিশেষত বিনয় ঘোষ, সরোজ দত্তর লেখায়, কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিলেন কবি সমর সেন ; ধূর্জটিপ্রসাদও মার্কস-বাদী কবির গুণাবলীর অভাব লক্ষ করেছিলেন তাঁর কবিতায়। এ-বিষয়ে আপনার ধারণা কী ছিল ? আজ কী মনে হয় ?

প্রথাগত মার্কসবাদের ব্যাপারটি খুব গোলমেলে, কারণ কেউ একটা দাবি করে বসলেন যে তাঁরাই মার্কসের সারাৎসার বুঝতে পেরেছেন, অন্যরা পারেন নি — সেক্ষেত্রে কিছু বলার থাকে না, দাবিটি তো ধর্মবিশ্বাসের পর্যায়ে চ'লে যায়। তবে মার্কসপন্থী মহলে সমরবাবুর কবিতা সম্বন্ধে বরাবরই খানিকটা প্রশ্ন থেকে গেছে অনেকের মনে। কারণ, এটা অবশ্য মেনে নিতে হয় যিনি মার্কসবাদী তাঁকে প্রত্যয়বাদী হতে হবে, হতাশায় ঢ'লে পড়লে চলবে না, সুড়ঙ্গের শেষে তাঁকে আলো দেখতেই হবে। অথচ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন কয়েকটি বছর বাদ দিলে, সমরবাবুর সমগ্রকাব্যপ্রবাহেই হতাশা সমাচ্ছন্ন, প্রেমের কবিতাতে হতাশা, স্বদেশের কবিতাতে হতাশা, জনগণকে ভাল লাগার, ভালবাসার, জনগণকে অভিবাদন জানাবার কবিতাতেও শেষ পর্যন্ত এক ধরনের সব লেপে দেওয়া অন্ধকার। একদিন আলোর আকাশগঙ্গা পৃথিবীকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, এই প্রত্যয়ের পাশা-পাশি নিজের অসহায় একাকিত্ব সম্পর্কে নিটোল স্বীকারোক্তি। কিন্তু হতাশাই যদি যথার্থ প্রতীতি হয় সেই হতাশার প্রকাশ কেন তাহলে সামাজিক সত্য বলে বিবেচিত হবে না, সেই সমস্যা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এবং যেখানে কবি নিজে বলছেন যে তিনি এই ঘুণধরা সমাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, তাকে দিয়ে কিছু হবার নয় ; কাদের দিয়ে হবে, ছুতোরকে দিয়ে হবে দুধ দেয় যে গয়লা, যে-মেথর সরায় ময়লা তাদের দিয়ে হবে যে-স্থপতি তৈরি করে তাকে দিয়ে হবে — তিনি তাদের অভিনন্দন-অভি-বাদন জানিয়ে যাবেন, তাঁর নিজের আকাশ অন্ধকারে বিলীন থাকবে কিন্তু তিনি এটা মেনে নিচ্ছেন যে তাঁর আলাদা আকাশ পৃথিবীর অখণ্ড আকাশ নয়, খেটে-খাওয়া সৃষ্টিশীল মানুষের পরিমণ্ডল নয়, তাদের জন্য একদিন অবশ্যই আকাশগঙ্গা পৃথিবীতে নামবে, কারণ তারা নিজেরাই, নিজেদের সৃষ্টি দিয়ে সেটা সম্ভব করবে। নিজেকে তিনি সমাজ থেকে ঈষৎ বিচ্ছিন্ন ক'রে নিয়ে অবশ্যই দেখতেন, কিন্তু সামাজিক অনুভাবনা তাঁকে স্পর্শ করেনি এরকম উক্তি পুরোপুরি বাস্তবতাহীন। তিনি এক হিসেবে হতাশার কবি, কিন্তু সেই হতাশার সঙ্গে প্রায় গায়ে গায়ে লেপ্টে মেশানো তাঁর প্রত্যয়, যে এই পৃথিবীতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা রচিত হবেই। সমরবাবু লিখেছিলেন, 'বিধ্বস্ত মাটিতে আনে ট্রাক্টরের দিন।

জোসেফ স্টালিন'। পঙ্‌ক্তিটি আমার বিশেষ করে মনে আসার কারণ ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রের উত্তর লিখতে কোথাও ব্যবহার করেছিলাম বলে পরীক্ষক, জনশ্রুতি শুনেছিলাম, কুড়ি নম্বর কেটে দিয়েছিলেন। —এই কথাগুলি তো প্রত্যয়েরই কথা, যে প্রত্যয় ছড়িয়ে আছে তাঁর কবিতায় যত্রতত্র একদিকে নিজের সম্বন্ধে কুঁকড়ে আসা, নিজেকেই আঘাত হানা, কিন্তু পাশাপাশি যেখানে নতুন সমাজ বপনের স্বপ্নের ইঙ্গিত, সেই স্বপ্নের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়া। আমার পূর্বসূরীদের সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা অটুট, কিন্তু যে-কোনো গণতান্ত্রিক পরিবেশে মতান্তরের অবকাশ আছে, থাকবে।

— অনুকারকদের ভয়ে সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়েছেন, এই রকম একটি অনুমানের কথা আপনি বলেছেন এক লেখায়। অন্য কোনো কারণ কি এখন আপনার মনে হয়? অরুণকুমার সরকার লিখেছেন, কবিতাকে সমর সেন খুব একটা সিরিয়াসলি নেননি কোনো দিন, রুদ্ধরতি ও রাজনীতির কিছু ফরমাস খাটিয়ে তাকে নাকি তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। আপনি কী মনে করেন?

— অরুণকুমার সরকার আমার অন্যতম, অন্তরঙ্গতম বন্ধু ছিলেন, তা সত্ত্বেও সমর সেনের কাব্য বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁর মতের সঙ্গে আমার মতের বিস্তর তফাত। সমরবাবু কেন কবিতা লেখা থেকে নিজেকে সংবৃত করলেন সে-সম্পর্কে এখন আমার মনে হয় দুটো আলাদা ব্যাখ্যা সম্ভব। একটির উল্লেখ আমি বছর পঁচিশ আগে একবার করেছিলাম। এন্তার বাজে কবিতা লেখা হয়েছিল সমরবাবুকে অনুসরণ, অনুকরণ করে—আধা-সাম্যবাদী কবিতা, আধা-খিস্তির কবিতাও—এবং কাঁচা খিস্তিরই—যাতে কোনো রকম কাব্যরস আদৌ ছিল না। আমি এর বেশি বলতে চাই না, যদিও মনে পড়ছে একটা-দুটো লাইন—এর-ওর-তার কবিতা থেকে। এই ব্যাপারটি কবিতার প্রতি সমরবাবুর বীতরাগের নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ ছিল। তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন—কী দরকার আর লিখে হয়তো তাঁর মনে হয়েছিল, অনুকারকদের যদি অনুকরণ করতে হয়।

দ্বিতীয় যে মস্ত কারণ, সমরবাবুর বরাবরই অসম্ভব পরিমিতি বোধ ছিল, পুনরুক্তি ওঁর ঘোর অপছন্দ। এটাও আমি দেখেছি, যে-কথাটি আমি গোটা কুড়ি বাক্য ব্যবহার করে বলতে চাইছি, সমরবাবু হয়ত তা দুটি বাক্যের পরিসরে বলে বেরিয়ে যেতে পারতেন। এখানেও হয়ত তিনি ভেবেছিলেন যে, যা বলবার তা তো বলেই দিয়েছেন, সব কবিতাই তো

শেষ পর্যন্ত পুনর্লিখন, সুতরাং কী হবে নিজেকে বারবার একই কথা বলতে প্রবৃত্ত ক'রে? আরো একটি মন্তব্য সংযোজন করতে আমার খুব সংকোচ হচ্ছে, কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমার কতগুলি ধারণা আছে, বিষ্ণুবাবু সম্পর্কেও। শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে কিছুটা পরিমিতি এসেছিল, এবং সেই পরিমিতি থেকে তাঁর কবিতা অনেক গভীরতায় পৌঁছেছিল বলেই আমার বিশ্বাস। এবং এটা রবীন্দ্রনাথ স্বভাব-বিরোধী ব্যাপার করেছিলেন, কারণ উনি একটু অতিকথন-অতিলিখন বরাবরই ভালবাসতেন। কিন্তু শেষের দিকের, তিন-চার বছর, হয়ত শারীরিক অক্ষমতার জন্যই তাঁকে বাধ্য হয়ে কম করে কথা বলতে হয়েছিল। তাতে কাব্যের উৎকর্ষ বহুগুণ বৃদ্ধিই পেয়েছিল। অন্য দিকে আমার কাছে খুব মন-খারাপ-করা ও শোকান্তিক ব্যাপার বলে মনে হয় যে তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছর বিষ্ণুবাবু এমন অনেক কবিতা লিখেছেন যেগুলি হয়ত না লিখলেও চলত। আমরা নতুন কিছু সে-সব কবিতা থেকে আর পাচ্ছি-না, খুব বেদনাহত হতাম যে কেন ওঁকে দিয়ে প্রায় জোর করে যেন এই ধরনের কবিতাগুলো লেখানো হচ্ছে।

সেদিক থেকে বিচার করলে মনে হয় কবিতা লেখা বন্ধ করে দিয়ে সমর-বাবু অত্যন্ত বিচক্ষণতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। আক্ষেপ হয়, অমন ক্ষমতাবান প্রতিভাবান কবি যদি আরো কিছু লিখতেন, বাংলা কাব্যের অনন্ত উপকার হত। কিন্তু তাঁর দিক থেকে, মনে হয়, ঠিক সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন।

-- 'বাবু বৃত্তান্ত' সম্পর্কে আপনার মত কী? সমর সেনের গদ্যের কোন্ বৈশিষ্ট্য আপনাকে আকৃষ্ট করে?

— 'বাবু বৃত্তান্ত', এটা সবাই মানবেন স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মজীবনী নয়। কতগুলি প্রসঙ্গ বা ঘটনার কথা তাঁর থেকে থেকে মনে পড়েছে, শারীরিক অসুস্থ ছিলেন, বাড়িতে বন্দী, কখনও-কখনও লিখে ফেলতেন, তারপর সেই টুকরো টুকরো লেখাগুলি জড়ো করেছেন। সুতরাং একটু অবিন্যস্ত ব্যাপার। কিন্তু তাহলেও মানুষটির চরিত্র-প্রকৃতি তো আমরা ফুটে বেরোতে দেখি, একটি ইতিহাসক্রমও খুঁজে পাই। যে-ধরনের সামাজিক বিন্যাসের ভিতর দিয়ে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কবিত্ব বিকশিত হয়েছিল, তার বিবরণের দলিল হিসেবে বেঁচে থাকবে 'বাবু বৃত্তান্ত'।

সমরবাবুর গদ্য সম্পর্কে প্রথম কথা, উনি পোস্টকার্ড যে ভাষায় লিখতেন সেই ভাষায়ই গদ্য লিখতেন—কোনো রকম পোশাকি সাজ বা আড়ষ্টতা নেই। সোজা লিখে যাচ্ছেন—যেমন ভাবে কথা বলছেন তেমন ভাবেই লিখছেন,

একটু ঠাট্টা, একটু বিদ্রূপ, কিন্তু সব কিছুই খুব কম কথায়। আমার বারবার প্রমথ চৌধুরী মশাই-এর একটি লাইন মনে পড়ে—'ঘোষালের ত্রিকথা' থেকে—'ঘোষাল তুমি কম কথা বলার আর্ট শেখো'। আমি সমরবাবুর গদ্যে সেই কম কথা বলার আর্টটা দেখতে পাই।

— কবি সমর সেন ও সাংবাদিক সমর সেনের ভিতরে সত্যি কি কোনো বিরোধ আছে বলে আপনি মনে করেন? সাংবাদিক সমর সেনের বিকাশের জন্য কবি সমর সেনের মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য ছিল? কবি হিসাবে সমর সেন যেখানে থেমেছিলেন, সমাজ-সচেতন, প্রতিবাদী সাংবাদিক হিসেবে তিনি কি শুরু করেছেন সেখান থেকেই? অর্থাৎ, কবিতায় যা করবার কথা ভেবেছিলেন সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কি তাই সম্পাদন করতে চেয়েছেন তিনি?

— একটা মস্ত বড় যতির কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি। সমরবাবু কবিতা লেখা প্রকৃতপক্ষে বন্ধ করে দিয়েছিলেন ১৯৪৭-৪৮ সালে, তারপর ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের ঢঙে একটি-দুটি কবিতা, হয়ত তার পরেও লিখে থাকবেন। 'নাউ' প্রকাশিত হতে শুরু হল ১৯৬৪ সালে অর্থাৎ মাঝখানে পনেরো-ষোলো বছরের দীর্ঘ ব্যবধান। সুতরাং একটি সত্তার মৃত্যু না ঘটলে আর একটি আরম্ভ হতে পারত না, এই ব্যাখ্যার এমন কি আক্ষরিক কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণও নেই। উনি যে, প্রতিবাদধর্মী সাংবাদিকতা শুরু করলেন তা অনেকটা আকস্মিকতার ব্যাপার। প্রথাগত সাংবাদিক ছিলেন বহু বছর ধরে এবং বাজারি কাগজে কাজ করছিলেন। হয়ত সহ্য-শক্তি আরো যদি একটু বেশি হত তাহলে আরো কয়েক বছর ওধরনের কাজ করে যেতে পারতেন, কিন্তু হিন্দু মুসলমান দাঙ্গায় যেখানে কাজ করছিলেন সেই পত্রিকাগোষ্ঠীর ন্যক্কারজনক ভূমিকা, বিবমিষা, বিবেকের দায়—১৯৬৪ সালে কাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হলেন। তারপর ঈষৎ ঘটনা-পরম্পরায় 'নাউ' সম্পাদনায় চলে এলেন। এবং এখানেও, ব্যক্তিগত ইতিহাস খানিকটা ভালভাবে জানি বলে বলতে পারছি। প্রথম দিকে 'নাউ' কিন্তু আদৌ রাজনীতি-সচেতন পত্রিকা ছিল না। সমরবাবু ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধবরা লিখতেন, সম্পাদকীয় বা অন্যান্য রচনা. তাঁদের মধ্যে প্রায় অনেকেরই রাজনীতি সম্পর্কে তেমন প্রত্যক্ষ আগ্রহ ছিল না। এবং আমাকে বাদ দিলে আর যাঁরা সম্পাদকীয় লিখতেন তাদের মনে প্রধানত আমারই তাগিদে সমরবাবু যে নাউ-কে রাজনীতি-মুখর করে তুললেন, তা নিয়ে প্রচুর সংশয় ছিল। আমি নাম করতে চাই না এই অতি প্রিয় বন্ধুবান্ধবদের, কেউ কেউ এখনও বেঁচে আছেন, কেউ কেউ প্রয়াত হয়েছেন। কিন্তু তখন খুব একটা নিজেদের

ভিতর বলা বলি হত সমরবাবু এটা কী করলেন ! দিব্যি তো এক ধরনের শৌখিন কাগজ বের হচ্ছিল, অনেকটা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় সোমবারের ক্যালকাটা নোটবুকের মতন, খুব সপ্রতিভ কথাবার্তা, চতুর শব্দ ও বাক্যের সমাবেশ, একটি-দুটি অলস-শিথিল মন্তব্য, কলকাতায় সামাজিক পরিবেশে কী ঘটছে না ঘটছে তা নিয়ে ; হঠাৎ ১৯৬৫ সালের জানুয়ারি মাস থেকে চরিত্র ব্যত্যয় ঘটল। অন্তরঙ্গদের অনেকেরই মন খারাপ হয়েছিল তখন। একটু ব্যক্তিগতভাবে জড়িত ছিলাম বলেই কথাগুলি আলাদা করে বললাম।

— 'একটি পত্রিকার কথা' আপনি লিখেছিলেন 'নাউ' বন্ধ হবার অব্যবহিত পরেই। আজ প্রায় কুড়ি বছরের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে 'নাউ' পত্রিকায় সত্যকার মূল্যায়ন কী হওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন ?

— 'নাউ' আলাদা একটি স্বাদ বিতরণ করেছিল, স্পষ্ট, ভিন্ন, স্বতন্ত্র একটি দৃষ্টান্তও স্থাপন করেছিল। অনুচ্চারিত কতগুলি অনুশাসনের প্রতি সম্পাদক হিশেবে সমরবাবু নিজেকে অঙ্গীকৃত করেছিলেন, তথাকথিত প্রতিষ্ঠান ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্মোহের বাইরে থাকবেন, সমাজের অধবর্ণদের কথা বলবেন, রেখে-ঢেকে বলবেন না, তাঁর একান্ত কাছের মানুষও যদি অন্যায় করেন সেই অন্যায়ও উদ্‌ঘাটন করবেন এবং কোনো প্রথাগত নিয়মের ফাঁদে পা দেবেন না—অর্থাৎ তাঁর নিজেকে জানানো, নিজেকে মানানো —এই নিয়মগুলি তিনি মেনে চলবেন, কারণ তার বিবেক তাঁকে কথাগুলি বলছে। সমরবাবু অক্ষরে-অক্ষরে সেই নিয়মগুলি মেনে চলেছিলেন, চলে-ছিলেন বলেই গত পঁচিশ বছর ধরে তাঁকে এত কৃচ্ছ্রের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। এটা মস্ত বিষণ্ণতার কথা যে, যে-ঐতিহ্য স্থাপন করার চেষ্টা 'নাউ' করেছিল তা কিন্তু তেমন ছড়িয়ে পড়ল না। সেই কৃচ্ছ্রসাধনার ঐতিহ্য দেশ থেকে এখন, লক্ষণাদি দেখে মনে হয়, প্রায় মুছে-মুছে গেছে। একজন-দুজন আছেন—এখানে ওখানে—, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। মুম্বাইতে 'ইকনমিক এ্যাণ্ড পলিটিকাল উইক্‌লি' সাহস দেখিয়ে চলেছে ; এখানে কলকাতায়, ও আমার মতের সঙ্গে যতই অমিল হোক, ফ্রন্টিয়ার সম্বন্ধে বলব যে তাঁরা আদর্শের প্রতি তন্নিষ্ঠ থেকে গেছেন। কিন্তু তেমন বেশি উদাহরণ এই আশি কোটি মানুষের দেশ চুঁড়লে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইংরেজি বাদ দিয়ে আমাদের দেশে বিভিন্ন ভাষায় যে-সমস্ত পত্রিকাদি বেরোচ্ছে তাদের কথাও যদি উল্লেখ করি, তাহলেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। অধিকাংশ পত্রিকাই—এখানে-ওখানে-সেখানে, বাঙ্গালোরে, দিল্লিতে,

নাসিকে, গাজিয়াবাদে, রায়পুরে ইত্যাদি নানা জায়গায় যা প্রকাশিত হচ্ছে—, তা হয় কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের, নয় কোনো সংগঠিত রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে, তার বাইরে একা দাঁড়িয়ে লড়াই করবার সাহস কিংবা ইচ্ছা যেন প্রায় অন্তর্হিত।

— 'নাউ'-এর কথা আপনি লিখেছেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর অভিজ্ঞতা এখনও সবিস্তারে কোথাও সম্ভবত বলেন নি, 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সাংবাদিকতার মধ্যে সত্যি কি কিছু প্রভেদ আছে? 'নাউ'-এর তুলনায় 'ফ্রন্টিয়ার'-এ কিছু বেশি স্বস্তি কি বোধ করেছিলেন আপনারা? এবং পত্রিকায় লেখাতেও কি তার প্রকাশ ঘটেছিল? পত্রিকার সুস্পষ্ট কিছু নীতি কি নির্ধারিত হয়েছিল? 'ফ্রন্টিয়ার' কি প্রথম থেকেই 'নাউ'-এর চাইতে কিছু কম 'এলিটিস্ট' এবং আরো বেশি খোলাখুলি রাজনীতিক পত্রিকা হবার কথা ভেবে এগিয়েছিল?

— 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখেছি মাত্র প্রথম দু বছর ১৯৬৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৭০ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তারপর 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে এবং আমি নতুন করে লেখবার তাগিদ কোনোদিন অনুভব করিনি। একটা কারণ, সেই ১৯৭০-৭১ সাল, খুব গোলমেলে সময় গেছে সেটা, অনেকেই বুঝতে পারছেন না, দেশে কী হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে। সমরবাবু যে-ধরনের তাগিদ সেই সময় থেকে অনুভব করতে শুরু করলেন, তার সঙ্গে আমরা অনেকেই—গোড়ার দিকে যারা 'নাউ'-তে লিখেছিলাম এবং ফ্রন্টিয়ার-এও লিখতে শুরু করেছিলাম—আমাদের মন মেলাতে পারলাম না। 'নাউ'তে অন্তত একটি বহুপাক্ষিক বামপন্থার ও বাম অভিমতের প্রকাশ ঘটত। আমাদের কারো কারো মনে হয়েছিল যে ফ্রন্টিয়ার বছরখানেক গড়িয়ে যাওয়ার পরেই একটু একপেশে হয়ে যাচ্ছে। সেই কারণে আমাদের মধ্যে খানিকটা মানসিক দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছিল। আমি সমরবাবুর ত্যাগ, তিতিক্ষা, কষ্টস্বীকারকে শ্রদ্ধা ও অভিবাদন জানিয়ে এসেছি বারবার, কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' সম্পর্কে আলাদা করে কোনো মন্তব্যে লিপ্ত হতে চাই না। কারণ, সত্যিই, পত্রিকাটি সম্বন্ধে আমার পরিচয় তেমন গভীর নয়।

— 'সম্পাদক' হিসেবে সমর সেনের ভূমিকা সঠিক ভাবে কী ছিল? লেখার পরিকল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি প্রশ্নে তিনি কি কোনো নির্দিষ্ট, নিজস্ব অবস্থান থেকে কাজ করতেন? নাকি আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়েই স্থির করতেন সেটা? সত্তর দশকের সব চাইতে চাঞ্চল্যকর যে ঘটনা, অর্থাৎ নকশালবাড়ি আন্দোলন, তার বিষয়ে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে

এ-নিয়ে কি সমর সেনের সুস্পষ্ট কোন অভিমত বা নির্দেশ ছিল ? মতান্তর ঘটলে তাকে সমর সেন কীভাবে গ্রহণ করতেন ? আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কী ?

— সমরবাবুর নিজেরই পঙ্‌ক্তি, যেটি মার্কসের সূত্রের প্রথম কথা, 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে।' আমি বোধহয় 'এক্ষণ' পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ প্রবন্ধেই লিখেছিলাম যে সমরবাবুর পারিপার্শ্বিকতার তেমন কোন প্রভাব কিন্তু তাঁর পত্রিকার ওপর পড়েনি। কিন্তু এ-কথাও সেই সঙ্গে আমার মনে হয়েছে যে এটা বহির্বয়বের ব্যাপার, ভদ্রলোকের স্থূলে ভুল ছিলনা। গুটিকয় বিশ্বাসের তিনি বশবর্তী ছিলেন, সেই শক্ত খুঁটিতে, সেই বিশ্বাসে, ভর দিয়ে তিনি বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন। 'নাউ' যে একটি রাজনৈতিক পত্রিকায় পর্যবসিত হল এবং হুমায়ুন কবির যে শেষ পর্যন্ত সমরবাবুকে অপসারণ করতে বাধ্য হলেন, সে-বিষয়ে বলবো আমার মতো কয়েকজন নিমিত্ত মাত্র ছিলাম। আমরা নিমিত্ত যদি নাও হতাম, আমার ধারণা, পশ্চিমবাংলায় এমন ধরনের ঘটনাক্রম তখন ঘটেছিল যে সমরবাবু একটা সময় নিজে থেকেই কতগুলি সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হতেন, নিজে থেকে, ভিতর থেকে তাগিদ বোধ করতেন, ফলে যেটা ছ'মাস আগে হয়েছিল সেটা হয়ত ছ'মাস পরে ঘটত। যদি প্রশ্ন করেন সম্পাদক হিসেবে তাঁর প্রধান গুণ কী ছিল, আমি বলব স্বল্পভাষণের গুণ। কম কথা বললে সে-কথার ওজন অত্যন্ত বেশি হয়। সম্পাদক সমর সেন অত্যন্ত কম কথা বলতেন। টেলিফোনে সামান্য মৃদু একটি দুটি কথা, খুব মৃদু উচ্চারণে; কাউকে হয়ত পোস্টকার্ডেই দু ছত্র লিখে পাঠানো; কিন্তু যাদের কাছে বাণী পাঠালেন তাঁরা ঠিক বুঝে নিলেন কী চাইছেন তিনি। একটি বিশেষ প্রতিভা প্রয়োজন সম্পাদকদের ক্ষেত্রে, যা আমরা দেখেছি শচীন চৌধুরী মশায়ের মধ্যে, এবং সমরবাবুর মধ্যেও দেখেছি : কাকে দিয়ে কোন্ লেখাটি লেখানো যাবে—এবং মেলানো যাবে পত্রিকার চরিত্রের সঙ্গে তা চট করে বুঝে নিতে পারতেন। পাশাপাশি—অন্য যে-বিষয়ের উল্লেখ করতেই হয়, অসম্ভব গণতান্ত্রিক মানুষ ছিলেন। হয়তো কলেজের পড়ুয়া আদর্শবাদী ছাত্র লেখা নিয়ে এসেছে, ইংরেজি প্রতিটি বাক্য অশুদ্ধ, ব্যাকরণ অশুদ্ধ, কিন্তু কাউকে অবজ্ঞা করেন নি, প্রত্যেকের সঙ্গে সম্মান দিয়ে কথা বলেছেন। যদি বুঝতে পারতেন যে কোন লেখাকে ভদ্রস্থ করা যাবে, শুধরে টুধরে নিয়ে ছাপানো যাবে, আপ্রাণ চেষ্টা করতেন, ধরে রাখতেন লেখাটি, এক মাস, দু মাস, তিন মাস, চার মাস। পরিশোধন পরিমার্জনার কাজ ওঁর শরীরে দিচ্ছেনা—অন্য কাউকে, রচনাটি দিতেন,

এমন কাউকে যাঁর উপর আস্থা স্থাপন করতে পারতেন, 'একটু দেখে দিন তো, দাঁড় করানো যায় কিনা।' এই ধরনের অনুকম্পা যে কোন সমাজ-সচেতন, বিবেক-আশ্রয়ী সম্পাদকের কাছ থেকে সমাজ আশা করতে পারে। এই ক্ষেত্রে আশাভঙ্গ ঘটেনি, সমরবাবু তাঁর সামাজিক দায়িত্ব অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালন করে গেছেন।

মতান্তরের প্রসঙ্গ। 'নাউ' চলাকালীন সম্পাদকীয় প্রবন্ধের সঙ্গে আমাদের কারো মতান্তরের বিশেষ সমস্যা দেখা দেয়নি। কারণ হয়ত যে তার শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশি ভাগ মন্তব্য আমাদের, নিজেদেরই কারো না কারো লেখা—'ক' লিখেছেন বা 'খ' লিখেছেন ভাগাভাগি করে। তবে অনেক সময়, যেমন 'নাউ'-এর পর্যায়ে, আমি ওঁকে তাগিদ দিতাম, রাজনীতির কথা আরো একটু বেশি থাকলে ভাল হয়, ওঁর অন্য বন্ধুরা হয়ত বলতেন, একটু কম থাকা ভাল। 'ফ্রন্টিয়ার' পর্বে আমার সঙ্গে যে মতপার্থক্য হতে শুরু হলো তা রাজনীতিঘটিত—উনি যে-ঝোঁকটাকে মেনে নিতে পেরেছিলেন, বিশ্বাস আরোপ করেছিলেন। আমি সেই আস্থা রাখতে পারিনি। তবে তা নিয়ে মাত্র একদিনই অন্য এক বন্ধুর বাড়িতে জোর তর্ক হয়েছিল মনে পড়ছে, কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিগত সৌহার্দ্যে কোনদিন ভাটা পড়েনি। যাই হোক, সত্তর দশকের গোড়ায়, পশ্চিমবাংলায় যে ঘটনাবলী ঘটছিল তা নিয়ে অনেক রকম মত এবং মতান্তর ছিল এবং আছে—পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর বিশেষ লাভ নেই এখন। সমরবাবু হয়ত একটি বিশেষ মতের দিকে সেই মুহূর্তে ঝুঁকে পড়েছিলেন, তার পরের ইতিহাস নিজের নিয়মে বয়ে গেছে। ওরকম ভাবে ঐ সময়ে ঐ দিকে উনি না ঝুঁকলে কী হতো বা না হতো তা নিয়ে এখন, মনে হয়, কথা বাড়ানো পণ্ডশ্রম।

— পত্রিকার বাইরে মানুষ সমর সেনকে আপনি যে-ভাবে জানতেন তারও কিছু পরিচয় জানতে চাই। নিজের কবিতা অথবা কবিজীবন সম্পর্কে কি কোন দুর্বলতা সমরবাবুর অবশিষ্ট ছিল?

— সব চেয়ে বড় কথা, যা আমি বহুবার বহু জায়গায় বলেছি, তা মানুষটির অবৈকল্য। মন আর মুখে কোন তফাৎ ছিল না। তার অর্থ এই নয় যে উনি খুব রূঢ়ভাষী ছিলেন। রূঢ়, রুক্ষ হতে পারতেন, কিন্তু সব সময় হতে দিতেন না নিজেকে। আমার যেমন বাজারে একটি অখ্যাতি আছে, অকথা-কুকথা বলি। সমরবাবু সম্বন্ধে সে-রকম কেউ কিন্তু কোনোদিন বলতে পারবেন না তিনি আগ বাড়িয়ে গিয়ে কাউকে কুকথা বলেছেন। স্পষ্ট কথা বলেছেন, কিন্তু যেটাকে অসৌজন্য ব'লে অভিহিত করা যায়

বাঙালিদের সামাজিক ব্যাকরণে—সে ধরনের অসৌজন্য কারো প্রতি কোন দিন দেখান নি—যাঁর প্রতি তিনি গভীর ভাবে বিরক্ত তাঁর প্রতিও দেখান নি। অথচ নিজের বিবেক থেকে, নিজের নীতি থেকে, নিজের ধর্ম থেকে সামান্যতম স'রেও আসেননি কখনো। তাঁর সততার কোন তুলনা নেই।

ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় কবি বন্ধুদের কথা সমরবাবু বলতেন, কিন্তু নিজের কবিতা নিয়ে কোন দিন কথা বলতে চাইতেন না। কবিদের কথা বলতেন—সুধীনবাবুর কথা, বিষ্ণুবাবুর কথা, বুদ্ধদেববাবুর কথা। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তেমন-একটা পরিচয় ছিল না বলতেন। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু—কামাক্ষীপ্রসাদ-দেবীপ্রসাদ—এঁদের কথা অবশ্যই বলতেন কখনো কখনো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গও। ঘরোয়া আড্ডায় বার-বার অন্য বন্ধুদের নামও উচ্চারণ করেছেন যেমন সুনীল জানা, শোভা দত্ত, অথবা কৃষ্ণনগরের দেবী ভট্টাচার্য। তাঁর এক বন্ধু—কয়েক সপ্তাহ হলো তিনিও প্রয়াত হয়েছেন—কৃষ্ণদাস গুপ্ত, তাঁর কথাও বলতেন। এই ভদ্রলোকও এক সময় কবিতা লিখতেন, গদ্য কবিতা, আপনারা কেউ তাঁর কবিতা পড়েন নি, সমরবাবুর অকৈশোর বন্ধু, এক সঙ্গে হুল্লোড় করতেন। সে-সব হুল্লোড় নিয়ে প্রচুর গল্প করতেন, খুব খোলা মনে, মজা করে বলতেন, সবটাই ছিল নির্বিষ মজা। ক্বচিৎ-কখনো অতি মার্জিত আদি রসের চর্চা। কিন্তু কাব্যের গুণ, কাব্যের ব্যাকরণ, কাব্যের সমাজ-ধর্মিতা কিংবা সমাজ-বিদ্রোহিতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোন মন্তব্য কোনদিন করেন নি। কবিতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে বরং অধৈর্য হয়ে উঠতেন, একটি কথা প্রায়ই ব্যবহার করতেন,—'ন্যাকামি', 'ন্যাকামি হচ্ছে'।

নিজের কবিতা নিয়ে সামান্য কিছু দুর্বলতা হয়ত, তাহলেও, তাঁরও ছিল। মনে আছে একবার, সম্ভবত ১৯৬৫-৬৬ সালে, যখন ওঁকে বললাম পুরোনো দিনের একটি হাতবৃত্ত জানতে চাই, খুশি মনে দুটো পুরোনো খাতা পড়তে ধার দিলেন। ছাত্রবয়সে ব্যবহৃত বাঁধানো খাতা, যখন খুব বেশি কবিতা লিখতেন এবং খুব বেশি পড়াশুনা করতেন সেই সময়কার। অনেক কিছু ছিল সেই খাতা দুটিতে : কবিতার খসড়া, কবিতার ইংরেজি অনুবাদ কী কী বই পড়ছেন তখন তাদের তালিকা, সে-সমস্ত বই থেকে কিছু-কিছু উদ্ধৃতি একজন দু'জন সহপাঠিনীর নাম, তাঁদের নিয়ে মস্করা। পরে তাঁর বড় মেয়েকে ঐ খাতা দুটো দিয়েছিলেন।

কবি ও সাংবাদিক সমর সেন সম্পর্কে শেষ বিচারে আপনি কী বলবেন? ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে কীভাবে দেখবে বলে আপনার ধারণা?

— এখনও বলবো, এবং আমার দশ পনেরো বছরের যাঁরা বয়ঃকনিষ্ঠ তাঁদের বিদ্রূপাত্মক প্রতিবাদের আশঙ্কা সত্ত্বেও বারবার বলবো : যখন তাৎক্ষণিকতার ঝড়-ঝঞ্ঝাগুলি থিতিয়ে যাবে, তখনও কিন্তু সমর সেনের কাব্য একটি বিশেষ সময়ের প্রতিবিম্ব হয়ে বেঁচে থাকবে। আমি যেমন তাঁর ১৯৩৭ সালে লেখা কবিতা এই ১৯৮৭ সালে সমান অনাড়ষ্টতার সঙ্গে পড়তে পারছি, গ্রহণ করতে পারছি, উপভোগ করছি, আমার ধারণা ২০৩৭ সালেও ঠিক সেই পরিমাণ উপভোগ্যতা-গ্রহণীয়তা সমরবাবুর কবিতার ছুঁয়ে থাকবে।

অন্যদিকে, একটি বিশেষ বিবেকদংশন, যাঁরা এখন প্রচুর পয়সাকড়ি করছেন সাংবাদিকতা থেকে, তাঁদেরও মধ্যে উদ্রিক্ত হচ্ছে যে আমরা করে খাচ্ছি, আর ঐ লোকটা কিন্তু একটা স্রেফ আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করল। এ ধরনের পাপবোধ এখনই মাঝে-মধ্যে এঁর ওঁর তাঁর মধ্যে হতে দেখি। বর্তমানে যে-রাজনৈতিক, সামাজিক বিচারগত অস্থিরতা তথা মানহীনতা ভারতবর্ষের প্রধান লক্ষণ, সেটা সাময়িক, আমার ধারণা এই বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্য থেকেই নতুন-কিছু নিয়মকলা আসবে, সেই নিয়মকলার নিরিখেই সমর সেনের সাংবাদিকতার ভূমিকার পুনর্মূল্যায়ন হবে।

তবে আমাকে যোগ করতেই হয়, ভূত-ভবিষ্যৎ তত্ত্বে সমরবাবুর আদৌ শ্রদ্ধা ছিল না, তাঁর অবর্তমানে তাঁর স্বীকৃতির পারা উপরে চড়লো কি নামলো সেই চিন্তায় অন্যের ভাত হজম হওয়া বিঘ্নিত হ'তে পারে, তাঁর কদাচ হতো না। শেষ পর্যন্ত বন্ধুদের প্রীতি ও আনুগত্যের বাইরে সত্যিই পৃথিবীর কাছ থেকে তিনি অন্য কিছু-আশা করেননি।

আলোচনা

অরুণ মিত্র

কবি সমর সেন

কোনো কাব্যের গুণাগুণ পর্যালোচনায় বয়েসকে যদি একটা নিরিখ ব'লে ধরা যায়, তাহলে বলতে হয় সমর সেনের সমকক্ষ কাউকে বোধহয় আমরা পাইনি বাংলা সাহিত্যে। প্রশ্নটা শুধু অল্পবয়েসে কাব্যরচনার নয়। বাঙালীরা জ'ন্মেই কবি, এমন একটা সুখ্যাতি বা অখ্যাতি প্রচারিত আছে। অবশ্য অল্পবয়েসে বাঙালীরা যে সাধারণত কবিতা লেখায় হাত লাগায়, তা ঠিক (বয়ঃসন্ধির আবেগে কবিতা হয়তো অন্যেরাও লেখে). কিন্তু সমর সেনের আরম্ভ উল্লেখযোগ্য শুধু বয়েসের জন্যে নয়, বয়েসের সঙ্গে ব্যতিক্রমীভাবে যুক্ত এমন এক মাত্রার জন্যে যার তুলনা বিরল। তিনি যখন কবিতা লিখতে এবং পত্রিকায় প্রকাশ করতে আরম্ভ করেছেন তখন তিনি সদ্য কৈশোর পেরোনো এক ছাত্র। কিন্তু যে-কবিতা তিনি লিখলেন তা মোটেই বালকসুলভ নয়, তাতে বোধ ও সংবেদনার যে-ছাপ পড়ল তা এক পরিণত মানুষের। আধুনিক কাব্যে আরো দুইজনের নাম এই প্রসঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ্য : সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁরাও অল্প বয়েসে অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে সমর সেনের বিশিষ্টতা এক দিক থেকে অনন্য। তিনি প্রকরণে ও পদ্ধতিতে এক নতুন কাব্যধারারই প্রবর্তন করলেন বলা যায়। এই ধারা বাংলা কাব্যে তাঁর পূর্বগামীদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। তৎকালীন আধুনিকতার যাঁরা কবি-নেতা, তাঁরা তাঁকে শিষ্য করতে পারেননি।

সমর সেনের কবিতার গঠনকে সাধারণত চিহ্নিত করা হয় গদ্যছন্দ নামে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ থেকে তা পৃথক। সমর সেন কাটা-কাটা শব্দে এবং খণ্ড খণ্ড প্রতীকী চিত্র ও ব্যঞ্জনার আশ্রয়ে কবিতাকে এক সংহত রূপ দিলেন এই ছন্দে, যা তাঁর প্রধান প্রকাশ-পদ্ধতি হিসেবে বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত, শুধু বাক্যের প্রবহমানতা কিছু বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর কবিতায় যে-সুর শোনা গেল, তাও আমাদের এখানে নতুন। প্রথম পর্বের বিভিন্ন রচনায় বিধুরতা, চাপা যন্ত্রণা, ঝলকিত প্রত্যাশার পরই বিষাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া বাংলা কাব্যে এক অন্য স্বাদ নিয়ে এল। তাঁর এ-সব কবিতায় বিষয়ের ধরাছোঁয়ার বদলে আমার চোখে ফুটে ওঠে এক মেজাজ, mood, শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পুনরাবৃত্তি যাকে গাঢ় ক'রে তোলে। এমন mood-এর কবিতা আমাদের ছিল না আগে। কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক :

> স্তব্ধ রাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও ?
> আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,

বিশাল অন্ধকারে শুধু একটি তারা কাঁপে,
হাওয়ায় কাঁপে শুধু একটি তারা।
কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
আমাকে একলা ফেলে ?···
আমাকে কেন ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায় ?
মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি
তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ ;
সহসা বুঝতে পারি—
দিনের পরে কেন রাত আসে
আর তারারা কাঁপে আপন মনে,···
বুঝতে পারি কেন
স্তব্ধ অর্ধরাত্রে আমাকে তুমি ছেড়ে যাও
মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায়।

(নিঃশব্দতার ছন্দ)

এবং

ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
বাতাসে ফুলের গন্ধ ;
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।
ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
নির্জন প্রান্তরের স্থকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

(একটি রাত্রের সুর)

এবং

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।
তুমি এখনো এলে না।
সন্ধ্যা নেমে এল ; পশ্চিমের করুণ আকাশ
গন্ধে-ভরা হাওয়া,
আর পাতার মর্মর-ধ্বনি।

(বিরহ)

একই সুরে আরো :

> সে হাওয়ায় শুধু যেন শুনি,
> কান পেতে শুনি
> কোন সুদূর দিগন্তের কান্না ;
> সে কান্না যেন আমার ক্লান্তি,
> আর তোমার চোখের বিষণ্ণ অন্ধকার

(দুঃস্বপ্ন)

> পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
> আমার অন্ধকারে আমি
> নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

(মুক্তি)

> কিছুই নয়, শুধু আকাশের মহাশূন্য, ঝরাপাতার ক্লান্তি,
> আর হাওয়ায়
> নামহীন ফুলের অদ্ভুত চাপা গন্ধ
> মুহূর্তগুলির নিঃশব্দ কান্নার মতো ;

(চার অধ্যায়)

অন্ধকার, ক্লান্তি, হাহাকার, বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, বিধুর বাসনা আর এক অনির্দেশ্য বিষাদ কবিতার পর কবিতায় ছড়িয়ে থাকে। এই বিমূর্ত যন্ত্রণাকে **romantic agony** ছাড়া আর কী বলব ? কিন্তু এরই মধ্যে এক-একটা ঝলক দেখা যায়, যাকে আশারই ঝলক বলতে হয়, যদিও তা ক্ষণস্থায়ী। এই আবহাওয়া থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও তাতে ধ্বনিত হয় :

> যদি ঝড় নেমে আসে,
> শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক'রে
> অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে
> ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে,
> তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।

(ঝড়)

'মেঘ-মদির মহুয়ার দেশের' কথাও তাঁর মনে আসে, কয়লাখনির 'গভীর, বিশাল শব্দ' তিনি শুনতে পান, কিন্তু 'শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে অবসন্ন মানুষের শরীরে ধুলোর কলঙ্ক' তিনি দেখেন এবং তাদের 'ঘুমহীন চোখে ক্লান্ত দুঃস্বপ্নের হানা' টের পান।

কিন্তু তাঁর **mood** বেশীদিন শূন্যচারী থাকেনি, অল্প কালের মধ্যেই মাটিতে শিকড় নামিয়ে দেয়। সে-মাটি শহরের মধ্যবিত্তের জীবন ও পরিপার্শ্ব, বস্তুত যা ছিল তাঁর

নামহীন যন্ত্রণা ও বিষাদের উৎস। মধ্যবিত্ত নাগরিক অস্তিত্বের গ্লানি, তার বিবর্ণ দৈনন্দিনতা, তার সঙ্কীর্ণতা, আত্মপরায়ণতা এবং অসহায়তা সমর সেন তাঁর কবি-জীবনে অচিরেই চিনে নিয়েছিলেন। তাঁর এই চেতনা তাঁকে বিষাদে ও একাকীত্বে আচ্ছন্ন করেছিল এবং এই মধ্যবিত্ত প্রাণধারণের অংশীদার হিসেবে তাঁকে আত্ম-করুণাতেও প্রণোদিত করেছিল। তাঁর পরিচিত জীবন সম্বন্ধে কোনো মোহ আর তাঁর ছিল না। এই মোহভঙ্গই অধিকাংশ সময় এক নৈরাশ্যে রূপ নিয়েছে, এক-এক সময় অসীম নৈরাশ্যের চিত্রকল্পে, যেমন :

সমুদ্র শেষ হল ;
গভীর বনে আর হরিণ নেই,
সবুজ পাখি গিয়েছে মরে,
আর পাহাড়ের ধূসর অন্ধকারে
দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত পাখির মতো।
সমুদ্র শেষ হল
চাঁদের আলোয়
সময়ের শূন্য মরুভূমি জ্বলে।

(স্বর্গ হতে বিদায়)

এই আবহাওয়া থেকে পরিত্রাণের আকুলতা তাঁর মনে যে-প্রত্যাশাকে ক্ষণিক আশ্রয় দিয়েছে তা যেন স্বপ্নের প্রত্যাশা। তবু মধ্যবিত্ত প্রাত্যহিকের গ্লানিকর চেতনা তাঁকে বার বার সেই স্বপ্ন দেখিয়েছে। এবং তাঁর প্রত্যাশা সব সময় অলস স্বপ্নেই শেষ হয়নি, তা বাস্তবকে স্পর্শ করেছে বলতে পারি। কারণ তা রূপান্তরিত হয়েছে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের আবাহনে, অনুভবে। প্রথম পর্বেই তিনি লেখেন :

মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,···
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে,···
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—
....
ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী!

রুদ্ধশ্বাস রাত্রি শেষে
জলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন
....
মাঝে মাঝে আকাশে শুনি
হাওয়ার চাবুক,
আর ঝাপসাভাবে শুধু অনুভব করি
চারদিকে ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ।

(নাগরিক)

এবং

আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি :
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

(একটি বেকার প্রেমিক)

এই ইতিবাচক দিক তাঁর কবিতায় পরে আরো স্পষ্ট হয়, কখনো-কখনো এমন অতিরিক্ত রকম স্পষ্ট যে, তা কাব্যের এলাকায় আর থাকে না। এসত্ত্বেও মনে হয় তাঁর কবিতার ধারাবাহিক প্রধান স্বর মধ্যবিত্ত জীবনের ও মধ্যবিত্ত চরিত্রের প্রতি অন্তহীন ঘৃণা ও বিদ্রূপ এবং আত্মধিক্কার। শেষ পর্বের কবিতাতেও তিনি "মধ্যবিত্ত মানবের বিড়ম্বিত গ্লানি"-র (বিকলন) উল্লেখ করেছেন। একই অবক্ষয়, ক্লিন্নতা, ক্ষুদ্রতা এবং গতানুগতিকতার ছবি বারে বারে দেখি তাঁর কবিতায়। এমনকি, যখন তিনি সাম্যবাদী বিপ্লবের প্রসঙ্গ আনছেন তাঁর কবিতায়, তখনো সাম্যবাদ ও প্রগতির সমর্থক মধ্যবিত্ত কবি-প্রবক্তাদের বিদ্রূপ করতে তিনি ছাড়ছেন না, এবং নিজেকেও সেইসঙ্গে :

যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক,
তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান অবশ্য উচিত।

(পরিস্থিতি)

তারপর চায়ের দোকানে ব'সে সহসা ভেবেছি
আজকাল ঘরে ঘরে সমাজধার্মিক অনেক,
মুখে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বুলি
মনে রোমান্টিক বুলবুলের অবিরত গান,
তুমি ছিলে তারি একজন।
এ অধমও তারি একজন।

(কয়েকটি মৃত্যু)

আমি রোমান্টিক কবি নই, আমি মার্ক্সিস্ট।
অনেকে জিজ্ঞেস করে : গুরুদেবের দৃষ্টির সঙ্গে
তোমার তফাতটা কী ? তফাতটা এই :
বেদ উপনিষদের বুলি মুখে তিনি বরাবর,
অক্লান্ত বাউল, একই নৌকোয়
একঘেয়ে খেয়া পারাপার করেছেন ;
কিন্তু জড়বাদী স্বুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকোয় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষীর
ভাগ্যবান এ কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।
জীবনযাত্রার গতি বদলাতে তাই
বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখি না।
....
লেনিন, স্টালিন, ক্রুশ্চভ্ ও গোর্কি,
তাদের আমরা চিনি। কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দু-নৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে।

(২২ শে জুন)

আত্মকরুণা এবং মধ্যবিত্ত নীতিহীনতা, এ-দুয়ের চিত্রণ কোনো পর্যায়েই ক্ষান্ত হয়নি সমর সেনের কাব্যে। বরাবরই চলতে থাকে। বেশ আগের রচনা 'রোমন্থন'-এ জীবনস্মৃতির ধারায় সামগ্রিকভাবে নিজের শ্রেণীগত চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে যে-স্বীকারোক্তি শুনি, শেষ কবিতা 'জন্মদিন'-এর শেষ কয়েক ছত্র কাব্যিক পালার যবনিকা ফেলে যেন তারই অন্তিম অংশ হিসেবে। আদ্যন্ত এই প্রকাশ অবশ্য সমর সেনের মানসিক সততা ও সত্যনিষ্ঠারই নিদর্শন। কিন্তু এ থেকে তাঁর মনের একটা একমুখী প্রতিক্রিয়ারও পরিচয় পাই, যা তাঁর কাব্যিক উৎসারে তাঁকে বাধা দেয়,

অনবরত পেছনে টানে, আট্‌কেও রাখে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যখন সাম্যবাদী আদর্শ ও রাজনীতির কথা ক্রমেই খোলাখুলি বলছেন তখনও।

তাঁর কাব্যে সমাজনীতি ও রাজনীতি স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে এই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই। এরই ঠিক আগের পর্বে প্রসঙ্গক্রমে ব্যক্ত বিশ্বাস যেন বর্তমানের নৈরাশ্যে টলমল, যেমন 'ঘরে বাইরে' কবিতায় দেখি :

> ···মাঝে মাঝে উদ্যত যমদূত ক্লান্ত হতাশা আঁকে
> দিন রাত্রির নরকের সিংহদ্বারে।
> তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
> যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
> তবু জানি,
> জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
> আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
> ততদিন
> ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
> পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
> অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো. ··

ক্রমে তাঁর বিশ্বাস এক অটল মূর্তি নিতে থাকে এবং অভিব্যক্তি প্রত্যক্ষতার দিকে ঝোঁকে। যথা—

> জানি ওরা নয় বৈশ্য সভ্যতার জারজ সন্তান,
> গলিত ধনতন্ত্রের চতুর বিভীষণ ;
> তাই সক্রিয় আশা মৃত্যুহীন জাগে অনেকের মনে ;
> অপরের শস্যলোভী, পরজীবী পঙ্গপাল
> পিষ্ট হবে হাতুড়িতে, ছিন্ন হবে কাস্তেতে।

(নানাকথা)

> আসমুদ্রহিমাচল হে হিন্দুস্থান,
> কানে বাজে
> ক্ষুরধার নদীসঙ্কুল চীনের আহ্বান
> কৃষ্ণসাগর থেকে বল্টিক পর্যন্ত
> বিপর্যস্ত সোভিয়েট-ভূমির মৃত্যুঞ্জয় গান· ·
> ....
> এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব
> যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে,
> প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।

(বসন্ত).

এই প্রত্যক্ষতা এতদূর অগ্রসর হয় যে, অনেক জায়গায় কবিতা বিবৃতির চেহারা নেয়। 'পঞ্চম বাহিনী' শীর্ষক রচনায় তো বুড়ো মজুরের উর্দু জবানই অনেকখানি বসিয়ে দেন লেখক :

বুড়ো মজুর বলে : হমারা হিন্দুস্থান নেহি দেঙ্গে।
হিম্মৎ হ্যায়, জানোয়ার মারনেকে লিয়ে মরনেকে লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।
হিন্দুস্থানকী ইজ্জৎ বাঁচ নেহি শকৃতি ইস্ কালে বুরখেমে
ব্লাক-আউট তো বিলকুল মজবুরীকা বাত হ্যায় ·· ইত্যাদি

এবং আরো পরে সুদীর্ঘ 'খোলা চিঠি' কবিতায় ছত্রের পর ছত্র নিরাবরণ বর্ণনা এবং বিশদ ঘোষণা। যেমন, এই শেষাংশ :

এ বসন্ত কাদের ? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে,
রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত হয় অক্লান্ত অভিযানে,
উদয়ী সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
নির্মম সঙ্গীনে।
অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে
পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,
হে সরকার, হুজুর সরকার,
হুজুর বড়োলাট, জঙ্গীলাট, বর্মাবীর আলেকজাণ্ডার,
আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।

মাঝে মাঝে অবশ্য কবিতার ঝলক দেখি আশা ও সঙ্কল্পকে জড়িয়ে। যেমন ঐ 'পঞ্চম বাহিনী' কবিতাতেই :

কিন্তু আগামী কাল আসুক ঘর-ফিরতি মজুরের গানে
কুমারীর আত্মদানের প্রথম বেদনায়
নবজাত শিশুর সহজ কান্নায় ;
শতাব্দীর যন্ত্রণার পর
নতুন দিন আসুক সভ্যতার পরম চিত্তশুদ্ধিতে।

কিংবা '২২শে জুন' কবিতার উপসংহারে :

আশা রাখি একদিন এ কান্তার পার হয়ে পাব
লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো পথ ভরে,
পরিচ্ছন্ন খোশগল্পে মুখরিত ঘনিষ্ঠ নগর
বাংলার লোহিত সকালে সকলের অক্লান্ত সফর।

তবু স্পষ্ট বিবৃতির ঝোঁকই যেন ক্রমে প্রবল হয়ে ওঠে, আরো পরের কবিতা 'গৃহস্থবিলাপ'-এ যার সাক্ষাৎ পাই, বিশেষত তার শেষ ছত্রাবলীতে :

ঘুণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার।
যারা মাঠে খাটে,
উদ্দাম নদীতে জাল ফেলে
মাছ ধরে যারা আনে হাটে,
ধান জল বিদ্যুত কয়লা
আনে যারা নগরিয়া ঘরে ঘরে,
সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা
তাদের মিতালি খুঁজি।
তাদের জীবন কর্কশ কঠিন,
হয়তো মলিন
নিরক্ষর অতীতের জগদ্দল চাপে,
তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।

কিংবা অন্তিম পর্বে 'লোকের হাটে' কবিতায় :

রমজানের শেষ দিন আজ ; উৎসবের আগে যেন মনে রাখি :
আমাদের মতো সাধারণ লোক
আজ দেশে দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্থান!

মনে হয়, কবিতার আকর্ষণ যেন ফুরিয়ে এসেছে এই কবির মনে। তার চাইতে গদ্যের বাক্যে খোলাখুলি কথা বলা যেন তাঁর কাছে বেশি জরুরী হয়ে উঠছে। শেষ কবিতা 'জন্মদিন'-এ তো কবিতা সম্বন্ধে মোহভঙ্গই প্রকাশ পায় :

ভুলে গেছি বাগবাজারী রকে আড্ডার মৌতাত,
বালিগঞ্জের লপেটা চাল,
আর ডালহাউসীর আর ক্লাইভ স্ট্রীটের হীরক প্রলাপ.

ডকে জাহাজের বিদেশী ডাক।

রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

এই মোহভঙ্গই কি সমর সেনকে কবিতা রচনা থেকে বিরত হওয়ার সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়? নাকি অন্য কারণও তার সঙ্গে জড়িত ছিল? তাঁর কাছে বাংলা কবিতার যথেষ্ট প্রত্যাশা ছিল ব'লে এই প্রশ্ন আমাদের পীড়া দেয়। কিন্তু তিনি নিজে এক পরোক্ষ বিরূপতা এবং ঔদাসীন্য প্রকাশ করা ছাড়া বিশদভাবে কিছুই বলেননি। সুতরাং এ-রহস্যের উন্মোচনে অনুমানই আমাদের একমাত্র নির্ভর। সে-অনুমানের ভিত্তি তাঁর জীবন ও কবিকর্ম ছাড়া আর কী হতে পারে? আমার মনে হয়, বিষয়টা বস্তুমূল (objective) এবং আত্মমূল (subjective), দুই দিক থেকে বিবেচ্য এবং এ দুই দিক সংযুক্তভাবে একটা সন্ধান হয়তো দিতে পারে।

কবিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সমর সেন সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন সাংবাদিকতায়। কিন্তু তা সাধারণ সাংবাদিক বৃত্তি নয়। অবশ্য সে-বৃত্তিতে তিনি এক সময় প্রবেশ করেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানে কাজও করেন, তবে শেষ পযন্ত থাকতে পারেননি। কারণ তাঁর চিন্তার প্রকাশ সেখানে অন্যের নির্দেশাধীন ছিল। স্থায়ী বৃত্তি হিসেবে তিনি যে-সাংবাদিকতা নির্বাচন করলেন তা স্বাধীন এবং তা তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তার বাহন। এখানে তিনি কখনো আপস করেননি। এবং এই স্বাধীনতা ও বৈপ্লবিকতার জন্যে তাঁকে অবশিষ্ট জীবন যথেষ্ট ক্লেশ সহ্য করতে হয়েছে। পরিষ্কার গদ্যে সর্বাঙ্গীণ বাস্তবদশা সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা অবাধে প্রকাশ করা তাঁর কাছে জরুরী হয়ে ওঠে, যার চিহ্ন তাঁর কবিতার মধ্যেই আমরা পাই। অবশ্য তাঁর সাংবাদিকতার এই গদ্য বাংলা নয়, ইংরিজী। কিন্তু তার পঠনক্ষেত্র তো সমগ্র ভারত এবং অন্যান্য দেশ। সুতরাং বাংলা কবিতা থেকে স'রে যাওয়া যদি তাঁর প্রয়োজনীয় মনে হয়ে থাকে, তবে বাংলা ভাষায় সীমাবদ্ধ না থাকাও তাঁর পক্ষে খুব স্বাভাবিক।

কিন্তু এই বস্তুগত কারণের পাশাপাশি তার কবিতার রূপায়ণ সংক্রান্ত অন্য কথাও মনে আসে। আমরা লক্ষ্য করি, ১৯৩৪ থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত তাঁর কাব্য-ভ্রমণে চলনের তেমন হেরফের নেই, বাক্যের গ্রন্থন খানিকটা সহজ হওয়া ছাড়া। অর্থাৎ রচনার পদ্ধতি মোটের উপর একই রকম : কাটা-কাটা কথা, টুকরো টুকরো ছবি এবং ব্যঞ্জনা। কাঠামোর দিক থেকে পরে তিনি কখনো কখনো মিলের আশ্রয় নিচ্ছিলেন এবং কোনো কোনো কবিতা প্রাচীন ছন্দেও রচনা করছিলেন, বিশেষত যা শ্লেষাত্মক। কিন্তু প্রধান কাব্যশরীরে এ-লক্ষণ অকিঞ্চিৎকর, হয়তো তাৎপর্যহীনও বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে যে-বদলটা লক্ষণীয়ভাবে আসছিল, তার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। তা হল বিবৃতিধর্মী বাচন। কিন্তু সে তো কবিতা-বর্জনেরই এক পূর্বাভাস। এক কথায় বলতে হলে বলব, তাঁর চিন্তা এবং বক্তব্যের

উপযোগী কোনো বিস্তার কবিতার রূপায়ণে আসছিল না। এমন কোনো পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল না, যাকে কবিতারই এক স্তর থেকে অন্য স্তরে উত্তরণের নিদর্শন ব'লে ধরা যায়।

আর ভিতরের দিকে তাকালে দেখি, নিজের শ্রেণী-পরিচয় তাঁকে বিক্ষুব্ধ করছিল বার বার। শহুরে মধ্যবিত্তের সুবিধাবাদী অন্তঃসারশূন্য চরিত্র তাঁর অশ্রদ্ধা জাগায় প্রথম থেকেই এবং এই শ্রেণীর একজন ব'লে তিনি নিজেকেও রেহাই দেননি কখনো। এই বিতৃষ্ণা তাঁর স্মরণকে বিচলিত করেছে একেবারে শেষ পর্যন্ত। এই কারণে একটা ছক দেখা দিচ্ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্মে, এবং পুনরাবৃত্তির এক প্রবণতা। কবিতার রূপান্তরের মধ্যে দিয়ে তা থেকে বেরিয়ে আসতে তিনি পারছিলেন না যেন। এ-অবস্থায় কবিতাকে বিসর্জন দেওয়া তাঁর মতো মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। আমি বলছি সেই মানুষের পক্ষে যিনি অটলভাবে আত্মপ্রতারণা-বিমুখ ছিলেন এবং যাঁর মনে বুদ্ধির সন্ধানী আলো সর্বক্ষণ জ্বলত। এ-সবই অনুমানের কথা অবশ্য : লক্ষণ থেকে অনুমান। কিন্তু কারণ যাই হোক, আমরা যারা তাঁর কবিকণ্ঠে উৎকর্ণ হয়েছিলাম, আমাদের এই দুঃখ র'য়ে গেল যে, তিনি নতুন স্বরবিস্তারে আর অগ্রগামী হলেন না, বরণ করলেন নীরবতা।

শঙ্খ ঘোষ

নিঃশব্দতার ছন্দ

'যদি ঝড় নেমে আসে
শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক'রে...
তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে।'

(ঝড়)

অবক্ষয়, বাঁকা কথা আর গদ্যছন্দের কবি হিসেবে যাঁর সাধারণ পরিচয়, সেই সমর সেনের কবিতাসংগ্রহটি শুরু হয়েছে 'ছন্দ' আর 'সুর' এই দুটি শব্দ দিয়ে। বইয়ের প্রথম কবিতার নাম 'নিঃশব্দতার ছন্দ' আর দ্বিতীয়টি হলো 'একটি রাত্রের সুর'। দুটি ভিন্ন কবিতা, কিন্তু এক হিসেবে দুটিকে একত্র করে নিলে যেন তৈরি হয়ে ওঠে পূর্ণতর একটি লেখা। প্রথমটির বিরহবিধুর নায়ক প্রশ্ন করেছিল 'স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও', প্রশ্ন করেছিল কেন নায়িকা এত ভাষাহীন, নিঃশব্দ। আর দ্বিতীয়টিতে সে নিজেই বেরিয়ে এসেছিল বাইরে। ধূসর সন্ধ্যায় তখন সে শুনে নিতে চেয়েছিল একটি সুর, যেখানে ফুলের গন্ধের সঙ্গে বাইরের বাতাসে মিশে থাকে কিসের হাহাকার আর করুণ আর্তনাদ। গন্ধের তুলনায় এই হাহাকারকেই অবশ্য আমরা বেশি মনে রাখি সমর সেনের কবিতায়, কিন্তু তবু লক্ষ করতে হবে কীভাবে প্রথম কবিতার আকৃতিভরা প্রশ্ন তৃতীয় স্তবকে একটি উত্তরও পেয়ে যায়, অন্ধকার মাটিতে প্রাণের আবির্ভাবের সঙ্গে কীভাবে একটা সামঞ্জস্য হয় এই বিরহ-স্তব্ধতার, কীভাবে এই স্তব্ধতাকে মনে হয় ছন্দোময়। সব সময়েই যে এ অনুভবের দৃঢ়তা থাকে তা নিশ্চয় নয়, তবু হাহাকারের মধ্যে কান পেতে কবি মাঝেমাঝে শুনতে পান সেই ছন্দ, তাকে ধরবার জন্য নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা থেকে বেরিয়ে আসেন বাইরে, যে-বাইরের প্রকৃতিতে আছে এক দ্বন্দ্বজটিলতা। কঠিনতার সঙ্গে স্নিগ্ধতার, মুখরতার সঙ্গে অস্ফুটতার, অন্ধকারের সঙ্গে বিদ্যুতের সেই দ্বন্দ্ব নিয়ে তৈরি হয় 'একটি রাত্রের সুর'।

যে-দুটি কবিতার কথা বলা হলো এখানে, তা ছিল প্রেমেরই ব্যাকুল কবিতা; কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে এও ঠিক যে প্রথাগত কোনো প্রেমের কবিতা এ নয়, এখানে প্রেম একেবারে পরতে-পরতে জড়িয়ে আছে এক সময়বোধের সঙ্গে। নিরাশাখিন্ন নায়ক এখানে যার মধ্য দিয়ে ছন্দ খুঁজছে সে কেবল নারীই নয়, সে হলো ব্যক্তিনিরপেক্ষ এক ব্যাপ্ত সময়। এলিয়ট তাঁর 'লেডি অব সায়লেন্সেস'কে যেমন একইসঙ্গে শরীরী আর অশরীরী মূর্তিতে দেখেছিলেন 'অ্যাশ ওয়েন্‌স্‌ডে' কবিতায়, মানবিক কামনা থেকে স্বর্গীয় বাসনা পর্যন্ত একইসঙ্গে যেমন ধরতে চেয়েছিলেন তার মধ্যে,

সমর সেনের এই 'তুমি'ও অনেকটা তা-ই। ভিন্নতা কেবল এই যে, এলিয়টের সেই কবিতায় নিঃশব্দের নারী তাঁকে ঊর্ধ্বচারী হবার পথ দেখায়, এগিয়ে দেয় কোনো আধ্যাত্মিক শব্দের মুক্তিতে ; আর সমর সেনের 'তুমি' হতে চায় ইতিহাসের দিশারি। তাই, যে-কবিতায় ধূসর জীবন থেকে রাত্রির স্তব্ধতা পার হয়ে আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতার দিকে কবি আহ্বান করছেন কোনো 'তুমি'কে, আর সে তবু চুপ করে আছে স্তিমিত হাসিতে আর অশান্ত বিষণ্ণতায়, সমর সেনের কাছে সেই ক বতারই নাম হতে পারে 'ইতিহাস'।

কিন্তু এই ইতিহাস কি বিষণ্ণতাতেই শেষ হয়ে যায় সমব সেনের কবিতায় ? হিংস্র পশুব মতো অন্ধকারে অবক্ষয়েরই একটা ব্যাপক ছবি অবশ্য দেখাতে চেয়েছিলেন কবি। 'মাই হাউস ইজ এ ডিকেয়্‌ড্‌ হাউস'—লিখেছিলেন এলিয়ট। তেমনই এক ক্ষয়ের পরিবেশে, 'মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস' দেখে, পশ্চিম গণতন্ত্র নামে 'দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা'র বৃত্তে সমর সেনকে কেবলই বলতে হচ্ছিল বিষণ্ণ-সূর্যাস্ত শবের-সান্নিধ্য তান্ত্রিক-স্তব্ধতা শরীরসর্বস্ব-আলিঙ্গন বা ঘড়িব-কাঁটার-মন্থর-মুহূর্তের কথা। তাই এলিয়টের ডেজার্ট বা ডেড ল্যাণ্ড বা ক্যাকটাস ল্যাণ্ড তাঁর কবিতায় ছায়া রেখে যাচ্ছিল, তাঁর কবিতাও ভরে উঠছিল বন্ধ্যাজমি মরামাঠ মরুভূমি বা ফণীমনসার ছবিতে, 'বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি থেকে 'নরম শরীরে'র মরুভূমি পর্যন্ত তার বিস্তার, আকাশ থেকে সময় পর্যন্ত সবকিছুই সেখানে হয়ে উঠছিল মরু-ময়। এলিয়টের প্রুফ্রক বা পোর্ট্রেট বা প্রোলোগ-এর মতো ধোঁয়াধুলোকুয়াশা আর হলুদ রঙে ভবে থাকছিল সমর সেনেরও কবিতা। 'স্বর্গ হতে বিদায়' লেখাটিতে 'হে শহর, হে ধূসর শহর' ধরনের ধুয়োগুলিও যে আমাদের এলিয়টকে মনে করিয়ে দিচ্ছিল তা কেবল 'দ্য ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'-এর 'O City, city'-র মতো আবর্তিত উচ্চারণগুলির জন্যেই নয়, তার সঙ্গে লগ্ন অন্য অনুষঙ্গগুলির জন্যেও বটে। ধূসর কুয়াশায় ঢাকা অবাস্তব শহরে এলিয়ট শুনিয়েছিলেন বণিকের এই আহ্বান : 'To luncheon at the Cannon Street Hotel / Followed by a weekend at the metropole', আর ধূসর শহরে সমর সেনের নায়কও যান 'মোটরে আর বারে / আর রবিবারে ডায়মণ্ডহারবারে' ; 'A crowd flowed over London Bridge' সমর সেনের কবিতায় শুনিয়ে যায় 'কালিঘাট ব্রিজের উপরে' কোনো পদধ্বনি, কিংবা 'পিচের পথে / অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ'।

এইসব, এবং এর তুল্য আরো অনেক অনেক নজির থেকে আমরা বুঝতে পারি, কেন বুদ্ধদেব বসুকে সমর সেন লিখেছিলেন তাঁর পঁচিশ বছর বয়সে : 'আমাদের বখাটে generation-এর শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট'। কতটাই এ শ্রেষ্ঠতার বোধ, সেই চিহ্ন সবসময়েই ছড়ানো থাকত তাঁর অল্পবয়সের ভাবনাচিন্তায়, চিঠিপত্রে। বি.বি.সি.তে এলিয়টের কোনো বক্তৃতা বা কবিতাপড়ার খবর জানলে আগ্রহভরে তিনি

অগ্রিম সেটা জানিয়ে দেন বুদ্ধদেবকে বা বিষ্ণু দে-কে, পরে কখনো মন্তব্য করেন তাঁর আবৃত্তিধরন নিয়ে, লক্ষ করেন তাঁর 'গলার 'mature melancholy' কিংবা তুলনা করে বোঝেন যে বিষ্ণু দে-র চেয়ে বরং 'সুধীনবাবুর আবৃত্তির সঙ্গে এলিয়ট-সাহেবের আরো মিল'। এলিয়টের কবিতা এতটাই মজ্জার মধ্যে কাজ করে যে প্রগতিপন্থী কোনো কবিতাসংকলন পড়ে বুদ্ধদেবকে নিজের হতাশা জানাবার মুহূর্তেও তাঁর কলমে উঠে আসে 'দ্য রক'-এর কোরাস থেকে পাওয়া এইসব শব্দবন্ধ : **Waste and void, waste and void** !

তাই, প্রথমে কারো মনে হতে পারে : সেদিনকার অনেক সমালোচকের এই অভিযোগ সত্যি ছিল যে সমর সেনের মতো কবিরা মাটির সঙ্গে সম্পর্কহীন এক মৌসুমি ফুলের চর্চা করছেন ছাদের টবে, কেননা তাঁরা কবিতা লিখছেন নিছক বিদেশের ছাঁচ নিয়ে, আর তাঁরা আশ্রয় করছেন 'ব্রিটিশ Decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা' এলিয়টকে। অভিযোগ ছিল এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল এক অবক্ষয়কে প্রশ্রয় দিয়ে বাংলা কবিতার সর্বনাশ করছেন তাঁরা। নিষ্ক্রিয়তা আর অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস যে মার্ক্সবাদের পরিপন্থী, সেকথা সেদিন বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন প্রগতিশীল সমালোচকেরা। কিন্তু, এলিয়টের দিকে প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও, অবক্ষয়ের ওই প্রশ্রয়ই কি ছিল সমর সেনের কবিতার মূল লক্ষণ, এমনকী তাঁর প্রথম পর্বেও? এ বিচারের জন্য আমাদের ফিরে তাকাতে হয় তাঁর কবিতার একটু ভিতর দিকে।

নিষ্ক্রিয় অদৃষ্টবাদী সুযোগসন্ধানী মধ্যবিত্ত যে সমর সেনের আক্রমণেরই লক্ষ্য, কবিতাগুলির প্রথমপাঠেই সেকথা বোঝা যায়। তবু সেদিন ব্যাখ্যা করে লিখতে হচ্ছিল তাঁকে : 'গ্রহণ-এর নামকবিতায় যে টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক…'। খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এই কবি সেই মুমূর্ষু জীবনধাঁচকে প্রত্যাখ্যান করতে চান বা 'ভিজে ফুলের মতো নরম প্রেম'-এর বর্ণনাকে ঠাট্টা করে নেন এইসব লাইনে : 'বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তাছাড়া একসঙ্গে রাত্রে শোবার / দুর্লভ সুযোগ।' তাঁর কবিতার একটা অংশ জুড়ে থাকে সেইসব বুদ্ধিজীবীর কথা, যাদের **'Jupiter first deprives of reason those whom he wishes to destroy'**, যারা ধৃতরাষ্ট্রের মতো ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস শোনে আর জ্ঞানপাপীর মতো বলে 'আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই'। কিন্তু এই ধ্বংসোন্মুখ রূপটির পাশাপাশি তাঁর কবিতা কি প্রথম থেকে একটা নতুন স্বপ্নেরও ছন্দ রেখে যায় না?

প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতায় আমরা স্বপ্নের সেই ছন্দটাকে খুঁজব কেমন করে। কবি যে সবসময়ে সেটা প্রত্যক্ষঘোষণার মধ্য দিয়ে করতে চান বা করতে পারেন তা নয়। কবি কথা বলেন তাঁর প্রতিমার বিন্যাসে-প্রতিবিন্যাসে, তাঁর যুক্তি অনেকসময়ে ধরা পড়ে তাঁর সত্তাসমগ্র থেকে উঠে-আসা কোনো আবেগে; তাঁর আবেগই তখন

হয়ে ওঠে তাঁর যুক্তি। সেই বিন্যাসের দিক থেকে লক্ষ করলে দেখব যে সমর সেনের একেবারে প্রথম পর্বের কবিতাতেও একধরনের প্রত্যয় আর প্রত্যাশা কাজ করে যায়, আর সেইজন্যেই—কেবল 'একটি রাত্রের সুর' কবিতায় নয়—প্রায় সর্বত্রই তৈরি হয়ে ওঠে সেই কঠিনতার সঙ্গে স্নিগ্ধতার, মুখরতার সঙ্গে অস্ফুটতার, অন্ধকারের সঙ্গে বিদ্যুতের দ্বন্দ্ব। তাঁর কবিতায় হাওয়ার মদির গন্ধে রাত্রির বর্ণহীন আকাশও এনে দেয় লালের ইঙ্গিত, অশান্ত সূর্যাস্তে কবি দেখেন ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল, হাহাকারের মধ্যে জেগে ওঠে ক্ষুধার্ত দীপ্তি, আকাশের দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেও দেখা যায় কৃষ্ণচূড়ার উদ্ধত আভাস, অলস স্বপ্নের পাশেই বিষাক্ত সাপের মতো বাসনা, হিংস্র পশুর মতো অন্ধকারে রক্তকরবীর মতো আকাশ। বিপরীতের এই সংঘর্ষে, সন্ধ্যার জলস্রোতে কবি যে 'গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ' দেখেছিলেন, 'ধূসরতা'র পাশাপাশি সেই 'উজ্জ্বলতা'ও তাঁর এক প্রিয় এবং বহুব্যবহৃত শব্দ হয়ে দাঁড়ায়। নিঃশব্দ বা স্তব্ধতা অবিরাম ছড়িয়ে থাকে তাঁর কবিতায়, পাথর নদী আকাশ দিন রাত্রি, সবকিছুরই বিশেষণ হয়ে আসে এই নিঃশব্দ। কিন্তু সেই নিঃশব্দতার বিশেষণ কখনো 'উজ্জ্বল' কখনো 'তিব্বতী' কখনো-বা 'তান্ত্রিক', কেননা ওই স্তব্ধতার মধ্যে তিনি শুনতে চান কোনো 'ঝড়ের…সঞ্চারণ', কোনো 'নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন', 'দুরন্ত মেঘের মতো' কোনো আবির্ভাব। বৃষ্টির আগে শব্দহীন গাছে যে কোমল সবুজ স্তব্ধতা আসে, সমর সেনের কবিতায় ছড়িয়ে আছে সেই স্তব্ধতা। বিপরীতের সেই সম্ভাবনাতেই এ স্তব্ধতা ছন্দোময়। একদিন হয়তো শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ করে ঝড় নেমে আসবে, ভেঙে যাবে স্তব্ধতা। সেই ঝড়ের কথাটা কবির আবেগের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে যায় বলেই তাঁর কবিতা নিছক 'ডেকাডেন্স'-এর বিমর্ষতা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আসে, সেইটে আছে বলেই স্তব্ধরাত্রের একাকিত্বের মধ্যেও আশ্বাস নিয়ে ভাবতে পারে তাঁর কবিতার বিরহী নায়ক: 'মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি / তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ'।

২

কবিতার ভাবনা বা ছবির মধ্যে বিপরীতের ওই-যে সংঘর্ষ, তাকে সংগত রূপ দিয়েছিল সমর সেনের আঁটো গদ্যছন্দ। দিগন্ত থেকে উঠে-আসা একটি বেগ্‌নি রঙের মেঘ দেখে এই কবির যে মনে হয়েছিল 'তার হঠাৎ চঞ্চলতায় / প্রাচীন ভাস্কর্যের অচঞ্চল গভীরতা আঁকা', তাঁর নিজের কবিতার প্রখর আবেগটানও সেইরকমই এক অচঞ্চল ভাস্কর্যের সংহতিতে বাঁধা আছে। বিমলচন্দ্র সিংহ একবার লিখেছিলেন, এসব কবিতায় যেন পাওয়া যায় এপ্‌স্টাইন বা এরিক গিলের 'প্রাস্তরিক সৌন্দর্য'। কীভাবে তৈরি হতে পেরেছিল সেই সৌন্দর্য? কবিতা যে

'turning loose of emotion' নয়, এলিয়টের কাছে বাংলা কবিতার এই দীক্ষার দরকার ছিল বলে সমর সেন জানিয়েছেন তাঁর বাবুবৃত্তান্তে। কবিতাচর্চা ছেড়ে দেবার অনেক পর 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় তিরিশের কবিতা বিষয়ে লিখেছিলেন তিনি, বাংলা কাব্যের শ্লথ দেহে তাঁরা চেয়েছিলেন ঋজুতা। সেই ঋজুতার খোঁজে তাঁর কবিতাগুলি প্রায়ই ছোটো ছোটো, শব্দের ঘনতায় তার বাঁধুনি, লাইনগুলি অনতিপ্রলম্বিত, আর এইসব মিলিয়ে এর একটা থমকলাগা কাটাকাটা উচ্চারণ। এইখানে এর ভাস্কর্য, আবার ওরই সঙ্গে এর ধ্বনির মধ্যে অন্তঃশায়ী বিষাদকোমল একটা টানও থেকে যায়। ফলে সমর সেনের গদ্যছন্দ যে নিজস্ব একটা ধ্বনিরূপ তৈরি করে তুলেছিল, অল্প কয়েকটি কবিতা পড়েই রবীন্দ্রনাথ সেকথা বলতে পেরেছিলেন ; এই গদ্যছন্দে তিনি দেখতে পেয়েছিলেন 'গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্যের প্রকাশ'।

এমন নয় যে রচনার প্রথম মুহূর্ত থেকেই সমর সেন তাঁর এই রূঢ়লাবণ্যের প্রকাশরীতিটা পেয়ে গিয়েছিলেন। কবিতা লিখতে শুরু করেই তিনি গদ্যছন্দের আশ্রয় নেননি। 'বন্দীর বন্দনা'-মুগ্ধ প্রায়-আঠারোর এই যুবক যখন কয়েকটি কবিতা নিয়ে পৌঁছেছিলেন বুদ্ধদেব বসুর কাছে, তখন ছন্দেই লিখতেন তিনি। কিন্তু— এই দুই কবিই তাঁদের স্মৃতিকথায় জানিয়েছেন—বুদ্ধদেবই তাঁকে পরামর্শ দেন 'নিয়মিত ছন্দের চেষ্টা ছেড়ে গদ্যে লিখতে' (সমর সেন , কেননা 'তার ছন্দের হাত টলোমলো' (বুদ্ধদেব)। এ অবশ্য সব অর্থেই নেপথ্যকাহিনী, চর্চাপর্বের সেই টলোমলো লেখা আমাদের কাছে এসে পৌঁছয়নি কখনো, তবে এ তথ্যটি পরে হয়তো আমাদের কাজে লাগতে পারে।

বুদ্ধদেব পরামর্শ দিয়েছিলেন গদ্যছন্দে লিখতে, এ পর্যন্ত ঠিক। কিন্তু সে-ছন্দ যে কোন্ সুর বাজিয়ে তুলবে, কী হবে তার ধরন, সে-নির্দেশ দেওয়া নিশ্চয় অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। গদ্যছন্দ একটা নির্বিশেষ কথা, তার তো কোনো নির্দিষ্ট ছাঁচ নেই, তাই সে-ছন্দের অনেক ভিন্ন এবং বিশেষ চেহারা তৈরি হতে পারে ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে, এমনকী একই কবি ভিন্ন মেজাজে তাঁর রচনায় আনতে পারেন ভিন্ন ভিন্ন চাল। 'সন্ধ্যা ও প্রভাত' 'সাধারণ মেয়ে' আর 'পৃথিবী', তিনটিরই ছন্দ গদ্য, কিন্তু একইরকম অবয়ব নয় রবীন্দ্রনাথের ওই তিন কবিতার। কতটাই প্রভেদ ঘটে যায় হুইটম্যানের লাইনডিঙোনো গদ্যকবিতার দীর্ঘ বাক্যে আর র‍্যাঁবো-র কবিতার টানা গদ্যে কিংবা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর অরুণ মিত্রের গদ্যছন্দে ! একই পরিবেশের একই উন্মাদ প্রজন্মের কথা বলবার জন্য গিনসবার্গের 'হাউল'-এ দরকার হয় 'I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving hysterical naked'-এর মতো দীর্ঘ লাইন, আর ফার্লিংগেত্তির দরকার হয় শ্বাসেপ্রশ্বাসে কাটা 'I fly and see America /

is mad mother / is being transformed in fillingstations / is Lucky Louie in two shoes...' ধরনের টুকরো টুকরো অংশ। গদ্যছন্দের কোন্ বিশেষ ধ্বনিরূপ কবি ব্যবহার করবেন, সেটা নির্ভর করে তাঁর নিজের নির্বাচনের ওপব।

তবে, এ নির্বাচন সবসময়ে সচেতন বুদ্ধির কাজ নয়। কবিতাসৃষ্টির মুহূর্তে সমস্ত শরীর থেকে আপনিই উঠে আসছে কোনো স্বর, স্ফূর্ত কোনো ছন্দকে কবি অনুভব করছেন তাঁর রক্তের মধ্যে, ফ্রস্টের মতো এ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় অনেক কবিরই ঘটে। নিজের কবিতা নিয়ে বিশেষ কথা বলতে চাইতেন না সমর সেন, কিন্তু তাঁর স্বল্প উচ্চারণের মধ্যেও তিনি বলেছেন কীভাবে বেশি রাতে মোমিনপুর থেকে হেঁটে ফিরতেন বেহালায়, আব পথচলতি 'ট্রামেব গতিছন্দে কবিতার অনেক লাইন মনে দানা বাঁধত'। ফলে তিনি অনুমান করেছেন যে ট্রামের গতিছন্দ হয়তো তাঁর গদ্যছন্দের মূলে ছিল। কিন্তু কীরকম সেই ট্রামের ছন্দ? সকলের কাছে তা অবশ্য একইরকম নয়, অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো শুনেছিলেন 'ঝড়ের সুর বাজাতে বাজাতে গেল / একটা মন্থর ট্রাম' কিংবা অন্য কোনো সময়ে 'রাত্রের শেষ ট্রাম / ঘ্যাংচাতে ঘ্যাংচাতে গুমটিতে ফেবে' অথবা 'একটা ট্রাম তার পেছনে পেছনে' তেড়ে গেল। সমর সেন যে ট্রামের ছন্দে একটা গদ্য-আশ্রয় পেয়েছিলেন, সেটা নিশ্চয় ঝড়ের চেয়ে ভিন্নতর কোনো সুরের জন্য, ঝাঁকুনিহীন তালহারা কোনো টানা সুর। এখানেও চকিতে একবার এলিয়টকে মনে পড়ে, মনে পড়ে 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড'এর 'Trams and dusty trees / Highbury bore me', মনে পড়ে যে সেই একই ক্লান্তিকে ধরবাব জন্য 'ট্রামবাসের বেতালস্পন্দন' বা 'ধাবমান ট্রেনের মন্থর শব্দ'র কথা মাঝে মাঝে বলেন সমব সেন।

ক্লান্তি বা মন্থরতাটাই এখানে তবে বড়ো কথা. তাঁর কবিতায় 'ধূসব'এর মতো আরো দুএকটি বহুব্যবহৃত শব্দ হলো 'মন্থব' বা 'দীর্ঘশ্বাস', আর সেই সূত্রেই তাঁর ছন্দের সঙ্গে ট্রামট্রেনকে মিলিয়ে দেখা যায়। তা নইলে, নিছক ট্রামের টানাধ্বনির কথা ভাবলে, দীর্ঘতর লাইনের স্পন্দনই বরং তাঁর কবিতায় প্রত্যাশিত হতে পারত। টুকরো টুকরো লাইনে গদ্যছন্দকে যেভাবে 'বেতাল' করে দিতে চেয়েছেন সমর সেন সেই বেতাল ধ্বন ঠিক ট্রামচলনের অনুষঙ্গ আনে কি না সন্দেহ। তবু, সে-চলন যে কীভাবে তাঁকে ঘিবেও রাখছিল ভিতরে ভিতরে, সেটা আরেকটু স্পষ্ট হয় তাঁর নিজেরই করা ইংবেজি অনুবাদগুলির দিকে তাকালে, যেখানে 'একটি রাত্রের সুর'-এর মতো চব্বিশটি ছোটো লাইনের কবিতাকে দীর্ঘতর চোদ্দ লাইনে সাজিয়ে দেন কবি, বা 'মহুয়ার দেশ' 'নববর্ষের প্রস্তাব'-এর মতো কবিতাগুলিকে সাজান দৃশ্যতই গদ্যে। এরই প্রসঙ্গে বরং ব্যবহার করা যায় তাঁর 'চার অধ্যায়'-এর লাইন : 'চারদিকে ঘেরে দীর্ঘছন্দে / সুদীর্ঘ অন্ধকার'।

ট্রামের কথা যদি ছেড়ে দিই, মূল কবিতার গদ্যছন্দে এই মন্থরতাকে ধরবার জন্য যে উচ্চারণভঙ্গি তিনি তৈরি করেন, নিছক ছন্দের প্রকরণে তার কি কোনো স্বাতন্ত্র্য ছিল? রবীন্দ্রনাথ যে সহজেই এর স্বরবৈশিষ্ট্য চিনতে পেরেছিলেন, লাইন-সাজানোর পদ্ধতির মধ্যে তার ইশারা ছিল কিছু? 'কবিতা'র প্রথম সংখ্যা থেকে তিনটি গদ্যকবিতার শেষ লাইনগুলি যদি দেখি:

১. জানি, তুমি আমায় ডাকবে—
(নীল বন কি কথা কয়ে উঠল—
আর মেঘের গায়ে গায়ে নেমে এল স্বপ্নরা?)
আমার চোখ নরম হয়ে আসবে ঘুমে, নীলিমা,
তোমাকে নয়, তোমার স্বপ্নকে পেয়ে।

২. কেতকীর গন্ধে দুরন্ত
এই অন্ধকার আমাকে কী করে ছোঁবে?
পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের সুদূর, নিঃসঙ্গ।

৩. একা চাঁদ আকাশে।
দূরের কোন্ বন উঠল চঞ্চল হয়ে।
পাতার ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়ল,
একটা হরিণ ঘুমভাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে।
আমার সময় যে কাটে না, সে নেই।

যে-অর্থে হুইটম্যান আর র‍্যাঁবো-র বা গিনসবার্গ আর ফার্লিংগেত্তি-র ছন্দোরূপের ভিন্নতার কথা বলা যায়, তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত নেই এ তিনটি অংশে। প্রায় একই বিন্যাসের পাঁচটি লাইনে অংশতিনটি সাজানো। নিছক ছন্দের বিচারে একই রকম এদের চেহারা।

কিন্তু তবু, একইরকম চরিত্র এদের নয়। পড়বার সঙ্গে সঙ্গে এদের একটা স্বর-স্বাতন্ত্র্যও যে বোঝা যায় তাতে সন্দেহ নেই। সে-স্বাতন্ত্র্য তৈরি হতে পারছে কিসে? এদের বাক্যের গড়নে, এদের শব্দের বিশিষ্টতায়। মধ্যবর্তী অংশটির প্রতি লাইনেই আছে এক বা একাধিক যুক্তবর্ণের আঘাত, আছে ক্রিয়াপদের স্বল্প প্রয়োগ। প্রথম বা দ্বিতীয়টির কথার ধরনে যদি লেখা হতো 'পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় আমি শান্ত হয়ে আছি' (যেমন 'একটা হরিণ ঘুমভাঙা চোখ মেলে তাকিয়ে আছে' কিংবা 'আমার চোখ ঘুমে নরম হয়ে আসবে, নীলিমা'), তাহলে হয়তো আরেকটু ধ্বনিগত সামীপ্য পেত লেখাগুলি। বাক্যেরই সংহতি এখানে ছন্দ-সংহতির মায়া তৈরি করে দিচ্ছে, আর সেইটেকেই আমরা ভাবছি গদ্যছন্দের

বিশিষ্টতা। গদ্যছন্দের তো কোনো নিয়মিত বাঁধা রূপ নেই, তাই শব্দ আর অন্বয় থেকে পাওয়া ধ্বনিতরঙ্গই তার চরিত্র হয়ে ওঠে, সেই ধ্বনির ভিন্নতার সঙ্গেসঙ্গেই ছন্দকেও তাই ভিন্ন বলে মনে হতে থাকে।

উদ্ধৃত অংশ তিনটির প্রথমটি লিখেছিলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, তৃতীয়টি বুদ্ধদেব, আর সমর সেনের লেখা ছিল দ্বিতীয়টি। কেবল এই অংশটিতে নয়, নিষ্ক্রিয় সমাজের মুমূর্ষাকে ধরতে গিয়ে সমর সেনের কবিতায় এই ক্রিয়াহীন খর্ব বাক্য-প্রয়োগের রীতি দেখতে পাব প্রায়ই :

১. কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস,
কত সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো,
আরো কত দিন !

২. স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস ;
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল, ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

৩. দীর্ঘ, দ্রুত যান—
বিদ্যুতের মতো :
কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
অন্ধকারের মতো সুন্দর,
অন্ধকারের মতো ভারি।

৪. দিনশেষে আজান ;
পড়ন্ত রোদ, পরে আদিম অন্ধকার,
তারপর আবার সূর্য,
প্রাচীন অথচ দীপ্ত,
স্থবির, যুবক যযাতি যেন ;
আলো, রোদ, অন্ধকার
দিনের পর দিন।

এবং এইরকমই আরো অনেক, যেখানে লাইনের পর লাইন চলছে, একটিও ক্রিয়া-পদ নেই, আর ক্রিয়াহীন এই বাক্যসংহতিতে তৈরি হয়ে উঠছে তাঁর গদ্যছন্দের সেই থমকলাগা কাটাকাটা ভঙ্গি, তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো পৃথিবী'র গম্ভীর গমক অথবা 'রাজার খাজনাবাকির দায়ে বিধবার বাড়ি যায়

বিকিয়ে'র লতিয়ে-পড়া দৈনন্দিনতা থেকে নিজেকে তা আলাদা করে নেয়। কিন্তু ওরই সঙ্গে, শব্দ বা বাক্যাংশের মুহুর্মুহু পুনরাবর্তনের ফলে ভিতরে-ভিতরে একটা লিরিকলাবণ্যও তৈরি হতে থাকে সমর সেনের কবিতায়। 'একটি রাত্রের সুর'-এ ফুলের গন্ধ আর কিসের হাহাকারের কথা যে ঘুরে ঘুরেই এসেছিল, সেটা তাঁর কবিতার একটা সাধারণ আবেশসঞ্চারী পদ্ধতি, এর মধ্য দিয়েই বাঁধা পড়ে তার দীর্ঘশ্বাস আর আবেগের চাপা মুহূর্তগুলি।

৩

অল্পদিনই কবিতা লিখেছিলেন সমর সেন। কিন্তু সেই অল্প কয়েক বছরের লেখা ঠিক একই জায়গায় থেমে থাকেনি, একটি বই থেকে অন্য বইতে পৌঁছবার পথে তাঁর বদলাবার ধরনটাও আমরা টের পাই। প্রথম দিকের স্মৃতিবিধুর টান অল্পে অল্পে কেটে যায় পরে, তার বদলে জেগে উঠতে থাকে একটা ঝাঁজ। ক্ষয়ের ছবির মধ্য থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে থাকে ভাবী সমাজের ইশারা, মহুয়া ফুলের আবেশ ছেড়ে দেখা দিতে শুরু করে 'তামাটে প্রান্তরে'র মানুষেরা, আর চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনের ক্লান্ত উর্বশী নৃত্যরতা হয়ে ওঠে 'কালের তপোভঙ্গে'। সময়ের একটা চাপ ছিল, ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ সাল ছিল দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক এক টাল-মাটালের সময়, তাকে লক্ষ করা অনিবার্য ছিল সমর সেনের পক্ষে। কিন্তু ঠিক যে-অর্থে সরল প্রগতির ভাবনাকে কবিতায় প্রতিফলিত দেখতে চান অনেকে, সে-অর্থে কবিতা লিখবার রুচি হয়নি তাঁর, বরং মনে হয়েছিল সেপথে আছে শুধু ভাবালুতা বা বাগাড়ম্বর। তরুণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতালেখা ছেড়ে দিয়েছেন ভেবে একচল্লিশ সালে যিনি বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন 'দুর্যোগে কে আর বাঁশি বাজাবে', পরের বছরের শেষে সেই তিনি লিখছেন : 'সুভাষকে গতবারে কলকাতায় বলেছিলাম যে কী যুদ্ধে কী কবিতায় সবচেয়ে দরকারি জিনিস হলো defence in depth, Maginot Line নয়। কয়েকটি সাম্প্রতিক লেখা পড়ে আমার ও ধারণা বদ্ধমূল হলো'। এ মন্তব্যের লক্ষ্য নিশ্চয় 'চিরকুট'-এর কোনো কোনো কবিতা। পঞ্চান্নজন কবির ফ্যাসিস্টবিরোধী কবিতাসংকলন 'একসূত্রে'কে যে তাঁর Waste and void মনে হয়েছিল, তাও হয়তো এই ম্যাজিনো লাইনের প্রখরতা দেখেই। কেবল বুদ্ধদেবকে নয়, ও-বই প্রসঙ্গে বিষ্ণু দে-কেও তিনি লিখেছিলেন বাঁকা সুরে : 'আপনারা বেশ আছেন। আপনারা জনযুদ্ধের বক্তা হিসেবে বাংলা কাব্যে যে বিপ্লব এনেছেন তার পরিচয় 'একসূত্রে' পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত আছি।'

চলতি প্রগতিপন্থী কবিতাবিষয়ে তাঁর আপত্তির, কিংবা সাধারণভাবেই বাম-পন্থীদের নিয়ে তাঁর অসহিষ্ণুতার একটা কারণ ছিল এই যে সমর সেন ভেবেছিলেন : কথা আর কাজের কোনো সামঞ্জস্য নেই কবিদের জীবনে। তীব্রভাবে আত্মসচেতন

তিনি, এবং ইতিহাসচেতন ; মার্ক্সবাদে তাঁর নির্ভরতা ; তবু বিষ্ণু দে-কে চিঠিপত্রে প্রায়ই লেখেন এইসব কথা : 'আপনারা যে রেটে বামপন্থী হচ্ছেন তাতে অশোক-বাবু এবং আমি বিচলিত এবং চিন্তিত' ···গালিগালাজ···আধুনিক বাংলা প্রগতি-সমালোচনার অন্যতম বিশেষত্ব' '··বামপন্থী বন্ধুরা যা বলতেন সেটা নির্বোধের আক্রোশ' 'বামপন্থী বন্ধুরা চুপ, দেশের অরাজক অবস্থায় তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কফিহাউসে সময় কাটাচ্ছেন'। ১৯৩৮ সালে 'In Defence of Decadence' নামের যে-প্রবন্ধটি নিয়ে একটা আবর্ত উঠেছিল, সেখানে সমর সেন লিখেছিলেন : 'We must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living'। এই কথারই প্রতিধ্বনি এসে পৌঁছয় কখনো বিষ্ণু দে-কে লেখা চিঠিতে ('আপনারো জীবনযাত্রা বদলানো উচিত'), কখনো-বা 'তিন পুরুষ'-এর কবিতার ব্যঙ্গে :

> জীবনযাত্রার গতি বদলাতে তাই
> বিশেষ আগ্রহ নেই, প্রয়োজনও দেখি না।

ম্যাজিনো লাইনের মধ্যে যদি সেই অগভীর আস্ফালন থাকে, তবে কবিতার 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ' পাওয়া যাবে কোন্ পথে ? সমর সেনের কবিতায় যে এর কোনো চূড়ান্ত উত্তর আছে তা নয়, তবে এটা লক্ষণীয় যে সময়বদলের সঙ্গেসঙ্গে তাঁর ছন্দোরূপও খানিকটা পালটাচ্ছিল। স্মৃতি থেকে ভবিষ্যতে এগোবার পথে, সংশয় থেকে আশ্বাসের পথে যত তাঁর নির্ভরতা বাড়ছিল, ততই বাড়ছিল একটা অন্তঃছন্দের প্রবণতা। 'তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসত্তাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে' : প্রথমদিকের কবিতা বিষয়ে বিষ্ণু দে-র এই অনুযোগ হয়তো এ-ব্যাপারে কিছু কাজ করেও থাকতে পারে। সমর সেনের গদ্যছন্দ বিষয়ে যে সাধারণ ধারণাটির প্রচলন আছে, সেটাকে ভেঙে দিয়ে অল্প খানিকটা ছন্দোবদ্ধতায় তিনি চলে যাচ্ছিলেন কখনো কখনো। এক হিসেবে হয়তো ওর মধ্যেও ছিল তাঁর 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ্'-এর প্রস্তুতি।

দ্বিতীয় কবিতার বই থেকেই গদ্যছন্দের ভিতরে ভিতরে দেখা দিতে শুরু করে-ছিল এইসব লাইন : 'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ নদী' 'পৃথিবীতে কবিতার শেষ নেই' 'বিকেলের আলো ঝরে, সোনালি চোখের রঙ / মেঘে মেঘে প্রতিদিন মৃত্যুহীন সৌন্দর্য ঘনায়' 'নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা' 'কিছু দূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য' 'ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে' 'নিঃসঙ্গ বট / যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধ প্রেত' এবং পরের বইগুলিতে এ-রকম আরো বেশ কিছু। অক্ষর-বৃত্তের চালে বসানো এ লাইনগুলি এতটাই ছন্দের আশা জাগায় যে বিষ্ণু দে এই তালিকার প্রথম লাইনটিকে আরো একটু প্রথাসিদ্ধ প্রসারে দেখতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন 'বিপুল আসন্ন মেঘে অন্ধকার স্তব্ধ মহানদী'র মাপসই আঠারো মাত্রা।

ছন্দ-অছন্দের মধ্যে একটা অনায়াস-গম্যতা রাখতে চেয়েছিলেন বলে সমর সেন নিশ্চয় ইচ্ছে করেই লিখেছিলেন 'নদী', ষোলোমাত্রায় থামিয়ে দিয়েছিলেন লাইন, সিগনেট-সংকলনে ছাপবার সময়েও বিষ্ণু দে-র পরামর্শকে তত আর গণ্য করেননি। পরামর্শ গণ্য না করার আরো একটি বড়ো উদাহরণ আছে তাঁর 'ক্রান্তি' কবিতার দ্বিতীয় অংশে। বিয়াল্লিশের আন্দোলন শুরু হবার পর দেশব্যাপী সরকারি জুলুমের মূর্তি দেখে, দিল্লির রক্তস্নান দেখে, চাঁদনি চকে স্বতঃস্ফূর্ত বিরাট জনসভার আয়োজন দেখে 'পিঁপড়ের পাখা' নামে যে কবিতা লিখেছিলেন তিনি, সেইটেই 'ক্রান্তি'র দ্বিতীয় অংশ। কিন্তু 'কবিতা' পত্রিকার জন্য পাঠাবার পর বুদ্ধদেব সে-কবিতার যে পরিমার্জনা করেছিলেন, তাতে বোঝা যায় সমর সেনের লক্ষ্যটা তাঁর কাছেও খুব স্পষ্ট ছিল না। গদ্যছন্দে লেখা সেই কবিতাটির মধ্যবর্তী কোনো কোনো লাইন ছিল স্পষ্ট অক্ষরবৃত্তের ছাঁদে বাঁধা : 'মাঝে মাঝে বিচলিত অন্ধকারে প্রহরীর ডাক / রাত্রির স্তব্ধতা ভাঙে', আর সেইটে দেখেই হয়তো বুদ্ধদেব পুরো কবিতাটিকেই পালটে দিয়েছিলেন অক্ষরবৃত্তে। এ কবিতা দেখেও কি তিনি ভাবছিলেন যে ছন্দের হাত টলোমলো বলেই বাকি অংশগুলিতে ছন্দ আনতে পারেননি সমর সেন? কবিতাসংগ্রহে কবিতাটি ছাপা হবার সময়ে সমর সেন কিন্তু তাঁর পুরোনো গদ্যপদ্যের মিশ্র মূলটিতেই ফিরে গেছেন আবার, বুদ্ধদেবের শোধিত দুএকটি লাইন মেনে নিতে যদিও তাঁর আপত্তি হয়নি।

কেবল মধ্যবর্তী বা অন্তবর্তী একটিদুটি লাইনে নয়, 'তিন পুরুষ' পর্যন্ত পৌঁছে আমরা বেশকিছু কবিতা পেয়ে যাব যা পুরোপুরিই ছন্দে লেখা, এবং অনেক সময়ে তাতে মিলও আছে। ততদিনে, প্রায় দশ বছরের গদ্যছন্দ চর্চার পরে, পুরোনো সেই টলোমলো হাতেরই যখন ব্যবহার করছেন আবার, তার পিছনে নিশ্চয় এবার কোনো পরিকল্পনার জোর ছিল। তখন আমরা দেখি 'স্তোত্র'র মতো কবিতা, যেখানে লাইন সাজানো আছে প্রায় শ্লোকের চেহারায়, যেখানে মহাজন আর চাষীর সম্পর্কসূত্রে আসে এইসব কথা :

> সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
> রাত্রি এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে ॥
> মহাজন গান গায়, নদারৎ ধান।
> অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান ॥
> অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বরকথনে।
> প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে ॥

একে কারো হঠাৎ মনে হতে পারে ঈশ্বর গুপ্তের ছন্দোজগতে ফিরে যাওয়া, যেমন একবার মনে হয়েছিল বুদ্ধদেবের। কিন্তু বহমান সামাজিক শঠতাকে আক্রমণ করবার জন্য, ব্যঙ্গকে ধারালো করবার জন্য, শ্লোকবদ্ধ এই পুরোনো কাব্যরূপ

(অথবা এর তুল্য আরো নানা ধরন) তো কখনো কখনো একটা শক্তি হয়েই আসতে পারে ? তারই একটা চেষ্টা আছে বলে এসব লেখা কবির ফর্ম-সচেতনতারই পরিচয় দেয়। এই একটিমাত্র কবিতা নয়, কালের-যাত্রা[১] অকাল বাবু-বৃত্তান্ত[২] বিকলন ২২শে-জুন[৩] গৃহস্থবিলাপ নাচিকেত—এই সবই সেখানে পূর্ণ ছন্দে গাঁথা হয়ে আসে। এর মধ্যে পরিকল্পনা কতটাই স্পষ্ট তা আরো বোঝা যায় যদি লক্ষ করি যে 'গৃহস্থবিলাপ'-এর পাঁচটি অংশ সাজানো আছে ১/৩/৫ আর ২/৪-এর স্বাতন্ত্র্যে ; ১/৩/৫ ছন্দোময় আর ২/৪ আছে ছন্দে-অছন্দে মেলানো তাঁর নিজস্ব ধরনে।

৪

গদ্যছন্দ থেকে ঈষৎ ছন্দোবদ্ধতায় এগোবার এই ইতিহাসের একটা তাৎপর্য হয়তো আছে। অনেকসময়ে আমরা ধরে নিই যে সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ জীবনের কথা বলবার জন্যই দরকার হয় গদ্যকবিতার, যেন বাস্তবতার দাবির সঙ্গে একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে গদ্যছন্দের। ছন্দ বা মিলকে অনেকসময়ে আমরা ধরে নিই কৃত্রিম আর শিল্পিত, সেখানে কেবল রোমান্টিকতার বা ভাবালুতার প্রশ্রয় আছে বলে ভাবি, তাকে ছেড়ে দিয়ে দৈনন্দিনে পৌঁছতে চাই বলেই আধুনিক সময়ে গদ্যছন্দকে অনেকে ভাবেন অপরিহার্য। কিন্তু এই ধারণার মধ্যে একটা মস্ত ভুল আছে মনে হয়। গদ্যছন্দ যে-দৈনন্দিনকে ধরে, সে হলো একধরনের মধ্যশ্রেণীর দেখা মধ্যশ্রেণীর জগৎ। এর সমস্ত শিল্পসম্ভাবনার কথা মনে রেখেও বলা যায় যে গদ্যছন্দের মধ্যে বরং এক বৃত্তবদ্ধতাই আছে, আছে ঈষৎ এলিটিজ্‌ম্-এরও ছোঁয়া। সহজ মানুষের রক্তের মধ্যে যে দোলা বা ছন্দের জন্য প্রচ্ছন্ন প্রত্যাশা আছে, সেটা সাড়া পায় বলেই অদীক্ষিত সাধারণ মানুষের কাছে লৌকিক ছন্দের এতটা টান হতে পারে। পথচলতি মানুষ সেই ছন্দের আলোড়নে বরং অনেক বেশি ছুঁতে পায় দৈনন্দিনকে।

দেশে-দেশান্তরে 'তান্ত্রিক স্তব্ধতা'র পরিবেশের মধ্যে যেখানে এখনো নবাবী আমলের পেয়ালা বাজে, সেখানে সমর সেন কেবলই বলতে চান 'আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও'। শ্রেণীত্যাগে বাঁচবার আশা আছে বলে, কর্মী মানুষের সাধারণ্যে আর বিশ্বাসে ফিরতে চান বলেই 'এক একদিন যন্ত্রসংগীতের শব্দ স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে'। যতই এসে পৌঁছয় 'পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের' ততই সরে যায় স্তব্ধতা। তখন ছন্দোহীনতা থেকে ছন্দের দিকেই এগোবার ইচ্ছে হয় তাঁর।

১ এ কবিতাটি 'সমর সেনের কবিতা'য় বর্জিত।
২ 'আনন্দমঠ' নামে এর প্রথম সাতটি লাইন আছে চলতি বইতে, বাকি সাতাশ লাইন বর্জিত।
৩ 'তিন পুরুষ'-এর পাঠে এ কবিতার কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে।

'গৃহস্থবিলাপ' কবিতার সবটাই তখন আর বিলাপ থাকে না, ছন্দোবদ্ধ অংশগুলিতে দেখা দেয় সংকল্পের উচ্চারণ, 'আমার পরমা যতি' হিসেবে যথার্থ 'কালের সারথি'-দের 'দোস্তি' খোঁজার কথা।

কিন্তু সংকল্পের সঙ্গে জীবনযাপনের কি সামঞ্জস্য করতে পারেন তিনি? ইচ্ছের সঙ্গে অভ্যাসের সামঞ্জস্য? যাপনের যে 'reconstruction'-এর কথা তিনি লিখেছিলেন ১৯৩৮ সালের প্রবন্ধে কিংবা ১৯৪৩ সালের চিঠিতে বা কবিতায়, তাঁর নিজের জীবনে কি পাচ্ছিলেন সেটা? বিষ্ণু দে যখন মণীন্দ্র রায়ের 'একচক্ষু' বইটির সমালোচনায় লিখেছিলেন যে তাঁর কাব্যচৈতন্য 'মার্ক্সিস্ট অবৈকল্য' বা 'চৈতন্যের অখণ্ডতা' পেয়েছে, সে-কথাগুলিকে তখন পরিহাসই করেছেন তিনি। বিষ্ণু দে-কে লিখেছেন 'মার্ক্সিস্ট অখণ্ড চৈতন্যের কথা কী লিখেছেন···চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে হয়েছে'; বুদ্ধদেবকে লিখেছেন 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৯ই অগস্টের পর মার্ক্সিস্টদের "অখণ্ড সত্তা" কিছু আলোড়িত হয়েছে'; আর সমকালীন 'তিন পুরুষ'-এর 'সাফাই' কবিতায়:

আর্টের কৈবল্য শুধু, অখণ্ড চৈতন্য শুধু,
আত্মচর্চার ধারালো সিঁড়ি ধাপে ধাপে উঠে
প্রাণের গম্বুজে আমার এ যাত্রা
আমার এ উর্ধ্বগতি সবাই দেখুক,
প্রগতিকেরা বিশেষ করে; দিক হাততালি।

এসব বলেছেন বটে, কিন্তু এও ঠিক যে তিনিও 'ক্রান্তি'র মতো কবিতায় কারখানার সংঘবদ্ধ ভিড়ের সামনে বলতে চান 'তোমার অখণ্ড সত্তায় দাও অধিকার / এ প্রার্থনা আমার'। অখণ্ডতা যে কোথায় সেটা বুঝবার জন্য, সেই সত্তার দিকে এগোবার আগ্রহেই লেখা হতে পারে তাঁর ছন্দোবদ্ধ কবিতার এইসব লাইন—কালের যাত্রায় তিন পুরুষের মধ্যে এই তৃতীয় পুরুষের সম্ভাবনা—

প্রায় পথের ভিখিরি, চালচুলোহীন,
অতীত সঞ্চিত গ্লানি ঘর অসংকোচে
সে মুছবে; আশা করি বজ্রগর্ভ ভবিষ্যতে
নতুন বিপ্লব গান সমষ্টি আদরে
সে শুনবে। কালরাত্রি দীর্ণ ক'রে দিনের মজুর
লোহিত সকাল আনে প্রায় বেকসুর।

লেখেন বটে এসব কথা, কিন্তু কবিতার স্বরে ঠিক সংগতি আসে না। সেদিনকার তরুণ কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় একটা আপত্তি তুলেছিলেন এই বলে যে 'প্রায় পথের ভিখিরি'-র ২-৩-৩ অক্ষরবিন্যাস 'পয়ারের প্রায় অসীম সহিষ্ণুতা'কেও যেন টপ্‌কে গেছে। ছন্দের স্বাভাবিক চালের মধ্যে ইচ্ছে করেই কিছু উপলবন্ধুরতা

আনছেন ভেবে একে হয়তো একরকম সমর্থন করাও চলে, কিন্তু তবু সত্যি যে এ লেখায় ছন্দের টলোমলো ভাবটাও ফুটে ওঠে 'সে মুছবে' 'সে শুনবে' অংশগুলিতে। লোকপরিচিত ছন্দের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন কবি, কিন্তু এর ওপর তাঁর দখল সম্পূর্ণ হয়নি তখনো। ওই কবিতাংশের বিরুদ্ধে আরো একটা বড়ো আপত্তি হতে পারে তাঁর নিজেরই বলা সেই ম্যাজিনো লাইনের কথায়। কবিতার শেষ লাইনে 'লোহিত সকাল'টি যেন সযত্নচেষ্টিত সেই ম্যাজিনো লাইন, বেশ বানানো ঠেকে সেটা। এর তুলনায় অনেক সত্য 'ডিফেন্স ইন ডেপ্‌থ্‌' ছিল বরং আদিপর্বের 'ইতিহাস' জাতীয় কবিতার সেইসব সকাল, যেখানে বলা যায়

> তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এসো,
> যেখানে প্রভাতের রক্তিম আশা কাঁপছে
> যেখানে আসে রাত্রের পাহাড়ে ঘননীল আভাস
> নামে সমুদ্রের গভীর অন্ধকার,
> আর তারারা জ্বালে তীব্র, নীল আগুনের শিখা
> আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।

যেখানে ক্লান্তি অন্ধকার রাত্রি নিঃসঙ্গতার মধ্যে জড়িয়ে আছে বলেই এই সকালটা আর সাজানো লাগে না, হয়ে ওঠে একেবারে প্রাকৃতিক।

নিছক সাধারণের জীবনকে ধরবার যোগ্য কোনো ভাষাছন্দের দিকে এগোতে চেয়েছিলেন কবি সমর সেন, কিন্তু সেই ভাষাছন্দ ঠিকমতো তাঁর অধিকারে আসেনি, কেননা মধ্যশ্রেণীর গণ্ডির মধ্যে কাটছিল তাঁর জীবন। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ভাষায় তিনি লিখতে পারতেন আরো কবিতা, কিন্তু সেই কবিতায় তাঁর রুচি ছিল না, কেননা কাজে-ভাবনায় সমন্বিত নতুন জীবনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে। 'কৃত্তিবাস'-এর যে-প্রবন্ধটির কথা বলেছি আগে, সেখানে তিনি লিখেছিলেন 'গোষ্ঠী থেকে সমাজে বেরোবার তাগিদ'-এর কথা। নতুন চীনের আবির্ভাবে, রুশ ফরাসি তুর্কি চিলির কবিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে একটা বিস্তার আর মানবিকতার প্রকাশ হয়তো দেখা যাবে বাংলা কবিতায়, লিখেছিলেন এই তাঁর প্রতীক্ষার কথা। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর কবিতায় পুরোনো অভ্যাস আর নতুন আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো শিল্প-সামঞ্জস্যে পৌঁছতে পারছিলেন না বলে বিদায় নিলেন সেই জগৎ থেকে।

আর এই বিদায় নেওয়ার মধ্যে আছে তাঁর সেই সাহসিক পুনর্নির্মাণের ইঙ্গিত, তাঁর সেই বহুপ্রত্যাশিত reconstruction। 'সমর সেনের কবিতা' বইটির বিখ্যাত শেষ লাইন ছিল 'বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে'। ভিন্ন অর্থে সত্যি হয়েছে এই লাইন। তাঁর অস্তিত্বের পুরোনো অভ্যাস আর নিরাপত্তা-আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত

অংশটিকে তিনি নির্বাসনে দিয়েছেন কাশীধামে ; আর পুনর্নির্মীয়মাণ এক সত্তায় নিজেকে তিনি লিপ্ত করেছেন তাঁর স্বপ্নেদেখা সমাজসৃষ্টির কাজে, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদনায়। ঝড়ের যে নিঃশব্দ সঞ্চারণের কথা ছিল প্রথম কবিতার বইতে, শব্দের তীব্র আঘাতের যে প্রতীক্ষা ছিল, তার একটা সাময়িক আসন্নতা তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন তাঁর চার পাশে, সত্তরের দশকের উদ্‌বেলতায়। কবিতার জগৎ থেকে নিঃশব্দে সরে গিয়ে এই উদ্‌বেলতার সঙ্গে যেভাবে নিজেকে তিনি মিলিয়েছিলেন, তাকেও বলা যায় একটা সৃষ্টিরই জগৎ, সংঘাতের আন্দোলনের উদ্দীপনার সৃষ্টি। মণিভূষণ ভট্টাচার্যের মতো তরুণতর কোনো কবি তাই বলতে পারছিলেন 'এখন কেবল ফ্রন্টিয়ারে গদ্য পড়ি সমর সেনের', কবিতা-থেকে-সরে-আসা সমর সেনের মধ্যে তাঁরা খুঁজে পাচ্ছিলেন আরেকরকম প্রেরণা ; তাঁদের জীবনের, তাঁদের স্বপ্নের প্রেরণা। তাই কবিতার জগতে তাঁর দীর্ঘকালীন নীরবতার মধ্যেও একটা ছন্দ থেকে যায়, পুনর্নির্মাণের সেই ছন্দ, আর সেদিকে তাকিয়ে তাঁর প্রথম কবিতাটির মতো আমরাও হয়তো বলতে পারি : 'মাঝে মাঝে চকিতে যেন অনুভব করি / তোমার নিঃশব্দতার ছন্দ'।

রণজিৎ গুহ

শান্তি নেই

সমর সেন, সমরদা, চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই তাঁর সম্পর্কে কিছু লেখা অসম্ভব। অন্ততঃ আমার পক্ষে। বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও তিনি আমার কাছে এতই সমকালীন, এতই প্রখর তাঁর উপস্থিতি এই মুহূর্তটির সমস্ত বেগ ও সম্ভাবনার মধ্যে যে তাঁকে অতীতের উপাদানমাত্র মনে করে কলম ধরতে পারছি না এখনও। তাৎ-ক্ষণিকতা থেকে যে দূরত্ব অভিজ্ঞতাকে অতীতে পরিণত করে এবং যারই প্রভাবে ঐতিহাসিক দৃষ্টি প্রসারিত হয় দূর থেকে দূরে, সেই নৈসর্গিক ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি যেন এখনও বিদ্যমান আমাদেব বুদ্ধিতে, আমাদের বেদনায়। কারণ মানবিক ব্যবহার যদিও কালাত্মক, তবু তা শুধু বাহ্য প্রকৃতির নিয়মেই বাঁধা নয়; কালাত্মক ব্যবহার, ভর্তৃহরি বলেছেন, জ্ঞানানুগতও বটে। সমরদার জীবন ও ব্যক্তিত্ব এখনও সাম্প্রতিকতায় সজীব। একদিন তিনি মারা যাবেন; আমরা তাঁর কথা যা জানি তা তখন কেবল স্মৃতির. সুতরাং সমর সেন প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক রচনার বিষয় বলে গণ্য হবে। সে রকম লেখার সময় এখনও আসেনি। আমি শুধু সেই সমরদার কথা লিখতে চাই যিনি এখনও একান্তই নিকটবর্তী আমাব পরিপ্রেক্ষিতে. জীবদ্দশায় যাঁর স্নেহ আমাকে ধন্য করেছে, যাঁর মৃত্যুশোক আমাকে আচ্ছন্ন করে আছে।

কিন্তু কী লিখব? যাই লিখি তাতেই সেই প্রকাণ্ড অস্তিত্বের সমগ্রতা খণ্ডিত হবে, জটিলতা চিত্রিত হবে সরলরেখায়। তবে তা হয়তো অনিবার্য। কারণ যে-কোনও মহৎ জীবনই তাব বর্ণনার চেয়ে বড়ো। যদি সে বর্ণনা আত্মজীবনীও হয়, তবুও। যেমন. 'বাবু বৃত্তান্ত'! সেখানেও কি আকৃতির সত্যটি ঠিক ধরা পড়েছে প্রতিকৃতিতে? যদিও আত্মকথার নায়ক ও লেখক দুজনেই উত্তমপুরুষের একবচনে লীন এবং বাচ্য ও বাচকের উভয় ভূমিকায় 'আমি' শব্দের দ্বৈতলীলার ফলে মূলের সঙ্গে বর্ণনার ও আকৃতির সঙ্গে প্রতিকৃতির পার্থক্য সেক্ষেত্রে প্রায় অবান্তর. তবু প্রশ্নটা থেকেই যায়।

প্রশ্নটা আমাব মনে এসেছিল 'বাবু বৃত্তান্ত' পড়েই। 'বাবু' শব্দটির কাজ তো এখানে শুধু লেখকের নিজ শ্রেণীসত্তাকে ব্যঙ্গ করা? আয়নায় ভেঙ্‌চি কেটে কি বাবু হয়ে জন্মানোর ভুল শোধরানো যায়—যদি তা ভুলই হয়? আর ভুল যখন হয়েছেই তখন কবিতায় বা আত্মকথায় তা নিয়ে নালিশ করে কী হবে? অপরাধ-বোধকে তারস্বরে জাহির করলেই কি অপরাধ স্খালন হয়?

বইটির একটি কপি (যা তখনই প্রায় দুষ্প্রাপ্য) তার দিনতিনেক আগে কোথা

থেকে জোগাড় করে সমরদা সস্নেহে আমার হাতে দিয়েছিলেন ; ১৭.১২.৭৯ তারিখের উপর তাঁর স্বাক্ষর প্রথম পৃষ্ঠায়। আর আমি তা পড়েই বললাম, 'নামটা ভালো হয়নি। আপনি নিজের বাবুত্ব নিয়ে সেই ছেলেবেলা থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন খালি। বাবু বলে নিজেকে ঠাট্টা করলেই কি বাবুজন্ম ঘুচবে ?' শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সমরদা বললেন, 'ঠিকই বলেছেন'। বলতে বলতেই কে একজন এসে গেল, কথার মোড় ঘুরে গেল। কেন তিনি ভেবেছিলেন যে আমি ঠিক বলেছি বা আদৌ তা ভেবেছিলেন কিনা, তাও তাঁকে আর জিজ্ঞেস করা হয়নি।

এখন আমার মনে হচ্ছে, ঠিক বলিনি। যে শব্দটিকে আমি তাঁর আত্মগ্লানির সাক্ষী বলে ভেবেছিলাম তা হয়তো তাঁর অস্তিত্বেরই বিশ্বস্ত সংকেত। যে-আখ্যায়িকার বাচক ও বাচ্য তিনি নিজেই, সেখানে ঐ সংকেতটির কাজ শ্রেণীসত্তা থেকে আখ্যায়কের ব্যক্তিত্বকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর নিঃসঙ্গতাকে ব্যক্ত করা। এক কথায়, 'বাবু বৃত্তান্তের' লেখক শিরোনামাতেই তাঁর অস্তিত্বের ঐতরিকতা ঘোষণা করলেন। বাবু হয়ে জন্মেছি, কিন্তু বাবুজীবন অসহ্য—এই রকম একটা ঘোষণা। এই অর্থে 'বাবু' শব্দটি একটি উন্মূলিত, কিন্তু উন্মূলিত বলেই অসুখী, একাকিত্বের নিশানা।

নিশানাটি অনেক পাঠকেরই চেনা। কারণ ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৭ সালে, অর্থাৎ আঠারো থেকে একুশ বছর বয়সের মধ্যে প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাগুলিতেই সেই ঐতরিক অস্তিত্বের উল্কি কাটা হয়েছিল যৌবনবেদনার নানা নক্‌শায়। 'আমার অন্ধকারে আমি / নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ' (স : ২৩)। নিরালোক আমিত্বের প্রধান শর্ত যে নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দ্য তার কথা তখনকার সেই পঁচিশটি কবিতার প্রায় প্রত্যেকটিতেই বারবার উচ্চারিত হয়েছে। আশমান-জমিন জুড়ে এক বিশাল একাকিত্বের উৎপ্রেক্ষা সেখানে 'আকাশের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়' (স : ২১) এবং 'নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়' (স : ১২)।

নৈঃশব্দ্যও সেই অন্ধকার সত্তার আরেকটি লক্ষণ। অন্ধকারের ভারে আকাশ নিঃশব্দ ; নিঃশব্দ কান্না ঝরে মুহূর্তগুলি থেকে ; চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায় শোনা যায় মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ (স : ৩১, ২৫, ১১)। স্তব্ধতাই মৃত্যুর প্রতীক, ভাষা জীবনের। তাই মিলন যদি জীবনের উৎস হয়, বিচ্ছেদ স্বভাবতই বোবা। আঠারো বছর বয়সের যন্ত্রণায় নীরবতা তাই নিঃসঙ্গতার সঙ্গী : 'কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে / আমাকে একলা ফেলে ? / কেন তুমি চেয়ে থাক ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো ? / ···আমাকে কেন ছেড়ে যাও / মিলনের মুহূর্ত থেকে বিরহের স্তব্ধতায় ?' (স : ১১)

যে অভাববোধের নিদর্শন এই সঙ্গীহীন ও শব্দহীন জগৎ, আমিত্বের অন্ধকারে আমি নিজেই যেখানে অচেনা, তার উৎস ঐতরিকতায়; এবং ঐতরিকতা তো পরত্বেরই প্রকারভেদ মাত্র। 'তর্কসংগ্রহ'-প্রণেতা অন্নংভট্টের মতে পরত্ব-অপরত্ব বোধ দুরকমের হয়: 'তে দ্বিবিধে। দিক্‌কৃতে কালকৃতে চেতি।' দিক্‌কৃত বা দৈশিক; কালকৃত বা কালিক। নিঃসঙ্গতার ধর্ম দৈশিক: যে দেশগত সন্নিকর্ষ না হলে সঙ্গলাভ সম্ভব নয়, তারই অভাবকে বলা হয় সঙ্গীহীনতা। তেমনি নিস্তব্ধতার ধর্ম কালিক. কালগত সন্নিকর্ষ না হলে ভাষার সংকেতগুলিকে পরম্পরানুযায়ী সাজানো যায় না শব্দে বা বাক্যে, তাই সন্নিকর্ষের সেই বিশেষ অভাবই ভাষাহীনতার আরেক নাম।

এই উভয় ঐতরিকতার চরম অভিব্যক্তি শূন্যতায়, কারণ শূন্যই সব অভাবের সম্পূর্ণতার প্রতীক। সমরদার কবিতায় তাই মহাকাশ, মরুভূমি ও মৃত্যু—এই ত্রিবিধ শূন্য একই বাঁশির তিনটি রন্ধ্রের মতো ঐতরিক ফুৎকারকে বাজাচ্ছে কখনো বিষণ্ণতায়, কখনো বা উদাসীনতায়। আকাশ ও মরুভূমি যে শূন্যতার দৈশিক উপমা তা বলাই বাহুল্য। মহাকাশ ও মহাশূন্য আমাদের অভিধানে সমার্থক। আর মরুভূমি দেশবিশেষ হলেও মানুষের সঙ্গ সেখানে দুর্লভ, কারণ তার উত্তাপে ও ঊষরতায় প্রাণের বীজ অঙ্কুরিত হতে পারে না। মরুভূমি যেমন প্রাণের অবধি দৈশিক অর্থে, মৃত্যু তেমনি তার অবধি কালিক অর্থে। ভাষা কালাত্মক বলেই যা নিষ্প্রাণ তাই নিঃশব্দ, এবং 'শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর' যখন 'অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।'

শূন্যতার এই মীড় ও মূর্ছনার কথা মনে রেখেই সমরদা পরিণত যৌবনের একটি বিখ্যাত কবিতায় লিখেছিলেন (স: ১৩৯-৪০), 'পুরোনো দিন ফেরে না কোনো-দিন', এবং তখন, তিরিশ বছর বয়সে, মাত্র দশ-বারো বছর আগেকার সেই অভাববোধকে ধিক্‌কার দিলেন এই বলে: 'শুনি না আর সমুদ্রের গান / ··· / ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি / একদা দিগন্তে দেখা উদ্যত পাহাড় / ··· / রোম্যান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।' এর পরেই আত্মশ্লেষে ভরা সেই দুটি লাইন যা এখন সুভাষিতের মতো মুখে মুখে ঘোরে: 'যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে / বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে।' রোম্যান্টিক ব্যাধি আর তার শিকার যৌবনকে যেন পয়ারের বোলে খোল বাজিয়ে ঘাটে তুলে দিয়ে আসা হলো।

কিন্তু যে আঠারো বছর বয়স তিরস্কৃত হলো তিরিশ-বছর বয়সের কাছে সে কি সত্যিই ব্যাধিগ্রস্ত ছিল? তখনকার কবিতাগুলি রোম্যান্টিক অবশ্যই, কিন্তু রোম্যান্টিকতা কি শুধুই একটা রোগের নাম? নিদানটা হাতুড়ে বলে মনে হয়

রোম্যাণ্টিকতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ উনিশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের কথা ভাবলে। যন্ত্রের ও যন্ত্রশিল্পের জয়, উৎপাদিকা শক্তির অভূতপূর্ব প্রসার, এবং উৎপাদনের উপায় যাদের হাতে ও মজুরীর বদলে যারা মেহনত দিয়ে উৎপাদনকে সফল করে তাদের শ্রেণীসংঘাতের ফলে তখন যে ঘোর বিপ্লব চলছে ইংল্যাণ্ডের সমাজে ও অর্থনীতিতে, ভাবজগতে তার অন্যতম লক্ষণ, বলা যায় প্রধান লক্ষণ, ধনিকস্বার্থের অনুকূল চিন্তা ও মানসিকতাকে প্রাধান্য দেবার চেষ্টা। কারণ ক্ষমতা কখনোই সর্বেশ্বরতায় পরিণত হয় না যদি না ক্ষমতালাভের বাস্তব ভিত্তির সঙ্গে সঙ্গে তৈরি না হয় তারই পরিপূরক, অথচ নিয়ামক, জীবনদর্শনের বনিয়াদ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধনতন্ত্র যখন সে দেশে তার সর্বেশ্বরতা প্রতিষ্ঠার জন্য মরীয়া হয়ে লড়ছে তখন বুর্জোয়া জীবনদর্শনও তাতে সামিল হয়েছিল তার ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সব হাতিয়াব নিয়ে। চিন্তায়, ভাবনায়, লেখায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে যে গুণ বা উপাদানই ধনতন্ত্রের প্রতিবন্ধক তা উৎখাত করা বা সংস্কার করে তাকে ধনতন্ত্রেরই কাজে লাগানো ছিল সেই জীবনদর্শনের উদ্দেশ্য। ফলে একদিকে যেমন নষ্ট হলো সামন্তবাদের তেজ (যা সতেরো শতকের রাষ্ট্রবিপ্লবের পরেও কিছু অবশিষ্ট ছিল), অন্যদিকে তেমনি হিতবাদ ও পণ্যপূজার প্রভাবে মানবিক সম্পর্ক-গুলিকে নিছক বৈষয়িক লাভলোকসানের খতিয়ানে পরিণত করার প্রবৃত্তি এবং সমাজ উন্নয়নের নামে ব্যক্তিস্বার্থের হিংস্র প্রতিযোগিতা ইংরেজের বুদ্ধিকে একে-বারেই অভিভূত করে ফেলে। সেই অবস্থায় যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সৃজনী প্রতিভার, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সুতরাং বহুধা বিভক্ত বিশ্বদৃষ্টির বিরুদ্ধে অধ্যাত্মবাদী হলেও) একধরনের ঐক্যবোধের, এবং অতিহিসেবি তথ্যদাসত্বের বিরুদ্ধে স্বাধীন কবি-কল্পনার স্বপক্ষে প্রতিবাদী শক্তি বলতে শুধু রোম্যাণ্টিক সাহিত্যই। সেই ঐতি-হাসিক সন্ধিক্ষণে রোম্যাণ্টিকতা পলাতক মনোভাবের সাক্ষ্য তো নয়ই , বরং হিত-বাদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তার ভূমিকা পাল্টা জীবনদর্শনের সাহসিকতায় গরীয়ান। প্রতিবাদী বলেই সে যুগের রাজনীতিতে শেলীর কবিতা প্রগতিশীল বলে মান্য। তবে, কোনো সন্ধিক্ষণই এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। রোম্যাণ্টিকতাও শেষ পর্যন্ত প্রতিবাদ ছেড়ে পলায়নের দিকে ঝুঁকেছিল। সামগ্রিক চৈতন্যের আওয়াজ আমিত্বের নৈঃশব্দ্যে পরিণত হয়েছিল, সমাজসংসার ত্যাগ করে কবিতা আশ্রয় খুঁজেছিল নিঃসঙ্গতার কাশীধামে। কিন্তু প্রৌঢ়ত্বের সেই পলায়নপরতার অপরাধে যৌবনের সাহসিকতা যদি অস্বীকৃত হয় তাহলে আর ইতিহাসের মান থাকে না।

আমার যেন মনে হয় যে তিরিশ বছর বয়সের আত্মগ্লানির প্রকোপে সমরদা তাঁর আঠারো বছর বয়সের রোম্যাণ্টিকতার সুস্থ দিকটা অযথাই উপেক্ষা করেছেন। অথচ সেই রোম্যাণ্টিকতাও তো উত্তাপ সংগ্রহ করেছিল এক ঐতিহাসিক সন্ধি-

লগ্নের অগ্নিকুণ্ড থেকে। ১৯৩৪-৩৭ সালকে সমাজের ইতিহাস এবং কবির অস্তিত্বের ইতিহাস—এই দুই অর্থেই সন্ধিষ্ঠ বলা চলে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ও সামাজিক অর্থে। তিরিশ দশক, যার সুরু হয় ধনতন্ত্রের দুনিয়াজোড়া অর্থসংকটে এবং শেষ সেই সংকটেরই রাজনৈতিক পরিণতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, তার ঠিক মাঝামাঝি ঐ সময়টায় সংক্রান্তির ঘোর লেগেছিল। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সঙ্গে বাধ্য হয়েই গাঁট-ছড়ায় বাঁধা এদেশের উপনিবেশিক অর্থনীতিতে সংকটের করাল প্রকাশ তখন গ্রাম-সমাজের সর্বনাশে। তার তীব্রতা ও তিক্ততাব অন্যতম সাহিত্যিক নজির হিন্দীতে প্রেমচন্দের 'পুস্ কি রাতের' (১৯৩৬) মতো গল্প ও 'গোদানের' (১৯৩৬) মতো উপন্যাস, এবং বাংলায় মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬) ও 'পুতুলনাচের ইতিকথা' (১৯৩৬)। এই অবস্থায় সমগ্র জাতিকে দেশব্যাপী সংগ্রামে সামিল করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে গান্ধীজী ও কংগ্রেসের উদ্যোগে যে অসহযোগ আন্দোলন সুরু হয়েছিল তা আপোষেই শেষ হলো। অথচ সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার মতো আর কোনো রাজনীতিই তখন যথেষ্ট শক্তিশালী নয়—না সন্ত্রাসবাদ, না সমাজবাদ। তবু উচ্চবর্গের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় হতাশ হয়েও অনেকে জঙ্গী লড়াইয়ের সম্ভাবনা দেখেছিলেন লালনিশানের সংকেতে, যদিও সে নিশান তখনো শুধু আঞ্চলিক ও খণ্ড প্রতিরোধের প্রতীক। 'তখন বিদেশে হিটলার ও মুসোলিনির দৌরাত্ম্য ক্রমশ বেড়ে চলেছে, স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হ'ল, প্রথম পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হবার পর রাশিয়া যুক্তফ্রন্টের আহ্বান অক্লান্তভাবে ক'রে চলেছে। দেশে গান্ধীজীর আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর অবসাদ, নেহরু সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন সভাসমিতিতে, গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষবাবুর মতভেদ হ'ল' (বা : ২৫)। আবার এই অবস্থার মধ্যেই 'ওদিকে হাওয়ায় বর্ধমান শব্দ : / কারখানায় ধর্মঘট, / গ্রামে খাজনা বন্ধ কর, / জমিদার, বণিক বরবাদ, / ইন্‌কিলাব্ জিন্দাবাদ, অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' (স : ৬৮)।

সব মিলিয়ে তখনো দেশের রাজনৈতিক চেতনার স্রোতে একটা থমথমে ভাব যখন ভাটার শেষ হয়েছে, কিন্তু জোয়ার আসেনি—যদিও ইতস্ততঃ জলের ঘূর্ণিতে তার পূর্বাভাস স্পষ্টই। জোয়ার-ভাটার সেই সন্ধিতে আবর্তের মধ্যে আবর্ত কবির নিজের অস্তিত্বের সন্ধিক্ষণ—বয়ঃসন্ধি। বয়ঃসন্ধির প্রধাণ লক্ষণ যৌনতা তাই ১৯৩৪-৩৭ সালের কবিতাগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উদ্ভিন্ন যৌবনকামনা আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি অভ্যস্ত বিষয় বলে গণ্য অন্ততঃ 'কড়ি ও কোমল' থেকে সুরু ক'রে। কিন্তু সেই রেওয়াজে মাধুর্যের আধিক্য এতই যে যৌনোন্মেষের তিক্ততার দিকটা প্রায়শই অস্বীকৃত থেকে যায়। প্রেম তাই লজেঞ্চুষের মতো মিষ্টি ও শরবতের মতো তরল পদার্থ বলে বোধ হয়। কিন্তু সমরদার কবিতায় যৌনতা ও প্রেম আশংকায় সঙ্গীন ('রক্তে যেন চঞ্চল বলাকা আসে, / মাঝে মাঝে গভীর

অন্ধকারে / যেন রক্তকরবী কাঁপে ; / আজ সমস্তক্ষণ অন্ধকার ভরে অশান্ত সূর্যাস্ত। স : ১৪), এমনকি বিষাক্ত ('বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে / তোমাকে পাবার বাসনা / ···সমস্ত দিন, আর সমস্ত রাত্রি ভরে / তোমাকে পাবার বাসনা / বিষাক্ত সাপের মতো' স : ২২)। এই বিষ অবশ্য রোম্যান্টিক মেজাজে একটা মিঠেকড়া মৌতাতের কাজ করে, এবং আসক্তির বশে তার মাত্রা বাড়িয়ে একাকিত্বের যন্ত্রণা উপশমের চেষ্টায় কোনো কোনো কবিপ্রতিভা যে জীবন্মৃত হয়ে ধুঁকতে থাকে তার দৃষ্টান্ত বিরল নয়। বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে রোম্যান্টিক যন্ত্রণার তাড়নায় সতেরো বছর বয়সে সমরদার আত্মহত্যার চেষ্টা একটা বেড়ালের অকালবিয়োগের বেশি আর গড়ায়নি (বা : ২৩)। কিন্তু আধ্যাত্মিক অর্থেও যে তিনি আত্মঘাতী হননি এবং বুঁদ হয়ে থাকেননি নিঃসঙ্গতার তিক্তমধুর নেশায়, তার কারণ হয়তো যুগসন্ধির সঙ্গে বয়ঃসন্ধির প্রতিচ্ছেদ। কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে মোড় নিতেই তাঁর ব্যক্তিত্ব ইতিহাসের সেই বাঁকে এসে পৌঁছলো যেখান থেকে মিলিত জীবনের বহুতাকে দিগন্ত-ছোঁয়া বলে মনে হয়েছিল ; বহুকে স্পর্শ করেছিল এক ; আর অন্তর্মুখী অস্তিত্বের ঘূর্ণী থেকে কক্ষান্তরিত হয়ে ঐতরিকতাও নতুন ভূমিকা খুঁজে পেয়েছিল বৃহত্তর সংকটের আবর্তে।

সেই উত্তরণের দ্বন্দ্ব ও দোটানাই ১৯৩৪-৩৭ পর্বের কবিতাগুলির উপাদান এবং বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো বিদ্বানের কাছে (যথা, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা সুকুমার সেন : ১৯৬০ সালে সাহিত্য আকাদেমি থেকে প্রকাশিত তাঁর 'হিস্‌ট্রি অব্‌ বেঙ্গলি লিটারেচরের' ৩৭৪ পৃ. দ্রষ্টব্য) ঐ কবিতা পাকামি বলে মনে হয়েছে। রোম্যান্টিকতার রুগ্‌ন দিকটা সাহিত্যিক আদর্শ হিসাবে প্রশ্রয় পায় এই ধরনের পণ্ডিতদের আশ্‌কারায়। আসলে এঁরা যেমনি কালা তেমনি কানা : শুনেও বোঝেন না যে কড়ি এবং কোমল পরস্পরকে পূর্ণ করে সুরের পর্দায় ; আর কাব্যলক্ষণ দেখেও চিনতে পারেন না যে মুগ্ধদৃষ্টি অথচ শ্যেনচক্ষু যৌবন জীবনকে স্বীকার করেও তার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারে। তাই সমরদার কবিতায় বৈপরীত্যের চতুর ব্যবহার তাঁদের কাছে অস্বস্তিকর লাগে। অথচ রোম্যান্টিকতার আত্মসমালোচনা সুরু হয় ঠিক ঐ ব্যবহার থেকেই এবং তার ফলে রোম্যান্টিক ব্যাধির বীজাণু একেবারে উৎসন্ন না হলেও যথেষ্ট নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।

এই পর্বের কবিতাগুলিতে বৈপরীত্যের কাজ আমিত্বের অন্ধকারকে বিব্রত করা। সেই অন্ধকার যখন জমাট বাঁধে নিঃসঙ্গতা ও নৈঃশব্দের অক্ষকোণে, বিপরীতধর্মী অলঙ্কারগুলি তখনই বারবার ঝল্‌কে ওঠে, আর তাদের ক্ষণপ্রভায় ঐতরিকতার ঐ দৈশিক ও কালিক লক্ষণ দুটি বৈদ্যুতিক অস্থিরতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। ধাবমান বেগ একাকিত্বকে চঞ্চল করে তোলে, স্তব্ধতা আন্দোলিত হয়

আর্তনাদে। যথা : 'ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি / নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গ-তায় / ···ঘনায়মান অন্ধকারে / করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল / দীর্ঘ, দ্রুত যান—/ বিদ্যুতের মতো : / ···অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ, / দীর্ঘ লৌহ-রেখার সহসা শিহরণ— / আর অস্ফুট, শীর্ণ, বহুদূর, কিসের আর্তনাদ, / কঠোর, কঠিন' (স : ১২-১৩)। কিংবা : 'সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা। / ধুলোভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে / একটি হরিণের ঊর্ধ্বশ্বাস, ধাবমান বেগ, / আর সেই ক্ষিপ্রগতি চঞ্চল রেখায় / উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস, / মৃত্যুহীন অতীতের শেষ হাহাকার' (স : ১৮)।

দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটিতে সাঁওতাল পরগণার কথা এসে গেছে অনিবার্যভাবেই। ঐ অঞ্চলটি সমরদার কবিত্বের শিলাইদা-পাতিসর। 'বাবু বৃত্তান্তে' তিনি লিখেছেন : 'যৌবনে সাঁওতাল পরগণার প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল।···ওসব অঞ্চলে রাতের আকাশ গভীর, স্বচ্ছ ও বিরাট মনে হতো' (বা : ৩৭)। সেখানকার আকাশ, মাঠ, আলো, অন্ধকার, মেঘ, পাহাড়, খনি, মহুয়া, শালবন ও সূর্যাস্ত তাঁকে শূন্যতার ও বিষণ্ণতার ভাষা জোগান দিয়েছে কবিতার পর কবিতায়। তাই শহরেও 'বৃষ্টির আভাসে করুণ পথে' যখন ধুলো ওড়ে 'এমন দিনে সে ধুলো মনে শুধু আনে / সাঁওতাল পরগণার মেঘ-মদির আকাশ' (স : ১৭)। আবার কয়েক বছর বাদে, ১৯৪০-৪২ পর্বে, যখন মধ্যবিত্ত অস্তিত্বকে 'কলে বিকল ইঁদুরের সঙ্গে' তুলনীয় মনে হয়, যখন 'দিনগুলির বুকে জগদ্দল পাথর', তখনও 'মহুয়ার বন মাঝে মাঝে মনে পড়ে' (স : ৮৯)। এমনকি শেষ পর্বের সর্বশেষ কবিতায় সাঁওতাল পরগণার কথা ভুলে যাওয়াই যেন 'রোমান্টিক ব্যাধি' থেকে আরোগ্যের উপায় বলে গণ্য হয়েছে : 'ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি / একদা দিগন্তে দেখা উদ্ধত পাহাড়' (স : ১৪০)।

এই ভুলে যাবার চেষ্টার মধ্যে লাল মাটির দেশটি যে অস্বাস্থ্যের আকর বলে অভিযুক্ত হলো তা ন্যায়সঙ্গত কিনা বিচার্য। কারণ সাঁওতাল পরগণার শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ও দৃশ্য যেখানেই তাঁর কবিতার মূল উপাদান সেখানেই কিন্তু রোম্যান্টিকতার পলায়নী প্রবৃত্তির বিপরীত একটি ঝোঁকও বেশ লক্ষ করার মতো। 'মহুয়ার দেশ' নামক বিখ্যাত কবিতাটি সেই বৈপরীত্যের অন্যতম উদাহরণ।

১

মাঝে মাঝে সন্ধ্যার জলস্রোতে
অলস সূর্য দেয় এঁকে
গলিত সোনার মতো উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,
আর আগুন লাগে জলের অন্ধকারে ধূসর ফেনায় !

সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিঃশ্বাস ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

২
এখানে অসহ্য, নিবিড় অন্ধকারে
মাঝে মাঝে শুনি
মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
গভীর, বিশাল শব্দ,
আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন। (স : ২৮-২৯)

কবি নিজেই কবিতাটিকে দুভাবে ভাগ করেছেন — ছত্রসংখ্যা ধরে (৭+৭+৮) তিনটি স্তবকে এবং স্তবকের হিসেবে (২+১) দুটি অনুচ্ছেদে। প্রথম স্তবকের অর্থালঙ্কারে এবং অনুচ্ছেদের একটি থেকে অপরটিতে উত্তরণে — উভয়তই বৈপরীত্যের প্রয়োগ বেশ চোখে পড়ে। সুরুতেই কোনো কোনো সায়ংকালীন সুরের আস্থায়ীর মতো একরকম ছায়াময় ও শ্লথ আমেজের কিছু উপাদান সাতটি ছত্রে সংগৃহীত হয়েছে। উপাদানগুলির আকর একই — তেজ। কিন্তু আলোক এবং গতির প্রকার-ভেদে তারা দ্বন্দ্বের সূত্রে গাঁথা : অস্তমান সূর্যের আগুনের সঙ্গে জলের ধূসর ফেনার দ্বন্দ্বে, আলম্বিত স্রোতোধারার সঙ্গে শেষরশ্মির স্তম্ভাকৃতি প্রতিবিম্বের দ্বন্দ্বে। দিন-রাত্রির সন্ধিলগ্নে যা উজ্জ্বল তা স্তিমিত এবং যা চঞ্চল তা মন্থর হয়ে একটি কোমল আরামের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। দ্বিতীয় স্তবকে ঐতরিকতার সুডৌল শান্তি সেই সম্ভাবনারই পরিণাম। মেঘমেদুর দেশ, দেবদারুর ছায়া এবং সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস সেখানে উপমান হয়ে আলো ও গতি থেকে রাত্রির, তথা জীবন ও সমাজ

থেকে কবিসত্তার বিচ্ছেদকে ব্যক্ত করেছে যথাক্রমে দূরত্ব, রহস্য এবং বিরহের ব্যঞ্জনায়।

কিন্তু মহুয়া ফুলের আস্তরণে ঢাকা ও মহুয়ার গন্ধে বিশ্রব্ধ চৈতন্য যেই একটু ঝিমিয়ে আসে অমনি দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি তাকে নিষ্ঠুরভাবে নাড়া দিয়ে জাগিয়ে দেয়। মহুয়ার দেশের গর্ভ থেকে উঠে এসে একটি প্রতীপ শক্তি মহুয়ার ঘোর ভাঙায়। কয়লাখনির শব্দে বিধ্বস্ত হয় রাত্রির নীরবতা যা নিঃসঙ্গ অস্তিত্বেরই নিত্যসঙ্গী। তারপর সবুজ সকাল; কিন্তু তার শিশিরসিক্ত শুচিতাকে লজ্জা দেয় 'অবসন্ন মানুষের শরীরে···ধুলোর কলঙ্ক'। বৈকালিক স্বস্তির মধ্যেও, প্রথম স্তবকে, দুঃস্বপ্নের যে ইঙ্গিত ছিল তাই যেন প্রকট হয় নতুন দিনে। অনেকের বিনিদ্র, শ্রমক্লান্ত উপস্থিতি তন্দ্রা ও আলস্যের একক আবেশকে দূর করে। এক কথায়, আমিত্বের অন্তর্গত দ্বন্দ্বই আর ঐতিহাসিকতার একমাত্র অবলম্বন নয়; এখানে তার প্রকল্পটি বৃহৎ জগতের অনেকানেক দ্বন্দ্বে আরো জটিল এবং অবশ্যই আরো যন্ত্রণাকর।

সেই প্রকল্পের মধ্যেই সমরদার কবিতার রোম্যান্টিকতার স্থান। তাই তাকে ব্যাধিগ্রস্ত বললে অবিচার হয়। আমিত্বকে অতিক্রম করার জন্য ব্যাকুল বলেই সেই রোম্যান্টিকতা সতেজ ও সুস্থ চেতনার সাক্ষী। বিবিক্ত ব্যক্তিসত্তা এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীসত্তার সংকীর্ণতা তার অসহ্য বলেই সে সবল। কবি নিজের সামাজিক ও মানসিক পিছটানের কথা ভুলে যাননি, বরং পিছটান আছে বলেই সজ্ঞানে বিপরীত ঝোঁকে কলম চালিয়েছেন। তাই তাঁর কবিতায় ধনুর্গুণের টান এসেছে। এই গুণটিকেই আমি ঐ কবিত্বের মৌলিকতা ও স্বধর্ম বলে মনে করি। কারণ, তিরিশ-চল্লিশ দশকের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে মধ্যবিত্ত বাঙালী ব্যক্তিসত্তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ঠিক যে-সূত্রে বাঁধা তার সত্যটি এখানে নির্মমভাবে এবং কাব্যকলার—গদ্যছন্দ, উৎপ্রেক্ষা ও বক্রোক্তির—বিদগ্ধ ব্যবহারের দ্বারা সরসভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

সেই ধনুকের চাপ ও তার ছিলার টান এতটুকু ঢিলে হয়নি পরবর্তী কবিতা-গুলিতেও। তবে, বৈপরীত্যের যে-কোটিতে সেই ছিলা পরানো হয় তার নির্বাচনে পরের দিকে এক বিশেষ ধরনের পক্ষপাত বেশ স্পষ্ট। কোটিগুলি তখন আর আমিত্বের অন্তর্দ্বন্দ্বের লক্ষণমাত্র নয়। আমিত্ব-অপরত্বের দ্বন্দ্বে বৈপরীত্যের যে সব লক্ষণ জীবনযুদ্ধের বৃহত্তর ইতিহাসের—সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের—দিক থেকে জরুরী ও প্রাসঙ্গিক, তাতেই এখন সেই কবিতা টানটান করে বাঁধা। তাই তার ছত্রে ছত্রে হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যেই টংকার বাজে। ১৯৪০ সালে বারো বছরের কবিজীবনের ঠিক মাঝামাঝি সময়ে লেখা '.গামন্থন' (স: ৬৭-৭০) সেই বিবর্তনের একটি দৃষ্টান্ত।

কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হবার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিয়ে এই কবিতাটির

স্থরু। কিন্তু বয়ঃসন্ধির যৌনতার চেয়ে সেই ইতিহাসে উপনিবেশিক সমাজের সংকট ও সংক্রান্তির বিষয়কে অনেক বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মদনরাজত্ব থেকে বিতাড়িত হবার কথা আছে বটে, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের সেই বিশেষ অভিজ্ঞতার স্থান এখন অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ, শ্রমিককৃষকের সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক রাজনীতি ইত্যাদি সামূহিক অভিজ্ঞতার ব্যাপক পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে। অবশ্য ঠিক তার পরেই ঐতরিকতার পুরোনো লক্ষণগুলি আবার দেখা দেয় কবিতাটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে। আবার অভাববোধের সেই চেনা চিত্রকল্পটি—'শূন্যমাঠে স্তব্ধ দিন'। কবি এখনও একাকী। তবে নতুন কথা এই যে ইতিমধ্যে দেশজোড়া দুর্গতির অস্বস্তিকর বাস্তব সেই একাকিত্বের সংজ্ঞায় একটা মৌলিক উপাদানের মতো সক্রিয় হয়ে উঠেছে। 'অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে / নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র।' অর্থাৎ সাঁওতাল পরগণার নির্জনতা নয়, বিশাল ভারতের জনারণ্যই এখন একাকিত্বের পটভূমি। তাই মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, প্লাবনের সম্ভাবনা এবং অকালবার্ধক্যে বিস্বাদ জীবন সম্পর্কে উদ্বেগ সত্ত্বেও গ্রাম্য হাটে শাকসব্জীর সহজ সবুজ যেন ঐতরিক অস্তিত্বটির মোড় ফেরাতে চায় কোনো আস্তিক প্রত্যয়ের দিকে।

ফেরাতে চায়, কিন্তু পারে না। শেষ পর্যন্ত আবার সেই শূন্যতারই জয় হয়: 'তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে / মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে / করাল শূন্যের বৃত্তে / নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে; / লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ, / শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ।' তবু লক্ষ করার কথা যে শূন্যতায় প্রত্যাবর্তন এবার দিনান্তে কলের বাঁশি শুনে। তাই ভরসা হয় যে 'প্রতিষ্ঠিত বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন' হবার খেদ একদিন নিরসন হবে কারখানার ধর্মঘটে এবং গ্রামে খাজনা বন্ধের লড়াইয়ে। 'সামনে বরাবর কালের জোয়ার, / সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরিনি'—এই দুঃখই প্রমাণ করে যে শূন্যতাবোধের চাপে চৈতন্য অসাড় হয়ে যায়নি এখনো। কালের জোয়ারে নেমে সাঁতার দেবার সম্ভাবনা এখনো লোভনীয় মনে হয়।

জলে নামবো না পারে বসে ঢেউ গুণবো—এই দ্বন্দ্বে চৈতন্য একবার দীর্ণ হলেই মহাপ্রস্থানের রাস্তা বন্ধ। অস্তিত্বের নিঝঞ্ঝাট ঐক্য সেই মুহূর্তেই বিভক্ত হয় পরস্পরবিরোধী সম্ভাবনায়। এমনকি তখনো যদি কেউ পারে বসে ঢেউ গোনার সিদ্ধান্ত নেয় তবুও তা সচেতন ও সম্যক বিবেচনায় আয়ত্ত সংকল্পের মর্যাদা পেতে পারে। পলায়নেরও প্রকারভেদ আছে। হঠাৎ ঘাবড়ে গিয়ে পিট্টান দেওয়া আর ভেবেচিন্তে পলাতক হবার সিদ্ধান্ত নেবার মধ্যে গুণগত তফাত যেমন প্রকট হয় পুলিশী বা ফৌজী হামলার মুখে কিংকর্তব্য বিচারে, তেমনি হয় সাহিত্য বিচারেও। কোনো কবিই হঠাৎ পালাবার পথ ধরেন না। ভাষার সঙ্গে চৈতন্যের অন্বয়ই যেহেতু কবিকৃতির শর্ত এবং ভাষা ও চৈতন্য উভয়ই যেহেতু সার সংগ্রহ করে মানবজমিন থেকে, তাই কৃষিকাজের ধুলোকাদা, শ্রম ও ঘাম, ক্ষত ও ক্ষতির

দাগ কবিতায় থাকবেই। নবাবী আমলে গ্রামজীবনের সুখদুঃখের চিহ্ন যেমন রামপ্রসাদী কাব্যের অলঙ্কার যদিও তা আধ্যাত্মিকতায় উদ্বুদ্ধ, ইংরেজ রাজত্বেও তেমনি অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' কিংবা বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'র মতো তন্ময় রোম্যান্টিকতাও মধ্যবিত্তের সুখদুঃখের অলঙ্কারে উজ্জ্বল হয়ে আছে। জীবনের নখের আঁচড় গায়ে লাগেনি, এমন কবিতা হয়না।

তিরিশ-চল্লিশ দশকের সংকটে বিধ্বস্ত উপনিবেশ সমাজে কোন বাঙালি কবির পক্ষেই পলায়ন সহজ ছিল বলে মনে হয়না। কারণ ঐ সমাজে তাঁরাও ছিলেন শোষিতের মধ্যে। শোষিতের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাশ্চাত্যশিক্ষায় অর্জিত লিবারল্ সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে তাঁদের কবিতার ওপর সমালোচনার ঐতিহাসিক দায়িত্ব বর্তে ছিল। কিন্তু লিবারল্ সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ ঝোঁকের প্ররোচনায় সেই দায়িত্ব যাঁরা সচেতনভাবে অগ্রাহ্য করেছেন, তাঁদের লেখাও যে পরাধীনতার অপমান এবং সেই অপমানের প্রতিবাদ সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন তা ঠিক নয়।

বাঙালি সাহিত্যিকদের মধ্যে সে যুগে যাঁরা সজ্ঞানে সেই দায়িত্ব স্বীকার করেছিলেন, সমরদা তাঁদেরই একজন। পালাবার পথ তিনি খোঁজেন নি। বরং পলায়নপরতাকে বারবার ধিক্কার দিয়েই তিনি নিজের পালাবার পথ বন্ধ করেছেন। 'রোমন্থন' এবং 'বাবু বৃত্তান্তে'র মতো নামকরণে সেই ধিক্কার বেশ স্পষ্টই শোনা যায়। তাই অলস অস্তিত্বের চর্বিত চর্বণ করার আরাম না চেয়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক আঘাত-সংঘাতের মধ্যে নিজের ভূমিকা খোঁজার যন্ত্রণা যেমন ঐ কবিতার বিষয়, তার আত্মকথাও তেমনি নিজের শ্রেণীসত্তাকে স্বীকার করেই তার সংকীর্ণতা থেকে আত্মরক্ষার অস্বস্তিকর ইতিহাস।

বাবুরা যদি বাবুজন্মের কথা মনে না রেখে বিপ্লবী হতে চায় তাহলে বিপ্লব যে বাবুগিরিতে পরিণত হয় তা তিনি বেশ ভালো করেই জানতেন। আবার সেই বাবুজন্মকেই অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে মধ্যবিত্ত চেতনার গণ্ডিতে নিজেকে স্বেচ্ছায় বন্দী রাখা, শ্রেণীসত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আদর্শ মেনে নিয়েও ঐ শ্রেণী-সত্তার নামেই সেই আদর্শ সম্পর্কে নিষ্ক্রিয় থাকার প্রবৃত্তিকে তিনি প্রশ্রয় দেননি— না তাঁর নিজের কর্মজীবনে, না তাঁর কবিতায়। 'যে জন বন্ধ ঘরে থাকে, / স্তব্ধ তার কাছে জীবনের জয়যাত্রা ? / কূপমণ্ডুক শোনে না সমুদ্রের গান, / কিন্তু সে তো দেখে কূপের উপরে / বৃত্তবদ্ধ নীল আকাশ, / দু-একটি অমর নক্ষত্র, / বৈশাখী মেঘের ভগ্নাংশ কোনোদিন' (স: ১১৬)। সমরদার ঐতরিকতার শক্তি এখানেই, যে শক্তি ব্যক্তিসত্তাকে এবং শ্রেণীসত্তাকে তার আপন সীমা লঙ্ঘনের স্পর্ধা জোগায়, বৈশাখী মেঘ থেকে প্রেরণা সংগ্রহ করার সাহস দেয় কূপমণ্ডুককেও।

কিন্তু বৈশাখী মেঘ তো ঝড়ের নিশানা। কি চাই তবে ? কূপের শান্তি না

বৈশাখের ঝড়? না কি ঝড়ের মধ্যেই শান্তি? 'আমার মনে শান্তি নেই। / যদি ঝড় নেমে আসে, / শব্দের তীব্র আঘাতে আকাশ চূর্ণ ক'রে / অন্ধকারে ঝড় নেমে আসে, / ঝড় নেমে আসে বিশাল, গভীর অন্ধকারে; / তাহলে হয়তো, হয়তো আমার মনে শান্তি আসবে' (স : ১৯)। ঝড়ই যেখানে শান্তির শর্ত, শান্তি চাই বললেই সেখানে অশান্তিকে ডেকে আনা হয়। ঝড়ের কেন্দ্রে শান্তির সম্ভাবনা খুঁজতে গিয়ে কবি বয়ঃসন্ধির মুহূর্তেই নিজের শান্তিভঙ্গ করেছিলেন। কিন্তু বিকল্প বাসনার দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই চৈতন্যের পথ। তাই সেই চৈতন্য যখন আমিত্বের নিরালা কোণ ছেড়ে ইতিহাসের সড়কে পা বাড়ায় এবং ঝড় আসে, তখনই, দ্বিতীয় পর্বের কবিতায়, মেনে নিতে হয় যে ঝড় শান্তির বাহন নয় মোটেই: 'যাযাবর মেঘ এল পাহাড়ের বন্দরে, / আর আমাদের জাহাজের উপরে / সেই গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এল: / শান্তি নেই' (স : ৪৯)। এই স্বীকৃতির মধ্যেও কিছু দ্বিধা যদি বা থেকে থাকে, তার রেশমাত্রও নেই শেষ পর্বের শেষ কবিতাটিতে:

> সহজ জীবনের পর মৃত্যু—
> সে তো বটের উপরে চাঁদের আলো,
> কিম্বা শূন্য পাহাড়ে কুয়াশা।
> ও ধ্রুপদী শান্তি আমাদের নয় (স : ১৩৯)

এই কথাটাই বোধ হয় সমরদা তাঁর কবিতায় ও কাজে বোঝাতে চেয়েছিলেন— 'ও ধ্রুপদী শান্তি আমাদের নয়।' বোঝাতে চেয়েছিলেন যে একটি দুর্ভাগা দেশে বুদ্ধিজীবীর জীবন মনুষ্যত্বের মর্যাদায় ধন্য শুধু তখনই যখন তা ক্ষুব্ধ হয় বৈশাখের ঝড়ে, দীর্ণ হয় জনতার অন্তর্দ্বন্দ্বে, জটিল হয় ঐতরিকতার আবর্তে—যখন তার আর শান্তি নেই।*

* সংকেত॥ 'বাবু বৃত্তান্ত' (আশা প্রকাশনী, ১৯৭৮) এবং 'সমর সেনের কবিতা' (৩য় সংস্করণ; সিগনেট প্রেস, ১৩৭৬) থেকে উদ্ধৃতিগুলির শেষে ঐ বই দুটির নাম যথাক্রমে 'বা' ও 'স' সংকেতের দ্বারা পৃষ্ঠাঙ্কসহ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

পরিভাষা॥ কয়েকটি শব্দ এই প্রবন্ধে পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। ইংরেজি প্রতিশব্দ সহ তাদের তালিকা: অবধি (limit); ঐতরিক (alienated); ঐতরিকতা (alienation); কালিক (temporal); জীবনদর্শন (ideology); দেশ (space); দৈশিক (spatial); পণ্যপূজা (commodity fetishism); পরত্ব (alterity); প্রকল্প (project, *projet*); সন্নিকর্ষ (contiguity); সংকেত (sign, symbol); সর্বেশ্বরতা (hegemony); হিতবাদ (Utilitarianism)।

অমিয়কুমার বাগচী

সমর সেন ও ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সমস্যা

After such knowledge, what forgiveness? Think now
History has many cunning passages, contrived corridors
And issues, deceives with whispering ambitions,
Guides us by vanities.

টি. এস. এলিয়ট: Gerontion (এলিয়ট, *Collected Poems* 1909-1935,
London, Faber, 1958, p. 38.)

ইতিহাসের কানাগলি ও ভুলাভুলাইয়ার মধ্যে মানুষ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষ, বারবার ঘুরপাক খেয়েছে এবং এখনও খাচ্ছে এই যন্ত্রণাদায়ী বোধ সমর সেন তাঁর কবিতায় ও গদ্যে নানাভাবে প্রকাশ করেছেন। তিরিশ-চল্লিশ দশকের আরও অনেক কবির মতোই সমর সেন এলিয়টের কবিতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কিন্তু এলিয়টের জীবনধারণা ও জীবনকৃতির সঙ্গে সমর সেনের জীবনধারণা ও জীবনপাতের ইতিহাস একেবারেই মেলে না। এলিয়টের মতো এবং এলিয়ট-প্রভাবিত আরও বিশিষ্ট বাঙালি কবির মতো তিনি জানতেন বোদ্ধা মানুষের আত্মম্ভরিতা কত ঠুনকো, কত দুর্বলাভিত্তি, কত অর্থহীন। কিন্তু এই নির্বেদ থেকে বাঁচার জন্যে অ্যাংলো-ক্যাথলিকের বিশ্বাসের কোনও ভারতীয় সংস্করণ তিনি খোঁজেন নি, প্রাচীন ভারতের স্বপ্নে নিজেকে মজিয়ে দিতে চান নি অথবা বিশুদ্ধ সংস্কৃতির পিছনে সারাজীবন ধাওয়া করে বেড়াননি:

সমর সেন খুব সচেতনভাবে জানতেন যে তাঁর বোদ্ধা মানসের মূল তাঁর মধ্যবিত্ত লালনে, এবং সেই লালনপুষ্ট ব্যষ্টিমুখীন প্রবণতা তাঁকে কৈশোর থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত পীড়া দিয়েছে। সমর সেন বারবার বস্তুবাদী দর্শন দিয়ে নিজের চেতনাকে বিশ্লেষণ করেছেন:

'জীবন ধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবন ধারাকে নয়'।

'সমর সেনের কবিতা', তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা,
সিগনেট প্রেস, ১৩৭৬, পৃ. ১০৮।

(এরপর থেকে এই বইটিকে শুধু 'সমর সেনের কবিতা' বলে উল্লেখ করা হবে।)

যাঁরা সমর সেনের জীবনকৃতির পরিচয় রাখেন তাঁরা হয়ত বলবেন যে, কার্ল মার্কসের Prelude to a Critique of Political Economy-র এই আর্য-

সূত্রের উজ্জ্বল ব্যতিক্রম সমর সেন নিজেই। কিন্তু সর্ববিষয়ে চিন্মার্গধর্মী সমর সেন নিশ্চয়ই একথা মানতেন না : তিনি বলতেন যে, সমাজের মুক্তি না হলে কোনও ব্যক্তিমানুষের মনের মুক্তি ঘটে না। ১৯৭৬ সালে 'প্রস্তুতিপর্বে' প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি লিখে গেছেন :

'জীবনধারার ছাপ চেতনা ও সৃষ্টিশক্তিকে গড়ে, চেতনা নয়। অপর পক্ষে এটা পরে বলা হয়েছে যে, উপরিকাঠামোর প্রভাব জীবন-ধারার পরিবর্তনে সাহায্য করে। এটা যৌথজীবনে যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত জীবনে ততটা নয়।'

সমর সেন : 'বাবু বৃত্তান্ত', পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলিকাতা,
দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮৮, পৃ. ৯৩-৯৪

(এর পর থেকে এই বইটিকে 'বাবু বৃত্তান্ত' বলে উল্লেখ করা হবে।)

ভারতবর্ষের ইতিহাস সমর সেনের কাছে খুব গৌরবময় কিছু ছিল না। সেই ইতিহাস যুগ যুগ ধরে অগণিত খেটেখাওয়া মানুষের ওপর মুষ্টিমেয় শোষকের অত্যাচারের কাহিনী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের যে-অংশের সুবিধাভোগী উত্তরাধিকারী বলে সমর সেন নিজেকে মনে করতেন সেই অংশ তাঁকে উঠতে বসতে বিঁধত।

আমরা বাঙালী মীরজাফরী অতীত ; মেকলের বিষবৃক্ষের ফল।
অনেক দিন ভেবেছি,

....

অনেক বার ভেবেছি :
ভবিষ্যতে বীজবাহী না হয়, এ বিষবৃক্ষ শেষ হোক ...

—সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৯৫।

এই ছত্রগুলি লেখা ১৯৪০ থেকে ১৯৪২-এর মধ্যে। কিন্তু ইতিহাস বদলে দিয়ে নতুন পৃথিবী আনার ইচ্ছা তাঁর কবিজীবনের প্রথম থেকেই লক্ষ করা যায় :

মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবীতে আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলতলার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার রুক্ষ মরুভূমি।

—সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৪০।

তাঁর কাব্যে এবং প্রবন্ধে বণিকসভ্যতা এসেছে মানুষের অধিকারের প্রধান শত্রু হয়ে। হাজার হাজার বছরের চেষ্টায় গড়া সভ্যতার এই চরম অপমানকর

পরিণতির বোধ তাঁর কবিতায় গোড়া থেকে জাজ্বল্যমান। সেই অর্থে তাঁর কবিতা প্রায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুব স্পষ্ট অর্থে রাজনৈতিক কবিতা। যাঁরা তাঁর কবিকৃতি এবং রাজনীতিপ্রণোদিত সাংবাদিক জীবনের মধ্যে বড় রকমের ফারাক দেখেছেন তাঁরা তাঁর কবিতাগুলো যথেষ্ট মনোযোগসহকারে পড়েন নি।

পরের দিকে কবিতাগুলোতে মানবসভ্যতার এই উত্তরাধিকার সম্বন্ধে গ্লানিবোধ অনেক বেশি তীব্র হয়েছে ; অতিপরিচিত ঘটনার মধ্য দিয়ে, মানবতার অবমাননার অতি-অভ্যস্ত নিদর্শনের মধ্য দিয়ে তাঁর রাগ, ঘৃণা এবং সদাজাগ্রত ইতিহাসবোধ বিস্ফুরিত হয়েছে। আর তার সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বহুকথিত সমাধান সম্বন্ধে তাঁর আপোষহীন, আত্মছলনাবর্জিত মনোভাব।

মীরজাফরী অতীত ও মেকলের বিষবৃক্ষের ফল হিসেবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে দেখে তিনি ক্ষান্ত থাকেন নি। তারপর এসেছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-স্বরূপ বিষবৃক্ষের ফলের বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ। 'আনন্দমঠে' সন্ন্যাসীরাই যবন অর্থাৎ মুসলমান-নিধনে লিপ্ত হল এবং ভারতের পুনর্জাগরণের আশায় ইংরেজশাসনকে স্বাগত জানাল :

> দুর্দান্ত যবনকালে সেজেছি বৈষ্ণব।
> ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এল, স্বাগতম্।
> পড়েছে মুসলমান বন্দেমাতরম্
> ধ্বনি ওঠে ঘটিরাম ডিপুটির ঘরে···
>
> —'আনন্দমঠ', সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১১৭

এই 'জাতীয়তাবাদী' কল্পকাহিনীর পুনরাবৃত্তি সমর সেন বারবার দেখেছেন তাঁর জীবদ্দশায়। অহিংসাধর্মের কথা মুখে বলে তারপর একদিকে ইংরেজ-তোষণ আর অন্যদিকে স্বজাতিনিধনে লিপ্ত হওয়া তিনি কোনদিন ক্ষমা করেন নি :

> মহাত্মা স্তব্ধ প্রায়, ওয়ার্ধায় উর্ধ্ববাহু ;
> এদিকে আসর জমায় অন্যান্য বেণিয়ার দল।
> যদিও দিগ্বিদিকে লোকক্ষয়, শহর গ্রাম উজাড়
> তামাম দুনিয়ায় চলে প্রতিবিপ্লবের ব্যভিচার
> তবু আমাদের স্বার্থ শুধু নিঃস্বার্থ কারবার।
> সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ অনেকদিনই করেছি বরবাদ
> শুধু সঙ্গোপনে রসদ জোগানোয়
> মিলে মিলে অন্ধকার বোম্বাই, আমেদাবাদ।
>
> —সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৯২-৯৩

সাম্রাজ্যবাদের এই নাভিশ্বাস মুহূর্তে
প্রতিবিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাহিনী
দেশে দেশান্তরে নতুন সাম্রাজ্যপ্রয়াসী।
তার প্রতিরোধ এদেশে—আমাদের প্রতিজ্ঞা।
এ ক্রান্তিতে, এতদিন অহিংস অসহযোগে মজ্জাহীন,
মুষ্টিমেয় বেণে, আর মধ্যবিত্ত, পরজীবী, শেঠির দালাল,
....
যদি ভাবে, মীরজাফরী জিন্দগী মন্দ কি,
ডাকে কুমির, কাটে খাল, যদি বলে, স্বাধীনতা তৈরি মাল,
এ চিজ এদেশে আনবে নন্দদুলাল,
কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধর···

—সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১০৫

প্রায় তিরিশ বছর পর (১৯৭২ সালে) তিনি 'বন্দেমাতরম' প্রবন্ধে লিখছেন : 'ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর [অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের] অবনতি শুরু হয় 'আনন্দমঠ' থেকে কেননা তিনি তখন তাঁর ইংরেজ-ঘেঁষা রাজনীতির রূপ দিতে শুরু করেন সাহিত্যে। সে রাজনীতিব বৈশিষ্ট্য ছিল মুসলমান বিদ্বেষ··· ইংবেজদেব সঙ্গে আপস এবং হিন্দুধর্ম সংস্কার কবে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা করা।'

—বাবু বৃত্তান্ত, পৃ. ৮৯-৯০

(লক্ষণীয় এই যে এই প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে সেই বছরে যখন 'বন্দেমাতরম' কণ্ঠে নিয়ে ইন্দিরাকংগ্রেসের গুণ্ডাবাহিনী পশ্চিমবাঙলায় সবুজ বিপ্লবের রাজত্ব কায়েম করছে।)

সারাজীবন সমর সেন তাঁর কবিতায় ও প্রবন্ধে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমার্গীর সামনের গলিঘুঁজির অনুকম্পাহীন বর্ণনা দিয়ে গেছেন :

তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস
অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো বিচলিত শুনি,
আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি :
আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জায়গা নেই,
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

—'একটি বুদ্ধিজীবী', সমর সেনের কবিতা, পৃ. ৪৯

ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব দিয়ে, সভ্যতার হাড়কাঠে-বলি যৌনচৈতন্যের দোহাই পেড়ে মধ্যবিত্ত মানসের বিকলন তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। মানুষ যদি ইঁদুরের মতো

অন্যের পরীক্ষার উপকরণমাত্র হয় তবে সে শুধু সারাদিন মনের উকুন বেছে সেই ইদুরদশা থেকে মুক্তি পেতে পারে না। ফ্রয়েড এবং পাভলভের তত্ত্ব বা তাঁদের উত্তরসূরী লাঁকা, বা স্কিনারের তত্ত্ব মানবমুক্তির উপায়ের, বা মধ্যবিত্তের মনের বিকৃতি নিরাময়ের সন্ধান দিতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করেন নি।

অনেক দেখে শুনে অনেক পড়ে অনেক পাণ্ডিত্য বা বুদ্ধির চাকচিক্যে সকলকে এবং নিজেকে তাক লাগিয়ে দিয়ে অনেকের মাথায় হাত বুলিয়ে তৈলচিক্কণ মসৃণ মানুষের দশায় উত্তীর্ণ হওয়াও সমর সেনের কাছে কোনদিন কাম্য বোধ হয় নি। আরও জোর দিয়ে বলা যায় এই মসৃণত্বকে তিনি অন্তর থেকে ঘৃণা করেছেন। মানুষের প্রেমের যে অবক্ষীণ রূপ সেই জান্তব প্রজননবৃত্তি আশ্রয় করে আর বণিকসভ্যতার দীর্ণ মরুভূমি থেকে অন্ধকার তাঁবুর দিকে চোখ রেখে যে মসৃণ মানুষ জীবন কাটিয়ে দেয় তাকে তিনি মানবত্বের পরাকাষ্ঠা বলে ভাবতে পারেন নি। মানুষের অধিকারচ্যুতির বোধকে যে বুদ্ধি ঢেকে দেয় তাকে সমর সেন কোনদিন সম্মান দেখাতে পারেন নি।

সমাজবদ্ধ জীব মানুষের পরমাগতি না হোক, অন্তত দৃশ্যমান ভবিষ্যতে শ্লাঘ্য লক্ষ্য থাকে ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে উত্তরণ, ব্যক্তিমানুষের অন্ধকূপবদ্ধ অস্তিত্ব থেকে সাধারণ মানুষের সমাজের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশার দিকে চোখ ফেরানো। বহুকে ভয় পাওয়া বা জনসমষ্টিকে এড়িয়ে চলার সাক্ষ্য তাঁর কবিতায় বা চিন্তায় নেই বলেই আমার ধারণা। কিন্তু তাঁর বহুজন শুধু সাময়িক হুজুগের দাস জনতা নয়, তাকে তিনি দেখেছেন সংগ্রামী মানুষের সচেতন সমষ্টি হিসেবে। বাড়তি মালগুজারী না দিতে যে চাষী প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এবং বণিক সভ্যতার জারজ সন্তান ইয়োরোপীয় ও নিপ্পনী ফ্যাসিবাদকে যে শ্রমিক তার হাতিয়ার দিয়ে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে সেই চাষী এবং সেই শ্রমিকের জাগরণের অনুরণন তাঁর প্রায় প্রতি কবিতার ছত্রে আমরা পাই।

আনন্দমঠের হিঁদুয়ানির এবং অহিংসার ধ্বজাধারীদের বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফল সমর সেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন ১৯৪৬ সালের আশার এবং আশাভঙ্গের দিনগুলিতে: ভারতীয় নৌসেনার বিদ্রোহ দিয়ে যে বছরের শুরু তার শেষ হয় কলকাতা নোয়াখালির ভ্রাতৃঘাতী নৃশংস দাঙ্গায়। স্বভাবসিদ্ধ সংযম দিয়ে সেই আশা ও আশাভঙ্গের অভিজ্ঞতা তাঁর কবিজীবনের শেষ চারটি কবিতাতে তিনি গ্রথিত করেছেন। এই কটি কবিতা লেখা হয়েছিল ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬-এর মধ্যে। তার প্রথমটির নাম 'লোকের হাটে'। এখানে হাট লোকেরই, সেখানে তারা কেনাবেচার সামগ্রী নয়, সেখানে তারা সমবেত হয়েছে সমাজবাসী জীব হিসেবে, যেখানে ধর্মের পরিচয়ে মানুষের পরিচয় নয়:

…যেন মনে রাখি
চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এদেশে, এখানে নোকর শাহীর হবে শেষ,

যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্থান।

—সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১৩৫

যে যুগে স্বৈরাচারী কেন্দ্রীকরণের সঙ্গে অনাচারী পাড়াকেন্দ্রিক গুণ্ডাবাজির লড়াই নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে সময় 'স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্থানের' মতো আশাবাদী স্লোগান নতুন করে শুনতেও ভালো লাগে।

কিন্তু এই আশা শীঘ্র পরিণত হয়েছিল দুঃস্বপ্নে :

মৃত্যু হয়তো মিতালি আনে :
ভবলীলা সাঙ্গ হলে সবাই সমান—
বিহারের হিন্দু আর নোয়াখালির মুসলমান
নোয়াখালির হিন্দু আর বিহারের মুসলমান।
....
শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে টামবাসের বেতাল স্পন্দন।
রোমান্টিক ব্যাধি আর রূপান্তরিত হয় না কবিতায়।

—সমর সেনের কবিতা, পৃ. ১৪০

সমর সেন যে তারপরও কবিতা লিখতে পারতেন তার প্রমাণ আছে বান্ধবীর সঙ্গে বাজি রেখে লেখা কবিতাগুলিতে ('উড়োখই', 'বাবু বৃত্তান্ত', 'পরিশিষ্ট')। তিনি যে আর কবিতা লেখেন নি সে ছিল তাঁর সচেতন সিদ্ধান্তের ফল। তিনি সারাজীবন অত্যন্ত সচেতনভাবে তাঁর পথ বেছেছেন : শুধু আশাভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় নয়, কোনও সাময়িক খেয়াল চরিতার্থ করতে নয়, অথবা নিস্তরঙ্গ জীবন অনায়াসক্ষেপণের আশায় নয়। সুতরাং তাঁর জীবনে কোনও নিশ্চিন্ত, শেষ ভবিতব্যে উত্তরণের জায়গা ছিল না। বিপ্লবী কবিতা তিনি লিখেছেন, কিন্তু শুধু 'বিপ্লবী শিল্পী' হওয়া তাঁর কাছে যথেষ্ট মনে হয় নি। শুধু বিপ্লবী শিল্পসৃষ্টি বা সংস্কৃতির বিপ্লবধর্মী আলোচনা তিনি চিন্মার্গগামীর মুক্তির উপায় বলে মনে করেন নি : তাঁর ১৯৭৬ সালে লেখা 'অনুশাসন পর্বের' প্রবন্ধে (বাবু বৃত্তান্ত, পৃ. ৯২) এবং অন্য লেখায় একথা খুব স্পষ্ট করে তিনি বলেছেন।

১৯৪০-এর দশকের দিনগুলিতে সর্বহারার মহান রুশবিপ্লব ইতিহাস। সোভিয়েত জনমণ্ডলী নাৎসীদের বিরুদ্ধে মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত, চীনের লড়াকু মানুষেরা নিপ্পনী আগ্রাসের বিরুদ্ধে তাদের নিজেদের জমির প্রতি কাঠার দখল নিয়ে লড়ছে কিন্তু সেই একই সময়ে ভারতবর্ষের প্রখ্যাত নেতারা স্বাধীনতা গাছ থেকে পড়া ফলের মতো পাবেন এই লোভে অহিংসার বাণী প্রচার করছেন অথবা ফ্যাসিবাদের সঙ্গে আপোস করে ব্রিটিশ বাঘকে তাড়িয়ে জার্মান-জাপানী কুমিরকে ঘরে আনতে

চাইছেন। ইতিহাসের এই তামাসাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং সেই সঙ্গে নিজের মধ্যবিত্তসত্তাকে বিদ্ধ করতে চেয়েছেন। কিন্তু নঞর্থক আত্ম-ব্যঙ্গের তুষ্টিতে তিনি মজে থাকেন নি।

সাম্প্রদায়িকতাদীর্ণ দেশের স্বাধীনতার রূপ দেখে তাঁর আশাভঙ্গ হয়েছে; তারপর তিনি দেখেছেন সোভিয়েত রাষ্ট্র কীভাবে অন্যদেশের বহু অত্যাচারী সরকারকে সমর্থন করেছে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার দোহাই পেড়ে। পরে চীন ভিয়েতনাম—সব সমাজবাদী রাষ্ট্রেরই বৈদেশিক নীতি স্ববিরোধ-দুষ্ট হয়েছে। সোভিয়েত রাশিয়ায় কয়েক বছর কাটানোর সময় সমর সেন আরও দেখেছিলেন কীভাবে রুশী জনগণ 'অরাজনৈতিক' হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু ষাটের দশক থেকে সমর সেনকে যে বামরাজনৈতিক ঘেঁষা সাংবাদিকতার পুরোধা হিসেবে পাই তার কারণ শুধু তাঁর আশাভঙ্গ নয়। তাঁর চিন্মার্গী সত্তার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটেছে এই সাংবাদিকতার মাধ্যমে। সমর সেনের আশা ছোটখাটো লড়াইয়ের সাময়িক জয়ে তুষ্ট থাকতে পারে নি, যেমন পারে নি সেই তুষ্টিকে তেলেঝোলে পুষে মসৃণ মানুষের আরামকেদারায় পৌঁছে দিতে। সমর সেন চেয়েছিলেন চাষী এবং মজুরের সর্বাঙ্গীন বিজয়: যতদিন না সেই বিজয় সম্পূর্ণ হচ্ছে ততদিন তিনি শান্ত থাকতে পারেন নি। সারাজীবন যে সমর সেন অশান্ত বুদ্ধিজীবীর কঠোর পারণ করে গেলেন তার কারণ তাঁর বুদ্ধি তাঁকে কোনমতেই আফিম খাইয়ে ঘুম পাড়াতে পারে নি।

চিন্তায় ধারণায় তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী মার্কস্‌বাদী। সেই যুক্তিবাদ, মার্কস্‌বাদ থেকে তিনি বুঝেছিলেন সাধারণ মানুষের মুক্তি না হলে কোনও মানুষেরই মুক্তি হবে না। পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ধারকরা যদি পুলিশ জমিদার বণিকের প্রতিভূ হিসেবে অত্যাচারীর ভূমিকায় নামে তবে সেই অত্যাচারের সোচ্চার প্রতিবাদ প্রতি মানুষের অবশ্য কর্তব্য: যদি মরিয়া মানুষ সেই অত্যাচারকে অস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ করে সেই প্রতিরোধকেও সমর্থন করা বুদ্ধিমার্গী মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। তার মানে এ নয় যে সমর সেন কোনও দিন দাবি করেছেন যে বিপ্লবের এক বিশেষ নিশ্চিত পথ তাঁর জানা আছে।

যেহেতু নিশ্চিত পথ জানা নেই সেই জন্যেই আরও বেশি করে দরকার ছিল সমর সেনের মতো একজন অসীম সাহসী মানুষের যিনি সমস্ত কিছু পণ করে সব বিপ্লবপন্থীর গলা শোনাবার জন্যে তাঁর পত্রিকাকে ব্যবহার করতে পারতেন। প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের ভড়ং দেখানো উদারনীতিতে তিনি ভোলেন নি। পশ্চিমবাংলার সবচেয়ে বড় সংবাদপত্রগোষ্ঠীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি তাঁর প্রকাশ্য সংগ্রামী সাংবাদিকের জীবন শুরু করেছিলেন। সমর সেনকে তথাকথিত অতিবামপন্থার সমর্থক বলে মনে করা ভুল হবে: অহিংস মেরু-

দণ্ডহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব তীক্ষ্ণ ছিল ঠিকই, কিন্তু তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে যেখানে মুখ বন্ধ করা হয়, প্রতিবাদের হাতকে আইন-শৃঙ্খলার অজুহাত দেখিয়ে পঙ্গু করার চেষ্টা যেখানে সর্বদা চলছে, সেখানে অন্তত যেন একটি পত্রিকা থাকে যার ভিতরে প্রতিবাদের ভাষা প্রতিরোধের সংকল্প প্রকাশ পাবে। তাছাড়া বিপ্লবীদের মধ্যে রেষারেষি যাতে ভ্রাতৃহননে পর্যবসিত না হয় তার জন্যে তাদের বিভিন্ন মতপ্রকাশের একটি সাধারণ মাধ্যম হিসেবে তিনি তাঁর পত্রিকাকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর জীবনকৃতি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে শ্রেণীবিভক্ত শোষণখিন্ন সমাজে সাধারণ মানুষের তথা-কথিত বে-আইনি পন্থায় প্রতিবাদের অধিকারও তিনি সবকিছু পণ করে সমর্থন করতে চেয়েছিলেন।

সমর সেনের বারোমাস্যার উদাহরণ দিয়ে সাধারণ বুদ্ধিজীবীর জীবনসমস্যার সমাধান করা যাবে না। কারণ সমর সেন সাধারণ বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। তাঁর চিন্তার ঔজ্জ্বল্য, বাংলাভাষা ব্যবহারে নবনবোন্মেষিণী প্রতিভা এমন কি তাঁর নির্বাধ সাহস এই দিয়ে তাঁর অসাধারণত্ব মাপা যাবে না। তাঁর অসাধারণত্বের সবচেয়ে উজ্জ্বল নির্দেশক (প্রমাণ নয় : তাঁর কাছে প্রমাণ প্রত্যাশার ধৃষ্টতা কে রাখে ?) হল এই যে তিনি শেষ পর্যন্ত মানুষের মানুষ হিসেবে বাঁচার অধিকারের কোনও সীমা মানেন নি। সেই না-মানার ব্রত পালন করতে তিনি কঠিন শর-শয্যায় শেষ জীবন কাটিয়েছেন। সীমা মানেন নি বলে তিনি শুধু কৃতিমান বাম-পন্থী সাংবাদিক ছিলেন না ; সমস্ত রকম সৎ বামচিন্তার সামনে ধ্রুবতারার মতো জ্বলে ছিল তাঁর নৈর্ব্যক্তিক মানবতাবোধ, তাঁর অদম্য জিজ্ঞাসা, সমস্তরকম ভ্রান্তি-বিলাসের বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত তাঁর চেতনা। তাঁর জীবনচর্চা আবার প্রমাণ করল যে পচাগলা সমাজ যতদিন আছে ততদিন ভারতীয় বুদ্ধিজীবীর সমস্যার সাধারণ অর্থে কোনও সমাধান নেই। যে সমাজের ভাঙার কাজে তাকে লিপ্ত হতে হবে সেই সমাজের আরেকটি পৃথক স্তর হিসেবে বুদ্ধিজীবী কীভাবে টিকে থাকবে ? বিপ্লবী না হয়ে শুধু বিপ্লবী শিল্পী বা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সে তো থাকতে পারে না কারণ পুরোনো সমাজ তার বিরোধী শক্তিকে বাঁচতে দিতে পারে না। সে ক্ষেত্রে হয় তার শিল্পী বা বুদ্ধিজীবী অংশের দেমাক ছাড়তে হবে নয়তো বিপ্লব করার ভনিতা ত্যাগ করতে হবে। কোনও প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী দলের আজ্ঞাবাহী সৈনিকের পদ যদি বুদ্ধিজীবীর শ্রেষ্ঠকাম্য হয় তা হলে তাকে বুদ্ধিমার্গ বিসর্জন দিতে হবে। সমর সেন আধুনিক পশ্চিমবাংলার সেই বিরল ব্যক্তি যিনি তাঁর অস্তিত্বের স্ববিরোধ মেনে নিয়ে এবং তাকে লঙ্ঘন করে সমস্ত সমাজের স্ববিরোধ পরতে পরতে খুলে দিয়েছেন। এই মহাজনের পন্থা অনুসরণের স্পর্ধা ক'জন বুদ্ধিজীবী ধরে ?

অশোক রুদ্র

কয়েক কোটি বাঙালির মধ্যে একটি মানুষ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।" সমর সেন সম্বন্ধেও একই কথা মনে জাগে। হঠাৎ করে এরকম একটা মানুষ কী করে সম্ভব হলো ? সুবিধাবাদী বাচাল বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে জন্মে কোথায় পেলেন তিনি ঐ ঋজু মেরুদণ্ড, ঐ মিতভাষিতা, যশের প্রতি ঐ উপেক্ষা, অর্থের প্রতি ঐ তাচ্ছিল্য, নিজ কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে ঐ উদাসীনতা, সর্বোপরি পণ্য সভ্যতার মধ্যে বাস করেও পণ্যের কালিমা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখার ঐ প্রতিজ্ঞা ? এদেশে পুঁজিবাদ এখনও পূর্ণাঙ্গভাবে বিকাশ লাভ করেনি। কিন্তু যে মধ্যবিত্ত সমাজে সমর সেন বাস করতেন, সেই সমাজে এখন পুঁজিবাদের ভরা জোয়ার। সব কিছুকেই পণ্যে পরিণত করার স্বধর্মে পুঁজিবাদ এই জগতে সিদ্ধিলাভ করেছে। কবির কবিপ্রতিভা, অধ্যাপকের বিদ্যা, বুদ্ধিজীবীর বুদ্ধি, নারীর নারীত্ব—সব কিছুরই দাম ধার্য করা হয়ে গিয়েছে। সকলেই কোনও না কোনও পণ্যের বিক্রেতা। সকলেই উচ্চতম মূল্যে নিজ সত্তাস্বরূপ পণ্যকে বিক্রি করার জন্য বাজারে হাজির। ব্যতিক্রম সমর সেন। সমর সেনকে কেউ কিনতে পারল না। সমর সেনের কেউ মূল্য ধার্য করতে পারল না। এর চেয়ে আশ্চর্য ঘটনা সম্প্রতিকালের বাঙালির ইতিহাসে আর কিছু ঘটেছে বলে আমার জানা নেই।

সমর সেনের পণ্যমূল্য যেমন ধার্য করা গেল না, তাঁকে পরিমাপ করার যন্ত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সমর সেনের জীবন ও ব্যক্তিত্বের অনেকখানিই প্রহেলিকাময়। আমরা যারা তাঁকে খুব কাছ থেকে জানার সুযোগ পেয়েছিলাম তারাও তাঁর চরিত্রের অনেক দিকই বুঝে উঠতে পারি নি। সমর সেনের সামগ্রিক মূল্যায়ন অসম্ভব। কেন, কী কারণে, কবিকীর্তির মধ্যগগনে অবস্থানকালে সমর সেন সাহিত্য জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়েছিলেন সেই রহস্য রহস্যই থেকে গেল। তেমনি রহস্য থেকে গেল, কেন, কী কারণে জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি স্বেচ্ছায় অমন ভয়াবহ দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছিলেন। আদর্শের জন্য বললে সম্পূর্ণ উত্তর পাওয়া যায় না। আদর্শ তাঁর অবশ্যই ছিল। তাঁর মতো আদর্শনিষ্ঠ নির্ভেজাল খাঁটি ব্যক্তির তুলনা আর অনেক ভেবে পাওয়া যায় না। কিন্তু আদর্শ বিসর্জন না দিয়েও তিনি পারতেন আরো অনেক স্বচ্ছলতার মধ্যে জীবনযাপন করতে।

একদিন ছিল, যখন কবি সাহিত্যিকেরা অর্থাভাবে কষ্ট পেতেন, বিনা চিকিৎ-

সায় মারা যেতেন। আজ আর সেদিন নেই। গাড়ি ড্রাইভার রাখতে পারার মতন কবি সাহিত্যিকও আছেন, যদিও তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। কিন্তু বহুতল অট্টালিকায় ছিমছাম সাজানো-গোছানো ফ্ল্যাটে বাস করতে পারার সামর্থ্য অধিকাংশেরই আয়ত্তে। সাংবাদিকেরা তো অধিকাংশই নিজের না হলেও অফিসের গাড়িতে চলাফেরা করেন। নানান কারণেই সংবাদপত্রের জগতে এখন অর্থের বেশ প্রাচুর্য। সমর সেন এককালে কবি তো ছিলেনই, পরবর্তীকালে বহুকাল সাংবাদিকতাও করেছেন— একেবারে সোনায় সোহাগা। তিনি যদি স্বেচ্ছায় নিজেকে পেশাগত সাংবাদিকতার জগৎ থেকে নির্বাসন না দিতেন তো হেসে খেলে বাড়ি গাড়ি টেলিফোন সমেত নগদে যা পেতে পারতেন তার অংক মাসে দশ হাজারের বেশি। এবং তা করতে তাঁকে কোনও আপসই করতে হতো না। তার কারণ আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলি আজকাল চালিত হয় কোন বিশেষ রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদ অবলম্বন করে নয়, নিতান্তই পুঁজিবাদের মূল ধর্ম অনুযায়ী, যে ধর্ম হলো মুনাফার জন্য যা প্রয়োজন তাই করা। জীবৎকালেই কিংবদন্তিতে পরিণত সমর সেনের নামটা শুধু ব্যবহার করতে পারলে তাই হতো যে-কোন সংবাদপত্রের প্রচারের সহায়ক এবং শুধু সেটুকুই দেখা হতো, সমর সেনের রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। সমর সেনও পারতেন পেশাদারী সাংবাদিকতার ভূমিকা পালন করে প্রচুর অর্থোপায় করতে এবং একই কালে তাঁর ফ্রন্টিয়ার কাগজ চালিয়ে যেতে। এ রকম তো অনেকেই করছেন। ভারতবর্ষের দুটি বৃহৎ কম্যুনিস্ট পার্টির অনেক নেতাই তো বিপুল ধনের অধিকারী। সক্রিয়-ভাবে নকশাল রাজনীতি করেন এমন অনেকেই তো আছেন যাঁরা অধ্যাপনা সাংবাদিকতা প্রভৃতি জাতীয় পেশায় নিযুক্ত থেকে তার সব সুখ সুবিধাই ভোগ করেছেন আবার আদর্শানুযায়ী রাজনীতিও করছেন।

এই সব সম্ভাবনার দিকে পিঠ ফিরিয়ে জীবনের শেষ কুড়ি বছর তিনি বেছে নিয়েছিলেন এমন এক পথ, যাতে প্রতিদিনই তাঁকে তাঁর সম্পাদিত ফ্রন্টিয়ার কাগজকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো বটেই, নিজের পেট চালানোর জন্যও দুশ্চিন্তা করতে হতো। ফ্রন্টিয়ারের অর্থাভাবের কথা তিনি সবসময়ই বলতেন, কিন্তু তাঁর নিজ দারিদ্র্যের কথার ধার দিয়ে যাওয়াও তাঁর গগনচুম্বী অহংকার সম্ভব করতো না। তবু তাঁর দারিদ্র্যকে চোখে দেখা যেত। দেখে আমাদের লজ্জা পেতে হতো। আমরা তুলনাতীতভাবে কম গুণের অধিকারী হয়েও কত আরামেই না জীবন কাটাচ্ছি।

ফ্রন্টিয়ারের মতো কাগজ চালিয়ে স্বচ্ছল জীবনযাপনের উপযোগী অর্থোপায় করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। কিন্তু কাগজটি চালানোর জন্য এত অর্থকষ্ট সমর সেনকে কেন পেতে হয়েছিল তাও এক প্রহেলিকা বটে। সাক্ষাৎ কারণ তো

পরিষ্কার। বিজ্ঞাপন ছাড়া কোন পত্র-পত্রিকাই চালানো অসম্ভব এবং বিজ্ঞাপন যে ফ্রন্টিয়ার কত কম পেতো তা তো চোখেই দেখা যেত। কিন্তু কেন? ফ্রন্টিয়ারের এই বিজ্ঞাপনের সমস্যা কেন? ফ্রন্টিয়ারের রাজনৈতিক মতামত এই প্রশ্নের সম্পূর্ণ জবাব দেয় না। 'অনীক', 'অনুষ্টুপে'র মতো আরো অনেক কাগজই তো আছে, যা নকশাল রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, ফ্রন্টিয়ারের চেয়ে বেশি সক্রিয়ভাবে। কৈ তাদের তো বিজ্ঞাপনের এই প্রকার ক্রান্তি দেখা যায় না।

এই প্রকার অনেক প্রশ্নই মনে জাগে যার উত্তর কারো জানা নেই। সেই কারণে সমর সেনের সামগ্রিক মূল্যায়ন অসম্ভব, তা আগেই বলেছি। অবশ্য সামগ্রিক না হলেও সমর সেনের বিশেষ বিশেষ ভূমিকার আংশিক মূল্যায়ন অবশ্যই সম্ভব।

যেমন সমর সেনের কবিতার এই মূল্যায়ন অবশ্য অনেক আগেই করা হয়েছে, যথার্থ ভাবেই করা হয়েছে। সমর সেনের কবিতার আধুনিকতা, নাগরিকতা, তার বৈদগ্ধ্য, তার নিজস্ব অম্ল-কটু শ্লেষের বিশিষ্টতা এই সব বিষয়ে নূতন করে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু একটা খবর আমি পাঠকদের দিতে পারি যা আধুনিক বাংলা কাব্য সম্পর্কে সমর সেনের মনোভাবকে খানিক প্রকাশ করে।

সকলেই জানেন, ১৯৪৬-এর পর সমর সেন আর কোনও কবিতা লেখেন নি। সকলেই জানেন, তিনি কাব্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন নিম্নলিখিত পংক্তি দুটি উচ্চারণ করে, যে দুটি পংক্তির অনবদ্য শ্লেষের মধ্যে সমর সেনের কাব্য-দর্শন সমগ্রভাবে বিধৃত:

> যৌবনের প্রেম শেষ প্রবীণের কামে।
> বছর দশেক পরে যাব কাশীধামে॥

কিন্তু তার পরও সমর সেন অন্তত একটি দুটি কবিতা লিখেছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৬১ সালের 'দেশ' পত্রিকার কোনও সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল 'পিকনিক' কবিতাটি। তখনও, সেই সময়ও, আমি জানতাম যে, সমর সেন কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন। কবিতাটির নিচে তারিখ লেখা ছিল ১৯৫৬। কিন্তু তাও তো ১৯৪৬-এর দশ বছর পর। তাই মনে ধাঁধা লেগেছিল, এ আর কোনও সমর সেন নয়তো? কিন্তু কবিতাটির গায়ে যেন সমর সেনের গন্ধ মাখানো। আমার সন্দেহভঞ্জন করতে বছর দশেক অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সত্তর দশকের মাঝামাঝি, আমার সঙ্গে সমরবাবুর যখন গাঢ় ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তখন আমি একবার তাঁকে ওই কবিতাটির কথা জিজ্ঞেস করি। উনি স্বীকার করেন, কবিতাটি উনিই লিখেছিলেন। আমি বলি, 'আপনি না কবিতা লেখা সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছেন?' উনি বলেন, 'হ্যাঁ'। আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, 'তাহলে হঠাৎ এ-

রকম একটা কবিতা লেখা কেন?' উনি বলেন, 'এক বন্ধু বাজি ধরে বলেছিল, তুমি চেষ্টা করলেও আর কবিতা লিখতে পারবে না। আমি তৎক্ষণাৎ একটি কাগজ টেনে নিয়ে কবিতাটি লিখে দিই।' এর পর আমি সমরবাবুকে তাঁর কবিতা লেখা বন্ধ করার কারণ নিয়ে একটু খোঁচাখুঁচি করি। যে রহস্য উদ্‌ঘাটন কেউ করতে পারে নি আমিও তাতে সফল হই নি। কিন্তু 'আর কবিতা লিখতে পারি না' এই যুক্তি দিয়ে তিনি আমাকে কাটাতে পারেন নি; কারণ একটু আগেই তিনি 'পিকনিক' কবিতাটির রচয়িতার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর মনোভাবের খানিক আভাস পেলাম। তাঁর চারপাশের প্রবীণ এবং নবীন কবিরা যে সব কবিতা লিখে যাচ্ছিলেন সেই কবিতা সম্বন্ধে তিনি কী ভাবেন, জিজ্ঞাসা কবতে প্রথমটা তিনি স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এড়িয়ে যান। তারপর বললেন. 'কী কবে জবাব দেব। খুব তো পড়ি না। পড়বার যোগ্য কবিতা তেমন লেখা হচ্ছে বলে তো চোখে পড়ে না।'

এই বোধহয় সমর সেনের কবিতা লেখা বন্ধ করে দেওয়ার রহস্যের চাবিকাঠি। কারও প্রত্যাশার মান যদি অতিশয় উচ্চ হয়, তো সাম্প্রতিক কালের বাংলা কাব্য-চর্চা বিষয়ে তিনি যদি খুব উৎসাহ বোধ না করলে তাঁকে বোধহয় দোষ দেওয়া যায় না। এই প্রকার ব্যক্তি যদি চারদিকের আর সকলকে পিগ্‌মি বলে মনে করেন তো তাতেও তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। এই মনোভাবটা নিতান্তই শস্তা অহমিকায় পরিণত হয়ে যেতে পারে, যদি সেই ব্যক্তি নিজেকে এরণ্ড প্রান্তরে মহীরুহ বলে কল্পনা করেন। সমর সেন সেই ভুলটি কখনোই করেছেন বলে মনে হয় না। তা যদি করতেন তো নিজের কবিতা লেখা বন্ধ করতেন না।

•

সমর সেনের অন্য একটি ভূমিকারও আংশিক মূল্যায়ন করার সাহস আমার আছে। এই ভূমিকাটি তিনি পালন করেছিলেন তাঁর ফ্রন্টিয়ার কাগজ সম্পাদনার মারফৎ। এবং ভূমিকাটির ক্ষেত্র ছিল রাজনীতি। সমরবাবু আগাগোড়াই বলতেন, তিনি কোন প্রকার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে নেই এবং থাকবেন না। তাঁর কাজ অতি সামান্য, একটি কাগজ চালানো মাত্র। তাঁর ঐ 'মাত্র' একটি কাগজ চালানোর কাজটি নকশাল আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে কী সুদূরপ্রসারী ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা মনে হয় ফ্রন্টিয়ারের নিয়মিত লেখক, সমর সেনের অনুরাগী বন্ধুসম্প্রদায় এবং সক্রিয় বিপ্লবী রাজনীতিতে অংশগ্রহণকারী নেতা ও কর্মী এই তিন ধরনের লোকেদের অধিকাংশেরই অজানা। সমর সেন নিজেও এই ভূমিকাটি কতটা সচেতনভাবে পালন করেছিলেন, তাঁর যে ঐতিহাসিক অবদানের কথা বলছি নিজে তিনি সেই বিষয়ে কতটা অবহিত ছিলেন, তা আমার জানা নেই।

নকশালবাদের জন্মলগ্ন থেকেই ফ্রন্টিয়ার তার সমর্থক থেকেছে। নকশালবাদ বলতে চলতি বাংলায় বা খবরের কাগজে যা বোঝানো হয়ে থাকে তার বেশি কিছু এখানে বোঝানো হচ্ছে না। সমাজ পরিবর্তনের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের কোন বিকল্প নেই, যে সংগ্রামে নেতৃভূমিকা গ্রহণ করবে দরিদ্র কৃষকেরা—মোটামুটি এই রাজনৈতিক দর্শনকে আমরা নকশালবাদ বলছি। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তিতে পরিচালিত সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে যত উত্থান পতন ঘটেছে তা ফ্রন্টিয়ারকে প্রভাবিত করে নি। কোন রাজনৈতিক দল, সংগঠন-বা গোষ্ঠীর সঙ্গে ফ্রন্টিয়ার নিজেকে যুক্ত করে নি। আবার কোনটির ছোঁয়াচ থেকেও নিজেকে বাঁচাবারও চেষ্টা করেনি। কো-অরডিনেশন্ কমিটির থেকে যখন চারু মজুমদারের নেতৃত্বে এম. এল পার্টি বেরিয়ে এলো তখন অন্য কিছু সংগঠন ছিল সেগুলি এই পার্টির সঙ্গে মিলিত হয় নি। তার পরের কুড়ি বৎসরে কতবার যে কত দল কত গোষ্ঠী গড়ে উঠল আবার ভেঙে পড়ল, এক অপরের সঙ্গে মিলিত হলো, আবার বিভক্ত হলো, তার হিসাব নেই। ফ্রন্টিয়ার আগাগোড়াই এই সবকটি গোষ্ঠী থেকে সমদূরত্ব রেখে চলেছে। এ যে কত কঠিন কাজ তা দলীয় বা গোষ্ঠীগত রাজনীতির বিষয়ে যারা জানে না তারা বুঝবে না।

নকশালরা প্রথম পর্যায়ে সমর সেন সম্পর্কে বন্ধুভাবাপন্ন তো ছিলই না, তাদের ছিল তাঁর সম্বন্ধে নিতান্তই এক তাচ্ছিল্যের মনোভাব। বর্তমান লেখকের মতো যেসব বামপন্থী বুদ্ধিজীবী কোন একটি পার্টির নেতাদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও নির্দেশকে অভ্রান্ত বলে মানতে পারে না, মতে মিললে সমর্থন করে, মতে না মিললে সমালোচনা করে, সেই প্রকার বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে সবকটি কম্যুনিস্ট পার্টির ছিল অগাধ অশ্রদ্ধা। সমর সেনও বাদ পড়েন নি। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের নকশালেরা ফ্রন্টিয়ারকে কোন পাত্তাই দিতো না, তাঁর সঙ্গে কোন যোগও রাখতো না। সমর সেনের দিকেও কোন দিনই ছিল না নকশাল নেতাদের সম্পর্কে কোন অতিরিক্ত বা অন্ধভক্তি। সেই প্রথম যুগে, যখন নকশালরা কথায় কথায় খতম করতো, তখন সমর সেন যে কত সহজে স্বয়ং চারু মজুমদারকে তীব্রভাবে সমালোচনা ও বিদ্রূপ করতে পারতেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। দুটি জলজলে উদাহরণ মনে পড়ছে। একবার লিবারেশন কাগজে ফলাও করে বিবরণ দেওয়া হয়, কীভাবে কোথায় কিছু কৃষক সংগ্রামী কোন জোতদারের মাথা কেটে তাই দিয়ে ফুটবল খেলেছে। সমর সেন তাঁর সম্পাদকীয় কলমে এই ঘটনাকে ঘৃণ্য বর্বর ও অমানুষিক বলে নিন্দা করেন। আর একবার তিনি বিদ্রূপ করে লিখলেন, 'বিশ্বাসের জোরে পর্বতকেও স্থানচ্যুত করা যায়।' উপলক্ষ্য ছিল চারু মজুমদারের সেই প্রসিদ্ধ ঘোষণা : অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ভাগীরথীর তীর দিয়ে রেড্ আর্মি মার্চ করে

যাবে। এই প্রকার ব্যঙ্গ বা সমালোচনা করলে যে তার পরদিনই চারু মজুমদারের শিষ্যরা তাঁকে কেটে ফেলতে পারতো তা তাঁর অজানা ছিল না।

কিন্তু ফ্রন্টিয়ার সম্বন্ধে মনোভাব নকশালেরা অবস্থার চাপে পড়ে পরিবর্তন করতে বাধ্য হলো। দেশব্রতী, লিবারেশন প্রভৃতি নকশালদের নিজস্ব কাগজগুলি একসময় থেকে চালানো আর সম্ভব হলো না। আন্দোলনে ভাঙন ধরল। নেতাদের অধিকাংশ ও কর্মীদের এক বৃহৎ অংশ পুলিশের হাতে ধরা পড়ল। যারা বাইরে রইল তাদের মধ্যে সংগঠন বলতে কিছু বাকি রইল না। সাংগঠনিক যোগাযোগের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বান্‌চাল হয়ে গেল। কিন্তু যোগাযোগের প্রয়োজন ফুরালো না। বরং বেড়েই গেল। তার কারণ, আন্দোলন ভাঙতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে নেতাদের নেতৃত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগতে শুরু করল, অভ্রান্ত বলে যে সব ধারণাকে বিনা বাক্য-ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল তাদের সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ পেতে শুরু করল, বিভিন্ন অঞ্চলের নকশাল গোষ্ঠীদের মধ্যে যারা সক্রিয় থাকতে পারছিল তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও আত্মসমালোচনা করে প্রচুর রাজনৈতিক দলিল তৈরি করছিল। কিন্তু প্রচারের কোন উপায় তাদের হাতে ছিল না। এই সময় উপায়ান্তর না দেখে তারা ফ্রন্টিয়ারকে ব্যবহার করতে শুরু করল। ১৯৭০ থেকে শুরু করে ১৯৭৭ পর্যন্ত ফ্রন্টিয়ার থেকে গেল বিচ্ছিন্ন বিভক্ত নকশালগোষ্ঠী ও নেতাদের মধ্যে চিন্তার আদানপ্রদানের একমাত্র বাহন। ঐ সময়কার ফ্রন্টিয়ার ঘাঁটলে দেখা যাবে, কি বিপুল পরিমাণ অজ্ঞাতবাসী ও কারাবাসী বিপ্লবীদের দলিল ফ্রন্টিয়ার কাগজে ছাপা হয়েছিল। শুধু দলিল নয়। ধরুন একজন নকশাল নেতা হাজারিবাগে জেলে রয়েছেন, আর একজন রয়েছেন প্রেসিডেন্সি জেলে। তাঁরা যদি নিজেদের মধ্যে আলোচনার প্রয়োজন অনুভব করেন তো কী ভাবে তা সম্ভব হতে পারতো? অন্যতম উপায় ছিল এই। প্রথমোক্ত ব্যক্তি ফ্রন্টিয়ার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠি জেল থেকে লুক্কায়িত পথে বার করে দিতেন, কোন ব্যক্তি সেই চিঠি স্বহস্তে বা ডাকে সমর সেনকে পৌঁছে দিত। এই রকম বস্তু সমর সেন প্রায়ই পেতেন এবং তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা না করে তাঁর কাগজের পরবর্তী সংখ্যাতেই তা ছেপে দিতেন। সেই কাগজ আবার প্রেসিডেন্সি জেলের ভিতর পাঠাবার ব্যবস্থা করা হতো। দ্বিতীয় ব্যক্তির উত্তরে বলার যা থাকত তাও লিখে আবারো লুক্কায়িত পথে জেল থেকে বার করে ফ্রন্টিয়ারে পৌঁছে দেওয়া হতো। এইভাবে চলত আদানপ্রদান। পুলিশের ভয়ে সমর সেন তাঁর যোগাযোগ রক্ষার ভূমিকা পালনে কিঞ্চিৎমাত্রও শিথিলতা প্রদর্শন করেন নি। পুলিশের ভয়ের কারণ অবশ্যই ছিল। জেলের ভিতর থেকে এবং অজ্ঞাতবাসের অন্তরাল থেকে নকশাল নেতাদের লেখা ফ্রন্টিয়ার কাগজে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে, এই ঘটনার থেকে সহজেই অনুমেয় ছিল যে সরকারের চোখে বেআইনী এইসব

বিপ্লবীদের সঙ্গে কোন না কোন যোগাযোগ ফ্রন্টিয়ার কাগজের রয়েছে। তা সত্ত্বেও পুলিশ যে কেন ফ্রন্টিয়ার কাগজকে বন্ধ করে দেয় নি বা সমর সেনকে গ্রেপ্তার করে নি তার পশ্চাতে অবশ্যই কোন কারণ আছে। কিন্তু সেই কারণ আর যাই হোক, সমর সেনের দিক থেকে কোন প্রকার আপস নয়।

সমরবাবু যে এই রাজনৈতিক ভূমিকা তাঁর সাংবাদিক জীবনের আগাগোড়াই পালন করেছিলেন তা অবশ্য নয়। ফ্রন্টিয়ারের আগে তিনি নাউ নামে একটি কাগজের সম্পাদনা করেছিলেন কয়েক বছর। নাউ কাগজটির একটি দুর্নাম ছিল, সেটাতে লিখতেন এমন অনেকে যাঁদের শৌখীন বামপন্থী বুদ্ধিজীবী বলে চিহ্নিত করা যায়। বিদগ্ধ, অর্থদায়ী পেশায় নিযুক্ত একাধিক লেখক, যাঁরা ইংরেজি লিখতে পারতেন খুব ভাল এবং যাঁদের লেখায় থাকত একটা উগ্র বিপ্লবী ঝাঁঝ, এই রকম কিছু লেখকের নাম কাগজটির সঙ্গে জড়িয়ে যায়। একই গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ বিদগ্ধ ও ইংরেজি ভাষায় কেতাদুরস্ত, কিছু বাঁধা পাঠকও জুটে যায়। বুদ্ধিজীবী মহলে সমাদর পেলেও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছে কাগজটা কোন আমলই পেত না। এর পর কাগজের মালিকপক্ষের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় সমর সেন বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা সামান্য কিছু পুঁজির ভিত্তিতে ফ্রন্টিয়ার কাগজের প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯৭৭ সালের পরও ফ্রন্টিয়ারের যে বিশেষ রাজনৈতিক ভূমিকার কথা বললাম তার আর প্রয়োজন রইল না। অধিকাংশ নকশাল বন্দীরা মুক্তি লাভ করলেন এবং কয়েক ডজন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়লেন। আবারো তাঁরা নিজেদের পত্রপত্রিকা বার করতে শুরু করলেন। অপর দিকে বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, যাঁরা এযাবৎ ফ্রন্টিয়ারে নিয়মিত লেখক ছিলেন এবং যাঁদের রাজনৈতিক মতামত ও ফ্রন্টিয়ারের সম্পাদকীয় মতবাদের মধ্যে ছিল বিশেষ মিল, তাঁদের অনেকেই মত পরিবর্তন করে নব-প্রতিষ্ঠিত বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে নিজেদেরকে গাঁটছড়ায় বাঁধলেন। ফলত, ফ্রন্টিয়ার ঐ লেখকদের সহায়তা থেকে বঞ্চিত হলো। তখন ফ্রন্টিয়ারে দেখা দিল এক সংকট, ভাল লেখা না পাওয়ার সংকট। যে সংকট পরবর্তী দশ বছর কাল বিজ্ঞাপনের সংকটের সঙ্গে মিলিত হয়ে সমর সেনকে কুরে কুরে খেয়েছিল। এই দুই সংকটের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সমর সেন যদি ফ্রন্টিয়ার কাগজের প্রকাশ বন্ধ করে দিতেন তো তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু তা তিনি দেন নি। তার কারণটা আমার কাছে সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয়। খানিকটা রাজনৈতিক কারণের কথা ভাবা যায়। দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে, আবারো ফ্রন্টিয়ারের প্রয়োজন বিপ্লবী মহলে অনুভূত হতে

পারে—এই চিন্তাটা খানিকটা তাঁকে নিশ্চয়ই ভাবিয়েছিল। কিন্তু এছাড়াও কিছু ব্যক্তিগত কারণও ছিল বলে আমার মনে হয়েছে।

সমর সেনকে ব্যক্তিগতভাবে আমি বেশ ভালভাবেই জানতাম কিন্তু তাঁকে কোন-দিনই বুঝে উঠতে পেরেছি বলে মনে করি না। তিনি খুব সরল ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁর চরিত্র মোটেই স্বচ্ছ ছিল না। তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে ভালবাসতেন না, তাঁর কথাবার্তা ও আচরণ থেকে তাঁর অন্তরের কথা বুঝে নেওয়া ছিল খুবই দুঃসাধ্য।

যেমন, গত দশ বছর তিনি একাধিক্রমে বলে এসেছেন, তিনি এখন আর কিছুই পড়েন-টড়েন না। তাঁর নিজের কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধও পড়েন না। বলতেন, প্রুফ দেখি মাত্র, অত প্রুফ দেখলে আর প্রবন্ধে কী লেখা হয়েছে বোঝার চেষ্টা করা যায় না। তিনি পড়েন না, পড়ে বোঝেন না, ভাল-মন্দ ভেদ করতে পারেন না, এই সব কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? কিন্তু তাই তিনি বলে যেতেন। কখনও কখনও তিনি তিক্ত সিনিশিজ্‌ম্ প্রকাশ করতেন। বলতেন, রাশিয়াতে থেকে গেলেই পারতাম, ওরা বেশ ভাল টাকা দেয়, ভাল মদও ওদেশে পাওয়া যায়। আরো বলতেন, রাশিয়া কেন, আমেরিকা থেকে ডাকলেও চলে যেতাম। এদেশে পড়ে থেকে কী আর হচ্ছে? বলাই বাহুল্য, তিনি রাজী হলে রাশিয়া-আমেরিকা দুপক্ষই যে কোন সময় তাঁকে লুফে নিতে এগিয়ে আসতো। সিনিক যদি হ'তেন তো পারতেন কি অত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে ফ্রন্টিয়ার কাগজ চালিয়ে যেতে?

ইংরেজিতে একটা কথা আছে, একজন মানুষের সংসর্গ দিয়ে তার চরিত্র বিচার করা যায়। সমর সেনের চরিত্র বিচারে এই প্রকরণটি প্রয়োগ করলে কোন ফলই পাওয়া যাবে না। তাঁর বাড়ির অতিশয় সাদাসিধে বসার ঘরে ভিড় করতো যে সব লোকেরা তাঁর প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধার আকর্ষণে তাঁরা কতই না বিচিত্র প্রকৃতির। বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে পেশায়, স্বাচ্ছন্দ্যে, অভ্যাসে ও রুচিতে যত বৈচিত্র্য তার সবই প্রতিফলিত হতো তাঁর বসার ঘরে সমাগত অতিথিদের মধ্যে, কেউ সাংবাদিক, কেউ অধ্যাপক, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ সরকারি চাকুরে, কেউ বিপ্লবী, কেউ বিদেশ-বাসী। এমন কি একসময় তাঁর নিয়মিত অতিথিদের মধ্যে একজন ছিলেন যিনি কলকাতা পুলিশের উচ্চতম স্তরের কর্তাদের একজন। নকশাল আন্দোলন যখন তুঙ্গে তখন সমর সেন সেই ভদ্রলোককে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, আপনি আর আমার বাড়িতে আসবেন না। সেই ভদ্রলোক নাকি জনান্তরে দুঃখ করে বলে-ছিলেন, "আমিই এত করে সমরদাকে বাইরে (অর্থাৎ জেলের বাইরে) রাখলাম আর উনি আমাকে এরকম বল্লেন।" কিন্তু এই একটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে তিনি

আর কাউকে তাঁর বাড়িতে আসতে মানা করেছিলেন বলে জানি না। যদিও তাঁদের সঙ্গে অধিকাংশের তাঁর না ছিল দৃষ্টিভঙ্গীর মিল, না ছিল মূল্যবোধের মিল। এঁদের অনেকেই দল করে এসে পকেটে করে আনা মদের বোতল বার করে আড্ডা জমাতেন। (সমর সেন নিজে কখনও মদ দিয়ে আপ্যায়ন করতেন না। তাঁর স্ত্রী সুলেখাদির নিজ হাতে এনে দেওয়া চা ও বিস্কুটের অধিক তিনি কখনও যেতেন না।) এর থেকে মনে হতে পারে সমর সেন বুঝি একজন মজলিসী লোক ছিলেন। যার বাড়িতে এত মজলিস বসে তাঁকে তো মজলিসী মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক কোন নিয়মই সমর সেনের প্রতি প্রযোজ্য ছিল না। তাঁর বসার ঘরের মজলিসে আমি অনেকবারই তাঁকে দেখেছি। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন যে মজলিসের মধ্যেও কোন মানুষ অতটা নিঃসঙ্গ হতে পারে। নিঃসঙ্গতা ছিল সমর সেনের ব্যক্তিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য, যে নিঃসঙ্গতা যে কোন গভীর চরিত্রের ব্যক্তির, যে কোন কবি-দার্শনিকের মধ্যে অবশ্য প্রত্যাশিত। ছোট্ট ঘরভরা লোক, অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে, মদের সঙ্গে চলেছে সিগারেট, তারই মধ্যে সমর সেন বসে থাকতেন নিজস্ব আসনটিতে, নিজস্ব ভঙ্গীতে, মূর্তিমান একাকীত্বের মতো। তিনি পান করতেন কম, কথা বলতেন আরো কম। মাঝে মাঝে এক একটি ক্ষুদ্র শব্দ বা বাক্য খানিক শ্লেষ, খানিক তিক্ততা, খানিক শুকনো হাসির মিশ্রণে উচ্চারিত হয়ে প্রমাণ রাখতো, সমর সেন উপস্থিত।

বিভিন্ন চরিত্রের ব্যক্তিরা শুধু যে তাঁর বাড়িতে ভিড় করতো তাই নয়, তাঁর সম্পাদকীয় স্তম্ভেও তিনি এমন অনেককেই লিখতে দিতেন যাঁদের সঙ্গে হয়তো তাঁর মতের মিল খুব বেশি ছিল না। এই ঘটনাটি নাউ পর্বে খুব বেশি ছিল। ফলে সম্পাদকীয় বক্তব্যে বেশ খানিক অসঙ্গতি থেকে যেত। ফ্রন্টিয়ার কাগজেও ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত এই অসঙ্গতিটি লক্ষ করা যেত। অবশেষে একটি ক্রান্তিবিন্দু উপস্থিত হয় সেই বছরের নির্বাচনের ঠিক আগের মুহূর্তে। ফ্রন্টিয়ার অনেক দিনই নির্বাচন বর্জনের লাইন বেছে নিয়েছিল। হঠাৎ করে একটি সম্পাদকীয় বেরিয়ে গেল যাতে পাঠকদের যুক্তফ্রন্টকে ভোট দিতে আবেদন করা হয়েছে। অত্যন্ত বিব্রত এক সমর সেন আমাকে জানান, তাঁর এক বন্ধু লেখাটি লিখে দিয়েছিলেন তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করেই। এর পর থেকে তিনি এই বিষয়ে সাবধান হয়ে যান। এবং ঐ জাতীয় অসঙ্গতিও দূরীকৃত হয়। ঐ বিশেষ বন্ধুটি নাউ ও ফ্রন্টিয়ারের নিয়মিত লেখক ছিলেন। কিন্তু এই ঘটনার পর আর কোনদিন তাঁর লেখা ফ্রন্টিয়ারে প্রকাশিত হয় নি।

শুধু এই বন্ধুই নন, তাঁর অনেক নিয়মিত লেখক বন্ধুই বামফ্রন্টের দিকে ঝুঁকে পড়ায় ফ্রন্টিয়ারে তাদের লেখা কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায়। যদিও তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক একেবারেই অমলিন থেকে যায়। রাজনৈতিক

লাইনের ব্যাপারে তিনি যদি খানিকটা আপস করতেন, তাঁর বামফ্রন্ট বিরোধিতাকে যদি খানিকটা নরম করে রাখতেন তো এই লেখকবৃন্দের কাছ থেকে অনেক লেখা পেয়ে তিনি তাঁর কাগজকে সমৃদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু সেই আপস তিনি করেন নি। ব্যক্তিগত সম্পর্ককে অটুট রেখেও রাজনৈতিক কারণে দূরত্ব বজায় রাখার তাঁর এই ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়ের উদ্রেক করতো।

তাঁর চরিত্রের ইস্পাতের বর্ম ভেদ করে একটি মাত্র গুণকে আমি পরিষ্কারভাবে চিনতে পেরেছি বলে সাহস করে বলতে পারি। সেই গুণটি হলো তাঁর গগনচুম্বী আত্মমর্যাদাবোধ। তিনি যে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন তাব পশ্চাতেও, অন্তত আংশিকভাবে, মনে হয় ছিল এই মর্যাদাবোধ, যা লিখেছি তার চেয়ে ভাল আর লিখতে পারব না, অতএব আর লিখে কাজ কি? এ এক বিরল অহংকার, যা ঐ মর্যাদাবোধেরই এক বিশেষ প্রকাশ। তিনি যে ফ্রন্টিয়ারের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে পারতেন না তার কারণও মনে হয় কারো কাছে কিছু চাওয়ার ব্যাপারে তাঁর অক্ষমতা। বিজ্ঞাপন তো যেচে আসে না, তা চাইতে হয়। লেখাও চাইতে হয়। এবং ফ্রন্টিয়ারের মতো কাগজে লেখা চাওয়ার মধ্যে কোনই অমর্যাদা নেই। তা সত্ত্বেও তিনি ঐ কাজটি সহজভাবে কবতে পারতেন না। তিনি মাঝে মধ্যে আমাকে এক আধটা পোস্টকার্ড লিখতেন লেখা চেয়ে। তারই মধ্যে কত না কুণ্ঠা কত দ্বিধা! মাঝে মাঝে ফ্রন্টিয়ারের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদনও করতে হতো। সেই সময় লজ্জায় যেন তিনি মাটিতে মিশে যেতেন। কোন নীতির ব্যাপারে আপস না করেই তিনি অনায়াসে অনেক টাকা উপায় করতে পারতেন, একথা আগে বলেছি। তা যে করেন নি তার কারণও মনে হয় তাঁর ঐ মর্যাদা-বোধ। অন্য কোন অর্থোপায়েব সূত্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা ছিল তাঁর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। স্বাধীনচেতা সমর সেন শ্রেয় গণনা করতেন ফ্রন্টিয়ারের মতো স্বাধীন ও বিদ্রোহী কাগজ চালিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করাকে।

এই মর্যাদাবোধ তাঁর শেষ জীবনকে একটি নৈতিক ফাঁদেব অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়েছিল বলে মনে হয়। অত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি যে ফ্রন্টিয়ার কাগজটিকে বন্ধ করে দেন নি তার পশ্চাতে কোন ব্যক্তিগত কারণ থাকার কথা আগে বলেছি, আমার অনুমানটা এই: সমর সেন ফ্রন্টিয়ার কাগজকে চালাতেন শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রেরণায় নয়। এটিই ছিল তাঁর জীবনধারণেরও উপায়। ফ্রন্টিয়ার থেকে কত পয়সা আয় তিনি করতেন তা আমি জানি না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তা ছিল এতই কম যে তার কথা ভাবলে লজ্জায় আমার মাথাকাটা যায়, কারণ ভারত সরকারের কৃপায় আমরা অধ্যাপকেরা সমর সেনের চেয়ে তুলনাতীতভাবে কম গুণের অধিকারী হয়েও তাঁর চেয়ে অনেক বেশি আয় করে থাকি। এবং নির্লজ্জ আমরা তা বাড়াবার জন্য আন্দোলনও করে থাকি। ফ্রন্টিয়ার বন্ধ করে দিলে সমর

সেনের স্বাধীন আয়ের এই পথটুকু একেবারেই বন্ধ হয়ে যেত। তাঁর কোন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সই ছিল না। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে তিনি তাঁর পরিবারের জন্য প্রায় কিছুই রেখে যান নি। এই কারণে ফ্রন্টিয়ারকে তিনি বন্ধ করে দিতে পারছিলেন না। অথচ ভাল লেখাও তিনি সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। আগে যে রাজনৈতিক ভূমিকা কাগজটি পালন করেছিল, তারও আর সুযোগ ছিল না। এই অনুমিত অবস্থাটিকেই আমি ফাঁদে ধরা পড়ার অবস্থা বলে বর্ণনা করছি। অত্যধিক আত্মমর্যাদাপ্রসূত এই অবস্থার জন্য তিনি জীবনের শেষ কয়েক বছর অত্যন্ত গ্লানি ও পীড়া ভোগ করেছিলেন।

সিনিসিজমের কাছে আত্মসমর্পণ না করলেও হতাশা সমর সেনকে শেষ জীবনে ভাল-ভাবেই গ্রাস করেছিল। যৌবনে তিনি কলকাতার যে নাগরিক জীবনে যে ধূসরতা বিবর্ণতা ক্লীবতা ও জড়দশার দর্শক হয়েছিলেন, পরিণত বয়সে সেই অবস্থার থেকে উত্তরণের জন্য বৈপ্লবিক পন্থার উপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন। এবং তার সমর্থনে নিজের [illegible] জীবনটাকেই পণ রেখেছিলেন। এই আস্থা তিনি শেষ পর্যন্ত বজায় রাখতে পারেন নি। এই হতাশা তাঁর কথায় ও আচরণে প্রায়ই প্রকাশ পেত।

সেই হতাশার সঙ্গে মিশে থাকত একটি শোকের প্রচ্ছন্ন আভাস। কোন সাময়িক শোক নয়। সমর সেনের পূর্ববর্তী জীবনের কথা আমি অন্য কারো চেয়ে বেশি জানি না। শুধু এইটুকু জানি, পারিবারিক কারণে তাঁকে অনেক শোকের আঘাত পেতে হয়েছিল। তাঁর দুই কন্যার একজনের জীবনটা যেভাবে নষ্ট হয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হয় তা তাঁর জীবনের এই অন্ধকার দিকের একটি অংশ মাত্র। তাঁর চলনে বলনে গলার স্বরে সবসময়ই মিশে থাকত একটি শোকের ছায়া যা বোধহয় পাতিত করতো তাঁর পূর্ববর্তী জীবন। এই হতাশা ও শোকই শেষ পর্যন্ত হলো তাঁর মৃত্যুর কারণ।

সমর সেনের মৃত্যু আমাকে চমকিত করে নি। এই মৃত্যু আমার কাছে অনেক দিনই প্রতীক্ষিত ছিল। তাঁর বয়স বেশি হয় নি। কিন্তু বয়স দিয়ে তো মৃত্যুর লগ্ন বিচার করা যায় না। তাঁর হতাশা ও শোকের মিশ্র ভাবের মধ্যে আমি অনেক দিন থেকেই মৃত্যুর ছায়াকে ঘনায়মান হতে দেখে এসেছি। তাঁর সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় এপ্রিল মাসে। তখনই আমি মৃত সমর সেনের মুখচ্ছবি দেখেছিলাম। মনে মনে বিদায় নিয়েছিলাম।

মালিনী ভট্টাচার্য

অবক্ষয়ের কবিতা না কবিতার অবক্ষয় : সমর সেনের কবিতা ও একটি বিতর্ক

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে সমর সেন—যিনি তখন 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন—'In Defence of the "Decadents"' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ঐ অধিবেশনেই পঠিত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধ এবং সমর সেনের এই প্রবন্ধটি নিয়ে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের মধ্যে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং 'অগ্রণী' পত্রিকায় ১৯৩৯ ও ১৯৪০-এ যে উত্তর প্রত্যুত্তর চলে তার কথা অনেকেরই জানা। ১৯৭৭ সালে 'উড়ো খৈ' পর্যায়ের একটি লেখায় সেই বিতর্কের স্মৃতিচারণা প্রসঙ্গে সমর সেন বলেন : 'সরোজ বাবু ঠিক লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে অনেক লেখক বোধহয় বিপ্লবীর অভিনয় করে বাহবার চেষ্টায় থাকতেন, তাঁদের আসল চেহারা সরোজ দত্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।' পরের অনুচ্ছেদে এই উক্তি কিছুটা সংশোধিত হয় : '...আক্রান্ত প্রবন্ধকারের জবাব পড়ে মনে হ'ল, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ...প্রবন্ধকারের জবাবটা বালখিল্যসুলভ নয়, যদিও কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গিয়েছে। সরোজবাবুর প্রত্যুত্তরটা কিন্তু অনেকটা উকিলসুলভ।' ১৯৩৮ সালে নিজের সম্পূর্ণ 'অবৈপ্লবিক' জীবনযাত্রার পরিপ্রেক্ষিতে সরোজ দত্ত প্রযুক্ত 'নির্বোধ প্রবঞ্চক' আদি বিশেষণে অস্বস্তি বোধ করলেও ১৯৭৭-এর সমর সেন 'বৈপ্লবিক কবিতা'র সপক্ষে পূর্বোক্তের সব যুক্তি মেনে নিতে পারেননি। 'উড়ো খৈ'-এর মন্তব্যগুলি থেকে কিন্তু সমর সেনের নিজস্ব অবস্থানও খুব পরিষ্কার হয় না। ঐ বিতর্কের মূল প্রশ্নগুলি কী ছিল এবং সমর সেনের কাব্যকৃতি তার সঙ্গে কীভাবে সম্পৃক্ত এ নিয়ে আলোচনার অবকাশ রয়ে গেছে। এ নিবন্ধের অবতারণা সেই জন্যই।

'অগ্রণী' পত্রিকায় (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৯) 'ছিন্ন কর ছদ্মবেশ' শীর্ষক নিবন্ধে সরোজ দত্ত বুদ্ধদেব বসুকে যে আক্রমণ করেন, তা তত্ত্বের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু 'অগ্রণী'তে এর বছরখানেক পরে (এপ্রিল, ১৯৪০) সমর সেনের প্রসঙ্গে তার বিরোধিতা তাত্ত্বিক সীমানা ছাড়িয়ে সমর সেনের কবিতার পর্যালোচনায় গিয়ে পৌঁছেছে। অর্থাৎ, সমর সেনের 'অবক্ষয়ী' তত্ত্বের প্রতিফলন তিনি দেখতে পেয়েছেন তাঁর কাব্যকৃতির 'অবক্ষয়ী' চরিত্রে। প্রথমত সমর সেন তাঁর কবিতায় যে আসন্ন বিপ্লবের ছায়াপাত ঘটাতে চেয়েছেন, সরোজ দত্তের মতে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু জীবনদর্শনের সঙ্গে তা সংগতিপূর্ণ নয়। তাঁর 'সাম্যবাদী ভাবাদর্শ' উর্বশীর মতো

"যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা, পূর্ণ প্রস্ফুটিতা"। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্য থেকে এই সাম্যবাদী আদর্শের পরিস্ফুটন কী প্রক্রিয়ায় সম্ভব তার কোনো ইঙ্গিত এই কবি দিতে পারেননি। তাই বিপ্লবের মন্ত্রোচ্চারণ 'কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল' ছাড়া কিছুই নয়। দ্বিতীয়ত, সরোজ দত্তের মতে আঙ্গিকের দিক থেকে এই কবিতা পাঠক সম্প্রদায়ের প্রতি 'সানুনাসিক অবহেলা'র পরিচায়ক। আঙ্গিক এখানে বিষয়কে ছাপিয়ে গুরুত্ব পেয়েছে, এবং 'communicativeness'-এর দিকে পেছন ফিরে একটি সীমাবদ্ধ 'intellectual clique'-কে খুশি করার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে।

সমর সেন তাঁর উত্তরে জোর দিয়েছিলেন 'মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন' থাকার ওপরে। বলেছিলেন, এই সচেতনতা মানেই কবিতায় বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করা নয়, এবং তাঁর কবিতাকে তিনি বিপ্লবী কবিতা বলে দাবি করেন এই অভিযোগটিই অস্বীকার করেছিলেন। তবু 'নেইমামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়' এই যুক্তিতে কবিতায় এই সচেতনতার উত্তরাধিকারীদের প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানান। তাঁদের লেখায় 'নিপীড়িত শ্রেণীর আশাভরসা, কিংবা সংগ্রামের সংযম অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর প্রথম বিতর্কিত প্রবন্ধটির উক্তি অনুযায়ী 'Consciousness of decadence is certainly a power' তাঁর নিজের কবিতার কথা তিনি না বললেও, এখান থেকে সূত্র টেনে বলা যায় উত্তরণের প্রক্রিয়া যে পর্যন্ত ভবিষ্যতের কুয়াশায় আচ্ছন্ন, তিনি তাঁর কবিতায় এই 'power'-টুকুই আয়ত্ত করতে চান।

১৯৩৮-১৯৪০-এর এই বিতর্কটির একটি আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটও ছিল। সরোজ দত্ত যখন তাঁর দ্বিতীয় বারের প্রত্যুত্তরে Cornforth-এর 'There is no middle position between Revolution and Reaction'—এই উক্তিটিকে মূলসূত্র রূপে বর্ণনা করে—'united front' আন্দোলনের প্রসঙ্গ তোলেন তখন এই আন্তর্জাতিক অনুরণন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৪ সালের সোভিয়েট লেখক সম্মেলনে সাহিত্যে দুই শিবিরের যে তত্ত্বকে জ্দানভ, গোর্কি প্রমুখ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী ধিক্কারের ঢেউয়ে তা ১৯৩৬ সালে গঠিত ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের চেতনাকেও ধাক্কা দেয়। ১৯৩৮ সালে সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলনে মুল্‌ক রাজ আনন্দ পঠিত অভিভাষণটি থেকে একথা বোঝা যায়। সেখানে গোর্কির একটি লেখার উল্লেখ করা হয়েছে ও ফ্যাসিবাদী বিপদের বিরুদ্ধে ইউরোপীয় লেখক-বুদ্ধিজীবীদের 'ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা' থেকে সমিতি-চেতনায় উত্তীর্ণ হওয়ার ছবির দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করা হয়েছে। সমর সেনের বিরুদ্ধে সরোজ দত্তেরও একটি প্রধান অভিযোগ ছিল 'ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা', যদিও এই অভিযোগ সমর সেনের কাব্য-আঙ্গিকের প্রসঙ্গেই বিশেষভাবে তোলা হয়েছে।

বস্তুত সমর সেনের বিতর্কিত প্রবন্ধের 'decadent' এই মূল শব্দটিও ১৯৪৩ সালের সোভিয়েত লেখক সম্মেলন থেকে উচ্চারিত বুর্জোয়া সাহিত্যের চরিত্র বিশ্লেষণকেই মনে পড়িয়ে দেয়। জ্দানভ বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তিনটি ধারা লক্ষ করেছিলেন : '…that section of literature which is trying to conceal the decay of the bourgeois system…those representatives of bourgeois literature who feel the state of things more acutely are absorbed in pessimism, doubt in the morrow, eulogy of darkness, extolment of pessimism as the theory and practice of art...only a small section—the most honest and far-sighted writers—are trying to find a way out along other paths, in other directions, to link their destiny with the proletariat and its revolutionary struggle.'

জ্দানভের শেষোক্ত দুটি রচনাদর্শই যে আমাদের আলোচ্য বিতর্কটির মূল প্রাক্ধারণাগুলি জুগিয়েছে—সমর সেনের ক্ষেত্রেও বটে, সরোজ দত্তের ক্ষেত্রেও বটে—এটা বোধহয় সাধারণভাবে ধরে নেওয়া যায়।

আর এগুলি প্রাক্ধারণার পর্যায়ে রয়ে গেছে বলেই এই বিতর্কে কোনো পক্ষেই স্পষ্ট হয় না 'decadence'-এর এই তত্ত্ব কীভাবে প্রযুক্ত হবে স্বদেশের রাষ্ট্রীয়-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে, পুঁজিবাদের বিশ্বব্যাপী যে সংকট ফ্যাসিস্ট শক্তির উত্থানে প্রতিফলিত, তার সঙ্গে ব্রিটেনের এক বৃহৎ উপনিবেশে আধা-সামন্ততান্ত্রিক শোষণে জর্জরিত জাতির সমস্যাকে কীভাবে সম্পৃক্ত করা হবে তা এই তাত্ত্বিক আলোচনার কোথাও নেই। সমর সেনের কবিতা কিন্তু এদিক থেকে তাঁর তাত্ত্বিক অবস্থানকে ছাপিয়ে গেছে; সেখানে পরিস্থিতির বিশিষ্টতা অনেক বেশি স্পষ্ট। সমাজের যে তুলনায় ক্ষুদ্র কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী তাঁর কবিতার প্রধান পাঠক, তাকেই কথক-চরিত্র হিসাবে উপস্থাপিত করে তাঁর কবিতা। এবং এই কথকের কণ্ঠস্বরের পেছনেও জেগে থাকে আরেকটি নীরব কণ্ঠ, যা কথকের উক্তিগুলিকে খণ্ডিত করে, তার সীমাবদ্ধতার দিকে আঙুল দেখায়। 'অগ্রণী'র উত্তরে সমর সেন এটুকুই বলেছিলেন। 'কর্মভীরু, পলাতক, আধা-বাস্তব, আধা-রোমান্টিকভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। "গ্রহণ"-এর নাম-কবিতায় যে টাইপের জীবন, এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক…' কিন্তু এই মুমূর্ষু শ্রেণী কোন্ শ্রেণী? কে এই নায়ক, যে স্বর্গে 'কবন্ধের ছায়া' দেখে অভিশাপ-স্খালনের মিথ্যা আশায় 'মরা গঙ্গায়' স্নান করতে নামে; কে সে যে নিজের বিষয়ে বলে : 'নিজের ছায়াভীরু, / ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই'? এতো ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যবাদী দেশের পুঁজিপতি বা তার প্রসাদ-

ভোগী নয় এতো পরাধীন দেশের মধ্যবিত্ত, 'গ্রহণ' শিরোনামায় যার সামন্ততান্ত্রিক অদৃষ্টবাদিতার শিকড়ের আভাস স্পষ্ট। তার ক্ষয়িষ্ণুতার চেহারা যে পৃথক্, তা চোখের উপর দেখা যায়। আবার তার চেতনার দ্বৈধতা যা তার নাগরিক অস্বস্তিতে প্রতিফলিত—ফুটে ওঠে 'সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে / ময়দানে উধাও' হওয়াতে। যে দীর্ঘ দিন 'গ্রীষ্মের পিচে কেঁপে / সন্ধ্যায় শূন্যগর্ভ, স্বস্তিহীন' সে তো এই নাগরিক-অথচ-সামন্ততান্ত্রিক সংকটাপন্ন সত্তারই চিত্রকল্প।

তাঁর বিতর্কিত নিবন্ধে তাঁর স্বশ্রেণী—যাকে নিয়ে তাঁর কবিতা—তাকে সমর সেন 'demoralised petty bourgeoisie' বলে বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু কবিতায় এই সাধারণীকৃত বিবরণের চাইতে অনেক স্বচ্ছ একটি চিত্র পাওয়া গেল, যেখানে স্থানকালের বিশিষ্টতাই প্রধান লভ্য। সোভিয়েত সাহিত্যিক সম্মেলনের দলিল থেকে একটি আদল (model) পাওয়া গিয়েছিল, নিবন্ধের মধ্যে সমর সেন তার পুনরাবৃত্তি করেছেন মাত্র, কিন্তু কবিতায় তাকে বিশেষের রূপায়ণে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এভাবেই হয়তো অবক্ষয়-বিষয়ক কবিতা তার বিষয়কে ছাড়িয়ে যেতে পারে, কবিতায় উত্তরণ-বাচক কোনো শব্দ বা বাক্য সরাসরি না থাকলেও পারে।

সরোজ দত্ত তাঁর দ্বিতীয় উত্তরে ১৯৪০-র আগের দশকে বাংলার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির কিছু বিশ্লেষণ করেছেন এবং এক 'অতিদ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তনে'র আরম্ভের কথা বলেছেন। এর এক প্রধান ফল নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে 'অতিদ্রুত শ্রেণীবিচ্যুতি'; তিনি আরো বলেছেন: 'চাষী ও দিনমজুরের দৈনন্দিন খণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক সংগ্রাম সংহত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিম্নাংশ কিষাণ মজুরশ্রেণীর সহিত স্বার্থসাম্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে, এবং রাজনীতি সাধারণের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে।' তাঁর অনুযোগ এই যে ১৯৪০-এর আগের দশকে বাংলাভাষায় যে কবিতা লেখা হয়েছে, তাতে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কোনো আভাস নেই।

ত্রিশের দশকের বাংলা কবিতা সম্বন্ধে একথা মেনে নিলেও কিন্তু প্রশ্ন থাকে, যে কবিতার প্রধান ভোক্তা যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, তার চেতনায় এই পরিবর্তনকে কীভাবে প্রতীয়মান করা যাবে। এতো একটা তৈরি ভাষা থেকে আরেকটা তৈরি ভাষায় ঢুকে পড়ার ব্যাপার নয়, কবিতার বর্তমান ভাষাকেই আশ্রয় করে তাকেই গালিয়ে গড়েপিটে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই; যে ভাষা এতদিন লিখিত কবিতার আওতার মধ্যে ছিল না, তাকে বারবার ব্যবহার করার চেষ্টা করতে হবে যাতে কবিতার বর্তমান ভাষার পরিধিকে বদলে দেওয়া যায়। অর্থাৎ ঐতিহাসিক বিবর্তনকে মেনে নেওয়া মানেই এই নয় যে সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষায় তার স্থান করে দেওয়া যাবে। ভাষার বিবর্তন ছাড়া যে চেতনার

বিবর্তন হয় না, এটা সরোজ দত্ত অনুধাবন করেননি। এছাড়া, সরোজ দত্ত যে 'অবক্ষয়'কে নিছক বিদেশ থেকে ধার-করা একটি মনোভাব হিসাবে নিয়েছেন—নিয়েছেন এলিয়টীয় পন্থার মুখ-ভ্যাংচানো হিসাবে—তা কি সত্যিই তাই? বাঙালি তথা ভারতীয় মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের যে বিশিষ্ট চরিত্র, সমর সেনের কবিতায় কি সেটাই ধরা পড়েনি? শ্রেণীবিচ্যুতি মানেই তো স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া নয়; তার মধ্যেও তো কতগুলো ধাপ থাকে, সচেতনভাবে গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত থাকে। বাঙালি মধ্যবিত্তের 'অবক্ষয়ে'র একটা জরুরি দিক তার সামন্ততান্ত্রিক পিছুটানে, যেহেতু ঔপনিবেশিক পরিস্থিতিতে তার সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষমতার সীমা একেবারে ছ'কে-দেওয়া, তার সামনে এগোবার কোনো রাস্তা নেই, ঠিক সেই কারণেই জমির সঙ্গে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ক্রমক্ষীয়মাণ অর্থনৈতিক বাঁধন দুরারোগ্য nostalgia-র সৃষ্টি করে। যার ফলে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণীস্বার্থের সঙ্গে এক হওয়া কখনো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটতে পারে না। সমর সেন তাঁর কবিতায় বাঙালি মধ্যবিত্তের সামন্ততান্ত্রিক অতীতের অহমিকা ও নাগরিকজীবনের শ্বাসরোধী শূন্যতাকে প্রথম মিলিয়ে দিতে পারলেন। সরোজ দত্ত ত্রিশের কবিদের অবক্ষয়-চেতনাকে নিছক সাহেবিয়ানা বলে ধরে নিয়েছিলেন; হয়তো তাই সমর সেনের এই সাফল্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেননি।

বস্তুত সরোজ দত্তের কাছে সমর সেনের কবিতার অবক্ষয়ী কণ্ঠটিই নির্ধারক কণ্ঠ; কবিতার সামগ্রিক পরিমণ্ডল যেন সেই কণ্ঠটিই তৈরি করে দেয়।

> 'তবু জানি,
> জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে। চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
> আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
> ততদিন
> ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস
> পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া,
> অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো…'

এই বক্তব্যকে সরোজ দত্ত সরাসরি কবির নিজস্ব বক্তব্য বলে ধরে নিয়েছেন ও 'ততদিন' কথাটিতে কবির যদ্ভবিষ্য আত্মপরিক্রমার সাফাই গাওয়া শুনতে পেয়েছেন, কিন্তু 'পেস্তাচেরা চোখ'-এর রূপকল্পে ও অন্ধকূপের স্তব্ধ ইঁদুরের উপমায় এই মনোভাবের উপর যে ক্রুদ্ধ ও ঘৃণাদিগ্ধ প্রহার এসে পড়ছে তা তিনি সম্ভবত খেয়াল করেননি। আকাশগঙ্গা পৃথিবীতে নামার আশা ততদিন অলীক স্বপ্নবিলাস যতদিন 'বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার' গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনকে জাগাতে পারে না। 'আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে'—এটা একটি সাহসী ঘোষণা, কিন্তু মধ্যবিত্তের কর্মভীরু চেতনায় তা আবার অসহনীয় জীবনকে সহনীয় করে রাখার

একটি মলমও বটে। কবিতার মধ্যে কবি কিন্তু এই দুটি অর্থকেই নিয়ে আসতে পেরেছেন ; মধ্যবিত্ত হিসাবে নিজের নিশ্চেষ্ট বুলি-আওড়ানোকেই আবার নির্মম বিদ্রূপে বিদ্ধ করেছেন। গর্ভবাসী 'কৃষ্ণবর্ণ' পুরুষের 'কাপুরুষ' প্রহার—এ যেন তাঁর নিজের সঙ্গেই নিজের লড়াই। সমর সেন সরোজ দত্তকে উত্তর দিতে গিয়ে যখন 'আমি নিজেকে কখনো বিপ্লবী কবি বলে দাবি করিনি' এটুকু বলেই ক্ষান্ত থাকেন, তখন তাঁর নিজের কবিতার গর্ভস্থ এই প্রতিবাদী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষের কথা যেন নিজেও ভুলে যান। সে 'কাপুরুষ' কেন না সে ঘরভেদী—ভেতর থেকে স্বশ্রেণীকে আক্রমণ করছে, এখনও বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেনি। বাইরে বেরোনো তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু স্বশ্রেণীর প্রতি তার তীব্র ঘৃণাও কি কবিতায় প্রকটিত হয় না, আর এই ঘৃণাই কি বৈপ্লবিক বিবর্তনের একটি প্রাথমিক ধাপ নয়? নিজের অবলুপ্তির কামনা থেকেই তো এই প্রহার : 'সেইদিন লুপ্ত হোক। যে-দিন পুরুষ পৃথিবীতে আসে'। 'ততদিন' কথাটি মধ্যবিত্ত চেতনার এই কাম্য লুপ্তিকে ঠেকিয়ে রাখা শুধু। ক্রুদ্ধ ব্যঙ্গে কথাটি জ্বলন্ত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেও আমরা এক সামগ্রিক প্রলয়-পয়োধিতে বিলুপ্ত হবার আগে বাক্তিস্বার শেষ আত্মসমীক্ষা ধ্বনিত হতে শুনি :

> এ-কখানা জীর্ণ কাঠে অস্মিতার অসম্ভব দাবি
> আবার প্রতিষ্ঠা পাবে সপ্তসিন্ধুপারে ?
> তার চেয়ে নিঃশঙ্ক সাঁতারে
> ব্যয় করে নিঃশ্বাসের অন্তিম সঞ্চয়,
> অগাধে সংকল্পসিদ্ধি একাধারে নিশ্চিন্ত নিশ্চয় ॥'

সুধীন্দ্রনাথ ও সমর সেন দু'জনেরই কবিতায় পাই আত্মবিলোপকামী স্বশ্রেণীর কণ্ঠস্বর। কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় বক্তা তবু নায়কের ভূমিকায় থাকে, কেন না সে একমাত্র দ্রষ্টাও বটে। ধ্বংসের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত অন্তত অস্মিতার এই দিকটুকু সে বজায় রাখে : সত্যের দিকে সচেতন দৃষ্টিক্ষেপ। কিন্তু অস্মিতার এইটুকু অভিমানও সমর সেনের কবিতায় আর থাকে না ; তা তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। কারণ এই বক্তার দৃষ্ট সত্যও তো এক খণ্ডিত সত্য। ইতিহাসের প্রধান অগ্রগামী শক্তি তো তার সচেতনতা নয়। বলা যেতে পারে ত্রিশের দশকের পরে বাংলা কবিতার সীমানাকে ভেঙে মধ্যবিত্ত চেতনার আড়ালে এই নতুন ব্যঙ্গের মাত্রা প্রয়োগ করার কৃতিত্ব সমর সেনেরই। ১৯৭৭ সালে তিনি নিজের চার দশক আগে লেখা নিবন্ধের মধ্যে একটা 'ফাঁকি' খুঁজে পেয়েছিলেন। সে 'ফাঁকি' কি তবে এই ছিল যে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তিনি যথেষ্ট বলেননি ? তাঁর কবিতাই অবক্ষয়ী, এ অভিযোগ মেনে নিয়েছিলেন, যেহেতু 'decadence'-এর প্রাক্‌ধারণাটিতে তাঁর সরোজ দত্তের সঙ্গে বিশেষ তফাত ছিল না ? তা যদি হয়,

তবে বলতে হবে এটা শুধু সরোজ দত্ত-বনাম-সমর সেনের কলম যুদ্ধ নয়, এই প্রাক্‌ধারণা প্রগতি লেখক সংঘকেই সাধারণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

'Communicativeness'-এর প্রয়োজন অস্বীকার করে শুধু একটি 'intellectual clique'-এর জন্য লেখা—এটাই ছিল সরোজ দত্তের দ্বিতীয় অভিযোগ। অন্যদিকে কবিতার মাধ্যমে সর্বসাধারণের সঙ্গে 'Communication' যে সম্ভব নয় সক্রিয় কবি হিসাবে এই সীমানাবোধ সমর সেনের পূর্ণমাত্রাতেই ছিল। তিনি বলেছিলেন যতক্ষণ জনতার বৃহদংশ অক্ষরজ্ঞানহীন, ততক্ষণ কবির নিয়তি স্বগতোক্তি, তাঁর কোনো 'real audience' নেই। কবিতা তথা সাহিত্যের ভাষা সমাজ-জীবনের নির্দিষ্ট একটি অংশের ভাষা; বিশেষ শ্রেণী বা জনগোষ্ঠী তার উদ্দিষ্ট। সেই ভাষাকে আয়ত্ত করে তবেই তার অর্থের পরিমণ্ডলের মধ্যে ঢোকা যায়। শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে, বিশেষত যে সমাজে এক বৃহদংশ অক্ষরজ্ঞানহীন—সেখানে কথ্য কবিতা ও লেখ্য কবিতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েই যাবে, যাঁরা কবিতা লেখেন তাঁরা ভাষার তরণীতে ঐ বৃহদংশের কাছে পোঁছতে না পেরে বিচ্ছিন্নতার বোধে ভুগবেন, এটা তাঁদের সামগ্রিক সংকটের একটা অংশ মাত্র। অন্যদিকে ঐ বৃহদংশের যে ভাষা তাও ঐতিহাসিক কারণেই সীমাবদ্ধ; আমাদের কবি যদি অসাধ্যসাধন করে সেই ভাষা আয়ত্ত করতে পারেন, তবু তাঁর নতুন কথা বলতে গেলে তাঁকে ঐ নিপীড়িত, পর্যুদস্ত ভাষার গণ্ডিকেও ভাঙতে হবে। 'Communicativeness'-এর অভাবকে সরোজ দত্ত নিছক নৈতিক সমস্যা হিসাবে দেখেছেন, তার মতে এর কারণ কবিদের 'subjective initiative-এর অভাব। বস্তুতঃ দেখা যাচ্ছে এ সমস্যা একটি ভাষাগত সমস্যা, যার মোকাবিলা একমাত্র করা যায় ভাষা নিয়ে নিরন্তর পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে। জনসাধারণের উপযোগী এমন কোনো সরল, সহজ, বলিষ্ঠ ভাষার ছক নেই যার মধ্যে যেকোনো কবি অক্লেশে ঢুকে যেতে পারেন। অন্যদিকে কবির হাতে ভাষার নবীকরণ হওয়া মানে তাঁব উদ্দিষ্ট পাঠকের ভাষাগত অভ্যাসে আঘাত লাগা; এই নতুন ভাষাকে আয়ত্ত করার জন্য পাঠককেও পরিশ্রমী এবং সজাগ হতে হবে। চাল্লিশের দশকে সুকান্ত ভট্টাচার্য ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে-কাব্যভাষার গোড়াপত্তন করেন, তাও কোনো স্বতঃস্ফূর্ত জনতার ভাষা নয়—একে যদি আমরা খুব সীমিত অর্থেও গণকবিতা বলি (যেহেতু সব স্তরের সব মানুষের কাছে আজও তা পৌঁছনো সম্ভব নয়), সে 'গণকবিতা' তাঁরা পরিশ্রম করেই গড়ে তুলেছেন, এবং যেহেতু তা তার উদ্দিষ্ট পাঠকের ভাষাগত অভ্যাসকে আঘাত করে, সেই পাঠককেও পরিশ্রম করেই এ ভাষার রস গ্রহণ করতে হয়। সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'লেনিন' বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'অগ্নিকোণ' এই সত্যকেই স্পষ্ট করে তোলে।

সমর সেনের ভাষা এবং ছন্দ অবশ্যই অন্য ধরনের। কারণ তাঁর কাব্যিক

উদ্দেশ্যও ভিন্ন। কিন্তু তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগ কেন এসেছিল? যাকে 'অবক্ষয়ী' কবিতার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা কি বস্তুত ছিল নতুন ভাষা সৃষ্টি করার চেষ্টা? তাঁর মধ্যবিত্ত পাঠকের কাব্যবোধের গণ্ডিকে নাড়িয়ে দেবার প্রয়াস করেছিলেন বলেই তাঁকে পরিচিত বাক্‌ভঙ্গিগুলি ভেঙে তাতে নতুন মাত্রা দিতে হয়েছিল? 'ঘরে বাইরে' কবিতাটিতেই আমাদের ভাষাগত প্রত্যাশার ওপর এই ঘন ঘন আঘাতের প্রচুর নিদর্শন।

'কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ম্বরা প্রেম…'

এখানে 'যেন' কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপরের স্মৃতিমেদুর ছবিটিকে 'যেন' কথাটি আরো ধূসর দূরত্বে নিয়ে যায়। সত্যিই কোনোদিন এসব ছিল কিনা সেই বিশ্বাসের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দেয়। এবং বিপরীতে আজকের 'কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম' এই ছবিটি ঐ nostalgia-র মূলে আঘাত করে, তার অসুন্দর, অশ্লীল বাস্তব ভিত্তিটিকে পরিষ্কার করে দেয়।

যে গদ্যছন্দের সঙ্গে বাংলা ভাষায় আমরা সমধিক পরিচিত, সমর সেনের গদ্য-ছন্দের চরিত্র তার থেকে আলাদা। এই গদ্যছন্দ কোনো সমতল, একমুখী গতিতে প্রবাহিত হয় না, তা আমাদের বাধা দেয়, হোঁচট খাওয়ায়, আমাদের সংবেদনের ধারাকে কেবলই মুচড়ে একদিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করে। 'ঘরে বাইরে' কবিতার প্রথমেই ছন্দের এই অনবরত জঙ্গম বৈচিত্র্য :

'তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিল
কামনার বিশাল ইশারা!
ট্যাঁকেতে টাকা নেই,
রঙিন গণিকার দিন হল শেষ,
আজ জীবনের কুঁজ দেখি তোমার গর্ভে…'

স্বদেশ বা পৃথিবী বা প্রিয়াকে সম্বোধন করে এই আরম্ভ আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বানচাল করে দেয়। প্রথম দুটি পংক্তির মসৃণতার পরেই সংক্ষিপ্ত 'ট্যাঁকেতে টাকা নেই' একটা মস্ত বড় ধাক্কা নিয়ে আসে। 'কামনার বিশাল ইশারা' 'রঙিন গণিকার' দিবসান্তে মিলিয়ে যায়, এবং সমস্ত উদ্দীপনার ফলস্বরূপ গর্ভের অস্বাভাবিক উচ্চতা ইঙ্গিত দেয়, তা কোনো বলিষ্ঠ সন্তান নয়, 'জীবনের কুঁজ' উঠে আছে সেখানে। কিন্তু সম্বোধকের কণ্ঠস্বর এমনই নির্মোহ যে কোনো স্বস্তিকর cynicism-এ আচ্ছন্ন হতে পারি না আমরা। অবধারিতভাবে পৃথিবীর / স্বদেশের / প্রিয়ার এই লজ্জাজনক অবস্থার উন্মোচনের থেকে ঘুরে তিনি আমাদের নিয়ে যান আমাদের নিজেদের বিকৃতির বিশ্লেষণে। সমর সেনের কবিতা পড়া সহজ নয়,

কেন না তিনি আমাদের প্রতি মুহূর্তে থামিয়ে দেন, আত্মসমীক্ষায় বাধ্য করেন। এটা কোনো দুর্বোধ্যতা-বিলাস নয়। চল্লিশের দশকে সুকান্ত বা সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে কবিতা লিখেছিলেন, তাও 'সহজ' ছিল না; পরবর্তীকালে তাঁদের 'সহজ' কবিতার বহু অক্ষম অনুকরণ এটাই প্রমাণ করে। কিন্তু তাঁরা যে পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন, তার জন্য সমর সেনের মতো একজন পূর্বসূরির দরকার ছিল। যিনি কবিতার সংবেদনের সমতলতাকে ভাঙতে শুরু করবেন। যদিও তাঁরা সম্পূর্ণ আলাদা আলাদা ধরনের কবি, তবু সমর সেনের বহু অনুরণন এইজন্যই সুকান্তের কবিতায় পাওয়া যাবে। সমর সেনের কবিতার এই ঐতিহাসিক ভূমিকা সরোজ দত্তের নিবন্ধে স্বীকৃতি পায়নি।

সমর সেন কিন্তু ১৯৭৭-এর প্রবন্ধে সুকান্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চল্লিশদশকী কবিতার 'সহজ ও বলিষ্ঠ' ভাষাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য এই ভাষার ঐতিহাসিক প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু মনে হয় যেন তাঁর নিজের কাব্য ভাষার সমর্থনে বলার তাঁর কিছুই নেই। বিতর্ক যখন চলছিল তখনও সরোজ দত্তের প্রাক্‌ধারণাকে মেনে নিয়ে তিনি এমনি একটি মতই প্রকাশ করেছিলেন, যে অবক্ষয়ী কবিতার ভাষা এমনি স্বগতোক্তির মতো হবেই। সরোজ দত্তের এই বক্তব্যে তাঁরও সায় ছিল যে তাঁর মতো কবিদের গণআন্দোলনের সঙ্গে কোনো যোগ নেই বলেই তাঁদের ভাষার এই সীমাবদ্ধতা। ১৯৭৭ সালে অবশ্য এই শেষোক্ত যুক্তির সম্পূর্ণ বিপরীতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'গণ আন্দোলনে যোগ দিয়েও অনেকে লেখক হিসেবে মহান্ হতে পারেননি; পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণআন্দোলন নয়, 'লাইন' বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে।' কিন্তু প্রশ্নটা তো আসলে তা নয়; কবি তো নিছক কবিতা লেখার জন্য গণআন্দোলনে যোগ দেন না, তিনি একজন সচেতন মানুষ হিসাবে দায়বদ্ধতা থেকেই তা করেন। গণআন্দোলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর যে লড়াই, আর কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তাঁর যে ভাষাগত, শৈলীগত লড়াই, তাদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ থাকলেও প্রত্যেক লড়াইয়েরই নিজস্ব পদ্ধতি, নিজস্ব হাতিয়ার আছে। ত্রিশের দশকের শেষে সমর সেন যখন কবিতা লিখছিলেন, তখন তিনি প্রগতি লেখক সংঘ নামক গণসংগঠনটির কাছাকাছি সরে এসেছিলেন। এসেছিলেন বলেই যে নতুন ধরনের কাব্যভাষা তৈরি করতে পেরেছিলেন তা নয়; তাঁর গণআন্দোলনের কাছাকাছি আসা এবং তাঁর কাব্য-ভাষার বিবর্তন এই দুইয়ের মধ্যে তবু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এটুকু নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এই বিবর্তিত কাব্যভাষা কঠিন হতে পারে, কিন্তু স্বগতোক্তি তাকে বলা যায় না। পাঠককে তা চিন্তার সংগ্রামে নামতে উদ্বুদ্ধ করে।

আজ তাঁরা দু'জনেই ইতিহাস। তাঁদের পঞ্চাশ বছরের আগের এই বিতর্কের

নিরসন কিন্তু এখনও হয়নি। বামপন্থী সংস্কৃতি আন্দোলনে এই প্রশ্নগুলি আজও বারবার উচ্চারিত হচ্ছে। বিপ্লব বা বিপ্লবী কবিতা থেকে আজও আমরা দূরে রয়েছি, কিন্তু 'ততদিন' কবি হিসাবে নিজেদের আমূল বদলানোর প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে, এবং সেদিক থেকে সমর সেনের কবিতার কাছে আজকের কবিদের শিক্ষণীয় অনেক কিছুই।

যশোধরা বাগচী

'মেকলের বিষবৃক্ষ' ও সমর সেনের গদ্য

> আমরা বাঙালী ; মীরজাফরী অতীত, মেকলের
> বিষবৃক্ষের ফল।
> অনেক দিন ভেবেছি,
> কখনো আকাশের খোলা মাঠে সূর্যের শেষ শিবির সন্ধ্যায়
> কখনো বিনিদ্র রাতে নগরের স্তব্ধতায়
> অনেকবার ভেবেছি :
> ভবিষ্যতে বীজবাহী যেন না হয়, এ বিষবৃক্ষ শেষ হোক,
> প্রতিদিন কুটিল কীটের আক্রমণে
> না হয় তিলে তিলে যন্ত্রণায়
> আমাদের জীবনে এ ফল সম্পূর্ণ শেষ হোক···

চল্লিশের দশকের গোড়াতেই কিন্তু সমর সেন জানতেন, এই বিষবৃক্ষের শিকড় ছড়িয়ে গেছে অনেক দূর ; এর বিস্তার অব্যাহত রাখবার ব্যবস্থাই এখন সম্ভব, একে নির্মূল করবার চেষ্টা নয় :

> মীরজাফরী বদরক্ত আবার অন্তঃশীলা
> পাতি কেরানীর ঘরে আনাচে কানাচে অনেক সংসারে,
> বেনিয়ার গদীতে, অহিংসার পরম আস্তানায়।
> আমাদের বাগানে বাড়ে ফণীমনসার ঝাড়
> সঙ্গোপনে আয়োজন চলে মনসার পূজার।

আধুনিক ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক থেকে নয়া ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় উপনীত হবার যন্ত্রণা ধরা পড়েছে সমর সেনের গদ্য রচনাতে। সেই ইতিহাসের ধূর্ত চোরা-পথগুলির সন্ধান সমর সেনের শিল্পে মেলে। বাঙালী শ্রেণী চেতনার উদারনৈতিক মুখোশ খুলে বারে বারে তার ঠুঁটো অপারগ চেহারা বের করে দেয় সমর সেনের মারাত্মক স্বল্পোক্তি এবং শ্লেষ। এবং তা শুধু সমালোচনাই নয়, আত্মসমালোচনা। যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন মানুষ সমাজ এবং ইতিহাস চেতনাকে নিজেদের জীবনের কষ্টিপাথরে যাচাই করবার সাহস এবং সততা আগাগোড়া বজায় রাখতে পেরে-ছিলেন, সমর সেন তাঁদের অন্যতম। দেশের রাজনৈতিক সংকটের মুহূর্তগুলিতে তাই আমরা পাই শিল্পী সমর সেনকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেকার ক্রমঘনায়মান দুর্দিন ছিল তাঁর এক দশকের কবি জীবনের পটভূমি। প্রায় তিন দশক পরে, সত্তরের দশকে, সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিক্ষোভে উত্তাল পৃথিবীর একটি অন্যতম

কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে কলকাতা শহর। তখন আবার আমরা পাই শিল্পী সমর সেনকে —এবারে গদ্যে। তাঁর উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকারের মোকাবিলা করবার জন্য তিনি সাধারণ পাঠককে দিলেন তাঁর অভিনব আত্মকথা 'বাবু বৃত্তান্ত'।

উনিশ শতকের উদারনৈতিক যুক্তিবাদের মাধ্যম আধুনিক বাংলা গদ্যকে তিনি তাঁর কবিতার গদ্য ছন্দে একবার ব্যবহার করেছিলেন। সত্তরের দশকে গিয়ে আবার আমরা ইতিহাসের চাতুর্য সম্পর্কে সদা হুঁশিয়ার তাঁর গদ্যশৈলিকে পেলাম। সাবেকি উদারনৈতিক গদ্যছন্দকে তিনি ক্রমাগত কেটে কেটে গিয়েছেন, নিজেকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে ব্যঙ্গ করেছেন তাঁর গোটা উনিশ শতকের উত্তরাধিকারকে। এই কারণে সমর সেনের শৈশব এবং যুবা বয়সের অভিজ্ঞতাগুলি তাঁর এই পর্যায়ের সমাজবীক্ষণের উপাদান। তাঁর আত্মচেতনা শ্রেণীবদ্ধতার দায়ে কলুষিত কিন্তু সেই সীমিত শ্রেণীচেতনাও তাঁকে যেটুকু জায়গা করে দিয়েছে সেটুকু তিনি পুরোই লাগিয়েছেন তাঁর মৌলিক পুনর্মূল্যায়নের কাজে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর সুভাষ-পন্থী বাবার সঙ্গে রাজনৈতিক মতান্তর প্রসঙ্গে কথাটি ওঠে এবং সমর সেন নিজের বিষয়ে পরিষ্কার বলেন,

> অবশ্য এটা নয় যে আমি সক্রিয় কর্মী ছিলাম। আমার গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে, সে গণ্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।
>
> (বাবু বৃত্তান্ত, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩৩)

চল্লিশের দশকে কবি সমর সেন একবার বলেছিলেন :

> ঘুণধরা আমাদের হাড়,
> শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
> আশা আছে বাঁচবার।

কিন্তু সেই কবি জীবনেই তাঁর 'সাধারণ মধ্যবিত্ত' চেতনার 'একান্ত কামনা' ছিল,

> তিলকে তাল করার ভ্রান্তি পার হয়ে
> আত্মকরুণার ক্লান্তি পার হয়ে
> সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে ফেরা।

যে-বিষবৃক্ষের কারণে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহজ জীবন ও সহজ বিশ্বাস হারিয়ে যায়, তাকে কিন্তু সমর সেন সারা জীবন শত্রু বলে চিহ্নিত করেছেন, 'তিলকে তাল করার ভ্রান্তি' বা 'আত্মকরুণার ক্লান্তি' তাঁর এই 'বৃত্তান্তে' তিনি প্রবেশ করতে দেননি। এমন কি সত্তরের দশকের শেষার্ধে 'বিপ্লবী' বুদ্ধিজীবী হিসাবে যখন তাঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি, তখনও তিনি বলছেন :

> এ পর্যন্ত বৃত্তান্ত পড়ে পাঠকেরা বুঝবেন যে জনগণের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ছিল না, পরিধি ও পরিবেশ ছিল মধ্যবিত্ত। আমার ছাত্রাবস্থায় বাবা বলতেন আমার বন্ধুবান্ধব সবাই স্বচ্ছল। কথাটা ঠিক। আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে

মনে হতো—এবং এখনো হয় যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায় কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না। এমন কি স্তালিনোত্তর 'মহান বিপ্লবী' দেশে কয়েক বছর কাটালেও নয়। (পৃ. ৫৪)

শেষের বাক্যটি দিয়ে তিনি আত্মসমালোচনার গুরুগম্ভীর গদ্যের আবহটুকু ভেঙে দিলেন এক নিমেষে। এই রকমই সমর সেনের গদ্যরীতি। উনিশ শতকীয় কায়দায় তিনি আত্মজীবনী লিখছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রীর মত সমাজ ও আত্ম-সচেতনতা সম্পর্কে পুরোপুরি নির্মোহ সততার প্রকাশে আগ্রহ আছে, কিন্তু লেখায় স্মৃতিকথার উদারনৈতিক ভড়ং বিষয়ে স্পষ্টতই তাঁর একটা বিদ্রূপের ভাব। বস্তুত, উনিশ শতকের আত্মকেন্দ্রিকতাকে ক্রমশ কেন্দ্রচ্যুত করে নিজের ইতিহাস বোধকেই তিনি উপস্থাপিত করেছেন সেখানে। তাঁর গদ্য রচনার ইয়ারকি-ঠাট্টা হল তাঁর উনিশ শতকীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিষময় গাম্ভীর্যের মুখোশ খুলে নেওয়া। 'বাবু বৃত্তান্তে' সমর সেন যখন বলেন, 'স্কুলের পরে একা একা থাকতাম কিন্তু একটা বাগবাজারি বখাটে ভাব কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি (পৃ. ১২), তখন তাঁর আত্মতুষ্ট শত্রুপক্ষের বোধ হয় একটু সন্ত্রস্ত বোধ করা উচিত। লক্ষ্যচ্যুত করার কাজে তাঁর লক্ষ্যভেদ প্রায় অব্যর্থ, কেউ-ই তার টিপ এড়াতে পাবে না। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যায়,

ঠাকুর্দা : বীণা দাস গভর্ণরের প্রতি যে গুলি ছোঁড়েন সেটা ঠাকুর্দার কান ঘেঁষে যাওয়াতে তিনি অতিশয় সন্ত্রস্ত হন, কিন্তু বীণা দাসের প্রতি রায়বাহাদুরের একটি সশ্রদ্ধ মনোভাব লক্ষ করি। (পৃ. ১৩)

বাবা : ১৯৪২-এ ছুটিতে কলকাতায় এসে রাত্রে বিমান আক্রমণের হুঁশিয়ারী বাজলে আমরা ছাদ থেকে নেমে যেতাম, বাবা নামতেন না, বোধ হয় কলকাতার আকাশে জাপানি বোমারু বিমানের আগমন তিনি অপছন্দ করতেন না। (পৃ. ৩৩)

বাবার ক্লাসে খুব হৈ চৈ হতো। তবে শিক্ষকেরা শাসন করলে পথে কুকাজ ক'রে চোখ রাঙানোর মানসিকতা ছাত্রদের মধ্যে ছিল না। কয়েকবার রাস্তায় 'হরিবোল' শুনে সরোজ দত্ত উঠে বাবাকে জানালেন, "স্যার, আর একজন রাঁড় হলো"। ক্লাস থেকে তিনি বহিস্কৃত হলেন, বাবা বোধ হয় ভুলে গিয়েছিলেন রাঁড়-এর আর একটা অর্থ বিধবা—"রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাচ"। [ভারতচন্দ্র] (পৃ. ৩৪)

শান্তিনিকেতন সফর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :

প্রচণ্ড গরমে গলা দিয়ে কিছু নামতো না এরকম জায়গায় খাওয়ার বন্দোবস্ত করে কর্তৃপক্ষ যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তার তারিফ করতাম। দিন সাতেক

পরে টাকা দিতে গিয়ে শুনলাম টাকা লাগবে না আমরা 'গুরুদেবে'র অতিথি। কলকাতায় ফিরে গদগদ ভাষায় কবিকে চিঠি লিখেছিলাম··· কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর শুনলাম 'রবিবাবু' বলাতে এবং প্রায়ই তাঁকে বিরক্ত করাতে দুর্নাম হয়েছে। (পৃ. ২৮)

এর পরের বাক্যটি ভোলা যায় না,

শান্তিনিকেতনের পরচর্চার আবহাওয়া দেখে বলতাম ব্রাহ্ম পল্লীসমাজ।

ইংরাজির নামকরা ছাত্র সমর সেনের কলেজ-প্রসঙ্গ :

পরীক্ষায় তখন ভালো করতো প্রেসিডেন্সি ও স্কটিশ। প্রেসিডেন্সির পরিবেশ ছিল বনেদী। তুলনায় স্কটিশ চার্চ কলেজ ছিল গণতান্ত্রিক, নানা শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী আসতো স্কটিশে। মাঝে হেদো, ওপারে দেয়াল-ঘেরা বেথুন কলেজ, রহস্যে আবৃত। হেদোতে বসতো 'খিস্তলজি'র (খিস্তি খেউড়ের) ক্লাস, প্রফেসর ছিলেন স্নেহাংশু আচার্য। (পৃ. ৩৫)

স্বয়ং ধর্মবাজ ও বাইবেলের মোজেজও বাদ যান না,

একবার গিয়েছিলাম বালাসোর থেকে মাইল সাতেক দূরে চাঁদিপুরে, জানাদের ও শিল্পী চিত্তপ্রসাদের সঙ্গে। শিশু-সমুদ্র, উঁচু নীচু বালিয়াড়ি, শালবন। ভোরে দেখতাম মাইল খানেক দূরে জলের ওপর গম্ভীর মুখে মহাভারতীয় বক দাঁড়িয়ে আছে। খুব সম্ভব বাইবেলের মোজেজ ওখানেই হেঁটে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। (পৃ: ৩৪)

উনিশ শতকের আত্মকথার অনুপ্রেরণা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক চারিত্র পূজা। সমর সেন 'বাবু বৃত্তান্ত' এবং 'উড়ো খই'-এ তারই প্যারডি করেছেন। তাঁর নিজেকে ও ঠাকুর্দাকে মিলিয়ে ঠাট্টাগুলির মধ্যেও পাওয়া যায় এই সমাজের মূল্যবোধের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ :

একটু বড়ো হয়ে পড়াশুনোর দিকে আমার ঝোঁক ছিল বলে ঠাকুর্দা আমাকে স্নেহ করতেন। তিরিশের দশকে অবশ্য আমার সাহিত্যচর্চা ও দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উঠলে বলতেন, "তুই একটা এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান"। আমাদের আলাপ-আলোচনা সরস ছিল। বি. এ. তে ভালো করলে বিলেত পাঠাবার প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দেওয়াতে বললেন যে অর্ধেক খরচ দেবেন, বাকিটা বিয়ে করে যোগাড় করতে। বললাম—"দাদু, পুরুষাঙ্গ বাঁধা দিয়ে বিলেত যাব না"। উত্তরে অট্টহাসি হেসেছিলেন। (পৃ. ১১)

'শনিবারের চিঠি' প্রসঙ্গে :

আধুনিকদের শ্রাদ্ধ করতো বলে 'শনিবারের চিঠি' সবাই পড়তাম।··· 'শনিবারের চিঠি' আমার একটা লাইনের প্যারডি করে লেখে "মাঝেরহাট ব্রিজের উপর" (ব্রিজটা বেহালার পথে) "শুনি লম্পটের গুষ্টির পদধ্বনি।"

"গুষ্টি ?" মানহানির মোকর্দমার কথা ঠাকুর্দার কাছে তোলাতে তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। (পৃ. ৩১)

নিজের শহুরে অরণ্যবিলাসিতা নিয়ে চুটকি রসিকতা করছেন (পেছনে কি রবীন্দ্রনাথের 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'? সত্যজিৎ রায় ত আছেনই।),

অরণ্যে একলা থাকার একটা ভারতীয়-সুলভ টান আমার অনেক দিন ছিল। খুব সম্ভব 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখার পর মোহমুক্ত হই। জন-অরণ্যে থাকা ভালো। (পৃ. ৩৬-৩৭)

২

তাহলে কি সমর সেনের গদ্যের পুরোটাই উনিশ শতকের উদারনীতির প্যারডি? মেকলের বিষবৃক্ষের উদ্গীরণ করতে গিয়ে কি তিনি তার সভ্যতার উত্তরাধিকারকে পুরোপুরি অস্বীকার করে বসেছেন? দুটি জায়গায় কিন্তু তাঁর প্রথম যৌবনের দায়বদ্ধতাকে পরিণত বয়সের লেখাতে পুরোপুরি স্বীকার করে নিয়েছেন—এক হচ্ছে 'কবিতা' 'পরিচয়' পর্যায়ের আধুনিক বাংলা কবিতা ও অন্যদিকে কম্যুনিস্ট সক্রিয় রাজনীতি। তাঁর গদ্যে আত্মবিদ্রূপের মধ্যেও কিন্তু যৌবনের এই দুটি ভালোবাসাকে তিনি পুরো স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য এ ব্যাপারেও সমরবাবুর সমালোচনার ধারটি হারায়নি। তাই 'কবিতা' 'পরিচয়'-গোষ্ঠীর ওপরে ইয়েটস-এলিয়ট-পাউণ্ডের প্রচণ্ড প্রভাবের উল্লেখ করে নিজের এলিয়ট-প্রীতির প্রসঙ্গে বাংলা কবিতাকে এক হাত নিতেও তিনি ছাড়েন না :

"Poetry is not a turning loose of emotion" কথাটি এখনো মনে পড়ে বাংলা কবিতা পড়লে। (পৃ. ২৮)

সে যুগের অর্থাৎ তিরিশ চল্লিশের দশকের বাংলা কবিতার যে-সাহিত্যিক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল সাহিত্যের বাজার দর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা' অনেকখানি বিলুপ্ত হয়। সমর সেন লিখছেন :

তখন মনে হতো বাংলা সাহিত্যের দিগন্ত ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। পরবর্তীকালের সাহিত্যে আগাছা কিন্তু বেড়ে গেল। (পৃ. ২১)

'কবিতা' পত্রিকার প্রথম প্রকাশ সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ তিনি গোপন করেননি :

কোন পত্রিকা বিষয়ে আতিশয্য অনুচিত। কিন্তু আশ্বিন ১৩৪২ অর্থাৎ ৪৩ বছর আগেকার প্রথম সংখ্যা 'কবিতা' থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠকদের ভালো লাগতে পারে। (পৃ. ২৯)

অন্য একটি ভালোবাসার প্রসঙ্গ 'বিপ্লবী রাজনীতি ও তার সক্রিয় কর্মীদের' তিনি তাঁর বিদ্রূপের আওতার বাইরে রেখেছেন :

বাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা আসতেন, দেখে বেশ উত্তেজনা হতো, বিশেষ করে

খানাতল্লাসীর পর পুলিশ যখন খালি হাতে ফিরে যেতো। অনেকদিন একটা লম্বা সরু কাঠের বাক্সে পুতুল জমাবার শখ ছিল। কৃচ্ছ্রসাধন ও স্থানাভাবে বাক্সটা বা কোনো টেবিলের উপর শুতাম। বাক্সতে সন্ত্রাসবাদী পত্রপত্রিকা পুলিশের নজরে পড়ে নি। (পৃ. ২১)

কিন্তু সমর সেনের জবানীতে রাধারমণ মিত্র এবং বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় (খাটা পায়খানার রসিকতা সত্ত্বেও) কিন্তু 'সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে'র দিশারি হয়ে এসেছেন :

আমাদের বেহালার বাড়িতে রাধারমণবাবু ও বঙ্কিমবাবু খুব সম্ভব ১৯৩২ নাগাদ আসেন।...রাধারমণবাবু ছিলেন আলাদা ধরনের মানুষ। এমন কোন বিষয় ছিল না যাতে তাঁর আগ্রহের অভাব দেখেছি। প্রতি সকালে খবরের কাগজ প্রথম থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত খুঁটিয়ে পড়তেন। পড়াশুনো স্মৃতিশক্তি অসাধারণ ছিল। বয়সের পার্থক্য তাঁর কাছে কিছু নয়। অনেকদিন গভীর রাত পর্যন্ত আমার মেজভাই ও আমার সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করতেন...জীবনের নানা বিচিত্র দিকে রাধারমণবাবু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর কাছে মার্কসবাদে শিক্ষা নিয়েছেন অনেকে। আশি পেরিয়েছেন, এখনো প্রায় সোজা হাঁটেন, লিখে যাচ্ছেন অক্লান্তভাবে। (পৃ. ২৪-২৫)

কবিতা এবং রাজনীতি সমর সেনের জীবনে খুব সহজেই মিলে গিয়েছিল :

প্রথম বই 'কয়েকটি কবিতা' বের করি ১৯৩৭-এ স্বর্ণপদক বেচে, উৎসর্গ করি মুজফ্‌ফর আহমেদকে। (পৃ. ২৬)

যদিও এ বিষয়েও তাঁর আত্মসমালোচনার অভাব নেই :

কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কিনা গভীরভাবে চিন্তা করে ঠিক করলাম আমার দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না। বক্তৃতা আমার একেবারে আসে না, তার চেয়ে মাঝে মাঝে 'বিপ্লবী' কবিতা লিখলে ও পার্টিতে কিছু অর্থ সাহায্য করলে বিবেক সাফ থাকবে। আমাকে কর্মী হিসেবে নিলে পার্টির বিশেষ কোন লাভ হবে না। (পৃ. ৫০)

সত্তরের দশকের শেষে বাম রাজনীতির বিস্ফোরক পরিস্থিতিতে *Frontier*-এর মতো পত্রিকার সম্পাদনা করতে করতে সমরবাবুর এই স্বীকারোক্তি তাঁর গভীর আত্মবীক্ষণের ফল। কম্যুনিস্ট পার্টিতে সক্রিয় কর্মী হিসেবে কাজ করে পরে যেসব পরিণতি তিনি দেখেছেন (যেমন মাও থেকে ম্যাও-এর উত্তরণ), তাতে মনে হয় যে নিজের শ্রেণী অবস্থানের ক্রমাগত মূল্যায়নের চেষ্টাই অনেকখানি বাঁচিয়ে রেখেছিল সমর সেনকে। তিলকে তাল করা বা আত্মকরুণার প্রবণতা থেকে তিনি নিজেকে দূরে রাখতে চেষ্টা করেছেন। নেহরু পরিবারের আলোকপ্রাপ্ত কর্তৃত্বের

স্বরূপ তাই খুব সহজেই তাঁর কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল। পরে যখন দিল্লীর সম্রাজ্ঞীর কোপ এসে পড়লো পশ্চিমবঙ্গের বাম রাজনীতি বিশেষ করে তার যুব সম্প্রদায়ের ওপর, সমর সেনকে তাঁর দল বেছে নিতে কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি।

৩

আমাদের বর্তমান সাংস্কৃতিক জগতের বন্ধ্যাত্ব আবার নতুন করে জানান দিল যখন সমর সেনের মৃত্যুর পরে এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক শোকপ্রকাশ করে বললেন যে সমর সেন নাকি ফরাসী কবি র‍্যাঁবোর সঙ্গে তুলনীয়। সমর সেন যেহেতু আধুনিক ভারতীয় সমাজ নামক নরকে মাত্র এক ঋতু কাটানানি সেইহেতু বুঝে নিতে হল যে তুলনার কারণ হচ্ছে র‍্যাঁবোর মতো সমর সেনও এক সময়ে কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফরাসী প্রতীকবাদের মতাদর্শগত গাঁটছড়া বাঁধা ছিল ফরাসী রোম্যান্টিক কবিতার সামন্ততান্ত্রিক পিছুটানের সঙ্গে। র‍্যাঁবো যখন কবিতা লেখা ছাড়লেন তখন পুনরাবির্ভূত হলেন ঔপনিবেশিকরূপে—ক্রীতদাস কেনা-বেচবার কাজে। আর সমর সেন? তাঁর কবিজীবন, সাংবাদিকজীবন ও পরে গদ্যশিল্পীর রূপ—সব কিছুর মধ্যে একটা গভীর পারম্পর্য আছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্বে সমর সেনের যৌবনের উন্মেষ। প্রেম ও রাজনীতি এই দুই-ই সমর সেনের কবিতার উপাদান এবং দুয়ের মধ্যে বিভেদের চাইতে সাযুজ্যই বেশি। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা হারিয়ে মেকলের বিষবৃক্ষকে সনাক্ত করেছিলেন কবি সমর সেন। নিজের শ্রেণীর সীমিত গণ্ডী সম্পর্কে তিনি শুধুমাত্র ক্ষোভ প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হননি। সাংবাদিক সমর সেনও জাতীয়তাবাদী ভুয়া উদারনীতির বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন—তার সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর গদ্যরচনাবলী।

সত্তরের দশকে সারা পৃথিবী জুড়ে ছাত্র আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এখানেও নতুন করে বিচার করা হয় ভারতবর্ষের তথাকথিত 'আধুনিকতা'র বাহক রামমোহন-ডিরোজিও-বিদ্যাসাগরের মতাদর্শকে। যুক্তি ও প্রগতির দোহাই পেড়ে যে আধুনিকতা ভারতবর্ষের একটি ছোট সুবিধাভোগী অংশের স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস জুগিয়েছে, তার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে আমাদের যুব সম্প্রদায়। লড়াই ঘোষিত হয় নকশালবাড়ি অভ্যুত্থানের, সশস্ত্র কৃষকবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। সমর সেনের সম্পাদনায় *Frontier* তখন এই মুক্তি সংগ্রামের কথা পৌঁছে দিয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। সম্পাদকের কলম তখন মাঝে মাঝেই গর্জে উঠেছে রাষ্ট্রযন্ত্রের নিপীড়নের বিরুদ্ধে।

পরবর্তীকালে সশস্ত্র কৃষকবিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের পুনরুজ্জীবনের উজ্জ্বল

সম্ভাবনা যখন স্তিমিত হয়ে গেল তখন বিপ্লবচিন্তা কেবলমাত্র চিন্তাজগতের বিপ্লবে পরিণত হয়। উনিশ শতকের উদারনীতিবাদের সঙ্গে ইতিহাসবোধকেই আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। পশ্চিমের যেসব সমাজে বিপ্লবের কোনও সম্ভাবনাই আপাতত নেই সেখানকার কিছু বাঘা বাঘা চিন্তাবিদের কাছ থেকে ধার নেওয়া চিন্তাভাবনা ব্যবহার করে আমাদের সমাজের সংগ্রামের ইতিহাসকে অস্বীকার করবার প্রবণতা দেখা দেয়। আশির দশকে রাজনৈতিক মৌলবাদের পটভূমিকায় উনিশ শতকের উত্তরাধিকারের প্রত্যাখ্যান এক বিশেষ চেহারা নিতে থাকে। সমর সেনের জীবনের শেষ দিকে তাঁর নিজের কাগজেও মাঝে মাঝে এর প্রতিফলন হতে থাকে। সুতরাং আমি একটি জরুরি প্রশ্নের মুখোমুখী হতে চাই তাঁর গদ্য রচনার তির্যক ভঙ্গীটির সূত্র ধরে।

সমর সেনের আজীবন সংগ্রাম কি ছিল যুক্তিবাদ ও উদারনীতির বিরুদ্ধে? অথবা সত্তরের দশকের সাংবাদিক ও গদ্যশিল্পী সমর সেন কি তাঁর প্রথম জীবনের প্রগতিবাদকে কাব্যের রোম্যান্টিকতার নামান্তর বলে প্রত্যাখ্যান করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন? সেকালের বিষবৃক্ষ কি কেবলই যুক্তি ও প্রগতিবাদ?

সমর সেনের গদ্যকে তাঁর কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে তিনি অহরহ সুস্থ যুক্তির বিচ্যুতি সম্পর্কে সজাগ। তিনি কেন ভারতবর্ষে বিপ্লবীচেতনার প্রচারের জন্য ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করলেন এ সম্পর্কে কিছু আনন্দবাজারী কায়দায় কটুকাটব্য শুনেছি, যেমন শুনেছি যে তিনি তাঁর নিজের শ্রেণী সম্পর্কে যন্ত্রণাদায়ক ঘৃণাভাব পোষণ করতেন। কিন্তু যে-কথাটা আজ পর্যন্ত খুব বেশি শুনিনি তা হচ্ছে যে এই দুটো শ্রেণীর সামিত চেতনাবিন্যাসের মধ্যেও বিচার ও দায়িত্ব-বোধকে তিনি কোথাও অস্বীকার করেননি। সেকালের বিষবৃক্ষ তাই যুক্তি বা মানবিকতা নয়, যুক্তি এবং মানবিকতার বিচ্যুতি। আমাদের ঔপনিবেশিক উত্তরা-ধিকারের বিষময় ফল উদ্গীরণ করতে হলে তাই প্রগতি ও মানবতাকে অস্বীকার করে সমাজকে সার্বিক মৌলবাদের দিকে ঠেলে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। যে বিষময় প্রক্রিয়ার ফলে যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে বিকৃত করে মৌলবাদের জন্ম, সেই-খানেই নিহিত আছে স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা। সমর সেনের কলম আজীবন সস্তা চটকদার সমাধানকে সন্দেহের চোখে দেখেছে। নেহরুর বিজ্ঞানভিত্তিক 'ধর্মনির-পেক্ষতা'র স্লোগানকে তিনি যেমন সন্দেহের চোখে দেখেছেন, তেমনি ধর্মকে ব্যবহার করে যে স্বৈরতন্ত্রের ভিত্ শক্ত করা হয় সেটাও তিনি বারে বারে বলেছেন। নিজের জীবনে একাধিকবার তিনি এই যুক্তিবিরোধী মৌলবাদী স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নেমেছেন। শুধুমাত্র কবিতায় তাঁর শিল্পকর্ম শেষ হয়ে গেলে তাঁর চিন্তা ও কাজের এই দিকটি অন্ধকারে থেকে যেতো। সেই কারণে তাঁর গদ্যরচনা-গুলি আবার খুঁটিয়ে পড়ে দেখার প্রয়োজনীয়তা নতুন করে দেখা দিয়েছে।

সমর সেন এটা খুব স্পষ্টভাবে বুঝেছিলেন যে মেকলের বিষবৃক্ষের আসল ফল হচ্ছে যুক্তিবিচ্যুত হয়ে মৌলবাদের, বিশেষ করে ধর্মীয় মৌলবাদের, শিকার হয়ে পড়া। দিল্লিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে এবং দাঙ্গা চলাকালীন সংখ্যালঘিষ্ঠের পাশে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সমর সেন ছিলেন সক্রিয় কর্মী। 'বাবু বৃত্তান্ত' এবং 'বন্দেমাতরম্' মিলিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে এ-ব্যাপারে সমর সেনের চিন্তাভাবনা কত গভীর ছিল।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব যে-ধর্মীয় মৌলবাদকে আশ্রয় করে বেড়ে ওঠে তার মধ্যেই লুকোনো থাকে ভবিষ্যতের স্বৈরতন্ত্রের রক্তবীজ। দিল্লির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনা দেন সমর সেন—তার রাজনৈতিক পটভূমিকার কথা উল্লেখ করে :

> কলকাতার দাঙ্গার পর বহুদিন চলে কংগ্রেস-লীগ আলোচনা, খেয়োখেয়ি। পটভূমিকায় দাঙ্গা—'স্বাধীনতার সংগ্রাম', ওয়াভেলের প্রত্যাবর্তন, মাউন্ট-ব্যাটেনের আগমন, তারপর দেশবিভাগ।
>
> রাজধানীতে একতরফা ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু হয় ক্ষমতা হস্তান্তরের দু-তিন সপ্তাহ পরে। আমার বাড়িওয়ালা তরুণ মুসলমান মারুফ আলিকে তার আগে কয়েকবার বলেছি নেহরু থাকতে দিল্লিতে কিছু ঘটবে না।
>
> কিন্তু নেহরুর দিল্লিতেই করোলবাগের খুনোখুনির ভয় ছড়িয়ে পড়ল তাঁদের পাড়ায়, বিকেলের দিকে মারুফের পিতৃবন্ধু আসফ আলি মেয়েদের জুম্মা মসজিদ এলাকায় নিয়ে গেলেন। মারুফ একা থেকে গেল। একটা বড়ো জমিতে পাঁচটা বাড়ির মালিক, বাড়িগুলো যতই জীর্ণ হোক জীবিকার একমাত্র উৎস, তাই তদারক করা দরকার। সারা পাড়ায় একটি মাত্র মুসলমান যুবক, ক্রমাগত হানা দিচ্ছে পাঞ্জাবের বাস্তুহারা, প্রায়-হিংস্র হিন্দু ও শিখ, বাড়ি দখলের জন্য। মারুফ কিন্তু অবিচলিত। আমরা যথাসাধ্য সাহায্য করতাম। শেষে বর্ষণ-মুখর একটি রাত্রে মারুফ ও হাম্‌দরদ্‌ দাওয়াইখানার নৈশ আস্তানাকে লক্ষ করে মত্ত শিখ সৈন্যেরা অনেকক্ষণ গুলি চালায়। (সে সময় বোমা, মেশিন-গান ও বন্দুকের আওয়াজ চলতো সারাদিন, সারারাত)। (পৃ. ৪৬)

আমাদের বুদ্ধিজীবীদের ('চন্দ্রবিন্দু বাদে') বিষয়ে কাজ আর চিন্তার বিরোধের কথা সমর সেন ক্রমাগত বলে গেছেন, এই একটা সংগ্রামে সমর সেন কিন্তু তাঁর চিন্তার সঙ্গে কাজকে পুরোই মিলিয়ে গেছেন। কলকাতার এক বড়ো দৈনিক থেকে তিনি পদত্যাগ করেন মালিকের সাম্প্রদায়িক উশ্‌কানীর প্রতিবাদে। পরে তিনি স্বভাবসিদ্ধ ঠাট্টার ছলে লিখেছেন :

> তাড়াতাড়িতে লেখা পদত্যাগ পত্রে আসল কারণের উল্লেখ ছিল না। ছিল একটা অভিমানের সুর। একটা নীতিনিষ্ঠ জ্বালাময় বিবৃতির সুযোগ হারাই।

ফলে সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত পর্যায়ে থেকে গেল, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার হল না। একথা বলেন অন্যরা। (পৃ. ৬৬)

'বন্দেমাতরম্' লেখাতে সমর সেন আমাদের জাতীয়তাবাদের মতাদর্শের অন্তর্নিহিত শক্তি পূজার প্রসঙ্গটি তোলেন। উনিশ শতকের বিষ কীভাবে সত্তরের দশকের রক্ত দূষিয়ে দিয়েছে এই আলোচনাটি তার একটি চমৎকার বিবরণ। পণ্ডিতেরা হয়ত তথ্যগত অনেক বিচ্যুতি আবিষ্কার করতে পারেন কিন্তু এরকম একটি সামাজিক বিশ্লেষণ দুর্লভ, যার প্রাসঙ্গিকতা আমরা এই লেখার দশ বছর পরে আবার নতুন করে উপলব্ধি করি। স্বভাবসিদ্ধ 'খাপছাড়া'ভাবে সমর সেন এই জরুরি প্রসঙ্গ তুললেন—

ইংরেজদের আমলে হিন্দুদের মধ্যে শাক্তভাব কিছু প্রবল ছিল। জাতীয়তার সঙ্গে শক্তিপূজা, 'আনন্দমঠ' ইত্যাদি…শক্তির আরাধনা আবার শুরু হয় সন্ত্রাসবাদীদের সময়ে। মার্কসবাদের প্রভাবে রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে এটা কমে যায়। সম্প্রতি যে আবার বেড়েছে সেটা অবশ্য খুব আনন্দের কথা নয়, কেননা সেটা বেড়েছে বিশেষ করে মস্তান ও তার সাকরেদদের মধ্যে, রাজনীতির ব্যবস্থাপনায় যাদের প্রভাব সবাই জানেন। তাছাড়া মাতৃকুল বেশ জমজমাট—কেন্দ্রে তো আছেনই, এদিক ওদিক অনেক মা আছেন তাঁদের শিষ্য-শিষ্যা বিস্তর, তাছাড়া মনের মধ্যে ভারতমাতা বিরাজ করছেন। (পৃ. ৮৯)

এই মাতৃকাপূজার সামাজিক উৎস সম্পর্কে তিনি কয়েকটি চোখা চোখা প্রশ্ন রাখেন, ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার দেশে যেখানে পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, সেখানে মাতৃমূর্তির প্রতি এত মোহ গবেষণার বিষয়। কেন ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময়ে বা দেশীয়দের বিরুদ্ধে আপন শোষকদের বর্বর অভিযানের সময়ে মাতৃমূর্তি এত প্রবল হয়ে উঠে। গো-মাতার প্রতিপত্তির পিছনে না-হয় অর্থনৈতিক কারণ আছে, কিন্তু আমাদের দেশে মেয়েদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্থান ত দৃঢ় ছিল না।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মেকলের বিষবৃক্ষের ফলকে সমর সেন এবারে সোজাসুজি উপস্থাপিত করলেন :

…অরাজকতার বিরুদ্ধে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরাণী নামলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রফুল্লর মুখে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কী বাণী শোনালেন ? 'আনন্দমঠ'-এ মুসলমান বধ, ইংরেজ রাজ প্রতিষ্ঠা আমাদের, হিন্দুদের, ঐতিহাসিক কর্তব্য। কিন্তু ইংরেজদের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ ? সেটা ঐশ্বরিক ব্যাপার, হিন্দু মানুষের কাজ নয়। (পৃ. ৯০)

চিন্তাকে হটিয়ে দিয়ে অতিমানবিকতার আশ্রয় নেওয়া এই পরগাছা সংস্কৃতির ভেতরে ঢুকে গেছে :

'আনন্দমঠ'এ যে বিষবৃক্ষের বীজ, রামরাজ্যবাদী গান্ধীজীর সমধর্মী আন্দোলনের মাধ্যমে তার পরিণতি ঘটে দেশবিভাগে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম দিকের নারী-চরিত্রে সামাজিক বিদ্রোহের আভাস আছে। কিন্তু 'আনন্দমঠ'এর পর তাঁর রাজনৈতিক ঐতিহাসিক কাহিনীগুলিতে যে-সব বীরাঙ্গনার আবির্ভাব ঘটে তাদের অনেকে অবাস্তব। তাদের ক্রিয়াকলাপ মাঝে মাঝে অত্যন্ত পুরুষোচিত, অতীব বীরত্বব্যঞ্জক। শক্তির ধারিকা এই নায়িকারা হিন্দি সিনেমার কথা মনে করিয়ে দেয়। যে বিভ্রান্ত রাজনীতি বন্দে মাতরম্ গানের পেছনে, যে মনোভাবের ফলে মাতৃমূর্তির এত প্রচলন, সে রাজনীতি ও মনোভাব এখনো আমাদের মধ্যে বর্তমান বলে আজকাল রাস্তাঘাট বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে যখন তখন মুখরিত হয়। কিন্তু এই মাতা অবাস্তব। একদিকে ছিল বহুবিবাহ, সতীদাহ, অন্যদিকে মা নিয়ে আবেগ। (পৃ. ৯১)

সত্তরের দশকের গোড়াতে বসে সমর সেন বলছেন :

পূজায় ও রাজনীতিতে মাতৃমূর্তির সুবিধা বোধ হয় এই যে এর আড়ালে অত্যাচার, হত্যা ইত্যাদি অবলীলাক্রমে করা যায়, যেমন করা হয় ভারতে, শ্রীলঙ্কায়। (পৃ. ৯১)

৪

সত্তরের দশককে যদি বলা হত মুক্তির দশক, আশির দশককে বলা যায় মৌল-বাদের দশক। এক সময় মনে হয়েছিল, সত্তরের দশকই ছিল সমর সেনের দশক, তিনি হয়ে উঠেছিলেন মুক্তিসংগ্রামের প্রতীক। তাঁর গদ্যরচনার ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ও তাঁর জীবনের-সংগ্রামের আখ্যান খতিয়ে দেখে বুঝলাম রাষ্ট্রের শোষণ-নিপীড়নযন্ত্রের মধ্যে মৌলবাদের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজাগ। উনিশ শতকের উত্তরাধিকার আমাদের এর হাত থেকে মুক্তির উপায় বাত্‌লাতে ত পারেইনি, উপরন্তু তার দিকে আরও বেশি করে ঠেলে দিয়েছে। মুক্তির দশকে সমর সেন তাঁর স্বভূমিকা পালন করেছেন অবশ্যই, কিন্তু এই দশকে তাঁকে প্রয়োজন ছিল আরও বেশি।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

এখন সীমান্তে

সে একটা সময় ছিল। শিক্ষিত বাঙালি তখনো ইংরেজিতে রাজনীতি চর্চা করত। কাগজ চালাত, সম্পাদকীয় লিখত। তাতে অনায়াসে আনাগোনা করত বিশ্ব ইতিহাসের নানা পর্বের নানা কথা। তার মধ্যে বেশি করে আধুনিক ইয়োরোপের লিবেরাল তথা বৈপ্লবিক রাজনীতির কথা। লিবেরাল রাজনীতির গায়ে ততদিনে অনেক ময়লা লেগেছে, তবু অন্তরের ভাবাদর্শটুকু সম্পূর্ণ মলিন হয় নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জয়ী হয়ে তা হয়ত কিছুটা বাড়তি জৌলুস নিয়েই বিশ্বময় ঘুরে বেড়াচ্ছে তখন। দুই যুদ্ধের মাঝখানে ইয়োরোপীয় গণতন্ত্রের কাঠামোটা মনে হয়েছিল ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে। এবার তার দেয়ালগুলো পাকাপোক্ত করার জন্য ফাঁকফোকরে ভরা হতে লাগল সমাজবাদের মশলা। তৈরি হল ওয়েলফেয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ভারতবর্ষে তখন স্বাধীনতার দ্বিতীয় দশক চলেছে। বুদ্ধিজীবী মহলে তখনো প্ল্যানিং নিয়ে উত্তেজনা। উজ্জীবিত তর্কবিতর্কে ঘুরেফিরে আসছে রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় আধুনিক ভারত গড়ার স্বপ্ন। জোটনিরপেক্ষ, স্বনির্ভর, শিল্পোন্নত ভারতবর্ষ, লিবেরাল গণতন্ত্রকে বজায় রেখে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পথে এগুনো—জওয়াহরলাল নেহরুর গণতান্ত্রিক সমাজবাদ নিয়ে মোহভঙ্গ হয় নি তখনো শিক্ষিত ভারতীয়দের। বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মন তখনো ভারতীয় রাষ্ট্রের বিশাল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে বেশ কিছুটা একাত্ম হয়ে আছে—সে পরামর্শ দেয়, সমালোচনা করে, ভেতরের লোক হিসেবেই। ভারতবর্ষে আধুনিক ভাবনাচিন্তার ক্ষুদ্র পরিমণ্ডলে তার তখনো বেশ একটা নেতা-গোছের ভাব। ইয়োরোপের ইতিহাস-দর্শন-সাহিত্য-শিল্পকলার সমুদ্রে ডুব দিয়ে সে তুলে আনছে আধুনিক মানবতার শ্রেষ্ঠরত্ন, অনুন্নত ভারতবাসীর সামনে এনে হাজির করছে ন্যায়নিষ্ঠ, যুক্তিগ্রাহ্য, বুদ্ধিদীপ্ত, কল্যাণময় সমাজপ্রগতির উজ্জ্বলতম আদর্শ। এবং বলা বাহুল্য, ইংরেজি ভাষায়। তা ছিল একান্তই স্বাভাবিক, অসঙ্গত বা বিসদৃশ কিছুই ছিল না তাতে

'নাও' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ৯ অক্টোবর ১৯৬৪। জওয়াহরলাল নেহরুর মৃত্যুর পাঁচ মাস পরে। ডিমাই কোয়ার্টো সাইজ, তখনকার ইংরেজি সাপ্তাহিক সাধারণত যে মাপে হত। ২৪ পৃষ্ঠার কাগজ, দাম তিরিশ পয়সা। কভারের তিন পৃষ্ঠা আর ভেতরে তিন-চার পৃষ্ঠা ফুল-পেজ বিজ্ঞাপন। প্রতি পৃষ্ঠায় তিন কলাম লাইনোয় ঝকঝকে ছাপা। দু-রঙা প্রচ্ছদ অতি সম্ভ্রান্ত ও আকর্ষণীয়। প্রতি সংখ্যায় চার-পাঁচটি, কখনো তারো বেশি সম্পাদকীয় মন্তব্য। প্রথম সংখ্যার

সম্পাদকীয়তে 'নাও'-এর ইস্তাহার : 'Why Now ?' 'নাও' কেন ? এখনই বা কেন ? আদৌ কেন ? কারণ, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের দায়িত্ব ভারতীয় সংবাদপত্রগুলো পুরোপুরি পালন করে নি। কারণ, একদিকে গয়ংগচ্ছ ভাব, অন্যদিকে বহু পরস্পরবিরোধী মতামতের বিভ্রান্তির মধ্যে এই সময়টাতেই স্বাধীন বিশ্লেষণের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। 'নাও' কোনো দল বা তত্ত্বের হাতে বাঁধা থাকবে না। সংবিধানে স্বীকৃত সেই নীতিগুলির প্রতিই সে নিষ্ঠ থাকবে যেগুলি এতকাল শুধু মুখে আওড়ানো হয়েছে, কাজে বাস্তবায়িত করা হয় নি। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রকে সে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করবে। জওয়াহরলাল নেহরুর নয়া ইমারতে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছে, সেগুলো দেখিয়ে দেওয়াই 'নাও'-এর কর্তব্য।

'নাও' সে অর্থে কোনো বৈপ্লবিক দল বা মতের পত্রিকা ছিল না কখনো। হুমায়ুন কবিরের উদ্যোগে কাগজ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এবং তাতে সম্পাদক হিসেবে সমর সেনের যোগ দেওয়ার কাহিনী সমরবাবু নিজেই বর্ণনা করেছেন তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত'-এ। পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে ততদিনে তাঁর যথেষ্ট নাম হয়েছে। 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড'-এর ঘটনার ফলে লোকে তাঁকে স্বাধীনচেতা এবং কর্তব্যনিষ্ঠ বলেও জেনেছে। সেই সুবাদেই তিনি দায়িত্ব পেলেন তাঁর নিজের কাগজ পরিচালনা করার। তৎকালীন রাজনীতি ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে 'নাও'-এর ভূমিকা ছিল সমালোচকের, কিন্তু পশ্চিমবাংলার শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের চিন্তা-ভাবনা আচার-আচরণের কেন্দ্রস্থলেই সে নিজেকে অবস্থিত করতে চেয়েছিল। প্রায় একই সময় আরো তিন-চারটি পত্রিকার আবির্ভাব হয়েছিল এই ধরনের অগ্রসর চিন্তাশীলতার বাহন হিসেবে—বোম্বাইতে শচীন চৌধুরীর 'ইকনমিক উইকলি', দিল্লি থেকে প্রকাশিত স্বল্পায়ু 'এনকোয়ারি', রমেশ থাপারের 'সেমিনার' আর কলকাতার 'নাও'।

সমালোচকের ভূমিকায় 'নাও'-এর ভঙ্গিটা ছিল তীক্ষ্ণ, সরস, কিন্তু নেতিবাচক নয়। বরং নানা বিভ্রান্তিকর উক্তি আর ফাঁকা বুলির ভেতর থেকে আসল সমস্যাটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেস তখন জওয়াহরলালের মৃত্যুর সাংঘাতিক ধাক্কাটা সামলে ওঠার চেষ্টা করছে। অর্থনীতিতে দেখা দিয়েছে বিকট খাদ্যসমস্যা। তারই মধ্যে ১৯৬৫-র অক্টোবর মাসে শুরু হল ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা নীতি সমর্থন করেছিল 'নাও'—দেশের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা সরকারের কর্তব্য, এই বলে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পেছনে মার্কিনী মদত ছিল, তাই দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক প্রশ্নটা ছিল গুরুতর। কিন্তু কোনো সময় পাক-বিরোধী জিগির তোলে নি 'নাও', বরং তার বিরুদ্ধে, আর সেই সঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

পাকানোর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিল সকলকে। তার পর শান্তি-প্রস্তাব নিয়ে যখন টালবাহানা চলতে লাগল, 'নাও' স্পষ্টভাবে জানালো, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে শান্তিতে বাস করাতেই ভারতবাসীর স্বার্থ সবচেয়ে বেশি। তুচ্ছ মান-সম্মানের প্রশ্নে শান্তি-প্রচেষ্টা আটকে থাকা উচিত নয়। ক-দিন বাদে তাশখন্দে শান্তিচুক্তি সই হবার পর-পরই প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী মারা গেলেন। 'নাও' লিখল : 'A common man is dead, long live the common man.'

নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন ইন্দিরা গান্ধী। মোরারজি দেশাই-কে কেন্দ্র করে মার্কিনপ্রেমী গোষ্ঠী আপাতত পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে, এতে 'নাও' কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিল মনে হয়। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমী জোটের দিকে ঝুঁকে পড়ার প্রবণতা নিয়ে বারে বারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিল 'নাও' : 'Must we allow Jawaharlal Nehru to be written out of our conscience and our memories ?' এবার হয়ত নেহরু-প্রবর্তিত পথ থেকে বিচ্যুতি ঘটবে না। ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচনে এই ইঙ্গিত দেখেছিল 'নাও'। কিন্তু আহ্লাদে গদগদ হয় নি, সতর্ক দূরত্বে দাঁড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিল মাত্র। 'With awe and hope, we come back and lay our claims on the Princess charming.' কিন্তু আশ্বস্ত থাকা যায় নি বেশিদিন। খাদ্যসংকট তীব্রতর হল। এককালের সমাজতন্ত্রী অশোক মেহতা ইন্দিরা মন্ত্রিসভার দূত হিসেবে ওয়াশিংটন ছুটলেন ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়ে। ক-দিন বাদেই এল ডিভ্যালুয়েশন। ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে কিছুটা আক্ষেপের সুরেই 'নাও' লিখল : 'Unlike her father, she is not free,' অন্যের কথায় চলতে হচ্ছে তাকে। ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭-র সাধারণ নির্বাচনের পূর্বাহ্নে 'নাও'-এর বক্তব্যে কিন্তু দ্বিধাদ্বন্দ্বের বিন্দুমাত্র ছোঁয়াও ছিল না। স্পষ্ট ভাষায় সে ঘোষণা করল : 'Not a vote, not even a casual absentminded vote, must be cast for the Congress'.

ওদিকে বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠছে ভিয়েতনামের যুদ্ধ। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দানবীয় আক্রমণের বিরুদ্ধে 'নাও' যে সরব ছিল, তাতে আশ্চর্যের কিছু থাকতে পারে এমন কথা আজ মনে হওয়া শক্ত। কিন্তু ১৯৬৫-৬৬ সালের পত্রপত্রিকা দেখলে দেখা যাবে যে অধিকাংশ শিক্ষিত ভারতীয়ই কিন্তু তখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে মনস্থির করে ওঠেন নি, বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্ট প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা নিয়ে অনেকেই যথেষ্ট চিন্তিত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে 'নাও'-এর সমালোচনার বিশেষ লক্ষ্য ছিল ভারত সরকারের ধরি-মাছ না-ছুঁই-পানি গোছের মনোভাব। উত্তর ভিয়েতনামের ওপর সরাসরি মার্কিন আক্রমণের পর্ব শুরু হলে 'নাও' আরো একটা সম্ভাবনা দেখেছিল।

'একটা ব্যাপারে কম্যুনিস্টরা প্রেসিডেন্ট জনসনের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেন। তিনিই হয়ত এবার চীন আর রাশিয়ার মৈত্রীর সেতুবন্ধন করে দিলেন।' চীনের আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নিয়ে প্রথম লেখা বেরোয় মার্চ ১৯৬৫-তে, জোন রবিনসনের লেখা। এরপর ১৯৬৭-র গোড়ায় 'মনিটর' ছদ্মনামে (পরেশ চট্টোপাধ্যায়) তিন কিস্তিতে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ওপর বিস্তারিত প্রবন্ধ, তার ওপর মোহিত সেনের দীর্ঘ সমালোচনা আর তাই নিয়ে বাদানুবাদ। সম্পাদকীয় স্তম্ভে 'নাও' এ-ব্যাপারে কোনো পক্ষ অবলম্বন করে নি। ভারতবর্ষে তখন অন্ধ চীন-বিরোধিতা চলেছে, সেই অবস্থায় স্পষ্ট বিশ্লেষণ আর বিতর্কের সুযোগ করে দেওয়ার মধ্যে সাহস আর মুক্তমনের পরিচয় ছিল।

পশ্চিমবাংলার ঘটনা অনেকটাই জায়গা অধিকার করেছিল 'নাও'-এর পৃষ্ঠায়। ঘটনাবহুল সময়ও ছিল সেটা। দেশব্যাপী খাদ্যসমস্যা পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে চলেছে তখন। তারই মধ্যে ১৯৬৫-র জানুয়ারিতে দুর্গাপুরে কংগ্রেস অধিবেশন বসল। রাজ্য কংগ্রেসের কর্ণধার অতুল্য ঘোষ সম্বন্ধে 'নাও' বেশ কড়া ভাষাই ব্যবহার করত। আসলে কংগ্রেসি শাসন নিয়ে পশ্চিমবাংলার মনোভাব যে যথেষ্ট বিরূপ হয়ে উঠেছে, 'নাও'-এর পাতায় তার প্রতিফলন খুব স্পষ্টই দেখা যায়। খাদ্য আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল ১৯৬৬-র ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে। পরপর কয়েক সপ্তাহ ধরে বেরোতে লাগল 'নাও'-এর জ্বলন্ত সম্পাদকীয়, তার পাশাপাশি অশোক মিত্রের 'ক্যালকাটা ডায়েরি', আর অসংখ্য চিঠি। 'খাদ্যকে শুধু আইন-শৃঙ্খলার সমস্যা হিসেবে দেখলে তার পরিণাম মারাত্মক হতে বাধ্য', এই ছিল সে-সব লেখার মূল কথা। আর সেই সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতা এবং পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভের সুর। ক-মাস বাদেই শুরু হয়ে গেল পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনের তোড়জোড়। 'নাও' স্বভাবতই বামপন্থী ঐক্যের পক্ষে, কিন্তু সে-পথের বাধাবিপত্তিগুলো নিয়ে 'নাও' যথেষ্ট সজাগও ছিল। 'বাম রাজনীতিতে অনেক ফাটল আছে। সকলে সমানভাবে কংগ্রেস-বিরোধী নয়। মুখে ইনকিলাব জিন্দাবাদ ধ্বনি দিতে দিতে গোপনে টেবিলের তলা দিয়ে জোট বাঁধার চেষ্টা হবে, সতর্ক থাকুন।' অশোক মিত্র সে-সময় আরো নির্ভেজাল বিপ্লববাদী ছিলেন। বামপন্থীদের নির্বাচন-সর্বস্বতা নিয়ে প্রচুর কটু কথা লিখতেন তিনি 'ক্যালকাটা ডায়েরি'-তে।

৬৬-র সেপ্টেম্বরে দু-দিনের পশ্চিমবাংলা বন্ধ পালিত হল। পুলিশ বন্দোবস্ত আর সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টার কোনো কসুর ছিল না সরকারের। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বেতার ভাষণ নিয়ে 'নাও' লিখল : 'তিনি নিজেই নিজের ডক্টর গোয়েবেল্স হয়ে দাঁড়িয়েছেন।' বামপন্থী-সংগঠিত প্রতিবাদের দিকে পূর্ণ সমর্থন ছিল 'নাও'-এর, কিন্তু প্রয়োজনীয় সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে সে দ্বিধা করে নি। 'বাম-

পন্থীদের মধ্যে ঐক্য নেই। মনে রাখা প্রয়োজন, পশ্চিমবাংলার ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে তলার দিকে সংগঠন তৈরি করতে বামপন্থীরা এখনো সক্ষম হন নি।' ৬৭-র নির্বাচনের পূর্বাহ্নে 'নাও' লিখল : 'আশা করি বামপন্থী অনৈক্য সত্ত্বেও জনগণ স্থির প্রত্যয় নিয়ে ভোট দেবেন।' নির্বাচনের ফল বেরোলে 'নাও' ঘোষণা করল : **'The people have done it !'**

যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার প্রতি সম্পূর্ণ শুভেচ্ছা আর সমর্থন জানিয়েছিল 'নাও'। সেই সঙ্গে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কী করা সম্ভব, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মনোভাব নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিল নতুন সরকারের নেতাদের : 'বাম সি-পি-আই নেতারাও অনেকে শ্রীমতী গান্ধীর কথায় আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাঁদের সতর্ক থাকা দরকার। কেরালা আর পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্র সদয় হবেন এমন মনে করার কোনো কারণ নেই।' দু-তিন মাসের মধ্যেই অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। মূল্যবৃদ্ধি রোধ করা যায় নি। 'অঞ্চলে অঞ্চলে গণ-কমিটি করার দরকার, তা আদৌ হচ্ছে না।' ৬৭-র জুন মাসেই 'নাও' লিখল : 'এ এক বিরক্তিকর দুর্বলতা। জনগণের এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় বাধা টানা হচ্ছে।' এই সময়েই শুরু হয়ে গেল নকশালবাড়ি কৃষক আন্দোলন। 'ভূমি সমস্যা থেকে যে বড় রকমের উত্থান অবশ্যম্ভাবী, যুক্তফ্রন্ট নেতাদের অন্তত এ-কথা জানা থাকা উচিত। ...নকশালবাড়ির কৃষকেরা তাদের আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন সরকারকেই অভিনন্দন জানাচ্ছে।' পরের সপ্তাহে থাকল একই কথা : 'কৃষকেরা সর্বত্র নড়েচড়ে বসেছে। যুক্তফ্রন্টের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তারা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে শিখেছে।' এর কদিন বাদেই এল চীন থেকে 'স্প্রিং থাণ্ডার' ঘোষণা। ১৪ জুলাই ১৯৬৭-র সম্পাদকীয়তে 'নাও' লিখল: 'চীনারা সমর্থন জানিয়েছে বলেই নকশালবাড়ির আন্দোলনকে অস্বীকার করতে হবে, নতুন সরকারের সবাই নিশ্চয় এমন ভাবেন না।'

এরপর আর বেশিদিন 'নাও' চলে নি। পত্রিকার মালিকেরা স্থির করলেন এই সম্পাদকীয় নীতি তাঁদের মনঃপূত নয়। হুমায়ুন কবির আসলে নিজেই ততদিনে যুক্তফ্রন্ট ভাঙার রাজনীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন। কিছুদিন মনোমালিন্য চলল, মালিকেরা দু-একটি সাংগঠনিক প্যাঁচ কশলেন। সমর সেন সম্পাদক হিসেবে ইস্তফা দিলেন ১৯৬৮-র জানুয়ারিতে। এই কাহিনীও 'বাবু বৃত্তান্ত'-এ লিপিবদ্ধ আছে।

রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ ও আলোচনার ক্ষেত্রে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই 'নাও' যথেষ্ট প্রভাবশালী পত্রিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যতদূর জানা যায়, সমর সেনের পদত্যাগ পর্যন্ত 'নাও'-এর বিক্রি ক্রমাগত বেড়েই গিয়েছে।

বিজ্ঞাপনের দিক দিয়ে কোনো ঘাটতি তো হয়ই নি, বরং শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। পরে পাঠকদের প্রতিক্রিয়ার আন্দাজ পাওয়া যেত তিন-চার পৃষ্ঠা-জোড়া চিঠিপত্রের কলামে। প্রায় প্রতিটি লেখা নিয়ে পাঠকদের মন্তব্য আর প্রায়শই বাদানুবাদ।

কিন্তু উচ্চশিক্ষিত পাঠকমহলে 'নাও'-এর জনপ্রিয়তা শুধু তার রাজনীতি-চর্চার মধ্যেই সীমিত ছিল না। তৎকালীন কলকাতার সংস্কৃতি-শিল্পকলার বিষয়ে সিরিয়াস, বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনার মাধ্যম হিসেবেও 'নাও' অত্যন্ত আকর্ষণীয় পত্রিকা ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, পরবর্তী কালের ইংরেজি-বাংলা কোনো পত্রিকাই নিয়মিতভাবে কলকাতার নাটক-সিনেমা চিত্রকলা সমালোচনার এমন উজ্জ্বল সমাহার হাজির করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। প্রথম দিকে প্রতি সংখ্যায় থাকত ইয়াগো ছদ্মনামে উৎপল দত্তের নাট্যসমালোচনা—অত্যন্ত সুলিখিত, তীক্ষ্ণ, স্বভাবসুলভ বক্রোক্তিতে ঠাসা, সময় সময় অসম্ভব রকমের উদ্ভট কিছু মন্তব্য। প্রবল উত্তেজনা সৃষ্টি করত এই সমালোচনাগুলি, 'নাও'-এর চিঠিপত্রের পাতায় তা দেখা যেত। চলচ্চিত্র-সমালোচনার পৃষ্ঠাতেও কলকাতায় দেখানো হয়েছে এমন ইংরেজি বাংলা-হিন্দি সব ছবিরই সমালোচনা থাকত প্রতি সপ্তাহে, আর থাকত ফিল্ম সোসাইটিতে প্রদর্শিত ইয়োরোপীয়-জাপানি ছবির বিষয়ে প্রবন্ধ। তা সত্ত্বেও একজন পাঠক অভিযোগ করেছিলেন, সংস্কৃতি-আলোচনাকে আপনারা দ্বিতীয় স্থানে রেখেছেন কেন? আরো রিভিউ চাই।

নানা বিষয়ে প্রবন্ধ-লেখকদের মধ্যে নামজাদা অনেকেই ছিলেন। সর্বভারতীয় রাজনীতি নিয়ে কয়েকবার লিখেছিলেন টাইম্স অফ ইণ্ডিয়ার ফ্রাঙ্ক মোরেস, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা নিয়ে জামিয়া মিলিয়ার উপাচার্য এম. মুজিব। পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে নিয়মিত লিখতেন কে. পি. করুণাকরণ, শিশির গুপ্ত এবং পরে অনিরুদ্ধ গুপ্ত। সত্যজিৎ রায় চ্যাপলিনের আত্মজীবনী রিভিউ করেছিলেন 'নাও'-এর পাতায়। 'আবোল-তাবোল' থেকে কয়েকটি ছড়ার প্রথম অনুবাদও বেরোয় এইখানে। অশোক মিত্রের 'ক্যালকাটা ডায়েরি' শুরু হয় 'নাও'-এই। কাগজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অনেক পরে সেটা 'ইকনমিক অ্যাণ্ড পলিটিকাল উইকলি'-র পৃষ্ঠায় নতুন করে চালু হয়। বামপন্থী অর্থনীতিবিদদের অনেকেই 'নাও'-তে নিয়মিত লিখেছেন—অশোক রুদ্র, পরেশ চট্টোপাধ্যায়, অমিয়কুমার বাগচী। ঐতিহাসিক বরুণ দে, শিপ্রা সরকার, সব্যসাচী ভট্টাচার্যও লিখেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল নীরদ চৌধুরীর প্রবন্ধ—ইংরেজ শাসনের সুফল বাঙালি সমাজের অবক্ষয়, নিরামিষ ভক্ষণের সঙ্গে ভারতীয় রাজনীতির সম্পর্ক, ভারতীয় বিপ্লবের অসম্ভাব্যতা—কত উদ্ভট কথা কত জোর দিয়ে বলা যায় তার অনুপম নিদর্শন। ভারত-পাক যুদ্ধের পর নীরদবাবু যুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য প্রয়োগ করে দেখালেন, এটা কোনো যুদ্ধই নয়। যে-যুদ্ধে একদিকের সেনাপতি একজন বাঙালি, সেটা আবার

যুদ্ধ নাকি? পরের সংখ্যায় স্টেট্সম্যানের লিণ্ডসে এমার্সন লিখলেন, এ-কাজ একমাত্র বাঙালিই পারে—এক বাঙালি, যে জীবনে কোনোদিন বন্দুকই দেখে নি, সে আর এক বাঙালি জেনেরালকে বলছে, তুমি যুদ্ধের কি জানো? তার উত্তরে নীরদবাবু ছোট্ট একটা চিঠি দিয়েছিলেন—দুই বাঙালি বাবুর ঝগড়া দেখে হাসা, এ কাজও ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ বটে!

একটা বিষয়ে পরবর্তী কালের 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কাজ 'নাও'-তেই শুরু হয়েছিল। তা হল রাষ্ট্রীয় প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে নাগরিক অধিকার রক্ষার চেষ্টা। ১৯৬৪ সালেই বাম সি-পি-আই নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় 'নাও'। ভারত তখন চীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত নয়, আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কও ছিন্ন হয় নি। অথচ চীন বিপ্লবের অনুরাগী বলে, ঘরে মাও সে-তুঙের বই পাওয়া গিয়েছে এই অভিযোগে রাজনৈতিক কর্মীদের বিনা বিচারে ভারতরক্ষা আইনে আটক রাখার পেছনে একমাত্র রাজনৈতিক অসদুদ্দেশ্য ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। ১৯৬৫ সালে লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'কল্লোল' নাটকের বিরুদ্ধে বড় পত্রিকাগুলির জঘন্য আক্রমণের সময় 'নাও' এসে দাঁড়িয়েছিল এল-টি-জি-র পাশে। প্রতি সংখ্যায় 'কল্লোল'-এর বিজ্ঞাপন ছাপা হত তখন।

রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য নিয়েও কিন্তু 'নাও' শিক্ষিত বাঙালিসমাজের জীবনচর্চার কেন্দ্রস্থলেই দাঁড়িয়ে ছিল। 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকার পর্বে সমর সেনের কাগজটি ক্রমেই সেই জায়গা থেকে সরে চলে আসে এক প্রান্তে। বরং বলা উচিত, সরে আসতে বাধ্য হয়। আসলে সত্তর-দশকের ঘটনাবহুল বছরগুলি শিক্ষিত বাঙালির মনে ঠিক কতটা গভীর পরিবর্তন এনে দিয়েছে, তা আমরা এখনো সম্পূর্ণ বুঝে উঠতে পারি নি। সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শবোধ, সততা, দূরদৃষ্টি—এসব মূল্যবোধগুলোকে কত নির্মমভাবে আমরা ত্যাগ করতে পেরেছি, তা আজ নিজেদের কাছেই আমরা স্বীকার করতে পারব না। শিল্প-সংস্কৃতির কাজে আজ হঠাৎ আবিষ্কার করেছি, সৃষ্টিশীলতার ধারা শুকিয়ে গেছে। কখন গেল, কেন গেল, উত্তর দিতে পারি না। ইংরেজি ভাষার কদর আমাদের মধ্যে কমে নি, বরং উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। অথচ বাঙালির ইংরেজি-চর্চা থেকে চলে গেছে শিক্ষার প্রত্যয়, পরিবর্তে এসেছে ইংলিশ-মিডিয়ামের হীনমন্যতা।

জীবনের শেষ বছরগুলিতে সমর সেন একান্ত ভাবেই নিঃসঙ্গ ছিলেন। তাঁর সততা, কর্তব্যনিষ্ঠা, এমন কি সাংবাদিকতার পেশাগত দক্ষতার গর্ব নিয়েও তাঁর পক্ষে আর বাঙালি জীবনের কেন্দ্রস্থলে থাকা সম্ভব ছিল না। 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজ তাই হয়ে উঠেছিল মার-খাওয়া, উচ্ছেদ-হওয়া ব্রাত্যদের কণ্ঠস্বর। যাদের কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, যাদের কথা কেউ বলবে না, তাদের কথা বলার আলোচনা করার জায়গা করে দিয়েছিলেন সমর সেন তাঁর 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজে।

হ্যাঁ, উপকণ্ঠের কাগজ, দরিদ্র বেশ, ক্ষীণ কলেবর, তবু ক্ষীণজীবী তো নয়। চালিয়ে নিয়ে এসেছিলেন কাগজটাকে তাঁর শেষ দিন পর্যন্ত সমর সেন। টাকা নেই, বিজ্ঞাপন নেই, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন নেই, রাজনৈতিক দলের মদত নেই, তার ওপর এমার্জেন্সির মধ্যে দেড় বছর কাগজ বন্ধ। তা সত্ত্বেও বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র জীবিকা এবং একমাত্র কর্তব্য হিসেবে 'ফ্রন্টিয়ার'-কেই ধরে রেখেছিলেন তিনি। সমর সেনকে অনেকে বলবেন, সিনিক। কথাটা আদৌ ঠিক বলে মনে হয় না, বরং সম্পূর্ণই উল্টো। সিনিকাল হলে তিনি গাড়ি-বাড়ি করে বহাল তবিয়তে স্বর্গে যেতে পারতেন। মধ্যবিত্ত জীবনে সাফল্যের প্রত্যেকটি যোগ্যতা তাঁর ছিল, সিনিসিজ্‌মটি বাদে। আজকের মধ্যবিত্ত সমাজের সর্বব্যাপী সিনিসিজ্‌মের বিপরীত সীমান্তেই শেষ পর্যন্ত সরে গিয়েছিলেন সমর সেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়েও তাই নিজেদের ব্যর্থতা সম্বন্ধেই বারে বারে সচেতন হতে হয় আমাদের।

ভবানী চৌধুরী

ষাট-সত্তর দশকের সমর সেন

ষাট-সত্তরের দশক ছিল, কি বিশ্বে কি ভারতে, বিশাল ঝড়-ঝাপটার সময়। এক-দিকে বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদীদের তাণ্ডবলীলা। অন্যদিকে এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকায় তখন প্রবল গতিতে ছড়িয়ে পড়া সংগ্রাম। একদিকে, পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ায় নেতিবাচক এক রূপান্তর ঘটছে ক্রুশ্চভ-ব্রেজনভের আমলে। অন্যদিকে, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে চীনেও হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের নতুন দিগন্তের উন্মোচন। কোটি কোটি ভারতবাসীর ওপর এই সময়ে শোষণ-নিপীড়ন যেমন বেশি বেশি করে চেপে বসেছে, তেমনি মেহনতী মানুষের সংগ্রাম ও সংগঠন এগিয়ে গেছে ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে। নকশালবাড়ির কৃষক-সংগ্রামের আলোকে যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত মেহনতী মানুষও এক সময় খুঁজে পেয়েছে তাদের মুক্তির পথ।

ক্রুশ্চভের রাশিয়া থেকে মোহমুক্ত হয়ে ফিরে ১৯৬১-তে জন্মস্থান কলকাতাকেই কর্মক্ষেত্র করলেন কবি সমর সেন। দেশে তখন ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। সেই উত্তাল পর্বের সমাপ্তি ঘটল ১৯৭৭-এ, জরুরী অবস্থার অবসান ঘোষণার মধ্যে। নিপীড়ন—সংগ্রাম, সংগ্রাম—নিপীড়ন, তারপর আবার নিপীড়ন ও সংগ্রাম—এই পর্বের ছিল এটাই দ্বান্দ্বিকতা। ষাট-সত্তর দশকের এই কঠিন পর্বেই সমর সেন অবতীর্ণ হলেন বলিষ্ঠ, অনন্য এক ভূমিকায়। সাংবাদিকতাকেই কবি সমর সেন এবার তাঁর সংগ্রামের হাতিয়ার করলেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রথমে 'নাউ' ও পরে 'ফ্রন্টিয়ার' সচেতন বুদ্ধিজীবীদের কাছে নতুন পথ খুলে দিল: সংগ্রামের সমর্থনে ও নিপীড়নের প্রতিবাদে কী সম্ভাবনাময় ভূমিকা পত্র-পত্রিকা পালন করতে পারে, তারই এক সাক্ষাৎ পরিচয় মিলল 'নাউ'-'ফ্রন্টিয়ারে'র পাতায়।

সমর সেনের সমস্ত রাজনৈতিক মতামত স্বচ্ছ ছিল, এমন অবশ্যই নয়। 'নাউ' বা 'ফ্রন্টিয়ারে'র কোন কোন লেখা নিয়ে বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি নগণ্য হয়ে যায় সাফল্যের প্রতিতুলনায়। সমর সেন-সম্পাদিত এই দুটি পত্রিকা অন্তত একটি অমূল্য শিক্ষা রেখে গেছে আমাদের জন্য। আইনের রীতি-নীতি-মেনে-প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকার সীমাবদ্ধতার মধ্যে, সামান্য পরিমাণে হলেও, মসী যে কখনো কখনো অসির সেবা করতে পারে প্রয়োজনীয় এই পাঠ আমরা তাদের কাছেই পেলাম।

সমর সেন-এর মতন মানুষদের পথ, কোনদিনই কুসুমাস্তীর্ণ থাকে না। এ পথেও অনেক বাধা, অনেক দুঃখ কষ্ট, অনেক নিগ্রহ। তাই, ষাট-সত্তর দশকের

ঝড়ঝাপটার বছরগুলোতেই মূলতঃ, সমর সেনের ভূমিকা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। নকশালবাড়ির সংগ্রাম আলোড়িত করেছিল তাঁকে, সাহস দিয়েছিল। কবি-সাংবাদিক সমর সেন হয়ে উঠেছিলেন এক প্রাজ্ঞ, নির্ভীক মানুষ। অভূতপূর্ব সংকটের দিন গুলোতে সমস্ত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে প্রায় এককভাবে তিনি সোচ্চার হয়েছিলেন। ১৯৬২-তে চীনের প্রশ্নে বা '৭০-'৭২-এ বাঙলাদেশের প্রশ্নে যখন উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যা বয়ে গিয়েছিল পশ্চিম বাংলায়, বয়ে গিয়েছিল গোটা ভারতে, তখনও প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন তিনি। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সেদিন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তাদের কুৎসিত চেহারাকে তুলে ধরেছিল জনসমক্ষে। বরানগরের গণহত্যা সম্পর্কে সবাই যখন নীরব, প্রতিষ্ঠিত প্রেস যখন সরকারের স্তুতিগানে উন্মত্ত, তখন প্রতিবাদের ভাষা যুগিয়েছে একমাত্র ফ্রন্টিয়ার। জরুরী অবস্থার দিনগুলোতে যখন প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বরও পুরোপুরি স্তব্ধ, তখন আর কোন্ পত্রিকাই বা সাহস করে প্রতিবাদ করেছে? চরম সংকটের সেই সব মুহূর্তে আর কোন্ সংবাদপত্র পেরেছে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর মতো বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে? এই ভাবেই দেশের সংবাদপত্র জগতে নির্ভীকতার এক অনুসরণযোগ্য দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন সমর সেন।

সমর সেন বড় কবি ছিলেন, বড় মাপের সাংবাদিক ছিলেন, বাংলা ও ইংরেজি —দুটো ভাষাতেই তাঁর সমান পারদর্শিতা ছিল, এ সবই সত্য। কিন্তু শুধু কি এই সবের জন্যই তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা? তা অবশ্যই নয়। সমর সেনকে আমরা শ্রদ্ধা করি একজন আপসহীন মানুষ, নির্ভীক সাংবাদিক হিসেবে। অত্যাচার-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে কোনদিনই তিনি পিছপা হন নি বলেই তাঁকে এই শ্রদ্ধা। অবশ্য এর জন্য ছাড়তেও হয়েছে তাঁকে অনেক কিছু। এই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার সমস্ত গুণই তাঁর ছিল। কিন্তু যে-প্রতিষ্ঠার জন্য মুখ বুঁজে অন্যায়কে সহ্য করে যেতে হয় তাকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন, আখের গুছানো ওয়ালাদের দু চোখে দেখতে পারতেন না। পুরস্কার পাওয়ার জন্য যারা দিল্লির দরবারে ধর্ণা দিতে যায় তাদের দলের তিনি নন। এই সব কারণেই সমর সেন ছিলেন কলকাতার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনন্য। তাঁর এই অনন্যতা সব চাইতে ভাল ফুটে উঠেছিল এক কঠিনতম মুহূর্তে, ষাট-সত্তরের দশকে। তাই সেই ষাট-সত্তরের সমর সেনকেই আমরা বিশেষ ভাবে স্মরণ করি।

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

সমর সেন : শেষ পদাতিক ?

১ ॥ কবিতায় আবেগের আদৌ কোনো স্থান থাকা উচিত কিনা—এ নিয়ে সমর সেনের বিশেষ প্রশ্ন ছিলো। তাই, ১৯৪১-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'উত্তর ফাল্গুনী' কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "বিশ্বাস যখন আবেগে পরিণত হয় তখন কাব্যশক্তি কমে আসে" ('কবিতা' : পৌষ, ১৩৪৮)। এর তিন বছর আগে 'বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে তিনি আরো বলেছিলেন : "রোম্যাণ্টিক আন্দোলনের একটি অন্যতম বিশেষত্ব, বিচারবুদ্ধির ও অনুভূতির মধ্যে তীক্ষ্ণ পার্থক্য টানা, এবং প্রথমটির বিসর্জন, আমাদের দেশে উর্বর ভূমি পেয়েছে" ('কবিতা' : বৈশাখ, ১৩৪৫)। এ সব থেকে মনে হয়, কবিতায় অনুভূতির আবেগ-উচ্ছ্বসিত অবাধ প্রকাশের তিনি বিরোধী ছিলেন, এমনকি কবিতার ক্ষেত্রেও বিচারবুদ্ধির মাপা পদক্ষেপেই তিনি এগোতে চেয়েছিলেন।

২ ॥ সমর সেন গভীর ভাবেই অনুভব করতেন যে, "চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় না আনতে পারলে বিপ্লবী হওয়া যায় না" ('বাবু বৃত্তান্ত' : পৃ. ৫৫)। তিনি একথাও বুঝতেন যে, "আমাদের জীবনে মধ্যবিত্ত অক্ষমতা ও ব্যর্থতার থেকে মুক্তির উপায় জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ···এ যোগাযোগ না থাকলে আমাদের যাত্রা ব্যর্থ হতে বাধ্য ('কবিতা' : কার্তিক, ১৩৪৯)। এর পাশাপাশি, নিজের সম্পর্কে নির্মোহ আত্ম-সমীক্ষা করে তিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর "গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে," সে গণ্ডী তিনি কখনো কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ('বাবু বৃত্তান্ত' : পৃ. ৩৩)। ছোটোবেলায় 'কচুটা কমিউনিস্টপন্থী আবহাওয়ায় বড়ো হয়ে, কিশোর ও তরুণ বয়সে তৎকালীন কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতার ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসে, এবং ফ্যাসি-বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েও তাই "কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেবার চেষ্টা করবো কিনা গভীর-ভাবে চিন্তা করে" শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, তাঁর দ্বারা সক্রিয় রাজনীতি হবে না ('বাবু বৃত্তান্ত' : পৃ ৪০)।

৩ ॥ সমর সেন 'বুদ্ধিজীবী' কথাটিকে ইংরাজী 'ইন্টেলেকচুয়াল' কথাটির সঠিক অনুবাদ ব'লে মনে করতেন না, কারণ, তাঁর মতে, 'ইন্টেলেকচুয়াল' কথাটিতে জীবিকার প্রসঙ্গ এসে পড়ে না। তাই 'বুদ্ধিজীবী' বঙ্গানুবাদের মধ্যে তিনি পুরোনো ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের রেশ খুঁজে পেতেন, কিংবা খুঁজে পেতেন মুৎসুদ্দি

সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য, কেননা সেখানে বুদ্ধি ও জীবিকার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতো স্বাধীন লোক ও মননশীলতা যে আমাদের দেশে অত্যন্ত দুর্লভ, তার কারণ এভাবেই তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন আমাদের দেশে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক দ্বন্দ্বের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য কাজের সঙ্গে বিরোধের মধ্যে। তাঁর চোখে ধরা পড়েছে, যে-কাজ যে-চাকরি বুদ্ধিজীবীরা করেন, তার সঙ্গে তাঁদের মূল্যবোধ খাপ খায় না, ফলে বিবেকদংশন দেখা দেয়। "অনেকে নানা জোড়া-তালি দিয়ে শেষ পর্যন্ত অবস্থাটা সইয়ে নেন। অল্পসংখ্যক ব্যক্তি সেটা পারেন না। তাঁরা না ঘরের, না বাইরের" ('চন্দ্রবিন্দু বাদে')। সমর সেন স্পষ্ট ক'রে না বললেও এটা পরিষ্কার যে নিজেকে তিনি সেই "না-ঘরের-না-বাইরের" মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের অন্যতম ব'লে মনে করতেন।

২

কবিতায় বিচারবুদ্ধি ও আবেগের, ব্যক্তিগত জীবনে শ্রেণী-অবস্থান ও রাজনৈতিক সক্রিয়তার, এবং মানসিকতায় কাজ ও জীবিকার দ্বন্দ্ব—এসব বিষয়ে সমর সেনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে প্রথমেই আমরা যে পরিচয় পেয়েছি, সম্ভবত সদ্যপ্রয়াত সমর সেনকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে তা আমাদের সাহায্য করবে।

একথা অনস্বীকার্য যে অন্যতম অগ্রণী আধুনিক বাঙালি কবি হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি পেয়েছিলেন সমর সেন। শুধু তাই নয়, ত্রিশের দশক থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় পাঁচ দশক ধরে সমর সেনের কর্মজীবন বিস্তৃত হলেও, মাত্র দেড় দশক জুড়ে বিস্তৃত তাঁর কবিসত্তাই যে প্রাতিষ্ঠানিক বাংলা সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের চোখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব'লে বিবেচিত হয়েছে, তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী অধিকাংশ শোক-প্রস্তাবে তার প্রমাণ মিলেছে। অথচ সমর সেন জীবনের শেষ চার দশকে কবিতা লেখা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার কারণ তাঁর নিজের ভাষায়, "ছক মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছিলো" ('উড়ো খই' : ৪)। সেই ছকটা কীসের, তার ব্যাখ্যা তিনি স্পষ্ট ক'রে দেননি। তাঁর কবি জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের বিশ্লেষণ সম্ভবত এ ব্যাপারে আমাদের খানিকটা সাহায্য করবে।

মোটামুটিভাবে ত্রিশের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় কালকে যদি তাঁর কবি জীবনের প্রথম পর্যায় বলে ধরি, তাহলে দেখা যাবে, এ পর্যায়ে সামাজিক রাজনৈতিক বিভিন্ন ঘটনাস্রোত তাঁর কবিতায় ছায়া ফেলেনি, তখন তাঁর কবিতার প্রাথমিক উৎস ছিলো ব্যক্তিমনের সঙ্গে ব্যক্তিমনের সংঘাত, সামাজিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে কবিমানসের সংঘাত নয়। এ সময়ের অধিকাংশ কবিতাই প্রেমের, প্রেমের কামনা-বাসনার অপ্রাপ্তিজনিত বেদনার। প্রেম-বাসনায় প্রত্যাখ্যাত এক তরুণ

মানসের স্মৃতি, অপ্রাপ্তি, নিরাশা ও ক্লান্তি, তাঁর মধ্যবিত্ত অবস্থানগত সচেতনতা, আত্ম-বিদ্রূপ ও মুক্তিবাসনা—এ সব কিছুই আবর্তিত হয়েছে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে ঘিরে। তা-ও প্রেমের মাধুর্য, সমারোহ ও ব্যাকুলতার বদলে কবিতায় প্রধান সুর হিসেবে ধরা পড়েছে প্রেমের ক্ষত-বিক্ষত আর্তি, শূন্যতা, নৈঃশব্দ ও অন্ধকার, এমনকি অতিপ্রখর শরীর-চেতনাও।

এর পরের পর্যায়ের কবিতায় ধীরে ধীরে তাঁর চারদিকের মধ্যবিত্ত নাগরিক পরিবেশ একটা গভীর সামাজিক আবহ হিসেবে বিশেষভাবে ছায়া ফেলতে শুরু করে। ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতার বদলে প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের কদর্যতা, নিষ্ফলতা ও নিরর্থকতা, এর ভয়াবহ বিকৃত পঙ্গুতার রূপ। যেজন্য তাঁর এসময়কার কবিতা সম্পর্কে বিষ্ণু দে পর্যন্ত মন্তব্য করতে বাধ্য হন: "সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে"। মূলত মধ্যবিত্ত জীবনের ও তার মানসিকতার মধ্যে তাঁর পৌনঃপুনিক আবর্তন এবং নৈরাশ্যবোধের আতিশয্য সমকালীন মার্কসবাদী মহলেও প্রশ্ন তোলে। এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা পেয়ে যাই, কবিতা তথা প্রগতি সাহিত্য প্রসঙ্গে সমর সেন ও সরোজ দত্তের সেই বিখ্যাত বিতর্ক। ১৯৩৮-এ নিখিল ভারত প্রগতিলেখক সম্মেলনে 'In defence of the decadents' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে সমর সেন বলেছিলেন—ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবক্ষয়ী অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরকম সাহিত্যিক অভিব্যক্তিই প্রগতির শক্তি হিসেবে কাজ করে। সরোজ দত্ত তাঁর সমালোচনায় সঠিকভাবেই দাবি করেছিলেন, ধনতান্ত্রিক অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনো অভিব্যক্তিই প্রগতির শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে না, বরং সজীব, আবেগপ্রবণ ও অনুভূতিপ্রবণ মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে। অবক্ষয়ের শুধুমাত্র উপলব্ধি নয়, বরং সেই উপলব্ধির ভিত্তিতে সমাজ-বদলের প্রয়োজনীয়তার অনুধাবনই প্রগতিসাহিত্যের প্রাথমিক শর্ত। পরবর্তী-কালে ('উড়ো খই': ৬. ১৯৭৮) সরোজ দত্তের এই বক্তব্যকে সমর সেন মূলতঃ ঠিক বলে মেনে নিলেও, একে তিনি সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি, এবং বলা যায়, তাঁর মার্কসবাদী ধ্যানধারণা ও প্রগতি লেখক আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকার সঙ্গে তাঁর অবসাদ ও নৈরাশ্যভরা কবি-মানসিকতার দ্বন্দ্বের ঠিকমতো সমাধান করতে পারেননি। কিন্তু এই বিতর্কের মধ্যেও ধরা পড়ে মধ্যবিত্ত জীবনের দ্বান্দ্বিকতা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতার কথা, কারণ মধ্যবিত্ত লেখকরা গণ-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন বলেই যে নিপীড়িত শ্রেণীগুলির আশা-ভরসা বা সংগ্রামী আত্মপ্রত্যয় তাঁদের লেখায় বিশেষ মেলে না, ওই বিতর্কে তিনি তা স্বীকার করেছেন। এমনকি তাঁর প্রথম বিতর্কিত প্রবন্ধটিতেও এই উপলব্ধির স্বীকৃতি মেলে: "Consciousness of decay is certainly a power. But a critical

situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough....We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity··· Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty... He who is bent on living in a little cell, will be dying with a little patience."

তাঁর কবিতার পরবর্তী ও শেষ পর্যায়ে ধরা পড়ে ওপরে উল্লেখিত এই দ্বন্দ্ব। এর আগে পর্যন্ত প্রবন্ধে ঐতিহাসিক আশাবাদের কথা ব্যক্ত হলেও কবিতায় প্রতিফলিত অপরিসীম হতাশা ও তিক্ততার তীব্র যন্ত্রণা ও আত্মবিদ্রূপের মানসিকতার সঙ্গে তার যে মৌলিক স্ববিরোধ ছিলো, তা কাটিয়ে ওঠার প্রচেষ্টায় এই পর্যায়ে ধরা পড়ে শ্রমিক কৃষকের সঙ্গে একাত্মতার সুর, সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনাবলী ছায়া ফেলে কবিতায়, কখনও বলিষ্ঠ আশাবাদে বলীয়ান হয়ে, কখনও বা বুদ্ধিদীপ্ত তীক্ষ্ণ ও তির্যক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিচ্ছুরণে। যদিও এ সময়কার কবিতার জন্যই তিনি 'সাম্যবাদী' কবি আখ্যা পেয়ে যান, তবু স্বীকার করতেই হবে, জীবনবোধের তীব্র আবেগ এই কবিতাগুলিতে প্রধানত প্রতিফলিত হয় নি, তাঁর সতেজ ও শাণিত কণ্ঠস্বর থেকে গেছে অনেকাংশেই অনুপস্থিত। ঠিক সেই সময়েই সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা জনমনে যে তীব্র ঝংকার তুলতে সমর্থ হয়েছিলো, তাঁদের থেকে কবি হিসেবে কোনো অংশে কম প্রতিভাবান না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কবিতায় সেই ঝংকার প্রায়শঃই ধরা পড়ে নি। তাঁর এ ব্যর্থতা নিঃসন্দেহে কবি নিজেও অনুভব করেছিলেন, এবং সেজন্যই এই পর্যায়েও মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় উঁকি দিয়েছে সংশয়বাদী হতাশা ও বিদ্রূপতীক্ষ্ণ রচনাশৈলী, এবং এই পর্যায়ের সর্বশেষ কবিতাগুলিতে শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতার সুরের বদলে অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়ে গেছে পারিপার্শ্বিককে ব্যঙ্গের আঘাত করার এবং হতাশার ধূসরতা দিয়ে আচ্ছন্ন করার প্রবণতা। তাঁর শেষ কাব্যগ্রন্থ সমালোচনা করতে গিয়ে মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় মূলত সঠিকভাবেই তাই মন্তব্য করেছিলেন যে, 'রাজনীতি'র 'ভাবলোক'-এর বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কবিকে ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার সমীকরণে সাহায্য করেনি। সম্ভবত সমর সেন নিজেও তা উপলব্ধি করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, এর পরে পরেই তিনি সারা জীবনের মতো কবিতা লেখা ছেড়ে দেন।

সমাজ-চেতনা ও ব্যক্তিগত কবি-মানসিকতার সমীকরণে প্রত্যাশিত সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ সমর সেন প্রায় একই ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁর মধ্যবিত্ত অবস্থানগত গণ্ডিবদ্ধতার উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার স্ব-বিবোধের সমাধান করতে। বস্তুত মধ্যবিত্ত জীবনের গণ্ডিবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বারবার উপলব্ধি ক'রেও এজন্য তিনি সর্বাত্মক প্রয়াস নিয়েছিলেন ব'লে কোনো প্রমাণ মেলে না। কেন নেননি, এই প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তাঁর বক্তব্যের মধ্যেই খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যায়। মনে হয়, স্বভাবজ সংশয়ে পার্টি সম্পর্কে তাঁর যথেষ্ট ভরসা ছিলো না। কারণ, পরবর্তীকালে ('উড়ো খৈ, ৬') তিনি নিজেই লিখেছেন: "গণআন্দোলনে যোগ দিয়েও অনেকে লেখক হিসেবে মহান হতে পারেন নি, পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণআন্দোলন নয়, লাইন বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে।" এ প্রসঙ্গে তিনি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখকের পার্টির সংস্পর্শে আসার পর মহান সাহিত্যসৃষ্টিতে ব্যর্থতা, সুভাষের 'মাও থেকে মেয়াও'-এ 'উত্তরণের', এবং "সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কোমুখী সি. পি. আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয়"-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারেও তিনি জানিয়েছেন: পার্টিতে তিনি "মেনে চলতে হবে ব'লে যোগ দিতে চাননি" ('নান্দীমুখ', জানুয়ারী: ১৯৮১, পৃ. ৫৮)। কিন্তু যে গভীর ও বিরল সততা নিয়ে তিনি নিজের আদর্শ ও কবিতার সমীকরণে ব্যর্থ হয়ে কবি-প্রতিষ্ঠার চূড়ায় পৌঁছেও হঠাৎ কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, সেই একই সততায় এ ব্যাপারটিও তাঁর মর্মপীড়ার কারণ হয়ে থেকেছে আজীবন। তাই শেষ জীবনেও তিনি তির্যক আত্ম-সমীক্ষা ক'রে বলেছেন: "কোনো সার্থক বিপ্লবী রাজনীতি দেশে থাকলে অনেক ব্যক্তিগত দুর্বলতা এমনকি মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরাও কাটিয়ে উঠতে পারতেন বিবেকদংশনে। সেটা যখন নেই, তখন দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন তুলে চুপ ক'রে যাওয়া ভালো।"

তাহলে বাকি থাকছে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এদেশে বিরাজমান জীবিকাগত কাজ ও মূল্যবোধের দ্বন্দ্বটি। জীবনের শেষ দশকটি বাদে এই দ্বন্দ্বটির সমাধান যে সমর সেন করতে পারেননি, তা নিয়ে সম্ভবত যে-কোনো আলোচনাই বাহুল্য হবে। কারণ, যারা জীবিকা ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের সমীকরণে ব্যর্থ হয়ে 'না-ঘরের-না-বাইরের' হয়ে থেকে যান, তাঁদের সংখ্যা নিঃসন্দেহে কম। আর যাঁরা এই সমীকরণে ব্যর্থ হয়ে মূল্যবোধকে বিসর্জন না দিতে গিয়ে জীবিকার অনায়াস-সাধ্য রঙীন হাতছানিকেই হেলায় অস্বীকার করবার দুঃসাহস দেখাতে পারেন, তাঁরা বিতর্কাতীতভাবেই এক বিরল প্রজাতির লোক। সমর সেন এই বিরল প্রজাতির সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত।

অধ্যাপনার কাজ, অল ইণ্ডিয়া রেডিও'র সাংবাদিকের কাজ, বিজ্ঞাপনের কাজ —এর কোনোটাতেই সমর সেন উপরোক্ত সমীকরণ ঘটাতে পারেননি, তাই বার-বার জীবিকা বদল করেছেন। রাশিয়ায় গিয়ে অনুবাদকের কাজে পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেননি। কিন্তু স্তালিনোত্তর রাশিয়ায় কুৎসিত নিঃস্তালিনীকরণ অভিযান-বহু-বিজ্ঞাপিত সমাজতান্ত্রিক 'নতুন মানুষ'-এর অদর্শন, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের অনুপস্থিতিতে কর্তাভজা ও অরাজনৈতিক প্রবণতা, ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-প্রতিষ্ঠা ও স্থূল বুর্জোয়া সংস্কৃতি সম্পর্কে যুক্তিহীন উচ্ছ্বাস ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর বিরাগের কথা তিনি নিজেই লিখেছেন ('বাবু বৃত্তান্ত' : পৃ. ৬২). এবং আরো অনেক আপত্তিকর বিষয় সম্পর্কে লেখেনইনি। তাই জীবিকা ও মূল্যবোধের সমীকরণ সেখানেও তাঁর পক্ষে ঘটানো সম্ভব হয়নি। তারপর দেশে ফিরে আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠির অধুনালুপ্ত 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় যুগ্ম-সম্পাদকের পদেও টিকে থাকতে পারেন নি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সম্পর্কে অর্ধ-সত্য ও মনগড়া কাহিনী ফেঁদে মুনাফা বাড়াবার কুৎসিত অনৈতিকতার কারণে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, সম্পূর্ণ নীতিগত কারণে বৃহৎ সংবাদপত্রের আত্মপ্রতিষ্ঠামূলক পদ হেলায় ছেড়ে দেবার এমন আর কোনো নজির আমাদের দেশে আছে কিনা, বর্তমান প্রবন্ধ-লেখকের অন্তত তা জানা নেই।

এর পরেই এসে পড়ছে সমর সেনের জীবনের শেষ দু'টি দশকের কাহিনী। যুক্তিযুক্ত কারণেই তাঁর জীবনের এই শেষ অধ্যায়টি বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে।

৩

সমাজ-চেতনার সঙ্গে কবি-ব্যক্তিত্বের স্ব-বিবোধের পরিণতিতে সমর সেন কবিতা লেখাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, কেননা সমাজ-চেতনার মৌলিক ভিত্তিভূমি তিনি কখনও পরিত্যাগ করেননি। নিজের মধ্যবিত্ত শ্রেণী-অবস্থানগত গণ্ডিবদ্ধতাকে ভাঙতে না পারার দরুণ তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেননি বটে, কিন্তু নিজের অবস্থানকে গোঁজামিল দিয়ে যুক্তিযুক্ত ব'লে প্রতিষ্ঠিত করার মতো অসততাও তিনি দেখাননি। জীবিকা ও সমাজ-চেতনাসঞ্জাত মূল্যবোধের দ্বন্দ্বে তিনি বারবার জীবিকাকেই বিসর্জন দিয়েছেন, মূল্যবোধকে নয়। অর্থাৎ, এককথায়, সমাজ-চেতনাই ছিলো তাঁর ভাবাদর্শগত মুখ্য বিষয়, তাঁর মৌলিক অবস্থান-বিন্দু। এর ভিত্তিতে জীবনের প্রথম পাঁচটি দশক ধরে তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনাগত বিভিন্ন স্ব-বিরোধের মীমাংসা করতে না পারলেও, জীবনের শেষ দু'টি দশকে তিনি যেন একটি সমাধান-সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন, বা পাবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন। এ সময় তাঁর ভূমিকা, এবং জীবিকাও, ছিলো পত্রিকা-সম্পাদকের। বলা যায়, তাঁর

সত্তর বছরের জীবনে এই ভূমিকাটিতে তিনি সবচেয়ে বেশি মহৎ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। তাই, যে যা-ই বলুন, সম্পাদক সমর সেন কবি বা অন্য যে কোনো সমর সেনের তুলনায় আমাদের কাছে, সামাজিক দায়বদ্ধতার শপথে আস্থাশীল যে কোনো বিবেকবান মানুষের কাছে, অনেক বেশি শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন।

১৯৬৪-র ৯ই অক্টোবর তাঁর সম্পাদনায় 'নাউ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে জানানো হয়েছিলো, সমাজ-সচেতন স্বাধীন বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করার দায়িত্ব বৃহৎ সংবাদপত্রগুলি পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে ব'লেই এই পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। বলা হয়েছিলো, এই পত্রিকা কোনো পার্টি বা মতান্ধতার অনুসারী হবে না, বরং এই পত্রিকা দায়বদ্ধ থাকবে নির্দিষ্ট কয়েকটি নীতির প্রতি, কথা ও কাজের ফারাককে উদ্ঘাটিত করাটা এই পত্রিকার অন্যতম কর্তব্য হবে। এবং ঘোষণা করা হয়েছিলো, ধীরে ধীরে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠবে এই পত্রিকার নিজস্ব চরিত্র। প্রথম সংখ্যা থেকে ১৯৬৮-র জানুয়ারি পর্যন্ত সমর সেনের সম্পাদিত এই পত্রিকাটির পাঠকরা তৎকালীন পরিস্থিতিতে 'প্রথম সম্পাদকীয়'র ঘোষণাকে কার্যকরী করাটা যে কী প্রচণ্ড কঠিন ছিলো, তা খুব গভীরভাবেই জানেন। ভারতের চীন-যুদ্ধ-পরবর্তী কুৎসিততম উগ্র জাতীয়তাবাদের পটভূমিকায় এবং রুশ-চীন মতাদর্শগত বিরোধ তথা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধা-বিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে 'নাউ' দক্ষতার সঙ্গে সে সময়ে বামপন্থী মহলে বিরাজমান গভীর সংশয় ও মননশীলতার শূন্যতাকে দূর করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলো। ফলত দ্রুত 'নাউ' জনপ্রিয়তা ও অভিনন্দন অর্জনে সক্ষম হলেও, জীবিকার সঙ্গে মতাদর্শের স্ব-বিরোধ 'নাউ' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে ঘনিয়ে এসেছিলো ১৯৬৭-র শেষের দিকে। 'নাউ'-এর মালিকগোষ্ঠীর প্রধান প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের নির্দেশমতো পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিবর্তিত করতে অস্বীকার করলেন সমর সেন, এবং এর পরিণতিতে মালিকের বেআইনী নির্দেশে তাঁকে সম্পাদকের পদ ছাড়তে হলো।

কিন্তু এবারের জীবিকা-বদলের সঙ্গে আগের বিভিন্ন জীবিকা-বদলের বিস্তর পার্থক্য ছিলো। কেননা, এতোদিনে সমর সেন নিজের কর্মক্ষেত্রের ভিত্তিভূমি খুঁজে পেয়েছেন, তার ওপর 'নাউ'-এর অধিকাংশ লেখক ও পাঠকগোষ্ঠী স্বাভাবিক কারণেই সমর সেনের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। ফলত, 'নাউ'-এর অচিরেই অপমৃত্যু ঘটলো, আর ১৯৬৮-র ১৪ই এপ্রিল সমর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হলো নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'ফ্রন্টিয়ার'। উল্লেখ্য যে, এই নতুন পত্রিকার মালিকানা থাকলো সমর সেন এবং তাঁর কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের হাতেই। মালিকের রক্তচক্ষু প্রদর্শনের আশংকা এভাবে দূর

হলেও, পত্রিকার সমস্ত আর্থিক সমস্যা এবার সমর সেন প্রমুখদের ঘাড়েই এসে পড়লো, এবং স্বাভাবিকভাবেই সম্পাদক হিসেবে সমর সেনের মাইনে 'নাউ'-এর তুলনায় প্রায় অর্ধেক হয়ে গেলো। এতোরকমভাবে সমস্যা বেড়ে গেলেও, এই 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদক হিসেবেই সমর সেন সক্ষম হলেন শেষ পর্যন্ত জীবিকা ও মতাদর্শের স্ব-বিরোধের মীমাংসা করতে। ফলত, বুদ্ধিদীপ্ত, সদা-প্রশ্নাতুর, বলিষ্ঠ আশাবাদে দৃপ্ত, প্রখরমনা এই মানুষটি এবার প্রকৃত অর্থেই খুঁজে পেলেন জগৎ ও জীবন সম্পর্কে, সমকালীন বাস্তব ঘটনাবলী সম্পর্কে, তাঁর অতীব জাগ্রত দৃষ্টি ও তীব্র বিচারশীল যুক্তিবোধের উৎসমুখ অবাধে উন্মোচিত করার পথ। তাঁর জীবনের শেষ দু'টি দশকের সেই উজ্জ্বলতম অধ্যায় মূলত এই পত্রিকাকে ঘিরেই রচিত হয়েছে।

অবশ্য সে-সময়কার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। ১৯৬৪-তে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হবার পরে সি পি আই (এম)-কে ঘিরে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ সমাজ-পরিবর্তনের যে স্বপ্ন দেখেছিলো, ১৯৬৭ ও ১৯৬৯-এর যুক্তফ্রন্ট সরকারের অভিজ্ঞতার আলোকে সেই স্বপ্ন ততোদিন থিতিয়ে গেছে। অন্যদিকে, ১৯৬৭-তে নকশালবাড়ির কৃষক সংগ্রাম জন্ম দিয়েছে নতুন এক গণজাগরণের জোয়ারের। সমর সেনের নিজের ভাষায় বলা যায়, "এই অভ্যুত্থান ছিলো এমনই যে নকশালবাড়ির পরে কোনো কিছুই আর আগের মতো রইলো না। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক—এই ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্র সম্পর্কেই মানুষকে নিজের অবস্থান পুনর্বিন্যস্ত ক'রে নিতে হয়েছিলো" ('Naxalbari and After' : প্রথম খণ্ডের ভূমিকা)। তাঁর মনে হয়েছিলো, "নকশালবাড়ি অনেক অনেক অতিকথার স্বরূপ উদঘাটন ক'রে দিয়ে ভারতে বৈপ্লবিক বামপন্থার সাহসিকতা ও চরিত্রগুণের ওপর (মানুষের) আস্থাকে পুনঃস্থাপিত করেছিলো। মনে হয়েছিলো, তেলেঙ্গানার পর থেকে কথা ও কাজের মধ্যকার ক্রমবর্ধমান ফারাক যেন এবার কমে আসবে।" এই দ্বিধা-থরথর মুহূর্তটিকে ধরে রাখার ও পাঠকদের সামনে তুলে ধরার ব্যাপারে 'ফ্রন্টিয়ার' ও তার সম্পাদক সমর সেন নিয়েছিলেন এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা।

পরবর্তীকালে নকশালবাড়ি আন্দোলন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার পর একদিকে যেমন বিপ্লবীদের ওপরে নেমে এসেছে প্রচণ্ডতম ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সন্ত্রাস, অন্যদিকে তেমনি নানাবিধ গুরুতর বিচ্যুতির ফলে আন্দোলনও হয়েছে দিক্‌ভ্রান্ত। এই প্রেক্ষিতে 'ফ্রন্টিয়ার' যেমন সাধ্যমতো, অসমসাহসিকতার সঙ্গে সোচ্চার হয়েছে বিপ্লবীদের হত্যা, দমন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে, ঠিক তেমনি আন্দোলনের বিচ্যুতিগুলির সমালোচনাও করেছে নির্দ্বিধায়—এবং সেজন্য সমর সেনকে সি পি আই (এম-এল) নেতা সরোজ দত্তের 'শশাংক'-এর কলমে তীব্র-

ভাবে আক্রান্তও হতে হয়েছে। কিন্তু কোনো কিছুই 'ফ্রন্টিয়ার'-কে তার নিজস্ব পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি।

এছাড়া, এর পরবর্তীকালে 'বাংলাদেশ' যুদ্ধ, সিংহলে যুব-অভ্যুত্থান, ইন্দিরা গান্ধী তথা সিদ্ধার্থ রায় মন্ত্রীসভার ফ্যাসিস্ট-সন্ত্রাস তথা গণতন্ত্র হত্যা, রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন, মাও-নেতৃত্বাধীন সমাজতান্ত্রিক চীন ও মাও-উত্তর চীনের ধারাবাহিক পরিবর্তন, কাম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামী ও আফগানিস্তানে রুশ আগ্রাসন প্রভৃতি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতেই 'ফ্রন্টিয়ার' গতানুগতিক স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহসিকতা দেখিয়েছে, এবং স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও সমাজ-চেতনার মুক্তমঞ্চ হিসেবে গড়ে উঠেছে। এমনকি, এই সময়কাল জুড়ে সি পি আই (এম-এল)-এর মধ্যকার বিভিন্ন রণনীতি ও রণকৌশলগত বিতর্কের আইনানুগ প্রকাশ-মাধ্যমও ছিলো এই 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকাই। এ সবকিছুই প্রাতিষ্ঠানিক মুনাফাভিত্তিক ও দলীয় সংকীর্ণতাভিত্তিক সাংবাদিকতার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক সাহসী সাংবাদিকতার ধারার জনক হিসেবে সমর সেনকে তুলে ধরেছে।

জীবনের শেষ কয়েকটি বছর 'ফ্রন্টিয়ার'-সম্পাদক হিসেবে সমর সেন তেমন সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারেননি। এর পেছনে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও দেশে বিপ্লবী কমিউনিস্টদের অন্তর্বিরোধ এবং নকশালবাড়ি আন্দোলনকে ঐক্য-বদ্ধভাবে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যাপারে ব্যর্থতা, মাও-উত্তর চীনের সমাজতন্ত্রের পথ থেকে পশ্চাদপসরণ, ভিয়েতনামের মুক্তি-পরবর্তী আগ্রাসী ভূমিকা, চীন-ভিয়েতনাম বিরোধ প্রভৃতি কারণজনিত মানসিক অস্থিরতা কাজ করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, সমাজ বদলের প্রয়োজনীয়তা তথা অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে তিনি আস্থা হারাননি। এতো সংশয়বহুল ঘটনাবলী এবং আত্মপ্রতিষ্ঠার তাড়নায় 'নাউ'-'ফ্রন্টিয়ার'-এর অনেক ঘনিষ্ঠ স্বজনের একে একে নিরাপদ দূরত্বে সরে যাওয়ার মর্মপীড়াদায়ক ঘটনাও তাঁর আশাবাদকে নিভিয়ে দিতে পারেনি।

৪

জন্মলগ্ন থেকে সমাজ-বদলের প্রশ্নটির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ-বিচার-যাচাই-বিতর্কের বহুমাত্রিক প্রক্রিয়ায় 'ফ্রন্টিয়ার'কে নিয়োজিত রাখতে গিয়ে সমর সেন বিপ্লবী না হয়েও সুখী জীবনের হাতছানিকে উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। বিপ্লব বা প্রগতি-শীলতাকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা বা লাভজনক আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের হাতিয়ার করে তোলেননি। এ কারণেই স্থিতাবস্থা-বিরোধী আদর্শভিত্তিক সাংবাদিকতার জগতে তিনি হতে পেরেছিলেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, বিরল মর্যাদা ও স্বাভাবিক নেতৃত্বের অধিকারী। সার্থক বিপ্লবী রাজনীতির অনুপস্থিতিতে, ব্যক্তিগত দুর্বলতা নিজেদের বিবেকদংশনে কাটিয়ে উঠবার সুযোগ না-পাওয়া বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে দ্বিধাগ্রস্ত

প্রশ্ন তুলে চুপ ক'রে যাওয়াই ভালো ব'লে মন্তব্য করলেও, জীবনের শেষ দু'টি দশক জুড়ে তিনি কিন্তু তাঁর এই মন্তব্যের বিরোধিতাই করে গেছেন নির্দ্বিধায়। সমাজ চেতনার সঙ্গে সাহিত্যকর্ম, শ্রেণীগত অবস্থান ও জীবিকার সতত স্ব-বিরোধে প্রায়শঃ-তাড়িত বাঙালী বুদ্ধিজীবীমহলে তাই তিনি একই সঙ্গে একান্ত অনুসরণীয় মডেল, এবং বিরল ব্যতিক্রম। সমাজ-চেতনা ও ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গভীরতম সততা একজন মানুষকে কী উজ্জ্বল ও মহৎ করে তুলতে পারে, সাম্প্রতিককালে সমর সেন তার বিরলতম দৃষ্টান্ত।

এই অর্থে, ভেবে দেখা দরকার, তিনিই কি ছিলেন বাঙালী বুদ্ধিজীবীমহলে শেষ পদাতিক—যিনি অশ্বারূঢ় হবার সমস্তরকম সুযোগ-সুবিধে থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সেই পদাতিকই রয়ে গেলেন ?

হিরন্ময় ধর

সম্পাদক সমর সেন

[শুরুতেই কয়েকটা কথা বলে রাখা প্রয়োজন। লেখাটি স্মৃতিচারণমূলক। ফ্রন্টিয়ারের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগুলি হাতের কাছে নেই। লক্ষ্ণৌ অনেক দূর। পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগও অনুপস্থিত। ফলে সম্পূর্ণভাবে স্মৃতির উপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। লেখার মধ্যে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া তাই অসম্ভব নয়। — লেখক]

সম্পাদক সমর সেনের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলেই 'নাউ' আর 'ফ্রন্টিয়ারে'র কথা আসে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে-সঙ্গে আসে নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বিভিন্ন নকশালপন্থী দলের প্রসঙ্গ। এ দুটি এক ও অবিচ্ছিন্ন—এইরকম একটা দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণের মধ্যে দেখা যায়। বলতে কুণ্ঠা নেই, আমারও তাই ছিল। কিন্তু লিখতে বসে এই ধারণার সঙ্কীর্ণতা আমার কাছে ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সমর সেনের 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সঙ্গে নকশালবাড়ি আন্দোলনের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে অনেক গভীর ও নিকটের। হয়ত-বা এও বলা যায়, সম্পাদক হিসেবে সমর সেনের কিংবা পত্রিকা হিসেবে 'নাউ' বা 'ফ্রন্টিয়ার'-এর বিশিষ্টতার সহজ প্রকাশ সম্ভব হয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন এবং তার পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্য দিয়েই। কিন্তু এর থেকে এমন সিদ্ধান্তে আসা ঠিক হবে না যে এছাড়া কাগজ দুটোর স্বতন্ত্র কোন সত্তাই ছিল না। 'বাবু বৃত্তান্তে'র সমর সেন ও তাঁর 'নাউ' 'ফ্রন্টিয়ার'-এর এই ধরনের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ শুধু নয় অনৈতিহাসিকও বটে। এটাই আমাদের বর্তমান প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য, আলোচনা মোটামুটিভাবে চলবে এই সূত্র ধরেই।

'বাবু বৃত্তান্তে'র লেখক সমর সেন সচেতন ব্যক্তি ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, আশা ও নিরাশা তাঁকে সবসময়ে নাড়া দিয়েছে। বাঁচার তাগিদে তিনি চাকরি করেছেন, কখনও সাংবাদিকতার, কখনও শিক্ষকতার, কখনও-বা বিজ্ঞাপন অফিসে। কিন্তু এক গভীর মূল্যবোধ ও নীতিনিষ্ঠা সবসময়ে তাঁকে অস্থির রেখেছে। অত্যন্ত কম কথার মানুষ ছিলেন সমর সেন। অন্ততঃ 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে তাঁকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এইভাবেই আমি দেখেছি। প্রুফ দেখতেই সারাদিন ব্যস্ত দেখতাম। তবে তারই ফাঁকে ফাঁকে ছিন্ন বিক্ষিপ্ত মন্তব্যে তাঁর মনের পরিচয় পেয়েছি। প্রসঙ্গটা মনে নেই, সময়টা বোধহয় ১৯৭১-এর গ্রীষ্মকাল। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর তখন আর্থিক দুর্দশার দিন। বিজ্ঞাপন অপ্রতুল ছিল চিরকালই, তখন নামমাত্রে পর্যবসিত। পরিস্থিতির সামাল দিতে সমরবাবু নিজের মাসোহারার হার কমিয়েছেন। পশ্চিম ভারতের একটি নামী দৈনিক থেকে তাঁকে এই সময়ে নিয়মিত লেখার জন্য বলা হয়। টাকার অঙ্ক লোভনীয়। সকালে 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে পৌঁছালে উনি আমাকে খবরটা জানালেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানালেন যে

উনি 'না' বলে দিয়েছেন। ইতস্তত করে ব্যাপারটা পরিস্থিতি অনুযায়ী ভেবে দেখার অনুরোধ করলে উনি বললেন, কিছু-কিছু ব্যাপারে প্রথম চোটে 'না' বলতে না পারলে পরে আর না বলা যায় না। উনি জীবনে, অনেকবারই এইরকম 'না' বলেছেন। 'বাবু বৃত্তান্তে'র পাতায় তার অসংখ্য উদাহরণ আছে। 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও'-তে কাজ করার সময় মুখে-মুখে জবাব দেওয়া ও লেখার জন্য তাঁকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন যুদ্ধ-বিষয়ক সংবাদ বিভাগে বদলি করে দেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালে কলকাতার একটি দৈনিক পত্রিকা ঠিক এইভাবেই উনি ছাড়েন, মতের মিল না হওয়াতে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংবাদ পরিবেশন নিয়ে মতানৈক্য ঘটে সেখানে। তাঁর মতামত উপেক্ষা করে মালিকেরা দাঙ্গার খবর ছাপালে তিনি কাজে ইস্তফা দেন। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা 'নাউ'-এর সম্পাদকের পদ থেকে তাঁর ইস্তফা। 'বাবু বৃত্তান্তে' এর বিশদ বিবরণ আছে।

সমর সেনের এই 'না' বলা মেজাজের পরিচয় 'নাউ' আর 'ফ্রন্টিয়ার'-এ পাওয়া যায়। স্বভাবতই, 'নাউ' বা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ তার প্রকাশ ভিন্ন। 'বাবু বৃত্তান্তে' 'নাউ'-এর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমরবাবু জানিয়েছেন, প্রাথমিক পর্যায়ে 'নাউ'-এর কোন চরিত্র 'দানা' বাঁধেনি। পরে লেখকগোষ্ঠীর ('নাউ'-এর) প্রভাবে, বিশেষ করে অশোক মিত্রের (এককালীন অর্থমন্ত্রী) প্রভাবে, 'নাউ' বামঘেঁষা হয়ে পড়ে। আমার ধারণা সমর সেনের এই উক্তি সম্পাদক সমর সেনের চরিত্রের এবং তাঁর কর্মপদ্ধতির একটি বিশেষত্বের দিকে ইঙ্গিত করে। সরকার বা মালিকের চাপের বিরুদ্ধে তিনি 'না' বলতে দ্বিধা করেননি। কিন্তু সহকর্মীদের প্রতি, বিশেষ করে সাংবাদিক সহকর্মীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল উদার। অন্যের লেখা তিনি সাধারণতঃ খুব কমই পরিবর্তন করতেন। ভাব কখনও নয়, ভাষা কদাচিৎ। আমার সামনে আমার লেখা কখনও ঠিক করেননি। বলতেন, 'কারও সামনে তার লেখা 'এডিট' করা তার শ্রমের অবমাননা।' অনেক বিরোধী বক্তব্য তিনি ছাপিয়েছেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ তার অনেক নমুনা আছে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর 'সি.পি. এম.'-বিরোধী পর্যায়ে অনেক সি.পি.এম.-পন্থী লোক 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখতেন। সম্পাদকীয়ও লিখেছেন কেউ কেউ। এঁরা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লেখা ছেড়েছেন স্ব-ইচ্ছায়। অন্য লেখক এসেছেন, সমরবাবু বাধা দেননি। এই দিক থেকে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর লেখকগোষ্ঠীর একটা স্বাধীন এবং চলমান 'চরিত্র' ছিল। অন্যদিকে সমর সেনের কিছু কিছু ব্যাপারে এই 'না' বলার ক্ষমতা অজ্ঞাতসারে 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'কে আর তাদের লেখকগোষ্ঠীকে একটা বিশেষ চেহারা দিয়েছিল। 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে বা সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউ-এর কফি হাউসের আড্ডায় তিনি নিজের মত বড় একটা প্রকাশ করতেন না। তবে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সংখ্যায় তাঁর মত তাঁর নিজস্ব চরিত্রে উপস্থিত থাকত। এর অনেক উদাহরণ আছে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ। এই প্রসঙ্গে

সবচেয়ে বেশি করে যে সম্পাদকীয়র কথা মনে পড়ে সেটা হচ্ছে ২২শে মার্চ ১৯৬৯-এ লেখা সম্পাদকীয়, "শিকারী কুকুরের সঙ্গে শিকার" (Hunting with the Hound)। ঐ বছর শুক্রবার ১৪ই মার্চ যুক্তফ্রণ্টের মন্ত্রীর প্রবোচনায় কলেজ-স্ট্রিটের হিন্দু হোস্টেলে যে নকশাল নির্যাতন অভিযান চালান হয় তার প্রতিবাদ এই সম্পাদকীয়তে ছিল। এর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। এই সংখ্যার পর সি.পি.এম. নেতারা তাদের সমর্থকদের 'ফ্রন্টিয়ার' পড়তে নিষেধ করেন বলে শুনেছি। অপরটি ১৮ই এপ্রিল ১৯৭০-এ লেখা সম্পাদকীয়, 'লেনিনের মুক্তি চাই' (Liberate Lenin) এই নামে। লেনিনের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে লেখা এই সম্পাদকীয় কমুনিস্টদের নিজেদের মধ্যকার খেয়োখেয়ি ও তার কুফলের উপর সমর সেনের নিজস্ব মেজাজে এক তীব্র আক্রমণ।

'ফ্রন্টিয়ার'-এর চরিত্র কি? এই প্রশ্নের জবাব সমর সেন সহজে দেননি। প্রাথমিক পর্যায়ে তো নয়ই। খুব সম্ভবতঃ (ঠিক মনে নেই) 'ফ্রন্টিয়ার'-এর প্রথম সংখ্যায় চারণ গুপ্ত তাঁর 'কলকাতার কড়চায়' (Calcutta Diary) লিখেছিলেন, 'নাউ' এবং 'ফ্রন্টিয়ার'-এর তফাত নামমাত্র। এক লেখকগোষ্ঠী। এক ধরনের লেখা. এক সম্পাদক, শুধু নাম ভিন্ন। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর এই চরিত্রায়ণ অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়। 'ফ্রন্টিয়ার' অনেকেই অপছন্দ করতেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের মার্ক্সবাদীরাও ছিলেন। কখনও ব্যঙ্গে কখনও বা সরাসরি কটূক্তিতে তা প্রকাশ পেত। কানে আসত অনেক কিছু। কেউ-কেউ বলতেন, "'ফ্রন্টিয়ার' সাহেবদের কাছে একটি আন্তর্জাতিক পত্রিকা যদিও ভারতবাসীর কাছে জাতীয়তা বিরোধী।" (To the Europeans Frontier is an international journal, for us, Indians it is anti-national)। এও শুনতাম, 'ফ্রন্টিয়ার'-এ পড়ার যোগ্য হচ্ছে পেছনের চিঠিপত্রের কয়েকটা পাতা। অবশ্যই 'চিঠিপত্র' 'ফ্রন্টিয়ার'-এর আকর্ষণীয় স্তম্ভগুলির মধ্যে একটি ছিল। যদিও নিন্দুকেরা বলতেন অন্যভাবে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর একদা শুভানুধ্যায়ী একজন বলেছিলেন (বোধহয় ১৯৭৩-এর কোন এক সময়ে, বম্বেতে), 'ফ্রন্টিয়ার' বেঁচে আছে শুধুমাত্র সমর সেনের অহমিকায়। সব-চেয়ে উল্লেখযোগ্য আক্রমণ হয় দেশব্রতীর সম্পাদকীয় স্তম্ভে। এইসব সমালোচনা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ "সংবাদপত্র থেকে উদ্ধৃতি"-স্তম্ভে অথবা চিঠিপত্রের আকারে ছাপান হত।

ফ্রন্টিয়ার গোষ্ঠীর অনেকে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর 'বিরোধী' ভূমিকাকে বড় করে তুলে ধরেছেন। কলেজস্ট্রিটের কফি হাউসে কোনো এক রবিবার সকালের আড্ডায়, যেখানে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে উপস্থিত থাকতেন, পরেশ চট্টো-পাধ্যায় এক প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, "কতকগুলি 'বিরোধী' বক্তব্য দিয়ে 'ফ্রন্টিয়ার'কে বর্ণনা করা যায়, যেমন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, শোধনবাদ বিরোধী,

রাষ্ট্র বিরোধী, সামন্ততন্ত্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাবাদ বিরোধী ইত্যাদি"। এক-দিক থেকে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর এই চরিত্রায়ণ সঠিক, কিন্তু বোধহয় সম্পূর্ণ নয়। সমর বাবুর নিজের লেখা—"Naxalbari and after, a Frontier Anthology" নামক সংকলনের প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর চরিত্র সম্বন্ধে ঠিক এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। লিখেছেন, 'নকশালবাড়ির পর আর কোন কিছুই এক থাকেনি। প্রত্যেক মানুষকে সমাজের সর্বস্তর অর্থাৎ তার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, সাংস্কৃতিক—জগতের সঙ্গে নিজের নিজেব সম্পর্ককে একবার নতুন করে স্থাপন করে নিতে হল। 'ফ্রন্টিয়াব'-এও এই নতুন ধারা প্রতিফলিত হয়েছে। '...যদিও অংশগ্রহণ করেনি, তথাপি 'ফ্রন্টিয়ার' এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছিল।'

সরেজমিন তদন্ত কবে লেখা, আন্দোলনের খবর লেখা, প্রাতিষ্ঠানিক বাজারি সংবাদপত্র-পত্রিকাকে আক্রমণ করে লেখার ধারা আমাদের দেশের সাংবাদিকতার ইতিহাসে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। মনে পড়ে 'জনযুদ্ধে' লেখা কাইয়ুব কমরেডদের উপবে পি. সি. যোশীব লেখা। 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের উপর ননী ভৌমিকের রিপোর্ট। সোমনাথ হোড়ও সে সময় গিয়েছিলেন ছবি আঁকার রসদ সংগ্রহের জন্য। তারও ফল আমবা পেয়েছি তে-ভাগার ডায়েরিতে। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পাতায় রসিদ আলী দিবসেব প্রেক্ষিতে সোমনাথ লাহিড়ীর সম্পাদকীয় ভুলবার কথা নয়। যেমন ভোলা যাবে না বিহারে ১৯৩০ ও ৪০-এ বাটাইদার আন্দোলনের উপর স্বামী সহজানন্দের লেখা পাটনা থেকে প্রকাশিত 'হুনকার' অথবা বম্বে থেকে প্রকাশিত 'কিষাণ' বুলেটিন-এ ছাপানো রিপোর্টগুলি।

কিন্তু এ সমস্তই দলের চেষ্টায়, সংগঠনেব প্রয়াসে। 'নাউ' বা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ সমর সেন সে-ভাবে কোন দলের সঙ্গে নিজেকে জড়াননি। তাঁর চেষ্টা একক। অথচ সেই একলা চলার মেজাজের জন্য কাছে এসেছেন অনেকে। সমর সেন বলেছেন যে সার্বিকভাবে না হলেও 'ফ্রন্টিয়ার' নকশালবাড়ি আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। কীভাবে? স্পষ্ট করে বলা যেতে পারে 'মেজাজে'। আবার অনেক সময় যুক্তও হয়নি। কীভাবে? তাতেও বলা যেতে পারে 'মেজাজে'। এবং রাজনৈতিক সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সমরবাবুর দানও বোধহয় এই বিশেষ মেজাজেরই তৈরী।

'বাবু বৃত্তান্তে'র সমর সেন মেজাজী। বঙ্কিম বর্ণিত বাবুর সঙ্গে তাঁর তফাত অনেক। তির্যক রসসিক্ত, অনমনীয়, বোধহয় তিনি কমলাকান্তের অকৃত্রিম সুহৃদ হতে পারতেন। কিন্তু কমলাকান্তের সঙ্গে ফারাক তাঁর এক জায়গায়। নিজেকে লুকোবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। নির্ভীক আত্মকথায় পুলকিত করার ইচ্ছা তাঁর ছিল না।

তিনি মনে করতেন, "ব্যক্তিগত জীবনের ঘটনা-বিশেষ বাদ দিলে দেশ বা দশের কী ক্ষতি?" লিখেছেন "উড়ো খৈ"। ভারতচন্দ্রকে তিনি যেভাবে মধ্যবিত্তের জীবনের চর্চার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তাতে একক সমর সেনকে 'ডায়োজিনাস' ভাবলে হয়ত ভুল হবে না। এদেশে এরকম অনেক 'ডায়োজিনাস' (আলেকজাণ্ডারের সামনে অবশ্য তাঁরা হাত জোড় করেন সবসময়ে) পাওয়া যায়, যাঁরা মধ্যবিত্তের সীমা নিয়ে হা-হুতাশ করেন আর মাথার চুল ছেঁড়েন। সমর সেনকে এই দলে ফেলা যায় না। নকশালবাড়ি আন্দোলন ও তৎকালীন আবহাওয়া তাঁকে তা হতে দেয়নি। তাঁর তির্যকতা, তাঁর গুটিয়ে থাকা আর না বলার ক্ষমতা, তাঁর নিজস্বতা, তাঁর সব কিছুকে যাচাই করা আর সব বিষয়েই শেষ কথা না বলার ইচ্ছা তাঁকে রূপান্তরিত করেছিল 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদকে। 'সীমানা' কথাটা শেষ পর্যন্ত প্রতীক হয়েছিল। এই 'সীমানা' কখনো শেষ হয়নি, পায়ে পায়ে সরে গেছে, সীমানার ওপারে কি তা সবসময় জানাও যায়নি। স্পষ্ট করে এক বিখ্যাত সম্পাদকীয়তে সমরবাবু স্বীকার করেছিলেন যে পরিস্থিতি বড় জটিল, নানা দ্বন্দ্বের খেলা চলছে, ছবি পরিষ্কার নয় এবং "পত্রিকাতেও সেই জটিলতা জনিত জট" ধরা পড়ছে। ('Shoot to Kill', Naxalbari and after, Vol I, p. 30) আর এই জটকে, জটিলতাকে কয়েকভাবে তিনি হাজির করেছিলেন। সবচেয়ে বড় জিনিস, হচ্ছে, এই জটিলতাকে স্বীকার করা, বৈপরীত্যকে তুলে ধরা।

আসলে ৭০-এর আগে পার্টি-কাগজ সমেত বাজারি কাগজগুলো যে-ছবি দিত তাতে নানা ভেদাভেদ থাকলেও তা বড়ই এক মাপে, এক আয়তনে বাঁধা। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কথাই ধরা যাক। বাজারি কাগজগুলো থেকে কী খবর পেয়েছিলাম? নানা খবর, মুখরোচক, কিন্তু বিভ্রান্তিকর। হয় কিছু লোক পাগল হয়েছে, তা না হলে কিছু লোককে চক্রান্ত করে সরান হচ্ছে। ঠিক ঐ সময়ে 'মনিটরের' কলমে যে জাতীয় খবর বেরোত, যে বিশ্লেষণ থাকত, তা সঠিক কি বেঠিক জানি না, কিন্তু তা বাজারি ঐকতানের তাল কেটে দিচ্ছিল। বেতালা ঐ বাজনাই তখন কী সুখকর বলে মনে হয়েছিল! অন্য ব্যাখ্যা যে সম্ভব, অন্য কোনভাবে যে সর্বহারার মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে দেখা যায়, তা আমরা সেদিন ভাবতে শিখলাম। চারপাশে যা শুনছিলাম তার বাইরে দম নিতে পারলাম। ভারতের বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় সমরবাবুর সম্পাদকীয় ত আরো মারাত্মক। এশিয়ার মুক্তিসূর্যের সঙ্গে সরকারী মার্কসিস্টরা তখন এককাট্টা। পশ্চিমবঙ্গের সি. পি. আই. (এম. এল.)-এও সবচেয়ে বড় ভাঙন এসেছে এই নিয়ে, ন্যাকা বাঙ্গালী-জাতীয়তাবাদের বন্যা চলছে। ঐ সময় মুক্তিবাহিনীকে ভারতের মদতপুষ্ট বলার মধ্যে যে সাহস তার ত তুলনা নেই। ঐ সাহস ছিল বলেই ফ্রন্টিয়ার ওরকম 'বেয়াড়া' সুর তুলতে পেরেছিল। 'সুতারকিন স্ট্রীটের' বাবুদের আর

কলকাতার প্রেসকে বারবারই সমরবাবু একহাত নিয়েছেন। কারণ একটাই। এরা প্রচণ্ড চ্যাঁচায় আবার চ্যাঁচানোর মধ্যেই নীরবতার দায়িত্ব পালন করে। সীমানার যারা ওপারে, টেবিলের যারা ওধারে তাদের কথা, তাদের মতো করে কখনোই শোনা যায় না। এই 'অপরকে' নীরব করে দেওয়ার চক্রান্তের জবরদস্ত উপায় হচ্ছে নানাভাবে নিজেদের কায়েমী বার্তাতরঙ্গে অপরের স্বরকে আত্মসাৎ করে প্রচার করার চেষ্টা। এর বিরুদ্ধে সমরবাবুর সম্পাদকীয় আর সমরবাবুর কাগজ সক্রিয় ছিল। দু'ভাবে 'ফ্রন্টিয়ার' সাধারণতঃ এই কাজ করত। চারপাশে যখন 'কেয়াবাৎ'-এর বৃন্দগান, হৈ-চৈ, তখন উনি বেসুরো গাইতেন। তা বাংলাদেশ নিয়ে কান্নাকাটিই হোক বা লেনিনকে নিয়েই হোক। মুজিবকে নিয়ে যখন সারাদেশ 'জয়বাংলা' 'জয়বাংলা' করে চ্যাঁচাচ্ছে তখন সমর সেন বললেন, 'আমি করি নাই ?' আর 'আমি বলি নাই ?'—এই দুইয়ের পেছনে এক শক্তিই কাজ করছে। আর লেনিনকে নিয়ে যখন চারিদিকে মাতামাতি তখন 'ফ্রন্টিয়ার' লিখল "লেনিনের মুক্তি চাই এদের হাত থেকে। ভণ্ডামি আজ বিপ্লবের জায়গা নিয়েছে। পার্টির কর্মীদের বলা হচ্ছে স্ট্রাইক ভাঙতে যাতে শ্রমিকশ্রেণীর আক্রমণ থেকে অত্যাচারীর সম্পত্তি রক্ষা করা যায়। পয়লা নম্বরের বিপ্লবী, নিষ্ঠাবান, সাহসী পার্টি কর্মীকে মারা হচ্ছে ; শত্রুর হাতে হাত মেলানোকে লেনিনবাদের দ্বন্দ্বমূলক প্রয়োগ বলে জাহির করা হচ্ছে।...প্রয়োজনে চোখ উপড়ে ফেলে অথবা আরও মারাত্মক কিছু করেও এই সামন্তবাদ উপনিবেশবাদের কব্জা থেকে লেনিনকে উদ্ধার করতে হবে।" এই সব সম্পাদকীয় অনেকের চটক ভাঙাত, অনেকে চমকাতেন, অনেকে অস্বস্তি বোধ করতেন, ভুরু কোঁচকানোর সীমা ছিল না। এইসব কাজে সমর সেনের প্রতিভার ছোঁয়াচ ছিল। জরুরি অবস্থার সময়ে সম্পাদকীয়র বদলে ২৬শে জানুয়ারীতে প্রদত্ত ফকরুদ্দীন সাহেবের বক্তৃতা তিনি যেভাবে কেটে-ছেঁটে ছেপেছিলেন, তা একটা আস্ত 'বোমার' মতন কার্যকরী হয়েছিল। প্রশ্ন তোলায় কিংবা পোশাকী ভাবালুতা ও আরামকে খুঁচিয়ে অস্বচ্ছন্দ করে তোলায় 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদকীয়র জুড়ি মেলা ভার। যারা মাও'য়ের মৃত্যুর পর 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সম্পাদকীয় মনে রেখেছেন তাঁরা একথা অস্বীকার করবেন না। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর দ্বিতীয় বিশেষত্ব ছিল সরাসরি খবর আর চিঠি ছাপানো। দেশের আর বিদেশের অসংখ্য সংবাদদাতার নামে ও বেনামে পাঠানো সরেজমিন তদন্ত রিপোর্টের ধারাবাহিকতা এই কাগজের অমূল্য সম্পদ। এতে আমরা অন্য স্বদেশ আর বিদেশের মুখ দেখতাম। এরা প্রশ্ন তুলত আর আমাদের ভাবাত।

এই নৈঃশব্দের চক্রান্তকে ভেঙে সীমানার ওপারকে কথা বলার সুযোগ করে দেওয়া আর তারই মাধ্যমে সব কিছুকে মেনে নেবার মানসিকতাকে প্রশ্ন করার

রসদ জোগানোর চেষ্টাই 'ফ্রন্টিয়ার'-এর প্রধান ভূমিকা হয়ে থাকবে। সমস্যাটাকে তুলে ধরাটাই যে আপাততঃ বড় কাজ, সমাধান হোক বা না হোক, এ কথা ত সমরবাবু নিজেই স্বীকার করেছেন।

সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কংগ্রেস সরকার অথবা রাষ্ট্রপতি শাসনের আমলে কেন্দ্রের ইন্দিরা সরকার যখন সি. পি. এম. কর্মীদের হত্যা করছিল, 'ফ্রন্টিয়ার' তখন চুপ ছিল না, তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। যুক্তফ্রন্টের মধ্যকার শরিকী ঝগড়ার কুফলের দিকে বারবার ইঙ্গিত করেছিল। ১৯৭২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পরাজয়ের পর সংসদীয় রাজনীতিতে ভ্রষ্টাচারের কথা সাধারণের কাছে তুলে ধরেছিল। ১৯৬৮ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় ধরে নকশাল নিধনের বিরোধিতা 'ফ্রন্টিয়ার'-এ অব্যাহত ছিল। সি. পি. আই. (এম. এল)-এর খতম অভিযান বা মূর্তি ভাঙার বিষয়েও সমর সেন প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন রেখেছেন, এই রকম ব্যক্তিহত্যায় বা মূর্তি ভাঙায় কী লাভ? তবে তিনি এদের ত্যাগ করেননি। যখন ১৪ই মার্চ ১৯৬৯ যুক্তফ্রন্টের আমলে কলেজস্ট্রিটে নকশাল বিরোধী আন্দোলন শুরু হয় তখন 'ফ্রন্টিয়ার' তার নিজস্ব ভাষায় এই হত্যাকাণ্ডের বিরোধিতা করে। পরে ১৯৭০-এ নকশাল নিধন যখন তুঙ্গে, তখন বরানগর হত্যা-কাণ্ডের পর 'ফ্রন্টিয়ার' (২১ আগস্ট, ১৯৭১) "Shades of Indonesia" সম্পাদকীয়তে লেখে, 'পশ্চিমবঙ্গে অনেককে হত্যা করা হয়েছে নিঃশব্দে। বারাসতে, নয়াপাড়ায় আর অন্য জায়গায়। পুলিশ সবার সামনে অনেক লোককে মেরেছে। গুণ্ডার সাহায্যে ওরা সি. পি. এম. কর্মী ও সমর্থকদের বিশেষ বিশেষ জায়গা থেকে বিতাড়িত করেছে। ওদের জেলের অবস্থা ভয়াবহ। কিন্তু ১২ / ১৩ অগাস্টে কাশীপুর বরানগরে এদেশে এক নতুন দৈত্যের জন্ম নিয়েছে। লুকিয়ে হত্যার দিন আজ শেষ হয়েছে। এবার থেকে নিহতদের দিনের আলোতেই ঠেলাগাড়ি ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে।'

দলীয় সাংগঠনিক নেতৃত্বের আওতায় রাষ্ট্রযন্ত্রের বিরুদ্ধে আঁটোসাঁটো কোন নির্দেশিত পথের সম্ভাব্য আয়োজনে সায় দেবার মানসিকতা বোধহয় তাঁর ছিল না। তাঁর বিখ্যাত সম্পাদকীয়গুলিতে সমস্ত সহানুভূতি নিয়েও তিনি সি. পি. আই. (এম. এল.)-এর দলীয় মুখপত্রের লেখাগুলিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। এদের আবেগপ্রবণ সম্পাদকীয়তে যে আত্মত্যাগের আর খতমের কথা বলা হচ্ছিল তাকে তিনি আনন্দমঠের সন্তানবাহিনীর সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। প্রত্যুত্তরে সরোজ দত্তও লিখেছিলেন, ভারতীয় বিপ্লবকে ঠেকাচ্ছে তার তিন শত্রু—'ইস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্, ফ্রন্টিয়ার গান্ধী, আর ফ্রন্টিয়ার কাগজ'। সরোজ দত্তের এই লেখা 'ফ্রন্টিয়ার' তার "অন্য সম্পাদকের চোখে" স্তম্ভে ছাপিয়েছিল। আবার সরোজবাবুর নৃশংস হত্যা তাঁর মনে যে আলোড়ন এনেছিল তার টুকরো-টুকরো পরিচয় আমরা

'বাবু বৃত্তান্তে' পাই। এক ধরনের নিরাসক্তি, বাড়াবাড়ি আর আবেগের প্রতি এক ধরনের অনীহা, সমরবাবুকে যে-মেজাজ দিয়েছিল, তা 'ফ্রন্টিয়ার'কে নিছক তাৎক্ষণিকতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পেরেছিল।

কেবল অন্য ধরনের সংবাদ সরবরাহ নয়, শুধু নৈঃশব্দের চক্রান্ত ভাঙা নয়, বরং অন্য এক জগতের জটিলতাকে বোঝার চেষ্টা করা, তাকে নানা কাঠামোয় ধরার চেষ্টাও 'ফ্রন্টিয়ার' বা 'নাউ'তে আছে। এর ব্যাপ্তি অসাধারণ। এর গভীরতা সবাইকে ভাবিয়ে তোলে।

ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজ, তার রাষ্ট্রচরিত্র, আর মার্ক্সবাদের নানা বিতর্ক আর 'দ্বন্দ্ব'-এর পরিচয় 'ফ্রন্টিয়ার'-এ আছে। সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতি, মার্ক্স, লেনিন, প্যারীকমিউন নিয়ে পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা, চীনের অর্থনীতি আর রাজনীতি নিয়ে জ্যাক্ গ্রে-র ধারাবাহিক আলোচনার কথা সবাই জানেন। আরো অনেকে লিখেছেন—কখনও স্বনামে, কখনও ছদ্মনামে। মল্লিকার্জুন রাও, প্রভাত জানা, মণি গুহ, অরুণ মজুমদার, সুমন্ত ব্যানার্জী, ভবানী চৌধুরী, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ। অমিত ভাদুড়ী সামন্ততন্ত্রের উপর তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপর্ণ লেখাটি 'ফ্রন্টিয়ার'-এ লিখেছেন। রণজিত গুহর 'নিপীড়ন ও সংস্কৃতি'এবং নীলদর্পণের উপর লেখার কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। দু'টি লেখাই বহু আলোচিত। অমিয় বাগচী, নির্মলচন্দ্র, বিনয় ঘোষ তাঁদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ লেখার প্রথম খসড়া 'ফ্রন্টিয়ার'-এ ছাপান। নানান ধরনের লোক এই কাগজে নানান বিষয়ে লিখেছেন। যেমন, সত্যজিৎ রায়, রজত রায়, অথবা সন্দীপ সরকার ছবির উপরে। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ রাজনৈতিক বিতর্কের পরিসর যে কত ব্যাপ্ত ছিল, তা Naxalbari and after—A Frontier Anthology-র দ্বিতীয় খণ্ডের পাতা ওলটালেই বোঝা যাবে।

সুতরাং, সব মিলিয়ে যে-বাতাবরণ তৈরী হয়েছিল তার স্বাদ ছিল বিচিত্র, বিতর্ক আর উত্তাপের আঁচ সেখানে অহরহ পোহানো হত। এটা 'ফ্রন্টিয়ার' ও তার সম্পাদকের একটা বড় কাজ। বেশিরভাগ রাজনৈতিক ও তথাকথিত অরাজনৈতিক পত্রিকার লেখাগুলি একঘেয়ে। বক্তব্যগুলি জানা। লেখকরা একই। নাম আর শিরোনাম দেখলেই বোঝা যায় প্রবন্ধে কী লেখা হবে। তার সব 'বামপন্থীয়' আনুগত্য সত্ত্বেও 'ফ্রন্টিয়ার' এই 'কোষ্ঠবদ্ধতা' থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছে। বারবার বাঁধা-ধরা পথের বাইরে যেতে পেরেছে। আসলে আমরা ভুল করতে ভয় পাই। ভাবতে ভয় পাই। কারণ তার অনেক যন্ত্রণা আছে। মানসিক অলসতা আমাদের দেশে জিইয়ে রাখা হয়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক হ'লে সরকারী আর বেসরকারী আউলচাঁদদের সুবিধা হয়। সব কিছু চালিয়ে দেওয়া যায় সহজে। তা মার্ক্সবাদ বিরোধিতা করে কিংবা, আরও মারাত্মক, মার্ক্সবাদের নাম করেই জাঁকিয়ে বসতে পারে ভালভাবে। এটা জানতেন বলেই এক ক্রুদ্ধ লেখকের দীর্ঘ চিঠির উত্তরে

সমর সেন ছোট্ট একটা কথা বলেছিলেন "The editor does not claim to be a marxist"। নিজেকে কোন ছকে না ফেলে, গণ্ডির মধ্যে না থেকে, বুদ্ধির সীমানায় দাঁড়িয়ে একলা প্রশ্নের আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন সমর সেন ও তাঁর 'ফ্রন্টিয়ার'। একলা তিনি গাজনের বাজনা বাজিয়েছিলেন। কারণ আগুন তাঁর শ্রদ্ধাভাজন ছিল।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—

মন্তব্য আর পরামর্শের জন্য বন্ধু গৌতম চন্দ্র-র কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অসীম চট্টোপাধ্যায়

সমর সেন প্রসঙ্গে

বামপন্থী আন্দোলন, বিশেষত নকশালবাড়ির আন্দোলন ও নকশালদের আন্দোলনের সঙ্গে সমর সেনের নাম এত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে ১৯৭৮ সালে জেল থেকে বের হবার আগে তাঁর সঙ্গে আমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না শুনে অনেকেই অবাক হয়েছেন। কিন্তু একথা সত্য যে সমর সেন প্রসঙ্গে ঘনিষ্ঠতাব বা ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের কোন পুঁজি আমার নেই। ব্যক্তি সমর সেনকে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্য দিয়ে জানবার, তাঁর একান্ত চিন্তাভাবনার শরিক হবার, এমনকি কোন যৌথ প্রয়াসে সরাসরি যুক্ত হবার কোন ঘটনা আমার জীবনে ঘটেনি। তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে বার চারেক—স্বল্প, সীমিত, কেজো সাক্ষাতে। কোনটিতেই অবিমিশ্র প্রত্যাশা-পূরণের অভিজ্ঞতা হয়নি, তবে চিন্তার রসদ পেয়েছিলাম অনেক। কিন্তু সেই সব সাক্ষাৎকার থেকে ব্যক্তিমানুষটিকে চেনার, কিংবা যে 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে'—সমর সেনের সেই জীবনধারার সঙ্গে পরিচয়ের কোন অবকাশ ছিল না।

অথচ আমাদের প্রজন্মের মধ্যমবর্গীয় আর সবার মতো আমার চিন্তায়-চেতনায়, মননে আকৈশোর সমর সেনের অবয়বহীন উপস্থিতি বাস্তব ঘটনা। 'অন্ধকারে লাল রাস্তা পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মত' যে মফস্বল শহরে, সেখানে বাল্য কেটেছে। যে-বয়সে সহজ, সরল বিশ্বাসের জগৎ থেকে বাস্তবে উত্তরণ ঘটে, মধ্যবিত্ত জীবনের স্ববিরোধী ফাঁক আর ফাঁকিগুলো চোখে পড়ে, ভুয়া মূল্যবোধ আর নিরন্তর আপসগুলো পীড়িত করে অপাপবিদ্ধ তরুণ বোধকে, বঙ্গভূমির শত শত কিশোরকে হাতছানি দেয় কবিতার মায়াবী জগৎ, তখন অকস্মাৎ অনিবার্যভাবে সমর সেনকে 'আবিষ্কার' করেছিলাম। সংযত আবেগ, বাঙ্‌ময় ইংগিত ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কবি সমর সেন আকৃষ্ট করেছিলেন।

অচিরেই নতুন পরিচয়ে সমরবাবুর গুণমুগ্ধ হলাম। যে-নাগরিক কবি একদা জনান্তিকে 'কবিতা আর কোষ্ঠকাঠিন্য হতে মুক্তি পেয়েছেন' এই মন্তব্য করে চিরতরে কবিতা ছেড়েছিলেন অকস্মাৎ, 'নাউ' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে তাঁর দেখা পেলাম। আত্মতৃপ্ত ত্রিশংকু-অস্তিত্বের আত্মরতির প্রতারণাকে অনায়াস দক্ষতায় ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে-উজ্জ্বল রসিকতায় ছিন্ন ভিন্ন করছে এ কোন্ কালাপাহাড়! আমাদের প্রজন্মের অনেকের মতো আমার চেতনা উন্মেষে সমরবাবুর প্রাসংগিকতা বলতে গেলে ছোট এই পত্রিকাটির কথা এসে পড়ে।

ষাট দশকের গোড়ার কথা। সবে তখন রাজনীতিতে হাতে খড়ি—অচেতন

বোধ আর সচেতন অস্তিত্বের মাঝে এক ধূসর জগতে রয়েছি। 'সৃজনশীল' মার্ক্সবাদের দাপাদাপি শুরু হয়েছে, কিন্তু তখনও তা সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক আকর্ষণকে ভোঁতা করতে পারেনি, 'শান্তিপূর্ণ উত্তরণ', স্বনামে বা বেনামে, গ্রাস করতে পারেনি সাম্যবাদী আন্দোলনকে। তখন, নবদীক্ষিতের উন্মাদনা আর তারুণ্যের আবেগাশ্রিত আশাবাদ মিলে স্বপ্নগুলোর বাস্তবায়নকে অনিবার্য মনে হচ্ছে—সমষ্টির স্বার্থের তুলনায় কী অকিঞ্চিৎকর এই ব্যক্তিজীবন! এমন সময় ভারত-চীন যুদ্ধের হাত ধরে এল সেই অসম্ভব দুঃসময়। অশোক মিত্রের অনবদ্য বর্ণনায়, "ভয়ংকর তমিস্রার দিন গেছে তখন: ফেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে, প্রতিদিন খবরের কাগজে কূপমণ্ডূক আস্ফালন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'চীন' এর সঙ্গে 'রে হীন' মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদছেন, যুদ্ধের জিগির তুলে কতিপয় তস্কর সাধারণ মানুষের সর্বস্ব নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটুকু বলবার সাহস কারো নেই, নতুন দিল্লি থেকে অদ্ভুতকিম্ভূত যা-যা অশ্লীলমন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে এমনকি এই বাংলাদেশেও তাদের ভয়াবিষ্ট পুনরাবৃত্তি, যারা একদা 'প্রগতিশীল' খেতাব এঁটে শৌখিন রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করতেন, তাঁরা হীনমন্যতার কম্বলে মাথা জড়িয়ে খাটের তলায় ঘুপ্‌টি মেরে অবস্থান করছেন।" মহাসংকটে পড়েছিলাম আমাদের মতো অনভিজ্ঞরা। সমাজতান্ত্রিক সমাজে, পরিকল্পিত অর্থ-নীতিতে বাজারের সমস্যা থাকে না, যুদ্ধের প্রয়োজন থাকে না—অভিজ্ঞতার অভাবে জানা কথাগুলোর উপলব্ধিতে উত্তরণ থমকে দাঁড়িয়েছে; সর্বত্র সংশয়, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা। সংশয় কাটাবার দায়ভার যাদের, এতাবৎ বাচাল সেই রাজনৈতিক-বৌদ্ধিক নেতৃত্ব হয় বেচাল, নয়ত মূক-বধির। সঙ্গী-সাথী অনেকে ভিড়ে গেছে জাতীয়তাবাদী দঙ্গলে। আমরা বন্ধ্যা নিষ্ক্রিয়তার অতৃপ্তিতে ভুগছি। আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরে স্তব্ধ অন্ধকার। এই সময়ে আলো আনলেন সমর সেন। 'নাউ' পত্রিকার প্রকাশ যেন এক আবির্ভাব—তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়। দেশ জুড়ে অচলায়তন গড়ার কূপমণ্ডূক আস্ফালনকে স্তব্ধ করে মিতভাষী মানুষটি সোচ্চারে আমাদের শুধু সাহস নয়, যুক্তি-বিশ্বাস-ভবিষ্যৎকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর রুদ্ধশ্বাস কত পথ পার হলাম—তবু, রক্তে খালি সেই সুর বাজার ঋণ রয়ে গেছে।

বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমরবাবুর যে বৈশিষ্ট্য মনকে টানে, তা হল, সামাজিক ঘটনাকে বিকাশের প্রক্রিয়ায় ও সামগ্রিকতায় দেখে ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধির সক্ষমতা। একারণেই তাঁর মূলে গলদ নেই, 'স্থূলে ভুল নেই', সাময়িক জনপ্রিয়তার চটকদারি মোহে আপ্লুত হবার ইতিহাস নেই। অন্যেরা যেখানে সদা-অপ্রস্তুত, সমরবাবুর সেখানে, প্রতিটি সন্ধিক্ষণে, অবস্থান নিতে দ্বিধা বা বিলম্ব ছিল না। তাই ভারতের বুকে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষকে চিনতে ভুল করেন না,

বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে দাবানলের সন্ধান পান, বিচ্ছিন্ন প্রতিটি বৃক্ষের সমাহারে বন-রাজিনীলা চোখে পড়ে। কবিতায় যেমন সিন্ধুর স্বাদ এনে দিতেন বিন্দুতে, তেমনই 'ফ্রন্টিয়ার' পত্রিকায় বিন্দু-বিন্দুবৎ ঘটনার মধ্যে দিলেন সমুদ্রের সন্ধান।

এ আর এক ক্রান্তিকাল, আরেক নতুন দিগন্ত। ১৯৬৭ সাল। গণআন্দোলন বিকাশের প্রক্রিয়ায় ও প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সূচনা, নকশালবাড়ির রক্তাক্ত অবদমনে তা অধঃপাতিত। কথা ও কাজের অসংগতি প্রতিপদে ধরা পড়ছে, স্থিতা-বস্থা বজায় রাখার রাজনীতি জাঁকিয়ে বসছে, সকলকিছুর বিনিময়ে সরকার-রক্ষা ক্রমাগত হিসেব-নিকেশের অক্ষবিন্দু হচ্ছে, কমিউনিস্ট পার্টি সমাজগণতান্ত্রিক দলে অধঃপতিত, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ধারাবাহিকতা হিসেবে নতুন দলের প্রয়ো-জনীয়তা অনুভূত হচ্ছে, নকশালবাড়ির পথ—শ্রেণীসংগ্রাম ধাপে ধাপে বিকশিত করে সশস্ত্র সংগ্রামে উন্নীত করার পথ—আসমুদ্রহিমাচল প্রচার দাবি করছে। নকশালবাড়ির পর কোনকিছুই আর আগের মতো থাকছে না; রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক—সকল পর্যায়ে নতুন বাস্তবতা দানা বাঁধছে। প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নতুন এই ধারার মুখপত্রের। 'ফ্রন্টিয়ার' এই প্রয়োজনের ফসল। স্বতঃপ্রণোদিত একনিষ্ঠায় সময়বাবু আমৃত্যু এই পত্রিকার সম্পাদনা করে গেছেন।

এই পত্রিকার প্রায় দুই দশকের ইতিহাস যেন সময়বাবুর ইতিহাস। তাঁর এ-পর্যায়ের ঠিক-ভুল, শক্তি-দুর্বলতার প্রতিফলন এখানেই ঘটেছে। এক হিসেবে 'নাউ' থেকে 'ফ্রন্টিয়ার' এক উত্তরণ বিশেষ। শুধু আরোপিত শেকল কেটে বিবেকের দায় মেটানোর কারণেই নয়, আন্দোলনের সঙ্গে সরাসরি কমবেশি সম্পর্ক স্থাপনের বিচারেও 'ফ্রন্টিয়ার' এক নতুন সীমান্ত।

এই পত্রিকার প্রায় দুই দশকের জীবন আমি নির্দিষ্ট চারটি পর্যায়ে ভাগ করে থাকি। প্রথম পর্যায়, '৬৯ পর্যন্ত, মূলত সমাজগণতান্ত্রিক সুবিধাবাদ, বুলিসর্বস্বতা ও ভাওতা নির্দয়ভাবে উন্মোচিত ; অন্যদিকে বিপ্লবী ধারার কিশলয়টিকে সংবাদ, ভাষ্য ও মতাদর্শগত সংগ্রামের মাধ্যমে পুষ্ট করার আয়োজন চলেছে। দ্বিতীয় পর্যায়, '৬৯-'৭১, এক কঠিন ও জটিল দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণের পর্যায়। তৃতীয় পর্যায়, '৭১-'৭৮, মূলত নাগরিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা তথা বন্দীমুক্তির ব্যাপারটিকে গ্রহণ করেছে; সঙ্গে সঙ্গে বিগত অভিজ্ঞতার নানা রকম সারসংকলনের প্রচেষ্টা চলেছে। আর পরবর্তী চতুর্থ পর্যায় যেন কিছুটা দিশাহীন।

এই চার পর্বের মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়টি সবিশেষ মনোযোগ দাবি করে। এই পর্যায়ে নকশালবাড়ির পথ থেকে ক্রমশ আলাদা হয়ে যাচ্ছে নবগঠিত পার্টির পথ ; জনসাধারণের যুদ্ধের ধারণার বিপরীতে অগ্রগামীদের যুদ্ধের ধারণা উপস্থাপিত ; বীরত্ব আর আত্মত্যাগের দ্যুতি রাজনীতির তথা লাইনের সঠিকতার প্রশ্নকে ঝাপসা করেছে ; 'খতম' দিয়ে যে নকশালবাড়ি গড়ে ওঠেনি, সেই সত্য বিস্মৃত—মার্ক্সবাদ

আর সমাজতান্ত্রিক বুলিসর্বস্ব সন্ত্রাসবাদের সীমারেখা বিলীনপ্রায়। নকশালবাড়ির আন্দোলন ও পরবর্তীকালের নকশাল আন্দোলনের পার্থক্য যে দুই মতাদর্শের, দুই বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, সেকথা সমরবাবু সম্যক বুঝেছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু একথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে এই সত্যের দ্বারপ্রান্তে এই দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি উপনীত হয়েছিলেন। তাই, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পাশাপাশি 'বাম' নামধারী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধেও হুঁশিয়ারী দিতে হয়েছিল। ফলে অচিরেই সমরবাবু তথা 'ফ্রন্টিয়ার' আমাদের বিরাগভাজন হন। মনে আছে, 'দেশব্রতী' পত্রিকায় লেখা হল যে শাসকশ্রেণীর তিন ফ্রন্ট—ফ্রন্টিয়ার, ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্ ও ফ্রন্টিয়ার গান্ধী। অন্যদিকে, মেদিনীপুরের সংগ্রাম প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে 'দেশব্রতী' সম্পর্কে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর মন্তব্য :

> "(This weekly) will see to it that there is little sympathy for the victims of police and army action. This weekly revels in the manner of exterminated jotedars as an index of revolutionary upsurge—there is jubilation where the head of a man killed is kicked about, though not much is said about what happens to his land and the system he represents. Thanks to this kind of agit-prop, the hungry, restless peasant fighters and their dedicated student-comrades, for no fault of their own, may come to be known as the head-hunters of Midnapore."

ইতিহাসের বিচিত্র পরিহাস হল, 'দেশব্রতী'র নরমুণ্ডশিকারপ্রীতি যে কোনমতেই আকস্মিক ছিল না, বরং উপরি-উক্ত head-hunting যে এই দলটির কাছে শ্রেণীসংগ্রামের উচ্চতর রূপ ও গেরিলাযুদ্ধের সূচনা ছিল, রাজনৈতিক লাইনের মূল অন্তবস্তু ও একমাত্র কার্যকরী কার্যক্রম ছিল, এই সত্য পরিষ্কার হবার পরও সমরবাবু এই দলকে কোন পর্যায়ে কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে আর চিহ্নিত করতে পারেননি। বরং জীবনের সায়াহ্নে অল্প সময়ের জন্য 'ফ্রন্টিয়ার'কে এদের একাংশের অপাঠ্যপ্রায় উপদলীয় মুখপত্র করে ফেলেছিলেন। সিকিশতাব্দী জুড়ে সমরবাবুর সম্পাদনার ইতিহাসে এই সময়টুকু ব্যতিক্রমবিশেষ। বিপরীতে, এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সম্পাদকীয় ভূমিকা ভবিষ্যতে উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

১৯৭০ সালে সমরবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, বন্দীমুক্তির আয়োজনে-আন্দোলনে তাঁর প্রয়াস জেলে বসে শুনেছিলাম। হাজারীবাগে নির্বাসিত আমার সঙ্গে পরিবারের লোকজনদের সাক্ষাৎকারে তাঁর অকুণ্ঠ সহায়তার কথা জেনেছিলাম। '৭৮ সালে জেল থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতায় সমরবাবুর সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছিলাম; নানা কারণে তা আর

হয়ে ওঠেনি। মাসকয়েক পরে কমরেড কানু সান্যাল, কমরেড সৌরেন বসু প্রমুখ-দের মুক্তির জন্য পার্বতীপুরম রাজবন্দী মুক্তি কমিটির সম্মেলনের কাজ নিয়ে সময়-বাবুর কাছে প্রথম যাই।

এখানে এই কমিটি গঠনের পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা জরুরি। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনা মনে হলেও, এই কমিটি গঠন ছিল ঐতিহাসিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ ও সাহসী পদক্ষেপ—এক নতুন ধারার রাজনীতির সূচনা। বন্দীমুক্তির প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এখানে সর্বপ্রথম সি. পি. আই.এম. সহ বাম দলগুলি এবং কমিউনিস্ট বিপ্লবীরা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এক মঞ্চে জড় হন।

আমাদের বিগত অভিজ্ঞতার সারসংকলন করার সময়ে সমাজগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতি ও কৌশলের প্রশ্নটি স্বাভাবিক ভাবেই আসে। সমাজগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম জটিল ও দীর্ঘস্থায়ী—মূলত নীতির লড়াই, লাঠির লড়াই নয়। কিন্তু নকশালবাড়ির অব্যবহিত পরের পর্যায়টুকু বাদ দিলে সমাজগণতন্ত্রের মোকা-বিলায় নীতির বদলে লাঠির লড়াই উভয়পক্ষেই প্রাধান্য পায়। এতে একদিকে কংগ্রেস সহ বুর্জোয়া দলগুলির লাভ হয়—তারা পাহাড়চূড়ায় বসে দুই বাঘের লড়াই দেখার সুযোগ পায়; অন্যদিকে, লাভবান হয় সমাজগণতান্ত্রিক নেতৃত্ব—জঙ্গী কর্মীদের আন্দোলনের পথের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণকে ভোঁতা করে সরকার গঠনের কাজে নিয়োজিত করা সহজ হয়ে যায়। আর নকশালপন্থী শিবির এসব বিবেচনা না করে সমাজগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে আগাগোড়া শিশুসুলভ অজ্ঞতা দেখিয়ে গেছে। সমাজগণতন্ত্র বিপ্লব করে না, অতএব ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, শুধু অন্ধ বিরোধিতা করলেই দায়িত্ব খালাস—এই জাতীয় চিন্তাভাবনা শিকড় গেড়ে বসেছে। 'কমিউনিস্ট আন্দোলনের এতাবৎ শক্তিসঞ্চয়ের মূলভাগই যে রয়ে গেছে সমাজগণতন্ত্রের দখলে, সমাজগণতন্ত্রের যে রয়েছে দৃঢ় গণভিত্তি, এদের জয় করে বিপ্লবী রাজনীতির আওতায় আনা যে সমাজবিপ্লবের অপরিহার্য শর্ত, সেসব ভুলে স্বতঃস্ফূর্ততার জোয়ারে ভেসে যাওয়া হয়েছে। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যক পুরনো কর্মী আমাদের সঙ্গে আসেন। আসলে প্রয়োজন ছিল একদিকে লাগাতার, আপসহীন নীতির লড়াই; অন্যদিকে এই নীতির লড়াই-এর স্বার্থেই সাধারণ সমস্যায় সমাজগণতন্ত্রীদের নিয়ে একযোগে যৌথ সংগ্রাম। এতে একদিকে বুর্জোয়া দলগুলি সমাজগণতন্ত্রীদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্যের সুযোগ যেমন নিতে পারত না; অন্যদিকে তেমনি সাধারণ কর্মীদের কাছেও নীতির ফারাক স্পষ্ট হত। এটি ছিল নীতিতে দৃঢ় থেকে নমনীয় কৌশল গ্রহণের প্রশ্ন। কিন্তু তখন আমাদের মানসিকতায় ও অভিধানে 'কৌশল' শব্দটিই অস্পৃশ্য, কৌশল ও সুবিধাবাদ সমার্থক বিবেচিত হত—যেন মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-মাও-চিন্তার তূণে বিপ্লবী কৌশল নামে কোন তীর নেই, নীতির সমস্যার সমাধান

করলেই যেন পদ্ধতির সমস্যার স্বতঃস্ফূর্ত সমাধান হয়ে যায়। অনুশীলনের দায়ভার-মুক্ত বুদ্ধিজীবীরা এই প্রকার চিন্তার বিলাসিতায় সক্ষম হতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক দল ও কর্মীর পক্ষে এই চিন্তা আত্মহত্যার সমান।

১৯৭৮ সালে সমাজগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সব ধরনেব নকশালদের অবস্থান কার্যত আগের মতোই ছিল। সাধারণ সমস্যায় সমাজগণতন্ত্রীদের সঙ্গে যৌথ কার্যক্রমের কথা বললে 'সমাজগণতন্ত্রের লেজুড়' আখ্যা জোটার সম্ভাবনা। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার কাছে নতিস্বীকার করে বন্ধ্যা বিপ্লবীয়ানার স্পর্শকাতরতায় কখনও আমি আগ্রহী ছিলাম না। ১৯৭৮ সাল, সবে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি। জলন্ধর কংগ্রেসে সি.পি.আই. এম. দল গণ লাইন অনুসরণকারী নকশালপন্থীদের যৌথ কার্যক্রমে আগ্রহ দেখিয়েছে। ওদিকে জনতা পার্টির সঙ্গে বাম দলগুলির নাগরিক স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্য পশ্চিমবঙ্গের বাস্তবতায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই সি.পি.আই.এম. দলের প্রয়াত নেতা প্রমোদ দাশগুপ্তের সঙ্গে পাবতীপুরম রাজবন্দীদের মুক্তি নিয়ে আলোচনা করি। গঠিত হয় পার্বতীপুরম রাজবন্দী মুক্তি কমিটি—পশ্চিমবঙ্গে বামদলগুলিকে নিয়ে কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের যৌথ কাজকর্মের সেটাই প্রথম প্রচেষ্টা। মনে পড়ে, অনেক প্রত্যাশা নিয়ে সমরবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। বন্দীমুক্তির আবেদনপত্রে সমরবাবু নির্দ্বিধায় স্বাক্ষরও করেন, কিন্তু, আগে বা পরে কোন কারণ না দেখিয়েই, সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকেন।

হতাশ হয়েছিলাম খুব, অভিমান হয়েছিল। কিন্তু সব ছাপিয়ে যে প্রশ্ন জেগেছিল, তা হল, কেন সমরবাবুর মতো মানুষও বিষয়ের আপাত রূপটিতে আটকে জটিল প্রশ্নের গভীরে যাোন না? 'ফ্রন্টিয়ার'-এব দ্বিতীয় পর্বে সম্ভাব্য সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী শুনিয়েও পরবর্তীকালে কেন যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন না? সমাজগণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জটিলতা জেনেও কেন স্পর্শকাতর ছুঁৎমার্গী বাতিকের সঙ্গে আপস করবেন? এই জিজ্ঞাসার উত্তর হিসেবে দুটো কথা মনে হয়েছে। এক. মিতভাষী সমরবাবুর অন্তর্লীন রোমান্টিকতা। কবিতায় সমরবাবু যতই রোমান্টিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ করুন, রাজনীতি বিচারে তিনি উষ্ণ আবেগকে শীতল যুক্তির ওপরে স্থান দিয়েছেন। চতুর্দিকে যখন সুবিধাবাদ আর বিশ্বাসহীনতার ঘনঘটা, তখন নকশালপন্থীদের বিপথগামী সাহস. লক্ষ্যভ্রষ্ট আত্মত্যাগ ও অন্ধ একনিষ্ঠতা দিয়ে সমরবাবু পরিব্যাপ্ত সিনিসিজমকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন। দুই, বুদ্ধিজীবীর সীমাবদ্ধতা। অনুশীলনের দায়ভারমুক্ত বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমরবাবু নীতির সমস্যা সমাধানকেই প্রয়োজনীয় ও যথেষ্ট বিবেচনা করেছেন; পদ্ধতির সমস্যার গভীরে যেতে চাননি, বরং পদ্ধতির সমস্যাকে নিজের ক্ষেত্র বিবেচনা করেননি—যেন নদী পার হতে হবে কিনা সেটাই তাঁর বিবেচ্য, কি করে পার হওয়া যাবে, সে প্রশ্ন বিবেচ্য প্রয়োগবিদ্‌দের। বলা প্রয়োজন, এই

সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সমরবাবু নিজেও সচেতন ছিলেন। রাজনীতির ক্ষেত্রে বার বার আমায় চারপাশের 'হাতুড়ে' বুদ্ধিজীবীদের অযাচিত নানা উপদেশের সম্মুখীন হতে হয়েছে। সমরবাবু সেখানে ব্যতিক্রম বিশেষ—সর্বদা শুনেছেনই বেশী, বলেছেন কম।

সমরবাবুর কোন প্রকার অবমূল্যায়নের জন্য এসব বলা নয়, আবার এটি প্রয়াত ব্যক্তিত্বে দেবত্ব আরোপের সস্তা প্রয়াসও নয়—আমার সীমিত জানার ভিত্তিতে সমরবাবুর বাস্তব মূল্যায়নের প্রচেষ্টামাত্র। আমি জানি, জীবনের শেষদিন অবধি সমরবাবু মার্ক্সবাদী ছিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত অথচ সরল, একনিষ্ঠ অথচ মুক্তমনা, সৎ, সাহসী, ভড়ংহীন সকল প্রকার আচারসর্বস্ব প্রদর্শনীবাদের বিরোধী—সমর সেনের মতো বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যে-কোন দেশের বামপন্থী আন্দোলনের পক্ষে অপরিহার্য এবং গর্বের। অথচ বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও তাঁর কাজকর্ম দুনিয়াকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার কাজেই সীমিত থাকল, আক্ষেপ সেখানেই।

তাত্ত্বিক বিভ্রান্তির প্রতিটি সন্ধিক্ষণে সমরবাবু বার বার প্রাসঙ্গিক হয়েছেন। আজ যখন রুশ ও চীন বিপ্লবের একদা আলোকিত জমিতে সমাজতন্ত্রের নামে রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের কৃষ্ণপতাকা সদম্ভে উড়ছে, তখন বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে। আগামীদিনেও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র হিসেবে ফেরী করার চক্রান্ত চূর্ণ করার মতাদর্শগত সংগ্রামে তাঁর অভাব অনুভূত হবে বার বার। বড় অসময়ে গেলেন সমর সেন। নাকি সময়ে?

দেবব্রত পাণ্ডা

সমর সেন প্রসঙ্গে

স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক অরুণ সেন মশায় নাকি তাঁর ছাত্রদের একসময় বলেছিলেন—"History will remember me as the son of an illustrious father and the father of an illustrious son." নিজেকে নিয়ে এ নেহাৎ কম ঠাট্টা নয়। সন্তানের সাফল্য সম্পর্কে গর্বিত পিতার ভবিষ্যদ্-বাণীর মতো শোনালেও লেশমাত্র অতিশয়োক্তি ছিল না এ কথায়। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের পৌত্র সমর সেন ছাত্রাবস্থাতেই আধুনিক বাংলা গদ্যকবিতার পথিকৃৎ হিসেবে স্বীকৃতি পান। তাঁর পরবর্তী জীবন নির্ভীক ও বিশ্লেষণাত্মক সাংবাদিকতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

তাঁর কোন্ পরিচয়টি বড় এই প্রশ্নে সমালোচক ও গুণগ্রাহীরা এখন তিনটি শিবিরে বিভক্ত। একদল মনে করেন, স্বেচ্ছায় কবিজীবন থেকে নিজেকে নির্বাসিত করলেও সমর সেনের সাংবাদিকতা জনস্মৃতির আড়ালে থেকে যাবে, স্মরণীয় হয়ে থাকবে তাঁর কাব্যকৃতি। আর একদল ঠিক এর উল্টোটাই বলতে চান: কবিতায় সমর সেন কী বলতে চেয়েছেন তা নিয়ে এত মাথা ঘামানোই বা কেন? মধ্য-যৌবনের পর কবিতা আর তাঁকে উৎসাহিত করে নি কোনদিন, সুতরাং সাংবাদিকতায় তাঁর অবদানই আলোচ্য। তৃতীয় মত হল (বর্তমান লেখকও যার শরিক), কবি ও সাংবাদিক সমর সেন এক অভিন্ন ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাঁর সৃজনকর্মের সামগ্রিক আলোচনায় আমাদের সেইকারণেই আগ্রহ।

যে-কোন প্রতিভাবান ব্যক্তি সম্পর্কেই আমাদের মনে অসংখ্য প্রশ্ন জাগে। সমর সেনকে ঘিরেও আজ এমনিতরো বিস্তর জিজ্ঞাসা। কেন কবিখ্যাতির তুঙ্গে উঠেও তিনি কবিতা লেখায় ইস্তফা দিলেন, কোন অনুরোধ-উপরোধেও কাজ হল না? একটা লিক্‌লিকে আধময়লা চেহারার ইংরেজি সাপ্তাহিক কাগজ দিয়ে তিনি কি সত্যিই চিন্তাজগতে কোন আলোড়ন তুলতে চেয়েছিলেন? তাঁর কাগজ এদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবে কোন যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে বলে কি তিনি বিশ্বাস করতেন? সমর সেন বামপন্থী ছিলেন, মার্কসবাদে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথাও সুবিদিত। তাহলে কি সাংগঠনিকভাবে তিনি কোথাও যুক্ত ছিলেন? তাঁর বামপন্থার আসল চরিত্রটাই বা কি? এমনিতরো অসংখ্য প্রশ্ন পরপর উঠে আসবে, আমরাও সবাই নিজেদের মতো করে এক একটা কল্পিত ব্যাখ্যা পেশ করতে পারি, তবু হলফ ক'রে বলা যাবে না, সে ব্যাখ্যা সত্যের কত কাছাকাছি।

সমর সেন ছিলেন বিপ্লবী আন্দোলনের এক বিশিষ্ট মিত্র। এই ভূমিকা তিনি

বিরলদৃষ্ট সততার সঙ্গে পালন করে গেছেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটাই আমার কাছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মনে হয়। আমার দেখা বহু কমিউনিস্টের চেয়েও তিনি ছিলেন অনেক বেশি সৎ। ব্যক্তিগত জীবনচর্যায়, পত্রিকা সম্পাদনায়, লেখায় পত্রে একজন অখণ্ড সমর সেনকেই খুঁজে পাওয়া যায়। আজকের আখের গোছানোর দিনে ব্যক্তিজীবনের মানুষ আর লেখক মানুষ প্রায়শ আলাদা সত্তা ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়ে থাকে। বামপন্থী বলে পরিচিত লেখক-শিল্পীদের বেলায় এটা এখন বেশি ক'রেই চোখে পড়ে। সমর সেন তার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। তাঁর সঙ্গে যখন-ই দেখা হত (বেশির ভাগটাই মট লেনে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর দপ্তরে, দু-চারবার মাত্র স্থইনহো স্ট্রীটে, তাঁর ভাড়াবাড়িতে), তখনি মনে হয়েছে এই মানুষটির ব্যক্তিজীবন আর কাগজ দুই-ই এক স্থতোয় বাঁধা—একই রকম আর্থিক অনটনের শিকার অথচ কোন কিছুকে তোয়াক্কা না করে চলা। প্রতিভার অর্থ কি তাহলে সব রকমের কষ্টস্বীকারের চরম ক্ষমতা?

হয়তো একথা উঠবে যে সমর সেনের চারিত্রিক বল ও ত্যাগস্বীকারের প্রসঙ্গে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। এ কথাও উঠতে পারে যে, অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করার নজির এদেশেও খুব কম কিছু নেই—বিশেষ করে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সত্যকার সর্বহারা নেতৃত্বের মধ্যে কিংবা বিপ্লবী সংগ্রামে। তখন হয়তো একটি কথা অনেকের নজরে আসে না, সমর সেন শ্রমজীবী ছিলেন না, ছিলেন আগাগোড়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী। বিপ্লবীদের কথা উঠছে না। নিজেকে তিনি কোনদিনই বিপ্লবী বলে জাহির করেন নি। আমাদের চারপাশে বুদ্ধির চর্চা যাঁদের করতে দেখি, এ কাঞ্চনকৌলীন্যের দিনে তাঁদের ক'জন 'কেরিয়ারিজম্'-এর আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে প্রস্তুত? ভুললে চলবে কেন—সমর সেন ছিলেন গৃহস্থ বাঙালি, বাড়ির সবার স্থবিধে-অস্থবিধের ব্যাপারে তাঁর উদ্বেগ থাকাটাই স্বাভাবিক। এমনও দেখা গেছে, তাঁর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য শ'দেড়েক টাকা তক্ষুনি লাগবে, সমর সেন কতখানি বিব্রত তাই নিয়ে। তাঁর মাপের যোগ্যতা ক'জনের থাকে? ইংরেজ আমলে ইংরেজি অনার্সে এবং এম. এ.-তে প্রথম, তার উপর বংশ-পরিচয়ের আনুকূল্য—জীবনে একটু স্বাচ্ছন্দ্য পেতে আর কি লাগে? তবু তিনি কেন এক অদ্ভুত রকমের কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিলেন? সাধারণ মধ্যবিত্তের মাপকাঠিতে ঐ মাপের অসম্ভব রকমের জেদী মানুষের বিচার হয় না। রাজনৈতিক যে-কোন প্রশ্নে সাহসের সঙ্গে বিশ্লেষণ পেশ করতে গিয়ে তিনি খুইয়েছেন একের পর এক বন্ধুর সমর্থন, হাতছাড়া হয়েছে কাগজের বিজ্ঞাপন। সর্বোপরি জরুরি অবস্থায় সময় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ, টাকার ঘাটতি—'ফ্রন্টিয়ার'-এ তালা ঝুলেছে তিনমাস। তবু সমর সেন কর্তব্যে অবিচল, সম্পাদকীয় দায়িত্ব পালনে শিথিলতা আসে নি একদিনের জন্যেও।

সচ্ছল জীবনযাত্রা আর বামপন্থী বুদ্ধিজীবীর সম্মান দুইই বজায় থাকতো, যদি আত্মমর্যাদার প্রশ্নে সমর সেন একটু কম স্পর্শকাতর হতেন, কিংবা তাঁর ঠোঁট ও কলম আর একটু কম তীক্ষ্ণ হতো। কিন্তু সত্যিই যদি সে রকম আদৌ ঘটতো তাহলে শীর্ণকায় ঐ মানুষটি হারিয়ে যেতেন জনতার ভিড়ে ; তাঁর উজ্জ্বল চোখের শাণিত দৃষ্টির সামনে অস্বস্তি বোধ করতে হত না কাউকেই। সত্যের প্রতি অকুণ্ঠ অনুরাগ তাঁর মননশীল অস্তিত্বকে আগলে থাকতো না সজাগ প্রহরীর মতো. তাঁকে হারানোর ব্যথাও এমন ভার হয়ে চেপে বসতো না। 'জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মাদৃশাঃ ক্ষুদ্রজন্তবঃ,' আমার মতন ক্ষুদ্রজন্তুরা জন্মায় আর মরে. কে তার হিসেব রাখে ? জীবজগতে মৃত্যু তো নিত্যকার ঘটনা। তাহলে প্রয়াত সমর সেনকে নিয়ে এত আলোড়ন কেন ?

সেটা কি তিনি মস্ত পণ্ডিত ছিলেন বলে ? একদমই নয়। পাণ্ডিত্য অর্জন সমর সেনের পক্ষে অনায়াসসাধ্য ছিল, তবে তিনি পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁর সম্মান কি তাহলে এইজন্যে যে তিনি ইংরেজিটা বেশ ভালোই রপ্ত করেছিলেন ? ঔপনিবেশিক ভাবনা আমাদের মজ্জাগত, এরকম একটা কথা আমাদের মাথায় এসেই পড়ে, হয়তো অনেকখানি স্বাভাবিকভাবে। কিন্তু সত্যিই কি ব্যাপারটা তাই ? ইংরেজি কাগজের সংখ্যা তো এ দেশে খুব কম নয়, ভালো ইংরেজি-জানা লোকেরও বা অভাব কোথায় ? প্রশ্ন স্বভাবতই আসে. সমর সেন কি তাহলে কবি বলেই আমাদের শ্রদ্ধাভাজন ?

সন্দেহ নেই আধুনিক বাংলা গদ্যকবিতার অন্যতম স্রষ্টা হিসেবে সমর সেনের সম্মান স্বীকৃত। কিন্তু এ কেমন কবি ? কবিতা যদি ভালোই বাসতেন, তাহলে লেখা ছাড়লেন কেন ? বামপন্থী রাজনীতির শূন্যতাই এর জন্য দায়ী কি-না সেকথা সাহিত্যের জ্ঞানী-গুণী-গবেষকদের বিবেচ্য। তবুও সাধারণ পাঠক হিসেবে আমরা একথা অনেকেই মানতে প্রস্তুত যে. চতুর্দিকে ভগ্নস্তূপের মধ্যেও যিনি শুনতে চান নবজীবনের গান. যাঁর বোধে এই চেতনা প্রখর হয়েছিল—"শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু আশা আছে বাঁচবার", তাঁর আশাহত হবার সঙ্গত কারণ ছিল প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের সুবিধাবাদী মধ্যবিত্ত বামপন্থীদের চরিত্রহীনতায়। নিজের মধ্যবিত্ত অবস্থান সম্পর্কে পুরোমাত্রায় সচেতন থেকে যে-কবি বারবার বিদ্রূপের খোঁচায় জর্জরিত করেছেন স্বশ্রেণীকে. নিজেকেও—একটা সময়ে তাঁর মনে তো হতেই পারে নতুন কথা আর কি-ই বা বলার আছে কবিতায় ? শিল্প ও দায়বদ্ধতাকে যিনি কবিতায় মেলাতে চেয়েছিলেন জীবনের একটা বিশেষ পর্বে তাঁর সম্ভবত মনে হলো, এ কাজ তিনি পারছেন না। হয়তো একদিকে সেটা ভালোই হয়েছে। পরিমিতি-বোধ বাঁচিয়ে দিয়েছে সমর সেনের প্রতিভাকে তিল তিল অপমৃত্যুর হাত থেকে। পুনরাবৃত্তির ঘেরাটোপে বন্দী হয় নি তাঁর সৃষ্টি। কবিতার জগৎ থেকে সরে আসায় তাঁর মনে কোন ক্ষোভও জাগে নি। বিষ্ণু দে সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সমর

সেন যখন লেখেন কবিতা আর তাঁর মনে কোন অনুরণনই সৃষ্টি করে না।[১] তখন মনে হয় কবিতারচনা ছেড়ে দিয়ে সমর সেন যেন পরম নিশ্চিন্ত। পরিণত বয়সে আবার যখন লেখেন—ভাগ্যিস্, সুকান্ত আগেভাগে মরে বেঁচে গিয়েছেন, নইলে তাঁরও দশা হতে পারতো সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো, মাও থেকে ম্যাও-এ যাঁর পরিণতি—তখন কি মনে হয় না, কবির জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছেন তিনি ?

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, পরবর্তী জীবনে সমর সেন কবিতা-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিলেন। বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে যতই তিনি কবিতা সম্পর্কে নিস্পৃহতা দেখান না কেন, তেমন তেমন কবিতা দেখলে উৎসাহ পেতেন, নিজের কাগজের মারফত আর দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন ঐদিকে। নিজে যে-কাজে আর এগোতে পারেন নি, অন্য কেউ সেটা করছে দেখলে তাঁর নিশ্চয় ভালো লাগতো। যদিও বামপন্থী রাজনৈতিক কাগজ বলেই 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পরিচিতি। 'ফ্রন্টিয়ার'-এর অতিরিক্ত একটি পরিচয় আবার ছিল র‍্যাডিকাল বামপন্থীদের মঞ্চ হিসেবে, কেউ কেউ একে বলেন, 'a Calcutta weekly of fairly crimson colour',[২] এমন কি 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কোন কোন গুণগ্রাহীর বর্ণনায়—এটি একটি স্বাধীন মার্কসবাদী-লেনিনবাদী (এম্. এল্.) সাপ্তাহিক।[৩] কিন্তু তাই বলে শুধুই রাজনৈতিক আলোচনায় এই কাগজের পৃষ্ঠা ভরানো হয় নি। রাজনৈতিক লেখার পাশাপাশি ছাপানো হতো শিল্পসাহিত্যের বিচিত্র শাখার কত ছোট ছোট অথচ মূল্যবান আলোচনা—ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত থেকে গণসঙ্গীত, চিত্রকলা, ফিল্ম, থিয়েটার এমন কি কবিতাও। অনেক সময়ই পাঠকের মন এতে ভরতো না। কিন্তু ছোট্ট ঐ সাপ্তাহিক-এর সামর্থ্যই বা কতটুকু ? অনেক ভারি বিষয় নিয়েও এত সংক্ষিপ্ত লেখাপত্র এখানে অনেক সময় বেরুত যার জন্য তীব্র সমালোচনাও হজম করতে হয়েছে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, হিতেন্দ্র মিত্র তাঁর "Tagore on British rule" প্রবন্ধে (*Frontier*, May 21, 1977) রবীন্দ্রনাথকে একহাত নিলে পর সমর সেনকে বেশ বিব্রত হতে হয়। গুণময় মান্না চিঠি লিখে (Letters, *Frontier*, August 13, 1977) ঐ প্রবন্ধ ছাপানোর জন্য 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সমালোচনা করেন, বছর বছর এর সাংবাদিকতার ধার ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে বলে সতর্ক ক'রে দেন।

১ Sanjay, "Frankly Speaking", *Frontier*, April 11, 1970.

২ পুস্তক পর্যালোচনা। "Wake of A Movement", *Statesman*, November 5, 1978.

৩ Bernard D' Mello, "Samar Sen : In Memoriam", *Adhikar Raksha*, Bulletin of the CPDR, July-September 1987.

আবার আগের প্রসঙ্গে ফেরা যাক। সমর সেন যদি কবিতাই ভালো না বাসবেন, তাহলে 'নাউ', এমন কি, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর গোড়ার দিকেও সত্যজিৎ রায় অনূদিত সুকুমার রায়-এর কবিতা[১] ছাপা হলো কেন? 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাঠক জানেন, একাত্তরের রক্তঝরা কলকাতাতেও কবিতা নাড়া দিয়ে যায় সমর সেনকে। ওপার বাংলার সাধারণ মানুষের উপর রাষ্ট্রীয় নির্যাতনে ব্যথিত এপার বাংলায় অনেকে যখন সমবেদনায় চোখের জল ফেলছিলেন, তখন সেইসব ভদ্রলোকের প্রতি তীব্র শ্লেষ ও বিদ্রূপ গেঁথে দিয়েছিলেন বিজেশ ব্যানার্জী (কোন ছদ্মনামী কবি সম্ভবত), তাঁর "জেন্টলম্যান অফ্ সিম্প্যাথি" কবিতায়।[২] তাহলে যাঁদের কবিতায় তিনি দেখতে পেয়েছেন শিল্প ও দায়বদ্ধতার সার্থক মিলন, তাঁদের কবিতা পড়ে তিনি অনুপ্রাণিত হতেন? সরোজ দত্ত এবং মাও সে তুঙের কবিতার[৩] কথা তো বেশ স্পষ্টই উল্লেখ করতে পারি, অন্যদের কবিতাও ছাপা হয়েছে, টুকরো টুকরো নয়তো পুরোটাই[৪] কবিতার উপর আলোচনাও পাওয়া যাবে বেশ কয়েকটি।[৫]

১ 'Nonsense Rhymes by Sukumar Ray', Translated by Satyajit Ray *Frontier*, September 28, 1968.

২ *Frontier*, June 5, 1971.

৩ Saroj Datta's "My Poem" translated by Debal Kumar Chakravarty, *Frontier*, January 28, 1978. সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় সোবিয়েত সংশোধনবাদকে ব্যঙ্গ করে মাওসেতুঙের লেখা "Two Birds: A Dialogue" এবং চু-এন লাইকে উদ্দেশ করে লেখা একটি ছোট কবিতা 'A Mao Poem' নামে প্রকাশিত হয় *Frontier*-এ। যথাক্রমে January 24, 1976 ও September 10, 1977-এ।

৪ যাদের পুরো কবিতা আমার চোখে পড়েছে:

Shamsur Rahman, "A Poem from Bangladesh", *Frontier*, (April 3, 1971).

Mahmud Darweesh, "Identity Card".

Paul Laraque, "Last Judgement", (Autumn Number, 1984).

Le Tan, "In South Vietnam", (February 20, 1971).

চিদানন্দ দাশগুপ্ত অনূদিত জীবনানন্দের একটি কবিতার অনুবাদ দিয়ে চিঠি বেরোয় March 27, 1976 স খ্যায়। জনপ্রিয় বালুচ কবিতার অংশ বিশেষ দিয়ে শুরু হয়েছে Lawrence Lifschultz, "The Insurgency in Baluchistan" (January 29, 1977), ফিলিপাইন্স্ কমিউনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান জোস মারিয়া সিসোনের কবিতা দিয়ে শুরু হয়েছে Sumanta Banerjee-র "In the Philippines", (January 28, 1978), হেমাঙ্গ বিশ্বাসের "Kuo-Mo-Jo: A Remembrance" প্রবন্ধের শেষে কুও-মো-জো-র একটি কবিতার অংশ উদ্ধৃত।

৫ কবিতা বিষয়ক আলোচনা:

Rathindra Nath Chattopadhyay, "Poetry Across the Border", (May 10, 1969);

পরিণত বয়সে সমর সেনের কাব্যপ্রীতির প্রমাণ হিসেবে বিশেষ একটি দিনের কথা বলতে পারি। ওড়িয়া কবি রবি সিং একবার এসেছিলেন ফ্রন্টিয়ার অফিসে, আজ থেকে আট-ন বছর আগে। আলাপ জমানোতে সমরবাবুর জুড়ি মেলা ভার। প্রসঙ্গ উঠলো—নকশালবাড়ি আন্দোলনের ঢেউ জাগলো অন্ধ্রে অথচ ওড়িশায় তার তেমন কোন প্রভাব পড়লো না কেন, জরুরি অবস্থার সময় ওড়িশায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর কিভাবে রুদ্ধ করা হয়, রবি সিংকে কী ধরনের নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে ইত্যাদি অনেক কথার। মজা হলো, যিনি নিজের কবি পরিচয় গোপন করতে কতই না সচেষ্ট, সেই সমর সেন রবিবাবুকে অনুরোধ করলেন দু-চারটি কবিতা পড়তে। দু-এক জায়গায় পড়া থামিয়ে শব্দ বেছে বেছে অর্থ জেনে নিচ্ছিলেন। বেলা গড়িয়ে এলো, করমর্দন সেরে সমর সেন বাড়ি

Dhupdeep, "Punjab : Voices, of Revolt", (November 4, 1972) ;

Ranjan K. Banerjee, "Ezra Pound", (November 11, 1972) ;

Hiren Gohain : "A Tricentenary Tribute to John Milton", (January 4, 1975) ;

I. K. Shukla : "Where Tomorrow is Liberty", এ্যাঙ্গোলার মুক্তি সংগ্রামের কবিতা সম্পর্কে, (August 24, 1974) ;

প্যালেষ্টাইনের কবিতা সম্পর্কে I. K. Shukla, "The Bleeding Lutes, The Blazing Crosses", (April 20-27, 1974) ;

Iravatham, "Modern Tamil Poetry", (April, 13, 1974) ;

R. Shankara Narayan, "Tamil Writing", (May 25, 1974) ;

Priyanandanan, "Prison Poems from Kerala" (November 19, 1977) ;

K. V. R., "Mahakavi Sri Sri", July 9, 1983 ;

IKS, "Roque Datton : The Poet as Partisan", (May 1, 1982) ;

Paresh Dhar, "On Contemporary Bengali Revolutionary Poetry", (April 9, 1983) ;

দক্ষিণ আফ্রিকার কবিতার উপর আলোচনা—Sudipto Dutta, "The Silent Writers", (January 3, 1987) ;

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মণিভূষণ ভট্টাচার্য ও চেবাবাগুরাজুর কবিতা নিয়ে আলোচনা, A. Lahiri, "Cultural Notes", (April 4, 1987) ;

সত্তর দশকের কবিতায় উপর আলোচনা, Ashis Lahiri, "The Flaming Seventies", (June 22, 1985) ;

এ যুগের বিপ্লবী কবিতার উপর লেখা, A. Lahiri, "Hail Revolution", (July 6, 1986) ;

Shukla, "The Murder of Chile", (October 1, 1983) ;

চেরাবাণ্ডারাজুর কবিতা নিয়ে আলোচনা, Ashis Lahiri, "Look Ahead in Anger", (January 14, 1984) ;

রওনা হলেন। এরপর বেশ কয়েক সপ্তাহ গড়িয়ে গেছে, নিজে থেকেই একদিন তুললেন রবি সিং-এর কথা, বললেন, 'আমার কিন্তু ভদ্রলোকের কবিতা খুবই ভালো লেগেছে। এঁর কবিতায় কোন ভণিতা নেই, যে-কোন বিষয়ে উনি বলছেন খুবই সোজাসুজি। কিছু মনে করবেন না, আমাদের কবিতায় শব্দ আর শৈলী নিয়ে যা সব কারবার চলে, তা হস্তমৈথুনের মতো রীতিমতো অশ্লীল।'

যাই হোক, ছেচল্লিশ সালে কবিতা লেখা ছেড়ে দিলেও একটি দুটি কবিতা তারপর সমরবাবু লিখেছিলেন। দীর্ঘ অনভ্যাসেও তাঁর কবিতা-রচনার হাত কখনো দুর্বল হয়ে পড়ে নি, একটি ছোট্ট ঘটনায় তারও সবিশেষ প্রমাণ রয়ে গেছে। চেরাবাণ্ডারাজুর কবিতা সংকলন 'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার'[১]-এর প্রথম কবিতাটির বলিষ্ঠ অনুবাদ ছিল সমর সেনের। সে-ও তো মাত্র এই বছর সাতেক আগের কথা। অবশ্য এই অনুবাদটি পেতে সামান্য কসরত করতে হয়েছিল। একদিন কাগজের কাজ সেরে বসে আছেন। এমন সময় বললাম. আপনাকে একটি কবিতা অনুবাদ করার কথা বলব? কবিতার কথা উঠলেই সমর সেনের ছিল বাঁধাবাঁধা এক কথা—'দেখুন, কবিতা লেখা তো আমি ছেড়ে দিয়েছি ছেচল্লিশ সালে, আমার হাতে কবিতা আসে না।' আমিও নাছোড়বান্দা, বললাম, 'তা কেন? নর্মান বেথুনের বই (কল্যাণ চৌধুরীর অনুবাদ 'মহাচীনের পথিক')-এ কবিতাংশের অনুবাদ তো আপনারই।' জবাবে বলেছিলেন, 'দেখুন, কবিতাংশ বলা হচ্ছে বটে, কিন্তু ওখানে কবিতার নামগন্ধ নেই, আসলে গদ্য। তার চেয়েও বড় কথা, নর্মান বেথুন কোনদিন নিজের জন্য ভাবেন নি। তাঁর বই-এর অনুবাদ হচ্ছে, আমি সাহায্য করব না?' সুযোগ পেয়ে বললাম, 'বেশ তো, আমি একজনের কবিতা আপনাকে দেব, অবশ্য ইংরেজি অনুবাদে, তিনি আপনারও চেনা, তিনিও নিজের জন্য ভাবেন নি কোনদিন।' বলেই চেরাবাণ্ডা-রাজুর নাম যেই বললাম, অমনি ইংরেজি বয়ানটি হাতে নিয়ে তিনি চোখ বোলালেন একবার। স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় বললেন—'ঠিক আছে, চলবে। এখানে hill, boulder, stone-এর ছড়াছড়ি, আমিও যাচ্ছি বিহার, ওখানকার পরিবেশে মানাবে ভালোই।' অনুবাদ হাতে দিয়ে বলেছিলেন, করলাম তো, তবে ঠিক ভরসা পাই না, একবার পারলে মণিভূষণ বা শঙ্খবাবুকে দেখিয়ে নেবেন, ওঁরা চর্চার মধ্যে আছেন কিনা।' শঙ্খ ঘোষ সসঙ্কোচে একটি শব্দের পরিবর্তনের প্রস্তাব পাঠালে সমর সেন খুবই আনন্দিত হয়ে সেটা মেনে নিলেন। প্রমাণ হলো, লিখতে চাইলে সমর সেন স্বচ্ছন্দেই কবিতা লিখতে পারতেন। এবং কবিতা যে

১ বাংলায় অনূদিত এই কবিতা সংকলন প্রকাশ করেন বিপ্লবী লেখক শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের প্রস্তুতি সম্মেলনের আহ্বায়ক পরিষদ।

তিনি ভালোও বাসতেন—ওপরের তথ্যগুলিও তার প্রমাণ। আমরা তাই নির্দ্বিধায় বলতে পারি, কবিতা রচনা ও সাংবাদিকতা তাঁর কাছে পরিপূরক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কবিতায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে, শ্রমজীবী ও বিপ্লবী জনতার সঙ্গে যে আত্মীয়তা-বন্ধন গড়তে চেয়েছিলেন সমর সেন, সেই কাজ আরো সরাসরি করার সঙ্কল্প তিনি নিয়েছিলেন প্রথমে 'নাউ' এবং পরে 'ফ্রন্টিয়ার'-এ।

২

সমর সেন কবি হিসেবে বেশি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন, এ-কথার মধ্যে 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকা অস্বীকার করার প্রবণতা লক্ষণীয়। কবিদের উন্নাসিকতা এক জটিল রোগ। কবিতার জগৎ ছেড়ে চলে আসা সমর সেনকে ভালোবাসেন এমন কবিদের মনে সাংবাদিক সমর সেনকে অগ্রাহ্য করার ইচ্ছে আসতেই পারে। আবার সাংবাদিকমহলে হীনমন্যতাবোধ থাকাও বা বিচিত্র কি? প্রতিষ্ঠিত সাংবাদিকের জীবনকে একেবারে তুড়ি মেরে পেছনে ফেলে যে-মানুষটি একটি ষোল পৃষ্ঠার আধময়লা রঙের কাগজ চালিয়ে শেষজীবনটা আর্থিক অনটনের মধ্যেও দিব্যি কাটিয়ে দিলেন, তাঁর ঠোঁটের কোণের বাঁকা হাসি আর কলমের খোঁচা সংবাদপত্র জগতের পক্ষে কি কম অস্বস্তির কারণ? জরুরি অবস্থার কথা উঠলেই কাগজের মহলে উদ্বেগ দেখা যায়, কারণ ঐ সময় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু গণতন্ত্রের আইনী কাঠামো কি তার আগেও ধর্ষিত হয় নি—বিশেষ ক'রে '৭৪-এ রেলধর্মঘট কিংবা '৭১-এর বাংলাদেশ যুদ্ধের সময়? সমর সেনের এসব প্রশ্ন সাংবাদিককুলকে বিব্রত করেছে। '৭৭-এর পর শ্রীমতী গান্ধীর ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় এদেশের দৈনিক কাগজগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, সেইকথা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে যিনি কসুর করেন নি, তাঁর সাংবাদিকজীবনকে যতখানি পারা যায় হালকা করে দেখার পেছনে কী মতলব থাকতে পারে তা নিয়ে নতুন করে গবেষণার কি কোন প্রয়োজন আছে?

সাংবাদিক সমর সেনের ঐতিহাসিক ভূমিকা বাংলার পাঠককুলের অজ্ঞাত থেকে যেতে পারে ভাষার ব্যবধানগত কারণে। ইংরেজিতে প্রকাশিত তাঁর কাগজে অনেক মননশীল রচনা ছাপা হতো, কিন্তু ক'জনই বা খবর পেতেন তার? আর সম্পাদকীয় / ভাষ্য ('কমেন্ট') প্রবন্ধগুলি তো ডাইনে বাঁয়ে সমানে শত্রুকুলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। আগ বাড়িয়ে ঝগড়া করা, কাউকে গালাগাল দেওয়া সমর সেনের স্বভাববিরুদ্ধ। ব্যক্তিগত আচার আচরণে তিনি ছিলেন রীতিমতো বিনয়ী এবং নম্রস্বভাবের। তাই ব'লে ভণ্ডামি বরদাস্ত করা তাঁর ধাতে সইত না। বছর পাঁচেক আগের কথা। 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে বসে আলোচনায় স্থির হলো আর্থিক সঙ্কট ঠেকা দিতে এ্যাসোসিয়েট গ্রাহক করা হবে, সোজা কথায়, কিছুসংখ্যক

গ্রাহকের কাছে একশো টাকা বেশি চাঁদা নেওয়া হবে বছরে। সমর সেন একমনে শুনছিলেন আলোচনা, তারপর বাড়ির দিকে রওনা হবার আগে বললেন, 'দেখুন, তা যা-ই করুন, দেখবেন অমুক অমুক দুজনের কাছে আমার কাগজের জন্য যেন টাকা নেওয়া না হয়।' এঁদের একজন খ্যাতনামা বামপন্থী নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক ('নাউ'-এর দপ্তরে সমর সেনের সহযোগীও) আর দ্বিতীয় জন বিশিষ্ট বামপন্থী চিত্রপরিচালক ('ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় ছাপা হয়েছে তাঁর অনেক লেখা)। বাঁচোয়া বলতে হবে, এ্যাসোসিয়েট গ্রাহক হবার প্রস্তাব এঁরা কোনদিন দেননি। সমর সেনের এতখানি ব্যক্তিগত অপছন্দের কি কারণ সেটা অবশ্য পরে জানা গেল। বলেছিলেন, দেখুন কেউ ভয় পান, এ আমি বুঝি, কিন্তু বীরত্বের আস্ফালন করেন অথচ ভীতুর ডিম এমন লোককে আমি আদৌ পছন্দ করি না। তবে প্রয়াত সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন এঁরা দুজনই।

বামপন্থী হয়েও কেন সমর সেন এদেশের সরকারি বামপন্থীদের কাছে স্বীকৃতি পান নি, বাম-এস্টাব্লিশমেন্টের তিনি কেন চক্ষুশূল, রুশভক্তদের চোখে কেন কালা-পাহাড—এসব কথা বুঝতে হলে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্যায়ন জরুরি। 'নাউ' পত্রিকার প্রকাশ এমন একটা সময়ে যখন এদেশের সাম্যবাদী আন্দোলনে উগ্রজাতীয়তাবাদ তার শেকড় চারিয়ে দিতে পেরেছে। সাধারণভাবে, বামপন্থী মনোভাবের লোকজনও কিছু পরিমাণে বিভ্রান্ত। কমিউনিস্ট দলের ভাঙনের চরিত্রটাও স্পষ্ট নয় তেমন। সব মিলিয়ে একটা সঙ্কটের পর্ব। ওরই মাঝে রুশ চীন দুই পার্টির মতাদর্শগত বিরোধ, চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব এবং ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের প্রবল জোয়ার। এই সময় 'নাউ' বামপন্থীদের কাছে হয়ে উঠল বাইবেল। সেই সময়কার 'নাউ'-এর অনেক ভাষ্য ঘরোয়া জটলাতেও আলোচিত হতো।

এমন সময়ে ভারত-পাক যুদ্ধ শুরু হল, তারই পাশাপাশি ঘটল ভয়াবহ মূল্য-বৃদ্ধি। ব্যাপক গণ-অসন্তোষের সুযোগে বাংলা কংগ্রেসের হাত ধরে ক্ষমতায় এলেন বামপন্থীরা। সারাদেশে কংগ্রেসের সংগঠনে তখন চিড় ধরেছে। বামপন্থী-দের এই মহানন্দের দিনে 'নাউ' কিন্তু তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করে দিয়েছে, যুক্তফ্রন্টের ঐক্য যে কত ঠুনকো, কেন যে তা টিঁকতে পারে না এসব ইঙ্গিত পরি-বেশন করেছে যথাযথ নিষ্ঠার সঙ্গে।

বিশ্ব-ইতিহাসে তো বটেই, ভারতীয় রঙ্গমঞ্চেই বা ঘটনার অভাব কোথায়? ১৯৬৭-র নকশালবাড়ি আন্দোলনের এক বছর বাদে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর জন্ম। বামেরা তখনো সমর সেনের উপর ততখানি বিরূপ ছিলেন না। এমন কি, চেকোশ্লোভা-কিয়ায় রুশদের হস্তক্ষেপের কড়া সমালোচনা সত্ত্বেও। কিন্তু তার পরই বিধি হলো

বাম। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকার ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল্‌স্ দিয়ে কৃষক-আন্দোলন দমনে নামলে সমর সেনের বিবেক সেটা মেনে নিতে পারে নি। 'ফ্রন্টিয়ার'-এ তার সমালোচনা হয়েছে বেশ জোরালো ভাষায়। তাছাড়া নকশালী ধাঁচের আন্দোলনের খবর বেরোতে থাকে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায়, ছাপা হয় সি. পি. এম.-এর কর্মসূচীর উপর আলোচনা। সমর সেনের প্রতি সরকারি বামেরা রীতিমতো রুষ্ট হন এই সমস্ত কারণে।

অন্যায়ের সমালোচনায় কেউ অখুশি হলে সমর সেনের কাগজ তাঁদের খুশি করতে কি আবার উল্টোগীত গাইবে? বলা বাহুল্য, তা কখনোই হবার নয়। অত্যাচারী কিংবা শোষকের রং যাই হোক, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর চোখে তারা সমান দুশমন। ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন যে-বিচারে ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দনীয়, সেই একই বিচারে রুশদের আফগানিস্তান আগ্রাসনও তার কাছে নিন্দার্হ। যে-ভিয়েতনামী নেতৃত্বকে সমর সেন সেলাম জানান তাঁদের বীরত্বপূর্ণ মুক্তিসংগ্রামের জন্য, সেই একই নেতৃত্বকে তিনি কাম্পুচিয়ায় হানাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নিন্দা করতে ছাড়েন না। গ্রেনাডায় মার্কিন আগ্রাসন, ইস্রায়েলের জঙ্গী যুদ্ধবাজদের মার্কিনী মদত কিংবা ইথিওপিয়ায় ইরিট্রিয় মুক্তিসংগ্রাম দমনে রুশদের মদতদান—'ফ্রন্টিয়ার'-এর বিচারে সবকটিরই তুল্যমূল্য, একই ধরনের জঘন্য কাণ্ড। মুক্তিসংগ্রাম মাত্রেই সমর্থনযোগ্য, আর যারাই তার টুঁটি টিপে ধরবে তাদের বিরুদ্ধাচরণ করাই একমাত্র সঠিক কাজ—এই বোধ 'ফ্রন্টিয়ার'-কে বাঁচিয়ে রেখেছে। 'ফ্রন্টিয়ার' শ্রেণীসত্যে বিশ্বাসী।

মরিচঝাঁপিতে উদ্বাস্তুদের উপর বামফ্রন্ট সরকারের নির্যাতন, সিদ্ধার্থ রায়ের আমলে বামপন্থী নিধন ও গণহত্যা, অন্ধ্রের রামা রাও-আঞ্জাইয়া-ভেঙ্গল রাও-দের কমিউনিস্ট বিপ্লবী নিধন, বাইলাডিলা কিংবা কানপুরে শ্রমিক হত্যা—এ সমস্ত ঘটনাকে সমর সেন একই চোখে দেখতেন। যাঁরা নিজের নিজের দলের কুকর্ম কুযুক্তির দোহাই পেড়ে আড়াল করতে চান, রণকৌশল কিংবা বাস্তব অনিবার্যতার কথা বলে তাকে সমর্থন করেন, তাঁদের পক্ষে সারাজীবন চেষ্টা করলেও সমর সেনের এই ন্যায়-অন্যায়বোধের মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

দেশ ও জাতির সঙ্কটময় মুহূর্তে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন বেশি বেশি, এমন কি তেমন কোন অস্বস্তিকর কথা কানে উঠলেও যাঁরা ভান করে থাকেন না শোনার, তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, পুলিশীতাণ্ডবের যুগে, সত্তরের আগুনঝরা দিনগুলিতে সমর সেন কোন্ দুর্জয়সাহসের জোরে তাঁর কাগজ চালাতেন! সেন্সর-এর খড়্গকে উপেক্ষা ক'রেও কিভাবে মাথা উঁচু করে কাজ করে যাওয়া যায়, জরুরি অবস্থার সময়ের 'ফ্রন্টিয়ার' তার নজির হয়ে থাকবে।

এশিয়ার মুক্তিসূর্যের অনুগামীদের যিনি 'মাফিয়া' বলে বারবার উল্লেখ

করতেন,[১] জয়প্রকাশের সম্পূর্ণ বিপ্লবের তত্ত্বকেও যাঁর অন্তঃসারশূন্য মনে হতো,[২] সেই সমর সেনকে এদেশের বুদ্ধিজীবীকুলের দক্ষিণপন্থী অংশ যে ভালো চোখে দেখবেন না, এতে অবাক হবার কি আছে? একইভাবে, বামপন্থীদের একটা বড়ো অংশও সমর সেনের প্রতি বিরূপ। একসময় মস্কোয় থাকলেও, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, এবং পরে আফগানিস্তানে রাশিয়ার অনুপ্রবেশকে যিনি আগ্রাসন বলে চিহ্নিত করেন, শ্রীমতী গান্ধীর মদতদাতা হিসেবে রুশ কাবুলিওয়ালাদের[৩] সমালোচনা যাঁর লেখায়, এ দেশের রুশভক্তদের আমন্ত্রণে রুশীরাও এদেশে ঢুকবে নাকি এমন প্রশ্ন করতে যাঁর সঙ্কোচে বাধে না[৪], সি.পি.এম. পলিটব্যুরোর বিশ্লেষণকে যিনি বিদ্রূপের খোঁচায় বিদ্ধ করেন, আর যাই হোক, 'মার্কসবাদী'র শিরোপা তাঁর প্রাপ্য হতে পারে না! বিশেষ করে তাঁর স্বর আবার যখন বেশ নরম 'উগ্রপন্থী হঠকারীদের' সমালোচনার বেলায়![৫]

কমিউনিস্ট বিপ্লবীদের মহলে অনেকেই যেমন তাঁকে সম্মান দিয়ে থাকেন তেমনি আবার অনেকে মনে করেন যে তিনি কিছু বেশি মাত্রায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ছিলেন। 'ফ্রন্টিয়ার'-কে বিভ্রান্ত বলেও গালি দেন অনেকে। কারণ, তাঁদের মতে, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর কোন সম্পাদকীয় নীতির বালাই নেই, সমর সেনের কাগজ চলতো তাঁরই মর্জিমাফিক। এই সমালোচনা একেবারে ভিত্তিহীনও হয়তো নয়। সুতরাং মার্কসবাদে প্রত্যয় থাকলেও সমর সেন শেষ পর্যন্ত থেকে গেলেন ব্যক্তি; তাঁর ঠাঁই বোধ হয় কোন দলেও হতো না। এত স্পষ্টবাদী লোককে নিয়ে, আর যাই চলুক, দল চলে না। জনতার হয়ে কথা বললেও সমর সেন তাই রয়ে গেলেন একক; একক প্রতিবাদী বিদ্রোহী, তথা কথিত বাম মহলের অচ্ছুৎ!

কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবী মহল সমর সেনকে চিনতে ভুল করলে তাঁদের অন্যায় হবে। তাঁদের প্রতি সমর সেনের সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল সত্তরের রক্তঝরা

১ এমন কি, ১৯৮০-তে ইন্দিরার বিজয় প্রায় সুনিশ্চিত জেনেও সমর সেন লিখলেন: **'Not that Mrs Gandhi and her men (we'd better drop the word 'mafia' now)..." "What a Rise", Editorial, (January 12, 1980).**

২ **Comment on J. P. (*Frontier*, October 20, 1979).**

৩ **"Interlude", Editorial, (January 5, 1979).**

৪ **"Russians are coming", Comment, (tJanuary 5, 1979).**

৫ **"Hotting up", Comment, (January 12, 1979)** রুশপার্টির নেতৃত্ব শোধনবাদী হলেও তার আফগানিস্তান নীতি বৈপ্লবিক—সি. পি. এমের এই বিশ্লেষণের সমালোচনা করে এই ভাষায় সমর সেন লেখেন: **"A revisionist leadership pursuing a revolutionary foreign policy is a dialectical wonder that the C.P.M. Politbureau famous for its instant sessions and resolutions has been offering whenever it has a chance."**

দিনগুলিতে। সারা দেশে নকশালপন্থা ব্যাপারটাই তখন এক প্রচণ্ড ভীতির বিষয় ও আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু অথচ 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় আন্দোলনের মত ও পথকে ঘিরে বিতর্কমূলক লেখা বেরিয়েছে একের পর এক। কম সাহসের কথা এটা নয়।[১]

কিন্তু কোত্থেকে পেতেন তিনি এতখানি সাহস? শুধু আপসহীন মনোভাবের কথা বললে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হয় না। সমর সেন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবেই। একজন বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী যে-সাহসে বলীয়ান হয়ে আসন্ন সমাজ-বিপ্লবের শরিক হন, সমর সেনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সেই একই সাহস।

'ফ্রন্টিয়ার'-কে অনেকে লক্ষ্যশূন্য, উদ্দেশ্যবর্জিত বলে সমালোচনা করে থাকেন শুনেছি। সেই সমালোচকদের অতি সত্বর সমর সেনের কয়েকটি লেখা পড়া দরকার। একটি ১লা সেপ্টেম্বর ৭৯-তে "Out in the Rains" শীর্ষক সম্পাদকীয়—জনতা সরকার নেই, পার্লামেণ্টে আবার নতুন করে ভোট হবে, কিন্তু তার দ্বারা দেশের মধ্যকার দুর্নীতি, মুদ্রাস্ফীতি, প্রশাসনিক অপদার্থতা এসব তো আর ঘুঁচবে না, তাহলে জনগণের এখন কী করণীয়? সমর সেন লিখলেন, কাজটা খুব কঠিন, জনগণকে বোঝাতে হবে যে নোংরা আঁস্তাকুড় তাঁরা পরিষ্কার করতে পারেন অন্য উপায়ে, যদি আজও না হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে। দ্বিতীয় যে-লেখার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেস-এর উপর লেখা সম্পাদকীয় "11th Congress" (*Frontier*, August 27, 1977)। সেখানে সমর সেন ক্ষোভের সঙ্গে লিখছেন, মাওপন্থী-র‍্যাডিক্যালরা এদেশে ভাগ হয়ে আছে ছোট ছোট টুকরো গোষ্ঠীতে, সবাই আবার নিজেকে সাচ্চা বলে দাবি করে, তাদের উচিত একজোট হওয়া, কেননা পরিস্থিতি এখন বিস্ফোরণের মুখে, এসময় একটা পার্টি চাই যে অনুঘটকের কাজ করবে। তৃতীয় আর একটি সম্পাদকীয়ের কথা উল্লেখ করা যায়। সমর সেনের মন বেশ বিমর্ষ। চিকমাগালুরের জনগণ উপনির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধীর ঘৃণ্য ক্লেদাক্ত পার্টিকে ("syphilitic party of Mrs Gandhi") ভোট দেবে কিনা, কাঁহাতক এইসব ব্যাপার নিয়ে একই কথার পুনরাবৃত্তি আর পোষায়? এই সময় সম্পাদকীয় প্রবন্ধের শেষ

১ একই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় Marcus Franda-র লেখায়: "That so many controversial articles could appear in the pages of *Frontier* during precisely the period when Naxalism was such a red herring for the police and the state and Central Government was a tribute to the courage of Samar Sen and his associates". "Babes in arms" প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত (*New Delhi*, October, 1978).

অনুচ্ছেদে লেখা হলো ক্ষোভের সঙ্গে, বিপ্লবী বিকল্পটাই বা এখানে কোথায়? তারা তো খুবই দুর্বল, এখানে ওখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে।[১]

এবার কেউ যদি বলেন, সমর সেনের রাজনীতি ভ্রান্ত, ভুল জায়গায় তিনি তাঁর সমর্থন জানাতেন, আপত্তি নেই। কিন্তু তাঁর সাংবাদিকতা উদ্দেশ্যবর্জিত বললে তার প্রতিবাদ করতেই হবে। একবার বসন্তের বজ্র নির্ঘোষ সমর সেনকে যথেষ্ট উৎসাহিত করেছিল। তবে সংগ্রামে আঘাত আসায় তিনি ভেঙে দুমড়ে যে একেবারে শেষ হয়ে যান নি সেটা বেশ বোঝা যায় যখন 'ফ্রন্টিয়ার'-এর দশ বছর পূর্তিতে তিনি লিখলেন, কাগজ বের করার এখনো প্রয়োজন, গড়িয়ে গড়িয়ে চলা।—কি আর করা যাবে? অনেক ক'টি আশাই তো গুঁড়িয়ে গেল অতীতের এই ক'টা বছরে। নিউজ প্রিন্টের দাম বাড়ছে, অসংখ্য ছোটখাটো সমস্যা বিশৃঙ্খলার ঝামেলা তৈরি করে, আমাদের সেজন্য হয়তো খুব পরিষ্কার দৃষ্টিশক্তি নেই। কিন্তু তবু তো বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের অপেক্ষায় থাকতে হবে, যদিও সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ সময় এখনো আসেইনি। "The best is to bungle along, hoping and waiting for Spring thunder, though the worst is perhaps yet to be" ("Barren Leaves?", *Frontier*, April 15, 1978)। সম্পাদক সমর সেন যে-উদ্দেশ্য মাথায় রেখে তাঁর কাগজ বের করতেন, সেই সামাজিক-রাজনৈতিক বিপ্লবের সম্ভাবনা তিনি দেখতে পেতেন না কোথাও তাঁর চারপাশে। তার ফলে কখনো সখনো খুব অস্পষ্ট ইঙ্গিতে লেখায় ছেদ টানতেন, একজন বিচ্ছিন্ন মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বোধ হয় সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে তারিফ করতেই হবে, সমর সেন তাঁর লেখায় কোনদিন বিপ্লবী সংগ্রামের বা শ্রমজীবী জনতার বিরোধিতা করেন নি।

একবারই এর ব্যতিক্রম ঘটেছিল 'ফ্রন্টিয়ার'-এর এক সম্পাদকীয় লেখায়।[২] তখন কলকাতায় ভয়ঙ্কর লোডশেডিং, বাড়িতে সন্ধেবেলায় লেখা দেখতে পারেন না কেরোসিনের আলোয়, ওদিকে বেয়াড়া গরম, কোন দিন সারারাতও চলে লোডশেডিং, মাঝে মধ্যে জলসরবরাহ হয় না ঠিকমতো, কাগজও ছাপা হয় না

[১] We write at a time when a revolutionary alternative is no doubt growing but at a very feeble pace in scattered pockets and with bewildering different dictions with minds glued to what is happening in China. Our tragedy is that, like our dependence on the English language, our radical political workers depend too much on experiences that their models are going through.—"Much Ado" Editorial (*Frontier*, December 2, 1978).

[২] "Shades of Power", May 5, 1979.

প্রেসে বাঁধাধরা নিয়মে, আবার নির্দিষ্ট দিনে পোস্ট অফিসে কাগজ জমা না দিলে ডাকবিভাগের কনসেসনও উঠে যাবার যোগাড়; ঠিক একই সময় ব্যাঙ্কেও কিছু বাইরের ড্রাফট্ ভাঙানো নিয়ে ঝামেলা বেশ জট পাকিয়েছে। এমন সময় ঐ সম্পাদকীয়তে সমর সেন লিখলেন, এবার একশ্রেণীর কেরানী এবং শ্রমিকদের সম্পর্কে কিছু তিক্ত সত্য না বললে আর নয়, কাজে ফাঁকি দেওয়াটা কোন রাজনীতিক বিকাশের লক্ষণ নয়। লিখতে গিয়ে ডোবালেন গৌরীদাকেও[১]। গৌরীদা ঐ সময় দুর্গাপুরে সরকারি কলেজে পড়াতেন। নাম না করে সমরবাবু লিখলেন, এই পত্রিকার এক বন্ধু, একজন মার্কসবাদী লেনিনবাদী, দুর্গাপুরের এক অধ্যাপক তিনিও বলেছেন, দুর্গাপুরের শ্রমিকরাও কাজে ফাঁকি দেয়। বাস, আর যায় কোথায়? সমর সেন লিখেছেন এই কথা! এ নিয়ে অনেক জায়গায় কানা-ঘুষো, অনেক কথাই শোনা গেল। অবশেষে আশীষ লাহিড়ী প্রতিবাদ করে এক জোরালো বিশাল চিঠি[২] লিখে এই পেটি বুর্জোয়া সুলভ ভাসাভাসা বিচারের উপর আক্রমণ হানলেন। এ সমাজে শ্রমিকদের কাজের প্রতি অনীহা যদি এসেই থাকে, তাহলে মূল কারণটি কোথায় তার গভীরে যাবার অনুরোধ জানালেন শ্রীলাহিড়ী, একই সঙ্গে নিজেও তার একটি মার্কসবাদসম্মত ব্যাখ্যা পেশ করলেন। ব্যাপারটা তখনকার মতন চুকলো।

সমর সেনের এই হচ্ছে মোটের উপর রাজনৈতিক পরিচয়। অতীতে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য তিনি কখনও ছিলেন কি-না, তার চেয়েও বড় কথা তিনি আজীবন কমিউনিস্ট মতাদর্শেরই সেবা করে গেছেন। একক চিন্তায় নিজেই ঠিক করে নিয়েছেন পথ হিসেবে কোন্‌টা ভুল আর কোন্‌টাই বা সঠিক।

লেখকের বিচার হয় লেখার গুণ দিয়ে, পরিমাণ দিয়ে নয়। সমর সেন কত-টুকুই বা লিখতেন? তবু ঝরঝরে গদ্য যে মস্ত আর্ট তার এক উদাহরণ তাঁর লেখা। আস্ত একটা সম্পাদকীয় লিখতে তাঁর বড়জোর লাগতো আধঘণ্টা। কলমের ডগা থেকে বেরিয়ে আসতো ঝরঝরে ভাষ্য, রাজনৈতিক বিচারে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও তার মধ্যে থাকতো উপভোগ্য রসের স্পর্শ। সামান্য দু-চার কথার আঁচড় টেনে কত তাৎপর্যপূর্ণ লেখা যে সমর সেন লিখতে পারতেন, সেটা সত্যিই না পড়লে বোঝা যায় না। তবে এও ঠিক যখনি কোথাও নিপীড়নের ঘটনা ঘটত (যেমন, মরিচঝাঁপির উদ্বাস্তু বিতাড়ন, কাম্পুচিয়া ও আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব হরণ, চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ার হস্তক্ষেপ, কলকাতায় তথা পশ্চিমবাংলায় শ্বেত সন্ত্রাস কিংবা চারু মজুমদার-হত্যার ঘটনা) তখনই সমর সেনের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ

১ অধ্যাপক গৌরীপ্রসাদ ঘোষ বেশ কিছু প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় / ভাষ্য লিখেছেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ।

২ Ashis Lahiri, "Lashing the Culprits", Letter, *Frontier*, May 26, 1979.

ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, আক্রমণের চোখা চোখা বাণে সজ্জিত হয়ে উঠতো। অন্যদিকে পরিস্থিতি যখন তুলনায় বেশ শান্ত, তখন কিন্তু সমর সেনের লেখা নেহাৎ-ই সাদা-মাটা।

শুধু লেখা নয়, সম্পাদনাও করে যেতে হয়েছে তাঁকে জীবনের শেষ তেইশটি বছর। শেষ তিনটি বছর কিছুটা ব্যতিক্রম হয়তো। শারীরিক অসুস্থতা এবং প্রিয়জন হারানোর ব্যথা তাঁর কর্মক্ষমতা নিঙড়ে নিয়েছিল অনেকখানি। সমাজ-বদলের যে-স্বপ্ন তিনি দেখতেন, অভিজ্ঞতায় তা-ও যেন আর খুব কাছের ব্যাপার বলে মনে হচ্ছিল না। এই সময়টুকুর কথা বাদ দিলে জীবনের দুইদশক কাল সম্পাদকজীবনে সমর সেনকে ঘিরে অনেকেরই অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। আমার সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ '৭৬-এ। সেই অর্থে তাঁর সম্পর্কে কতটুকু লেখারই বা অধিকার আমার?

তখন অনুশাসনপর্বের শৃঙ্খলা যথেষ্ট শিথিল। তলব এলো সোমেশ্বর ভৌমিকের মারফত, তাঁর কাগজের একটি রচনাসংকলন সম্পাদনার (পরে ঐ সংকলন দুই খণ্ডে 'নকশালবাড়ি এ্যাণ্ড আফটার'—এ 'ফ্রন্টিয়ার এ্যান্থলজি' নামে প্রকাশিত হয়)। 'নাউ' ও 'ফ্রন্টিয়ার'-এর নিয়মিত পাঠক, সাকুল্যে এই আমার পরিচয়। এর আগে মৌখিক আলাপ হয় নি একবারও। সুতরাং যেতে হলো যথেষ্ট শ্রদ্ধা মেশানো ভয় নিয়ে। বাইরের একটা গাম্ভীর্যের আবরণ তিনি সরিয়ে ফেললেন মুহূর্তে। স্বচ্ছন্দ কথাবার্তায় হয়ে উঠলাম, তাঁর কাগজের এক বন্ধু—'এ ফ্রেণ্ড্ অফ্ ফ্রন্টিয়ার'।

'এত বড় একটা আন্দোলনের কোন রেকর্ড থাকবে না? এত ত্যাগ এত বীরত্ব, এ কি কম প্রাণবন্ত ব্যাপার?' সমর সেনের এই কথায় একবাক্যে রাজি হয়ে গেলাম, নকশালবাড়ি আন্দোলন-বিষয়ক রচনা সঙ্কলন তৈরির কাজে লেগে পড়লাম তার পরদিন থেকে।

প্রথম প্রথম কাগজের অফিসে খুব বেশি কেউ আসতেন না, ঐ সময় প্রায়ই আসতেন প্রবোধচন্দ্র দত্ত, গৌরীপ্রসাদ ঘোষ এবং রতন খাসনবিশ। আস্তে আস্তে করে আসর বেশ জমজমাট হয়ে উঠতে থাকলো কিছুদিন বাদে। আমিও একদিন সাহসে ভর করে বললাম—'ফ্রন্টিয়ার' হাতে পেলে আমরা আগে প্রথমেই পড়তাম চিঠিপত্র, তারপর সম্পাদকীয় 'ভাষ্য (কমেন্ট), এরপর তেমন তেমন লেখা পছন্দ হলে সেগুলি পড়তাম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। আজকাল আর 'কমেন্ট' বেরোয় না কেন?' বেশ কিছুক্ষণের জন্য যেন, সমর সেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন বললেন তারপর—'কি আর করি, সবই যেন কোথায় হারিয়ে গেল। আচ্ছা দেখি'। ব্যস, পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হলো 'কমেন্ট' (ভাষ্য) ছাপার কাজ। স্বভাবে রীতিমতো জেদী হলেও সমর সেন জানতেন, অন্যের কথার মর্যাদা কিভাবে দিতে হয়। তাঁর কাগজ আরো ভালো কি করে করা যায়, কেউ তাঁকে সে বিষয়ে পরামর্শ দিলে তিনি কোনদিন

উড়িয়ে দেন নি, চেষ্টা করতেন কতটুকু কি করা যায়। একি খুব কম গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয়?

সমর সেন ছিলেন একেবারে ঘরোয়া মানুষ, আমলাতান্ত্রিকতা বরদাস্ত করতেন না। তাঁর কাগজে লিখতে গেলে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তকমা লাগতো না, এমন কি, সম্পাদকীয় বিভাগে লিখতে গেলেও কোন বিশেষ ট্রেনিং-এর দরকার পড়তো না। অনেক সময় দূর থেকে কেউ চিঠি লিখেছেন, আর সেই চিঠিকেই ভাষ্যের মর্যাদা দিয়ে ছাপা হয়েছে। '৭৭-এ জেল থেকে বেরিয়ে ভবানী চৌধুরী এলেন সমর সেনের সঙ্গে দেখা করতে, অমনি তাঁকে এনে বসানো হলো সহযোগী হিসাবে। অদ্ভুত ধরনের এক সরল অনাড়ম্বর ব্যক্তিত্ব এই ভবানী চৌধুরীর। দীর্ঘ দুই দশক কালের বেশ সাংবাদিকতার জীবন, '৭১-এ স্টেটস্‌ম্যানের চাকরি থেকে ইস্তফা, তারপর কমিউনিস্ট বিপ্লবী। '৭৪ থেকে '৭৭ জেলে কাটিয়ে এলেন 'ফ্রন্টিয়ার'-এ। সমর সেন ও ভবানী চৌধুরীর মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা এবং শ্রদ্ধার সম্পর্ক এই সময় 'ফ্রন্টিয়ার'-কে আবার শক্ত পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করে। কত কাঁচা লেখাই যে স্রেফ সম্পাদনার জোরে উতরে গেল তার আর ঠিক নেই। কাগজের নিয়মিত কাজ ছাড়াও 'ফ্রন্টিয়ার' রচনাসংকলন ইত্যাদিকে সংশ্লিষ্ট অন্য সবার চাইতে সময় দিলেন বেশি, কিন্তু শর্ত, কোথাও নামোল্লেখ চলবে না। গোষ্ঠীরাজনীতির যুগে কাগজের কাজে তিনি যে গোষ্ঠীসঙ্কীর্ণতার কত উর্ধ্বে উঠেছিলেন সে কথা বোধ হয় তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীরাও একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। যাক্ গে, ঐ সুখের সংসার টেকে নি বেশিদিন। বছর তিনেক এখানে কাটিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আকর্ষণে ভবানী চৌধুরী কাগজ ছেড়ে দেবার মনস্থ করলেন। যাবার আগে প্রস্তাব দেন তিমির বসুকে সহকারী সম্পাদক করা হোক, পত্রিকার সাংগঠনিক দিকটা তিনি দেখতে পারবেন, আর্থিক জট কেটে যাবে। যেই বলা, অমনি কাজ। পরের সংখ্যা থেকে তিমির বসুর নাম ছাপা হতে লাগলো সহকারী সম্পাদক হিসেবে। এত দীর্ঘ কথার অবতারণা করলাম একটি সামান্য কথা বলার জন্যে। সম্পাদক সমর সেন কত সাদামাটা ঘরোয়া মানুষ, শুধু এই কথাটা বোঝাতে। কত সহজে অন্যদের কাছে টেনে নিতে পারতেন, অন্যদের পরামর্শ শুনতেন কত সরলভাবে, এই কথাগুলি থেকে তা কিছুটা আন্দাজ করা যায়।

সম্পাদনার কাজে তাঁর এই সহজ সরল আচরণের কথা তাঁর পত্রিকার লেখকদের অজানা নয়। মাস্টারি করাটা সমর সেনের স্বভাববিরুদ্ধ। কারুর লেখা পেলে কেটে-কুটে একাকার করতেন না, সামান্য দু' একটা শব্দ, কিংবা দু'-একসময় লেখার শিরোনামটা বদলে দিতেন, তাতেই লেখাটা একেবারে ঝলমল ক'রে উঠতো। নেহাৎ খুব কাঁচালেখা হলে অনেকসময় তিনি পারতেন না, ভবানী চৌধুরীর হাতে

তুলে দিতেন, পরের দিকে তিমির বসুকে একাজ করতে হচ্ছিল। রাজনৈতিক বিতর্কের লেখার বেলায়ও তাই। সমর সেনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী খুবই স্পষ্ট ছিল সন্দেহ নেই, তবে রাজনীতির জটিল তর্কে তাঁর উৎসাহ তেমন দেখা যায় নি, পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিতর্ক মাথায় ঢোকাতে চাইতেন না তেমন। মনে আছে, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর পাতায় ভারতের বুর্জোয়াদের পৃথকীকরণের প্রশ্নে জোর কদমে বিতর্ক চলেছে বেশ কিছুদিন ধরে—অশোক রুদ্র, সুনীতিকুমার ঘোষ এবং সুব্রত বল বিতর্কে রয়েছেন, একসময় রঞ্জিত সাউও লিখলেন। সমর সেনের অবস্থা তখন ন-সে-মি-বা। বললেন, 'আমি ক্লান্ত, এ সব আলোচনা আমার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়, তবু ছাপি, কেননা এর মধ্য দিয়ে অন্যেরা হয়তো কোন সত্যের সন্ধান পাবেন। আমার কথা যদি বলেন, এ সময় কোন জায়গার সংগ্রামের রিপোর্ট বা কোন এক গ্রামের জীবনযাত্রার সত্যিকারের ছবি পেলে বেঁচে যাই।' যে সময়টার কথা আমি লিখছি, অন্তত ঐ সময় পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখার চেয়ে সম্পাদক সমর সেন রিপোর্ট ছাপতেই বেশি উৎসাহ পেতেন। আমাকে অবশ্য কতবার বলেছেন, 'বামানা রেডিড্রকে লিখুন না, অন্ধ্রের কে নিপীড়নের রিপোর্ট বড় একঘেয়ে লাগছে, নিপীড়নের ঘটনা আসে আসুক, তবে সংগ্রামের পটভূমিকায়। নইলে বড্ড ক্লান্তিকর ঠেকে।'

সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পাদক সমর সেনের আচরণ নিঃসন্দেহে আদর্শস্থানীয়। 'ফ্রন্টিয়ার' অফিস চলতো মাস মাইনের তিনজন (পরে চারজন) কর্মচারী নিয়ে। এখানে ছিল না কোন মালিক-কর্মচারী সম্পর্ক, গড়ে উঠেছিল পারস্পরিক বিশ্বাস, সৌহার্দ্য ও নির্ভরতা। কাগজের আর্থিক দিকে নজর সমর সেন খুব একটা দিতে পারতেন মনে হয় না, কখনো-সখনো সামান্য যে ক'টি টাকা তাঁর মাইনে পাবার কথা, তা-ও জুটতো না। কিভাবে তাঁর সংসার চলতো সেকথা একমাত্র তাঁর জীবনসঙ্গিনী সুলেখা সেনই জানেন।

এত কষ্টের মধ্যে চললেও সমর সেনের মুখে এ নিয়ে কোন সরব আলোচনা শোনেন নি কেউ। তাঁর ছিল প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ, সেই কারণে কারুর কাছে টাকা চাওয়া দূরের কথা, তাঁর কাগজের জন্য বিজ্ঞাপন চাইতেও বাধতো। এমন কি, প্রতিষ্ঠিত লেখকদের কাছে লেখা চাইবার সময়ও তাঁর সঙ্কোচের সীমা ছিল না। বলতেন, 'সবাই তো চান তাঁর লেখা অনেকে পড়ুক, আমার কাগজের আর কি-ই বা বিক্রী? তার ওপর আবার লেখকদের এক পয়সাও দিতে পারি না।'—এমনি ধরনের আরো কত কথা। এত সব কথা বললেও কাগজটি কিন্তু বের করে গেছেন দায়িত্ববোধের তাড়নায়।

তবে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও সমর সেন ওয়াকিবহাল ছিলেন। খুব সম্ভব সেই কারণে বাংলা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনগুলির পরিপূরক ভূমিকার কথাও

তিনি আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতেন। কোন পত্রিকা অসুবিধেয় পড়লে তা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তাও হতো রীতিমতো। একটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা যাক। 'প্রস্তুতি-পর্ব' পত্রিকাকে কীভাবে আসন্ন সঙ্কট থেকে রক্ষা করা যায় একবার তাই নিয়ে তাঁর সুইনহো স্ট্রীটের বাড়িতে আলোচনা বসে। উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। আমিও আমন্ত্রিত। একে একে সবারই বক্তব্য ফুরোল। ম্লান আলোয় চা-চানাচুর খাওয়ায় আমরা তখন ব্যস্ত। বললাম, 'এবার সমরবাবু কিছু বলুন, তাঁর কথা আমরা শুনতে চাই।' একমনে এতক্ষণ আলোচনা শুনছিলেন সস্ত্রীক সমর সেন। আমার প্রস্তাব শুনে বললেন, 'প্রস্তুতিপর্ব-এর ভবিষ্যৎ কি হবে সে বিষয়ে আমি আর কি বলবো ? আমার তো সমাপ্তিপর্ব। আমি তো একসপ্তাহের বেশি ভাবতে পারি না। একটা সংখ্যা বেরুনোর পর পরের সংখ্যাটা কিভাবে বেরোবে বড়জোর সেটুকুই ভাবতে পারি।'

নিজের সম্পর্কে সমর সেন কতখানি উদাসীন ছিলেন দু-একটি ঘটনার উল্লেখে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থনীতিবিদ ডঃ অশোক মিত্র 'দ্য ট্রুথ ইউনাইটস্' বইটির সম্পাদনা করেছেন সমর সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে—এখবর পেয়ে তাঁকে জিগ্যেস করলাম বইটি কেমন হয়েছে ? হাসপাতাল থেকে তার মাত্র ক'দিন আগে ছাড়া পেয়ে এসেছেন 'ফ্রন্টিয়ার' অফিসে. চোখমুখ এমনিতেই ফ্যাকাশে। বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন আরো ফ্যাকাশে হয়ে গেল ! মুখের স্বাভাবিক হাসিটাও মিলিয়ে গেল, সসঙ্কোচে বললেন --'তাতে আমার কী লাভ বলুন ?' বলেই আবার স্বাভাবিক রসিকতায় ফিরে এলেন—'পাছে বইটির মরণোত্তর প্রকাশ (Posthumous publication) হয়ে যায়, তাই তাঁরা খুব তড়িঘড়ি নরম কাঁচা-বাঁধানো একখানা বই দিয়ে এসেছিলেন হাসপাতালে, এখনো খুলে দেখি নি।' আর একটি ঘটনার কথাও মনে পড়ে। সমর সেনের কিছু কবিতার ইংরেজি বয়ান চেয়ে কেরালার পিপলস্ কালচারাল ফোরাম একবার একটি চিঠি লেখেন। আমি তাঁর শরণাপন্ন হলে তিনি বললেন (প্রথমটায় মনে পড়ে নি বইটির কথা), 'আচ্ছা দাঁড়ান. অনেক বছর আগে একটা বই বেরিয়েছিল, অনুবাদ বোধ হয় ভালোই হবে. আমার আর পড়া হয় নি, আপনাকে এনে দেবো।' পরের দিন একটি সুন্দর মলাটের, লাল ফিতে দিয়ে বাঁধা বই এনে রাখলেন. যদ্দুর মনে পড়ে রাইটার্স ওয়ার্কশপের বই। পড়তে পড়তে একটা জায়গায় হঠাৎ খটকা লাগলো, দেখি 'কলের বাঁশি'র অনুবাদের জায়গায় রয়েছে flute। বলার সঙ্গে সঙ্গে সমর সেন যেন বেশ লজ্জায় পড়লেন। আমার হাত থেকে বইখানা নিয়ে পাঁচ-ছ'টি কবিতার অনেক ক'টি জায়গায় মার্জিনে পেন্সিল দিয়ে শুধরে দিলেন। হয়তো সমর সেনের বাড়িতে ঐ বই-এর মাঝে শুধরে দেওয়া শব্দগুলি এখনো খুঁজলে পাওয়া যাবে। কী আশ্চর্য এই মানুষটি ! নিজের কবিতার অনুবাদ কেমন হয়েছে সেটা খুলে

দেখার ইচ্ছেও এত ক'টা বছরে একবারের জন্যেও হয়নি ? আত্ম-উদাসীনতার এ-রকম দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে কি ?

আত্ম-উদাসীন বললেও বোধ হয় ঠিক বলা হয় না, সমর সেন ছিলেন পুরো-পুরি আত্মপ্রচার-বিরোধী। নিজের প্রসঙ্গ কোন ব্যাপারে আসতোই না, কিন্তু কেউ যদি কোন সূত্রে টেনেও আনতেন কোন কথা, অসামান্য দক্ষতায় সেই প্রসঙ্গ চাপা দিতেন তৎক্ষণাৎ। মনে পড়ে, এই কিছুদিন আগেকার কথা। **'A Babu's Tale'** শিরোনামে 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর ধারাবাহিক অনুবাদ বেরুচ্ছে তখন টেলি-গ্রাফ কাগজের রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রে। অনুবাদকের মুখবন্ধ পড়ে সমর সেনকে তাঁর বন্ধু প্রাক্তন আই সি এস ডঃ অশোক মিত্র কতখানি ভালোবাসতেন এবং একই সঙ্গে তাঁর কতখানি গুণগ্রাহী ছিলেন সেকথা বেশ স্পষ্ট নজরে পড়বে। কাগজের কাজের শেষে আমরা অল্পস্বল্প গল্পগুজব করতাম। একদিন এরকম একটা সময়ে বললাম, "'টেলিগ্রাফ' কাগজে আপনার 'বাবু বৃত্তান্ত'-এর অনুবাদ বেরোচ্ছে, দেখলাম। অশোক মিত্র মশাই আপনার বন্ধু জানি, উনি কি আপনার সহপাঠীও ?" পাছে নিজের কোন প্রসঙ্গ এসে যায়, সমর সেন অনর্গল বলতে শুরু করলেন—"জানেন, ওঁর মতো versatile লোক খুব কম হয়, কত বিষয়ই না উনি জানেন। ভাবুন 'ডেমোগ্রাফি' নিজে প'ড়ে তার উপর রীতিমতো পণ্ডিত, একি চাট্টি-খানি কথা ? সোভিয়েত বিজ্ঞান একাডেমির ডি.এস্‌সি.—ভারতীয়দের পক্ষে খুব দুর্লভ সম্মান, মহলানবীশ আর ইনি ছাড়া আর কেউ পেয়েছেন কি-না জানা নেই", ইত্যাদি কত কথা। বললেন, "আমি তো গেলাম শেষ হয়ে, নড়তে চড়তেই কত রোগ এসে ধরে, আর উনি হিল্লী দিল্লী ক'রে বেড়াচ্ছেন, ওঁর সঙ্গে আমার তুলনা ?" জানতে চাইলাম—'উনি কি আপনার সময় সেকেণ্ড হয়েছিলেন ?' প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে ব্যাগটি ঝুলিয়ে সমরবাবু উঠে পড়লেন বাড়ি যাবার জন্যে, বললেন—'ওটা কিছু নয়, উনি আমার চেয়ে তিন মাসের ছোট তো, তাই চার নম্বর কম পেয়েছিলেন', বলেই হনহন ক'রে নেমে গেলেন সিঁড়ি বেয়ে।

আত্মপ্রচার-বিরোধী, স্পষ্টবাদী, সর্বত্যাগী সমর সেনের নির্ভীক সাংবাদিকতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং আত্মমর্যাদাবোধ এ দেশের বুদ্ধিজীবীকুলে বিরল-দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর মৃত্যুতে এদেশ তার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে হারাল। যে-কোন রকমের নির্যাতন-অত্যাচারের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে হলে সমর সেনের সই ও সমর্থন চাইতেন সবাই, পেতেনও। ঐ সমস্ত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রিপোর্ট ও চিঠিও ছাপা হতো তাঁর কাগজের পাতায়।

এমন কথা উঠতে পারে যে, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আজ আর নেই, পরিস্থিতি এখন পাল্টে গেছে। যে জাতীয় তদন্তমূলক সাংবাদিকতায় 'ফ্রন্টিয়ার'-এর আগ্রহ, তার কদর আজ সর্বত্র, এমন কি দৈনিক কাগজেও। হয়তো

একথাও উঠবে, বিপ্লবী সংগ্রামে এখন ভাটা, কী দরকার তাহলে 'ফ্রন্টিয়ার' বের করার ?

ঠিকই, পরিস্থিতি এখন অন্যরকম। তা বলে কি জোয়ার সত্যি আসবে না কোনদিন ? আর এক বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের অপেক্ষায় না বসে থেকে উপায় কি ? অপেক্ষা যখন করতেই হবে, অনুশীলন তাহলে বন্ধ রাখলেই তো ক্ষতি শুধু শুধু বসে কাটালে বাত ধরবে শরীরে, মনেও। কিন্তু 'ফ্রন্টিয়ার' কি পারবে, সত্যিকারের তেমন পরিস্থিতিতে ঐতিহ্যের অনুসারী হতে ? এর উত্তর পাওয়া যাবে সমর সেনের লেখায় :

"If one gives up all hope one becomes a moron.

If one nurtures too much hope one becomes a fool."

—"Waiting for What ?", Editorial, *Frontier*, October 27, 1979.

—ভিন্ন প্রসঙ্গে বলা হলেও, আশা নিরাশার প্রশ্নে এই দুটি বাক্য একটি গভীর সত্যের ইঙ্গিতবাহী।

চিঠিপত্র

১

শ্রীযুক্ত সমর সেন
সাগরমান্না রোড বেহালা

কল্যাণীয়েষু,

সমর সেদিন তোমরা কবির দল এসে খুসি হয়ে গেছ শুনে আরাম বোধ করচি। তোমরা আতিথ্যের যতটা প্রশংসা করেচ তার যথোচিত কারণ খুঁজে পাচ্ছিনে। অল্পে খুশি হবার শক্তি যদি তোমাদের থাকে সে একটা দুর্লভগুণ বিশেষত বাংলা দেশে। আমাকে বোধ হয় আগে থাকতেই তোমরা দুর্দ্ধর্ষ দুর্জ্জন বলে কল্পনা করে এসেছিলে তারপরে যখন দেখলে মানুষটা নেহাৎ আপত্তিজনক নয় কেবল দোষের মধ্যে যাব তার সঙ্গে হাসি তামাসা করে থাকে, বয়স বিচার করে না, তখন নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলে। ঢুঁ খেয়েছিলে প্রশান্তের কাছে, তর্কের যোগ্য শিকার পেলে সে রেয়াৎ করে না—আমি হাসি, তর্ক করিনে। তোমাদের লেখায় "হাল্‌কা" কথাটা অত্যন্ত বেশি ব্যবহার করে থাকো, হাল্‌কা ঝড়, হাল্‌কা হাতি, হাল্‌কা ঢেউয়ে নৌকোডুবি, ইত্যাদি. আমাব সম্বন্ধে গদ্য কবিতা যদি লেখো তবে ঐ হাল্‌কা বিশেষণটা সহজে ব্যবহার করতে পারবে। ইতি ১৭ই বৈশাখ ১৩৪৫

তোমাদের
কবি অগ্রজ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২

সমর সেন
1/9 Prince Golam Md. Road,
Kalighat, Calcutta.

ওঁ

কল্যাণীয়েষু

তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে সে আমার অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারণের কাছে এর ম্যাপ এখনো স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয়নি স্থতরাং এখানে তোমার আসন অল্প লোকের কাছেই স্বীকৃত হোতে বাধ্য।

এখানকার পরিচয় ক্রমশ হয়তো প্রশস্ত হবে কিন্তু যে পর্যন্ত না হয় সে পর্যন্ত তোমার অভ্যর্থনা বিশেষ রসগ্রাহী মহলেই সংকীর্ণ হয়ে থাকবে—এ অনিবার্য। আমাদের রস সম্ভোগের অভ্যাস তোমাদের এ যুগের নয় ক্ষুণ্ন মনে এই কথা কবুল করে তোমাকে আশীর্বাদ জানাই। ইতি ১৫।৩।৪০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমর সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে

১

১৬ই এপ্রিল
বেহালা
সাগরমান্না রোড

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমার কবিতার বইএর এক কপি আপনার ঠিকানায় পাঠিয়েছি। আপনার কেমন লেগেছে জানতে পারলে বাধিত হব। আশা করি আপনার শরীব ভালো আছে। আমার নমস্কার জানবেন।

ইতি
বিনীত
সমর সেন

২

সাগরমান্না রোড, বেহালা
২২।৪।৩৮

শ্রীচরণেষু

শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় ফিরে এসে অশান্তিতে সময় কাটছে। ওখানকার কাঁকরের রক্তলাল সৌন্দর্য্য আপনার শান্তমূর্ত্তি এবং ললিত মধুর ব্যঙ্গ বরাবর মনে থাকবে।

অদূর ভবিষ্যতে আশা করি আপনার সাক্ষাৎলাভের সৌভাগ্য আবার হবে। আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে এবারে আপনাকে অনেক বিরক্ত করে এসেছি জানি,

তবু ভবিষ্যতে আবার বিরক্ত করার সৌভাগ্য এবং আনন্দ হতে নিশ্চয় বঞ্চিত হব না। জানেন ত আমরা পদ্মাপারের লোক, একবার প্রশ্রয় পেলে আর ছাড়তে চাই না।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত

সমর সেন

৩

সাগরমান্না রোড, বেহালা
৪।৫।৩৮

শ্রীচরণেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে ভারী ভালো লাগল, কারণ আপনার লেখা চিঠি আমি এই প্রথম পেলুম। কলকাতার বাসিন্দেদের রবীন্দ্রনাথের দুর্দ্ধর্ষতার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা আছে; আমারও কিছু ছিল, যদিচ আমি সহরের উপকণ্ঠে বেহালায় থাকি। ভুল ধারণা শান্তিনিকেতনে গিয়ে ভেঙেছে বটে, তবে অনেক হিসেবে আপনি যে দুর্দ্ধর্ষ সেটা ত অস্বীকার্য্য। 'যার তার' সঙ্গে হাসিতামাসা করলেও আসলে আপনি একান্তই সুদূর। এবং সুদূর তারকার জন্য আমাদের মত পতঙ্গের তৃষা মাঝে মাঝে হলে আশা করি নিশ্চয়ই মাপ করবেন। আপনার উপরে গদ্য-কবিতা লেখার সময় আপনার সহজ সুদূরতার কথাই প্রথমে লিখব। আমি কিন্তু কখনো 'হাল্‌কা' কথাটি কবিতায় ব্যবহার করিনি, বোধহয় নিজের কবিতা খারাপ অর্থেই হালকা বলে। শব্দটি বেশী ব্যবহার করলে স্বীকারোক্তির মত শোনাত।

বুদ্ধদেব বাবু শান্তিনিকেতন যাত্রা উপলক্ষ করে একটি ভ্রমণ কাহিনী লিখবেন। আমার 'বন্ধু' চিত্রকর কামাক্ষীবাবু এর মধ্যেই একটি ভ্রমণকাহিনী 'রংমশাল' পত্রিকায় লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আমিই পিছিয়ে পড়েছি কেননা আমার দৌড় ভাঙ্গা ছন্দ, কিম্বা বড় জোর পুস্তক-সমালোচনা পর্য্যন্ত।

কাল এখানে বেশ ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। ঝড়টা হিমালয় থেকে না সমুদ্রের দিক থেকে এলো সেই কথা ভাবছি। আশা করি আপনি ভালো আছেন। চিঠি লিখে বিরক্তি করছি, সেজন্য মাপ করবেন।

আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। ইতি

সমর সেন

৪

1/9 Prince Golam Md. Road,
Kalighat, Calcutta.
11.3.40.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আমার দ্বিতীয় কবিতার বই অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে আপনাকে পাঠাচ্ছি। আপনার সময়ের অত্যন্ত অভাব জানি, তবু 'গ্রহণ' আপনার কেমন লেগেছে জানতে পারলে বিশেষভাবে উপকৃত হবো।

আশা করি ভালো আছেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম নেবেন। ইতি

প্রণত
সমর সেন

১

Sagoremanna Road, Behala
24 Parganas.
31. 12. 35.

প্রিয় বুদ্ধদেব বাবু,

আমি এখনো কল্‌কাতায় আছি। এবারে আমার রাঁচী যাওয়া আর হোল-না। কারণ—অর্থাভাব। এখানে কয়েকদিন বেশ শীত পড়েছিল; কাল থেকে বৃষ্টিও [য] আরম্ভ হয়েছে। রাঁচী গেলে আমার অনেক সুবিধে হত, কিন্তু নিরুপায়।

কাল্‌কে সুধাংশুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার ঠিকানাটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম বলে এতোদিন চিঠি লিখ্‌তে পারিনি। আজ্‌কে সেটা হঠাৎ খুঁজে পেলাম। মাঝে আরো দুতিনজন কবিতার "Subscriber জোগাড় করেছি। শ্রী-হর্ষের সম্পাদক কয়েকটি করেছে; এবং করে দেবে বলেছে, যদি আপনি তাদের একটা "ভালো" লেখা দ্যান্। আমি কয়েকদিন Esplanadeএর Stall দেখিনি। তবে মনে হচ্ছে Stallএ এবার কোনো "কবিতা" দেওয়া হয়নি। অন্তত দিন আস্টেক [য] আগে পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি।

আপনারা কেমন আছেন লিখ্‌বেন। সম্প্রতি একজনের কাছে শুন্‌লাম যে নাম্‌কোমে রাঁচীর চেয়ে বেশী শীত পড়ে। খবরটা সত্যি হলে আপনাদের একটু অসুবিধে হবে নিশ্চয়ই। আপনারা রাঁচীতে যান্ নাকি? আপনাদের কথা ভেবে আমার মাঝে মাঝে বেশ হিংসে হয়।

মিসেস্ বোস্‌কে আমার নমস্কার জানাবেন। "মিস্ বোস" কেমন আছেন? আমার নমস্কার জান্‌বেন।

ইতি
আপনাদের
সমর সেন

২

C/o Station-master
Maheshmunda.
E. I. R.
19/5/38

প্রীতিভাজনেষু

কাল এখানে এসে পৌঁছেছি। পথে গরমের জন্য বিশেষ কস্ট [য] হয়নি ; থার্ড-ক্লাসে অসম্ভব ভিড় ছিল। ঘণ্টা পাঁচেক খাটি [য] কম্যুনিষ্টের [য] মতো খোট্টা মাড়োয়ারী humanityর গন্ধ সহ্য করেছি। মহেশমুণ্ডায় বলতে গেলে ঠাণ্ডাই আছে, তবে আপনাদের কিরকম লাগত জানিনা। বেলা দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত মহুয়াগাছের নীচে চেয়ারে বসে কাটাই, তবে দুঃখের বিষয় এক লাইন কবিতাও মগজে আসছে না। পড়াশুনোর প্রগতি মালগাড়ীর 'বেগে' এগুচ্ছে।

আপনারা যদি আসতেন তাহলে সময়টা ভালো কাটত। একটা ট্রাঙ্কে আপনি যে পাঠ্যপুস্তক লিখছেন তার মালমশলা নিয়ে এলেই পারতেন। পাঠ্যপুস্তকের কথাটা মিসেস বোস ফাঁস করে দিয়েছেন, যদিচ আমি অনেক আগেই আন্দাজ করেছিলাম। ওখানে জলঝড় কিরকম হচ্ছে ?

আমি এখনো দিনকতক মহেশমুণ্ডায় আছি। এখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা, আকাশের নীচে বিছানা পেতে ঘুমোবার আয়োজন করছি। এখানকার আকাশ এতো গভীর ও গম্ভীর যে না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আমরা আসছি বলে রাম একটা গরু খরিদ করেছে, তার নামকরণের ভার আমার উপরে। কী নাম দেবো ঠিক করতে পারছিনা। রবীন্দ্রনাথকে লিখবো নাকি ?

মিসেস বোস কেমন আছেন ? তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন। মিমির খবর কি ?

আমার নমস্কার জানাবেন। ইতি

সমর সেন

৩

C/o Station-master
Maheshmunda
P. O. Giridih 28/5/38

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কাল বিকেলে পেয়েছি। ভাবছিলুম যে আমার চিঠি আপনি

হয়ত পাননি। মাঝে দিন দুই জরে ভুগেছিলুম, এখন শরীর ভালোই আছে। তবে পুস্ট [য] হয়েছে কিনা বলতে পারিনা।

Suny [য] Park থেকে দিন তিনেক আগে কয়েকজন এসেছিলেন। ওঁদের বাড়ীর সকলে আপনাদের আসার সম্বন্ধে খোঁজ করছিলেন ; আমি খুব গম্ভীরভাবে প্রচার করে দিয়েছি যে আপনি ছেলেদের জন্য কী সব লিখছেন ; পরে বাংলা-ভাষায় ছেলেদের ভালো বইএর অভাব নিয়ে আলোচনা করেছি।

আজ সকাল থেকে বেশ বৃষ্টি [য] সুরু হয়েছে, কখন থামবে বুঝতে পারছিনা। পড়াশুনো প্রায়ই বাদ যাচ্ছে। এবারে পরীক্ষার ফল কী হবে জানিনা। কামাক্ষীর চিঠি পেয়েছি, অনেক কবিত্ব করে লিখেছে। ওখানেও মহুয়াগাছ আছে শুনে আমি নিদারুণ মর্ম্মপীড়া ভোগ করছি। আমি কবে ফিরব ঠিক নেই, খুব সম্ভব আরো দিন সাতেক পরে।

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা হয় না কি ? তিনি কেমন আছেন ? আমি বহুদিন খবরের কাগজ পড়িনি, পৃথিবীর খবর কিছুই জানিনা। আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপনটা সেজন্য দেখিনি।

মিসেস বোসকে আমার নমস্কার জানাবেন। ইতি

সমর সেন

Indian Affairs থেকে কোনো খবর পেয়েছেন ?

রাম তার নিমন্ত্রণ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছে।

৪

C/o Babu Panchanan Bhattacharya
Jamtara. E. I. R.
5/10/38

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার একখানা চিঠি ডালটনগঞ্জে পেয়েছিলুম। সেখানে যাওয়ার পর বাবার সংসারের কাজে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিলুম যে যথাসময় উত্তর দেবার অবকাশ পাইনি। আপনি বাঁচলে বাপের নাম, এই মহাজনবাক্য স্মরণ করে এখানে পালিয়ে এসেছি। জামতাড়া থেকে একদিন আসানসোল, আর একদিন মহেশমুণ্ডা গিয়েছিলুম। মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ন আবেগে ঘুরতে আর ভালো লাগছেনা। সুতরাং কয়েকদিন এখানেই কাটাব।

'কবিতা' পেয়েছি। আপনার দীর্ঘ সমালোচনা এখনো ভালোভাবে পড়তে পারিনি, পারিবারিক পরিশ্রমের জন্য সময়ের অভাবে। আমার ত মনে হয় আজকাল

গুরুদেবের বিরুদ্ধে যাই লিখুন না কেন তার একটা মূল্য আছে,—আশ্রমের মোহান্তের সমালোচনা সর্বদাই ভালো।

'চতুরঙ্গ' বেড়িয়েছে [য] কিনা জানিনা; আপনিও বোধহয় জানেননা। যদি বেরোয়, এখানে এক কপি পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে পারেন ?

কামাক্ষীবাবুর উপর নানাকারণে আমি একটু চটেছি। তিনি নিজেই আমার সঙ্গে ডালটনগঞ্জ আসার প্রস্তাব করে শেষের দিকে ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধের জন্য গয়ায় যেতে হবে ইত্যাদি দোহাই দিতে সুরু করেন। দোহাই দেওয়াটা আমি অপছন্দ করি, বিশেষ করে হিন্দুশাস্ত্রজনিত দোহাই। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'—গুরুদেবকে স্মরণ করি।

মিসেস বোস্ কেমন আছেন ? তাঁকে আমার নমস্কার দেবেন।

রামের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আপনার না যাওয়াতে রাম বিশেষ বিস্মিত হয়নি, কারণ আপনি যে কবি, এবং কবিদের রকমই যে আলাদা, সেটা রবীন্দ্রনাথের মতো রামনারায়ণও জানে।

মিঃ আইয়ুবের যাওয়ার কথা ছিল দার্জিলিঙে। তিনি গিয়েছেন না কি ?

আমার নমস্কার নেবেন। কবে ফিরছেন ? ইতি

সমর সেন

রবীন্দ্রনাথের নাম অনেকবার করেছি। আশা করি মনে করবেন না যে তাঁর সম্বন্ধে কোনো কমপ্লেক্স মনে বাসা বেঁধেছে।

৫

14/10/38 C/o Babu Panchanan Bhattacharya
Jamtara. E. I. R.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কাল পেয়েছি। স্নোভিউতে আপনাদের অসুবিধা হয়েছিল শুনে একটু আশ্চর্য্য হয়েছি। আমি যখন ওখানে ছিলুম, তখন অন্তত খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে হোটেলটি ভালোই ছিল। আপনাদের বর্ত্তমান বাসস্থানের কথা শুনে ঈর্ষান্বিত বোধ করছি। জলা পাহাড় ত শহর থেকে অনেক দূরে।

এখানে কয়েকদিন বৃষ্টির [য] পর রাত্তিরে ঠাণ্ডা পড়তে আরম্ভ করেছে। সময় ভালোই কাটছে। ঠিক কবে যে ফিরব তার ঠিক নেই। মহেশমুণ্ডায় একদিন গিয়েছিলুম, কিন্তু গিরিডি যাওয়া হয়ে ওঠেনি। শিগগিরই যাবো বোধ হয়। রাম এখন মহেশমুণ্ডায় আছে।

অশোকবাবু লক্ষ্ণৌ থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। 'চতুরঙ্গ' এক কপি পাঠাতে

আমাকে অনুরোধ করেছেন। 'চতুরঙ্গ' বেরিয়েছে শুনলুম। আপনি যা হয় বন্দোবস্ত করুন।

আপনার ফিরতে কি নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহ হবে?

জামতাড়ায় প্রতিদিন বিকেলে ওস্তাদী গান শুনি।

আমার নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

৬

প্রীতিভাজনাসু,

আমার চঞ্চলতার জন্য আপনারা চিন্তিত শুনে নিশ্চিন্ত বোধ করছি। বর্মা যাওয়ার পর আপনি যে প্রস্তাব করেছিলেন, তারই পুনরুক্তি করেছেন। কিন্তু সুদূর নেপাল কেন, সোনার বাংলার কোনো অধিবাসিনীকেই ঠিক করুন না! আমি ইতিমধ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করে একটি পাত্রী প্রায় ঠিক করে ফেলেছি, ফিরে গিয়ে দেখা হলে বিস্তারিত বিবরণ দেবো।

আমার প্রীতি-নমস্কার নেবেন। মিমিকে ভালোবাসা দেবেন। ইতি

সমর সেন

৭

26/10/38

C/o Babu Panchanan Bhattacharya
Jamtara. E. I. R.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি পরশু। আপনার দেওয়া 'কবিতা'র রাইটিং প্যাড ফুরিয়ে যাওয়াতে চুপচাপ ছিলুম। এখানে রোজ ডাকঘরে বেলা আটটা নাগাদ একবার যাই; চিঠি বিলি হবার পূর্বমুহূর্তগুলি বেশ রোমাঞ্চকর। যেদিন ভাবি যে আজ নিশ্চয়ই গোটা পাঁচেক চিঠি একসঙ্গে পাবো সেদিন বাড়ীর ঠাকুরের নামে হয়ত একটি চিঠি আসে। অধিকাংশ দিনই বিপ্রলব্ধ হয়ে ফিরতে বাধ্য হই।

'চতুরঙ্গ' এখনো পাইনি। মনে হচ্ছে এসপ্লেনেডের স্টলেই প্রথম এই পত্রিকাটির বাহ্যরূপ দেখবার সৌভাগ্য হবে। ভেতরের ব্যাপার আপনি না ফিরলে আর দেখা হবেনা।

কলকাতা ফেরার যদিচ কোনো আগ্রহ নেই, তবু ৩০শে অক্টোবরের মধ্যে

ফিরব। কাজের সঙ্গে এতোদিন যে মধুর শ্বশুরভাদ্রবৌ সম্পর্ক ছিল সেটা ভাঙতে হবে। শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করে টাকা রোজগারের কর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবো।

মিসেস্ বোস কেমন আছেন ? তাঁকে নমস্কার দেবেন। মিমির গাল কতোখানি লাল হলো ?

নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

৮

C/o Babu Panchanan Bhattacharya
Jamtara.
25.11.38

প্রীতিভাজনেষু,

কোনো অনিবার্য্য কারণে মঙ্গলবার রাত্রের ট্রেনে হঠাৎ আমাকে এখানে চলে আসতে হয়েছে। সকালের দিকে মিহিজাম স্টেশনে কামাক্ষী করুণভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখে করুণার উদ্রেক হওয়াতে ওকে ডাকতে হয়েছিল। কাল মিহিজাম গিয়েছিলুম, কামাক্ষীও এখানে এসেছিল। ওর কাছ থেকে জামতাড়া-রহস্যের সমাধান করতে আশা করি চেষ্টা করবেননা।

আমি জামতাড়ায় এসেছি, সেটা অনুগ্রহ করে কাউকে জানাবেন না। বাড়ীতে এবং অন্যান্য জায়গায় অন্যান্য নানা জায়গার কথা বলে এসেছি। মঙ্গলবার দিন ফিরব।

ভালোই আছি। কেমন আছেন ? নমস্কার নেবেন। মিসেস বোস্ কেমন আছেন ? ইতি

সমর সেন

কামাক্ষীর জ্যাঠাইমার কাছে (মিহিজামে) ওর মেয়ে দেখার ব্যাপার স্বকর্ণে আবার শুনলুম। ওরা দুহাজার টাকা দেবে, কামাক্ষী ১০, হাজার চায়। সুতরাং একটা stalemate হয়েছে।

৯

১।৯ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কালীঘাট
১৬. ৫. ৪০.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি অনেকদিন পেয়েছি, কিন্তু নতুন কোনো খবর না থাকাতে এতো-দিন উত্তর দিইনি। বাড়ী ছাড়িনি, বয়কটের চেয়ে স্টে-ইন্-স্ট্রাইক্ বোধহয় ভালো।

গতকাল আইয়ুবের কাছে গিয়েছিলাম। বিষ্ণুবাবুর নবজাগ্রত উৎসাহের কথা শুনলাম। আইয়ুব বললেন যে, রবীন্দ্রনাথের পরে সবচেয়ে বেশী পাত্তা পাবার লক্ষ দে-সাহেবের ছিল, সেটা নানা উপায়ে তিনি কাজে পরিণত করেছেন। বিষ্ণুবাবুর উৎসাহ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি (private) উক্তি করলেন। হীরেনবাবু তাঁর ভূমিকায় আমাদের মতো "সাম্যবাদী" কবিদের অরুণ মিত্রের "লাল ইস্তাহার" থেকে বামপন্থী কবিতা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে অনুরোধ করেছেন। "অগ্রণী"তে আমার প্রবন্ধ এবং কবিতা সম্বন্ধে একটি বিরাট বামপন্থী সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি বামপন্থী বিশেষণ সমালোচক আমার সম্বন্ধে প্রয়োগ করেছেন। প্রবন্ধটি পড়লে বেশ মজা পাবেন।

২৩শে মে চঞ্চলের শুভবিবাহ। মনে হচ্ছে বিষ্ণুবাবুরাই তাঁদের spiritual পুত্রটির বিয়ে ঠিক করেছেন, কারণ ভাবী বধূ কমলা গার্লস [য] স্কুলে মাস্টারী করেন। চঞ্চলের গাম্ভীর্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, রাস্তায় পদক্ষেপের সময় কোনো দিকেই দৃষ্টিপাত করেনা। দেবীর বিয়ে বোধহয় কিছুদিন পিছিয়ে যাবে, কারণ দুর্গানন্দবাবু হঠাৎ মালাক্কায় মারা গিয়েছেন। কামাক্ষীর বিয়ের জন্য চেষ্টা হচ্ছে কিন্তু পাত্রী ঠিক হয়নি। হবে কিনা তাও সন্দেহ, কারণ কামাক্ষীর যোগ্যপাত্রী বোধ হয় বাংলাদেশে নেই।

কলকাতায় গরম অনেক কমে গিয়েছে। সবসময় প্রচুর হাওয়া, ঘর্মপাত বন্ধ হয়েছে। আমি এখনো বিরসবদনে ছাত্রী পড়াচ্ছি, এবং লক্ষহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি। আপাতত পাশের ঘরে বাবা এবং কাকা সম্পত্তিভাগের আলোচনা করছেন, এবং গ্যারাজের উপরের ঘরে কমলা স্কুলের আর একটি কাগ্‌তাড়ুয়া শিক্ষয়িত্রী "আমি তোমায় যতো" অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে গাইছেন। এবারে আর বাইরে যাওয়া হলনা।

মিসেস দে-কে আমার নমস্কার দেবেন। মিমি কেমন আছেন? আপনারা কবে ফিরছেন? ইতি

সমর সেন

১০

C/o Police Station, Contai.
7. 8. 40

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। প্রথমে কাঁথিতে পাঠাবার জন্য আপনাদের উপরে চটে-ছিলাম, কিন্তু এখন মেজাজ সরিফ্, কারণ জায়গাটা বেশ ভালো লাগছে। ক্লাস এখন পর্যন্ত বেশী নেই, সপ্তাহে মাত্র নটা, আসছে সপ্তাহ থেকে আরো গোটা দুয়েক টিউটোরিয়াল ক্লাস নিতে হবে। বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়না।

সন্ধ্যেবেলাটা অসহ্য লাগেনা। এখানে দুএকজন বন্ধুবান্ধব আছে, তাদের সঙ্গে হয় দীঘার পথে না হয় বালিয়াড়িতে বেড়াতে যাই। মাঝে মাঝে অবনীবাবুর বাড়ীতে যাই, অবনীবাবুর বাড়ীটা উত্তম। আমি নতুন বাড়ীতে আজ উঠে এসেছি। ঘরটা ভালো লাগছে। মনে হচ্ছে কাঁথিতে টিঁকে যেতে পারবো। কলেজে অধ্যক্ষদের মধ্যে অল্পবিস্তর দলাদলি আছে। কাল পর পর দুটো ক্লাস ছিল, আমার কিন্তু ধারণা ছিল যে মাঝে একটি period নেই, সুতরাং মনের আনন্দে আশে পাশে কিছু বেড়াতে গিয়েছিলাম। দেখলাম অনেক ছেলে নির্বিস্টচিত্তে [য] আমার ঘোরাফেরা পর্যবেক্ষণ করছে। ক্লাস নিতে ফিরে এসে দেখি—যে সময় বেড়াচ্ছিলাম যে সময় আমার দ্বীতিয় [য] ক্লাস শেষ হয়ে গিয়েছে। ছাত্ররা ক্লাস ছেড়ে আমাকে বালিতে বেড়াতে দেখে অত্যধিক পরিমাণে বিস্মিত হয়েছিল।

থার্ড ইয়ারে Arms and the Man পড়াতে দিয়েছে। কালকে কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ আবিস্কার [য] করলাম যে জানুয়ারী থেকে গ্রীষ্মের ছুটি পর্যন্ত সেকেণ্ড ইয়ারকে পড়াতে হবেনা, সুতরাং পড়াবার ঘণ্টা অনেক কমে যাবে। সেই আনন্দে আছি।

এখানকার আবহাওয়া খুব ভালো, পূজোর [য] সময় থেকে সুরু করে। এখনো বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের চেয়ে বোধহয় ভালো, ঝাড়গ্রাম ছাড়া (এ সব তথ্য লোকের কাছে সংগ্রহ করছি)। মনে করছি পূজোর [য] ছুটি শেষ হবার দিন দশ বারো আগে কাঁথিতে ফিরে আসবো। সে সময় আপনি যদি সস্ত্রীক আসেন, তাহলে কয়েকদিন হৈ চৈ করা যাবে। বাড়ীওয়ালা ছুটির মধ্যে ঘরটা পাটিশন করে দিতেও পারে।

অন্নদাশঙ্করের একটি চিঠি পেয়েছি। তিনি পরের মাসে আসবেন লিখেছেন। Anthologyটা যতো শিগগীর পারেন পাঠাবেন। অবনীবাবুকেও পাঠাবেন, তিনি খোঁজ করছিলেন।

যে কোনো দলের সঙ্গে মেশার অভ্যেস করে খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম, নইলে একলা এখানে টিঁকতে পারতাম না। যে বাড়ীতে এতোদিন অতিথি

ছিলাম, তারা লোক খুব ভালো। দুবেলায় চাকর পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন। কদিন খুব মুর্গী খাইয়েছিলেন।

প্রচুর সিগারেট খাচ্ছি। দুদিনে এক টিন্। অবনীবাবু ভয় দেখিয়েছিলেন যে আলাদা বাড়ীতে উঠলে অনেক বন্ধুবান্ধব জুগিয়ে তিনি সিগারেটের খরচ বাড়াবেন। সেই ভয়ে একটি গড়গড়াও কিনেছি। তামাকটা কড়া দেখে এনেছি।

আপনি লিখেছেন যে কামাক্ষী ও দেবী কাঁথিতে আসার জন্য পা বাড়িয়েই আছে। কিন্তু আজ কামাক্ষীর চিঠি পড়ে আসার আগ্রহ সম্বন্ধে সন্দেহ হচ্ছে। নতুন প্রেম। দেখা হলে তাগাদা দেবেন।

আমার মন কেমন করছে প্রায়ই। কিন্তু ইউরোপের দুরবস্থার কথা চিন্তা করে সাহসে বুক বাঁধছি।

আশা করি ভালো আলো আছেন। মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

রাধারমণবাবুর কাছে শুনেছিলাম যে হীরেণবাবু [য] তাঁর সঙ্গে এখানে আসতে পারেন। কাল রাধারমণবাবুকে চিঠি লিখেছি। হীরেণবাবু [য] এলে একটু কষ্ট সহ্য করতে হবে, কিন্তু এমন কিছু নয়। আজ কলেজে থার্ড ইয়ারের ছাত্ররা আপনার এবং হীরেণবাবুর [য] কথা জিজ্ঞেস করছিল।

১৮ই তারিখে কলকাতায় যাওয়া সম্ভবপর হবেনা; শনিবার ক্লাস আছে। বিকেলের বাস্ ধরলে পরদিন ভোরে কলকাতা পৌছব। একদিনের জন্য অর্থব্যয় করা আমার মতো দরিদ্র অধ্যক্ষের পোষাবেনা। সেদিন অবনীবাবু বলছিলেন, এখানকার S. D. O. দিনে একটিন খান, আপনি দুদিনে একটিন খান্। তাতে আমি পরিহাস করে বলেছিলাম যে S. D. O. আমার চেয়ে "একটু বেশী" মাইনে পান। অবনীবাবু অনাবশ্যক বিস্মিত হলেন, এবং উপরোক্ত চাকুরের সঙ্গে আমার মাইনের পার্থক্য সম্বন্ধে অনেক কিছু বললেন। শুনলাম এক একজন I. C. S. চাকুরে জীবনে সরকার থেকে সবশুদ্ধ প্রায় ৫০ লাখ্ টাকা পান। শুনে আমার পরিহাসের জন্য লজ্জিত, ও স্তম্ভিত হলাম।

১১

Police Station, Contai.
13. 8. 40

প্রীতিভাজনেষু,

দু একদিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি। Anthology পাবার সৌভাগ্য

এখনো হয়নি। অবনীবাবু দিন সাতেক আগে পেয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে দেখছিলাম। দেখতে ত ভালোই হয়েছে।

এখানে মাঝে মাঝে গরম পড়ছে, কখনো অল্পস্বল্প বৃষ্টি পড়ছে। মোটের উপরে এখনো মন্দ লাগছেনা; মাঝে মাঝে বিনাকারণে মেজাজ খুব গরম হয়ে যায়। ব্যাপারটা যে কী বুঝতে পারিনা।

বাংলা বানান ভুল হলে মোটেই লজ্জা হয়না, অনেক বছর দাসত্ব করার ফল। ভারত স্বাধীন না হলে আমার বাংলা বানান বোধহয় ঠিক হবেনা। ক্লাসে সুবিধে পেলেই ইংরেজদের প্রাণভরে গালাগালি দিই, কারণ, কলেজের Governing Bodyতে শুনেছি কয়েকজন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে আছেন।

সপ্তাহে বারোটা ক্লাস, তার মধ্যে তিনটে টিউটেরিয়াল। ফার্স্ট ইয়ারে কবিতা আর সেকেণ্ড ইয়ারে প্রোজ সিলেক্‌সন্‌স্ পড়াতে হয়। গলার জোর ইতিমধ্যেই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। নতুন অনেক প্রফেসর এসেছেন, আমাকে নিয়ে পাঁচজন। দুজন বেশ বয়স্ক, দেখে মনে হয় ৺দীনেশ সেনের সমসাময়িক। এখন পর্যন্ত অধ্যাপকদের মধ্যে আমিই youngest। সুতরাং জল খাবার প্রবৃত্তি হলে অধ্যক্ষকে জানাই, তিনি চাকর ডেকে জলের বন্দোবস্ত করে দেন। ক্লাস প্রায়ই আগে ছেড়ে দিই, বলি এতো বেশীক্ষণ পড়ানো পোষায়না।

দিল্লী থেকে প্রায়ই টেলিগ্রাম ও চিঠি পাচ্ছি। Interviewতে যেতে লিখছেন। আমি লিখে দিয়েছি যে শুধু interviewর জন্য দিল্লী যেতে পারবনা।

কামাক্ষী একেবারেই নিরুত্তর। এখন মনে হচ্ছে যে এখানে আস্‌তে বারবার অনুরোধ করা বোধহয় অন্যায় হয়েছে। প্রথম কারণ, নতুন বিয়ে। দ্বিতীয় কারণ, কাঁথি কাশ্মীর কিম্বা আসানসোল নয়। এদিকে অনেকেই আমার সঙ্গে মেস্ পাতবার তালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আমি এই বলে ঠেকিয়ে রেখেছি যে শিগগিরই অনেকে এখানে এসে উঠ্‌বেন, তাদের জন্যই আলাদা বাড়ী করা, ইত্যাদি :

এইমাত্র অবনীবাবু এসেছিলেন।

এ বাড়ীতে দোতলায় দুটি ঘর; আর একটি রান্নাঘর। একটি ঘর খুব বড়ো, আর একটিও ভালো, আপনারা এলে সেটাতে আমি অনায়াসে আশ্রয় নিতে পারি। তাছাড়া, বাড়ীওয়ালা কাল বলছিলেন যে পূজোর [য] ছুটিতে তিনি বড়ো ঘরটা পার্টিশন্ করে দিতে পারেন। তাহলে ত ভালোই।

অবনীবাবু বলছিলেন যে পূজোর [য] ছুটির দিকে যদি আসেন, তাহলে অনায়াসে তাঁর বাড়ীতে থাকতে পারবেন।

আশা করি ভালো আছেন। মিসেস্ বোস্‌কে আমার প্রীতি-নমস্কার দেবেন।

ইতি

সময় সেন

১২

Contai

৮. ৯. ৪০

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। মোটের ওপর ভালোই আছি। মাঝে মাঝে গুমোট গরম, মাঝে মাঝে এক পশ্‌লা বৃষ্টি। আশেপাশে গ্রামে শুনছি ছ ফিট জল জমেছে, বাড়ীঘরদোর ভেসে গিয়েছে। তার ফলে কাঁথিতে মাছ সস্তাদরে বিক্রী হচ্ছে। বৃষ্টির ছুতোয় দুএকদিন ক্লাসে পড়াইনি, নাম ডেকে ছেড়ে দিয়েছি। অন্ধকার, সুতরাং বইএর অক্ষর দেখা যাচ্ছেনা, আমার আবার cylindrical চস্‌মা, বজ্রপাত, সুতরাং ছেলেরা গলার স্বর শুনতে পাচ্ছেনা, ইত্যাদি অভিযোগ প্রিন্সিপালের কাছে করাতে তিনি বিরসমুখে ক্লাস ছেড়ে দিতে বলেছেন।

আপনার বইএর এবং সম্রাটের সমালোচনা এক সপ্তাহের মধ্যে পাঠাতে খুব চেষ্টা করব, হাতে অন্য কাজ নেই, লেখাটা হয়ে যাবে নিশ্চয়ই। একটি মাত্র নতুন কবিতা ছিল, সেটা 'পত্রিকা'তে দিয়েছি, চেয়ে পাঠিয়েছিল। কামাক্ষীর বিয়ের কবিতাটা ছাপাতে পারেন।

পুজোর [য] সময় কোথাও যাবেন না নাকি? আমাদের ছুটি হবে ১লা অক্টোবর। এখনো দীঘা যাবার কোনো সুবিধে নেই, খুব সম্ভব পুজোর [য] ছুটির পর যেতে পারব। মানে, কলকাতা থেকে নভেম্বরে ফিরে এসে।

মিসেস বোস কেমন আছেন? দেবপ্রসাদ বাবুর ব্যাপারটা আর বেশীদূর গড়ায়নি?

নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

'চতুরঙ্গ' পেয়েছি। অমিয়বাবু কি "গ্রহণ"-এর সমালোচনা পাঠিয়েছেন?

১৩

Agra Hotel
6 Daryagunj, Delhi.

বুদ্ধদেববাবু,

নিরাপদে দিল্লীতে এসে পড়েছি। পথে চেনাশুনো অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সেজন্য অসুবিধে ভোগ করতে হয়নি। ট্রেনে বিশেষ ভিড় হয়নি। এখানে প্রথম কয়েকদিন খুব হৈ চৈ-এর মধ্যে কেটেছে, সঙ্গে গায়ক ও বাদ্যকার ছিলেন। হোটেলেই মাসিক বন্দোবস্ত করেছি, ৫০৲। এ হোটেলটা গঠনের দিক

দিয়ে দার্জিলিং, পুরী কিম্বা [য] রাঁচীর যে কোনো হোটেলের চেয়ে ভালো। আমার ঘরের পেছনেই কমার্সিয়াল কলেজ। কলেজের বাড়ী ও লাইব্রেরী চমৎকার, ছেলেদের মধ্যে বাঙালী, শিখ, পাঞ্জাবী মুসলমান, মাড়োয়ারী, মারাঠি, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ইত্যাদি আছে। অনেক ধর্ম ও প্রদেশ থাকায় গোলমালের বিশেষ সুবিধে হয়না। কলেজে সবই পড়ানো হয়, সঙ্গে কমার্স নেওয়াটা বাধ্যতামূলক, সেজন্য কমার্সিয়াল কলেজ নাম। আমাকে This Modern World (1st Yr) Abraham Lincoln (3rd Yr) ও Modern Symposium (4th Yr) পড়াতে হচ্ছে। আপাতত ১০ ঘণ্টা ক্লাস (সপ্তাহে), তবে শিগগীরই সপ্তাহে ঘণ্টা কুড়ি হবে বলে প্রিন্সিপাল আশ্বাস দিয়েছেন। দু একটা বাংলা বই বোধ হয় পড়াতে হবে, মেঘনাদবধকাব্য, সঙ্কলন গোছের বই। শনিবার পর্যন্ত কলেজ ছুটি।

কুতব, হুমায়ুনের, জাহানারাব কবর ইত্যাদি দেখতে গিয়েছিলাম। বেশ লাগল। নয়া দিল্লী দেখতে গিয়েছিলাম, গুচ্ছির পয়সা খরচ করে অনেক আজগুবী জিনিষ তৈরী হয়েছে। সে সব দেখলে কলকাতার জন্য মন কেমন করে। এখানে এখনো বিশেষ ঠাণ্ডা পড়েনি। সাহেবী পোষাক এখনো পড়িনি, [য] একটু শীত পড়লে বোধহয় পড়তে [য] হবে।

আপনাদের খবর কী? 'কবিতা' পেলাম। অতুলবাবু অপরূপ একালতী কবেছেন। অমিয়বাবুব লেখা, সত্যি বলতে, ভালো লাগলনা। গদ্যটা কেমন যেন জড়ানো। তাছাড়া কবিতার অনেক অর্থ তিনি কবেছেন যার প্রয়োজন ছিলনা। কামাক্ষীদের কোনো খবর পেয়েছেন? আমি পাইনি।

হোটেলে থাকলে প্রায় প্রত্যেকদিন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। অধিকাংশই স্কটিশের পূর্বতন ছাত্র।

মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? অজিতবাবু, পঞ্চুবাবুর খবর কী?

নমস্কার নেবেন। আগ্রা হোটেলের ঠিকানায় চিঠি লিখবেন।

ইতি

সমর সেন

১৪

Agra Hotel, 16 Daryagunj, Delhi.
17. 10. 40.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। পূজোর [য] পাঁচদিন খারাপ কেটেছে, কারণ পায়ে একটা কোঁড়া হওয়াতে বাড়ীতেই থাকতে হয়েছিল। দুএকদিন হল আবার বেড়াতে

স্বরু করেছি। কলেজেও যাচ্ছি, এখন পর্যন্ত কাজের চাপ পড়েনি, একটা পরীক্ষা ছিল। পুরোদমে [য] আরম্ভ হলে সপ্তাহে শুনছি গোটা বিশেক্ ক্লাস থাকবে, টিউটোরিয়াল নিয়ে। কলকাতার কলেজে কাজের কথা লিখেছেন। এখানে আর যাই হোক, ছাত্ররা ভদ্র এবং অধ্যাপকদের মধ্যে অন্তত দেবপ্রসাদের মতো মহারথী নেই। নয়া দিল্লীর যা দেখেছি তাতে অবশ্য...হয়, কিন্তু সেখানকার রাজকীয় হালচাল এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে এবং...স্থবিধে নেই বলেই বাঁচোয়া। আজ সকালে পুরোনো কেল্লা দেখতে...বিলাসের চূড়ান্ত, তবু মোগ্‌লাই রুচির প্রশংসা করতে বাঁধেনা, সমস্ত জিনিষটা...তবে সেখানেও এখানকার অবাঙ্গালী এমন অনেক ভদ্রমহিলা এবং ভদ্রলোক দেখলাম,...কথা মনে পড়ল। একটি ছাত্রকে beach-এর মানে জিজ্ঞেস করাতে...A bitch is a dog surrounded by many dogs. আশেপাশের...আবার কর্তারাও রেডিও লাগিয়েছেন।

কামাক্ষী ও দেবীর চিঠি পেয়েছি। কামাক্ষী বেশ আনন্দেই আছে বলে মনে হল। সিকিম, দার্জিলিং, অনেক জায়গার নাম লিখেছে।

কলকাতার খবর ত দিয়েছেন। নতুন কবিতা কিছু লিখিনি, লেখার সম্ভাবনাও ত আপাতত নেই। প্রেমেন্দ্র বাবু বাংলা কবিতার সংস্কারে কতোদূর এগোলেন? দেবীর চিঠিতে জানলাম যে অমিয়বাবুর শরীর খুব খারাপ। কোনো খবর রাখেন না কি? বিষ্ণুবাবু, হীরেণবাবু, [য] আইয়ুব, এঁদের সঙ্গে দেখা হয়?

কলকাতায় ফিরতে দেরী হবে বোধহয়। ডিসেম্বরে আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকলে যাওয়া হবেনা, তারপরে জুলাই মাসের আগে বড়ো ছুটি নেই। এখানে বেশ একলা লাগছে, মানে, খারাপ লাগছে। অজিতবাবু, পঙ্কুবাবু কেমন আছেন?

মিসেস্ বোস্‌কে আমার নমস্কার দেবেন। আশা করি তিনি ভালো আছেন। আপনারা তাহলে এ ছুটিটা কলকাতায় রইলেন। উপন্যাস শেষ করলেন না কি? আমি ভাবছি প্রবোধ সান্ন্যালের [য] মতো ভ্রমণকাহিনী লিখতে স্বরু করব, তাও যদি সময় কাটে! কলকাতা খুব দূরে মনে হয় না, ভাড়াটাই সাংঘাতিক। ইতি

সমর সেন

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে বাঁদিকে কোণাকুণি] মাঝে মাঝে ঘরের দরজা বন্ধ করে চড়ুই পাখি ধরি, তাতে অনেকটা সময় কাটে। ভাবছি এবার থেকে গোটাকতক আলপিন্ মেঝেতে ফেলে আলো নিবিয়ে দিয়ে সেগুলো একে একে খুঁজে বের করবার চেষ্টা করব।

১৫

১৩.১.৪১

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হোলো পেয়েছি। 'কবিতা' আজ পেলাম। এ কদিন ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল; মিনিমাম ৩২° আর ম্যাক্সিমাম ৩৭°। হাত পা চালানো মুস্কিল, দিনরাত কন্‌কনে বরুফে হাওয়া; এসব কারণে উত্তর দিতে দেরী হল।

কলকাতার অবস্থা বোধহয় আগের চেয়ে একটু ভালো হয়েছে, আপনাদের কলেজ বোধহয় এ সপ্তাহের শেষেই খুলবে। এখানে শুনছি যে শিগগীরই দরিয়াগঞ্জ থেকে সব বাসিন্দেকে ভাগিয়ে দেবে, কিল্লার নেহাৎ কাছে বলে। খবরটা হয়ত নেহাৎ গুজব, কিন্তু সত্যি হলে বিপদ। অনেকদিন পরে আজ একটু চিন্তান্বিত বোধ করছি। দাদার একটি চিঠিতে জানলাম যে রুগীরা সব কলকাতা ছেড়ে যাওয়াতে আয় দৈনিক ছআনায় দাঁড়িয়েছে। উকীল, ডাক্তারদের বিপদ কম নয়।

বিষ্ণুবাবুর খবর বহুদিন পাইনি,...কলেজ আর কতোদিন মাইনে দেবে তার হিসেব করছেন। আমাদের বাড়ীর সকলে এখন পর্যন্ত কলকাতায় আছেন। বাবা থিয়েটার নিয়ে আবার ব্যস্ত; প্রশান্ত মহাসাগরের মহাঅশান্তিতে [য] বোধহয় বিচলিত হননি।

দিল্লীতে জীবনযাত্রা যথারীতি চলছে। সুলেখা এখন অনেক ভালো আছে, বাপের বাড়ীতেই থাকে। আমি সকালে কাগজ পড়ি, দুপুরে কলেজ, বিকেলে মহাসমস্যা। কলকাতার বিকেলের সঙ্গে কোনোজায়গার [য] তুলনা হয়না। মিসেস সান্ন্যালদের [য] সঙ্গে আর দেখাসাক্ষাৎ হয়নি, যা ঠাণ্ডা পড়েছে।

লেখাপত্র অনেকদিন বন্ধ। আমার ভাইকে 'গ্রহণ'-এর জন্য লিখেছি। কলেজ থেকে মাঝে ২০০৲ ধার নিয়েছি।

মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? জ্যোতির্ময় বাবুর সঙ্গে মূলাকাৎ [য] কি ওখানে হয়েছিল? সুভায কি কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছে? দুর্যোগে কে আর বাঁশী বাজাবে। ইতি

সমর সেন

১৬

12B Daryaganj, Delhi
14. 1. 41.

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। 'নতুন পাতা' সম্বন্ধে একটা কথা

আপনাকে আগে জানাইনি। এখানকার এক আর্টিস্ট ভদ্রলোক মাসখানেক হল বইটা আমার বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে নিয়ে গেছেন। ক্রিসমাসে তিনি কলকাতায় গিয়েছিলেন, এতোদিনে নিশ্চয়ই ফিরেছেন। কিন্তু তিনি এখান থেকে মাইল বারো দূরে থাকেন। যাহোক, তাঁকে ফোন করিয়ে বইটা আনার বন্দোবস্ত সত্বর করব।

দিল্লীর খবর ভালোই। মাঝে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, এখন মন্দের ভালো। New Indian Literature-এর নারদমুনির সঙ্গে আলাপ হল, তাঁর নাম নিখিল সেন, তিনি পাশের বাড়াতেই থাকেন। পাঞ্জাবীর মত গঠন, সম্পর্কে আমার মামাত ভাই হন।

আমাদের ঘরের ওদিকেই একটি বিশ্বনিন্দুক বৈদ্য কুমারী (২৬) থাকেন। তিনি পাড়ায় আমাদের জংলী বলে রটিয়েছেন। শনিবারের চিঠি এখানেও তাড়া করেছে দেখছি। দোষের মধ্যে নিরীহভাবে লাল আপেল মাঝে মাঝে খেতাম, দু-একদিন সরাব খেয়েছিলাম। চিঠিপত্রের জন্য একটু চিন্তিত থাকি, প্রায়ই ভুলে পিওন পাশের বাড়ীতে দিয়ে যায়।

কামাক্ষী এক বন্ধুর মারফৎ আমার অনেক বই পাঠিয়েছে। কিন্তু কিছুই লিখতে পারছিনা। Wheels and Butterflies আবার পড়লাম, বেশ লাগল।

সময় কাটাবার জন্য মাঝে মাঝে সামনের একটি বাড়ীতে গিয়ে লুডো খেলি। মোটের ওপর ভালোই আছি। অনেক পরীক্ষার খাতা দেখতে হচ্ছে।

লেখাপত্র আবার বন্ধ।

নমস্কার নেবেন। 'বন্দীর বন্দনা' বেরুল? ইতি

সমর সেন

১৭

12 B, Daryagunj, Delhi

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। আমাদের ছুটি হয়ে গিয়েছে ১৮ই নাগাদ, কলেজ খুলবে ৬ই। তারপর পরীক্ষা, মানে, কলকাতায় গেলে ২২, ২৩ দিন ছুটি পাওয়া যেত। কিন্তু অর্থাভাবে যাওয়া হলনা। প্রথম প্রথম দিল্লী খুব খারাপ লাগত, কিন্তু এখন ভালোই লাগছে। বেশ শীত পড়েছে, ঝড়ের মত হাওয়া, কিন্তু এ তিনমাসে শীতটা সয়ে গেছে। আমার বন্ধু এখন লক্ষ্ণৌ-এ [য] আছে, সুতরাং একেবারে একলা আছি। এ কদিন ফ্লবেয়রের Salammbo পড়লাম।

মাঝে দুএকবার সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম। অসহ্য। যারা গান একেবারেই

জানেনা, তাঁরা মহাউৎসাহে গায়, যারা কবিতার কিছু বোঝেনা, তারা মস্ত সাহিত্য-রসিক। নিজেদের ছোট দলে বসে আড্ডা মেরে সময় কাটাই। দিল্লীর যে বিখ্যাত snobberyর কথা আমাকে বলেছিলেন, সেটা এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে, নিউ দিল্লীতে। দরিয়াগঞ্জটা পুরোনো পাড়া, যে সব বনেদী ঘর আছে তারা ভালোই। সরকারী চাকুরেরাই ভুঁইফোড় হয়।

অমিয়বাবু কি ইংরেজীর চেয়ার পেলেন ? আমি আগে এবিষয়ে শুনিনি। 'কবিতা'র একটি মাত্র গ্রাহক করেছি, তবে আরো হবে। একটু গাহাতপা ঝেড়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। আপনি 'কবিতা' অমিতাভ সেনের নামে না পাঠিয়ে এই ঠিকানায় পাঠাবেন : Jyotirmoy Lahiri. C/o, Cambridge School, 2 Daryagunj.

অনেকদিন পরে একটা কবিতা লিখেছি, সেটা পাঠাচ্ছি। আপনার উপন্যাস কবে বেরুবে ? রিসার্চ কিছু হচ্ছেনা, বইএর অভাবে। কামাক্ষীকে লিখেছি কয়েকটা বই পাঠাতে ওর বন্ধু অশোক মুখুজ্যের মারফৎ। সেগুলো এলে লিখতে সুরু করব।

মিসেস্ বোস আশা করি ভাল আছেন। মিমির খবর কী ? আপনাদের youngest-এর কী নাম রাখলেন ?

নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

অনেকদিন আইয়ুব, হীরেনবাবু ইত্যাদির খবর শুনিনি। এঁরা কেমন আছেন ?

আপনার 'বন্দীর বন্দনা'র নতুন কপি পেলে বাধিত হবো।

'কবিতা'র সম্পাদক হিসেবে আমার নাম আর কতোদিন রাখবেন ? ব্যাপারটা হাস্যকর দেখায়

১৮

12B Daryagunj, Delhi
24. 5. 41

বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আপনারা শান্তিনিকেতনে, কামাক্ষীরা পুরীতে, ভাবতেও মন কেমন করছিল। লাল মাটি আর মহুয়াগাছের ওপর আমার আসক্তির কথা জানেন, আসক্তির কারণটাও হয়ত অস্পষ্টভাবে জানতেন। পুরোনো দিনের কথা ভাবলে এখনো মন খারাপ হয়। একটানা দিল্লীতে এতোদিন কাটিয়ে প্রাণ ওষ্ঠাগত, বিয়ের ব্যাপারটাও নানাকারণে এখনো গা সওয়া হয়নি। এখানে

বন্ধুবান্ধব সম্প্রতি একেবারেই নেই। যার সঙ্গে আগে mess করতাম সে ভদ্রলোক অনেক টাকা বাকি রেখে স্বদেশে গিয়েছেন। নতুন করে পড়াশুনো আবার সুরু করেছি, যে সব পড়া বই সঙ্গে ছিল সেগুলো আবার পড়ছি। মাঝে মাঝে বিলিতী পত্রিকা পাই; ইংরেজী সাম্যবাদের শোচনীয় পরিণতি দেখে বিরক্তি লাগে। আজকালের মধ্যে এলিয়টের East Coker নামক কবিতাটি পাবো। আমাদের বখাটে generationএর শ্রেষ্ঠ কবি এলিয়ট, বিয়ের পর এ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে।

মাঝে বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল। দিল্লী এদিক থেকে মজার জায়গা। ১১৩ থেকে একদিনে ৮০ হয়ে যায়। মাঝে মাঝে আঁধি হয়। ধুলোতে [য] চারদিক অন্ধকার, তারপর বেশ ঠাণ্ডা। চোখে সুর্মা লাগিয়ে সৌখীন সন্ধ্যা ঘোরাফেরা করে। পরের দিন আবার ১১০, এগারোটার পর বাড়ী থেকে বেরুনো যায়না। রাত্তিরে কয়েকদিন বারোটা একটা পর্যন্ত গরম হাওয়া দেয়। এসব ব্যাপার খুব মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করি, পৃথিবীর অবস্থা যতো খারাপ হয় ততো Meteorological studyর দিকে ঝোঁক যায়।

রবীন্দ্রনাথের কথা আপনার চিঠিতে পড়লাম। ইয়েটস্‌-এর লাইন মনে পড়ে: Grant me an old man's frenzy. এখানে নাচগানের সঙ্গে রবীন্দ্রজয়ন্তী হল। বীরেন গাঙ্গুলী মশাই একটি প্রশস্তি পাঠ করলেন। পৃথিবীতে মুখর মূর্খের সংখ্যা সম্প্রতি ভয়ানক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কাল কামাক্ষীর চিঠি পেয়েছি। মহানন্দে আছে। ঈর্ষায় মারা যাচ্ছি। বিষ্ণুবাবুর চিঠি পেয়েছি। বিয়ের ব্যাপারে আমার আত্মা সম্বন্ধে তিনি ভাবিত হয়েছেন।

কবিতাগুলো মাস দেড়েক আগে লেখা। প্রেমের কবিতা আর আসেনা। আশা করি মিসেস্ বোস ভালো আছেন। জুলাইমাস এলে বাঁচি। ইতি

সমর সেন

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে বাঁদিকে কোণাকুণি পেন্সিলে : যে কবিতাগুলো পাঠিয়েছিলাম তার তৃতীয়টির (ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ইত্যাদি) শেষের চার লাইন (সকালে —ফলাফল) বাদ দেবেন।

১৯

12B Daryagunj, Delhi
16. 9. 41

প্রীতিভাজনেষু,

কাল আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন শুনে ঈর্ষান্বিত

(নতুন বানান?) বোধ করছি, কারণ এখানে একেবারে বেকারের মত জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। তার ওপর অর্থনৈতিক কারণে নিরন্তর দুশ্চিন্তা। তবে খুব সম্ভব পরশুদিন কলেজের পয়সায় দিনবারোর জন্য মশুরী যাবো, টাকাটা মাসে মাসে শোধ করতে হবে। সুলেখা ততদিন পিত্রালয়ে থাকবে। মশুরী শুনেছি ভালো জায়গা, দেখি কীরকম লাগে। ফিরে আসব ৩০ শে নাগাদ, আপনারা নিশ্চয়ই ট্রেনে পূজোর [য] ভিড় কাটিয়ে রওনা হবেন, দিল্লীতে অক্টোবরের প্রথমে বোধহয় পৌঁছবেন। আমার বাড়ীটা একটু বড়ো হলে আপনাদের আমাদের এখানে উঠতে বলতাম, host হিসেবে যে আমি ভালো সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেন, কিন্তু দিল্লীতে এসে বাড়ীটা স্বচক্ষে দেখলে বুঝতে পারবেন যে কাউকে এসে থাকার জন্য নিমন্ত্রণ করা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা। কলকাতা থেকে ফিরে এসে পাশের অংশটা নেবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটা শুনছি খালি হবেনা। যুদ্ধ শেষ কবে হবে স্বয়ং ঈশ্বরও জানেননা।

দিল্লীতে কায়েমী হয়ে বসার ইচ্ছে ক্রমশই কমে আসছে। কিন্তু নিরুপায়। কলকাতা আবার একটু superior জায়গা। আপনার 'সবপেয়েছির দেশে' পড়ার আগ্রহ হচ্ছে। ধৈর্য ধরে থাকবো। বিষ্ণুবাবুর বই পেয়েছি। সুধীনবাবুর এক কপি বই সমালোচনার নাম করে ত আনিয়েছিলাম, না লেখার জন্য লজ্জিত বোধ করছি। আমার হাতে একটা লম্বা কবিতা ছিল, সেটা এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। হাতখালি না হলে নতুন লেখার আগ্রহ হয়না।

মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? মিমি ও রুমীর খবর কি? দিল্লীতে আসবার সময় জিনিষপত্র ভালো করে ওজন করিয়ে আনবেন, লগেজের জন্য মাশুল আর ঘুঁষ [য] বাবদ আমার ২০৲ খরচ হয়েছিল। ওভারকোটের প্রয়োজন হবেনা। চিঠি লিখবেন, স্টেশনে উপস্থিত থাকবো। মশুরী গেলে সেখান থেকে চিঠি লিখবো। নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

[চিঠির নিচে বাঁদিকে কোণাকুণি] আজ সকালে জানতে পারলাম যে অধ্যক্ষ যাবেননা বলে কলেজের অন্যান্য ভদ্রলোকরা মশুরী যাবেন না। সুতরাং দিল্লীতেই আছি।

১৭. ৯. ৪১

[চিঠির নিচে ডানদিকে কোণাকুণি] লাহিড়ীকে (দরিয়াগঞ্জ) যদি 'কবিতা' ইতিমধ্যে পাঠিয়ে না থাকেন, তাহলে আর পাঠাবেন না কারণ দেড় টাকা এখনো পাইনি, পাবার সম্ভাবনাও নেই। এই দুঃখেই গ্রাহক করি না।

২০

৩০. ১২. ৪১

বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। কামাক্ষীরা শেষ পর্যন্ত আসেনি, ট্রেনে জায়গা পায়নি। বর্ধমান থেকে একটি চিঠি লিখেছে, তাতে খবর পেলাম আপনি ঢাকাতে। স্কুল, কলেজ ত বন্ধ থাকবেনা, সুতরাং খুবসম্ভব কলকাতায় ফিরে আসছেন। ক্রিসমাসে কল্‌কাতা যাবার চেষ্টা করতাম, কিন্তু কামাক্ষীর আশায় থাকাতে যাওয়া হল না। আমি এখনো হুজুগপ্রিয়, সেজন্য কলকাতায় থাকলে ভালোই লাগত। দিল্লী বড়ো একঘেয়ে জায়গা। আপনারা এতো ব্যস্ত হলে চলবে কেন? সম্পত্তি যাদের তাদেরই তো ভয় হবার কথা। আমাদের বাড়ীর সবাই কলকাতায় আছেন। আপনি হয়ত ভাবছেন যে 'জিন্নুর দেহ্‌লী দূর্‌ অস্ত্‌'—এ কথা ভেবে নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু তা নয়।

এবারে শীত বিশেষ পড়েনি। মাঝে কামাক্ষীর জন্য ষ্টেশনে গিয়েছিলাম, মেল্‌ এক্সপ্রেস্‌ হওয়াদ আড়াই ঘণ্টা লেট্‌ আসছে। কিছুদিন আগে মিসেস্‌ সান্যালরা [য] এসেছিলেন, তাঁদের জানিয়ে দিয়েছি যে বাড়ীর দরকার আমার নেই, কারণ পাশের অংশটা পেয়ে গিয়েছি।

'গ্রহণ' আমাদের বাড়ীতে খুব সম্ভব একটিও নেই। আপনার অফিসে গোটা-কতক ছিল, খোঁজ করলে পেতে পাবেন। ১০০ কপি দপ্তরীর কাছে পড়ে আছে।

মাঝে একটা উপন্যাস পড়লাম : হেমিংওয়ের For whom the bell tolls. স্পেন্‌ সম্বন্ধে লেখা। বইটা প্রথম শ্রেণীর। রবীন্দ্রনাথের পুরোনো উপন্যাস সবকটা পড়লাম। এখন বেকার বসে আছি।

মিসেস্‌ বোস্‌ আশা করি ভালো আছেন। চিঠির উত্তর তাড়াতাড়ি দেবেন। "কবিতা" বেরুতে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহ হবে বোধহয়। ইতি

সমর সেন

২১

12B Daryagunj
31. 1. 42

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। একটি মাত্র কবিতা হাতে ছিল। সেটা আতওয়ার রহমান্‌কে পাঠিয়েছি, দুসপ্তাহ আগে কবিতা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। 'কবিতা'

এতো শিগগীর বের করার জন্য প্রস্তুত হবেন আগে বুঝতে পারিনি। যদি লিখি তাহলে তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দেবো।

মাঝে কেস্ট[য]দিল্লীতে এসেছিল, আমাদের এখানেই ছিল। কয়েকদিন ভালোই কেটেছিল, এখন আবার গতানুগতিক ভাবে দিন কাটছে। এপ্রিল মাসের জন্য অপেক্ষা করে আছি, সেসময় গ্রীষ্মের ছুটি হবে। কলকাতায় ফেরবার প্রবল ইচ্ছে। মে মাসের গোড়াতে যেতে পারব, যদি হাওড়ার পুল অক্ষত থাকে। কেস্ট য] বলল যে সোভিয়েট-বিরোধীদের মনের অবস্থা : Springএ রাশ্যান্‌দের দেখে নেবো।

'গ্রহণ' বাঁধাবার জন্য আমার ভাইকে লিখেছি। দেবীর সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার দেখাসাক্ষাৎ হয় ; গোটা ৩০ কপি বাঁধাতে কতো খরচ পড়বে জানলে সুবিধে হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা সুবিধার নয় বলে বিশেষ উৎসাহিত বোধ করছিনা। খদ্দরের দাম কি খুব বেড়ে গিয়েছে ?

কামাক্ষীর অবস্থা শোচনীয়, ওর চিঠিতে জানতে পারলাম। Waiting roomএ দিনযাপন, স্টেশনে স্টেশনে রাত্রে ঘুরে বেড়ানো ইত্যাদি। অবশ্য একটি সান্ত্বনা আছে। খড়গ্‌পুর কলকাতার খুব কাছেই।

মিসেস্ সান্যালদের [য] সঙ্গে অনেক অনেকদিন দেখা হয়নি। ওঁরা বোধহয় এখন কলকাতায় ফিরবেন না।

আপনার একলা নিশ্চয়ই খুব খারাপ লাগছে। পঙ্কুবাবু, অজিতবাবু, এঁদের খবর কী ?

গ্রহণের কিছু কপি U. N. Dhur ও ভারতীভবনে ছিল। নিশ্চয়ই বিক্রী হয়ে যায়নি। কামাক্ষীর নতুন বই আপনার কেমন লাগল। ইতি

সমর সেন

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে বাঁদিকে কোণাকুণি] বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে তাঁর ঘড়ি কেস্টর [য] হাতে পাঠিয়েছি।

২২

৭ ২ ৪২

প্রীতিভাজনেসু,

আপনার চিঠি পেলাম। আপনার ফরমায়েসে একটি কবিতা লিখেছি, সঙ্গে পাঠাচ্ছি।

কলকাতার অবস্থা এখন শুনছি স্বাভাবিক। তবে নারীবর্জিত। আমাদের বাড়ীর মেয়েরা এবং ছোট ছেলেরা শুনছি এখন কলকাতার বাইরে, বাবা কেস্ট [য] এবং আমার মেজভাই-এর সঙ্গে বাক্যালাপ করেননা, হিটলার বিরুদ্ধ বলে। পৃথিবীটা

তাজ্জব জায়গা। আমি অনেকের সঙ্গে বাজী রাখবার চেষ্টা করছি যে জর্মানরা আসছে শীতে পগারপার হবে, কারণ স্টালিন সে কথা বলেছেন। কেউ বাজী রাখতে প্রস্তুত নয়। বাজী রাখবার আগ্রহ আমার প্রবল, কেননা কলেজ থেকে ২০০৲ ধার নিয়েছি।

'গ্রহণ'-এর একশ কপি বাঁধাবাধ মতো অবস্থা ১৯৪৩-এর আগে হবেনা। ত্রিশ কপি বাঁধিয়ে বাকী কাগজ আমাদের বাড়ীতে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলে ভালো হয়। দেবীকে লিখবো লিখবো করে লেখা হচ্ছেনা। আর একটি বই বের করবার মতো লেখা হাতে জমেছে, অথচ মাসের প্রথম সপ্তাহে হাতখরচ ছপয়সায় দাঁড়ায়।

মাঝে কেস্ট [য] এসে আট দিন ছিল। সে সময়টা ভালো কাটে। বাড়ীবদল করিনি, তবে অন্য অংশটা নিয়েছি। এখন একটা ঘর বেশী হল। দিল্লীতে জীবনযাত্রা মনে হচ্ছে বেশীদিন পোষাবেনা, মানুষের মনখেগো জায়গা। মিসেস বোস আশা করি ভালো আছেন। ইতি

সমর সেন

শীত ক[illegible] তবে আজ আঁধি চলছে; কাল কেমন অবস্থা হবে জানিনা।

২৩

২১. ২. ৪২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হোলো পেয়েছি। ৫০ কপি 'গ্রহণ' বাঁধিয়ে কোনো লাভ নেই, দেবীকে ২৫ কপির জন্য লিখেছি। বাকি কাগজ বিক্রী করে দিলে কিছু টাকা নিশ্চয়ই হবে, তাতে বাঁধাবার খরচ উঠে আসতে পারে।

'এক পয়সায় একটি' পেলাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বইটার দাম এক পয়সা, অবশ্য ভুল অল্পক্ষণ পরেই ভাঙ্গলো। শেষের দিকের কবিতাগুলো সবচেয়ে ভালো লাগল, শান্তিনিকেতনের ওপরে কবিতাটাও। বইটা দেখতে ঝরঝরে হয়েছে। আমি যদি মে মাসে কলকাতায় যাই (ইন্সা আল্লা হাওড়ার পুল যদি অক্ষত থাকে) তাহলে একটা তিনফর্মার বই বের করবার মতো কবিতা হাতে থাকবে, কিছু স্বচ্ছল [য] অবস্থা থাকলে একটা বই বের করার চেষ্টা করব। কিন্তু দুরাশা বোধ হয়। কলেজের টাকা (ধার) দিন তিনেকের মধ্যেই উধাও হয়, আপাতত অবস্থা আবার সঙীন।

গত দুতিনদিন রাত্রে বাঙ্গলা দেশের মতো ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে শিলাবৃষ্টি। কাল রাত্রে প্রাকৃতিক দুর্যোগে একেবারে ঘুম হয়নি। ঘনঘন বজ্রপাত, কিন্তু কম্বল মুড়ি দিয়ে মনে হল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবার আর কোনো আশঙ্কা নেই। মাঝে আর

একটি ৫০ লাইন কবিতা লিখেছি, তার শেষ অংশটা 'চতুরঙ্গ'র জন্য আগেই পাঠিয়েছিলাম, কী গতি হয়েছে জানিনা।

কামাক্ষী কি বদ্‌লী হয়েছে? দেবী নিশ্চয়ই এতোদিনে আমার চিঠি পেয়েছে। ওদের খবর কিছুদিন পাইনি, বিশেষ করে কামাক্ষার।

আপনাদের কলেজ কেমন চলছে? আমাদের পূরোদমে [য] চলছে, তাব ওপর রোজ একটি অন্যকলেজের ছাত্র সন্ধেবেলায় পড়তে আসে, কলেজের ধারের জন্য পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

মিসেস্ সান্ন্যালদের [য] সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয়নি। মিসেস্ বোসের খবর কী? ইতি

সমর সেন

[চিঠির নিচে বাঁদিকে কোণাকণি] চিঠি ডাকে ফেলতে অনেক দেরী হল, কারণ চাকরটা ছুটি নিয়ে চলে গিয়েছে, সংসারে বিপর্যয় উপস্থিত।

২৪

১০. ৮. ৪২

প্রীতিভাজনেষু,

'২২শে শ্রাবণ' ও আপনার চিঠি পেয়েছি। শান্তিনিকেতনে বর্ষার ওপর আপনার একটি কবিতা 'কবিতা'য় পড়েছিলাম। সেটা এ বইতে দেননি কেন? আমার সব-চেয়ে ভালো লাগল শেষের দুটো কবিতা।

আপাতত সরকারের জুলুমে এত চটে আছি যে কবিতা কিম্বা প্রবন্ধ কিছুই লেখা হচ্ছেনা। কাল চাঁদনী চকে একটা জনসভা আপনা থেকেই হয়েছিল, বিরাট ব্যাপার। পিঁপড়ের পাখা মরবার আগে ওঠে, এ কথার সত্যতা হুজুরেরা শিগগিরই বোধহয় প্রমাণ করবেন।

এ ছাড়া এখানকাব বিশেষ কোনো খবর নেই। কামাক্ষার সঙ্গে প্রায় প্রত্যহ দেখা হয়। 'নানাকথা'র রিভিয়ু এ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয়নি, আসছে বছর নাগাদ হতে পাবে। বছর চারেক আগে সদয় হোক নির্দয় হোক সমালোচনা অন্তত হত। এ কবছরে অসম্ভব প্রগতির ফলে সমালোচনার ফুরসদ [য] কাগজওয়ালাদের হয়না।

আপনাদের খবর কী? কলকাতার হালচাল কেমন? আসছে সেপ্টেম্বর মাসে একটা ছুটি আছে। সেসময় যাবার চেষ্টা করব। বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে কিছুদিন থাকলে লাভ হয়, কিন্তু এখন লোকসান শুরু হয়েছে।

মিসেস বোস্ কেমন আছেন? আর মিমি ও রুমী? আমাদের খবর ভালো। ইতি

সমর সেন

২৫

২৩. ৮. ৪২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার বই ন দিন পরে এখানে এসেছে। একদিনে শেষ করলাম, বিশেষ ভালো লাগল। অরুণের বাবা আর মহামায়[া] আপনার উপন্যাসের মধ্যে বোধহয় সবচেয়ে স্মরণীয় 'চরিত্র'। মহামায়ার কথোপকথন এত স্বাভাবিক হয়েছে যে তিনি চোখের সামনে ভাসেন। বইটা আজ কামাক্ষীকে দিয়ে এলাম।

কয়েকদিন রক্তস্নানের পর দিল্লী আপাতত ঠাণ্ডা। কয়েকদিন নিস্ফল [য] আক্রোশে সময় কাটালাম। নেহাৎ মাস্টার আর মাঝে মাঝে সাহিত্যচর্চা করি, সেজন্য শেষপর্যন্ত চুপচাপ ছিলাম। কিষাণ কিম্বা মজুর হলে কী করতাম জানিনা। আমাদের কলেজ গত ১০ই অগস্ট থেকে বন্ধ. কাল খোলার কথা আছে। অন্যান্য কলেজের অবস্থা একইরকম। সেপ্টেম্বরে অর্থাভাব না হলে কলকাতায় যাবো ভাবছিলাম, কিন্তু এবছরে বোধহয় ও সময়টা ছুটি হবেনা। আসছে বছরে হয়ত হেঁটে কলকাতা যেতে হবে. কর্তাদের যা efficiency।

আপনাদের খবর কী ? মিসেস বোস্ কেমন আছেন ? কলেজ কি খোলা ? আপনাকে একটি পোস্টকার্ড ১১ই আগস্টে লিখেছিলাম. আশা করি এতোদিনে পেয়েছেন। চঞ্চলের বই-এর সমালোচনা এখনো হয়নি। এবার চেষ্টা করব। আপনার সঙ্গে দেবীর দেখাসাক্ষাৎ হয় ? সুভাষের খবর রাখেন ?

আশা করি ভালো আছেন। ইতি

সমর সেন

আজ কলেজ গেলাম. কিন্তু ছাত্ররা এখনো ধর্মঘট করছে। বলছে যে আজাদী না পাওয়া পর্যন্ত পড়াশুনো করবেনা। সভা কিম্বা procession. তাও চলবেনা. কারণ পুলিশ আছে। কয়েকটা ফরওয়ার্ড ব্লকের গুণ্ডা এই সুযোগে খুব প্রতিপত্তি করে নিচ্ছে মনে হল ; তাদের হাবভাব দেখে মনে হয় গান্ধিজীর পোষ্যপুত্র। চার-দিকে এতো বিশৃঙ্খল উত্তেজনা যে কম্যুনিষ্ট পার্টির সব শ্লোগান অরণ্যে রোদনের মত হচ্ছে।

রেখার appendicitisএর মত হয়েছে. তবে এখন ভালো আছে। কামাক্ষী খুব চিন্তিত।

কাল 'ত্রিকাল' ও 'চতুরঙ্গ' পেলাম। কয়েকটি প্রবন্ধ বেশ লাগল।

২৪. ৮. ৪২

২৬

৮.১০.৪২

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

আমার চিঠি, রিভিয়ু ও অনুবাদ আশা করি পেয়েছেন। দু একদিনের মধ্যে আরো কয়েকটির অনুবাদ করেছি, সেগুলো এইসঙ্গে পাঠাচ্ছি। "টাইম্‌স্"-এর সেই সংখ্যাটা আমার কাছে নেই। ওতে Amor stands upon you ও 'মুক্তি' নামের কবিতাটির প্রথম stanzaর অনুবাদ ছিল। 'মুক্তি'র শেষ কয়েকটা লাইন অনুবাদ করে পাঠাচ্ছি, আপনার কাছে "টাইম্‌স্" থাকলে জুড়ে দিতে পারেন। নামটা ইংরিজীতে Escapist করেছি।

দিল্লীতে এরি মধ্যে সকালের দিকে বেশ শীত পড়ে। কামাক্ষী এসেই একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছে, ম্যালেরিয়া যাতে না হয় তার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আমাদের খবর মোটের ওপর ভালোই।

মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? আপনি নিশ্চয়ই শরীরের দিক থেকে ভালোই আছেন।

"কালো হাওয়ার" রিভিয়ু আশা করি খুব নির্বোধ হয়নি। ইতি

সমর সেন

Escapist

2nd stanza (?)

How can this darkness, wild with the scent of Ketaki flowers, touch me? Like an island, I am distant and withdrawn in my own darkness, I have in me the peace of the grey silence of the rocks.

২৭

১৭. ১০. ৪২

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

রিভিয়ু ও অনুবাদ পেয়েছেন জেনে নিশ্চিন্ত হলাম। আজকাল ডাক্‌বাক্‌সে চিঠি ফেলে মাঝে মাঝে মনে হয় আগুনে ফেলছি।

আপনি যে ইংরাজ ভদ্রলোকের কথা লিখেছেন তাঁকে খুঁজে বের করা মুশকিল হবে. এখনো চেষ্টা করিনি।

এ সংখ্যা কবিতায় শেষের কবিতার সমালোচনা বেশ ভালো লাগল। গতবছর এ সময় রবীন্দ্রনাথের পুরোনো উপন্যাসগুলো অনেকদিন পরে পড়ে খুব বিস্মিত হয়েছিলাম ; যোগাযোগ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে বোধহয় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস লিখেছেন. ও বইটি পর্যন্ত তাঁর লেখায়. সুধীনবাবুর ভাষায়. ব্যক্তিস্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। যোগাযোগে [-শেষের কবিতায় বু.ব.] তিনি ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের [য] খপ্পরে পড়েন. এবং সেই থেকে ঔপন্যাসিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অবনতি শুরু হয়।

এ সংখ্যা আনন্দবাজারে মাণিকবাবুর [য] সহরবাসের ইতিকথা ও আর একটি উপন্যাস চতুষ্কোণ [য] পড়লাম। দুটোই বাজে মনে হল। মাণিকবাবু [য] বাঙালী বুর্জোয়াদের সম্বন্ধে লিখতে শুরু করে কেলেঙ্কারী করেছেন।

কলকাতার হালচাল কী? আপনি কি পুজোর [য] সময়টা কলকাতাতেই কাটাবেন? দিল্লীর খবর ভালো। ম্যালেরিয়া অনেক কমেছে. শুনছি নাকি উত্তাপ ৬০° নীচে নামলেই মশারা বিলকুল মরে যায়। কয়েকদিন আগে ৫৯° হয়েছিল। তাই নিশ্চিন্ত আছি।

গতকাল এলিয়ট্‌ B.B.C.-তে East Coker-এ [র] আবৃত্তি করলেন. চমৎকার লাগল। আপনি শুনেছেন না কি? আসছে সপ্তাহে Burnt Norton পড়বেন। দিনটা এখনো announce করেনি। এলিয়টের গলার mature melancholyটা উপভোগ্য।

কলকাতায় ফিরে যাবার মহৎ সঙ্কল্প আছে। ইংলণ্ড ও আমেরিকার কর্তাদের মত ১৯৪৩-এ এবিষয়ে offensive নেবো। কী হবে জানিনা। চাকরীর বাজার ত খুব খারাপ।

মিসেস্‌ বোস্‌ এখন কেমন আছেন? আমাদের খবর ভালোই। সঙ্গে আর একটা অনুবাদ পাঠাচ্ছি। ইতি

সমর সেন

সুভাষকে গতবারে কলকাতায় বলেছিলাম যে কী যুদ্ধে কী কবিতায় সবচেয়ে দরকারী জিনিষ defence in depth, Maginot Line নয়। কয়েকটা সাম্প্রতিক লেখা পড়ে আবার ও ধারণা বদ্ধমূল হল।

[চিঠির পরে "Past days haunt the present" অনুবাদটি যুক্ত আছে। বর্তমান সংখ্যার সমর সেন-কৃত ইংরেজি রচনা-পর্যায় দ্রষ্টব্য।]

২৮

১৭. ১. ৪৩

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। অনেকদিন পরে কলকাতা থেকে লম্বা চিঠি পেলাম। মাঝে অশোকের একটি নাতিদীর্ঘ চিঠি এসেছিল, কিন্তু আমার কুকুরটা একটু চিঠিপ্রিয়, তার সমস্তটা সাবাড় করে দেয়। পিওন আসার সময় হলে বারান্দায় ঘোরা-ফেরা করতে হয়।

কামাক্ষীর চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম যে আপনাদের সান্ধ্য মজলিস্ আজকাল আর বসেনা, কামাক্ষী অবশ্য লিখেছে যে তাতে ওর কোনো অসুবিধে হয়না, কেন হয়না বুঝতেই পারছেন। ওর মত প্রেমিক বাংলাদেশেও দুর্লভ।

আপনার চিঠি পাবার পরই কাগজে দেখলাম বেঁটেরা আবার কলকাতায় হানা দিয়েছে। চন্দ্রালোকে বোধহয় নোগুচীর কবিতা পড়তে পড়তে আসে। ক্রিসমাসে যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অর্থাভাবে যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া বাড়ীতে কলকাতায় যাবার প্রস্তাব করলে কিছুক্ষণ পরে নিজেকে বিয়োগান্ত নাটকের নায়ক বলে মনে হয়। মাঝে কলকাতায় চাকরীর খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু বিশেষ সুবিধে হয়নি। এখানো ক্রমশ জড়িয়ে পড়ছি।

হারীনবাবুর সঙ্গে কাল দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক একটু বোহেমিয়ান, তবে মদ্যপান ও ধূমপান একেবারে ত্যাগ করেছেন। নিজের অনেক কবিতা পড়ে শোনালেন, গানও গাইলেন। ভদ্রলোকের গলাটা খুব ভালো। বোহেমিয়ান সাহিত্যিক দেখলে একটু অস্বস্তি হয়। বছর দশেক আগে বোধহয় ওরকম হওয়াই আদর্শ ছিল। রাজনৈতিক কর্মী বোহেমিয়ান হলে এখনো ভালো লাগে। রাজনৈতিক কর্মী যদি মুড়িপাড় ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবী [য] পরে লপেটা জুতোয় ঘুরে বেড়ান, তাহলে গা জ্বালা করে। বছর দশেক পরে হয়ত এঁদেরও ভালো লাগবে। হারীনবাবুর কাছে Boatman Boyএর কপি নেই, এখনও পযন্ত প্রকাশকেরা ওঁকে পাঠাননি। কয়েকটি বাংলা কবিতা কাল দিয়ে এসেছি। আপনার কী কী কবিতার অনুবাদ হয়ে গিয়েছে, আমাকে জানাবেন।

'একসূত্রে' খুঁজে পাচ্ছিনা, পেলেই রিভিয়ুটা পাঠাবো। কালো হাওয়ার রিভিয়ু যদি দিন পনেরো পরে পাঠাই, তাহলে কি খুব অসুবিধে হবে? আমার হাতে এখন একগাদা পরীক্ষার খাতা জমেছে, সেগুলো শিগগীরই শেষ করতে হবে। কলেজে নতুন অধ্যক্ষ আসায় একটু কর্তব্যপরায়ণ হয়েছি।

মাঝে একদিন রাস্তায় ডঃ গুহঠাকুরতার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়েছিল। চেহারা অনেক বদলে গিয়েছে, প্রথমে চিনতে পারিনি। জিজ্ঞেস করাতে বলেছিলাম "আপনি শিশির ভাদুড়ীর কোনো ভাই।" মিসেস্ বোস্ কেমন আছেন? আর মিমি ও রুমী? সুলেখা ও বাচ্ছা ভালোই আছে। একটা কবিতা পাঠাচ্ছি। ইতি

সমর সেন

কলকাতায় যেতে মে মাস হবে।

২৯

১৫. ২. ৪৩

বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি দুএকদিন হল পেয়েছি। খুব তাড়াতাড়ি কালো হাওয়া ও বোটম্যান বয়ের সমালোচনা পাঠাচ্ছি। এবারে কালো হাওয়ার সমালোচনাটা সুবিধের হলনা, হাতের কাছে বইটা ছিলনা। বোটম্যান বয় আমার একেবারেই ভালো লাগেনি, তবে মনে হয়েছে যে উড়িয়া জানলে বইটির প্রতি সুবিচার করা যেত। আপনি আরো কয়েকদিন সময় দিলে ভেবেচিন্তে বোটম্যান বয়ের রিভিয়ু করতে পারতাম। অনুবাদের ব্যাপারটা দেখে ঠিক করেছি যে হরীন্দ্রের কাছ থেকে সমস্ত বাংলা বই সত্বর ফেরৎ নেবো।

কলকাতার কিছু খবর আপনার চিঠিতে পেলাম। কামাক্ষী ও দেবীর চিঠি অনেকদিন পাইনি। শুনলাম ওরা পুনরুজ্জীবন নাটকটির অভিনয় করেছিল।

আপনাদের খবর দিয়ে চিঠি দেবেন। এখানে সময় কাটতে চায়না, আড্ডার নিদারুণ অভাব বাজে কাজে এক একটা দিন কাটছে।

মিসেস বোস্ কেমন আছেন?

আমাদের খবর একরকম। সুলেখার হার্ণিয়া [য] operation শিগগীরই হবে। বাচ্ছা ভালোই আছে। ইতি

সমর সেন

৩০

৫. ৩. ৪৩

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। এ কদিন একটু ব্যস্ত ছিলাম। সুলেখার অস্ত্রোপচার হয়ে গিয়েছে। গত শুক্রবার হয়েছে। ফিরবে বোধহয় রবিবার। এখন বেশ ভালোই

আছে, আমরা যারা হাঁসপাতালে [য] পালা করে থাকি তাদের খুব খাটিয়ে নেয়। সার্জন প্রায় বারো ইঞ্চি [য] কেটেছে। ভাবলেই পেট কুরকুর করে। শুনছি আবার চলাফেরা করতে স্বলেখার প্রায় মাস দেড়েক লাগবে।

এখানকার আর সব খবর একরকম। আপনি রিভিয়ু থেকে কোন লাইন বাদ দিয়েছেন আন্দাজ করতে পারছি। অবশ্য ওটা বেরুলেও কোনো ক্ষতি হতনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ৯ই অগষ্টের পর মার্কিষ্টদের [য] "অখণ্ড সত্তাও" কিছু আলোড়িত হয়েছে: তাই বীররস সহজেই শূন্যে হাতপা ছোঁড়ায় পরিণত হয়, তাই "একসূত্রে" পড়ে মনে হয় waste and void, waste and void. অগষ্টের অনেক আগে প্রকাশিত 'প্রাচীরে' যে বিশ্বাস ছিল সেটা "একসূত্রে" নেই। অবশ্য সাম্যবাদীদের উপরে চটা আমি নই, বোধহয় নান্যপন্থা [য] বিদ্যতে অয়নায়। কিন্তু যখন শুনি যে বিশিষ্ট কবিরা বলে বেড়াচ্ছেন যে গান্ধিজীর সঙ্গে স্বভাষ বোসের তফাৎ নেই, তখন মনে হয় we ha e lost the old integrity of patriotism, and are yet a long way from the new integrity of socialism (ইংরিজি পংক্তিটা কেষ্টর)।

এখানে ডঃ বারেন গাঙ্গুলী এবং আরো কয়েকজন মিলে একটি পত্রিকা বের করছেন, তাতে বিভিন্ন প্রদেশের লেখা ছাপানো হবে। ডঃ গাঙ্গুলী আপনাকে, এবং আপনার মধ্যস্থতায়, অন্যান্য বাঙ্গালী লেখকদের, অনুরোধ করছেন লেখা পাঠাবার জন্য। বছর তিনেক আগে আপনাদের কয়েকটি গল্প ত অনূদিত হয়েছিল, এবং সম্প্রতি কয়েকটি কবিতাও ত আপনারা ইংরিজীতে তর্জমা করেছেন। তার থেকে কিছু পাঠাবেন? বিষ্ণুবাবু, অজিতবাবু ইত্যাদিকে বলবেন।

আপনারা যদি লেখা পাঠান তাহলে এ মাসের শেষেই কাগজটি বেরুতে পারে। চৌবংবয়ের [য] সঙ্গে আপনার আলাপ আছে? স্বভাষকে যদি আমার হয়ে লেখা পাঠাতে বলেন ত বাধিত হবো। গতবছরে সোমেন চন্দের 'ইঁদুর' গল্পটির কিছুটা আমি অনুবাদ করেছিলাম। সেটা এ পত্রিকায় দেবো।

আশা করি আপনাদের আর সব খবর ভালো। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি এবারে দেরীতে শুরু হবে, ৮ই মে নাগাদ। আমার কলকাতা যেতে মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হবে। কলকাতায় গিয়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ না হলে অত্যন্ত খারাপ লাগবে।

আশা করি কিছু অনুবাদ নিশ্চয়ই পাঠাবেন। ইতি

সমর সেন

৩১

১৩.৩.৪৩

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়েছি। কবিতাটির জন্য ধন্যবাদ। অনুবাদটা খুবই ভালো হয়েছে। আপনি কি বিষ্ণুবাবুকে কবিতার জন্য বলেছিলেন? বিষ্ণু-বাবুকে চিঠি লিখে উত্তর পেতে অনেক দেরী হয়ে যায় বলে নিজে লিখিনি।

'কবিতা'য় সে কবিতাটি পাঠাবার পর আমি আর কিছু লিখিনি। উৎসাহ পাইনা। স্ত্রীর অপারেশন নিয়ে কয়েকদিন ব্যস্ত ছিলাম; দুএকদিন হল একটু ম্যালেরিয়ার মত হয়েছে। আর জানেন ত, ম্যালেরিয়া কবিতার মহাশত্রু।

কাল কামাক্ষীর চিঠিতে জানলাম ওরা একটি মাসিক পত্রিকা বের করছে। যুদ্ধের বাজারে এ তৎপরতা প্রশংসনীয়।

এখানকার আর সব খবর একরকম। দিন দিন জীবনযাত্রা একঘেয়ে হচ্ছে, বিকেলে বাড়ী থেকে বেরুতে ইচ্ছে করেনা (পত্নীপ্রেমের জন্য নয়), কোথায় যাবো ভেবে পাইনা। একজনের বাড়ীতে প্রায়ই যেতাম, কিন্তু সম্প্রতি সে রাতা-রাতি বড়লোক হবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে, সাহিত্যানুরাগ বেমালুম উবে গিয়েছে। সুতরাং বাধ্য হয়ে কয়েকদিন কয়েকটা পুরোনো বাংলা উপন্যাস পড়লাম। "অপরাজিত" গাঁজা খেয়ে লেখা মনে হল, 'বিপ্রদাস' পড়ে শরৎবাবু যে কতখানি নির্বোধ ছিলেন সেটা উপলব্ধি করলাম।

দেশের কথা আর বলবেননা। মধ্যবিত্তদের সমূহ বিনাশ না হলে আমাদের কোনো আশা নেই। আমাদের কলেজের হিন্দুস্থানী লোকেরা সবাই বড়ো পেট্রিয়ট, গান্ধিভক্ত। আজকে মহামান্য বড়োলাট-বাহাদুরের বাড়ীতে বিভিন্ন কলেজ অধ্যাপকদের চায়ের নিমন্ত্রণ, সবাই সুর সুর [খ] করে গেলেন। আমি না যাওয়াতে অনেকেই চটেছেন। এ দেশের যে কি হালৎ হবে ভেবে পাইনা।

কলকাতায় পৌঁছুতে ১৫ই মে হবে। আশা করি সে সময় কলকাতায় থাকবেন।

কবিতাটির প্রুফ পাঠাতে বলব। আমি দেখে দিলে কী হবে?

আশা করি আর সব খবর ভালো। ইতি

সমর সেন

৩২

১৮.৮.৪৩

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু

আপনার চিঠি ও বইগুলো পেয়েছি। অশোককে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার চেনাশুনো লোক এত আছে যে সবাইকে বই দেওয়া সম্ভবপর হবেনা। কামাক্ষী, দেবী, চঞ্চল, এদের নিশ্চয়ই দিয়েছেন। তাছাড়া বিষ্ণুবাবু, আইয়ুব, হীরেনবাবু, হাবুলবাবু, অজিতবাবু, এঁদের দিতে পারেন। যদি অসুবিধে না হয় তাহলে কেষ্টকে (K. Gupta, P 151B, Raja Basanta Roy Road, Kalighat) এবং আমার ভাই-কে (যার কাছে এবার ছিলাম) পাঠাতে পারেন।

ভারতী সরাভাই-এর বই-এর রিভিয়ুটা পাঠাচ্ছি। আমি মাঝে একটা ছোট কবিতা লিখেছিলাম, সেটা প্রতিজ্ঞাপালনার্থে অজিতবাবুকে পাঠিয়েছি। তার পরে আর কিছু লিখিনি, এবং লিখতে প্রবৃত্তিও হচ্ছেনা। বোধহয় দিল্লীতে আর বেশীদিন বসবাস করলে চিঠি লিখতেও ভালো লাগবেনা।

এখানকার আর সব খবর ভালোই। আপনাদের খবর দিয়ে চিঠি দেবেন। অজিতবাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে প্রবন্ধ এখনো লিখে উঠতে পারিনি। দিল্লীর মহাপণ্ডিত ছেলেদের পড়িয়ে যখন বাড়ী ফিরি তখন লেখাপড়ার প্রবৃত্তি থাকেনা। Infant, individual, ইত্যাদির মানে নিয়ে অত্যন্ত মাথা ঘামাতে হচ্ছে।

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। ইতি

সমর সেন

[বিপরীত পৃষ্ঠায় ভারতী সারাভাই-এর The Well of the People-এর সমালোচনার খসড়া।]

৩৩

7.10.43

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু,

আপনার চিঠি অনেকদিন পাইনি। কিছুদিন আগে কবিতা পেয়েছিলাম। কয়েকদিন আগে দিগন্ত পেয়েছি। এবারে পূজোসংখ্যা [য] পত্রিকা বেশী আসেনি। কবিতা পূজোসংখ্যা [য] কবে বেরুচ্ছে ?

এখানকার খবর একরকম। ঘরে ঘরে ম্যালেরিয়া। পূজোবাড়ীতে [য] থিয়েটার ও খাওয়া দাওয়া হচ্ছে। অল্প সল্প ঠাণ্ডা পড়েছে। আমাদের বাড়ীতেও অসুখ

বিসুখ। কলেজ বন্ধ. শিগগীরই খুলবে। এবারে পূজোর [য] ছুটিটা একেবারে মাঠে মারা গেল।

কলকাতায় যাবার চেষ্টা করছি, কিন্তু সুবিধে হচ্ছেনা। বছর তিনেকের মধ্যে বাজারদর কমে গিয়েছে। কলকাতা ছাড়া সহজ. ফিরে যাওয়া কঠিন।

শুনে সুখী হবেন রবীন্দ্র রচনাবলী মনযোগ [য] দিয়ে পড়ছি। এখন পর্যন্ত কোনো মহান "সত্যের" মুখোমুখি হইনি। 'কড়ি ও কোমল' ভালো. মানসী সুবিধের ঠেকছেনা। অবশ্য এ সব বই যে প্রথম পড়ছি. তা নয়।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ইতি

সমর সেন

হাতে গোটা দুই কবিতা আছে। কবিতা পত্রের সংখ্যার ত এখনো অনেক দেরী।

৩৪

৬.১১.৪৫

প্রিয় বুদ্ধদেববাবু

আমার আগের চিঠি পেয়েছেন নিশ্চয়। ইতিমধ্যে একটা বড়ো কবিতা লিখেছি. সেটা পাঠাচ্ছি। কবিতাটি ছাপতে অসুবিধা হতে পারে. দৈর্ঘ্যের জন্য যদি আপনার অসুবিধে হয় তাহলে আমাকে জানাবেন।

এখানে একঘেয়েভাবে সময় কাটছে। আমার প্রত্যেক চিঠিতেই আর্তনাদের সুর থাকে বোধহয়। কিন্তু বনবাসে থাকার সময় সেটা মার্জনীয়। যদি কোনো যোগ্য কারণে থাকতে হত তাহলেও সান্তনার [য] সুযোগ ছিল। কিন্তু দিনের পর দিন ভূতের মত কাটাতে কাটাতে বিশ্রী লাগছে। বিকেলে একটি আধ-পাগলা লোকের বাড়ীতে ক্যারম্ খেলি। পুরোনো বাংলা কবিতা কিছু কিছু যোগাড় করছি. পড়তে ভালোই লাগছে।

জিনিষপত্রের দাম ক্রমশ বাড়ছে। আপনাদের খবর আশা করি ভালো। আমাদের একরকম. তবে মাঝখানে চাকরের বিড়ম্বনা চলেছে। দিন কুড়ি চাকর নেই। সুলেখার পিত্রালয় কাছে ছিল বলে রক্ষা. নইলে বাসন মাজতে মাজতে হাতে হাজা পড়ে যেত। সুলেখা আর আমার বোনের হাতের কথা বলছি।

কামাক্ষীদের কাগজ কতদূর এগোল? কলকাতার চিঠিপত্র আজকাল কম পাই। কাগজে বাংলাদেশ নিয়ে তর্কবিতর্ক বাগবিতণ্ডা অসহ্য ঠেকে। হয়রাণীর একটা সীমা আছে। কী কুক্ষণে আমাদের দেশে Legislative Assembly হয়েছিল।

আশা করি আপনাদের পারিবারিক খবর ভালো।

ইতি সমর সেন

৩৫

২৫.১১.৪৭

বুদ্ধদেববাবু,

চিঠির জবাব দিতে অনেক দেরী হয়ে গেল. এবারে সত্যিই ব্যস্ত ছিলাম। মাঝে কয়েকদিন ঠাণ্ডা লেগে শয্যাগত ছিলাম. তার ওপর কলেজে কাজের চাপ। অনেক বাংলা ক্লাস নিতে হচ্ছে. ফলে মাতৃভাষার ওপর দখল বেড়েছে।

আপনাদের সব খবর কী? হ্যারল্ড অ্যাক্টন্‌কে আন্দাজে দিল্লীর ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছিলাম. উত্তর পেয়েছি সিংহল থেকে। আপনার কবিতার কথা লিখেছেন।

এখানে বেশ শীত পড়েছে। কলকাতার অবস্থা কী রকম? শুনছি মাঝে দুবার বাঁশী বেজেছিল। কামাক্ষীর সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছিল. হঠাৎ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাল। ইয়েটস মনের কথা লিখেছিলেন—We are the *last* romantics.

কবিতার জন্য একটা কবিতা পাঠাচ্ছি।

মিসেস বোস আশা করি এখন ভালো আছেন। সুধাংশুর কাছে এবং হীরেন-বাবুর প্রবন্ধে (যেটা People's Warএ প্রকাশিত হয়েছে) বাংলা সাহিত্যের অনেক খবর পেলাম। ভারতের ও আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব নিশ্চিন্ত বোধ করছি। ইতি

সমর সেন

৩৬

১৩।৫।৫৩

প্রীতিভাজনেষু,

ইয়াঙ্কদের ভারতপ্রীতি অসম্ভব বেড়ে গিয়েছে, সেটা ভাবনার কথা। শুনছি বিষ্ণুবাবু এতো বিচলিত যে, কোনো লেখা পাঠাননি। আপনার কথামত প্রকাশিত অনুবাদ গোটা পাঁচেক পাঠিয়েছিলাম, পরে আবার Tambimuttuকে পাঠিয়েছি। কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে মনে হয় সময়ের অপব্যয় করছি। যা-হোক, যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

আপনি মহিশূরে (মহীশূর?) কদিন থাকবেন? জায়গাটা শুনেছি খুব

ভালো। মিসেস্ বোস্ কি গিয়েছেন ? শুনছিলাম ওঁর প্রযোজনায় 'গৃহপ্রবেশ' খুব ভালো হয়েছিল, বিশেষ করে মিমির অভিনয়। বেয়াড়া সময়ে অফিস থাকাতে কোনো জায়গাতেই যেতে পারিনি। আজকাল রবীন্দ্রজয়ন্তী দুর্গাপূজার [য] মত পাড়ায় পাড়ায় হচ্ছে, সেটা ভালো কথা। আসছে বছর শুনছি ঢাক ঢোলও বাজানো হবে।

সুকান্ত কি মহাকবি ? আমার কল্পনা ও বোধশক্তি এতো কমে গিয়েছে যে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনা।

এখানকার বিশেষ কোনো খবর নেই। শুধু দিনগত পাপক্ষয়।

সমর

সমর সেন বিষ্ণু দে-কে

১

C/o Tirath Prakas
Belwaticai
Daltongonj. E I. R.
26. 9. 38

বিষ্ণুবাবু

এখানে দিন কতক হল এসেছি। জায়গাটি ভালো লাগবার পক্ষে ভালো, তবে কেন জানিনা বিশেষ সুবিধের লাগছেনা। বেশী দূরে গেলে বাঘের সাক্ষাৎ মেলে শুনেছি। সেজন্য সন্ধ্যে হলেই গৃহমুখে রওনা হই। বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সাহসের অভাব ঘটছে। রাত্রে গরম, অথচ খালি গায়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগে। বিশেষ মুস্কিলে পড়েছি। আর দিন তিনেক পরে এ স্থান পরিত্যাগ করব।

আপনার বাবা এখন কেমন আছেন? আপনার বাবার কথা বলতে নিজের পরিবারের কথা মনে হল। পরিবারের সঙ্গে বিদেশে বাস বাল্যকালের পরে এই প্রথম। বাড়ী ও চাকর ঠিক করা, মাঝে মাঝে বাজার সরকারী, এসব করতে হচ্ছে। হাউসের ভাষায় মাঝে মাঝে 'পরিবার গরু' (household cow) বলতে ইচ্ছে করে।

আপনার সঙ্গে চঞ্চলবাবুর দেখাসাক্ষাৎ হয়? হীরেণবাবুর [য] আর মিঃ আইয়ুবের?

কাল এক কপি 'কবিতা' এবং অশোকবাবুর চিঠি পেলুম।

আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আমার মানসিক অবস্থা ক্রমশই নানা-কারণে neurotic ভাবাপন্ন হচ্ছে। মোক্ষহীন ভিক্ষুকের বিষণ্ণ আবেগে ঘুরতে আর ভালো লাগছেনা। শিগগীরই কলকাতায় রওনা হবো। সুধীনবাবুর 'স্বগতের' খবর কী?

আমার নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

অবকাশ না হলে চিঠির জবাব দেবেন না।

২

8/10/38 C/o Babu Panchanan Bhattacharya
Jamtara. E. I. R.

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি ঘুরে এখানে এসেছে। ডালটনগঞ্জে অত্যধিক পারিবারিক পরিশ্রমের পর আপনি বাঁচলে বাবার নাম এই সুপ্রসিদ্ধ বাণী স্মরণ করে জামতাড়ায় চলে এসেছি। বাবার সংসারে বসবাস করা আর পোষায়না।

'কবিতা'য় আপনার সনেটগুলি ছাপার অক্ষরে পড়ে বেশ ভালো লাগল। আমার অবস্থাটা প্রথম সনেটটার মতো। সেটাকে যদি রোমান্টিক nostalgia ভাবেন তাহলে নিরুপায়। সুধীনবাবুর কবিতাও ভালো লাগল; তবে শেষের কয়েকটি লাইন একটু আড়স্ট [য] বলে মনে হল। সেটা হয়ত সুধীনবাবুর প্রগতিক হবার পথের প্রথম সঙ্কোচ। আপনারা যে রেটে বামপন্থী হচ্ছেন তাতে অশোকবাবু এবং আমি বিচলিত এবং চিন্তিত। অশোকবাবু লক্ষ্ণৌ [য] থেকে একটি চিঠি লিখেছেন। বাড়ীর গোলমালে তিনি বিশেষ বিব্রত জেনে আনন্দিত হয়েছি।

আজকাল নিয়মিতভাবে অমৃতবাজার পত্রিকার বিজ্ঞাপনগুলি অধ্যয়ন করি। একটি কলেজে চাকরী খালি ছিল সেখানে আবেদন পেশ করেছি। আপনাদের কলেজে ত বিশেষ সুবিধে হবে না এ বছর। মফঃস্বলের কোনো কলেজে চাকরী পেলে শুস্কপ্রায় [য] কবিপ্রেরণা জীবনানন্দবাবুর মতো আবার চাগিয়ে উঠবে বোধহয়। তখন বরিশাল-বাসী জীবনানন্দবাবুর মতো অন্তঃপ্রেরণা ভোরের শালিকের মতো আবার বুকের মধ্যে বাসা বাঁধবে, কীটপতঙ্গকে নিরন্তর দার্শনিক প্রশ্ন করব, সাদা ঘোড়ায় চেপে নক্ষত্রলোকে যাবার বন্দোবস্তও হবে। বুদ্ধদেববাবুর সমালোচনা এতো দীর্ঘ যে এক বসায় শেষ হচ্ছেনা। মাঝে মাঝে ঠুকরিয়ে ঠুকরিয়ে পড়ছি।

মিঃ আইয়ুব শুনলুম দার্জিলিং-এ যাবেন। বুদ্ধদেববাবুর চিঠি পেয়েছি। তিনি আরামে আছেন।

'চতুরঙ্গ' এখনো পাইনি।

আপনারা সকলে কেমন আছেন? চঞ্চলবাবুকে আমার প্রীতি-নমস্কার দেবেন। নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর সেন

৩

সাগরমান্না রোড,
বেহালা
১০ই মে

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়েছি শনিবার দিন। উত্তর দিতে দেরী হল বলে আশা করি কিছু মনে করবেননা। এবারের গ্রীষ্মে [য] হ্রদের [য] ধারে শান্তি পাবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছিনা। যে ভদ্রলোকের কাছে টাকা ধার পাব বলে আশা করেছিলাম তিনিই দিন কয়েক আগে আমার কাছে ধার চেয়ে বসলেন। ফলে ব্যাপারটা কী হল বুঝতেই পারছেন। গত শুক্রবার আমার এক বন্ধু এখানে এসে-ছিলেন তার পরের দিনই শিলঙে যাওয়ার প্রস্তাব নিয়ে। ধার দিতে তিনি রাজী ছিলেন. কিন্তু নানা কারণে এখনো যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কোয়েটা গমনের সম্ভাবনা এখনো আছে। শেষ পর্যন্ত কী হবে জানিনা। আপাততঃ torn on the horn between season and season। আপনাকে ১৩ই ১৪ই নাগাদ finally পুরী যেতে পারব কিনা জানাব।

কেশববাবু কেমন আছেন? আপনারা নিশ্চয়ই মনের আনন্দে সময় কাটাচ্ছেন। এখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্ম [য] আর প্রচুর ঘাম। জ্যোতিরিন্দ্রবাবু, মিঃ আইয়ুব এঁরা ওখানে গিয়েছেন কি?

আমার নমস্কার জানবেন। ইতি

আপনাদের
সমর সেন

৪

২৪. ১০. ৩৯

বিষ্ণুবাবু,

আমি মাঝে কলকাতা ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলুম, ফিরেছি কাল রাত্রে। আজকে সারাদিনের মধ্যে আপনাদের চিঠির পাত্তা পাইনি, কারণ, জানেন ত এ বাড়ীতে ওসবের ঠিক থাকেনা। দুপুরে লক্ষ্ণৌএর [য] টিকিট কেটে বিকেলে এইমাত্র ফিরেছি; ডেস্ক হাতড়াতে গিয়ে আপনাদের চিঠি আচম্কা পেলুম; কিন্তু এখন দেরী হয়ে গিয়েছে। মিসেস্ দে'কে বলবেন যে তিনিই যেন আমার অকারণ এবং দুর্বিনীত গোঁ মাপ করেন; তার জন্য যদি পায়ে পড়তে হয় ফিরে এলে তাই করব। আপনি নিশ্চয়ই চটবেননা, কারণ আপনি ত মনোমালিন্যের উর্দ্ধে [য]।

চঞ্চলকে বল্‌বেন যে ওর দুটো লাইনে যে নিরুদ্ধ আহ্লাদ ফুটে বেরিয়েছে তাতে আমি শঙ্কিত। কী করে বিপুল চঞ্চলকে সামলাচ্ছেন সেটা রহস্যের বিষয়। মিঃ আইয়ুব কী [য] গিয়েছেন?

দেবীকে জানাবেন যে মহেশমুণ্ডা যাওয়ার কল্পনা সুদূরপরাহত। দেবীবাবুর হৃদয়ঘটিত ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ মনে হচ্ছে। রামবাবুর মতো রক্ষক কলিকালে দুর্লভ।

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি কাল পাঞ্জাব এক্স্‌প্রেসে লক্ষ্ণৌ [য] যাচ্ছি। আপনারা কদিন থাক্‌বেন? যদি বেশীদিন থাকেন তাহলে ফেরার পথে গেলে হয়ত তাড়িয়ে দেবেননা।

নমস্কার নেবেন। ইতি

সমর

বুদ্ধদেববাবুর গিরিডি যাওয়ার কথা ছিল, গিয়েছেন কিনা জানিনা; দিন কয়েক দেখা হয়নি।

৫

C/o Sudhindra Bose
Birkett Road, Nazarbagh,
Lucknow.
2. 11. 39

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি দিন দুয়েক হোলো পেয়েছি। উত্তর দিতে পারিনি, কারণ হাতে পয়সা ছিলনা, এবং পায়ে একটা পেরেক ফোটাতে বেশী দূর হাঁটার ক্ষমতা ছিলনা। শুক্রবারের মধ্যে আপনাদের ওখানে গেলে মিসেস্ দে মাপ করবেন লিখেছেন, এখানে এসেছি দিন পাঁচেক আগে, এর মধ্যেই ফিরি কি করে?

শিমূলতলায় দিন তিনেক ছিলুম। লক্ষ্ণৌ-এ [য] যে ছেলেটির বাড়ীতে উঠেছি সে শিমূলতলায় আমি যাওয়া পর্য্যন্ত ছিল; এক সঙ্গেই এখানে এসেছি। এখন কোনো কাজ নেই, দিনরাত্রি রেডিও শুনছি, আর ওস্তাদীগানের সুরে শূন্যে তুড়ি মারছি। আছি বেশ; নড়বার আগ্রহ বেশী নেই।

দেবীর মহেশমুণ্ডায় মুণ্ডপাত ব্যাপারটি কী? চঞ্চলকে বলবেন যে তার ছ্যাব-লামী ছাড়ার বয়স হয়েছে, কারো নজরে বন্দী হওয়া—এ সব কথা মাথায় ঢোকে কেন? ওর কিছু বন্দোবস্ত করেছেন?

ধূর্জটীদাব [য] সঙ্গে দেখা করিনি; আজ বিকেলে হয়ত যাবো। মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে খবর দেবো।

নমস্কার নেবেন। মিসেস্ দে'কে আমার প্রতি সদয় হতে অনুরোধ করবেন। ইতি

সমর

আপনারা কদিন থাকবেন ?

৬

12B, Daryagunj, Delhi
15. 2. 41.

বিষ্ণুবাবু,

নভেম্বরের প্রথম দিকে সত্যিই একটা চিঠি আপনাকে লিখেছিলাম। চিঠিটা পাননি, তার কারণ যে হোটেলের লোকের হাতে পয়সা দিয়ে ফেলে দিতে বলতাম, তারা খুব সম্ভব পয়সা মেরে দিত। হোটেল ছেড়েছি ডিসেম্বর মাসে, দিল্লী ফোর্টের ঠিক পশ্চিম কোণে একটা ছোট বাড়ী নিয়েছি ; আমার সঙ্গে লক্ষ্ণৌ-এর [যে] একটি ছেলে থাকে (অশোক যাকে আপনার সম্বন্ধে প্রকাণ্ড একটি চিঠি একবার লিখেছিল ; যে আমাকে dead horse বলেছিল)। আড্ডা মারবার লোকের অভাব নেই, ওটা একটু বেশীই হচ্ছে।

কলেজে সপ্তাহে ২১টা ক্লাস। ফাঁকি দিতে এর মধ্যেই ওস্তাদ হয়ে পড়েছি। ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কলকাতার মত না হলেও অনেক। এখানকার ছেলেরা কলকাতার তুলনায় অনেক ভদ্র। সুতরাং পড়াতে যত খারাপ লাগবে ভাবতাম ততটা লাগেনা। মোটের ওপর ভালোই আছি। প্রথম প্রথম একলা লাগত। কিন্তু পরে শুনলাম যে বাবা যখন ২৫ বছর আগে এখানে আসেন তখন নাকি আমি মার গর্ভে ছিলাম। তারপর দিল্লী সম্বন্ধে একটু ঘরোয়া ভাব এনেছি। এখন কলকাতায় ফিরলে ট্রাম-বাসে চাপা পড়ব।

ডিসেম্বর, জানুয়ারীতে প্রচণ্ড শীত ; ভালোই লাগত। কিছুদিন আগে রাত্রে King Lear মার্কা ঝড়, বৃষ্টি হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গরম পড়ছে।

মাঝে দুএকবার সাহিত্যসভায় গিয়েছিলাম। কয়েকটি বখা ছোকরা আপনাদের নামের সঙ্গে পরিচিত আছে। মনে হল যে শনিবারের চিঠি বাঙ্গালী একটা generationকে অন্তত খেলো, আর আত্মম্ভরী হতে শিখিয়েছে।

Emmerson এখানে আছেন শুনি। কোথায় থাকেন জানিনা। আপনি ঠিকানাটা জানেন ?

আপনি যদি চাকরী নিয়ে দিল্লীতে আসেন তাহলে আমাকে ত কলকাতায় চাকরীর সন্ধান করতে হবে। সেটা কি ভালো হবে ? নতুন কিছু লিখলেন নাকি ?

বই বের করার কী হল ? অশোককে বাগাতে পারলেন না ? অশোকের চিঠি প্রায়ই আসে।

অক্টোবর মাসে দিল্লীতে চলে আসুন। সেসময় আমাব ছুটি নেই। লম্বা ছুটি পাবো জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত। এপ্রিলে একটা দিন পোনেরোর ছুটি পাবো। কিন্তু তখন কলকাতায় যাওয়া হবেনা। এখন পর্যন্ত মাসের প্রথম সপ্তাহেই পকেট খালি করে বসে থাকি, মনে হয় মুদীর জন্যই আয় করি।

আপনাদের সাহিত্য মণ্ডলীব খবর কী ? মিঃ আইয়ুব, হীবেনবাবু ইত্যাদির সঙ্গে দেখা হয় ? সুধীনবাবুর খবর কী ? লক্ষ্ণৌ-এর [য] একটি ছেলে, ধামণ্ডীলাল [?] নাম, যামিনীবাবুর ছবির একটি exhibition করাব চেষ্টায় ছিল। কিন্তু পুলিশ পেছনে লাগাতে দিল্লীতে আছে। দুএকদিন এসেছিল। কিছুদিন আগে চট্ করে একটা বিয়ে করেছে।

কলকাতায় অনেক গল্প জমেছে লিখেছেন। কী গল্প ? অবশ্য কিছুটা অনুমান কবতে পারি।

মিসেস্ দে কেমন আছেন ? আশা করি আপনার স্বাস্থ [য] ভালো আছে। আমি ভয়ানক অনিদ্রায় মাঝে মাঝে ভুগি। ওটা না হলে অনেকটা নধর চেহারা হত। আশা করি মহাকবিজনোচিত আলস্যে চিঠির উত্তর দিতে ভুলবেননা। ইতি

সমর সেন

Golden Bough-এর প্রথম সংস্করণের প্রথম খণ্ডটি দু টাকায় পাওয়া গিয়েছে। পড়া হচ্ছেনা, অনেক পরীক্ষাব খাতা দেখতে হল। নতুন কিছু লিখলে মাঝে মাঝে পাঠাবেন ?

৭

12B Daryagunj, Delhi
5/4/41

বিষ্ণুবাবু,

আপনাকে চিঠি অনেকদিন আগে লিখেছিলাম, এবং সেটা আপনি পেয়েছেন সে খববও পেয়েছি। উত্তর না দেবার কারণ বোধহয় আপনার সাম্প্রতিক আলস্য।

দুএকদিন হল অশোকের কাছ থেকে খবর পেয়েছি। চিঠি পড়ে মনে হল ভয়ানক চটে আছে। লিখেছে যে আপনারা হঠাৎ ভয়ানক সাহিত্যের ব্যাপারে খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছেন, চা খাচ্ছেন, কবিতা পাঠ করে শোনাচ্ছেন ইত্যাদি।

আপনি বোধহয় শুনেছেন যে দিল্লীতে বিয়ে করছি। বিয়ে এখানে ২৮শে এপ্রিল তারিখে হবে। মেয়েটির নাম সুলেখা, বয়স কম, আমাদের সামনের

বাড়ীতেই থাকে। গত ডিসেম্বর মাসে আলাপ হয়েছিল। সম্পর্কে আত্মীয়া হয়। চেহারা ভালো নয়, তবে আমার বেড়ে লাগে। বিয়ের সময় এতোদূরে নিশ্চয়ই আসতে পারবেননা, তবু আপনাদের নিমন্ত্রণ করে রাখছি। বিয়ের চিঠি বোধহয় ছাপা হবেনা, স্নুতরাং এটাই নিমন্ত্রণপত্র বলে ধরবেন। আশা করি কলকাতা যাবার আগেই আমার নামে গল্প বানাবেন না।

অশোক লিখেছে যে মিসেস দে'র খুব অসুখ। কী হয়েছে? তাঁকে আমার বিয়ের খবর দেবেন ও নিমন্ত্রণ জানাবেন।

এপ্রিলে কলকাতা যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু নানাকারণে হলনা। একেবারে জুলাই মাসে দেখা হবে। আশা করি চিঠির উত্তর পাবো। ইতি

সমর সেন

৮

12B Daryagunj, Delhi
28. 4. 41

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি অনেকদিন আগে পেয়েছিলাম, কিন্তু বিয়েঘটিত ঝামেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। অবশ্য আপনার কথামতো **hymeneal** উৎসবের আগেই লিখছি।

এখানে এখন দুর্দান্ত গরম পড়েছে। মে, জুন কী করে কাটাবো জানিনা। হয় পাগল হবো নয় আত্মহত্যা করব। অর্থাভাবে ফ্যান্ কিনতে বা ভাড়া করতে এখনো পারিনি, দুটো পাত্‌লা খস্‌খস্ কিনেছিলাম, তাতে আরো গরম হচ্ছে। দুপুরগুলো জানোয়ারের মতো অসহায় ভাবে কাটাই।

বিয়েটা খুব মজার হচ্ছে। বাড়ীর পাশেই আমার ভাবী স্ত্রী থাকেন; বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান ওদের বাড়ীর মেয়েরা জোগাড়যন্তর করে সম্পন্ন করছেন। এমন কি যে জামা কাপড় পরে বিয়ে করতে যাবো সেটাও বাগিয়েছি। আমার হাতে মাত্র পাঁচ টাকা আছে। এর কাছে কাপড়, ওর কাছে রুমাল, রাধারমণবাবুর কাছে টাকা, কোনোরকমে manage করেছি। বাবা শুনলাম মেয়েকে আশীর্বাদ করার সময় শ্বশুরমশায়ের কাছ থেকে গিনি নিয়ে সেটাই দিয়েছেন। মজা মন্দ নয়, আপনারা এলে খুব উপভোগ করতেন, আমিও শেষবার আপনার কাছে সেই ২৫৲ উদ্ধার করার চেষ্টা করতাম।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? আমাদের তরফ থেকে কোনো চিঠি ছাপানো হয়নি। সেজন্য অনেককে খবর দিতে পারলামনা বলে দুঃখিত।

আপনি শুনে খুশী হবেন যে সাধারণ বাঙালীর মতো খুব মনের আনন্দে আছি। আর বিয়ের দিনের জন্য অধৈর্য লাগছে।

Emmerson কে আজ ফোন করেছিলাম, সিম্‌লা চলে গিয়েছেন। অনিলার সঙ্গে দেখা হয়? তাকে 5 Bri ht St., এর ঠিকানায় বিয়ের খবর দিয়ে চিঠি লিখে-ছিলাম, বোধহয় পায়নি। শুনলাম এখন অন্য জায়গায় আছে।

জুলাই মাসে কলকাতা যাবো, তখন অনেকদিন পরে দেখা হবে। যদি গরমে মারা না যাই। রাধারমণবাবু এসেছেন। আমেদ প্রায়ই আসে। ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

৯

12B Daryagunj, Delhi
19. 5. 41

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। ভাষাটা সাঙ্কেতিক বলে অনেক কথাই ঠিক বুঝতে পারিনি; আত্মা সম্বন্ধে কেন চিন্তিত হলেন? গত মাস ছয়েকের মধ্যে অনেক অবনতি হয়েছে সেটা মাঝে মাঝে বুঝতে পারি, বিয়ের পরও যে পরমানন্দে কাটাচ্ছি তাও নয়। কলকাতা ছাড়া হয়ত উচিত হয়নি, এখানে লেখাপড়ার এবং "সাহিত্যিক" আবহাওয়ার বিশেষ অভাব। প্রবাসী বাঙালীর দশম দশায় হয়ত শিগগীরই উপস্থিত হবো। বিয়ের সময় নানারকম গণ্ডগোল হয়েছিল, সেগুলো আমার পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হয়নি। তার ফলাফল এখনো অল্পস্বল্প ভুগতে হচ্ছে। তবে জানেন, টাকাওয়ালা লোকের বাড়ীতে যাতায়াত করলেই আমার গাত্রদাহ হয়না, কিম্বা হীনতাবোধ জাগেনা; সেজন্য অকারণে এবং অসময়ে হঠাৎ উগ্র বিপ্লবীর মতো ব্যবহার করতে স্থুরু করিনা, এবং এক পয়সা খরচ না করার স্বাভাবিক ইচ্ছাকে বিপ্লবী মতবাদের পর্যায়ে তৎক্ষণাৎ আনতে প্রয়াস করিনা। যাহোক, চিঠির মারফৎ জানতে পারছি যে আপনি বিবাহের বার্তাবহ হিসেবে ইতি-মধ্যেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন; সেজন্য ভয়ানক শঙ্কিত হয়ে আছি। কী করে আপনাকে সামলাই ভেবে পাচ্ছি না। দিল্লীতে আপনাকে আনতে পারলে পরিত্রাণের একটা উপায় হয়।

পুরোনো বাড়ীতেই আছি, কারণটা অর্থনৈতিক। তাছাড়া সান্নিধ্যের জন্য চরিত্র খারাপ হবার বয়স গেছে।

'রাজপথ'টা খুঁজে পাচ্ছিনা, পেলে পাঠাবো। তাতে অবশ্য আপনার প্রশংসা কম

আছে। মাঝে মাঝে যে আপনি চালিয়াৎ হয়ে যেতেন সেটা লিখেছি, তবে এও লিখেছি যে আপনার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। পাটনার "প্রভাতী" কাগজে কোনো এক প্রগতিক খুব গালিগালাজ করেছেন ; অবশ্য আমার বক্তব্যের সঙ্গে তাঁর সমালোচনার কোনো সম্বন্ধ নেই ; সেটা হয়ত আধুনিক বাংলা প্রগতি-সমালোচনার অন্যতম বিশেষত্ব। আত্মবিচারের আয়না সামনে থাকলে এঁদের অনেকেই লজ্জিত হবার একান্ত প্রয়োজনীয় সুযোগ পেতেন।

আপনাদের খবর কী? জুলাই মাসে দেখাসাক্ষাৎ হবে। আপনাদের মেহের-বাণীতে এখানে একরকম সময় কাটছে। মিসেস দে কেমন আছেন?

ইতি

সমর সেন

১০

12B Daryagunj, Delhi
20. 8. 41

বিষ্ণুবাবু,

আসবার দিন বিকেলে আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি. বাড়ীতে ছিলেন না। এখানে এসে একেবারে বেকার হয়ে সময় কাটাচ্ছি. গরম অনেক কমে গিয়েছে বলে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছেনা। খুকু স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে।

হীরেনবাবুর বই এখনো আসেনি। আহ্‌মেদ শিগগীরই কলকাতা যাচ্ছে. খুব সম্ভব নিজেই নিয়ে আসবে।

কলকাতার খবর কী? খবরের কাগজ পাঠে বাবার আনন্দের মাত্রা নিশ্চয়ই বেড়ে গিয়েছে। রাধারমণবাবুর সঙ্গে দেখা হয়?

কলেজের মিটিং কাল হয়ে গিয়েছে, আমাকে নিয়ে গোলমাল হয়নি, সুতরাং আপাতত দিল্লীতেই টি'কে গেলাম। অক্টোবর থেকে ১৫০্ হবে। কলেজের খবরটা, আপনার যদি অসুবিধে না হয়, আমাদের বাড়ীতে দেবেন?

অশোক ঢাকা থেকে ফিরেছে বোধহয়। যে সব রেকর্ড নিয়ে এসেছিলাম. সেগুলো ইতিমধ্যেই পুরোনো হয়ে গিয়েছে, Egmont টা fibre-এ আর বাজেনা। দেবী Gielgud-এর রেকর্ডদুটো সময়মত আর ফেরৎ দেয়নি। বড়ো মনোকষ্টে আছি।

মিসেস দে কেমন আছেন? আপনাদের দিল্লীতে আসার কি হল? বুদ্ধদেব-বাবুকে আসতে বলবেন। আশা করি ভালো আছেন। ইতি

সমর সেন

আপনার বই এক কপি পাঠাবেন।

১১

১২বি দরিয়াগঞ্জ,
১০. ৯. ৪১

বিষ্ণুবাবু,

আপনাকে একটি পোস্টকার্ড অনেকদিন আগে লিখেছিলাম। কলকাতায় অতিরিক্ত নেমন্তন্ন খাওয়ার ফল এখানে ফলেছে, হামেশা পেটের অসুখ লেগে আছে, যথারীতি জীবন বিস্বাদ লাগছে। দুএকদিন একটু ভালো আছি।

মাঝে অশোকের চিঠিতে আপনাদের খোঁজ খবর পেলাম। আপনি কি Society of Friends নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন? কাজ কতোদূর এগোল? এদিকে বাবা ত কেস্টর [য] কাছে ৪৫, হারলেন, লেনিনগ্রাড ও মস্কো এখনো অটুট আছে। আপনার বই এতদিনে নিশ্চয়ই প্রকাশিত হয়েছে। এক কপি পাঠাবেন? 'পরিচয়'-এ সুধীনবাবুর "রবীন্দ্রনাথ" কেমন লাগল? আপনার এবং আমাদের Y. M. C. A.তে ৭ই আগস্ট চপ্‌কাটলেট খাওয়ার গল্পটা বাংলা ছাত্রসঙ্ঘের কল্যাণে খুব রটেছে। মণীন্দ্র রায়ের মুখে শুনলাম। "কথাটা বন্ধ করতে হবে",-- সুভাষের গম্ভীরোক্তি মনে পড়ছে।

এখানে আপাতত বৃষ্টি হচ্ছে, বিকেলে হাওয়ায় শীতের আমেজ, সুলেখা religiously রোজ বমি করছে, স্কুল যাওয়া বন্ধ, কলকাতার জন্য মাঝে মাঝে nostalgia হয়। খুচু ধার প্রায় সব শোধ করে দিয়েছে, এখানে এসে ৩০, ধার নিতে হয়েছিল, তার থেকে এক বন্ধু দুদিনের জন্য ১০, নিয়েছিলেন, ২৩ দিন হয়ে গেল।

আপনাদের খবর কী? মিসেস্ দে কেমন আছেন? রাধারমণবাবুর একটি চিঠি কাল পেয়েছি। হীরেনবাবু কেমন আছেন?

আশা করি চিঠির উত্তর দেবেন ও এককপি 'পূর্বলেখ' বিনামূল্যে পাঠাবেন। ইতি

সমর

১২

২০।৯।৪১

বিষ্ণুবাবু,

আপনার বই ও চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে বই সম্বন্ধে কিছু লিখবনা, কারণ তাহলে প্রবন্ধের আয়তন কমে যাবে, চিঠির কথার পুনরাবৃত্তি প্রবন্ধে করলে জোচ্চুরী করছি মনে হবে। রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করার পর যে সংস্কৃত শ্লোকটি

আছে তার মানে বুঝতে পারলামনা, সংস্কৃতে আমার জ্ঞান নামমাত্র, পাশে বাংলা অনুবাদ না থাকলে বেজায় মুস্কিলে পড়তে হয়। প্রবন্ধটা কতোদিনের মধ্যে চাই জানাবেন?

আমাদের কলেজ খুলে এলো। বুদ্ধদেববাবুরা দিল্লীতে আসছেন কিনা জানিনা। দিনদশেক আগে একটা চিঠি পেয়েছিলাম, তাতে তিনি কোনো সঠিক খবর দেননি। আমি ফিরে এসে পাশের ঘরদুটো নেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু ভাড়াটে আছে, এবং তারা যুদ্ধশেষ না হওয়া পর্যন্ত যাবেনা।

আপনি কি কোথাও বেরুচ্ছেন? না ছুটিতে কলকাতায় থাকবেন? আপনাদের 'সোভিয়েট্ দেশ' বেড়িয়েছে [য] শুনলাম, অক্টোবর মাসে এক কপি কেনার চেষ্টা করব। দামটা একটু বেশী করেছেন, হওয়া উচিত ছিল আট আনা। আট আনা দাম হলে সোভিয়েট ও ভারতবর্ষ, উভয়েরই উপকার হত।

মাঝে আহ্মদের কাছে শুনলাম যে হীরেনবাবুর দিল্লীতে আসার ইচ্ছে আছে। পরে আর কোনো খবর পাইনি। রাধারমণবাবু শুনলাম মণিপুর যাচ্ছেন। আপনার সঙ্গে [illegible] দেখা হয়? পেলিকান্‌টা ব্যবহার করার সময় অনিলাকে মনে পড়ে।

চিকিৎসা অর্থাভাবে করা হচ্ছেনা। খুচু ২রা অক্টোবর বিয়ে করছে, তা[illegible] আগে একবার তার ঘাড় ভাঙার তালে আছ। স্বলেখার অবস্থা তথৈবচ। কাল বিকেলে কাপড়ের দোকানে গিয়ে বমি করেছে। বেচারী! আমি বোধহয় ক্রমশ নির্বাণপ্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছি। আমার পুরোনো এবং ভালো কলমটা স্বলেখা পিত্রালয়ে নিয়ে গিয়ে সবান্ধবে লিখে প্রায় নষ্ট করে ফেলেছে। আপনার ঘড়ি আনিয়ে রেখেছি, যদি বুদ্ধদেববাবু আসেন তাহলে সঙ্গে দিয়ে দেবো।

বাবার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়? নিশ্চয়ই খুব উল্লসিত। স্বভাববাবু এলেন বলে।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? ইরা ও তারার কী সংবাদ? ইতি

সমর সেন

১৩

১২বি দরিয়াগঞ্জ
৫.১১.৪১

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। চিঠি লিখে উত্তর না পাওয়াতে টাইম্‌-পিসের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম, ভবিষ্যতে আপনার চেনা কলকাতাযাত্রী কোনো

লোকের মারফৎ পাঠাবো। রিভিয়ু-টা হয়ে গিয়েছে, এই সঙ্গে পাঠাচ্ছি। ফাঁকি না দেবার চেষ্টা যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু মনে হচ্ছে 'জন্মাষ্টমী'র প্রসঙ্গ এসে পড়াতে হঠাৎ পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গিয়েছি। রিভিয়ুটা খারাপ লাগলে ধরে নেবেন বাংলাদেশ থেকে অনেক দূরে থাকার দরুণ [য] ওরকম হয়েছে।

আপনার পুরী যাবার কথা গাবুর চিঠিতে জানতে পেরেছিলাম। আমাদের বাড়ীতে শুনলাম খুব খানাপিনা চলছে, জর্মানরা রুষদেশকে প্রায় খেয়ে ফেলছে বলে। বেশী খেলে বমণের [য] সম্ভাবনা বাড়ে, সেকথা পিতৃদেব বোধহয় ভুলে গিয়েছেন। আপনি কিন্তু এবারে দিল্লীতে এলে ভালো করতেন, কারণ শুনে খুব দুঃখিত হবেন যে আসছে বছর থেকে অক্টোবরে আমাদের ছুটি থাকবে, সুতরাং সেসময় দিল্লীতে নাও থাকতে পারি।

রামসিং অমৃতসরে বিয়ে করছে। আশীবাদি [য] ৫০০৲ পেয়েছে, শুনে ঈর্ষায় মারা যাচ্ছি।

আপনাদের খবর কী? শারীরিক অবস্থা কেমন? মিঃ আইয়ুব, হীরেণবাবু, [য] এঁদের সব খবর কী? লিণ্ডসে এমারসন্ এতোদিনে সিম্‌লা থেকে নিশ্চয়ই নেমেছেন, কোথায় থাকেন জানেন? আগে ত York Hotelএ থাকতেন। এখন কোথায় জানিনা।

সুলেখা আগের চেয়ে অনেক ভালো। আবার স্কুলে যাচ্ছে। পরীক্ষা দিয়ে ছাড়বে মনে হচ্ছে। কুকুরটা জালিয়ে মারল, গোটা চারেক ধুতি, গোটা দশেক শাড়ী, খাটের নেয়ার ইত্যাদি ইতিমধ্যে ফুটো করেছে। তারওপর মাঝে মাঝে আয়নায় নিজের চেহারা চট করে দেখে আসে, আমাকে অনেকসময় ধমকায়। আপনার চুম্বনের কথাটা পড়ে সুলেখা shocked, যদিচ ব্র্যাকেটে শেষরক্ষা করেছেন।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? চঞ্চল-এর বিবর্তনের ইতিহাস জানবার ইচ্ছে হয়। মাঝে অশোকের একটি চিঠি পেয়েছিলাম। ভবিষ্যতে আত্মপ্রত্যয় আশা করি কমাবেন। ইতি

সমর সেন

আপনাদের পোস্টকার্ড পেলাম, এখন ত ইংরিজীতে লেখা সম্ভবপর নয়। পোস্টকার্ডটি আসার আগেই সুলেখা স্কুলে গিয়েছে, সুতরাং তার প্রতিক্রিয়াটা জানতে পারলামনা।

১৪

12B Daryagunj
15 11 41

বিষ্ণুবাবু,

আমার চিঠি ও রিভিয়ু পেয়েছেন নিশ্চয়। তারপরে আপনার আর একটি চিঠি পেয়েছিলাম। রিভিয়ুটা কেমন লেগেছে? নিতান্ত নির্বোধ হয়েছে কি?

এখানকার খবর একরকম। আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা পড়তে স্থরু করেছে, দিন রাত্রে প্রায় ৩০°র তফাৎ। ফলে দুবার জ্বর [য] হয়েছিল, একবার বোধ হয় ম্যালেরিয়া। আপাতত ভালো আছি। কলেজ থেকে ফিরে এসে কিছু করার থাকেনা। দু তিনটি বাড়ীতে যেতে যেতে বিরক্ত লাগে। পয়সার অভাবে চিকিৎসা হয়না, অথচ এ সময় চিকিৎসা খুব দরকার, কারণ ঠাণ্ডা পড়তে স্থরু করেছে। আজ বিকেলে নেহাৎ কোনো কাজ না থাকায় মানবেন্দ্র রায়ের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সম্মেলনে গিয়েছিলাম। টিকিটের দাম আট আনা শুনে তৎক্ষণাৎ [য] নিখিলদার বাড়ীতে গেলাম। The Vacant unto the Vacant

সল্মন আলি নামক প্রগতিক ভদ্রলোকের নাম শুনেছিলেন? একটা বড়ো সরকারি চাকরী বাগিয়ে দিল্লীতে এসেছে। লক্ষ্ণৌ [য] বিচিত্র জায়গা। ধূর্জটিবাবু আজকাল আবার সমালোচনার নামে স্থধীন্দ্রনাথের চর্চা স্থরু করেছেন। বাংলা কবিতা=স্থধীন্দ্রনাথ; স্থধীন্দ্রনাথ=ভারতীয় ঐতিহ্য। ভাটপাড়া ও লক্ষ্ণৌ—দুয়ের সমন্বয় বড়োই বিচিত্র। তারপর রবীন্দ্রনাথ আবার তাঁকে কী যেন করার ভার মৃত্যুর পূর্বে দিয়ে গিয়েছেন। কলেজে ছেলেরা প্রায়ই একটা লাইন্ আওড়াতো, সেটা মনে পড়ছে; কতো ঢংই দেখালি বৌদি, অম্বলে দিলি আদা।

আপনি কি এমার্সনের ঠিকানা জানেন? জানাতে পারেন?

আমাদের বাড়ীর খবর অনেকদিন পাইনি। আপনি কিছু জানেন কি? অশোক চিঠির জবাব দেয় একমাস অন্তর। স্থতরাং তার সম্বন্ধে কিছুই অনেকদিন শুনিনি। রাধারমণবাবুর কোনো চিঠি তিনি দিল্লী থেকে ফেরার পর পাই নি। কামাক্ষী লিখেছে যে ডিসেম্বরে দিল্লীতে আসবে, এবং এখান থেকে কাশ্মীর যাবে। ডিসেম্বরে কাশ্মীর!

মিসেস্ দে কেমন আছেন? স্থলেখা নিজের মনে ছোটখাট একটি পৃথিবী বানিয়ে নিয়েছে, বর্তমান গর্ভ ও ভবিষ্যৎ প্রসব তার দুটো সীমান্ত, তার মধ্যেই মনের আনন্দে থাকে। ভবিষ্যতে নতুন বাড়ী নিয়ে কীরকম ভাবে সাজাবে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ সেদিন আমাকে দিল। অনেকটা বাকিংহাম্ প্যালেসের মত। চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে উল্টো করে কোণাকুণি ডানদিকে] আসছে মঙ্গলবার রাত্রি আটটার সময় (I. S. T.) এলিয়টের একটি বক্তৃতা আছে বি. বি. সি. থেকে। পয়সা বাঁচালাম কিছু মনে করবেন না।

[বাঁ দিকে]

'চলন্তিকা'য় obsession-এর বাংলা করা হয়েছে 'আবেশ'। 'বাতিক্' (বাতিকগ্রস্ত) কথাটা কি আরো ভালো নয়? না বাতিক্ মানে mania?

১৫

১২বি দরিয়াগঞ্জ
৮.১২.৪১

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি অনেকদিন হল পেয়েছি। আপনার উর্দু জ্ঞানের পরিচয়ে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করেছি, দুএকটি কথার মানে কলেজের মৌলভিসাহেবকে জিজ্ঞেস করতে হয়, যথা কস্‌বীকা কস্‌বা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর বয়স অল্প এবং গোঁড়া নন্।

আপনি রিভিয়ুটা কোথায় ছাপাচ্ছেন? কোনো দৈনিক পত্রিকায়? আমাকে এক কপি পাঠালে খুসী হবো, কারণ নিজের লেখা ছাপার অক্ষরে দেখ্‌লে এখনো ভালো লাগে।

আপনাদের ভবিষ্যতে দিল্লীতে আসার সুবিধে হয়েছে, খুব সম্ভব ১৫ই থেকে পুরো বাড়ীটা পাবো। ওদিকটা নিলে সকালে আপনাকে মাঠে যেতে হবেনা। অবশ্য যদি দিল্লীতে আসেন, কারণ সকালে খবরের কাগজ পড়ে মনে হচ্ছে আপনাদের জীবনসংশয় হতে পারে। আপনার সহকর্মীরা নিশ্চয়ই দুঃস্বপ্নে সময় কাটাচ্ছেন, হাওড়া স্টেশন নিশ্চয়ই মাড়োয়ারীর উদরে ছেয়ে গিয়েছে। আপনাদের ওখানে কয়লার দাম কতো? এখানে নিউ দিল্লীতে দু টাকায় মণ, দরিয়াগঞ্জে বোধ হয় একটাকা বারো আনা। বাবা কী করে সংসার এতোদিন চালিয়েছেন মাঝে মাঝে তাই ভাবি।

আসনাই-এর উল্লেখ শুনে সুলেখার ভালোই লেগেছে মনে হয়, তবে পিতা ও পিতামহ সম্পর্কের কথায় বোধহয় একটু হতাশ হয়েছে। মাঝে চাকরের অসুখ হয়, কয়েকদিন রেঁধে খাইয়েছিল, প্রথম দিনেই আঁচল উনুনে ফেলে অগ্নিকাণ্ড করেছিল। তখন বেলা চারটে, আমি নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, সোরগোলে ঘুম ভাঙ্গেনি। আগুনের ব্যাপারটা দেখেই কুকুরটা সটান চৌকির তলায় আশ্রয় নেয়। ব্যাপারটা অবশ্য বেশীদূর গড়ায়নি।

অশোকের খবর কী? প্রায় দুমাস চিঠি পাইনি। এখনো কি কৃষ্ণনগরে আছে? দেবীর বোনের বিয়ের খবর পেলাম, চড়া রোদ পোয়াতে পোয়াতে মন

খারাপ করার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম, সুবিধে হলনা। স্মরণ তরবারির মতো জৌলুষ দেখালনা।

রাধারমণবাবু শুনলাম পুরী যেতে গিয়ে কটক পৌঁছতে ১৪ দিন নেন, পরে ফিরে আসেন। রাধারমণবাবুর চিঠিপত্র অনেকদিন পাইনি। আতিথ্যের কোনো ক্রটি [য] হয়েছিল কিনা জিজ্ঞেস করবেন ত। কামাক্ষীরা দিল্লী আসছে, কাশ্মীরের পথে। শীতে কাশ্মীর, কাশ্মীরে শীত। এবারে দিল্লীতে শীতের উপদ্রব এখনো সুরু হয়নি।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? ইতি

সমর সেন

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে উল্টো করে কোণাকুণি বাঁদিকে] Ode to west wind রেকর্ডটা কি আপনার বাড়ীতে? যদি থাকে, কামাক্ষীর সঙ্গে পাঠিয়ে দেবেন? ঘড়িটা কামাক্ষীর হাতে নির্ঘাৎ যাবে। একটা খুব ভারি জাপানী ঘড়ি আছে। সেটাই পাঠাবো ভাবছি।

১৬

7 2 42

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি অনেকদিন হল পেয়েছি, কিন্তু নানাকারণে উত্তর দিতে দেরী হল। মাঝে কেস্ট [য] এসেছিল। তখন চিকিৎসায় এবং বদ্‌জুবান্ করতে এতো ব্যস্ত ছিল যে চিঠি লেখার অবসর পাইনি। তারপর দুএকদিন বিশ্রাম করে লেখার জোগাড় করছি, এমন সময় রাম সস্ত্রীক এসে হাজির। অবশ্য হোটেল দেখিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিলাম। আজ তারা চলে গেছে।

আশা করি কেস্টর [য] হাতে পাঠানো ঘড়িটা পেয়েছেন, জাপানী হলেও ওটা দামী, দোকানে খবর নিয়েছিলাম।

এখানকার খবর বিশেষ নেই। ভয়ানক একঘেয়ে। কেস্ট [য] আসাতে কয়েকদিন ভালোই কেটেছিল। আড্ডার জায়গা ক্রমশ কমে আসছে। নিখিলদা মাঝে শুনলাম একটি মহিলাকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন, কাল না পরশু ফিরে এসেছেন। শিগগীরই ইরাক্ কিম্বা ইরাণ যাচ্ছেন, Asst. Red Cross Commissioner for Iraq and Iran. কাজের মধ্যে বিকেলে চাঁদনী চৌক্ যাই এবং ফিরে আসি। খুচু পারিবারিক জানোয়ারে পরিণত।

সুলেখার খবর ভালোই। আমার কুষ্ঠিতে নাকি লেখা আছে যে কুসংসর্গে পড়লে ব্যাভিচার মদ্যপান কিছুই আটকাবেনা। আমার সম্বন্ধে নানারকম ইঙ্গিত

কলকাতায় থাকতে ওর কাছে করেছিলেন। বিশেষ চিন্তিত, এবং মে মাসে কলকাতায় একলা গেলে কী হবে তাই নিয়ে ভাবিত।

কলকাতায় একটা চাকরী পেলে বর্তে যাই।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? হীরেণবাবু [য] ও রাধারমণবাবুর খবর কী? রিভিউটা এখনো ছাপা হয়নি মনে হচ্ছে। মে মাসে কি হাওড়ার পুল অক্ষত থাকবে? ইতি

সমর সেন

Hemingwayর বই পড়েছি।

১৭

১২. ৪. ৪২

বিষ্ণুবাবু

বহুদিন আপনার কোনো খবর পাইনি। চিঠির উত্তর না দেওয়াটা মহাকবির লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছি। তাছাড়া, আপনারা কলকাতায় থাকেন। নিউ ইয়র্ক-বাসীদের সম্বন্ধে লণ্ডনবাসীদের যে অসীম করুণা বেঁটেরা যুদ্ধে নামবার আগে পর্যন্ত ছিল, আমাদের মত লোক সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আপনাদেরও সেরকম মনোভাব। যাহোক, দিল্লী থেকেও শুনছি লোক পালাতে স্থরু করেছে, ৩০ হাজার নাকি এরি মধ্যে বেমালুম নিরুদ্দেশ। ততঃ কিম্? ঠিক করছি মে মাসে কলকাতায় পালাবো।

কলকাতায় একলা যাবো এবং যাবার আগে বেশ খানিকটা ধাপ্পা দিয়ে যাবো। সুলেখার কিছুদিন আগে একটি মেয়ে হয়েছে, আপাতত পিত্রালয়ে আছে। কন্যাহবার [য] সংবাদ দেবার পর ও বাড়ীর একটি আত্মীয়া আমার পকেট থেকে দশটাকার একটি নোট জোর করে নিয়ে নেন, ওটা নাকি হিন্দুপ্রথা। তার ফলে দুতিনদিন অনিদ্রা। তার ওপর আমার একটি ছাত্র বিয়ের ছাতাটি মেরে দিয়েছে। একদিন বিনাছাতায় ঘণ্টা তিনেক রাস্তায় ঘুরে জর ও পেটের অসুখ। আজ ভালো আছি।

এখানে মাঝে সোভিয়েট-সুহৃদ-সমিতি হল। কিন্তু দিন কুড়ি আর কোনো খবর পাইনি।

আপনাদের খবর দেবেন। কলকাতায় মে মাসে থাকবেন ত? বুদ্ধদেববাবুরা কি করবেন? প্রায় চারমাস অশোকের কোনো চিঠি পাইনি। অশোক হঠাৎ স্বর্ণগর্ভ মৌনতা কেন অবলম্বন করল? আপনি কি আমার নাম দিয়ে ওর বিশেষ নিন্দে করেছেন? জাপানী ঘড়িটা মাঠে মারা গেল; সেজন্য দুঃখিত।

আশা করি মিসেস্ দে ভালো আছেন। এখানে কাল থেকে গর্মি হাওয়া দিয়েছে। এরপরেই মহাসমারোহে গ্রীষ্ম সুরু হবে। ইতি

সমর সেন

১৮

২৩. ৫. ৪২

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি পেয়েছি। মাঝে একদিন হীরেণবাবুর [য] কাছে গিয়েছিলাম। ওঁর ধারণা আপনি দিন পোনেরোর মধ্যে ফিরে আসবেন, ফিরতে অন্তত মাসখানেক হবে শুনে আশ্চর্য হলেন। আজ স্নেহাংশুর বাড়ীতে গিয়েছিলাম, দেখা হয়নি, সকাল থেকে উধাও। দেবী পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত, সুভাষ আজ বনগাঁয়ে যাচ্ছে সভাপতি হয়ে। মঙ্গলবার দিল্লী থেকে রেডিওতে ওর গানটা দিয়েছিল, ওরা রেকর্ড করেছে। বুদ্ধদেববাবু এখন শান্তিনিকেতনে, দিল্লীতে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি, কারণ টাকা এসে পৌঁছয়নি। কাল চঞ্চলের বাড়ীতে গিয়েছিলাম, ও Shosta Kovitch (বানান ঠিক জানিনা)-এর রেকর্ড কিনেছে, খুব মন দিয়ে শুনলাম। চঞ্চল বলল যে রেকর্ডটা শুনে ও নিঃসন্দেহ যে সোভিয়েট্ এ যুদ্ধে জিতে যাবে। বলা বাহুল্য, আমারো তাই মনে হল।

আমার অর্থনৈতিক অবস্থা দিনদিন জটিল হচ্ছে। মাসের শেষে হাওড়া স্টেশনে যাবার রেস্ত থাকবে কিনা সন্দেহ, বাঁকুড়া ত দূরের কথা। যাহোক, একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখব।

আশা করি মিসেস্ দে ভালো আছেন। আপনারা কি দূরে পাহাড় উঁচুনীচু লাল মাটি, মহুয়ার বন দেখে সময় কাটাচ্ছেন? ভাবলে মাঝে মাঝে nostalgia হয়। যামিনীবাবু আশা করি ভালো আছেন। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার দেবেন। ইতি

সমর সেন

১৯

২৯. ৫. ৪২

বিষ্ণুবাবু

আপনার পত্রগুচ্ছ পেয়েছি। মাঝে অরুণবাবুর কাছে গিয়েছিলাম। ওঁর ছোট মেয়েটি যশোরে মারা গিয়েছে। আমি সমালোচনার এবং অন্যান্য কাজের তাগাদা দেবার পর খবরটা পেলাম, খুব লজ্জিত লাগছিল।

কবিতার বই নিশ্চয়ই পেয়েছেন। আমার বাঁকুড়া যাওয়ার সঙ্কল্প দিনে দিনে সুদূরপরাহত হচ্ছে। পয়সা শেষ, অবশ্য চিকিৎসা করে নয়। বই-এর ব্যাপারে, ঘোরাফেরায় অনেক গিয়েছে। এদিকে দেবী পরীক্ষার জন্য ভয়ানক ব্যস্ত, খুব সম্ভব যেতে পারবেনা। দেবীর বাড়ীতে গেলেই প্রত্যেকবার বসন্তবাবু জিজ্ঞেস করেন আমি আর কলকাতায় কতদিন থাকব।

এখানে গুমোট গরম, নয়নাভিরাম নীল মেঘ নেই। হুজুগ-এর নিতান্ত অভাব, সাইরেন বাজেনা, বোমাপড়াত দূরের কথা। সারাদিন বাড়ীতে কাটাই, বিকেলে একবার শুধু ঘুরে আসি। বুদ্ধদেববাবু চিঠি লিখেছেন, শান্তিনিকেতন যাবার জন্য। স্নেহাংশুর সঙ্গে দেখা হয়নি।

হীরেণবাবুর [য] সঙ্গে একটি মিটিং-এ সাক্ষাৎ হয়েছিল, হিরণবাবুও ছিলেন।

আপনি কবে ফিরছেন? আরো অনেক পরীক্ষার কাগজ এসেছে, শুনে খুব ভাল লাগল। মিসেস্ দে আশা করি ভালো আছেন। ইবা আমার চরিত্রে সঙ্কল্পের অভাব আপনার চেয়ে বেশী বোঝে। যামিনীবাবু কেমন আছেন?

বাড়ীতে ভয়ানক গালিগালাজ সহ্য করতে হচ্ছে। এখানে আর বেশীদিন নয়। ইতি

সমর সেন

২০

১. ৬. ৪২

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। তবে বাঁকুড়ায় যাওয়া বোধহয় এ যাত্রা হবেনা। আপনার কলকাতায় ফিরে আসা বিশেষ দরকার। হীরেণবাবুর [য] কাছে কাল গিয়েছিলাম, তিনি আপনার খোঁজ করছিলেন। বললেন যে ওখানে আপনি থাকাতে কাজের ক্ষতি হচ্ছে। সুতরাং আপনি সটান্ ফিরে আসুন।

চঞ্চল তার বই প্রেসে দিয়েছে। দেবী পরীক্ষার জন্য বিশেষ ব্যস্ত, আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কম হয়। সুতরাং সুজাতার খবর কিছু জানিনা। মাঝে অশোকের চিঠি পেয়েছি। ধূর্জটিবাবু বই পেয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। দেবী ভট্টচায্ গরিলা-যুদ্ধ শেখবার জন্য লাহোর যাত্রা করেছে। অজিতবাবুর বাড়ী একদিন গিয়েছিলাম, আজ হীরেণবাবু [য] সেখানে যাবেন, বিকেলে সাক্ষাৎ হবে। দোদো কাল হঠাৎ এসেছিল, পিতৃদেব খুব গালিগালাজ করেছেন। দোদো অবশ্য অবিচলিত, বলল ওদের অস্ত্রশালায় প্রায় চারশ বন্দুক পাঁচহাজার টোটা আছে। মুসলমান চাষারা

সব জাপ-বিরোধী, কারণ হিন্দুরা বলে বেড়াচ্চে যে জাপ্‌রা এলে মুসলমানদের দেখে লেবো।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? আর ইরা আর তারা?

যামিনীবাবুকে নমস্কার জানাবেন। অর্থাভাবে পোস্টকার্ড ব্যবহার করলাম, ক্রটি মার্জনীয়। ইতি

সমর সেন

২১

12B Daryagunj, Delhi
23. 6 42

বিষ্ণুবাবু

যে চিঠিতে আপনাকে জানিয়েছিলাম যে বাঁকুড়া যেতে পারবনা, তার উত্তর অদ্যাপি মেলেনি। তাই সন্দেহ হচ্ছে যে আপনার গড়গড়া, পটল বেগুন ইত্যাদি পৌঁছিয়ে না দেওয়াতে অপ্রসন্ন আছেন। এর থেকে ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে স্বার্থপরতা আপনার মজ্জাগত না হলেও অন্তত চর্মগত। হঠাৎ একটা ব্যক্তিগত ব্যাপারে কলকাতা ছেড়ে চলে আসতে হল। এখানে এখন এলাহি কাণ্ড। সকাল থেকে মাঝরাত পর্যন্ত গরম হাওয়া, ধুলোর ঝড় ইত্যাদি। তবে আজ সকালে বৃষ্টি হয়েছে। সাংসারিক কারণে নিতান্ত বিমর্ষ আছি। চাকর চোখের রোগে হাঁসপাতালে [য], সুলেখা এখনো পিত্রালয়ে। আজকে না কি শুভদিন, বিকেলে আসবে শুনছি।

সেদিন কাগজে পড়লাম যে কলকাতার সরকারী স্কুল, কলেজ না কি খুলবেনা, অন্যান্য কলেজকেও সেই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকরা, সরকারের মতে, তাহলে "অনাবশ্যক নাগরিক"দের মধ্যে পড়েন। রিপন কলেজে [য] কি মফঃস্বলে খুলবে? তাহলে ত আপনাদের খুব বিপদ।

পরিচয়ে আপনার দুটি কবিতা পড়ে অনেক বামপন্থী নানারকম কথা বলছে: আপনি ছন্দের খাতিরে দুবার তিরিশ কোটি ভারতবাসীর কথা লিখেছেন। লোকে বলছে আপনি মুসলমানদের বাদ দিচ্ছেন। তাছাড়া বাহুবলে বিদেশীদের আপন করে নেওয়ার কথাটাতে অনেকের আপত্তি। ভারতীয় ইতিহাসের এ দিকটাকে না কি Marx rural idiocy এবং Asiatic barbarism বলে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজরা আসার পর রেলপথ এবং অন্যান্য কারণের জন্য বিশাল ভারতের অসংখ্য কিষাণের শতাব্দীর অনড়, অচল জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছে, গ্রাম্য জীবনযাত্রায় এ বিপ্লব আনাটাই নাকি ইংরেজ শাসনের প্রগতিক দিক।

আপনি একবার দিল্লীতে আসুন। পূজোর [য] সময় যদি আসেন ত এখানকার মোগলাই আবহাওয়া নিশ্চয় ভালো লাগবে। তবে চাকরী ছেড়ে দিয়ে আসবেননা। আমি তার আগে কলকাতায় যেতে পারি। আমাদের কলেজ থেকে লোক তাড়ানো হচ্ছে। ভাগ্যচক্রে, বিতাড়িতরা প্রত্যেকেই বাঙ্গালী। প্রিন্সিপাল্‌কে retire করতে বলা হয়েছে। ডক্টর দাসগুপ্ত, অঙ্কের অধ্যাপক, সাতবছর এ কলেজে আছেন ; এবারে তিনজন অঙ্কের ছাত্রদের মধ্যে দুজন ফেল্‌ করাতে তাঁকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে। আর একজন অধ্যাপক, মিঃ দাস-এর কাছে explanation চাওয়া হয়েছে কেন ভূগোলে ৪৫ জনের মধ্যে আটজন ফেল করেছে। ইত্যাদি। বেনিয়াদের প্রতাপ শিগগীরই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকানুনে খর্ব হবে, তার আগেই তারা একটা second front খুলে কাজ হাসিল করছে।

আপনি কি মিসেস্‌ দে কে নিয়ে ফিরেছেন ? আশা করি আপনারা ভালো আছেন। আপনার Soviet Literature বইটি চঞ্চলের কাছে আছে, দেখা হলেই ফেরত পাবেন।

আশা করি চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর সেন

২২

২০. ৭. ৪২

বিষ্ণুবাবু,

আপনার উত্তর পেলাম। সে রিভিয়্যুটা আমার কাছে আছে, তবে আপনাকে যে কপিটা পাঠিয়েছিলাম তাতে কয়েকটি জায়গায় নতুন লাইন কিছু কিছু ছিল, সেগুলো মনে নেই। হয় মণীন্দ্রের হাতে নয় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেবো। এ কদিন আড্ডার মাত্রা বেশী হয়েছিল বলে লিখে ফেলাব সময় পাইনি। মণীন্দ্রের চাকরীর জন্য এখানে অনেকেই এসেছিলেন। মাণিকবাবু [য] এসে দুতিনদিন ছিলেন। প্রথমে হোটেলে তারপর কামাক্ষীর বাড়ীতে ওঠেন। মাণিকবাবুকে [য] বেশ ভালোই লাগল।

আপনাদের কলেজের খবরটা খারাপ। মণীন্দ্রের মুখে শুনলাম বাংলার বীর ছাত্রদলের অনেকে এখনো অজ্ঞাতবাসে। সুতরাং স্কুল কলেজ ঢিমে তালে চলছে। আমাদের কলেজে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, এ বছর ত গণ্ডগোলের পাশ এড়িয়ে গিয়েছি, কিন্তু বেণেদের কলেজে বেশীদিন টেঁকা যাবেনা। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবো ভাবছি। তবে কলকাতায় আপনি আছেন। হঠাৎ যদি পিছনে লাগতে শুরু করেন তাহলে সর্বনাশ হবে।

আপনার '২২শে জুন' প্রকাশিত হয়েছে? সুভাষ কি পুরো [য] একটা বই বের করছে? আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। তারপর দিল্লীর কর্মীরা Peoples' War এর জন্য প্রথমে একমাসের মাইনে, পরে সেটা পাবার সম্ভাবনা না দেখে. মোটা টাকা চেয়েছেন। ভাবছি রয়মশাই-এর দলে নাম লেখাবো. সেখানে চাঁদা দেবার ফ্যাচাং নেই, উপরন্তু মাসে কিছু আয় হতে পারে।

বাড়ীর খবর ভালো। সুলেখা কলেজ যেতে শুরু করেছে। আয়তনে বেড়েছে বলে সন্দেহ করি। রাত্রি এগারোটার সময় মাঝে মাঝে হঠাৎ আলো জালিয়ে কলেজের বই নিয়ে অসামান্য গাম্ভীর্যে বসে; বইগুলো এতো মোটা ছুঁড়ে মারলে মানুষ মরতে পারে। বাচ্ছার [য] খবর ভালোই। নাকটা সুলেখার মত হচ্ছে। অবসবসময় তার তদারক করি। বেশ করি।

আপনাদের খবর কী? মিসেস্ দে আশা করি ভালো আছেন। ইরা তারার খবর কী? হেগাংশুর সঙ্গে দেখা হয়? হিরণবাবুর তবিয়ত কেমন? আর হীরেণ-বাবু? [য]

আপনাদের সন্বেঘর [য] pamphlets কিছু কিছু এখানে পাঠাতে পারেন. বিশেষ করে বিজন রায়ের বইটি। দশ কপি করে বিক্রী হতে পারে। বই কাছে থাকলে গ্রাহক জোগাড় করা সহজ হয়।

কলকাতায় থাকতে A. F. W. নিয়ে গণ্ডগোল হয়েছিল। সেটা আশা করি মিটমাট হয়ে গিয়েছে।

এখানে বেশ বর্ষা। আপনারা সেপ্টেম্বর নাগাদ আসুন না। সে সময় শুনছি কলকাতা নিরাপদ জায়গা নয়। মিঃ আইয়ুব কলকাতায় ফিরেছেন খবর পেলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

আপনি ফসিল্ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক' পড়েছেন? সেই গল্পটা যাতে নায়ক শেষ মুহূর্তে পোলিটিক্যাল্ সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন? এখানকার কর্মীদের অনুরোধে সেটা চোস্ত ইংরিজীতে অনুবাদ করেছি। অনুবাদটা. বিশ্বাস করুন, জব্বর হয়েছে। বোধহয় আপনার প্রভাব আছে।

চিঠির উত্তরে আশা করি মহাকবি-সুলভ বিলম্ব করবেননা। ইতি

সমর সেন

২৩

১০. ৮. ৪২

বিষ্ণুবাবু

দুর্যোগে আপনার বই পেলাম। সবকটা একসঙ্গে পড়ে সম্যকভাবে উপলব্ধি হল

যে বামপন্থী বন্ধুরা যা বলতেন সেটা নির্বোধের আক্রোশ। দুএকটা কবিতা সম্বন্ধে একটু খটকা লাগে, কিন্তু সে বিষয়ে চুপচাপ থাকাই ভালো। উদ্ধৃতিগুলো, বিশেষ করে, লেনিনেরটা, জব্বর হয়েছে। অনেককে একহাত নিয়েছেন।

এ সঙ্গে '২২শে শ্রাবণ' পেলাম। কামাক্ষী একটা মূল্যবান কথা বলল : বুদ্ধদেব-বাবুর কবিতা পড়ার পর কাব্যচর্চার আগ্রহ উবে যায়, আপনার লেখা পড়ার পর সে চর্চার উৎসাহ বাড়ে। আমি অবশ্য কোনো মন্তব্য করলামনা।

আপনাদের সন্ঘের [য] কাজ কেমন চলছে? বিজনরায়ের এক কপি বই আর জনযুদ্ধের কবিতা পাঠাতে পারেন? ভি. পি. তে আপত্তি নেই।

কাল চাদনী চকে আপনা থেকেই একটা প্রকাণ্ড জনসভা হল। সভার পর স্থভাষের hero জগদত্ শর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। মিটিং সম্বন্ধে ভদ্রলোকের উন্নাসিক মনোভাব দেখে পশ্চাদ্‌ভাগে চপেটাঘাতের ইচ্ছা হয়েছিল। এইসব লোক আমাদের ডোবাবে।

আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। স্নেহাংশু এখন কোথায়? মিসেস দে কেমন আছেন? ইতি

সমর

২৪

২০ [?]. ৮. ৪২

বিষ্ণুবাবু

১১ই অগস্ট নাগাদ আপনাকে একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলাম। এতোদিনে নিশ্চয়ই পেয়েছেন; '২২শে জুন'-এর প্রাপ্তিসংবাদ তাতে দিয়েছিলাম।

এখানে situation well in hand. তবে রোজ বিকেলে বেরুবার আগে জেনে নিই সান্ধ্যআইন [য] আছে কি না আছে। বেঘোরে প্রাণ হারাবার ইচ্ছে নেই। প্রায়ই রাস্তায় সরকারের সশস্ত্র বাহার দেখি। বিশেষ গাত্রদাহ হয়। কলেজ ১০ই থেকে বন্ধ, শুনছি ২৪শে খুলবে। সেপ্টেম্বরের ছুটি থেকে এ ১৪ দিন বোধহয় কাটা যাবে, স্থতরাং সে সময় বোধহয় আর কলকাতা যাওয়া হবেনা।

আপনি নিশ্চয়ই কোনো দৈনিক পত্রিকার জন্য রিভিয়ুটা চেয়েছিলেন; পরিবর্তিত পরিস্থিতির ফলে ওটা বোধহয় কাজে লাগবেনা, ছাপাবেন কোথায়?

পারিবারিক খবর মন্দের ভালো। বাচ্ছার [য] অস্থখ হয়েছিল, স্থলেখাও অস্থস্থ ছিল।

টাকা পাঠানো ত অসম্ভব ব্যাপার। চাঁদাতে এ মাসে ৩৬্ গিয়েছে। এখন অবস্থা কাহিল।

কিছুদিন আগে Fantasia দেখলাম। উল্লুকের মত লাগছিল। আপনাদের খবর কী ? আশা করি মিসেস্ দে ভালো আছেন।

চিঠিটা কবে পাবেন ভাবছি। আপনার পোস্টকার্ড আজ পেলাম। কলেজ কি চলছে ? ইতি

সমর

২৫

৭. ৯. ৪২

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি পেয়েছি। রেখা ভালোই, কামাক্ষী Information Dept.এ কাজ করছে। দিল্লীতে ঘোরতর বর্ষা শুরু হয়েছে, বাংলাদেশের মত।

আপনি যে বইকটা পাঠিয়েছেন তাদের মূল্য হয় ১।।০, অথচ চেয়েছেন পাঁচ-টাকা। কী ব্যাপার ? আমার আর্থিক অবস্থা গতমাসের বদান্যতার জন্য শোচনীয়, সুতরাং আমাকে নিষ্কৃতি দিন। কামাক্ষীকে টাকাটার জন্য বলব।

'অরণি'কে তাড়া দিয়ে কী [যে] কোনো ফল হবে ? 'নানাকথা'র রিভিয়ু 'অরণি'তে করার জন্য অরুণবাবুকে গত মে মাসে অনুরোধ করেছিলাম. বিশেষ ফল হয়নি। রিভিয়ুটা 'পরিচয়ে' ছাপালে ভালো হয়না ? সাপ্তাহিকের পক্ষে লেখাটা একটু বড়ো। '২২শে জুন'এর বিষয়ে লিখতে সময় লাগবে. 'খটকা'র কথাটা আপনাকে চটাবার জন্য লিখেছিলাম। বামপন্থী বন্ধুরা চুপ. দেশের অরাজক অবস্থায় তাঁরা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে কফি হাউসে সময় কাটাচ্ছেন। Dung and death.

আপনাদের খবর কী ? স্নেহাংশু কেমন আছে ? অশোকের চিঠিপত্র পান ? মণীন্দ্র একটা ধুতি আমার বাড়ীতে ফেলে গিয়েছিল, সেটা একজনের হাতে আপনার কাছে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছি। বুদ্ধদেববাবুর "২২শে শ্রাবণ" মহৎ কবিতা ?

এখানে মন রয়না রয়না ঘরে গোছের অবস্থায় আছি। দিল্লী ছাড়তে পারলে খুসী হই, কিন্তু কলকাতায় যাবার উপায় ত কিছু দেখছিনা।

আশা করি সকলে ভালো আছেন। মিসেস্ দে-র স্কুল খুলেছে ? ইরা ও তারা কেমন আছে ?

ইতি

সমর

পুঃ দমননীতির বিরুদ্ধে কবিতা লিখলে সেটা কি anti-fascist হবে ? বোধহয় "counter-revolutionary" হবে।

২৬

১২বি দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী
২০. ১০. ৪২

বিষ্ণুবাবু

অনেকদিন আপনার জবাবের আশায় থেকে মনে হল যে আপনার আর একটা মোটা বই না প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত চিঠির আশা করা বোকামী। কিন্তু অনেকদিন আপনার কোনো খবর না পেলে অস্বস্তি হয়, আমাদের অনেকের জীবনে আপনি বোধহয় ইহুদীর ঈশ্বরের মত।

এখানকার খবর সব ভালো। মাঝে মাসদুয়েক পার্টিলাইন আর ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। এখন ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। তাই মনে হচ্ছে দুমাস কলেজ প্রায় বন্ধ থাকাতে অলস মাথা নানাধরণের [য] সন্দেহের কারখানায় পরিণত হয়েছিল। বাক্যবাগীশরা সবচেয়ে বীর ও স্বদেশভক্ত হয় বোধহয়।

কলকাতায় ফেরার মন্‌সা করছি। কিন্তু ওখানকার কলেজের যা হাল শুনছি তাতে কলকাতায় চাকরী দূরাশা [য]। আপনি এখানে আসার যে ভয় দেখিয়েছিলেন সেটা কার্যে পরিণত করার ত কোনো ইন্তাজাম্ করলেন না।

মাঝে বুদ্ধদেববাবু কয়েকটি কবিতার অনুবাদ চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, নানাকথা বাদ দিতে বলেছিলেন। শুনছি নাকি ইংরেজীতে একটি সঙ্কলন বেরুবে। আপনি অনুবাদ করেছেন নাকি? আমি কয়েকটা পাঠিয়েছি।

আশা করি মিসেস দে ভালো আছেন, ও ইরা ও তারার খবর ভালো। এবার অর্থাভাবে কলকাতায় যাওয়া হলনা। যামিনীবাবু কেমন আছেন? উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

২৭

৪.১১.৪২

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি পেয়েছি। ছুটিটা তাহলে মজায় কাটিয়েছেন। আমার এবারে যাবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু অর্থাভাবে যাওয়া হলনা। ক্রিসমাসেও যে যেতে পারব তার কোনো সম্ভাবনা নেই। আসছে এপ্রিলে এখান থেকে একেবারে পাততাড়ি গুটোতে চেষ্টা করব, দিল্লী বিশেষ ভালো লাগছেনা। অবশ্য কলকাতাতেও যে খুব চমৎকার লাগবে সেরকম আশা করিনা। তবে বুদ্ধিমান লোকজনের সংখ্যা বেশী, ট্রাম বাস আছে, চায়ের দোকান আছে, F. S. U. আছে, চিকিৎসা করে

এমন লোকেরও অভাব বোধকরি হবেনা। এখানে দিনের পর দিন দু-তিনটে বাড়ীতে ঘুরি, ফলে মাথামোটা হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধদেববাবুর Tale of Two Cities পড়িনি, পড়া থাকলে এ বিষয়ে আরো বেশী লিখতে পারতাম।

কামাক্ষী দিনরাত পালাই পালাই করছে, পত্নীপ্রেম কারণ। কেষ্ট ও খুচুতে প্রত্যেকদিনই প্রথমে তর্ক ও শেষে মুখ খিস্তি হয়। আমরা শ্রোতা। দুজনে জুটেছে ভালো। মাঝে মাঝে ধূর্জটিবাবু পত্রাঘাত করেন। সে সব চিঠিতে আপনার কবিতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তত্ত্ব থাকে। মাঝে বি. বি. সি.তে পরপর তিন-সপ্তাহে এলিয়ট সাহেব East Coker, Burnt Norton ও Dry Salvages পড়লেন। সবচেয়ে ভালো হয়েছিল প্রথমটি। কিন্তু দেখলাম আপনার চেয়ে সুধীনবাবুর আবৃত্তির সঙ্গে এলিয়ট সাহেবের আরো মিল।

আমার চিঠিটা একটু বেখাপ্পা ও বদমেজাজী হচ্ছে বোধহয়। ঠাণ্ডা লেগে মাথা ধরেছে, নাক বন্ধ হয়ে এসেছে, ও সিগারেটের স্বাদ পাচ্ছিনা। আশাকরি কিছু মনে করবেন না, গোস্তাকী মাফ্ করবেন।

আপনাদের কলেজ খুলেছে? ক্লাস হচ্ছে? একটা খবর অনুগ্রহ করে দেবেন? আপনাদের কলেজে কি থার্ড ইয়ারে নতুন কোনো ছেলে এখনো ঢুকতে পারে? একটি ছেলে এখান থেকে I.Sc. পাশ করেছে, সে B.Sc.তে কলকাতার কোনো কলেজে ভর্তি হয়ে [য] চায়। সেটা সম্ভবপর কিনা জানাবেন?

হীরেণবাবু [য] ও স্নেহাংশুর রাশ্যা যাত্রার কী হল? যাবার পথে কি দিল্লী পড়বে? দেখা হলে খুসী হতাম।

আশা করি মিসেস্ দে ভালো আছেন, ইবা ও তাবার খবর কী? আমাদের খবর ভালো। সুলেখার শুনছি হার্নিয়া হয়েছে, তবে serious কিছু নয়। পেটে বেল্ট বেঁধে সপ্তাহ তিনেক শুয়ে থাকতে হবে। বাচ্ছা [য] ভালোই আছে। ইতি

সমর

সঙ্গের চিঠিটা আমাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবেন।

২৮

২৭.১.৪৩

বিষ্ণুবাবু

আপনার দুটো চি   পেয়েছি। সোমেন চন্দের 'ইদুরের' আয়তন বিশ পাতা, আমি মাত্র পাতা ছয়েক অনুবাদ করেছিলাম। যদি চান সেটা পাঠাতে পারি। সমস্তটা অনুবাদ করতে অনেক সময় লাগবে, এবং সত্যিই আমার হাতে অনেক কাজ জমেছে। পরীক্ষার খাতা ইত্যাদি। সুভাষের চিঠি পাবার পর, যে দুটো

কবিতার কথা লিখেছেন, সে দুটো অনুবাদ করবার কোরশীশ [য] করেছিলাম, কিন্তু পারিনি। 'নববর্ষের প্রস্তাব'টা আগে অনুবাদ করেছিলাম, সেটা যদি প্রগতিকদের পছন্দ হয় তাহলে পাঠাতে পারি।

হাবুলবাবুর অভিভাষণ বিশেষ ভালো লেগেছে, তারাশঙ্করের বক্তৃতার চেয়েও। আপনার সমালোচনা (একচক্ষু) পড়েছি, কিন্তু মণীন্দ্রের বই এখন পর্যন্ত দেখিনি, সুতরাং কোনো মন্তব্য করা অনধিকারচর্চা হবে। তবে মার্কিস্ট [য] অখণ্ড চৈতন্যের কথা কী লিখেছেন? বাংলাকাব্যে ও বস্তুটির সঙ্গে এখন পর্যন্ত ত মূলাকাৎ হয়নি, তাই আপনার সমালোচনা পড়ে চিন্তিতভাবে মাথা চুলকোতে হয়েছে। আপনারা বেশ আছেন। আপনারা জনযুদ্ধের বক্তা হিসেবে বাংলা কাব্যে যে বিপ্লব এনেছেন তার পরিচয় 'একসূত্রে' পেয়ে অত্যন্ত পুলকিত আছি।

আশা করি আর সব খবর ভালো। সুলেখা ও বাচ্ছা [য] ভালোই আছে। কলকাতায় যেতে মে মাস হবে। আপনার সঙ্গলাভের লোভ সম্প্রতি আরো বেড়েছে, শুনছি নাকি আজকাল প্রায়ই cocktail party দিচ্ছেন। চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

২৯

১৩.৩.৪৩

বিষ্ণুবাবু,

কাল কলেজ থেকে ফিরে এসে উঠোনের রোদে বিষণ্ণভাবে (আগের দিন জ্বর হয়েছিল, কাল আবার চাকরের উপরে রাগ দেখিয়ে না খেয়ে ছিলাম) পায়চারী করছিলাম, এমন সময় ময়লা-ফেলা টিনের কাছে আপনার হস্তাক্ষরে একটি খাম আবিস্কার [য] করলাম। আরুইনকে বলেছিলাম আপনি চিঠি লেখেননি, সে জন্য লজ্জিত। চিঠি পাইনি বলা উচিত ছিল। যাহোক, বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেছিলাম, কিন্তু ভারতীয় স্থাপত্য বিষয়ে আমার জ্ঞান নামমাত্র বলে সেদিক থেকে ভদ্রলোকের বিশেষ সুবিধে হয়নি। ইতিহাস ও শতাব্দী কিছু কিছু বলেছিলাম। পদ্ম দেখিয়ে Peoples' Warএর ভাষায় হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই ইত্যাদি বলি, কিন্তু আরুইনের প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করতে বাধ্য হই যে মন্দির ভেঙ্গে মসজিদ গড়া হয়েছিল, ভ্রাতৃত্বের কোনো প্রশ্ন সেখানে ওঠেনা। জুম্মা মস্‌জিদে কাফের বলে আমাকে পয়সা দিতে হল, সাহেবরা বোধহয় কাফের নন, কেননা আরুইনের টিকিট লাগলনা। বাড়ী ফিরে বুঝলাম পাকিস্থান ছাড়া কোনো গতি নেই। পরদিন থেকেই জ্বর।

আপনার খবর অনেকদিন পাইনি। লেখাও অনেকদিন পড়িনি। আপনি নিজের কয়েকটি কবিতা ত তর্জমা করেছেন, তার থেকে কিছু আমাকে পাঠাতে পারবেন? এখানে একটি পত্রিকা বের হবে, যাতে বিভিন্ন প্রদেশের লেখা ছাপানো হবে। বুদ্ধদেববাবু Realisation কবিতাটি পাঠিয়েছেন, অনুবাদটা ত বেড়ে হয়েছে। আপনি কিছু কবিতা পাঠালে বেশ ভালো হয়। আপনার বোধহয় ধারণা আছে যে এ অধমের অবচেতন মনে আপনার সম্বন্ধে বাঁকা মনোভাব আছে, কিন্তু শুনলে বিস্মিত হবেন, বিদেশে আপনার গুণগান নিরন্তর করি, বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে। বিদেশী মানে দিল্লীওয়ালা, গুজরাটি, ইত্যাদি। তবে মনে হয় ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী সম্মেলন করে লেখার দিক দিয়ে বিশেষ সুবিধে হবেনা. ওটা বাংলাদেশে সহজ পথ। ২২শে জুন, ১৯৪১ এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি আইনত চালু হবার পর সাম্যবাদীর সংখ্যা হু হু করে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেটা আনন্দের কথা, কিন্তু? আরুইনকে বললাম যে আপনারো জীবনযাত্রা বদলানো উচিত। কী করে বদলাবেন? মোড়ে মোড়ে সাজ্জাদ জাহীরের মত 'জনযুদ্ধ' বিক্রী করুন (Peoples' Warএ নির্ঘাৎ ছবি বেরুবে), কয়লার ডিপো থেকে স্নেহাংশুর মত কয়লা নামিয়ে লোককে দিন, মুগাপাড় ধুতি ও গরদের পান্‌জাবী [য] পরে সভায় গিয়ে বলুন জাপানকে রুখতে হবে, আর দয়াময় সরকার যদি দেশের দশবিশজনকে নশ্বর শরীরের বন্ধন থেকে মুক্তি দেন তাহলে বলুন—পঞ্চম বাহিনী যোগ্য শাস্তি পেয়েছে। এইভাবে reconstruction of ways of living করলে সব মিলিয়ে বেড়ে ব্যাপার হবে, কিন্তু মহত্তর কবি হবেন কিনা বলতে পারিনা। সমন্বয় (ধূর্জটিদার সত্য শিব সুন্দর) কি তখন আসবে?

আমার অবস্থা কাহিল। নিঃস্ব রোমন্থক কাল আপনাকে পরিপাক করে গোছের অবস্থা। মোদ্দা কথায়, আড্ডা একেবারে বন্ধ, বিকেলে কোথায় যাই সেটা ঘোরতর সমস্যা. নতুন বই পাইনা, অনেকদিন বেঠোফেণী সঙ্গীত শুনিনি, অর্থাভাবে জলীয় সান্ত্বনা একেবারে বন্ধ, সন্ন্যাস নেবো ভাবছি।...সুলেখা গত রবিবার ফিরে এসেছে, এখনো শয্যাগত। ভালোই আছে, তবে চলাফেরা করতে মাস দেড়েক লাগবে। আমি অন্য ঘরে আশ্রয় নিয়েছি, বলা যায়না রক্তে ৺দীনেশ সেন, অরুণ সেন যদি হঠাৎ আত্মঘোষণা করেন!

কলকাতায় যেতে মে-মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হবে, আশা করি সে সময়ে কলকাতায় থাকবেন। ইন্‌সা আল্লা, তখন দেখা হবে। শুনে ভালো লাগল যে আপনাদের একটি ছেলে হয়েছে। কী নাম রাখলেন? আমার মেয়ের একটা ভালো নাম বাত্‌লে দিন না?

আশা করি মিসেস দে ও ইরা ও তারা ভালো আছেন। অনূদিত কবিতা পাঠাতে ভুলবেননা। ইতি

সমর

৩০

12B, Daryagunj, Delhi
5.9.43

বিষ্ণুবাবু

মাস দুয়েক আপনাকে চিঠি লিখব লিখব করে শেষ পর্যন্ত লিখিনি। কারণ, আপনার কাছ থেকে উত্তর আসার সম্ভাবনা আজকাল সুদূর। বন্ধুবান্ধবের চিঠিতে আপনার খবর মাঝে মাঝে পাই।

এখানে ফিরে এসে মেজাজ মোটেই ভালো নেই। প্রথমে কয়েকদিন মনে হয়েছিল মাথা খারাপ হবে, পরে বুঝলাম কুইনিনের প্রতিক্রিয়া।

কলকাতায় চাকরীর চেষ্টা করছি, শেষ পর্যন্ত হবে কিনা জানিনা। এখানকার সবাই বারণ করছেন, কেননা জিনিষপত্রের দাম তুলনায় এখানে অনেক কম, পথে-ঘাটে দুর্যোগের চিহ্নমাত্র নেই। কিন্তু "দ্যাশের ডাক", বুঝতেই পারছেন। যে ডাকের জন্য সুবোধ ঘোষের নায়ক স্ত্রীপুত্র ছেড়ে পোলিটিকাল্ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিল।

শুনছি "Us" প্রকাশিত হয়েছে। আমাকে নাকি পাঠানো হয়েছিল। হয়ত ডাকঘরের চক্রে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি। একবার দেখবেন ত।

আপনাদের খবর দেবেন। আমরা একরকম আছি। খোলা চিঠি পেয়েছেন কি? বুদ্ধদেববাবুকে লিখেছিলাম। আপনি আর কোনো বৃহৎ যুগান্তকারী কবিতা লিখেছেন কি?

মণীন্দ্রের "ইঙ্গিত" পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত। হনুমানের marxist interpretation অতীব মনোহর হয়েছে। ইতি

সমর সেন

৩১

২৫.১০.৪৩

বিষ্ণুবাবু

আপনার পোস্টকার্ড যথাসময়ে পেয়েছি। ঈশ্বর গুপ্তের উপরে লেখাটা উত্তম লেগেছিল। তবে ইংরেজ আসবার আগে আমাদের চরিত্রে কি ভাবালুতা ছিলনা? চণ্ডিদাসী বৈষ্ণব কবিতা এবং চৈতন্যদেব এবং তার অনুচরবর্গের ঘন ঘন মূর্চ্ছা পতন আলিঙ্গন? তবে কবিতায় অবশ্য সে সব ব্যাপারও বেশ কড়া পয়ারে প্রকাশ পেয়েছে। চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদিতে ভাবালুতা নেই।

এলিয়টের উপর মহৎ প্রবন্ধটি পেলে অত্যন্ত খুশী হতাম। বাঙালী কবিদের

(পুরাতন) নিয়ে আলোচনা করলে আমরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হবো। আমাদের সাহিত্য দিগ্‌গজেরা দেশীয় সাহিত্য অবহেলাই করেছেন। স্বগতও দুর্ভাগ্যক্রমে এর ব্যতিক্রম নয়। অনেক ভ্রান্তি আমাদের প্রায় বৈতরণীর পারে এনেছে, আপনারা কাণ্ডারীর সন্ধান দিলে খুসী হবো।

Us এখনো পাইনি, পাবার সম্ভাবনা নেই মনে হচ্ছে। ধূর্জটিবাবুর বইদুটো কি পাঠ করেছেন? শুনছি ওদুটোর পরে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে আর কিছু লেখা হতে পারেনা। এখানকার খবর ভালো। আজ 'জাতীয় নেতাদের মুক্তি দিবস' উপলক্ষে কলেজে একটি কম্যুনিষ্ট ছাত্র জাতীয় পতাকা তুলছিল, কংগ্রেসী ছাত্ররা সেটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে মাটিতে ফেলল। আজব দুনিয়া। এবং দিল্লী আজবতম জায়গা। কলকাতায় ফিরে যাওয়া উচিত। তবে শশাঙ্কের সঙ্গে আশ্চর্য্য মেলের কথাটা তুলে অত্যন্ত বিব্রত করেছেন, আপনার কাছ থেকে হাজার মাইল দূরে থাকাই কি শ্রেয় হবে?

আশা করি ভালো আছেন। চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে উল্টোভাবে কোণাকুণি ডানদিকে] Us এক কপি পাঠাবার চেষ্টা করবেন। স্নেহাংশুর কি শুভবিবাহ আসন্ন?

৩২

২৯. ২. ৪৪

বিষ্ণুবাবু

অনেকদিন পরে আপনার একটি চিঠি হস্তগত হয়েছে। আপনি মহাকবির চালে লিখেছেন, সুতরাং আপনাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো খবর তাতে পেলামনা। কামাক্ষীর মুখে আপনাদের সংবাদ কিছু পেয়েছি, তবে বিশেষ নয়।

এখানে ঢিমেতালে দিন চলছে। আজকাল নানাদিকে নাচগান মজ্‌লিস বসে। প্রায়ই প্রগতি সাহিত্যের আলোচনা এদিকে ওদিকে হয় ও সংস্কৃতিতে লোকের ঝোঁক দেখছি অসম্ভব বেড়েছে। অগষ্ট-আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন হয়েছে। বিশেষ পুলকিত হতে পারা যায়না। সেদিন একটা সভায় গিয়েছিলাম। এক ভদ্রলোক হিন্দি সাহিত্যের উপর ৫৬ পাতা প্রবন্ধ পাঠ করলেন। সুধীনবাবু বসন্ত মল্লিক ও বাঘ সম্বন্ধে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা মনে পড়াতে আমি আগেই অবশ্য চলে এসেছিলাম।

এখানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হচ্ছে। মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার। লোকমুখে শুনেছি যে সাহিত্য শাখার স্থানীয় সেক্রেটারী আমি, এবং

সেস্থত্রে কলকাতার লেখকদের নিমন্ত্রণ করার জন্য আমাকে তিনটে খাম দেওয়া হয়েছিল। দুটো ব্যক্তিগত চিঠিতে খরচ করে ফেলেছি। আপনি যদি কোনো দুর্বোধ্য লেখা ৬ই মার্চের আগে পাঠান তাহলে এখানকার শালারা কিছু জব্দ হয়।

অন্যান্য সব খবর ভালো। ডিসেম্বর থেকে টিউশনী করছি, কলকাতায় যাবার মালমশলা জোগাড় করার প্রয়োজন আছে। মে মাসের প্রথমে যাবো।

কয়েকদিন ধরে খুব বৃষ্টি পড়ছে। শীত কমে গিয়েছে। পানবসন্ত, হাম ইত্যাদি হচ্ছে। রাত্রে মশারা আবার গান ধরেছে। শুনলাম যারা গায় তারা ম্যালেরিয়া বহন করেনা। এরকম কাব্যিপনা মশাতে আছে আগে জানা ছিলনা।

আপনাদের কী হালচাল ? মণীন্দ্রের খবর শুনে খুব খারাপ লেগেছিল। মণীন্দ্র এখন কোথায় ? লেখাপত্র বন্ধ। আপনার নতুন কোনো বই কি বেরুচ্ছে ? বুদ্ধদেব-বাবুর নাটকে কোনো পার্ট কি করছেন ? ইতি

সমর

Us এখনো পাইনি। প্রগতি সাহিত্যিকদের কাণ্ড !

৩৩

12B, Daryagunj, Delhi
23.6.44

বিষ্ণুবাবু,

রাস্তায় ঠাণ্ডা ছিল বলে স্বস্তিতে এসেছি ; চাকরীতে ঢুকে স্থখের ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। আজকাল রোজ সকাল চারটের সময়, খুব সম্ভব ব্রাহ্মমুহূর্তে, উঠি। সাড়ে চারটা নাগাদ সাইকেল ধরি, অফিসে পৌঁছই প্রায় পাঁচটা নাগাদ। সাড়ে চার মাইল অন্ধকার, ক্বচিৎ কখনো শ্যামাপ্রসাদী ষাড় [য] আর চিমড়ে কুকুর দেখা যায়। কিছুদিন আগে নাকি খবরের কাগজের একটি সহ-সম্পাদককে গুণ্ডারা নামিয়ে জিনিষপত্তর সাইকেল নিয়ে বিবস্ত্র অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছিল।

এখানকার আর সব খবর ভালো। কেষ্টবাবু নিউ দিল্লীতে, আমার সঙ্গে মূলাকাৎ হয়নি। স্থলেখা ভালোই। নিয়মিত রান্নাবান্না করছে।

চখাবাবুর সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল ?

আশা করি আপনাদের খবর ভালো। ইতি

সমর

Statistical Laboratory—শেষ পর্যন্ত কী হল ?

৩৪

১৯.৭.৪৪

বিষ্ণুবাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। আমার ধারণা ছিল যে এ মাসের প্রথম থেকে আপনি Laboratoryতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনার সময় খারাপ যাচ্ছে দেখছি। দাদার একটি চিঠিতে জানলাম যে মেট্রোতে আপনি রাজী হলেই হয়; কিন্তু বিজ্ঞাপন লিখছেন ভাবতে মোটেই স্ববিধের লাগছেনা। আপনার আবার কলকাতা ছাড়ার উপায় নেই, নইলে আমাদের বেনিয়া কলেজে চলে আসতে পারতেন।

এখানকার খবর সব একরকম। আজকাল সাড়ে দশটা-সাড়ে চারটে করছি। গরমে সাইকেল করতে বেড়ে লাগে। বৃষ্টি পড়লে আবার সমস্ত ঘরে এত জল পড়ে যে হাঁড়ি চড়েনা। অফিসে রবিবারও ছুটি নেই, তবে বুধবার যেতে হয়না। কাজ করতে খুব ভালো লাগেনা, বিবেকে বাঁধে [য]। কিন্তু জনযুদ্ধের দরুন আমাদের বিবেক এখন অনেকটা elastic, তাই যা রক্ষে।

খুচুবাবু এখন বেকার। ফলে অনেক জায়গায় আমাদের চেষ্টা করতে হচ্ছে। আজ বুধবার, কিন্তু ছুটির দিন সকালটা রোদে ঘুরে মরতে হল।

আশা করি আপনাদের বাড়ীর খবর ভালো। 'এরুইন' ও কার্কমানের কী খবর? কার্কমান আপনার কাছে সুধীনবাবুর কোনো নাম শোনেনি জেনে খুব আশ্চর্য হয়েছিলাম। আশ্চর্য হওয়াটা কি খুব অস্বাভাবিক? সুধীনবাবু এখন নাকি উচ্ছন্নে গেছেন, তবু মরা হাতীরও দাম আছে। ইতি

চিঠির উত্তর দেবেন

সমর

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে উল্টোভাবে কোণাকুণি বাঁদিকে] অফিসে গিয়ে বুঝতে পারছি আমি ইংরিজী লিখতে বিশেষ পারিনা। আর একটা illusion গেলো।

৩৫

১২বি দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী
১২.৯.৪৪

বিষ্ণুবাবু

অনেকদিন আপনার কোনো বাণী পাইনি। চিঠি একটা লিখেছি, অনেকদিন হয়ে গেল, কিন্তু আপনার উত্তর পাবার সৌভাগ্য এখনো হয় নি। এর কারণ

আলস্য সেটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না, কেননা গতবছর আপনার কাছে শুনেছিলাম যে কলকাতাবাসী কয়েকজনের সঙ্গেই আপনার অতিদীর্ঘ পত্রালাপ চলে, অবশ্য বিদেশী ভাষায়।

প্রশান্তবাবুর সঙ্গে কাজ করছেন শুনেছিলাম, নিশ্চয়ই অনেক গল্প জমা হয়েছে। দাদার চিঠিতে একটা খবর পেয়েছিলাম যে আপনি Senior Educational Serviceএ কাজ পেয়েছেন, শিগগীরই ঢুকবেন। খবরটা পেয়ে খুসী হয়েছি।

এখানে একরকম দিন কাটছে। ম্যাজিনো লাইন কোথা থেকে আরম্ভ হয়ে কোথায় শেষ জানেন? কটা দুর্গ, কটা লোক থাকতে পারে? নীরোদবাবু [য] জানেন। ওঁর ভয়ে ক্রমাগত ম্যাপ দেখে দেখে মায়োপিয়া বেড়ে গিয়েছে। অফিসে কয়েকটা একহাজারী পাঞ্জাবী আছে, দেখলে গা জ্বালা করে। তাছাড়া একরকম কাটছে, দিনগত পাপক্ষয়।

কলকাতার খবর দিয়ে পারেন ত চিঠি লিখবেন। কে একজন আপনার সম্বন্ধে একটা মজার কথা লিখেছে। ঠিক আপনার সম্বন্ধে নয়, আপনার প্রতিপত্তির সম্বন্ধে। আপনার বাড়ীর সামনে নাকি আজকাল বিদেশীরা কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকে, ১৫ মিনিট দর্শন আর Sweetness & light পেয়ে ফিরে যায়। কার্কমানের কথা মনে পড়ছে। চিঠি দেবেন। ইতি

সমর

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে বাঁদিকে উল্টোভাবে কোণাকুণি] চিঠিটা পড়ে দেখলাম দু একবার 'বিদেশী' কথাটা লিখেছি। পেছনে বোধহয় কোনো মানসিক গণ্ডগোল আছে।

৩৬

27.9.44

বিষ্ণুবাবু,

আপনার সংসারে তাহলে অনেক ঝামেলা গেল। আপনাদের বাড়ীতে ম্যালেরিয়া হয়েছিল শুনে দু তিনদিন কুইনিন খেলাম। এখানে যদিও শীতের আমেজ ধরেছে, তবু এত মশা হয়েছে যে প্রাতঃকৃত্যের জন্য বেশীক্ষণ বসে থাকা যায়না।

এখানকার খবর একরকম। প্রতিক্রিয়াশীলতা বোধহয় বাড়ছে। বম্বেতে আমাদের একটা হিল্লের বন্দোবস্ত হবে ভেবেছিলাম; এখন ত কাগজগুলো দুর্মুখের মত নানা ইঙ্গিত দিতে শুরু করেছে। হতচ্ছাড়া দেশ, যোশীভরসা।

খুচু চাকরী পেয়ে আজমীর যাচ্ছে। গতবছরে (খুব সম্ভব আমারি টাকায়) একটা রাইটিং টেব্‌ল আঠারো টাকায় করিয়েছিল। কিনব ভেবে দাম জিজ্ঞেস

করলাম, শালা বলল ওটা করাতে ৩৬৲ পড়েছিল। তাজ্জব ব্যাপার। এখনো ওর কাছে ২১৫৲ পাই।

কেষ্ট খবর দিয়ে গিয়েছে স্টালিনেরও নাকি ধর্মে মতি হয়েছে। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চারটের মধ্যে প্রথম দুটোতে আপাতত ওর ভয়ানক মন বসেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রের বই তাহলে সত্যিই বেরিয়েছে। বিনা পয়সায় একটা কপি আশা করি। তবে anti-fascistরা complimentary copy পাঠায়না শুনেছি।

এর সঙ্গে একটা বড়ো কবিতা আপনাকে পাঠাচ্ছি। যদি মনে করেন যে ভদ্রলোকের পাতে দেবার মত হয়েছে, তাহলে 'পরিচয়ে' দিতে পারেন। ইতি

সমর

শুনলাম যে আহমেদ আলি কলকাতায় না গেলে আপনি সিনিয়র সার্ভিস্‌এ চাকরী পাবেন। বেটার পেছনে গুণ্ডা লাগাবো?

৩৭

8.10.44

বিষ্ণুবাবু,

শুনলাম আপনি মুঙ্গেরে। আমার আগের চিঠি পেয়েছেন? সেটার সঙ্গে যে লেখাটা ছিল সেটা যদি ছাপানো মনস্থ করে থাকেন, তাহলে অন্য নামে ছাপাবেন। কারণ আছে। বুঝতেই পারছেন।

এখানকার খবর ভালো। বিকেল ছটা থেকে রাত পৌনে একটা পর্যন্ত কাজ। মজায় আছি। দু একদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। কলকাতায় কবে ফিরছেন? চিঠি দেবেন। আশা করি আপনার তবিয়ৎ বাহাল, এবং মিসেস্ দে ভালো আছেন। ইতি

সমর

৩৮

১২বি, দরিয়াগঞ্জ
২৩.১.৪৫

বিষ্ণুবাবু

ফিরে এসে আপনাকে চিঠি লেখা হয়নি। আসবার আগের দিন আপনার কাছে স্কচের নেমন্তন্ন ছিল, কিন্তু আপনি ছিলেন না। সেই ক্ষোভ এতদিনে কমেছে।

আমাদের খবর একরকম। সুলেখারা কলকাতায়, ওর দাদার বিয়ে। আমার অফিসে পূরোদমে [য] চলেছে, এখনো রাত্তিরে কাজ। স্টালিনের অর্ডার অব্‌ দি ডে গুলো রাত্তিরে বেশীর ভাগ আসে, সেজন্য মন্দ লাগেনা। একটি বাচ্ছা [য] Steno সেদিন আমাকে বলল যে **Big Three meeting Ardennes**এ হবে।

মাঝে বেজায় শীত পড়েছিল। এখন মন্দের ভালো।

'সাত ভাই চম্পা' কতদূর এগোল?

একটা কথা। সাম্প্রতিক লেখায় সুযোগ পেলেই আপনি গদ্যকবিতা সম্বন্ধে সরস মন্তব্য করেন। মন্তব্যগুলো কিন্তু সজনীকান্ত দাসের কথা মনে করিয়ে দেয়। আপনারো তাহলে রুচি বিকার হয়।

আশা করি চটবেন না, এবং চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

৩৯

১৩/২ [/৪৫]

বিষ্ণুবাবু

আপনার পোস্টকার্ড অনেকদিন হল পেয়েছি। উত্তর দিতে অভদ্র রকমের দেরী হয়ে গেল।

'সাত ভাই চম্পা' এখনো পাইনি। পাব্‌লিশারের ওপর যখন পাঠাবার ভার দিয়েছেন তখন পাবার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। পরের বারে যখন কলকাতায় যাবো তখন হয়ত দেখবার সৌভাগ্য হবে, অবশ্য যদি সব বিক্রী না হয়ে যায়। মণীন্দ্র লিখেছে শিশুসাহিত্য ভেবে অনেকে হয়ত বইটা কিনবে।

কলকাতায় ফেরবার চেষ্টা করছি, সুবিধে হচ্ছে না। অফিসে ঝগড়া করছি, যদি বেটারা যেতে বলে।

ওরেস্টভের সঙ্গে দেখা হয়নি, বই পাঠিয়ে দিয়েছি। ভদ্রলোক থাকেন অনেক দূরে, তবে রোজ পাঁচনম্বরে আসেন। পাঁচনম্বরে একটি বাঘা কুকুর আছে, এবং আমার একটি শ্যালিকা আছেন, যিনি পড়াশুনো বুঝে নিতে যান; সেজন্য ওমুখো হইনা।

গদ্যকবিতা সম্বন্ধে যা লিখেছেন এতদিনে ভুলে গিয়েছি। হয়ত অহমিকার জন্যই গায়ে লেগেছিল। আপনার রুচি সম্বন্ধে যা অভিযোগ করেছিলাম, প্রত্যাহার করছি। তাছাড়া, গদ্যকবিতা কেন, কোনো কবিতা সম্বন্ধেই এখন আর উৎসাহ নেই।

স্কচের কথাটা পরের বারে মনে রাখবেন।
আশা করি আপনারা ভালো আছেন। ইতি

সমর

[চিঠির সম্ভাষণের ওপরে, উল্টোভাবে কোণাকুণি বাঁদিকে] : বড়াসাব্ আহম্মক আলির খবর কী?

৪০

12B. Daryagunj
14.4.45

বিষ্ণুবাবু

অনেকদিন আগে আপনাকে চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু আপনি বোধহয় আবার মহাকবির যুদ্ধে relapse করেছেন। আপনার নতুন বই এখনো আসেনি, অদূর ভবিষ্যতে আস্‌বার কোনো সম্ভাবনাও দেখছিনা। যামিনীবাবু সম্বন্ধে আপনার ও আরউইনের বই পড়বার আগ্রহ ভয়ানক বেড়েছে, কিন্তু আপাতত সেটা দমন করেছি।

কলকাতায় মাঝে ত খুব হৈচৈ হল। যাই বলুন, তারাশঙ্করবাবুর অভিভাষণটা বিশেষ সুবিধের হয়নি। আপনি কী করলেন?

কলকাতায় ফেরার জন্য অনেকরকম ফন্দী মনে আসে, কিন্তু কোনোটাই কার্যকরী হচ্ছেনা। আপনি ত অনেককে চেনেন। কলকাতায় আমার একটা হিল্লে করাতে পারেননা? রেডিওর চাকরীতে ঢুকে প্রথমে ভেবেছিলাম প্রাণপণে টাকা জমিয়ে তারপর কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা করব। কিন্তু টাকা কাত্‌লা মাছের মত খালি পিছলে বেড়িয়ে [য] যায়, আমি যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছি।

যাহোক, দুঃখের কথা আপনাকে আর জানাবো না। আত্মকরুণার হাত থেকে কিছুতেই রেহাই পাচ্ছিনা।

মিসেস্ দে ও বাচ্ছারা কেমন [য] আছেন? আমাদের খবর ভালো। সুলেখা বোধহয় একটু মোটা হয়েছে, বীথি রোগা হয়েছে। আমার মুখ এবং দুটো করকমল রোদে পুড়ে টমিদের মত লাল হয়েছে। চিঠি দেবেন। ইতি

সমর

৪১

১২বি, দরিয়াগঞ্জ
২৬.৪.৪৫

বিষ্ণুবাবু

আপনার চিঠি দিনদুয়েক আগে পেয়েছি। চাকরীর কথা ছিল বলে তক্ষুণি জবাব দেব ভেবেছিলাম, কিন্তু কয়েকদিন সকালে কাজ পড়ে গিয়েছিল, তাই দেরী হল। আহমেদ আলি ও আপনার বইএর কোনো পাত্তা এখন পর্যন্ত পাইনি। আপনার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়েছে শুনে একটু আশ্চর্য হলাম। এখানকার লোকেরা ভদ্রলোককে খুব চালিয়াৎ বলে। যাহোক, আশা করি বইটা পাওয়া যাবে।

কলকাতায় চাকরীটা পেলে বেড়ে হয়। আপনাকে তাহলে বই কিম্বা রেকর্ড উপহার দেবো (পঞ্চাশ টাকার মত)। আপনি বোখারিকে তাড়া দিতে শুরু করুন। বিরলার [য] চাকরীর কোনো পাত্তা পাচ্ছিনা, শুনছি ওরা কলকাতায় বাড়ী পাচ্ছেনা। তাছাড়া বিজ্ঞাপন লেখার কাজ বুড়োবয়সে পোষাবে না।

এখানে আজকাল সপ্তাহে তিনদিন নীরোদবাবুর [য] সঙ্গে কাজ করি। নানা বিষয়ে উপদেশ দেন। আমরা যে কিস্সু লিখতে পারিনা সেটা অনেকবার জানিয়েছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে এও বলেন যে চাকরীর খাতিরে সাহিত্যচর্চা ছাড়া কোনো কাজের কথা নয়। যত কাজ বাড়ে, তত বেশী লেখা যায়, যেমন বঙ্কিম চাটুয্যে, রমেশ দত্ত। ভদ্রলোক মজার লোক। অফিসে শকুন্তলা ও Marcus Aurelius আনেন।

চঞ্চলের খবর অনেকদিন পাইনি। আপনার সঙ্গে দেখা হয়?

কলকাতার হালচাল কেমন জানাবেন। আশা করি মিসেস্ দে ভালো আছেন। ইতি

সমর

বার্লিন ত প্রায় গেল। হীরেনবাবু ও রাধারমণবাবুকে এসময়ে দেখতে ইচ্ছে করে।

৪২

6/6 [/45]

বিষ্ণুবাবু

এখানে ঝড়, ধুলো [য] আর বালি, মেজাজ ভয়ানক গরম। তার ওপরে শুনলাম যে আপনি সমুদ্রতীরে সূর্যমন্দিরে বেড়াতে গিয়েছেন। ভয়ানক পরশ্রীকাতর বোধ করছি।

আগের চিঠিটা কি পাননি? মাঝে বোখারি সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি প্রোগ্রাম এক্‌সিকিউটিভের জন্য চেষ্টা করতে বলে গিয়েছেন। মাইনে কম হলেও আমার আপত্তি নেই; কিন্তু লোক নেওয়া পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের হাতে। বোখারি সাহেব মজার লোক, কিন্তু চালাক। আপনার বিষয়ে উচ্ছ্বসিত। তাতে ঈর্ষা হওয়া স্বাভাবিক, কিন্তু নানাদিকে আপনার বন্দনা কয়েক বছর ধরে শুনে এখন গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

"সাত ভাই চম্পা"—আহমেদ আলি একদিন অফিসে এসে দিয়ে গেছেন, আমার সঙ্গে দেখা হয়নি। কোথায় থাকেন জানি না, তাই ধন্যবাদ জানাতে পারিনি। বইটা one of your best। যুদ্ধের বছর কটাতে আপনিই লাভ করেছেন (টাকা নয়)।

মণীন্দ্র বিয়ে করেছে। আশা করি আপনি ঘটকালি করেননি। করে থাকলে শিগগিরই মনান্তর হবে।

এখানকার খবর একরকম। ভয়ানক গরম। বেলা একটায় অফিসে যাবার সময় পোড়া আমের সরবৎ, রাত্তির নটায় বাড়ী ফিরে খাওয়া আর ঘুম, সকালে খবরের কাগজ আর Purgationএর চিন্তা।

উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

৪৩

১৪।৭ [/৪৫]

বিষ্ণুবাবু

পরিচয়ে আপনার লেখাটা বেড়ে হয়েছে। সংখ্যা বিজ্ঞান বিষয়ে এরকম সোজা-ভাবে লেখাতে অনেকক্ষণ ধরে মাথা চুলকোলাম, তাজ্জব ব্যাপার।

'সাত ভাই চম্পা' সম্বন্ধে আপনাকে আগেই লিখেছিলাম যে ভালো লেগেছে। কেন জিজ্ঞেস করলেই মুশ্‌কিল। জাপানীরা পিগুর [য] কাছে কেন যুদ্ধ করছে, আমেরিকানরা কেন হনস্থ আর হোক্কাইডোতে বোমা ফেলছে জিজ্ঞেস করুন, চটপট বলে দেবো। কিন্তু কবিতা কেন ভালো লেগেছে সেটা কী করে বলি, বিশেষ করে কবিতাভবনে বছর পাঁচেক ঘোরাফেরার পর। বাগ্‌বাজারী ওপর চালাকির একটা সীমে আছে ত।

অফিসে আজ বড়োলাটের সিম্‌লা-বক্তৃতা পড়ে এলাম। বেড়ে দেশ আমাদের। যাহোক, বাঁদর নাচ যে বেশীদিন হয়নি সেটাই ভালো। কংগ্রেসের চোখে বোধহয় ছানি পড়েছে।

আপনারা কেমন আছেন ? চঞ্চল ও নববিবাহিত মণীন্দ্রের সঙ্গে মুলাকাৎ হয় ? বোখারি সাহেবকে বলবেন যে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভের জন্য দরখাস্ত করেছি। চাকরীটা **non-gazetted** শুনে মনটা ভয়ানক খচ্‌খচ্‌ করছিল, দিল্লীর বিষ একটু রক্তে ঢুকেছে।

চিঠির জবাব আশা করি দেবেন। ইতি

সমর

৪৪

18/10[/45]

বিষ্ণুবাবু

এখানে ফেরার পর থেকে আপনাকে লিখব লিখব করে লেখা হয়ে ওঠেনি। তার একটা কারণ দিল্লী প্রত্যাগমনের পর আপনারা কলকাতায় যে কাণ্ডটা শুরু করলেন তাতে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম। অশোকের মারফৎ খবর পেয়েছিলাম যে আপনারা ভালো আছেন, যদিও বাড়ীর পেছনে ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র গোছের হয়েছিল।

লেখার কথা শুনলে জ্বর আসে। কবিতা ও প্রবন্ধ লেখা আমার দ্বারা হবেনা, তবে অনুবাদের চেষ্টা করে দেখতে পারি। কতদিনের মধ্যে চাই জানাবেন ?

এখানকার সব খবর ভালো। আমাদের শুনছি ফেব্রুয়ারীর শেষে সরে পড়তে হবে। একটা চাকরী যদি জুটিয়ে দেন তাহলে ভালো হয়। প্যাটেলের হুকুমতে আমার বিশেষ সুবিধে হবেনা। বুলেটিনে নেহরু কিম্বা গান্ধির আগে ভুলেও জিন্নার নাম করলে নোক্‌রী যাবার সম্ভাবনা আছে। বাঁদর নাচ আর কতদিন দেখতে হবে কে জানে। এরপর লীগ যখন সরকারে ঢুকবে তখন আমাদের অবস্থা **between the devil and the deep sea** হবে।

ওপেল্‌টা সাপের ছুঁচো গেলার মত হয়েছে। পেট্রল আর অ্যালকোহল্‌ একসঙ্গে চালানো মুশ্‌কিল।

পূজোর [য] ছুটিতে কলকাতাতেই ছিলেন ?

আশা করি বাড়ীর খবর ভালো। ইতি

সমর

৪৫

১২বি দরিয়াগঞ্জ
৫।৪।৪৬

বিষ্ণুবাবু

অনেকদিন আপনার কোনো চিঠি পাইনি। গতবার পূজোর [য] সময় কলকাতায় গিয়ে শুনলাম আপনি দেওঘরের কাছে কোন লাল মাটির গ্রামে আছেন, নভেম্বরে ফিরবেন। সুতরাং বাৎসরিক রূচিচর্চা হলনা।

মাঝে কে যেন লিখেছিল আপনি নাকি ভয়ানক ছবি আঁকছেন এবং কয়েকটা নাকি সত্যিই ভালো হয়েছে। গুজব নয় ত?

পরশুদিন Orestov-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাংলা বেশ শিখেছে। ওর মাতৃভাষায় বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ এবং বই লেখবার মতলব আছে, আমাকে materialsএর জন্য জিজ্ঞেস করছিল। আপনাকে সেবিষয়ে লিখে খবর আনাবো বলে এসেছিলাম। আপনি যদি নিচের বিষয় সম্বন্ধে বই এবং প্রবন্ধের খোঁজ দিতে পারেন ত ভালো হয়। কিছু কিছু বই-এর নাম আমি দিয়ে এসেছি

(1) Social development in 19th Century Bengal.

(2) Religious movements in Bengal

(দুটো অবশ্য একই বিষয়-এর মধ্যে পড়ে)

(3) Marxist interpretation of Modern Bengali literature.

Orestov ইংরেজীতে ওপরের বিষয়গুলোর উল্লেখ করেছিল বলে ইংরিজীতে লিখলাম।

আশা করি কলকাতার সব খবর ভালো, এবং আপনারা বহালতবিয়তে আছেন। আমাদের হালৎ একরকম। রোজ ভোর সারে [য] চারটেয় উঠে অফিস যাই আর খবরের কাগজে কলকাতায় আপনাদের নিদারুণ গুণ্ডামীর কথা পড়ে লজ্জিত হই। অবশ্য কম্যুনিষ্ট গুণ্ডামীতে রাধারমণবাবু, নীরেনবাবু কী করে আহত হলেন সেটা বোঝা শক্ত।

চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর

৪৬

১৬।৪ [/৪৬]

বিষ্ণুবাবু,

আপনি যে কটা বই ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছিলেন তার অধিকাংশই

আমার মনে ছিল। দেবীর প্রবন্ধ Orestov ইতিমধ্যেই মাতৃভাষায় অনুবাদ করেছে। দেবী শুনলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। Orestov বাংলা বেশ ভালোই শিখেছে। কথাবার্তা বলতে অসুবিধে হয়, সেজন্য চলতি বাংলা শেখার জন্য একজন মাস্টার রেখেছে। কিন্তু লিখিত বাংলা বেশ আয়ত্ত করেছে। মাঝে গর্কির একটা গল্প অনুবাদ করেছিল, একজন কমরেডের হাত দিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিল পরিচয়-এ পাঠিয়ে দেবার জন্য, কিন্তু কমরেডটি তিন চার পাতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে বাকী অংশটা এখনো পড়ে আছে।

এখানকার খবর বিশেষ নেই। মাঝে IPTA এসেছিল, দিনসাতেক দিল্লীতে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। আমি নাক একটু উঁচু করে প্রথমে গিয়েছিলাম, দেখার পর একেবারে floored, অনেক মান্যগণ্য ব্যক্তি দেখতে গিয়েছিলেন ; শেষের দিন পণ্ডিতজীকে দেখলাম।

আপনার চিঠি পড়ে মনে হল ছবি এঁকে কবিতা লিখে বেশ আছেন। কলকাতায় যাবার খুব ইচ্ছে হয়, কিন্তু সুবিধে হচ্ছে না। Z.A. Bokharine নেহাৎ চালিয়াৎ, মুখেই পৃথিবী মারে, কাজের বেলায় কিছু নয়।

আশা করি আপনাদের খবর সব ভালো।

ইতি

সমর

কালি ফুরিয়ে গেছে বলে পেন্সিলে লিখলাম।

৪৭

২৪।১১ [/৪৬]

বিষ্ণুবাবু,

লেখা হয়ে উঠলনা, আর কোনোদিন যে হবে সে ভরসাও নেই। দেরীতে খবর দিলাম বলে আশা করি কিছু মনে করবেননা। একদিন ভয়ানক মনমরা হয়েছিলাম, পুলিশের দোর্দণ্ড ব্যবস্থায় সন্ধে ছটার থেকে বাড়ীতে থাকতে হত।

সুলেখা এখনো পিত্রালয়ে। একটি মেয়ে হয়েছে। দুজনেই ভালো আছে।

আপনারা আশা করি ভালো আছেন। মাঝে অরেস্টফ্ আপনার দুটি কবিতার মানে জিজ্ঞেস করেছিল, দুতিনটে লাইনে এমন হোঁচট খেলাম যে মানে বের করতে পারলামনা। দোষটা বোধহয় আমারি, আপনার কবিতার নয়। ইতি

সমর

৪৮

12B, Daryagunj
24/4/47

বিষ্ণুবাবু,

আপনি ত Jack Hughesকে চেনেন। ওর নামে আমাকে একটা পরিচয়পত্র দিতে পারেন? শুনছি ওরা কলকাতায় একটা অফিস খুলছে। আপনার চিঠি পেলে সেটা নিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করি। যদি সোজা ওকে চিঠি লিখে আমাকে খবরটা দেন তাহলেও হয়। Hughes এর ঠিকানা C/o United Kingdom Publicity Office, Malhotra Building, Connaught Circus, New Delhi.

ব্যাপারটা জরুরী।

এখানকার খবর একরকম। সন্ধ্যেবেলায় সাতটার মধ্যে বাড়ী ফিরি, চরিত্র ভালো হচ্ছে।

আপনার বই-এর কতোদূর? ইতি

সমর

৪৯

১২বি, দরিয়াগঞ্জ
২১. ৫. ৪৭

বিষ্ণুবাবু

উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। মাঝে একটা কাজে সিমলা গিয়েছিলাম। জায়গাটা ভালো লাগলনা। পাহাড়ের চেয়ে বোধহয় সমুদ্র ভালো, বিশেষ করে পাঞ্জাবী পাহাড়ের চেয়ে।

পরশুদিন Hughesএর সঙ্গে দেখা করেছি। আপনার চিঠির জন্য খাতির করল। আপনাদের দুজনের কথা অনেকবার জিজ্ঞেস করল। চাকরীর ব্যাপারে বলল আপাতত কাজ খালি নেই। লোক দরকার হলে আমাকে স্মরণে রাখবে। মোটামুটি লোকটি বেশ অমায়িক বলে মনে হল।

আপনার বই কবে বেরুচ্ছে?

আপনি মহাকবি সুলভ অবজ্ঞায় আজকাল আর বই টই পাঠাননা। কিন্তু 'সন্দীপের চর' [য] পাঠালে খুশী হবো।

কলকাতার খবর কী? জুনমাসের জন্য আশা করি তৈরী হচ্ছেন। পুরী যাবার কী হল?

আপনার বাড়ীতে বিচলিত মুহূর্তে কলমের কথা যা বলেছিলাম, সেটা এখনো ভুলতে পারিনি। ইতি

সমর

৫০

৫. ৯. ৪৭

বিষ্ণুবাবু

আপনার এগারো তারিখের চিঠি পরশুদিন পেয়েছি, আজাদীর বিচিত্র মহিমা! এখানে উত্তর-আজাদী যবন-মেধ যজ্ঞ হয়ে গেল, পাণ্ডা ছিল পলাতক পঞ্জাব-কেশরীরা। তিনচারদিন অনাবিল রামরাজত্বের পর নেহরু পঞ্জাব থেকে ফিরে আসেন, এবং তারপর অবস্থার উন্নতি হয়। এখন দলে দলে কলকাতায় যাদের মনার্কিষ্ট বলছেন তারা শহর ছেড়ে পুরোনো কেল্লায় যাচ্ছে, সেখানে সাপ, কলেরা বৃষ্টি, খোলা আকাশ। যাদের পয়সা আছে তারা পাকিস্থানে পাড়ি দিচ্ছে। ১৫ই অগষ্টের তিনরঙার বাহার দেখেছিলাম, একমাসের মধ্যে কী তুচ্ছ পরিণাম।

এদিকে খালি বাড়ীর লোভে শকুনের মত শিখেরা এবং তাঁদেব তাঁবেদার হিন্দুরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার বাড়ীর পাশে প্রত্যহ গুরু গ্রন্থ সাহাবের উপাসকেরা আসে; তালা ভেঙ্গে ঢোকে, পুলিশ তাড়িয়ে দেয়, আবার আসে। তবে একটা জিনিষ। বাড়ীওয়ালা বর্তমান থাকলে পুলিশ সবসময়ে তাকে সাহায্য করে। সেটা আমাদের সরকারের গুণ বলতে হবে।

কয়েকদিন রাত্রে স্লোগান, স্টেন্‌গান, মেসিনগান, রাইফেল ইত্যাদির মধুর ঐক্যতানে [য] ঘুম হয় নি। ভাগ্যিস [য] দু বোতল স্কচ ছিল, তাতে এ ক্রান্তি পার [বাকি অংশ চিঠির প্রথম পিঠে, উপরে এবং বাম পাশে] হয়ে যাবো আশা করি।

আপনার চাকরীর কী গণ্ডগোল হল? Hughes-এর ঠিকানা: C/o British Information Services, Eastern House, Man Singh Road, New Delhi.

'সন্দীপের চর' [য] এক কপি সত্বর পাঠাবেন। আমার রুচির অধঃপতন হয়েছে, প্রগতির সঙ্গে সম্পর্ক পাতলা হয়ে এসেছে, অতএব রুচি ও প্রগতির সমালোচনা করতে ভরসা হয় না।

৫১

১৭. ১০. ৫৫

বিষ্ণুবাবু

বৃষ্টির জন্য যাবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি। তাছাড়া রাত্তিরে অফিস ছিল। রিখিয়া গেলে বেড়ে হয়, কিন্তু এখনো ছুটি শুরু হয়নি, ২২শে কিম্বা ২৭শে পাবো। সেসময় পকেটের অবস্থা ভালো থাকলে আপনাদের ওখানে চলে যাবো, দিন চারেকের জন্য।

অশোক শেষ পর্যন্ত নেতেরহাট যাচ্ছেনা।

কাল একটা প্রদর্শনীতে যামিনীবাবুর সঙ্গে দেখা হল; শরীর খারাপ, সর্দি কাশিতে ভুগছেন। আশা করি আপনারা ভালো আছেন।

সমর

৫২

১. ১১.

বিষ্ণুবাবু

এবারে আর যাওয়া হলনা। ছুটি পেতে বেশ দেরী হয়ে গেল, তখন মনে হল ১লার পর আপনাদের ওখানে স্থানাভাব হবে, তাই বার্নপুরে দিন চারেক থেকে আজ দুপুরে ফিরে এসেছি। আপনার চিঠি পেয়ে মনে হল দু তিন দিনের জন্য এখন গেলেও হয়, কিন্তু অর্থাভাব। তাছাড়া নিশ্চয়ই ওখানে বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে, —আমাদের গরম জামা কাপড়ের বাক্সের চাবি সুলেখার কাছে, এবং সুলেখা দিল্লীতে।

আপনারা নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফিরছেন?

এখানকার খবর নিশ্চয়ই ভালো। ফিরে এসে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা হয়নি। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন।

সমর

৫৩

YAROSLAVSKOYE SHOSSE,
DOM 24, Kvartira 279,
Moscow, U. S. S. R.
16. 10. 57

বিষ্ণুবাবু,

চিঠি লিখতে একটু দেরী হয়ে গেল ; ঠিক আসাব আগেও দেখা করতে পারিনি মার্কারি "ট্রাবল্সের" জন্য। শেষ মুহূর্তে দেখা গেল দরকারী কয়েকটা কাজ করা হয়নি, তাই টোঁ। টোঁ। [য] করে ঘুরতে হয়। তাছাড়া "সজল" বিদায় গ্রহণের ঠেলা সামলাতে হল।

এখানে গুছিয়ে বসতে পেরেছি এতদিনে, রাস্তায় মাস্কোভাইটের মত মুখ করে ঘুরে বেড়াই, অভিনয় দেখে হাততালি দিই, যদিও ভাষাজ্ঞান বলতে গেলে শূন্য। গত মাস দুয়েক ধরে রোজ নিয়মিত পড়ছি, কিন্তু বিশেষ এগোচ্ছে না, কেননা ব্যাকরণে আমি নেহাৎ কাঁচা ; তাছাড়া, কথা বলবার লোক মাত্র হালে হয়েছে। সবচেয়ে মজার লোক হলেন আমাদের ওরেস্তভ ; এখানে মাস তিনেক এসেছেন, কোন খোঁজখবর নেওয়া ত দূরের কথা চিঠির জবাব পর্যন্ত দেননি। জেনো-ফোবিয়ার জের সাধারণ মানুষদের কেটে গিয়েছে, বুদ্ধিজীবীদেব নয়।

অফিসে যেতে হয় না। বাড়ীতে কাজ, কয়েক মাস রোজগারপাতি বেশ করে শেষে মনে হল মস্কোতে এসে অর্থলোভ হওয়া উচিত নয়, তাই কাজে ঢিলে দিয়েছি। অনুবাদ করতে ভালো লাগেনা, ওটা কোনরকমে বাদ দিতে পারলে সোনায় সোহাগা হত। এ পর্যন্ত পাঁচটা বই অনুবাদ করেছি : Health Protection in the Soviet Union (এটা শেষ করার পর আমার ছোট ভুঁড়িটা অদৃশ্য হয়ে যায়), তলস্তয়ের Cossacks, করলেঙ্কোর The Blind Musician, পলভয়ের A Story of a Real Man এবং Ermilov-এর চেখভ। শেষেরটা আমার একেবারে ভালো লাগেনি, কিন্তু নাচার। অনুবাদ কেমন হয়েছে জিজ্ঞেস করবেন না।

আমাদের কোন maid নেই। তার ওপর, সুলেখা অফিসেব কাজ করে, বাড়ীতে। ফলে গার্হস্থধর্মে মন দিতে হয়, বিশেষ করে প্রথম দিকে। এখন অনেকটা কমে গিয়েছে। মেয়েরা স্কুলে পড়ছে, তোড়ে রুশী বলে। ওরা আমার দোভাষীর কাজ করে দরকার পড়লে।

এখানকার আবহাওয়া বেড়ে লাগে। তবে খুব ফ্লু হচ্ছে। আজ দুপুরে এক পশলা বরফ বৃষ্টি হয়ে গেল, দিন চারেক আগে -৫° ছিল, তখন কিন্তু বরফ দেখিনি।

সন্ধ্যেবেলাগুলো একটু বিস্বাদ লাগে। মাঝে মাঝে থিয়েটার আর অপেরা, মাঝে মাঝে ফুটবল। তাছাড়া আড্ডা। নীরেনদার সঙ্গে দেখা হয় প্রায়ই। ননী ভৌমিক বেড়ে আছে। কলকাতার আড্ডার কথা প্রায়ই মনে হয়।

চঞ্চলের চিঠি দু এক মাস অন্তর পাই। এখানে চাকরীর চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ভারত সরকারের মাধ্যমে না এলে এরা লোক নেবেনা। তাছাড়া, ভারতীয়দের অনুবাদক্ষমতার কথা এরা জানতোনা—বরাদ্দ বই হু হু করে শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর লোক নেবেনা মনে হয়।

মিসেস্ দে না কি স্কুল ছেড়ে দিয়েছেন? আপনি কি এখনো সেনট্রাল কলেজে না যাদবপুরে? সুধীনবাবু সস্ত্রীক শুনলাম আমেরিয়া [য] ইওরোপ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বুদ্ধদেববাবুর খবর কী?

যামিনীবাবুর অপারেশনের খবর পেয়েছিলাম. এখন কেমন আছেন?

রুশীরা ভারতীয়দের ভালোবাসে খুব, কিন্তু ভালোবাসার তুলনায় জ্ঞানটা অনেক কম। প্রায়ই অনেক বিখ্যাত ভারতীয় লেখকের কথা শুনি যাদের নাম আমার পিতৃপুরুষ পর্যন্ত শুনিনি [য]। নিজের ধামা পেটানোটা এখানেও তার ফলে কাজ দেয়। একটা ভারতীয় গল্পের সঙ্কলন দেখলাম, ৪১০ পাতার বই। তার মধ্যে ১১০ দশ পাতা খাজা আহমেদ্ আব্বাস জুড়ে বসে আছেন। ভদ্রলোক মাস চারেক হল মস্কোয়, ফিলম্ তুলছেন।

কামাক্ষীরা বাৎসরিক ছুটিতে একমাসের জন্য কলকাতায় যাচ্ছে। আপনাদের সঙ্গে দেখা হলে এখানকার আরো খবর পাবেন।

চিঠির উত্তর দেবেন। আপনার নতুন কোন বই কি বেড়িয়েছে [য]?

সমর

৫৪

Yaroslavskoye Shosse,
Dom 24, Kvartira 279
Moscow,
৫.২.৫৮

বিষ্ণুবাবু,

ইরার তাহলে বিয়ে হয়ে গেল, শুনেছিলাম সত্যেশের সঙ্গে বিলেত যাবে, সেটার কী হল? নীরেনবাবুকে খবরটা দিয়েছি। নীরেনবাবু এখানকার হিন্দুস্থানী সমাজের সভাপতি, তাছাড়া অফিসের কাজ, খুব ব্যস্ত আছেন মনে হয়। কাল শরৎ-বাবুকে উপলক্ষ [য] করে একটা সভা হবে, সেখানে উনি একটা ভাষণ দেবেন।

আমাকে বলতে বলেছিলেন, খুব কৌশল করে কাটিয়েছি। এখানে বিদেশী নানা লেখকদের নিয়ে সভার অন্ত নেই। প্রথম প্রথম উৎসাহ করে যেতাম, এখন উৎসাহটা অনেক কমে এসেছে।

অক্টোবর মাসে তাসকেণ্ডে না কি এশিয়া লেখক সম্মেলন হবে। যে সব বাঙ্গালী লেখকদের নাম পাঠানো হয়েছে তার মধ্যে আপনি ত আছেন। চলে আসুন, এলে ভালো লাগবে বেজায়।

চঞ্চল লিখেছিল ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এখানে আসবে, দেশে ফেরার পথে। তারপব কোন পাত্তা নেই। লিখেছিল এখানে কিছুদিন কাটিয়ে যাবার ইচ্ছে আছে। দেশে একেবারে ফিরছে কিনা জানিনা, চঞ্চলের গতিবিধির কথা শুধু ভগবান জানেন।

সহ-অবস্থান নীতির কৃপায় আমাদের দিন মন্দ কাটছে না। তবে রুশী পানীয় বড়ো কড়া, জল কিম্বা সোডার বালাই নেই বলে। ঠাণ্ডাটা কিন্তু ভয়াবহ কিছু নয়, এতদিনে গা সওয়া হয়ে গিয়েছে।

বুদ্ধদেববাবু চিঠির জবাব দেননি। সুধীনবাবু কবে ফিরছেন জানেন? যামিনীদার সঙ্গে দেখা হলে আমার "প্রিভিয়েত্" জানাবেন।

আপনার নতুন কোন বই বেরিয়েছে কিনা লেখেননি ত। দেবীর বই-এর রুশী অনুবাদ হবে, বিস্তর টাকা পিটবে মনে হচ্ছে।

মিসেস্ দে কেমন আছেন? জবাব দেবেন।

সমর

১

৯. ২. ৪২

কামাক্ষীবাবু

আপনার চিঠি দুএকদিন হল পেয়েছি। মাঝে হঠাৎ রাম সস্ত্রীক এসে হাজির, উঠেছিলো অবশ্য আগ্রা হোটেলে। খুব ডারলিং ডারলিং করছে, ওর স্ত্রীর অন্তত ওটা না বলে লিংডর বলা উচিত। যাহোক্, এতোদিনে হয়ত মহেশমুণ্ডায় পৌঁছিয়েছে।

মাঝে বুদ্ধদেববাবুর চিঠি পেয়েছি। উত্তরের সঙ্গে একটা ফরমায়েসী কবিতা পাঠিয়েছি। আপনার বই আমার অনুপস্থিতিতে একজন্য [য] কবি-গোছের ভদ্রলোক শুনলাম খুব আগ্রহের সঙ্গে নিয়ে গেছেন, দুএকদিন ধাওয়া করে তার সাক্ষাৎ পাই-নি। লিখে রেখে এসেছি। আশা করছি ত আজকালের মধ্যে পাঠিয়ে দেবেন। না পাঠালে আপনাকে আবার বোধহয় মেহেরবাণী করে আর একটা পাঠাতে হবে।

মে মাসে আন্তর্জাতিক কারণে কলকাতায় যাওয়া অসম্ভব হতে পারে, কিন্তু পারিবারিক কারণে যাওয়া বন্ধ হবার সম্ভাবনা নেই। কয়েকটি বোমা পড়লে কলকাতা জনশূন্য মরুভূমি হবে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, সেসময় সাঁতরে বিদ্যাসাগরের মতো গঙ্গা পার হয়ে কলকাতায় গিয়ে কী লাভ বলুন? বরং আপনারা যদি দিল্লীর দিকে আসেন তাহলে ভালো হবে। বুদ্ধদেববাবু খোঁজ নিয়েছেন আমি বাড়ী বদলিয়েছি কিনা। মৎলবটা কী বলুন ত?

অশোকের ভবিষ্যৎ ও হালচাল কেমন? আপনি ত শুনলাম মাত্র তিন ঘণ্টা দিল্লীতে থাকার সঙ্কল্প করেছিলেন, সুতরাং ক্ষোভের কোনো কারণ নেই।

বুদ্ধদেববাবু 'গ্রহণ' বিক্রীর কথা ভুলেও কখনো লেখেন না। তাজ্জব ব্যাপার। ছোটোদের বইটা পাঠিয়ে দেবেন।

আমি বি. বি. সি-র মতো যথারীতি সময় কাটাচ্ছি। দিনরাত খাঁ খাঁ করছে। সুলেখা ভালোই আছে। রেখুর খবর কী? দেবী শুনলাম কলকাতায় ফিরেছে। কী করছে? ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

[চিঠির উপরে বাঁ দিকে উল্টো এবং কোণাকুণি ভাবে] চতুরঙ্গের জন্য একটি দুরুহ দার্শনিক কবিতা পাঠিয়েছি। শালার কাগজ কি বাজারে দেখা দিয়েছে?

২

২০।১২।৪৫

কামাক্ষীবাবু

বেজায় শীত বলে চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। তা ছাড়া কাজের চাপে আপনার হাতের লেখা এমন বাঁদুরে হয়েছে যে কিছু বোঝ্‌বার জো ছিল না। ভাসা ভাসা কয়েকটা খবর আন্দাজ করে নিতে হয়েছিল।

আপনারা তিন চারটে ব্যবসা একসঙ্গে ফাঁদুন, যদি লাভজনক হয় তাহলে এ শর্মা জুটে পড়বে। ফেব্রুয়ারী মাসে বেকার হবার একটা দুর্লভ chance জুটবে মনে হচ্ছে।

এখানকার খবর গতানুগতিক। কয়েকটা অবশ্য মজার খবর আছে, তবে সে গুলো চিঠিতে লেখবার মত নয়।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর

কবে বাবা হচ্ছেন ?

১২বি দরিয়াগঞ্জ দিল্লী
২০. ৬. ৪২

চঞ্চল,

তোমার বই দিন কয়েকের মধ্যে পাবে। আশা করে চিঠি লিখিনি। কিন্তু খুব সম্ভব তুমি বই-এর কভার আবার বদ্‌লেছো, নতুন করে ব্লক করাচ্ছো। নইলে এত দেরী হবার কোনো কারণ নেই।

এখানে খুব গরম পড়েছিল। এ সময় তোমাকে এখানে দিন কয়েক থাকতে হলে কী যে করতে ভাবতেও মজা লাগে! সকাল থেকে শুরু করে মাঝ রাত্তির পর্যন্ত গরম হাওয়া, ধুলোর ঝড়। রাস্তায় বেড়াতে বেরুলে মনে হয় উনুনের ওপর হাঁটছি। যা হোক, আজ সকালে বৃষ্টি পড়েছে, আকাশ এখনো মেঘলা। অবশ্য এখানকার বর্ষা বিশেষ রোমান্টিক নয়, রামচন্দ্রের শরীরের মত নীল আকাশ, গুরু গুরু মেঘ, মেঘদূতী হাওয়া, ওসব কিছুই নেই। 'নীল' কথাটি ব্যবহার করেই নীল নদী এবং মিশরের কথা মনে পড়ল। ওদিকে ত ব্যাপার বেগতিক। মাঝে দুদিন বোস্ সাহেবের বক্তৃতা রেডিওতে শুনলাম। দুধ-সন্দেশ খাওয়া গলা, বাংলাদেশের চিরন্তন জামাইবাবু, বার্লিনের ঘর জামাই।

কলকাতার খবর কী? গুরুদেব 'ক প্রত্যাবর্তন করেছেন? আজ ওঁকে একটি চিঠি লিখেছি। তুমি কি রাধারমণবাবুর সঙ্গে দেখা করেছিলে? আশা করি সে বইটা (Soviet Literature) ভালো লাগছে।

এখানে আপাতত আড্ডার অসুবিধে হচ্ছে না। বিকেলে সাড়ে পাঁচটার সময় কাঠফাটা গরমে স্নান করে বেড়িয়ে [য] পড়ি, ফিরি দশটা নাগাদ। কামাক্ষীর সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু কি এখনো কলকাতায়? আশা করি মিসেস্ ভালো আছেন। তোমার কয়েকটা রেকর্ড মারতে পারলে ভালো হত। নীরোদবাবুর [য] সঙ্গে এখনো দেখা করিনি। চিঠির জবাব দিও। ইতি

সমর

২

১২বি, দরিয়াগঞ্জ
৩. ৭. ৪২

চঞ্চল,

তোমার চিঠি পেলাম। তোমার বই ইতিমধ্যে বার দুই পড়েছি। অনেক কবিতা ভালো লাগল। তবে কয়েকটা বিষয়ে খটকা লাগছে। প্রথম দিকের কবিতাগুলোতে পাপবোধের পীড়া আছে (যেমন প্রথম কবিতাটি), তারপর যখন গ্রীক কবিতা-গুলো আসে তখন মনে হয় এদের মধ্যে সে বোধের পরিণতি হবে, কারণ গ্রীক নাটকের মূল কথা ট্যাজিক বিচ্যুতি ও নিয়তির খেলা ; নিয়তি ও ব্যক্তিগত পাপ পুণ্যের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া। কিন্তু তোমার গ্রীক কবিতাগুলোতে সে রকম কোনো সমাধানের বার্তা নেই, সেজন্য ওগুলো বেশী মাত্রায় narrative মনে হয়। তারপরে আসে রাজনৈতিক কবিতাগুলো। প্রথম দিকের কবিতাগুলোয় যে সমস্যার আভাস পাই, যে আত্মদ্বন্দ্ব আছে, তার সঙ্গে শেষোক্ত রচনাগুলির কী সম্বন্ধ ? সম্বন্ধ হয়ত আছে, কিন্তু সেটা ঠিক ধরা পড়েনি, অন্তত আমার কাছে পড়েনি। সেজন্য বইটা একটু খাপছাড়া লাগে। এ বিষয়ে তুমি লিখো। হয়ত পরে বুঝবো। এ পাতার শেষের দিকে আমার অসুস্থতা বর্ণিত হয়েছে।

বিষ্ণুবাবুকে একটি চিঠি লিখেছি। 'অরণি' সোভিয়েট-সংখ্যা দেখেছো ? সুভাষের কবিতায় মাঝে মাঝে মজার লাইন থাকে, "শকুনির নখরে নখরে লালা ঝরে।" বিষ্ণুবাবুর কবিতার প্রথম লাইন—'শতাব্দীর ঊর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাতে নীল (২য় লাইন) আকাশে মুখর হল" ইত্যাদি। 'মুখর হল'? খুব সম্ভব 'আকাশে' না হয়ে ওটা 'আকাশ' হবে। তাছাড়া ভদ্রলোক যে আন্তরিক নন সে সন্দেহটা কিছুতেই কাটছে না। এ রক্তাক্ত জুলাই মাসে, যখন জর্মানরা মিশরে ও রাশিয়ায় এখনো অপরাজিত, তখন শ্রেণীহীন সমাজের সুদূর কৈলাসের স্বপ্ন ও তার গান একটু বিদ্রূপের মতো শোনায়। আমার রচনাটাও অবশ্য পরে নিজেরি খারাপ লেগেছে।

The Dry Salvages কোথায় পেলে ? কোনো দোকানকে বলে আমাকে এক কপি পাঠাতে পারো ? বই পেলেই দাম পাঠাবো। রেকর্ডের কী হল ? এখন টাকা পোনেরো কুড়ি পাঠাতে পারি।

এখানে দিন সাতেক বাংলাদেশের মতো অশ্রান্ত বৃষ্টি ও দিন সাতেক হোলো আমার দাঁতে বেশ ব্যথা। দিনের বেলায় মন্দ থাকিনা, রাত্রে ব্রোমাইড সেবন করেও নিদ্রা হয় না। লোকে বলছে আক্কেল দাঁত।

একদিনে রাধারমণবাবু ও সুধীনবাবু ! কামাল কিয়া ! সুধীনবাবু সম্বন্ধে আমার মনোভাব তুমি জানো, তোমার সঙ্গে একমত। যে কারণে এলিয়টের মত

কবিকে শ্রদ্ধা করতে পারি, সে কারণে সুধীনবাবুর মত ভদ্রলোককেও ভালো লাগে। সুধীনবাবুকে ১৩৯ কর্নওয়ালিস্ স্কোয়ার ঠিকানায় বই পাঠিয়েছিলাম কলকাতায় থাকতে, পেয়েছেন কিনা জানো ?

অশোককে চিঠি দিয়েছি। বিষ্ণুবাবুকেও পত্রাঘাত করেছি। তাতে তাঁর কবিতায় deviations from the party line সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেছি। গুরুদেব ক্ষেপে গিয়েছেন।

এখানে কামাক্ষী ও খুচুর (যার কথা তোমাকে কলকাতায় বলেছি) সঙ্গে প্রত্যহ সাক্ষাৎ হয়। কলকাতায় থাকতে কামাক্ষী আমাকে লিখেছিল যে ওর 'শিবির' এক কপি যেন তোমাকে পৌঁছিয়ে দিই। ভুলে গিয়েছিলাম।

দিল্লী আর ভালো লাগছে না, কলকাতায় চাকরী জুটলে বাঁচি।

সুলেখা ভালো আছে, মেয়েরও মেজাজ শরীফ। অবসর সময় দাঁত ব্যথা কম থাকলে বাচ্ছার তদারকি করি।

এখন একটা কাজের ভার পড়েছে। আনন্দবাজারে ১০ই জুন তারিখে সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক' নামে একটা গল্প প্রকাশিত হয়। প্রকাণ্ড গল্প। সেটার অনুবাদ আমাকে করতে বলা হয়েছে। আজ সকালে প্রায় দেড় কলাম করেছি।

আশা করি ভালো আছো ও তোমার স্ত্রী ভালো আছেন। ইতি

সমর

দত্ত সাহেবের বইএর খোঁজ করব। এখানে F. S. U. থেকে মাস দুয়েক কোন কোনো কাজ হয়নি। মানে শুরু হবার পরে কোন কিছু হয়নি। দিল্লী তাজ্জব জায়গা।

৩

দিল্লী
১৩.৭.৪২

চঞ্চল,

তোমার চিঠি পেলাম। আমি খুব মনোযোগী পাঠক নই, প্রথমটা তাড়াতাড়ি পড়ি। 'বসুন্ধরা' যখন পেয়েছিলাম তখন আক্কেল দাঁতের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত ছিলাম। মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস একটা অনাগত দাঁতে দানা বেঁধেছে। সুতরাং সে সময় মূলসূত্র ধরা মুশকিল হয়ে পড়েছিল। তুমি যা লিখেছো তার সঙ্গে বইটা মিলিয়ে পড়লে ভালো হত, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে একটি উৎসাহী পাঠক কয়েকদিনের জন্য 'বসুন্ধরা' নিয়ে গেছেন। ফেরত পেলে আবার লিখব। কোনো বই সম্বন্ধে স্বচ্ছ মতামত হতে আমার মাসখানেক লাগে। বুদ্ধদেববাবু তাঁর

পত্রিকায় 'বসুন্ধরা'র সমালোচনার জন্য আমাকে লিখেছেন। সেটা হতে কিছু দেরী হবে, তবে 'কবিতা' বেরুবার আগে নিশ্চয়ই হয়ে যাবে।

তুমি যে তৎপরতার সঙ্গে রেকর্ড ও বই পাঠিয়েছো তাতে ভয়ানক বিস্মিত ও তোমাকে তারিফ করছি। অনেক ধন্যবাদ। রেকর্ডগুলো ও বইটা এই মাত্র পেলাম। এ মাসে আর রেকর্ড আনাতে পারবোনা, কারণ People's war কাগজের জন্য বোধহয় মোটা চাঁদা দিতে হবে। রেকর্ডের খবর যদি কাল না পেতাম তাহলে হয়ত আজ ভয়ানক সঙ্কট উপস্থিত হত, কারণ চাঁদার টাকাটা খরচ হয়ে যেত। রেকর্ড আনাতে বেশ খরচ পড়ে, প্রায় সাড়ে তিন টাকা লেগেছে। এলিয়টের বইটা এখনো শুরু করিনি। তোমার বই আজ বিকেলে কামাক্ষীকে দিয়ে আসব। কামাক্ষী কাল থেকে খুব ব্যস্ত, ওর বন্ধু মন্ত্রীপুত্র পূর্ণেন্দু দিল্লীতে এসেছে। তাছাড়া আজ ওর বিয়ের দ্বিতীয় বাৎসরিক উৎসব। দেবী কি 'শিবির' তোমাকে পৌঁছিয়ে দিয়েছে?

কলকাতার হাল চাল কী? সুভাষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়? গুরুদেব কেমন আছেন? চিঠির উত্তর এখন পাইনি। সুবোধ ঘোষের 'কর্ণফুলির ডাক' অনুবাদের ভার পেয়েছিলাম, সেটা তোমাকে লিখেছি। অনুবাদটা হয়ে গিয়েছে, এবং মনে হচ্ছে বেশ জব্বর অনুবাদ হয়েছে। আপাতত সোমেন চন্দর 'ইঁদুর' নিয়ে পড়েছি। ওটা অনুবাদ করা বেশ কঠিন ব্যাপার।

অশোকের কোনো খবর পেয়েছো? চিঠির জবাব দেওয়ায় ওর আলস্য অসীম। বলে, সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে। বেশী কাজ করলে বেশী সময় পাওয়া যায়, ধূর্জটিবাবু কথাটা আমাকে লিখেছিলেন। সেদিন নয়াদিল্লীর একটি সাহিত্য সভায় গিয়েছিলাম, কামাক্ষী সভাপতি হয়েছিল। দারুণ গ্রীষ্মে বর্ষামঙ্গল উৎসব হল। এক ভদ্রলোক 'বজ্রমাণিক দিয়ে গাঁথা' গানটি কীর্ত্তনের সুরে গাইতে শুরু করলো। বেরিয়ে ভয়ানক মুখ খারাপ করলাম অনেকদিন পর।

সকালে খবরের কাগজ দিল্লীর লাড্ডুর মত লাগে। কোনদিন দেখছি কুকুরটার প্রাণহানি হবে। এখানে বেজায় খারাপ ভাবে সময় কাটছে।

তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? ভালোবাসা নিও। সুলেখা ও বাচ্চা ভালোই। ইতি

সমর

The Dry Salvages এর দামটা?

৪

১২বি, দরিয়াগঞ্জ দিল্লী
৩০. ৭. ৪২

চঞ্চল,

তোমার চিঠি অনেকদিন হোলো পেয়েছি। তুমি নানা কারণে বিচলিত আছো মনে হল। হয়ত মনে হয়েছে লোকে তোমাকে দূরে পরিহার করছে। আমার মনে হয় দেবী পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত, আর স্বভাষ এখন রীতিমত কর্মী. বেটোফেনের মত পাতি-বুর্জোয়ার সঙ্গীতে সেজন্য আসক্তি থাকা সম্ভবপর নয়। কলকাতায় রাজনীতির হাল আমাদের কাছে মাঝে মাঝে খারাপ লাগে তার কারণ আমাদের পরিচয় পোলিটিকাল দালালদের সঙ্গে।

এদিক্‌কার খবর মোটের ওপর ভালো। সকালে কলেজে যাচ্ছি। এরকম কলেজ আগে আর দেখিনি। আমাদের বাড়ীর পাশেই একটা ফার্নিচার-এর কারখানা আছে। দিনরাত শব্দ। সুতরাং রেকর্ড শোনা কদাচিৎ হয়ে ওঠে। নতুন রেকর্ডগুলো একদিন রাত্রে বাজিয়েছিলাম. খুব ভালো লেগেছিল। ওরা কোনো কাগজ সঙ্গে পাঠায়নি। Thorn needles ও sharpner [স]-এর দাম কী রকম? আসছে মাসে. অর্থাৎ অগষ্টে. আর্থিক অবস্থা শোচনীয় থাকবে। তোমাকে কয়েক দিনের মধ্যে জানাবো যে ও মাসে রেকর্ড কেনা সম্ভবপর হবে কিনা।

'Peoples war' নিয়মিতভাবে পেতে চাও? উদ্‌বৃত্ত কপি পাওয়া খুব কঠিন, ওরা অর্ডার মাফিক ছাপায়। প্রথম দু'এক সংখ্যা আমি পাঠাতে পারি। কলকাতায় পাওয়া নিশ্চয়ই যাবে। দত্তসাহেবের বই আমি তোমার জন্য আনিয়েছিলাম. কিন্তু ডাকযোগে পাঠানো উচিত হবেনা। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ।

তোমাদের আর খবর কী? অশোক আবার মৌনব্রতী হয়েছে।

সুলেখা পেটের অসুখে আর বাচ্ছা সর্দি কাশিতে ভুগছে।

তোমার স্ত্রী কেমন আছেন? ইতি

সমর

সুধীনবাবুর মতামত ঠিক বুঝতে পারলাম না। বিষয়বস্তুর পরিণতি হয়েছে, আঙ্গিক আগেকার মত আছে, এটা ত একটু আশ্চর্য ব্যাপার। বরং কবিতায় উল্টোটা হতে পারে, বিষয়বস্তুর পরিণতি না হওয়া সত্ত্বেও আঙ্গিকের উন্নতি হতে পারে। আমার নিজের ত মনে হয় 'কয়েকটি কবিতা'র গদ্য একটু বেশী কাব্যি ঘেঁষা ছিল. 'নানা কথা'র ভাষায় সে দোষ বিশেষ নেই। তাছাড়া বিষয়বস্তু যদি বদলে থাকে তাহলে আঙ্গিকও বদলাতে বাধ্য।

৫

২৪. ৮. ৪২

চঞ্চল,

তোমার পোস্টকার্ড পেলাম। আমরা সকলেই ঠিক আছি, ৪০ জনের একজন হইনি। তবে কটাদিন নিদারুণ গাত্রদাহ আর নানা রকম সংশয়ে সময় গেল।

তোমার বইএর রিভিয়ু শুরু করার মতলব করছিলাম, এমন সময় লড়াই। এ কদিন লেখাপড়া হয়নি। কলেজ ১০ই থেকে বন্ধ। ছেলেরা অবশ্য উজবুকের মত সময় কাটাচ্ছে। আজাদী না এলে নাকি তারা কলেজে আর ফিরবে না। অবশ্য আড্ডা মেরে, বাড়ীতে ব্রিজ খেলে, বিকেলে কাননবালার গুণকীর্তন করে কী করে সুভাষ বোস বর্ণিত আজাদী আসবে তা ঈশ্বরই জানেন।

তোমাদের খবর কী? বিষ্ণুবাবু কি সুভাষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়? '২২শে জুন' পেয়েছি। মোটের ওপর বেশ ভালোই হয়েছে। এবাবে বোম্বাইওয়ালা জনযুদ্ধে সুভাষের বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজের অনুবাদ বিষ্ণুবাবু করেছেন, দেখেছো? এদিকে চারদিকে এত বিশৃঙ্খল উত্তেজনা ও নিরর্থক বাগবিতণ্ডা যে কম্যুনিষ্ট পার্টির আওয়াজ কেউ শুনছেনা।

আশা করি ভালো আছো ও মিসেস্ ভালো আছেন। আমরা সব এক রকম, দিনগত পাপক্ষয় করছি। ইতি

সমর

৬

৩০. ৯. ৪২

চঞ্চল,

তোমার পোস্টকার্ড পেলাম। সে রিভিয়ুটা দিন পোনেরো আগে বুদ্ধদেববাবুকে পাঠিয়ে দিয়েছি. ছ পয়সা বেশী খরচ হওয়াতে এতো মর্মাহত হয়েছিলাম যে চিঠির উত্তর দিতে অত্যন্ত দেরী হয়ে গেল। তোমার চিঠি পড়েই মনে হয়েছিল যে গৃহ-দুর্গে অনেকটা অজ্ঞাতবাসে আছো। রিভিয়ুটার দু এক জায়গায় অদলবদল করেছি। শ্রেণীহীন সমাজ হবার আগেই Spender প্রশংসিত non-political মানুষ হওয়া যায় কিনা ভাবছি।

কলেজ ২০শে অক্টোবর পর্যন্ত বন্ধ, কিন্তু কলকাতায় যাওয়া হবে না, কারণ পকেট শূন্য। রেকর্ডের দোকানটির খবর নিতে পারিনি, কারণ আমার বন্ধুটি মাদ্রাজ গিয়েছেন। তুমি কোনো খবর পেলে? নীরদ চৌধুরীর সম্বন্ধে বিশ্বস্তসূত্রে যা শুনলাম

তাতে আলাপের প্রবৃত্তি হয়নি। এত কম রেকর্ড যে বাজাবার প্রবৃত্তি হয় না, গ্রামাফোনটা দেখে মাঝে মাঝে গা জ্বালা করে। তোমাদের কিছু রেকর্ড মেরে দিতে পারলে ভালো হত।

কামাক্ষী রেখাকে নিয়ে কলকাতায় গিয়েছে। বোধহয় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে। তোমার একটি চিঠি কলকাতায় redirect করা হয়েছে।

এখানকার আর সব খবর ভালো। মাঝে কয়েকটা repression-এর বিরুদ্ধে কবিতা লিখেছিলাম, ফলে শুনছি যে আমি নাকি Gandhite ও counter-revolutionary হয়ে গিয়েছি। এ দুনিয়া তাজ্জব।

সুলেখা ও বাচ্ছা ভালোই। আশা করি তোমরা ভালো আছ। গুরুদেবের খবর কী? ইতি

সমর

৭

২০। ৯

চঞ্চল,

তোমার চিঠি ষোলো তারিখ নাগাদ পেয়েছি। কদিন খুব ব্যস্ত ছিলাম, মানে গণ্ডগোলের জন্য ছোটোখাটো গোছের একটা নৈতিক ক্রান্তি হয়। স্কচের সাহায্যে সেটা এখন সামলে উঠেছি। তবু কেমন বিস্বাদ লাগছে। গত মাসে পোনেরো তারিখে শুনেছিলাম যে আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছি। এক মাসের মধ্যে তিন রঙার কী তুচ্ছ পরিণাম!

দিল্লীর হিন্দু আর শিখদের জানোয়ার বলাতে শুনেছি আমাদের দেশের সব জঙ্গলে বড়ো বড়ো সভা করে জানোয়াররা আপত্তি জানিয়েছে। আমি ওদের সভায় থাকলে ওদের প্রতিবাদকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতাম।

আজ একটা খবর শুনলাম আমাদের জাতীয় সঙ্গীত নাকি 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' হবে।

এখানকার গান্ধীবাদীদের কিছু বললে পশ্চিম পাঞ্জাবের কথা বলে।

সুন্দরবনে থাকার কোনো বন্দোবস্ত হতে পারে?

ভালোবাসা নিও। দিল্লীতে এখন এসোনা।

অশোককে ভালোবাসা দিও। গুরুদেবকে আমার হয়ে বোলো যেন এক কপি 'সন্দীপের চর' [য] (বানানটা ঠিক মনে আসছে না) পাঠিয়ে দেন। ইতি

সমর

সমর সেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে

১

18.8.40

দেবীবাবু,

পত্র-পাঠ আপনার চিঠির জবাব দিয়েছিলাম, তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা করছিলাম।···যা হোক, আজ শুনছি যে আমার চিঠি পাননি। বিশ্বেস হচ্ছে না।

চিঠির পিছনে ইণ্ডিয়ান পুলিশ লাগল না কি? সেরেছে।

কামাক্ষী লম্বা হয়ে পড়ে মুখ হাঁ করে প্রাণপণে ঘুমোচ্ছে, মাঝে মাঝে বালকোচিত অভ্যেসের ফলে ঘুমের ঘোরে কথাবার্তা বলছে। একটি পিঁপড়ে গাল কামড়িয়ে বেশ লাল করে দিয়েছে। কি জানি, হয়ত পিঁপড়ের কামড় রেখার আদর বলে মনে হচ্ছে। প্রেমের বিচিত্র গতি, আঘাতেও আনন্দ অতি। আপনার মাকে বলবেন যে তাঁর সন্তুর জন্য কিছু ভাবনার প্রয়োজন নেই, আমি ঠিক cleverly manage করব।

সমুদ্রের শব্দ হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়ে লজ্জায় ফেলেছে। আপনি আসছেন ত? কবে? সুভাষকে সঙ্গে আনবেন, বেবীকে নয়। ফিনাইলের দাম বড্ড চড়া, আগের চিঠিতেই লিখেছিলাম।

···হ্যাঁ ভালো কথা: অনেক experiment করে constipation-এর মহৌষধ বের করেছি ও আপনাকে জানাচ্ছি, বেশী লোককে বলবেন না। সকালে খালি পেটে এক গ্লাস জল, তারপর তিনটে বিস্কিট, তারপর গরম চা (এক কাপ); তারপর পুরো এক ছিলিম তামাক। তামাক দেবার সময় ফৈয়জ খাঁ সাহেবের জয় জয়ন্তীটা রেকর্ডে চড়াবেন। শাস্ত্রে কোনো জায়গায় মেয়েদের তামাক খাওয়া নিষিদ্ধ নেই।

রেখা কি আমার উপর খুব চটে আছে? আমি মাত্র দিন দুয়েক হল রেখার শরীর খারাপের কথা জানতে পারলাম। আগে জানলে কামাক্ষীকে তাড়াতাড়ি এখানে আসতে কখ্খনো অনুরোধ করতাম না। এখন too late। রেখাকে দুবেলা ঘোল খেতে বলবেন, রাগ করতে বারণ করবেন। আমার জন্য যে মেয়ে দেখা হচ্ছে, তার বয়স কতো? দশের বেশী হলে ভয়ানক আপত্তি। অরক্ষণীয়া কন্যা শাস্ত্রে বারণ। বয়সটা ঠিক করে দেখবেন। সন্ধ্যেবেলায়, সকালে, মাঝরাত্রে মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। কিছুই ভালো লাগেনা, মনে হয় সব সময় মুর্গী খাই। লক্ষণ ভালো নয় মনে হচ্ছে, তাড়াতাড়ি আমাকে ঝুলিয়ে দেবার বন্দোবস্ত রেখাকে করতে বলবেন। আশা করি এখন ভালো আছে; শারীরিক, মানসিক নয়।

এখন সাড়ে তিনটে, কামাক্ষী ঘুমোচ্ছে। টক কম খেলে, চা বেশী খেলে, প্রচুর মাংস (মুর্গির) ওড়ালে. শুনেছি বড়ো ওস্তাদ হয়।

ভালোবাসা নেবেন। আমি ভালো আছি, পায়ে বেশ muscles হয়েছে, হাতে এখনো হয়নি। ইতি

সমর সেন

রাধারমণবাবুর জন্য মন খারাপ লাগছে। আর কিছু খবর পেলেন? দিন কয়েক চিঠি পেয়েছিলাম. উত্তরও দিয়েছিলাম।

[পরবর্তী অংশটুকু চিঠির প্রথম পিঠে, সম্বোধনের উপরে, উল্টোভাবে আড়াআড়ি লেখা] বৃহস্পতিবার আসবেন শুনছি। সঠিক খবর সত্বর দেবেন। সুভাষকেও বলবেন। বেবীকে নয়।

২

১৮. ৯. ৪০

দেবীবাবু,

আপনার ও কামাক্ষীবাবুর চিঠি এইমাত্র পেলাম। আমার পক্ষে, বুঝতেই পারছেন. কাশ্মীর কিম্বা হনোলুলু যাওয়া একেবারে অসম্ভব। আমাকে কাজের জন্য অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী যেতে হতে পারে। তা ছাড়া, শীতে কষ্ট পাওয়ার অনর্থক অস্বস্তি এ বয়সে পোষাবেনা।

আপনি তাহলে কালই চলে আসুন। আসবার সময় কিছু টাকা আমার তহবিল থেকে আনতে পারবেন? কয়লা আর কেরোসিনের খরচ জোগাতে ফতুর হয়ে যাচ্ছি। মাসে ছ মন কয়লা! ছোটবেলায় কী যেন একটা পড়েছিলাম—অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতে।

আপনি তাহলে পুজোর [য] ছুটিতে কোথায় যাচ্ছেন? এখানে আসুন, একসঙ্গে প্ল্যান করা যাবে।

মায়া কাটিয়ে সত্বর চলে আসুন। আসবার সময় ও পথ সম্বন্ধে কামাক্ষীপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করে নেবেন। ইতি

সমর সেন

Agra Hotel. 16 Daryagunj
Delhi
25 [য]. 10. 40

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি কাল পেলাম। প্রতুলের সঙ্গে এক গাড়ীতেই দিল্লী আসি, পৃথীশও ছিল। ফলে সমস্ত রাস্তা সঙ্গীতচর্চার যথেষ্ট সুযোগ ঘটেছিল। প্রতুলরা দিন দুয়েক কাটিয়ে আমেদাবাদ চলে গিয়েছে, ফেরার পথে দিল্লী হয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে কুতব ইত্যাদি একদিন দেখে এলাম।

হোটেলেই মাসিক বন্দোবস্ত করেছি। হোটেলের পেছনেই কলেজ। ওখানে ইংরেজীর পাঠ্যপুস্তক অন্যান্য কলেজের মতই, কমার্স বিষয়টা বাধ্যতামূলক বলে কলেজের ওই নাম। ছাত্রদের মধ্যে বাঙ্গালী কম, নানা জাত আছে। বোকা নয়, কিন্তু দুর্দান্ত নয়। পড়াতে অসুবিধে হবে না। কাল পোষাক পরে গিয়েছিলাম, প্যাণ্ট খুলে যায় আর কী! Stiff Collar-এ দম আটকিয়ে আসে। ছেলেরা বলল যে আমি স্বচ্ছন্দে বাঙ্গালী পোষাকে আসতে পারি। শীত না পড়া পর্যন্ত তাই করব।

এখানে কয়েকদিন বাড়ীতে বন্দী থাকতে হয়েছিল, হাঁটুর ওপরে একটা লোম ফোঁড়া হওয়াতে। বারান্দায় বসে হোটেলের লোকদের দেখি। নানা লোক আসে আর যায়। 'গ্র্যাণ্ড হোটেল' নামে একটি বই পড়েছেন? অনেকটা সেই রকম। কামাক্ষীপ্রসাদের কবিত্ব মাখানো চিঠি পেয়েছি, ভাষায় বুদ্ধদেববাবুর প্রভাব বাড়ছে, সতর্ক করে দিয়েছি।

আপনি কেমন পড়াশুনো করছেন?...ওখানে বেড়াচ্ছেন না বাড়ীতে বসে পড়াশুনো করছেন? এখানে চলে আসুন, হোটেলে থাকবার বন্দোবস্ত ভালোই।

বুদ্ধদেববাবুর চিঠি পেয়েছি। কাব্য ও পলিটিক্স সম্বন্ধে লিখেছেন। প্রেমেন্দ্রবাবু নাকি উঠে পড়ে লেগেছেন।

কলকাতায় ফিরতে মনে হচ্ছে অনেক দেরী হবে। দিয়ালীর ছুটি ২ দিন।

[বাকি অংশ পাওয়া যায়নি]

৪

Agra Hotel, 16 Daryagunj
Delhi
29. 10. 40

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি অনেকদিন পরে পেলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়েছেন শুনে হিংসে হচ্ছে। অনেক তীর্থ ঘুরে দেখছি বাংলাদেশ এবং বিশেষ করে কলকাতার মত জায়গা হয়না। তবে এসব কথা শুনে যদি মনে করেন যে চাকরী ছেড়ে আমি সত্বর ফিরে যাবো তাহলে ভুল বুঝবেন। আপনারা যদি মাঝে মাঝে আসতে পারতেন তাহলে মজা হত। নিজের ওপর নির্ভর করতে শিখতে হবে।

দেওঘরে কেমন তীর্থ করলেন। নানা দিক থেকে শুনছিলাম যে ওখানে মহা আনন্দে দিন কাটাচ্ছেন। প্রতুল আমেদা [য] ফেরত এখানে দিন তিনেক ছিল, গত কাল (সোমবার) কলকাতায় পৌঁছিয়েছে। বিমলজ্যোতি দিল্লীতে আছে. তবে সরকারী পরীক্ষার জন্য ব্যস্ত। এ বছরের এম. এ-র গেজেট থেকে জানাবেন ত আমাদের ছাত্রী সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হয়েছে কিনা। তার নাম - বাণী দত্ত।

কলকাতা ত এখনো খালি। গড়িয়াহাট জুড়ে বুদ্ধদেববাবু আছেন এবং নিশ্চয়ই আসন্ন শীতের আমেজে লরেন্সের মত প্রেম করছেন। সুভাষের খবর জানাবেন, অনেকদিন কোনো খবর পাই না। বেবীর সংবাদলাভের জন্য বিশেষ ব্যস্ত নই : গীতাকে কাশি থেকে একটা চিঠি লিখেছিলাম, খুব সম্ভব পায়নি। সেটা আমার দোষ নয়। আপনার বন্ধু ধ্রুব মিত্তিরের সাম্প্রতিক হালচালের কোনো পাত্তা রাখেন ?

কামাক্ষীর চিঠি পাই, ওভারকোটের মত গরম একটা খামের ভেতর থেকে বের করতে হয়। কামাক্ষী এখন, যাকে উর্দুতে বলে, সান্ দেখাতে ; অর্থাৎ চাল মারছে : আছে বেশ। Of such is the kingdom of heaven. পুরুষের গাল মেয়েদের মত লাল হয় এই প্রথম শুনলাম মশায়।

...এখন কোথায়, কলকাতা না দেওঘর ? পড়াশুনোয় নিশ্চয়ই বেশীরকম ব্যস্ত। দেওঘরে লেখাপড়া কেমন করলেন ও করালেন ?

ভালোবাসা নেবেন।...ডিসেম্বরে চোখ কান বুজে সোজা দিল্লীতে চলে আসুন। পরীক্ষা বরবাদ করুন ; যুদ্ধটা এদিকে এগিয়ে আসছে। ইতি

সমর সেন

প্রতুলের সঙ্গে একদিন দেখা করবেন, এবং দিল্লীর গল্প শোনার জন্য চাপ দেবেন, বলবেন বললে আমার আপত্তি নেই। আপনার কাছে লাল মলাটের Chateubriand [য] এর একটি জীবনী আছে, তার লেখিকার নামটা দেবেন। আজ থেকে ছদিন ছুটি। দিয়ালী আর কী আছে।

৫

Agra Hotel, Daryagunj
Delhi

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি কাল পেয়েছি। হোটেলের ম্যানেজারকে ডাকিয়ে টাই বাঁধাতে বাঁধাতে জীবনের অনিত্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করছি এমন সময় আপনার চিঠি এলো। আজকাল মাঝে মাঝে গরম কাপড়ের দোকানে ঘুরি। এখানকার চাঁদনী চকটা বেড়ে জায়গা, এমন সব জ্যান্ত জিনিষ দেখা যায় যে মাথা ঘোরে। তবে যদি সাজ দেখে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করি টুইডটার দাম কতো তাহলে শালারা বেমালুম হাসে। বুদ্ধদেববাবুকে দিল্লীতে আসতে বারণ করবেন। ঢাকার থেকে কলকাতায় এসে সহর দেখার আদিম বিস্ময় তাঁর এখনো যায়নি। দিল্লীতে এলে নতুন লেখার ঠেলায় আপনাবাই ব্যতিব্যস্ত হবেন। দিল্লীতে সাপ নেই আপনি ঠিক জানেন?

কামাক্ষীকে দার্জিলিং-এর ঠিকানায় একটা চিঠি লিখেছিলাম, তার উত্তর এখনো পাইনি। সত্বর উত্তর দিতে বলবেন।

এ কদিন কলেজ বন্ধ ছিল, কাল খুলেছে। ডিসেম্বরে খুব সম্ভব কলকাতায় যাবো না, পরীক্ষা বরবাদ করুন, এখানে চলে আসুন। অন্তত কামাক্ষী ও রেখা যাতে আসে তার চেষ্টা করা আপনার কর্তব্য।...কালকে St. Stephen's College-এ আধুনিক বাংলা কবিতার উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করলুম। এখানে বাংলা কবিতার বিশেষ চর্চা নেই বলে চাল মেরে সবাইকে চুপ করিয়েছি। অনেক প্রশ্ন করেছিল, আপনারা থাকলে আমার চটপট উত্তর দেওয়ার ক্ষমতায় নিশ্চয় বিস্মিত হতেন।

বিয়ের কথা লিখেছেন, সেটা উত্তম ব্যাপার। কিন্তু আপনি খোঁজ করে দেখবেন ওজন অন্তত দেড় মণ, আমার (একটু বাড়িয়ে বলছি) এক মণ দশ। ওজনের এত তফাৎ থাকলে আত্মার আত্মীয় করা যায়, Epipshychidion [য] লেখা যায়, বিয়ে বোধ করি চলেনা। নির্জনে ভেবে দেখবেন।

দিল্লীতে বেশ শীত পড়ছে। দু একজন লোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, বেশ interesting.

...সুখে থাকতে আপনাদের ভূতে কিলোয়। সুভাষ তাহলে পাগল হয়ে গিয়েছে। গীতাদের খবর পান? ভালোবাসা নেবেন।...কামাক্ষীকে চিঠি লিখতে বলবেন। ইতি

সমর সেন

৬

Agra Hotel Daryagunj, Delhi
29.11.40

দেবীবাবু,

আপনার মোড়ক ও চিঠি পেলাম। চুরোট ও ব্যাগের জন্য ...কে আশীর্বাদ জানাবেন. বিয়ের কথা কিছু না বলাই ভালো। ...কি বর্মায় গিয়ে আরো মুটিয়েছে? পাগলের মত এখনো হাসে আর পলিটিক্স করে? বিস্তারিত বিবরণ জানাবেন।

আমার অবস্থা সঙ্গীন। সপ্তাহে ১২টা ক্লাস, রাত্রে ঘুম নেই, তার ওপর আসন্ন শীতের সম্বন্ধে নানা লোকে নানা কথা আমার কাছেই খালি বলাবলি করে। দারুণ অর্থাভাব হবে, যদি না কাঁকতালে কিছু স্কলারশিপ পাই। আপনি ত এম. এ. না দিয়েই বিয়ে করে রাত জেগে একটা মজার জীবন দর্শন খাড়া করেছেন, লিখেছেন রাত্রিবিহারেও আনন্দ পান না। এদিকে আমার এক বন্ধু দুটো বিভিন্ন level-এ কী করে এক সঙ্গে থাকা যায় তার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত। আমি ব্যাপারটা কী জানার জন্য এলিয়টের The Idea of a Christian Society পড়ছি। ছেলেটির নাম অমিতাভ সেন, ধূর্জটিবাবুর মানসপুত্র, কিন্তু সত্যিই খুব brilliant. আর একটি ছেলের সঙ্গে বেশ জমেছে, তার নাম লাহিড়া। আমার চেয়ে এক ইঞ্চি ছোট বলে তাকে বেঁটে বলে সম্বোধন করি, চাপলিনের মত গোঁফ আছে। সেন, লাহিড়ী এক সঙ্গেই থাকে, একই স্কুলে পড়ায়: ওখানেই আড্ডা মারি। বিমলজ্যোতির বাড়ীতে কদাচিৎ যাই, বেটা খুব মুটিয়েছে, বুদ্ধিটাও গিয়েছে। কামাক্ষীকে বলবেন যে নানা দিক থেকে আমার নিমন্ত্রণ আসছে।

ক্রিসমাসে কলকাতায় যাওয়া হবেনা। আপনারাও ও আসছেন না। সুভাষ তাহলে ভালোই আছে।...গলা ফোলার কথা শুনলেই ইঁদুরের কথা মনে পড়ে, তারপরেই Bubonic Plague-এর কথা মনে হয়। সে জন্য ঘরের ইঁদুর আমি কিছুতেই মারি না। সাবধানে থাকবেন।

ভালোবাসা নেবেন।...ইতি

সমর সেন

বাচ্চা ছেলেকে মেয়েরা নানারকম শব্দ করে আদর করে, কখনো শুনেছেন? অসহ্য। পাশের ঘরে পুরোদমে আদর চলছে।

৭

12B Daryagunj, Delhi
23/12/40

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেয়ে আশ্বস্ত হলাম। আপনার অসুখের কথা শুনে নানা রকম ভাবের উদয় হয়েছিল, তার মধ্যে সম্ভ্রম ও ভয়টাই প্রধান। অসুখ দুটো জ্বর। সেজন্য সম্ভ্রম। ভাইটুগড়ের কথা মনে হলে, সেখানকার পুকুরে (যার তলে অসংখ্য কুয়ো ছিল) আপনার স্নানের কথা মনে হল, ভাবলাম যে কাঁথির জেরেই বোধহয় অসুখটা হয়েছে। যা হোক, ভালো আছেন শুনে ভয়টা কেটেছে। আপাতত সাবধানে থাকবেন, অত্যাচার করার ইচ্ছে হলেই (সিগারেট, ইত্যাদি)...র কথা মনে করবেন। শুনেছি, সহধর্মিনীর কথাটা মনে করলেই লোকের দায়িত্বজ্ঞান বৃদ্ধি পায়। সে জন্যই আমি বিয়ে করছিনা। খালি খাটে শুতে প্রচণ্ড আরাম। কানের কাছে ঝামেলা আমার ভালো লাগেনা. কানদুটো বড়ো কিনা।

আমি 'একদম্' একলা আছি। পাশের ঘরে একটি অশরীরি বৈদ্যকন্যা সঙ্গীত-মুখর হয়ে ঘুরে বেড়ান। তাঁর পশ্চাদ্ভাগ মাত্র দেখেছি। চেহারা কেমন জানিনা।...

মাঝে দুএকটা কাঠবিড়ালীকে ধেনো খাইয়েছিলাম, ফলে স্নানের সময় বাথ-রুমে (Bathroomটা Central European, অর্থাৎ কাঠের, অনেক ফুটো আছে) এসে চুপচাপ বসে থাকত। লজ্জায় মরি।

আমি যে ভাবে দিন কাটাচ্ছি, সেটা শুনলে আপনার হিংসে হবে, তাই লিখলুম না। ক্রিসমাসে কলকাতা যাওয়া হবেনা. পকেটে একটি দশ টাকার নোট নিয়ে গম্ভীরভাবে বসে আছি। জানুয়ারীর মাইনে আগেই draw করে দু এক-জনকে ধার দিয়েছি। খাট কম্বল কোট পুলোভার বেমালুম কিনিয়ে যাচ্ছে. এক বছরে ধার শোধ করব। এক পেয়ার বাঘা gloves কিনেছি। কামাক্ষী কাশ্মীরের ছবি পাঠিয়েছে। জালালে। এই শীতে বরফের ছবি! কাশ্মীরের ছবি আমাকে পাঠাবার কোনো মানে হয়. দিল্লীওয়ালার কাছে কাশ্মীর খুব দূর নয়।

আপনি কলকাতায় কবে ফিরবেন? আমি ভাবছি বিবাগী হয়ে যাবো। যা শীত। ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

আমি নতুন বাড়ীতে এসেছি, সেই ঠিকানায় উত্তর দেবেন। সাবধানে থাক-বেন। দর্শন সম্বন্ধে আমার জ্ঞান শিগ্‌গীরই বাড়বে, কাল থেকে Critique of Pure Reason পড়তে শুরু করব, এখন Flaubert-এর Salammbo পড়ছি, ফিরে গিয়ে দার্শনিক আলোচনা করব। দু একটি উর্দু শিখেছি যথা:

আপ মেরে লিয়ে খাম্‌খা এত্‌না এন্তাজাম্‌ কিয়া।

আপনি আমার জন্য মিছামিছি এতো আয়োজন করেছেন।
এ বন্দেকো [য] সমর সেন কয়তা হয়
এ চাকরের নাম সমর সেন।

৮

12B Daryagunj, Delhi
14. 1. 41

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। নানা কারণে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। কলেজ খুলেছে, এ কদিন পরীক্ষা ছিল, আজ থেকে ক্লাস স্বরু হচ্ছে। মাঝে ভয়ানক ঠাণ্ডা পড়েছিল, ঝড়, বৃষ্টি ইত্যাদি। এখন চলনসই শীত।

আপনি এতোদিনে নিশ্চয়ই অনেকটা ভালো হয়েছেন। রাঁচী যাচ্ছেন কবে? রাঁচী যাওয়া অনেক দিক থেকেই ভালো হবে, অনেক জিনিষ হাতের কাছে থাকবে। আপনারা কজন ওখানে থাকবেন, এবং কদিন কাটাবেন?

...অশোকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। পরীক্ষা ভালোই দিচ্ছে। আপনার চিঠির সঙ্গে আগের বারে কামাক্ষীকেও লিখেছিলাম। অনেকদিন হয়ে গেল, কিন্তু এখন পর্যন্ত উত্তর পাইনি। জানুয়ারী মাসে দিল্লীতে আসার কথা ছিল, তারও ত কোনো সম্ভাবনা দেখছি না। পূর্ণেন্দুর Companyতে ভয়ানক ব্যস্ত আছে শুনছি।

কলকাতার খবর আপনি নিশ্চয়ই বিশেষ রাখেন না। অশোকের কাছে শুনলাম যে অসুস্থ শরীরেও আপনি খুব আড্ডা দিচ্ছেন। ওসব করবেন না।

গীতার একটা চিঠি পেয়েছি। বখাটে ধ্রুবকে বিয়ে করেছে বলে জানিয়েছে। গয়নাগুলো খুব শিগগিরই viceroy-এর cup-এ যাবে। আপনি শুনলে নিশ্চয় দুঃখিত হবেন যে এখানে এসেও আমাকে ঘটকালী করতে হচ্ছে। আমার জন্য নয়, অন্যের জন্য। পিছু টান ব্যাপারটা কী স্থব?

ভালোবাসা নেবেন। রেখাকে আমার আশীর্বাদ দেবেন। কয়েকদিন আগে ওদের সম্বন্ধে একটি দুঃস্বপ্ন দেখে বিশ্রী লাগছিল। কামাক্ষীকে এ অধমের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। ইতি

সমর সেন

বইগুলো কামাক্ষী চমৎকার ভাবে পাঠিয়েছিল।
[চিঠির উল্টো পাতায়] কামাক্ষীর ছোট গল্পের বই (নতুন যেটা বেরিয়েছে) চুরী [য] করে এক কপি পাঠাবেন ত। একটি বাচ্ছা ভদ্রমহিলাকে দেবো।

অশোক হয়ত ফিরে গিয়ে আমার নামে অনেক গল্প করবে। বিশ্বাস করবেন না।

৯

12B Daryagunj Delhi
15. 2. 41

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। দাদার চিঠিতে জেনেছিলাম যে আপনি শান্তিনিকেতনে গিয়েছেন। খবরটা শুনে চিন্তিত হয়েছিলাম, গুরুদেবের প্রভাব কাটানো ভয়ানক কঠিন ব্যাপার। সাবধানে থাকবেন।

এখানে এক রকম সময় কাটছে। দিনগত পাপক্ষয় করছি। শীত যখন খুব বেশী ছিল তখন একটা occupation ছিল। কলেজ গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। ছেলেদের প্রথমে আহ্লাদ দিয়ে ভুল করেছিলাম, ওদের সঙ্গে পুলিশের মত ব্যবহার করাই উচিত। এরা অবশ্য বাঙ্গালীর তুলনায় অনেক ভদ্রজনোচিত। তবে পড়ানোর সময় sex, abortion এ সব কথা শুনে যখন হাসে তখন গা জলে।

আজকাল আর ঘোরা ফেরা বেশী করিনা। বিকেলে সামনের একটা বাড়ীতে গিয়ে লুডো ইত্যাদি খেলে সময় কাটাই। কাব্যচর্চা প্রায় বন্ধ।

শুনছি মার্চ, এপ্রিল মাসে পৃথিবীতে সাংঘাতিক একটা ব্যাপার হবে। কী হবে? মুসোলিনীই দেখালে। এখানে ছাত্রসঙ্ঘের কয়েকটি ছেলেব সঙ্গে আলাপ হল। বিশেষ সুবিধের ঠেকলনা, কেমন যেন সৌখীন।

পকেটের অবস্থা এখনো কাহিল। মাসের প্রথম সপ্তাহে ধারটার চুকিয়ে মনের আনন্দে খালি পকেটে বসে থাকি। মুদী ইত্যাদির জন্যই এতো পরিশ্রম করি. এটা ভেবে বেশ বিষণ্ণ লাগে।

জুলাই মাসে কাশ্মীর যাওয়া অনিশ্চিত। কামাক্ষীকে উত্তেজিত কবার জন্য লিখেছিলাম। তবে প্যাচ্‌প্যাচে গরমে কলকাতায় ফিরে গিয়ে কী হবে? আপনারা ত আর এদিকে এলেন না। রাঁচীর চেয়ে দিল্লীর আবহাওয়া অনেক ভালো, গ্রীষ্মের সময়েও।

...গীলুকে ধ্রুব-র হাতে ওরকম ভাবে ছেড়ে দিল?...ক্ষিতিশবাবুকে আমার প্রীতি-সম্ভাষণ দেবেন। ইতি

সমর সেন

১০

12B Daryagunj, Delhi

দেবীবাবু,

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেয়ে খুশী হলাম। বিয়ের সময় শেষ পর্যন্ত আপনারা কেউ আসতে পারবেন না জেনে খারাপ লাগছে। বাড়ী থেকে অনেকদিন কোনো খবর পাইনি, সে জন্য চিন্তিত আছি। যাহোক, জুলাই মাসে আলবৎ কলকাতা যাবো, সে সময় দেখা হবে। আমার হাতে নাকি লেখা আছে যে ভয়ানক স্ত্রৈণ হবো। জুলাই মাসে আশা করি আমাকে দেখে shocked হবেন না।

নানাকারণে আপনি বিচলিত আছেন। মতামতের জন্য লজ্জিত হবার কী কারণ আছে? যদি মনে করেন যে ভুল করেছিলেন তাহলে সংশোধন করতে পারেন। আপনার প্রবন্ধের প্রথম দিকটা আমার ভালোই লেগেছিল, কিন্তু মনে হয়েছিল যে বক্তব্যটা স্পষ্ট করে লিখতে পারেন নি। বিনয় ঘোষ এণ্ড কো'র প্রতিক্রিয়া লিখেছিলেন বলেই হয়ত একটু extreme হয়েছিল। আমাদের generation এর অধিকাংশ লোকেই শেষ পর্যন্ত অর্থহীন। আমরা যে দেশে যেভাবে মানুষ হয়েছি তাতে হয়ত দোটানার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব, মহৎ বা ক্ষুদ্র হলে সেটা পারেন। সে জন্য যখন নিজের ওপর নানা কারণে ধিক্কার জন্মে তখন ভাবি যে we are not the doctors, we are the disease. বর্তমান কালে ব্যক্তিগত জীবনে যদি ভদ্রতা রেখে চলতে পারি, যতই তুচ্ছ হোক না, কেন কোনো একটা pattern জীবনে আনতে পারি, তাহলেই যথেষ্ট। আপনি যে জন্য বিচলিত আছেন সে কারণে গত তিন চার বছর আমিও অল্প বিস্তর বিচলিত ছিলাম, কিন্তু এখন কেটে গেছে।

...অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়নি। মাঝে মাঝে এই বৃদ্ধবয়সেও মন কেমন করে, কিন্তু তখন সেন্টিমেণ্টাল হবার ভয় আমাকে আপনার মতো পীড়িত মোটেই করে না।

ভালোবাসা নেবেন।...আমি যাকে বিয়ে করছি তিনি আশা করেছিলেন যে আপনারা আসবেন, কিন্তু আসছেননা শুনে দুঃখিত হয়েছেন। ইতি

সমর সেন

১১

12B Daryagunj, Delhi
2. 5. 41

দেবীবাবু,

শেষ পর্যন্ত আপনারা কেউ এলেন না। যদি আপনারা আসতেন তাহলে বেঁচে যেতাম; বিয়ের সময় বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষের মধ্যে অনেক গণ্ডগোল হয়েছিল। তার জন্য দায়ী কারা সেটা বোঝাবার চেষ্টা করছিনা, কারণ স্বভাবতই আমার মতামত কন্যাপক্ষ ঘেঁষা হবে। যা হোক, বিয়ের ঝামেলা এখানে আমার কাছে অন্তত মিটে গেছে। কলকাতায় আমাদের বাড়ী থেকে অনেক কথা শুনতে পাবেন. সব বিশ্বাস করবেন না।

আপনাদের পাঠানো জিনিষ খুব কাজ দিয়েছে। ছবিগুলো চমৎকার, তবে ঘরটা এতো অদ্ভুত যে কোথায় টাঙাবো ভেবে পাচ্ছি না। এ দুদিন বাড়ী ঘরদোর গুছিয়ে নিয়েছি. জিনিষপত্র সাজিয়ে নিজেকে এতো বুর্জোয়া লাগছে যে মন খারাপ হয়ে গিয়েছে, মনে হচ্ছে যে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ করে ফেলেছি।

বিয়ের সমস্ত অনুষ্ঠান মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছি। বিয়ের দিন temperature ছিল ১১৪. লগ্ন ছিল রাত একটা, বিয়ের পরেই কুশণ্ডিকা. ব্যাপারটা শেষ হল তিনটের সময়। পিঁড়িতে বসে পাছা ব্যথা হয়েছে, এখনো সারেনি। দুজনে মাত্র ঘর সংসার করা শেষ পর্যন্ত হয়ত ভালো নয়, মুখোমুখী বসে থাকতে তিন দিনের বেশী ভালো লাগেনা। এ সম্বন্ধে অবশ্য কিছু লিখবেন না. চিঠিটা স্বলেখার হাতে পড়লেই গণ্ডগোল।

আপনারা সবাই কেমন আছেন?...জুলাই মাসে কলকাতায় যাবো। তার আগে ত আপনাদের সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের কলেজ এখনো বন্ধ, ৫ই মে খুলবে। অসহ্য গরম, ১১৫, ১১৬।

ভালোবাসা নেবেন...। আজকাল দিলীপ রায়ের মতো একটা ব্যাপার আমারো হচ্ছে, কোনো মেয়েকে আপ্যায়িত করতে হলেই গাল টিপে দিই। একজনকে মাসী বলি, কিন্তু অন্যমনস্ক ভাবে সেদিন গাল টিপে দিয়ে এখন পর্যন্ত অপ্রস্তুত আছি। বিয়ের ছবি কয়েকদিন পরে পাঠাবো, যদি ছবিতে আমাকে নেহাৎ গবেট না লাগে। কামাক্ষী নেই, আমার কান বাঁচিয়ে কে ছবি তুলবে বলুন। ইতি

সমর সেন

রাধারমণবাবু এসেছিলেন। তাঁকে প্রত্যেকেরই ভালো লেগেছে।

১২

12B Daryagunj, Delhi
16. 5. 41

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আমার সম্বন্ধে কী শুনছেন জানিনা, তবে বিয়ের ব্যাপারে আমি একটু সতর্ক হয়ে ছিলাম। উভয়পক্ষের গোলমালে সাবধান হয়ে থাকা ভালো। সে জন্য বাড়ীর লোকে বিশেষ চটে যান। যাক, ওসব ব্যাপার চুলোয় যাওয়াই ভালো।

বিয়ের পর আপনার মতো বোকা বোকা লাগছে, ও কামাক্ষীর মত অস্বস্তি লাগছে। মনের বয়স বেশ হয়েছে বলে প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিশেষ রং ধরাতে পারছিনা, তার ওপর রঙীন হবার অন্য উপায় আপাতত বন্ধ। ফলে শরীর খারাপ করে বসে আছি।...

দিল্লীতে বই-এর প্রচণ্ড অভাব, তার ওপর আমার বুদ্ধিবৃত্তি অনেক কমে গিয়েছে। বইপত্র না থাকলে লেখা ভয়ানক কঠিন। সেজন্য শেষ পর্যন্ত যদি না লিখতে পারি ত নিজ গুণে মার্জনা করবেন। সুভাষের খবর কী? তাকে চিঠি লিখেছিলাম, উত্তর পাইনি। আচ্ছা মশাই, ওদের কাগজে একটি কবিতা লিখে-ছিলাম, কাগজটা ত চোখে দেখলাম না। 'ত্রিকাল' বলে একটা কাগজের বিজ্ঞাপন দেখলাম কি বার্তায়, ওটার নাম ত তিনকালে শুনিনি।

কলকাতায় ফেরার ইচ্ছে আজকাল মাঝে মাঝে হয়। বেবী গুপ্তের খবর কী? তাদের পুরাতন নেতা শুনলাম পণ্ডিচেরী গিয়েছেন। ভালোবাসা নেবেন...। ইতি

সমর সেন

আত্মগ্লানির আর একটা পর্যায় আমার এখন চলেছে: তার ঠেলা সামলানো দায়।

১৩

12B Daryagunj, Delhi
27th May 1941

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। আমাদের বাড়ীর কোনো সাত্ত্বিক নাম নেই বটে, কিন্তু এখানে এখন মুনিরা এসে বসবাস করতে পারেন। নেশার মধ্যে শুধু চা আর

সিগারেট। মাথা নিচু করে কথা বলি, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ, সে সব দিন গত, মনে হচ্ছে পৃথিবীটা শূন্যগর্ভ, তার মাঝে বগল বাজানো ছাড়া আর কোনো কাজ নেই। আপনারা ত আমাকে ত্যাগ করলেন। বিবাহোত্তর দারুণ দুর্যোগের দিনে যদি থাকতেন!

আপাতত আবার পড়াশুনো শুরু করেছি। দত্ত সাহেবের ভারতবর্ষের ওপর বইটা পড়ছি। তাতে যদি আপনার অভারী প্রবন্ধের কিছু সুবিধে হয়।

শুনে খুশী হবেন দিল্লীতে এসে আমার রং আরো ভালো হয়েছে। স্বাস্থের [য] বিশেষ উন্নতি দেখছি না। ··প্রচণ্ড গরম, কাল ১১৪ ছিল, আজকে বোধহয় আরো বাড়ছে।

আমাদের ছুটি হবে জুনের শেষ দিকে। মাঝে গীতার একটি চিঠি পেয়েছিলাম। মনে হল ভালোই আছে। সুভাষের খবর অনেকদিন পাইনি। আহমেদ পয়লা মে'র পরে আর আসে নি, বোধহয় ভেবেছে যে আমি বুর্জোয়া হয়ে গিয়েছি। ক্রীট ত যায় যায়, Hood জলের নীচে, ইরাকে বিশ্বাসঘাতক রসিদ আলি কী ব্যাপারটাই করছে। আমাদের সাম্রাজ্য বড্ড ঝামেলায় পড়েছে।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

এক খামে চিঠি লিখে পয়সা বাঁচালাম।

১৪

১৪.১.৪২

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেলাম। অনেকদিন আগে কামাক্ষীর ও আপনার চিঠি একখামে পেয়েছিলাম, তার উত্তর অবিলম্বে দিয়েছিলাম, আপনারা পাননি তার জন্য দায়ী ডাকঘর। তারপর থেকে আপনি নিরুত্তর ও বোধ হয় শান্তিনিকেতনে নিরুদ্দেশ। মাঝে কে যেন খবর দিয়েছিল যে পীতাতঙ্কের জন্য লাল-সবুজ শান্তিনিকেতনে আপনি মাস ছয়েকের জন্য আশ্রয় নিয়েছেন। খবরটা পেয়ে চিন্তিত বোধ করেছিলাম। বুদ্ধদেববাবু ৬ই ডিসেম্বরের পর তুমুল কাণ্ড করেছিলেন, খণ্ড প্রলয়ে তাঁর জীবন লোপের সম্ভাবনায় অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিলেন। এখন বোধ হয় ভারসাম্য ফিরে এসেছে।

'গ্রহণ' ৫০ কপি বাঁধিয়ে কী হবে। ২৫ কপি বাঁধান। খরচটা এখন পাঠাতে পারবনা সেটা ত জানা কথা। ডি এম লাইব্রেরী ও ভারতীভবনে কয়েকটি কপি ছিল, রসিদ আমার কাছে আছে। সেগুলো বিক্রী হয়ে থাকলে কি টাকা পাবার

কোনো সম্ভাবনা আছে ? বুদ্ধদেববাবুর বাড়ী থেকে কয়েক কপি বিক্রী হয়েছিল. সাক্ষী কামাক্ষী, কিন্তু সে বিষয়ে বুদ্ধদেববাবু, সুধীনবাবুর ভাষায়. স্বর্ণগর্ভ স্তব্ধতা বজায় রেখেছেন। আপনি কি ইউ. এন্. ধরে যান ? সেখানে আমারো পাচ টাকা দশ আনা দেওয়া বাকী আছে. ভাবছি কলকাতায় আর ফিরবনা। মাঝে মাঝে মাঝরাতে আচম্কা ঘুম ভেঙে যায়, তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত ধারের কথা মনে পড়ে। হাত দেখে কে যেন বলেছিল যে ঋণযোগ আছে। সুতরাং তার দিন সাতেক পরে কলেজ থেকে ২০০্ ধার নিয়েছি। তার ঠেলা সাম্লাতে অস্থির।

এখানে মশাই সময় কাটানো একটা প্রধান সমস্যা। শুনেছি আর্কটিক অঞ্চলে শীতকালে এমন একটা নিঃসঙ্গ বিষণ্ণতার ভাব আসে যে সেটা শেষ পর্যন্ত মানসিক রোগে পরিণত হয়। জানুয়ারী মাসের কদিন যা শীত পড়েছিল সেটা অকথ্য। কলেজ থেকে ফিরে এসে বিকেলে কোনো কাজ থাকেনা. চাঁদ্নী চকে কফির দোকানে যাই. কিন্তু কলকাতার চায়ের দোকানের আবহাওয়াও এখানে নেই। বই-এর ভয়ানক অভাব। তারপর যখন সিংগাপুর শিঙা ফুঁকছে তখন বই পড়লে কেমন মাইরি মাইরি লাগে। একজনের সঙ্গে বাজী রেখেছি যে রাশ্যানরা আসছে বছরের এপ্রিলের আগে জিতে যাবে। বাজী রাখার কারণ কলেজের ধার শোধ করতে হবে।

মাঝে কেষ্ট এসেছিল। দিন আষ্টেক মজাদার সময় কেটেছিল। আপনি কি পরীক্ষা দিচ্ছেন ? না দিলে চলে আসুননা।..গরীবখানায় বিশেষ বোধহয় কষ্ট হবে না (অশোককে জিজ্ঞেস করবেন)। কামাক্ষীকে আসতে বলা বৃথা. বরফ দেখবার জন্য হয়ত পাগল হবে। রাম সস্ত্রীক এসেছিল।..

সুলেখার খবর ভালোই। মনের আনন্দে ঘুরছে। এখন বেশীর ভাগ সময় ও রাত্রে পিত্রালয়ে থাকে।

সুভাষের তাহলে দেখা সাক্ষাৎ নেই। বেবীর "downfall of character" হয়েছে দেখছি। ভালবাসা নেবেন। । দিল্লীতে আসুন। হনুজ [য] দেহলী দূর অস্ত্। Hemingwayর For whom the Bell Tolls পড়েছেন ?

আর একটা বই বের করবার মতো মশ্লা জমেছে। তবে টাকার দিয়াশলাই নেই। ইতি

সমর সেন

১৫

২১.৩.৪২

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি দুএকদিন হোলো পেয়েছি। 'গ্রহণ' আমার কাছে পাঠিয়ে কোনো লাভ নেই, যদি মেহেরবাণী করে ডি এম লাইব্রেরী ভারতীভবন আর ইউ এন্ ধরে দেন তাহলে ভালো হয়। পাঁচ কপি করে দেবেন। আমাকে এক কপি পাঠাতে পারবেন? শালার বইএর কেমন চেহারা হয়েছে দেখব। বাঁধাবার জন্য আপনাকে নিশ্চয়ই অনেক ঝামেলা সহ্য করতে হয়েছে, সে জন্য লাখ লাখ স্যাক্রিয়া। কতো খরচ পড়ল? নিশ্চয়ই হৃদয়বিদারক একটা হিসেব পাঠাবেন না।

এখানকার খবর বিশেষ কিছু নেই। কামাক্ষীবা যতোদিন ছিল, খুব হৈ চৈ করে কাটানো গিয়েছিল, এখন ফাঁকা লাগছে। সে সময় আপনি এলেও ত পারতেন। বিশেষ অসুবিধা হতনা, তবে চুলের তেল একদিনে দেখতেন শেষ, সোনার ঘড়ি ভৌতিকভাবে অদৃশ্য, কলম নিরুদ্দেশ, ডালে নুন নেই, ভাতে চিনি। সকালে ও বিকেলে মাছিতে ঘুম ভাঙ্গাত। তবে বিশেষ অসুবিধে হতনা। সময় ও সুবিধে করে একবার আসুন না।

কলকাতার অবস্থা খারাপ হলেও ভালো। আড্ডার অভাব নিশ্চয়ই নেই। এখানে মনের মতন মানুষ পাওয়া দায়, সময় কাটানো আরো দায়। বেবী শুনলাম একদিন একটানা পাঁচ ঘণ্টা আপনার ঘরে বসে পড়েছে। চরিত্র খারাপ হয়েছে মনে হচ্ছে। সুভাষকে একটা দার্শনিক কবিতা পাঠিয়েছি। পাঠাবার পর ওর ফরমায়েসী আর একটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী কবিতা লিখেছি। কিন্তু দেরী হয়ে গিয়েছে ভেবে আর পাঠাইনি। তা ছাড়া ফ্যাসিস্ট-বিরোধী হলেও কবিতা হয়েছে কিনা বুঝে উঠতে পারছিনা।

আপনার চিঠিতে একটু rancourএর ভাব দেখলাম। কী ব্যাপার? দিনকাল যা পড়েছে তাতে নিজেরা বাঁচবার জন্য অনেকে চীনের নাম করছে, কিন্তু সেটা ভণ্ডামী হলেও কিছু পরিমাণে কার্যকরী। এদিকে কাগজে পড়ছি যে বাংলাদেশে গুণ্ডার উৎপাত খুব বেড়েছে, অনেকে ভাবছে যে ভারতমাতার প্রেমিক বদলাবার সময় এসেছে, বিধবারা কলকাতা ছাড়ার প্রস্তাবে বলছে যে বিধবার আর জাপানীতে কী ভয়, কতো লোক এল আর গেল। আজকের কাগজে বঙ্কিমবাবু, সুরেন গোস্বামী ইত্যাদির statement পড়লাম। সুভাষ বোসীরা তাহলে খুব আস্ফালন করছে।

...এপ্রিল মাসে সুলেখার বাচ্ছা পয়দা হবে। আপনি কি এ বছরে পরীক্ষা দিচ্ছেন? ভালোবাসা নেবেন...। ইতি

সমর সেন

১৬

৪. ৪. ৪২

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি ও 'গ্রহণ' পেলাম, অনেক ধন্যবাদ। চিঠির উত্তর দেওয়ায় তৎপরতা আমার এখনো বজায় আছে, কেননা আপনাদের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে থাকি না। কলকাতার বিষয় নানা রকম গুজব এখানে রটে। কেউ বলে কলম্বোর পতন হয়েছে, কাশীপুরে ৩০ মণি একটা বোমা পড়েছে, জাপানী উড়োজাহাজ না কি ব্রিটিশ উড়োজাহাজের সঙ্গে প্রত্যহ চিৎপুরের উপরে আকাশে লুকোচুরী খেলে। যাঁরা এ সব মজাদার খবর রটান তাঁরা অন্য লোককে বলতে আবার বারণ করেন, বললে নাকি তাঁদের চাকরী যাবার সম্ভাবনা আছে। খোঁজ নিলে জানা যায় তাঁদের অধিকাংশই বেকার, সরকারী চাকরীর উমেদার। মোটের উপর, ধরে নিয়েছি যে আপনারা ধর্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের একটি প্রান্তে আছেন। তারপর 'পরিচয়ে' চঞ্চল উড়োজাহাজের উপর একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছে।

'গ্রহণ' বাঁধাতে কতো খরচ লাগল কিছু লেখেন নি। টাকাকড়ির উল্লেখে যদি লজ্জিত হন তাহলে অবশ্য আর লজ্জা দেবনা, কারণ তাতে আমার লাভ বই লোকসান নেই। বাঁধানোটা ভালোই হয়েছে।

সুভাষকে প্রথম কবিতা পাঠাবার সময় লিখেছিলাম যে ওদের প্রসঙ্গের উপযোগী না হলে যেন বর্জন করে। তারপরে কোনো খবর না পাওয়াতে নতুন কবিতা পাঠাইনি। সুভাষের ঠিকানাটাও মনে ছিলনা। তাছাড়া কবিতাটার শেষের দিকে কয়েকটি কথা ছিল সেগুলো পড়ে পরে খারাপ লাগল, মনে হল আমি কলেজে পড়াই (?), বিকেলে টেরা কেটে ধোপদুরস্ত কাপড়জামা পরে আড্ডার সন্ধানে বেরোই, কখনো কখনো চাঁদনী চকে কাফে হাউসে পোলিটিক্যাল বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে আলাপ করি, জীবনযাত্রা নিতান্ত নিরীহ, এ ধরণের কবিতা লেখা শোভা পায়না। It is the mode of existence that determines consciousness, not consciousness that determines existence ইত্যাদি। উদ্ধৃতিটা ঠিক হোলো কিনা জানিনা, এখানকার পার্টি সেক্রেটারী আমার Handbookটা বেমালুম মেরে দিয়েছে, লোককে বলেছে ওটা হচ্ছে exploiting the petty bourgeoisie.

কিছু জরুরী খবর চাই। দাদা লিখেছে যে বেবীর খবর এই যে আপনারা না কি সত্বর এলাহাবাদে চলে আসছেন। ১৫ই এপ্রিল স্কুল কলেজ বন্ধ হলে কি বিষ্ণুবাবু, বুদ্ধদেববাবু, এঁরা কলকাতায় থাকবেন? আপনাদেরই বা গ্রীষ্মের কী প্রোগ্রাম? দাদা আমাকে কলকাতায় যেতে বারণ করেছে, লিখেছে যে এপ্রিলের শেষে ছুটির জন্য চেনাগুনো কেউই ওখানে থাকবেনা। এখান থেকে কলকাতায়

যাতায়াতের খরচ প্রায় ৫০৲। সেটা খরচ করে যদি দেখি কলকাতা পাণ্ডববর্জিত, আলাপী লোক মাত্র দু একজন আছে, তাহলে সে নিদারুণ রসিকতা সহ্য করা কঠিন হবে। সুতরাং পত্রপাঠ জানাবেন যে বিষ্ণুবাবু, বুদ্ধদেববাবু, আপনারা এবং অন্যান্যরা এপ্রিলের শেষে কোথায় থাকবেন। এপ্রিলের পরেও যদি কোনো কারণে এ হতভাগা শালার দেশে থাকতে হয় তাহলে ঠিক করেছি যে রাগ করে কবিতা লেখা এবং চা খাওয়া একেবারে ছেড়ে দেবো। অবশ্য আপনারা যদি কোনো সুখপ্রদ জায়গায় হাওয়া বদলাতে যান এবং আমাকে দু একবার সনির্বন্ধ নিমন্ত্রণ করেন তাহলে কলকাতায় গিয়েও থাকতে পারি।

এখানে সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি হয়েছে। হিন্দী উর্দু ও ইংরেজীতে প্রচারকার্য চালানো হবে। ইংরাজী বিভাগের ভার আমাকে দিয়েছে। অনেকদিন লেখার চর্চা করিনি, আপনার দেওয়া Pocket Oxford Dictionary ঘন ঘন ওলটাচ্ছি, কিন্তু মিটিংটা হয়ে যাবার পর আর কোনো খবর পাইনি। শুনছি এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ না হলে না কি কাজ এগোবে না। নানা রকম লোক সমিতিতে আছেন। একজন ভদ্রলোক (B. A. Cantab) তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে আসেন, স্ত্রীও সদস্য, বাঙ্গালী, কিন্তু দুঃখের বিষয় ভদ্রমহিলা বাংলা বলতে পারেননা, ইংরেজী তাঁর মাতৃভাষা। ভদ্রলোকটি যেহেতু বিলেত ফেরত, সেহেতু তিনি কলেজের বাইরে বিঃ ফেরতদের সঙ্গেই মেলামেশা করেন। কলেজে তাঁর ব্যবহার অবশ্য খুব ভালো, তার ওপর তিনি সোভিয়েট সুহৃদ। সত্য সেলুকস কী বিচিত্র এই দেশ।

আপনাদের বাড়ীর খবর আশা করি ভালো। ···রেখার খবর কী? আপনার ভ্রাতৃদেব ত চিঠিপত্রের ব্যাপারে শ্রীবুদ্ধদেব বসু শ্রীবিষ্ণু দে ইত্যাদি মহাজনদের পন্থা অবলম্বন করেছেন। অশোকের খবর প্রায় এক যুগ পাই নি। ইতি

সমর সেন

১৭

১০. ৪. ৪২

দেবীবাবু

আপনার চিঠি কাল পেয়েছি। ৮ই তারিখে সত্তা ও অমলবাবু এখানে এসে আগ্রা হোটেলে উঠেছেন, সেদিন বিকেলে দেখা হয়েছিল। দু একদিন আগে কামাক্ষীর চিঠি পেয়েছি, আমাকে 'নিশ্চয়ই' মে-মাসে কলকাতায় যেতে লিখেছে। অবশ্য চিঠি লেখার সময় বেঁটেরা ভাইজাগে বোমা ফেলেনি।

বুদ্ধদেব বাবু ডিসেম্বরে প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকা গিয়েছিলেন, লুপ্ত সাহস এতো দিনে তাহলে ফিরে এসেছে। মিসেস বোস্ বোধহয় কলকাতায় থেকে যাবেন। বিষ্ণুবাবু কলেজ ছুটি হলে কোথায় যাচ্ছেন? আপনারা এলাহাবাদে এলে নিশ্চয়ই

দেখা হবে। তবে কলকাতা যাবার আশা এবং ইচ্ছা এখনো ত্যাগ করিনি। বাড়ীর কোনো খবর বহুদিন পাইনি। আপনি কিছু জানেন ?

অমলবাবুর কাছে এখনো আপনার সুখ্যাতি করা হয়নি। কারণ প্রসঙ্গটা ওঠবার আগেই তিনি বললেন যে আপনার কাছে আমার অনেক প্রশংসা শুনেছেন। উল্টে আপনার গুণগান করলে তিনি নিশ্চয়ই সন্দিহান হতেন। যা হোক, এখানে গরুর গাড়ীর গতিতে জীবন কাটছে। দিল্লিতে একটানা কাটাতে পারি গরমের সময় কলকাতা যাত্রার কথা ভেবে। এবারে সে গুড়েও বালি না হয় !

কবিতা থেকে লাইন বাদ দিয়েছেন. বেশ করেছেন। তবে 'অশ্লীল' লাইন মাত্র একটা ছিল, শুধু সেটা বাদ দিলেও কবিতার প্রসঙ্গ অব্যাহত থাকত। আমার হাতে গদ্য লেখা নেই. তবে সুভাষের ফরমায়েসে লেখা কবিতাটি পাঠাচ্ছি। ওর ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছি, সেজন্য আপনার নামেই পাঠাচ্ছি।

সুলেখা এখন 'পত্রালয়ে এবং আমার সঙ্গে কোথাও যাওয়া সম্ভবপর হবে না। গত সোমবার একটি কন্যা হয়েছে। শুনছি আমার কান কিম্বা সুলেখার নাক পায়নি। সতীকে ওবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলাম। এলাহাবাদ এলে আপনি ত ...একবার আসতে পারেন। দিল্লি সে সময় খুব সুখকর জায়গা। দুপুরটা খোঁয়াড়ে বন্য পশুর মতো কাটাতে হয়। বিকেল ও রাত্রি মন্দ কাটে না। ইতি

সমর সেন

কামাক্ষী কি এপ্রিলটা খড়গ্‌পুরেই থাকবে ?

১৮

১২ বি দরিয়াগঞ্জ
১৯. ৬. ৪২

দেবীবাবু.

সজ্ঞানে দিল্লীতে এসে পড়েছি। রাস্তায় বিশেষ ঠাণ্ডা ছিলনা. ক্রমাগত জল খেয়ে heat-stroke এর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এখানে আবহাওয়া এখন চমৎকার, হাওয়ায় মনে হচ্ছে হাজার হাজার বিছে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; তবে মাঝরাত্রে ঠাণ্ডা পড়ে। সবাই বলছে আমি নাকি ভালো সময় এসে পড়েছি। পরিহাসের সীমা বোধহয় বর্তমান জগতে নেই। আশা করছি শিগগীরই ঝড়বৃষ্টি হয়ে দিনসাতেকের মধ্যে ঠাণ্ডা হবে।

কামাক্ষীর কাছে কাল গিয়েছিলাম। প্যাকেট ও চিঠি দুইই দিয়েছি। রাস্তায় প্যাকেটটা খোলার দুর্দান্ত আগ্রহ হয়েছিল আমসত্ত্বের লোভে ; কিন্তু উত্তমরূপে বাঁধা ছিল বলে শেষ পর্যন্ত উৎসাহ হল না। আপনার মাকে বলবেন ভবিষ্যতে যেন

হালকাভাবে ও-সব জিনিষ বাঁধেন। কামাক্ষী এই গরমে যে ভাবে আফিস করে তাতে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছি। একটা চাকর পেয়েছে, রেখা তাকে রান্না শেখাচ্ছে। রেখা এখন বেশ কাজের মেয়ে হয়েছে, কাল বিকেলে আমাদের দু বার চা করে খাইয়েছে। কাল প্রমথবাবু সস্ত্রীক ওখানে খেয়েছিলেন।

আমাদের চাকর হাসপাতালে, সুলেখা রাঁধছে, ওর মেয়ে জমিদার গিন্নীর মত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকে। আমি সকালে দিল্লীকে অভিশাপ দিই, বিকেলে কামাক্ষী-দের ওখানে যাই। সকালে কামাক্ষী এসেছিল গেরুয়া রং-এর খদ্দরের পাঞ্জাবী পরে। রং অবশ্য ধুলোতে [য] কালচে হয়ে গিয়েছে।

আপনার পড়াশুনো কেমন হচ্ছে? মন দিয়ে কাজ করুন; বিকেলে পড়বেন না, একচোট ঘুরে আসবেন। বেশী রাত জাগবেন না।...বেবী কি পাইলট্-অফিসার হল? তাজ্জব ব্যাপার। ভালোবাসা নেবেন ও চিঠির জবাব দেবেন। ইতি

সমর সেন

১৯

12 B, Daryagunj, Delhi
1. 7. 42

দেবীবাবু,

এখানে ঘোর গ্রীষ্মের পর বর্ষা শুরু হয়েছে। সুতরাং বাইরের উত্তাপ অনেক কমে গিয়েছে, কিন্তু কলকাতা থেকে দিল্লীতে ফিরে এসে মনের উত্তাপ চড়ে গিয়েছে। এ রকম হতভাগা শালার দেশ আর নেই। বেকার সমস্যা chronic। বিকেলে আড্ডার স্থান আছে, কিন্তু জমছেনা। কামাক্ষী বলছে ছোটোখাটো সাহিত্যিক coterie করবে। কবিতা গল্প প্রবন্ধ পাঠ, চা পান ইত্যাদি। (চা পানের সঙ্গে জাপানের মিল কী রকম!) বিকেলে আমার কথা এমনিতেই একটু জড়িয়ে যায়, সে জন্য আবৃত্তির মধ্যে নেই। চা পানে আপত্তি নেই।

মাঝে কলকাতায় ফিরে যাবার সম্ভাবনায় পুলকিত হয়েছিলাম। আমাদের কলেজের প্রিন্সিপাল ও আর একজন অধ্যাপকের (তিনিও বাঙ্গালী) চাকরী হঠাৎ গিয়েছে। বেনেদের বীররস দেখাবার সুযোগে অত্যন্ত খুশী লাগছিল, কিন্তু শালারা এখন পর্যন্ত আমার পেছনে লাগেনি। সুযোগ পেলেই চাকরীতে ইস্তফা, এবং কলকাতা যাত্রা। সুকুমার দত্ত মশাই-এর চাকরী গিয়েছে শুনছি, ঠিক জানিনা।

আপনাদের হালচাল কেমন? বেবীর যে হবেনা আগেই জানতাম; মিছিমিছি পোনেরো দিন ব্যায়াম করল। এখন surplus energy নিয়ে কী করবে?

বিষ্ণুবাবুকে একটি চিঠি লিখেছি। তাতে তাঁর কবিতায় deviations from

the PARTY LINE সম্বন্ধে লিখেছি। গুরুদেব নিশ্চয়ই ক্ষেপে গিয়েছেন। সাবধানে থাকবেন। কামাক্ষী 'শিবির' এক কপি চঞ্চলকে পৌঁছিয়ে দিতে আমাকে আগে লিখেছিল। আপনি সময় করে দিতে পারবেন ?

'অরণি'র সোভিয়েট-সংখ্যা কেমন লাগল ? সুভাষকে জিজ্ঞেস করবেন শকুনির নখরে কী করে লালা ঝরে ? কবিতাটির তিনটি সবচেয়ে ভালো লাইন "বারুদে জোয়ার লাগে" ইত্যাদি জনশক্তি সম্বন্ধে লেখা হলে দারুণ হত, কিন্তু সুভাষ নিশ্চয়ই জাপানের কথা লিখেছে। 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', এটা শেষ movement-এ তিন চারবার ধুয়া (refrain) হিসেবে ব্যবহার করলে কেমন হত ? বিষ্ণুবাবুর কবিতার প্রথম লাইন : 'শতাব্দীর উর্ধ্বশ্বাস জটায়ুর পক্ষপাতে নীল/আকাশে মুখর হল",—কী মুখর হল ? 'আকাশে' বোধহয় ছাপার ভুল।

এখানে F. S. U. চমৎকার কাজ এ দু মাসে করেছে। সজ্ঘ প্রায় ছত্রভঙ্গ, ম্যানিফেস্টোটা সই করানো হয়নি, সুতরাং ছাপানো হয়নি। গ্রীষ্ম অবকাশে ভারতবর্ষে বিপ্লব হতেই পারেনা। এখানেও অনেক slit trenches হয়েছে। রাত্রে শুনছি সৈন্যরা তার সদ্‌ব্যবহার করে।

রেখা দু সের ওজনে কমেছে, কামাক্ষী এক সের লাভ করেছে। সুলেখা বোধহয় পাঁচ সের বেড়েছে। ইয়া আল্লা !

অশোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় ? বুদ্ধদেববাবুর কী খবর ? তিনি তাঁর রাবীন্দ্রিক গাম্ভীর্য বজায় রাখতে বোধহয় ব্যস্ত।

চতুরঙ্গে রিভিয়ু-এর কথাটা মনে রাখবেন। চিত্ত অচঞ্চল রেখে পরীক্ষাটা দিয়ে দিন, তারপর দিল্লীতে চলে আসুন।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

সুভাষের ঠিকানাটা কী ?

অবসর সময় আমি অম্লানবদনে মেয়ের তদারক করি। বেশ করি।

২০

১২বি, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী
১৫. ৭. ৪২

দেবীবাবু

আপনার খৎ পেয়েছি। পূর্ণেন্দুর হাতে মহাভারতও এসে পৌঁছেছে।

এখানকার হালৎ আগেকার মতই। তবে গরম অনেক কম, আমার আক্কেল দাঁত কয়েকদিন যন্ত্রণা দিয়ে এখন বোধহয় ব্যূহ ভেদ করে নিশ্চিন্ত হয়েছে,

আপনাদের প্রেরিত চাকর কামাক্ষীর বাড়ী থেকে সহসা নিরুদ্দেশ, ফলে রেখা ও কামাক্ষীর জীবন দুর্বিষহ। আজ একটা চাকর জুটতেও পারে।

কলকাতার খবর কী। খবরের কাগজ রোজ সকালে এক গলা জলে ফেলে দেয়, অনেক কষ্টে টাল সামলাই। কলকাতায় নিশ্চয়ই এখন বেশ ভিড় হয়েছে, বীর বাঙ্গালীরা সব ফিরে এসেছেন।

বিষ্ণুবাবুর সঙ্গে তাহলে এখনো দেখাসাক্ষাৎ হয়নি। বুদ্ধদেববাবু লিখেছেন যে 'কবিতা'য় 'নানাকথা'র জন্য তিনি মণীন্দ্রবাবুকে লিখেছেন।

এলিয়টের The dry salvages দেখেছেন? অবশ্য আপনি পরীক্ষা নিয়ে খুব ব্যস্ত আছেন। লেখাপড়ার জন্য সময়ের অভাব থাকলে চিঠির উত্তর দিতে স্বচ্ছন্দে দেরী করতে পারেন।

...আপনারা নিশ্চয়ই দিল্লীতে আসবেন, পরীক্ষার পর। ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

বেবীর খবর কী? ব্যায়াম করাই সার হোলো।

২১

দেবীবাবু

ভবিষ্যৎ কেমন? পরীক্ষা কেমন হল? ১৪ই তারিখে বোধহয় একটু অসুবিধে হয়েছিল। আমরা এখানে ভালোই আছি। রেখার খবর কামাক্ষীর চিঠিতে নিশ্চয়ই পেয়েছেন, কামাক্ষী খুব চিন্তিত ও ব্যস্ত।

পরীক্ষার পর আপনাদের এখানে আসার কথা ছিল, সেটা ইয়াদ আছে ত? এখন যান চলাচল আবার শুরু হয়েছে, টিকিট কেটে উঠে পড়ুন। অনেক কথা আছে।

কলকাতার খবর কী? সুভাষের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়? বেবীর খবর কী? চাকরী বদলায়নি? রং কেমন হয়েছে?

আশা করি পত্রপাঠ দিল্লী রওনা হবেন। ইতি

সমর সেন

২২

৫.৯.৪২

দেবীবাবু,

আজ আপনার চিঠি পেয়েছি। কামাক্ষীর কাছে শুনেছিলাম যে পরীক্ষা দিয়ে আপনি বিমর্ষ আছেন, দু একটা পেপার না কি ভালো হয়নি। ও সম্বন্ধে চিন্তা করবেন না, ও কথা মনে পড়লেই স্টালিনগ্রাডের কথা ভাববেন। কোনো গণ্ডগোলের মধ্যে পড়লে আমি বিশ্বসংসারের কথা গভীরভাবে চিন্তা করি। এক কোষ্ঠকাঠিন্য হলে দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকেনা। সেটা অবশ্য আজকাল প্রায়ই হয়।

আপনি উত্তেজনার বশে চিঠি লিখলে খুশী হতাম. আমারো যথেষ্ট উত্তেজনা হয়েছিল। ৯ই অগষ্ট একটা প্রকাণ্ড জনসভা হয়েছিল, সভার পরে এখানকার সাম্যবাদী নেতার (সুভাষের hero) সঙ্গে দেখা হল। তিনি বললেন : সব বিল্‌কুল পাগলামী। এ রকম মিটিং প্রথম ও শেষ। মজুরদের কী করা উচিত জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন যে ধর্মঘট অকর্তব্য, করলে বিশ্বগণতন্ত্রের সর্বনাশ হবে, সংগ্রাম প্রচেষ্টার সতীত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা প্রত্যেকের উচিত। ছাত্রদের কলেজে ফিরে যাওয়া উচিত। তা ছাড়া, মজুর ও ছাত্রদের উপর কংগ্রেসের ত কোনো হাত নেই, তারা সি. পি.-র একচেটিয়া কর্তৃত্বের মধ্যে পড়ে। অবশ্য এ সব বাগ্‌জাল সত্ত্বেও মজুররা দিন দশেক মিলে যায়নি. এবং ছাত্ররা আজ পর্যন্ত (দুটি কলেজ ছাড়া – একটি মুসলিম লীগ অন্যটি 'মশ্‌ন কলেজ) ক্লাসে আসেনি। বম্বেতেও শুনলাম প্রথম দিনেই মজুর ও ছাত্র ধর্মঘটের বিরুদ্ধে পার্টি থেকে শ্লোগান দেওয়া হয়েছিল, কারণ রাস্তায় না কি সরকারী গুণ্ডা ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ধর্মঘট হলেই নাকি তারা মজুরদের পুলিসের কাছে চালাকী করে নিয়ে গিয়ে গুলী খাওয়াচ্ছিল। তাজ্জব দুনিয়া! সমস্ত ব্যাপারটা গোলমেলে। এখানে ছাত্রেরা বিড়ি খাচ্ছে, আড্ডা মারছে, বলছে আজাদী না হলে পড়াশুনোর মানে হয় না। তাদের এবং দেশবাসীদের কাছে সংগ্রাম প্রচেষ্টার বর্ণনা করলে ফল কী হয় বুঝতেই পারছেন। এদিকে বাংলা ও বোম্বাই-এর বামপন্থী পত্রিকায় হঠাৎ কোরিয়াতে জাপদের অত্যাচার সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ বেরুতে শুরু করেছে। ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে চুপচাপ। বাংলার কাগজ পড়লে আমার নিজেরি লজ্জা করে. যোশীর কাগজটা অবশ্য অনেক কড়া ও militant.

এখানে দু একজন লোক আছেন তাঁরা সত্যিই বিচক্ষণ সাম্যবাদী। কিন্তু কর্তাটি (সুভাষের hero) অদ্ভুত জীব। যখন চাঁদনী চকে লাঠি এবং আরো অনেক কিছু চলেছিল তখন তিনি সংগ্রাম প্রচেষ্টার ভবিষ্যতে উৎকণ্ঠিত হয়ে কফি-হাউসে কফি পান করছিলেন। আমাদের কলেজে প্রায়ই আসেন, বলেন যে General Wavell নাকি হিন্দুস্থানে সবচেয়ে progressive লোক, এসব গড়বড় যে হচ্ছে

তার জন্য অবশ্য সরকার কিছুটা দায়ী, ইত্যাদি। এসব আত্মন্তরী চিড়িয়া দেখে দেখে অত্যন্ত বিমর্ষ লাগে। জাপুভাইদের জন্য পার্টিলাইন পরিবর্তিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক, কিন্তু এটা ঠিক যে জাতীয় গভর্মেণ্ট না হলে আমাদের ভবিষ্যৎ পাইখানার মত (সে পাইখানা কমোড্‌শোভিত নয়, নেহাৎ খাটা পাইখানা)। কী করে জাতীয় গভর্মেণ্ট হবে সেটা ঈশ্বর ও কম্যুনিষ্ট পার্টি জানেন।

আমার মতামত ব্যক্তিগতভাবে বিস্তারিতভাবে আপনাকে জানাতে পারি, কিন্তু পরের চিঠিতে। কিছুদিন আগে অনেকে এসে আমাকে Counter-revolutionary, Gandhite ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করে গিয়েছেন। অবশ্য তাঁদের অনেকেই এখন বিচলিত ও বিমর্ষ। দু একজন কর্মীর সঙ্গে আলোচনা করে পরে মত বদলিয়েছি। কিন্তু গুণ্ডা, hooligan ইত্যাদি শুনতে আমার খারাপ লাগে। সাবোটাজ এ সময় খারাপ, কিন্তু দেশের লোক বোঝেনা যে ইউরোপে সাবোটাজ যখন নীতিসঙ্গত তখন ভারতবর্ষে কেন গর্হিত। ২২শে জুন, ১৯৪১-র পরে যুদ্ধের প্রকৃতি যে বদলে গিয়েছে সেটা আপনার, আমার মাথায় ঢুকলেও তাদের মাথায় ঢোকেনা। আপনার সাম্যবাদী বন্ধুদের বলবেন যে তাঁরা যে সুরে কথাবার্তা বলছেন সেটা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে মানায়, সাম্যবাদীকে মানায় না। আমি বিশ্বাস করতে রাজী নই যে ভারতবর্ষের অসংখ্য গ্রামবাসী সচেতনভাবে পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছে।

সে হোক, আপনি দিল্লীতে চলে আসতে চেষ্টা করুন। আমার মতলব ছিল কলকাতায় সেপ্টেম্বর মাসে যাওয়া, কিন্তু অর্থাভাবে সেটা হয়ে উঠবেনা। আপনার শরীর হঠাৎ "খারাপ" হয় না? দিল্লী change-এর পক্ষে ভালো জায়গা। এ বিষয়ে বাড়ীতে বলুন।

কলকাতার হালচাল কেমন? বেবী কি করছে? বেবী 'crisis'-এর সময় কী ভাবে react করেছিল? পূর্ববঙ্গের লোক, নিশ্চয়ই আমার মত বিচলিত হয়েছিল।

আপনাকে দুটো কাজের ভার দিতে পারি কি? "চতুরঙ্গে" নানাকথার রিভিয়ুটা আপনি করবেন বলেছিলেন, সে মর্মে আতোয়ারকে চিঠি লিখেছি। আর 'প্রতিরোধ' পত্রিকায় রিভিয়ু-এর জন্য এক কপি 'নানাকথা' পাঠাতে পারেন? আমার কাছে একটি মাত্র কপি আছে, তাই এখান থেকে পাঠাই নি। 'প্রতিরোধ'-এর ঠিকানা—20, Court House Street, Dacca.

আপনার আর্থিক অবস্থা এত শোচনীয় কী করে হল? সোনার বোতাম নেই?

কামাক্ষী ও রেখা ভালোই। যদি বাঁচি করে দিল্লী চলে আসুন।

আর একটা কথা। অমিয়বাবুর সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়? আমাদের কলেজে অধ্যক্ষের পদ খালি ছিল। মাঝে শুনেছিলাম এলাহাবাদের আদার্‌কার নামক ভদ্রলোক চাকরীটি পেয়েছেন। আজ শুনছি তিনি আসবেন কিনা ঠিক নেই। খবরটা অমিয়বাবুকে দেবেন।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

একটা কবিতা পাঠাচ্ছি। এটা 'প্রতিবোধে' পাঠিয়েছি, জানি না ছাপা হবে কিনা। কবিতাটি কেমন হয়েছে জানি না, হয়ত বদরুচির পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

এরা কারা ? কেন এত সশস্ত্র ঠাট ? কী মতলব ?
কেন আমাদের সহরে গ্রামে জমে অনেকের ছিন্নভিন্ন শব ?
বহু দেশ থেকে বিদ্যুৎগতিতে হটে
এ নিরস্ত্র দেশে বীরদল বেড়ায় দাপটে।
শ্মশানে লাস এনে খুনীরা বেইমান
তুড়ি মেরে আজো করে সভ্যতার গুণগান।

ইঁদুর কলে দেখেছি তুচ্ছ জানোয়ার,
আসন্ন মৃত্যুর ছায়া মুখে, চোখে ভয়ের বিকার,
মরণ কামড়ে উদ্যত তুচ্ছ জানোয়ার
বারে বারে মনে পড়ে এ দুর্দিনে আবার।

লবেজান সাম্রাই !
আমাদের হাত থেকে পাবে না রেহাই
হিট্‌লার, টোজোর এ গুপ্ত জাতভাই।

"লবেজান" মানে মুমূর্ষু।

২৩

১৮. ৯. ৪২

দেবীবাবু,

৮ তারিখে লেখা আপনার পোস্টকার্ড বারো তারিখে পেয়ে এ ছদিন চুপ করে ছিলাম, তার কারণ, ধরে নিয়েছিলাম যে ৭ [য] তারিখে লেখা আমার দীর্ঘ ও সারগর্ভ চিঠি আপনি ১১ তারিখ নাগাদ পেয়েছেন। কিন্তু এখনো সে প্রাপ্তির সংবাদ পাইনি বলে উদ্বিগ্ন লাগছে। ছ পয়সা কী জলে গেল ? জলে যাবার ত অনেক জিনিষ আছে, শুনছি ইংরেজ নৌবহর রাতারাতি submarine হয়ে গিয়ে চক্রশক্তির উদ্বেগ যথেষ্ট বাড়াচ্ছে।

সে চিঠিতে অনেক কিছু লিখেছিলাম, বেশীর ভাগ বোধ হয় আবোল তাবোল। সে সব কথার পুনরাবৃত্তি আর করলাম না, তবে দুটো কাজের ভার আপনাকে

দিয়েছিলাম। একটা চতুরঙ্গে রিভিয়ু করা। দ্বিতীয় 'প্রতিরোধ' নামক মাসিক পত্রিকায় (ঠিকানা—20, Court House Street, Dacca) এক কপি 'নানা কথা' পাঠাতে পারেন? সমালোচনার জন্য। আমার হাতে এখানে একটিও কপি নেই।

রেখার শরীর আবার খারাপ হয়েছে। সঠিকভাবে ধরা পড়েছে যে appendicitis। সন্তোষ সেন (বিখ্যাত surgeon) কাল বলেছেন যে ১৪ দিনের আগে কলকাতায় যাওয়া অসম্ভব, এর মধ্যে যদি আবার যন্ত্রণা হয় তাহলে অস্ত্রোপচার করতে হবে। কামাক্ষীকে অফিসে যেতে হয়, কলকাতায় সেপ্টেম্বরের পর নিরাপদ জায়গা নয়। আমার মনে হয় রেখার তদারকের জন্য আপনি যদি দিল্লীতে আসেন তাহলে খুব ভালো হয়। চিকিৎসার ত্রুটি এখানে হবেনা. কামাক্ষী যাঁর ভাড়াটে তিনি এবং তাঁর পরিবারবর্গ খুব তদারক করছেন। Dr. Sen ভালো চিকিৎসক। কামাক্ষীর অবশ্য ইচ্ছে কলকাতায় রেখাকে নিয়ে যাওয়া, কিন্তু ট্রেনযাত্রা বোধহয় উচিত হবে না। আপনারা অবিলম্বে চলে আসুন। রেখার চেহারা বিশেষ খারাপ হয়েছে। সৌভাগ্যক্রমে রোগটা খুব শিগ্‌গীর ধরা পড়েছে। কামাক্ষীরও শরীর খারাপ। খুব অস্থিরভাবে সময় কাটাচ্ছে।

কলকাতার আর হালচাল কী? কী করে সময় কাটাচ্ছেন? এখানে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, আবহাওয়া ভালোর দিকে বদলেছে। ছাত্ররা জ্বালালে! বেকার অবস্থায় বিরক্তি লাগে।

আশা করি আপনার বাড়ীর খবর ভালো।...সুভাষ, বেবী, এদের সঙ্গে দেখা হয়? 'People's War' পড়েন? চঞ্চলের বইএর সমালোচনা প্রসঙ্গে সৌমেন ঠাকুরের উল্লেখ করাতে খুব চটে রিভিয়ুটা ফেরৎ পাঠিয়েছে। ডোবালে মশাই! সেটা ছ পয়সা খরচ করে আবার বুদ্ধদেববাবুকে পাঠালাম।

কবে আসছেন? ইতি

সমর

আসবার সময় দু এক কপি নানাকথা আনবেন।

২৪

৫. ১০. ৪২

দেবীবাবু,

মাসখানেক আগে পর পর দুবার পত্রাঘাত করেছিলাম, আপনি কি খুব ব্যস্ত আছেন? চিঠির জবাব এখন পর্যন্ত পাইনি। ভেবেছিলাম চিঠির জবাব হিসেবে আপনিই আসবেন কিন্তু সেটাও আশার ছলনা হল।

কামাক্ষী আজ সুস্থ তবিয়তে ফিরে এসেছে, আমরা ভেবেছিলাম দিল্লী দূর অসত বলে আর আসবেনা। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে মনে হল, কারণটা কী বুঝতেই পারছেন। কামাক্ষীর মুখে আপনার পরীক্ষার খবর শুনে অত্যন্ত খুসী হলাম, খুসী হয়ে পরপর দুবার চা পান করলাম। এখন কী করবেন?

রেখা এখন কেমন আছে? Operation কবে হবে? ভাবতেও পেট কুরকুর করছে। আমার ঘোরতর সন্দেহ, আমারো appendicitis হয়েছে। কিন্তু ভয়ে ডাক্তার দেখাইনা। নিজেকে প্রাণপণে বোঝাই যে gastric neuristhesia [য] হয়েছে।...কেমন আছে?

কলকাতার আর কী খবর? বিষ্ণুবাবু গত মে মাসে ভয় দেখিয়েছিলেন পূজোর [য] ছুটিতে দিল্লী আসবেন। কিন্তু কোনো লক্ষণ ত দেখছিনা। আপনার খুব সম্ভব আর এখানে আসা হবে না। সুভাষ ও বেবী কেমন আছে?

এখানে ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আর সব খবর ভালো। আমার খামের চিঠিটা একটু indiscreet হয়েছিল। সে জন্য লজ্জিত।

আসছে এপ্রিল মাসে ভাবছি কলকাতায় সুবোধ বালকের মত ফিরে যাবো। কোনো চাকরীর সন্ধান দিতে পারেন? অবশ্য সরকারী নয়।

ভালোবাসা নেবেন। উত্তর দেবেন। ইতি

সমর সেন

বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে 'কালো হাওয়া'র রিভিয়ু কাল নির্ঘাৎ শুরু করব, বইটা ফেরৎ পেয়েছি। ওর 'শাপভ্রষ্টে'র অনুবাদের কপি এখানে একটিও নেই, কলকাতায় আমার বই এর আলমারীতে খুব সম্ভব আছে।

২৫

১৫. ১০. ৪২

দেবীবাবু

আপনার চিঠি পেয়েছি। আপনার আগেকার চিঠিটা তাহলে মারা গেল। কিন্তু নিশ্চিন্ত থাকুন, শুধু চিঠিপত্রের জন্য ঘোরতর বিপদ হবার সম্ভাবনা নেই। আপনার পোস্টকার্ডটা হাতে দেবার আগে পিওনটা আবদারের সুরে তিন পয়সা চাইল, ব্যাপারটা বুঝতে পারলামনা। তারপর শেষের দিকে আপনি চমৎকার যোগ করেছেন। লিখেছেন ৯+২৫=৩১। কী ব্যাপার?

দিল্লীর খবর আগেকার মত। কামাক্ষী অফিস করছে, আমি প্রাণপণে আড্ডা মারছি, দুপুরে উপন্যাস পড়ছি, রাত্রে লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোই, সকালে ঠাণ্ডা হাওয়ায় এক চোট ঘুরে আসি। মাঝে বুদ্ধদেববাবুর তাগাদায় কয়েকটা কবিতা

ইংরেজীতে অনুবাদ করে পাঠিয়েছি, মনে হচ্ছে শিগগীরই নোবেল প্রাইজ পাবো।। পূজো [য] সংখ্যা হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডে সুবোধ ঘোষের গল্পটির অনুবাদ বেরিয়েছে, ভদ্রলোক দু এক জায়গায় অদল বদল করেছেন, ফলে দুএকটি জব্বর ভুল হয়েছে। টাকার জন্য সম্পাদককে লিখব ? আনন্দবাজারে শুনলাম আমার কবিতায় একটি মারাত্মক ভুল হয়েছে। এ ভুলটার জন্য রায়বাহাদুর খেতাব পেতে পারি, কিন্তু আর আগে মার খাবার সম্ভাবনাটাই প্রবল।

আপনি এতদিনে নিশ্চয়ই কলকাতার খবর সংগ্রহ করেছেন। সমাচার জানাবেন। বিষ্ণুবাবুর কোনো চিঠি অনেকদিন পাইনি। ওর আর একটা বই বেরুলে হঠাৎ খুব আদর করে একটি চিঠি দেবেন আশা কবি, সমালোচনার কথাটা শেষে থাকবে। আপনি কি নানাকথার সমালোচনা করেছেন ?

সুভাষ কি বাড়ী বদল করেছে ? দিন দশেক আগে ওব লেক রোডের ঠিকানায় একটি পোস্টকার্ড লিখেছিলাম, পেয়েছে কিনা জানিনা। বেবীব খবর কী ?

রেখা এখন কেমন আছে ? কামাক্ষীর কাছে শুনলাম খুব টাকা জমাচ্ছে।... আপনি হঠাৎ বেলুড় মঠে পড়াতে শুরু করলেন ? পড়াতে কেমন লাগছে ?

ক্রিসমাসে দিল্লীতে আসার চেষ্টা করুন। ইতি

সমর সেন

২৬

১৭. ১০. ৪২

দেবীবাবু,

আমার আগের পোস্টকার্ড নিশ্চয়ই দুর্গম গিরি মরু কান্তার পার হয়ে কলকাতায় পৌঁছেছে। আপনার রিভিয়ুটা স্বচ্ছন্দে পরিচয়ে দিতে পারেন। আপত্তি হবে কেন ? পরিচয়ের জন্য ধূর্জটিবাবুকে এককালে লিখেছিলাম, তিনি অন্যান্য বিষয়ে লিখেছেন এবং বাংলা কবিতার বিষয়ে আলোচনা ও প্রবন্ধ লিখছেন বলে জানিয়েছেন, কিন্তু সেগুলো ইংরিজীতে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কথাটা আকাশকুসুম হলেও ভাবতে ভালো লাগছে। একবার যদি কলকাতায় এখন ফিরতে পারি ! তবে সত্যি কথা বলতে এ বছরদুয়েক যে দিল্লীতে কাটিয়েছি সে জন্য আমার বিশেষ অনুতাপ হয়না, কামাক্ষীর চার মাসেই হাঁপিয়ে পড়াটা একটু বাড়াবাড়ি। তবে একেবারে প্রবাসী বাঙ্গালী হয়ে যাবার সম্ভাবনাটা মারাত্মক ব্যাপার। সেইজন্য ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব ঠিক করছি। এখন আপনাদের হাত।

আপনার ছাত্রীর মত কন্যা লাখে একটা মেলে, সুতরাং মিউজিয়ামে পাঠাবার

বন্দোবস্ত করুন। গত কাল রেডিওতে এলিয়ট সাহেব East Coker আবৃত্তি করলেন, চমৎকার লাগল। শুনে না থাকলে miss করেছেন। আসছে সপ্তাহে (দিনটা এখনো বলেনি, কাগজে দেখে নেবেন) Burnt Norton পড়বেন এবং তার পরের সপ্তাহে খুব সম্ভব Dry Salvages শোনার [য] তালে থাকবেন।

'চতুষ্কোণ' আপনার ভালো লেগেছিল শুনলাম। আমার মোটেই পছন্দ হয়নি। বেথা ভালো আছে শুনে খুসী হলাম। মাঝে এক বুড়োর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আচমকা লেগে গিয়ে বুকে ব্যথা হয়েছে। এখন একটু ভালো।...

কলেজ খুলছে মঙ্গলবার। সেরেছে মশাই। ইতি

সমর সেন

২৭

২৩. ১০. ৪২

দেবীবাবু

আপনার চিঠি ও পোস্টকার্ড আজ পেলাম। এখানে আমার এক মোটা শালা আছে, তাকে আপনি কলকাতায় দেখে থাকবেন। তিনিই আনন্দবাজারে 'কুচক্রী কংগ্রেস' কথা দুটো দেখেছিলেন। এবং এত জোর গলায় আমাকে বলেছিলেন যে পত্রিকা পাবার আগেই ও বিষয়ে আনন্দবাজার সম্পাদককে চিঠি লিখি। সেদিন বিকেলেই পত্রিকা পেলাম এবং দেখলাম যে কোনো ছাপার ভুল হয়নি। স্থূলেখা মোটা শালাকে সে কথা বলাতে খুব চটে যায়, বলে "আমাকে গবেট পেয়েছো ? এই দেখো ভুল,". বলে উচ্চকণ্ঠে পত্রিকা থেকে কবিতাটি পাঠ করে ওখানে যে কুচক্রী কংগ্রেস আছে সেটা প্রমাণ করে। এরপর আর কিছু বলার আছে ? গুজবে বিশ্বাস আর কোন্ শালা করে। আমার লম্বা কান মলছি।

ধূর্জটিবাবু লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েকটি চিঠি আমাকে লেখেন। তাতে বাংলা কবিতার বিশেষ করে, বিষ্ণুবাবুর ও নানাকথার বিষয়ে, অনেক কথা ছিল। ধূর্জটিবাবুর একটি ছাত্র এখানে থাকে, তার বিষয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই বলেছি। তার কাছে ধূর্জটিদা সম্বন্ধে মজার মজার গল্প শোনা যায়। সে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হলে আপনিও খুব খুসী হবেন।

বিষ্ণুবাবুকে বেলেতোড়ের ঠিকানায় পোস্টকার্ড ছেড়ে পরে মনে হল যে তিনি পুরুলিয়াতে আছেন। আর একটা কবিতার মোটা বই না বেরুলে বিষ্ণুবাবুর কাছ থেকে চিঠি পাবার সম্ভাবনা নেই।

সুভাষ তাহলে অনেক টাকার মালিক। আমার পোস্টকার্ড পেয়েছিল কি ?

এবারে আনন্দবাজারে মাণিকবাবুর গল্পটি ভালো লাগেনি। বোধহয় কোনো

অসমাপ্ত উপন্যাসের অংশ। সুবোধ ঘোষের একটা গল্প আছে, ভালো লাগা উচিত কিনা বুঝতে পারছিনা। হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে টাকার জন্য চিঠি দিয়েছি, দেখি কী হয়।

দিল্লীর খবর ভালো।...শুনছি কাল কেষ্ট এখানে আসছে, নলিনী সরকারের প্রাইভেট সেক্রেটারী হয়ে। কেষ্ট শেষ পর্যন্ত বোধহয় ছোটলাট হবে।

এখানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ এখনো চলছে। কলেজ খুলেছে, এবং দুর্ভাগ্যক্রমে ছাত্রেরা ক্লাস করতে শুরু করেছে। ফলে চেঁচিয়ে গলা ফুলে ঢোল। তার ওপরে ক্যাপস্টানের দাম পাঁচ আনা হওয়াতে আমরা সকলে Passing Show সেবন করছি। অবশ্য পরস্পরকে লুকিয়ে এক আধ প্যাকেট Cavanders কিম্বা Capstan চলে।

এখন রাত দশটা বেজে গেছে। একটু <u>বিচলিত</u> আছি। সেজন্য আর চিঠিটা বাড়ালামনা। রেখার জন্য কামাক্ষী খুব উদ্বিগ্ন আছে, কাল লম্বা টেলিগ্রাম করেছে, পেয়েছেন নিশ্চয়ই। অস্ত্রোপচার কবে হবে? আপনি বিজয়ার ইত্যাদি নেবেন। ইতি

সমর সেন

হীরেনবাবু শুনেছিলাম রাশিয়া যাচ্ছেন। কবে যাচ্ছেন? কলকাতায় চাকরী পেলে বেড়ে হয়। দিল্লীতে একটা ডিমের দাম ছপয়সা। আমি একটা মুরগী কিনে শ্বশুরবাড়ীতে রেখেছি, সেখানে ওদের একটা মোরগ আছে। রোজ একটা তাজা ডিম পাড়ে।

২৮

১২বি দরিয়াগঞ্জ
৫. ১১. ৪২

দেবীবাবু,

আপনার চিঠি পেয়েছি। উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। আগে দুপুরে চিঠি লিখতাম, কলেজ খোলা থাকাতে সেটা হয়ে ওঠে না। দুতিন ঘণ্টা চেঁচিয়ে যখন বাড়ী ফিরি তখন আর উৎসাহ থাকেনা। সর্দি লাগাতে আজ কলেজ যাইনি, কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত অশোক ছিল, কেষ্ট এই মাত্র আবার চাকরী করতে বেরুল।

কামাক্ষী আর অশোক তাগাদা দেওয়াতে টাকার জন্য হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ডে [যে] লিখেছিলাম, উত্তর দেয়নি। সুভাষ বোসের কাগজ কত আর ভালো হবে। আবার লিখব ভাবছি।

মাঝে বিষ্ণুবাবুর একটি চিঠি পেয়েছি। পুরুলিয়ার আশেপাশের পাহাড়ে খুব

ঘুরেছেন. ভ্রমণের লোমহর্ষণ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে দুটো মৃত্যু, একটি নদী ও একটি সাপের উল্লেখ আছে। আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হয়েছে।

'কালো হাওয়া'র রিভিয়ু করেছিলাম. হাবুলবাবু হারিয়ে ফেলেছেন। আবার লেখা হয়ে উঠছেনা, লিখতে গেলেই মনে হয় অনেক কাজ বাকী আছে। কামাক্ষী কলকাতায় ফিরে যাবার মতলব করছে এবং চাকরী ছাড়ার সুযোগ প্রাণপণে খুঁজছে। মাস দুয়েকের মধ্যে ২০০্ মাইনের Journalist হবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এখন বলছে ৩৫০্ মাইনে না হলে দিল্লীতে থাকা যায়না। আসল কারণটা রেখা। রেখা এখন কেমন আছে? আপনি কি এখনো বেলুড় মঠে যাচ্ছেন?

...শুনছি রেবী দিল্লী আসছে। সেরেছে।

আমাদের খবর ভালোই। ইতি

সমর সেন

এলিয়টের আবৃত্তি শুনলেন?

আপনার কবিতার বই বেরুল?

২৯

২১. ১১. ৪২

দেবীবাবু,

আপনার বই কয়েকদিন হল পেয়েছি, কিন্তু এবারে সত্যি ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হল। আপনার সব কবিতা ভালো করে এখনো পড়বার সময় পাইনি. পরে খুব গম্ভীরভাবে ও-বিষয়ে একটা চিঠি লিখব। সংস্কৃত উদ্ধৃতিটার মানে কি? মনে হচ্ছে কিছু গালাগালি দিয়েছেন। পরের চিঠিতে মানেটা লিখে জানাবেন

কাল স্নেহাংশু এসেছে। হোটেলে উঠেছে। এদিক ওদিকে কমরেডদের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে হবে। তার ওপর আজ পরপর পাঁচটা ক্লাস। রবীন্দ্রনাথের সঙ্কলন পড়াতে হচ্ছে, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর চরিত-কথাও পাঠ্য. ফলে প্রায়ই চলন্তিকা দেখতে হয়। শুনছি নাকি মেঘনাদবধ কাব্যও পড়াতে হবে। মেরেছে মশাই।

কামাক্ষী পালিয়েছে। রেখা কেমন আছে? Operation কি হয়ে গিয়েছে? ...র জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, কিন্তু সম্প্রতি আমারো মাথা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে. গত তিন মাস নাপিত ডাকিনি বলে।

আপনি কি শান্তিনিকেতনে সত্যি চাকরী নিচ্ছেন? শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্ম পল্লী-সমাজে যাবেন?

সুভাষের সঙ্গে দেখা হলে বলবেন যে নবেন্দুবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন

যে সুভাষ নানাকথার সমালোচনা যদি অরণিতে করে তাহলে আমার আপত্তি আছে কিনা। সুভাষকে বিনয় কমাতে বলুন।

বেবীর কি খবর? বেবীর ভয়ে কামাক্ষী বোধ হয় দিল্লী ত্যাগ করল।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর

৩০

1. 12. 82 [য]

দেবীবাবু,

আপনার পোস্টকার্ড কয়েকদিন হল পেয়েছি। এখনো খুব ব্যস্ত। কলেজে কাজের চাপ খুব বেশী। আগে ফাঁকি দেবার যে ক্ষমতা ছিল সেটাও কমে এসেছে। তার ওপর কেষ্ট, স্নেহাংশু, ও সম্প্রতি বঙ্কিমবাবু দিল্লীতে আছেন। স্নেহাংশু দিনের বেলা নিজের কাজে (যে জন্য দিল্লীতে এসেছে) খুব ঘোরে, এবং সন্ধ্যা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত এখানে কাটায়।

পড়াশুনো অনেকদিন বন্ধ। আপনাদের সব খবর কী? রাধারমণবাবুর একটি চিঠিতে আপনাদের কিছু কিছু খবর পেয়েছি। রেখা বাড়ী ফিরছে কবে? কামাক্ষীর সাইকেলটা কেষ্ট নিয়েছে, এ সপ্তাহেই বোধ হয় টাকা পাঠিয়ে দেবে। পূর্ণেন্দুর সাইকেলটা মাঝে খুচু দু একদিনের জন্য নিয়েছিল, রবিবার বিকেলে যথাস্থানে রেখে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লীতে ভয়ানক শীত পড়েছে, এবারে জ্বালাবে মনে হচ্ছে।

কলকাতার হালচাল জানিয়ে বড়ো চিঠি দেবেন। অশোকের কন্যা হয়েছে শুনে খুসী হলাম। অশোক এখন কোথায়? অশোক মুখুয্যের [য] কী হল ?...

সুভাষ anti-fascist Writers and Artist's Conference নিয়ে ব্যস্ত মনে হচ্ছে। মাঝে স্নেহাংশুর কাছে পুরোনো ও নতুন অনেক জাতীয় সঙ্গীত শুনলাম। কিন্তু পুরোনো গানের তুলনায় আধুনিক জাতীয় গান কিছুই হয়নি দেখছি। এমন কি 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী', এ গানের মত গানও হয়নি। কী ব্যাপার? ইতি

সমর

৩১

১৯. ১. ৪৩

দেবীবাবু,

অনেকদিন পরে আপনার খৎ এলো। মাঝে একটা পোস্টকার্ড লিখেছিলাম, সেটার উত্তরের জন্য অপেক্ষা করে করে আর লেখা হয়ে ওঠেনি। এখান থেকে বড়ো চিঠি লেখা মুস্কিলের ব্যাপার, কোনো খবর থাকেনা। তাছাড়া কলকাতার লোককে চিঠি লিখতে গেলেই নিজেকে ইঁদুর মনে হয়, দূর দিল্লীবাসীদের কাছে জাপ-আক্রান্ত বিধ্বস্ত কলকাতা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। যোশীর কাগজ পাঠ করে এমন একটা সম্ভ্রমের ভাব মনে এসেছে যে কলকাতায় চিঠি লিখতে গেলেই ভাষা নদারৎ হয়। আপনাদের সৌভাগ্যে ঈর্ষাও হয়েছে, শুনছি নাকি জাপানী উড়োজাহাজে মেয়ে-চালকেরা আসে। একটি মেয়ে নাকি ধরা পড়েছে, বেচারীর একটি ঠ্যাং নাকি কেটে বাদ দিতে হয়েছে। সে মেয়েটি খুব সম্ভব জাহানারা বেগম চৌধুরীর সঙ্গে আছে। কামাক্ষীকে বলবেন আলতাফ্ এখানে Asst. Press Advisor হয়েছে)।

এখানে জীবনযাত্রা একই ভাবে কাটছে। সম্প্রতি আটাশ দিন পরে ক্লাস করলাম, এতদিন ইম্‌তিহান্ [য] হচ্ছিল। আজ একটা ক্রিকেট ম্যাচ্ দেখতে গিয়েছিলাম, আমাদের কলেজ অল্ আউট, ২৭ করল। বাড়ী ফিরে এলাম। ভয়ানক মাথা ধরেছে। অনেক পরীক্ষার খাতা জমেছে।

আপনাদের ছাত্রী ভাগ্য খুব ভালো। এখানে মাঝে দু তিনটে ছেলে এসেছিল, টিউটর্ করতে চায়। ছাত্র দেখলেই নিজেকে ভয়ানক কাজের লোক মনে হয়, মনে হয় বিকেলে নিশ্বেস ফেলার সময়ও নেই। সব কটাকে ভাগিয়েছি। এখন কিছু আফশোষ হচ্ছে। কাঁচা টাকা কিছু পেলে মন্দ হয়না। কয়লার মন ৫৲, চাল ২০৲, জনি ওয়াকার ৩৲, Peopels' War-এর চাঁদা ৫৲। ফ্রয়েডের একটা লাইন বেড়ে লাগে (আপনার বইতে পড়েছি) : The hermit turns his back on the world.

বন্ধুবান্ধবেরা ক্রমশ কেমন বিরস হয়ে যাচ্ছে, বাড়ীতে গেলে খালি সিগারেট চায়, চায়ের নামগন্ধ করেনা। রাস্তায় বেরুবার জো নেই, টাঙ্গাওয়ালারা আর্থিক অবস্থা নিয়ে রসিকতা করে, কফি হাউসে এক কাপ কফি খেয়ে এক টাকা দিলে ভাঙ্গানো দেয়না, কাগজে I. O. U. লিখে দেয়। একটা প্যাণ্টের পেছনে দুটো গর্ত হয়েছে। লাল রং-এর জুতোটা সব সময় মাড়ি বের করে হাসে। বাচ্চাটা দশে পড়ল, এখনো দাঁত বেরোয়নি।...

সুভাষ মাঝে চিঠি দিয়েছিল। বুদ্ধদেববাবুকে বলবেন যে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজে কয়েকটি কবিতা ছাপানোর ব্যাপারে আমার কোনোই আপত্তি নেই, বিশেষ করে যখন খরচের ভাবনা আমার নয়। তবে খরচ বুদ্ধদেববাবু দেবেন আর

লভ্যাংশ আমি পাবো, এটা কী রকম কথা ? কথাটা শোনা পর্যন্ত পাতি-বুর্জোয়া বিবেক পীড়ন করছে।

আপনি নানাকথার যে রিভিয়ুটা লিখেছিলেন সেটা কোথায় গেল ?

এখানকার আর সব খবর ভালো। কেষ্ট আমার সঙ্গে আছে। প্রায়ই হারমোনিয়াম নিয়ে সঙ্গীত চর্চা করে। কবিতা সম্বন্ধে এমন সব original কথা বলে যে তাক্ লেগে যায়।

আশা করি ভালো আছেন। চিঠির উত্তর দেবেন। ইতি

সমর সেন

আমার কলকাতায় চাকরীর কী হল ?

৩২

12B, Daryagunj.
18. 7. 43

দেবীবাবু,

কেমন আছেন ? শুনলাম যে একটা চমৎকার বাড়ী পেয়েছেন, টাকায় পাঁচ সের দুধ পাচ্ছেন এবং প্রায়ই লোক মারা যাচ্ছে বলে অনেক ছুটি পাচ্ছেন।

এখানকার খবর একরকম, nothing to report. গোঁফ রাখছি, কলকাতায় চাকরী পেলে বরবাদ করব। এখানে আর একদণ্ড ভালো লাগছেনা।

...কলকাতায় ত প্রত্যেক সপ্তাহে আসেন ("আশ্চর্য জীবন"—বিষ্ণু দে) ওখানকার হালচাল কেমন ? এখানে পড়াশুনো করছি, কিন্তু কুইনিনের প্রতিক্রিয়ায় স্মরণ শক্তি অনেক কমে গিয়েছে।

আশা করি আর সব খবর ভালো। ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

৩৩

৭. ৮. ৪৩

দেবীবাবু

অনেকদিন পরে আপনার চিঠি পেলাম। বীরভূমে ভালো আছেন মনে হচ্ছে। খাটিয়া, হ্যারিকেন লণ্ঠন, ইত্যাদির কথা ভেবে রীতিমত nostalgia হচ্ছে। দিল্লীর চেয়ে অনেক ভালো।

এখানে প্রত্যহ খুচুর কাছে যাই। চা খাবার পরেই পা নড়তে শুরু করে, রোদে ঘামতে ঘামতে হানা দিই। অনেকদিন দেখি খুচু ঘুমোচ্ছে। প্রায়ই বলে, দিনে আঠারো ঘণ্টা খাটতে হয়। তাছাড়া প্রায়ই আলোচনা করে ; তর্কের সুবিধে নেই, আমি তর্কের পাশ কাটিয়ে যাই। রাত দশটার সময় তুতুর মত মুখ করে বাড়ী ফিরি। আজকাল ঘুম অনেক কমে গিয়েছে, বোধ হয় কুইনিনের প্রতিক্রিয়া। কলেজে সকালে ক্লাস হয়। আমার বাংলা পিরিয়ড দশটা, ইংরিজী সাতটা। কলেজের মতলব হৃদয়ঙ্গম হচ্ছেনা।

আপনাদের খবর দেবেন। কামাক্ষীর চিঠি এখানে এসে মাত্র একটা পেয়েছি। সপ্তাহে কবার কলকাতায় যান ?

আশা করি আর সব খবর ভালো। বেবী কি অফিসার হয়েছে ? বলছিল যে সত্বর চাকরীর উন্নতি হবে। সুভাষের সঙ্গে কলকাতায় মুলাকাৎ হয় ? Peoples' War ত আর পড়া যায়না। ইতি

সমর

৩৪

১০.৮.৪৩

দেবীবাবু,

অনেকদিন হল আপনার চিঠি পেয়েছি, সাংসারিক চিন্তায় এবং অলসতায় ব্যস্ত থাকাতে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল।...কল্পনা করছি, আপনারা সন্ধ্যায় টিমটিমে কেরোসিনের আলোয় মশা মারতে মারতে প্রেমালাপে মশগুল। দূরে এবং কাছে শেয়াল ডাকছে। দিনে পাঁচ সের দুধ খাচ্ছেন। ভাবলেও রোমাঞ্চ হয়। তবে পঞ্চম বাহিনী মাঝে মাঝে অসুবিধেয় ফেলতে পারে, ওরা সবার পাকা ধানে মই দিয়ে বেড়ায়। রাত্রে রুটি খাওয়া সত্ত্বেও পঞ্চম বাহিনীর জন্য সকালে বাহ্যে হয়না, বুঝতে পারি বাহ্যসংসার কত খারাপ। Peoples' War পড়ি, নিয়মিতভাবে পড়ি। সোমবার দিন কাগজটার অংশ রান্নাঘরে পাওয়া যায়। Waste and void, waste and void and darkness on the face of the deep. গত রোববারের আগের রোববার স্টেটস্‌মানে কলকাতার ছবি এবং P. W.তে অনাহারী চট্টগ্রামবাসীদের জাপ-বিরোধী-যাত্রার ছবি মিলিয়ে দেখে পুলকিত হয়েছি।

আপনাদের আর সব খবর কী ? বেবী পাশ করে চিঠি দিয়েছে, মণীন্দ্র একটা বই পাঠিয়েছে তাতে হনুমান জাম্বুবান সীতা সরমা রাম লক্ষ্মণ মার্কসের ভাষায় কথা বার্তা বলছে। হনুমানের মৃত্যুবাণ হরণের নব interpretation জব্বর হয়েছে।

কেষ্টর 'বিদ্যাসুন্দর' বেরিয়েছে। তাতে বিদ্যার পরিচয় শেষের দিকের নোটে আছে আর সৌন্দর্যের কথা, সেটা ঈশ্বর বুঝবেন।

আমাব মেয়ে বই দেখলেই পড়তে চায়, বুদ্ধদেববাবুর বই হাতে দিতে শুরু করেছি। পড়ার পর যা দুরবস্থা হয়।

আমি কবিতায় নাটকে fundamental আলোচনার চেষ্টায়, কুইনিনে মহানন্দে সময় কাটাচ্ছি। তবে দিল্লীর এ পারিজাত বন কলকাতার খবরে এবং ছবিতে বিচলিত হয়।

ভালোবাসা নেবেন...। ইতি

সমর সেন

৩৫

১৬.৩.৪৪

দেবীবাবু,

বেশ কিছুদিন আগে, এবং অনেকদিন পরে, আপনাব একটি চিঠি পেয়েছিলাম। কবিতার ইংরিজী অনুবাদ চেয়েছিলেন। বিশ্বাস করুন, সে চিঠিটার কথা বেমালুম মনে ছিলনা। আজকে হঠাৎ মনে পড়েছে।

আপনাদের কবিতা পাঠাবার সময় নিশ্চয়ই হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ইংরিজী অনুবাদের কথা ভাবলেই ফ্রি স্কুল স্ট্রীট আর এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের কথা মনে পড়ে। সেজন্য বিশেষ উৎসাহ হচ্ছেনা। আশা করি কিছু মনে করবেননা।

আপনাদের খবর কী? হঠাৎ চিঠিপত্র লেখা আপনারা দুজনেই বন্ধ করেছেন কেন? সংকেতের সম্পাদক বলে? আপনারা দেখালেন। কামাক্ষী ত দিল্লী থেকে প্রত্যাবর্তনের পর একেবারে নিরুত্তর। আপনি কি নবদ্বীপে বোষ্টমদের আখড়ায় যাতায়াত করছেন?

যদি কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে তাহলে মে মাসে সাক্ষাৎ হবে।...রেখা আচার খেতে শুরু করেছে বোধহয়।

আমাদের খবর ভালো। বীথি আমাকে আজকাল প্রায়ই বাঙ্গাল বলে।

কাগজ বের করবার সম্মতি পেয়েছেন? এখানে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন হয়ে গেল। অনেক বড়ো চাকুরে উঁচু জায়গায় গিয়ে বসেছিল। বেশ ভালো লোক সবাই। ফিলম্‌ও তুলল দেখলাম। সাহিত্য-কেনা [য] সভার কোণে ইঁদুরের মত বসেছিলেন। আমি অনিবার্যকারণে suit পরে গিয়েছিলাম বলে সবাই (যারা চেনে) ঘেন্নার চোখে তাকাচ্ছিলেন। বাড়ীতে ফিরে এসে শিব উলঙ্গ হয়ে স্নান করে স্বস্তি হল।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

বুদ্ধদেববাবু নাটক কেমন হল ? বিষ্ণুবাবুকে যুদ্ধের পর আরউইন বিলেতে নিয়ে যাবে শুনছি, বিষ্ণুবাবু নাকি নোবেল প্রাইজ পাবেন। সে সময় যদি রিপনে একটা চাকরা পাওয়া যায়।

৩৬

৩১.৩.৪৪

দেবীবাবু

আপনার একটি চিঠি কয়েকদিন আগে পেয়েছিলাম, কিন্তু ব্যস্ত ছিলাম বলে উত্তর দিতে দেরী হয়ে গিয়েছে। হাতে ছাত্রছাত্রী ঝুলছে, একটা ছাত্র চোখ গুলি গুলি করে এক ঘণ্টার জায়গায় রোজ পৌনে দুঘণ্টা পড়ে যায়, তাকে পড়িয়ে ইংরেজী বেমালুম ভুলে গিয়েছি, গাল ভেতরে ঢুকে গিয়েছে। মেয়েটি ভালো ; মেয়ে জাতটাই বোধহয় মিষ্টি।

আজকে আপনার অন্য চিঠি পেয়ে কবিতার অনুবাদগুলো খুঁজে বের করেছি। সেগুলো পাঠাচ্ছি। ইংরেজী অনুবাদ ছাপাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই, তবে আপনার তাগিদ। নতুন কবিতার অনুবাদ হয়ে উঠবেনা মনে হচ্ছে। পুরোনো কবিতা এদিকে গর্ভস্রাবের মত লাগে। কিন্তু নিরুপায়।

আমাদের সময় এক রকম কাটছে। মাঝে খুব ঝড় বৃষ্টি হল, ফলে এবারে গরম এখনো পড়েনি। কলেজ ঢিমে তালে চলছে। মাঝে উদ্‌ভ্রান্ত গতিতে স্টেশনে তরল সান্ত্বনার জন্য গিয়েছিলাম, বলল ডিনার খেতে হবে, ১০০ মাইলের সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট দেখাতে হবে, তাহলে পাওয়া যাবে। নতুন কিছু ঘুঁষ। গৃহে প্রত্যাগমন করলাম।

এখানকার আড্ডা জমছেনা, বুড়ো মিনসেরা গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্যারম খেলে।

মে মাসে আশা করি দেখা হবে।...

ইতি

সমর সেন

৩৭

২১.৬.৪৪

দেবীবাবু

ট্রেনে ভালোভাবে এসেছিলাম। এখানে এসে খবর দেবার মত কিছু ছিলনা, তাই ইচ্ছে করে চিঠি লিখতে দেরী করলাম। কাল থেকে অফিস করছি। এ দুদিন কোন কাজ দেয়নি। তবে কাল থেকে সকালে সাড়ে চারটার সময় বেরুতে হবে। এর পরের সপ্তাহে শুনছি সন্ধ্যে আটটা থেকে রাত আড়াইটে পর্যন্ত কাজ করতে হবে। তোফা চাকরী। চক্রবর্তীকে বলে রাখবেন যে আমি শিগগীরই ফিরব। ওর যদি অন্য কোনো লোকের দরকার হয়, তাহলে কাউকে ঠিক করার আগে যেন আমাকে খবর দেয়। Service-এ চাকরীটা হাত ছাড়া হলে খারাপ হবে, কারণ কলেজ থেকে resign করেছি।

আপনাদের হালচাল বিষয়ে লিখবেন। আমাদের firm সম্বন্ধে আর কিছু ঠিক করলেন? আপনি কি বিদ্যাসাগরে ফিরে যাবেন? কলেজে আর ঢুকবেননা মশাই।

আজ এই পর্যন্ত। এখন নটা বাজে (রাত)। বিছানায় ঢুকব ভাবছি, সকালে উঠতে হবে। ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর

৩৮

৬. ৭. ৪৪

দেবীবাবু

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। আপনি তাড়াতাড়ি কিছু ঠিক না করতে বলে যা লিখেছেন, ভালোই বলেছেন। এখানে এসে তাড়াহুড়ো করে কলেজের চাকরীটা ছেড়ে দিয়ে বোধহয় ভালো করিনি। যেখানে ঢুকেছি সেখানে এক বছর কাজ করলে সতেরো দিন ছুটি। আর একটা shift যখন অভ্যেস হয়ে আসে তখন নতুন সময়ে আসতে বলে। এখন সাড়ে দশটা—সাড়ে চারটা করছি। যাতায়াতের সময় গরমে মাথার চাঁদি ফাটে। কিন্তু খাটুনীর ফলে, লোকে বলছে, শরীর ভালো হয়েছে। পায়ে দিব্যি muscles হয়েছে। আর পাছায় যে টোল পড়ত, সেটা অনেকটা ভরে গিয়েছে।

এসব ছাড়াও, চাকরী ছাড়তে অনেক হাঙ্গামা। মাইনে পেতে কেউ বলছে দু মাস হবে, কেউ বলছে মাস চারেক হলেও হতে পারে। কলেজ থেকে কী করবে সেটাও জানিনা। ভবিষ্যত অনিশ্চিত।

কামাক্ষীকে বলবেন যে খুড়ো দু একদিন বেশ অসুস্থ হয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনের

জন্যে চিঠিটা পাঠিয়েছেন কিনা আজ খোঁজ করব। 'সংকেত' সম্বন্ধে আর কোনো খবর পেলেন ?

দিলীপকে তাতানোর দরকার। মাঝে মাঝে দেখা হলে মনে করিয়ে দেবেন, আর খুব উৎসাহ দেখাবেন। তবে শুনছি সরকার থেকে কি একটা হুকুম জারী করেছে, তাতে নাকি বিজ্ঞাপন দেওয়া কমাতে হবে। খবরটা ঠিক জানিনা।

আপনার অফিসে কেমন লাগছে। কলেজের জন্য nostalgia হয় ? আশা করি আর সব খবর ভালো। এখানে আজ থেকে বোধহয় বর্ষা শুরু হল। ইতি

সমর

[চিঠির সম্বোধনের ওপরে উল্টো দিকে আড়াআড়িভাবে লেখা] anti V. D-র একটা ভালো বিজ্ঞাপন Statesman-এ দেখলাম।

৩৯

১৬. ৮. ৪৪

দেবীবাবু

আপনার চিঠি কয়েকদিন হল পেয়েছি। আপনার উত্তর পেতে দেরী হওয়াতে ভেবেছিলাম আরো দু একটি ছাত্রছাত্রী জোগাড় করেছেন। ছকুবাবুর সঙ্গে নতুন বন্দোবস্ত করলেন কেন ? রংমশালের জন্য খাটছেন ?

জীবনযাত্রা বড়ো এক ঘেয়ে লাগছে। আজকাল মাঝে মাঝে সকালের দিকে পূজোর [য] আবহাওয়া হয়. 'কন্তু বেল পাকলে আমার কী লাভ। দিল্লী আমাকে খেলে।

বিষ্ণুবাবুর কাজ হওয়াতে আপনি নিশ্চয়ই আশ্বস্ত হয়েছেন। পেছনে লাগবার সময় কর্তা কম পাবেন। সুভাষের সঙ্গে দেখা হয় ? কেমন আছে ?

আপনারা দুজনে যদি আসেন ত বেড়ে হয়। তবে এরকম ইয়ার্কি আপনি আগেও দু একবার করেছেন বলে ঠিক বিশ্বাস হচ্ছেনা। সত্যি যদি ঠিক করে থাকেন তাহলে বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে গরীবখানায় আসতে পারেন।

দাদা, গাবু এদের সঙ্গে দেখা হয় ? মাঝে আমার বোনের বিয়ে (বোধহয়) হয়ে গিয়েছে। একেবারে blitz ব্যাপার।

আশা করি আপনাদের আর সব খবর ভালো। খুচুর Orchitis হয়েছিল। এখন ভালো আছে। ইতি

সমর সেন

৪০

27. 8. 44

দেবীবাবু

আপনার খুদে চিঠি পেলাম। আপনাদের ওখানে ইঁদুর বেড়েছে, আমাদের এখানে আজকাল প্রায়ই সাপ আনাগোনা করছে। দিন পোনেরোর মধ্যে গোটা চারেক মারা পড়েছে, প্রত্যেকটাই চন্দ্রবোড়া। অবশ্য বাড়ীর ভেতরে এখনো মহাশয়রা প্রবেশ করেননি, আশেপাশে আনাগোনা করছে। দিনে অফিস, রেতে সাপ।

এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য খবর আর কিছু নেই। চুতিয়া হয়ে গিয়েছি, সৌখীন গোঁফ্ ঝুলে পড়ছে। আপনারা তবু লেখাপড়া নিয়ে আছেন, আমার সেসব বালাই ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তবে সুভাষকে বলতে পারেন যে historical sense কিছুটা আবার ফিরে এসেছে, সুভাষরাই আমাদের ভরসা।

আপনি দিল্লীতে এলে খুসী হবো, বলা বাহুল্য। আসবার কোশীশ্ [য] করবেন। তবে না আসা পর্যন্ত বিশ্বাস নেই। আপনি অনেকবার দেখিয়েছেন। অশোকের একটা চিঠি কাল পেয়েছি। অক্টোবরের প্রথমে দিল্লীতে আসতে পারে বলে লিখেছে। কলকাতায় গিয়েছিল, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল? বিষ্ণুবাবুর সম্বন্ধে একটি চল্‌তি ইয়ার্কির কথা লিখেছে: বিষ্ণুবাবুর বাড়ীর সামনে সাহেবরা কিউ করে দাঁড়িয়ে থাকে, পোনেরো মিনিট দর্শন আর sweetness and light পায়।

আমার অনুবাদগুলো ফেরত পাঠাচ্ছি। কার্কমানের অনুবাদ ভালোই হয়েছে দু একটা জায়গায় আমি কিছু লিখে দিয়েছি যাতে মূল কবিতার অর্থ স্পষ্ট হয় মূল কবিতাটা সুবিধের নয়।

প্রথম তিনটে লাইন আলাদা করে quotation-এর মত ছাপাতে পারেন (the nomadic...impending mountain', কারণ ওটা অনেকটা Inferno থেকে নেওয়া। সেটা যদি করেন তাহলে Jupiter ইত্যাদি বাদ দিতে পারেন।

নতুন অনুবাদ করার মত মানসিক অবস্থা নেই। আপনি যদি করতে পারেন তাহলে ভালো হয়। ..

...ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

৪১

১৯. ৯. ৪৪

দেবীবাবু

আপনার চিঠি পেলাম। আমি ভেবেছিলাম যে আপনি হয়ত ইতিমধ্যে ছকুর চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন; রংমশাল থেকে এত লাভ করছেন যে বাড়ীতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে সিগারেট খাচ্ছেন।

এদিকে আমাকে দ্যুতিনবাব লিখেছেন যে...দিল্লীতে আসবেন; ওদিকে হিমালয়যাত্রার ব্যবস্থা পাকা করে প্রায় এনেছিলেন। বামুনে বিশ্বাস নেই বলে খুব বেশী আশ্চর্য হইনি। কিন্তু ঘোর কলি হলেও ন্যায়ধর্ম একেবারে লোপাট হয়নি দেখছি, কারণ শেষ পর্যন্ত দার্জিলিং যাওয়া আপনাদের হলনা।

আমাদের খবর ঠিক এক রকম। শালারা আমার একটা off day মেরেছে। বেটাচ্ছেলেদের জব্দ করার একমাত্র উপায় কোনো অসুখ বাঁধিয়ে বাড়ীতে বসে থাকা; কিম্বা studio-তে বিষ্ঠা ত্যাগ করে আসা। আমার আবার কোষ্ঠকাঠিন্য, নইলে চেষ্টা করে দেখতাম।

যুদ্ধ ত (ইউরোপে) প্রায় শেষ হয়ে এল। আমার একটা জর্মান কলম আছে। সেটা দিয়ে জর্মান বেটাদের রোজ এক একটা জায়গা থেকে হটাই। কাগজ কলমের ব্যাপার যদিও, তবুও একটু চিত্তপ্রসাদ হয়। Russia at War পড়ে বেটাদের ওপর হাড়ে হাড়ে চটে আছি।

মাঝে অনেকগুলো আমেরিকান ভাল্লুক পাওয়া গিয়েছিল, ঊর্ধ্বশ্বাসে শেষ করেছি।

ক্ষুদে 'পরিচয়' দেখেছেন? 'নবান্ন' কি অভিনীত হয়েছে? সুভাষদের জয় জয়কার। ভাবছি আর একটা বড়ো কবিতা সুভাষকে উৎসর্গ করব।

এখানে আসার মতলব কি একেবারে ত্যাগ করেছেন? চিঠিতে ত উল্লেখমাত্র করেন নি।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

৪২

১০. ১০. ৪৪

দেবীবাবু

আপনি তাহলে বোম্বাই যাচ্ছেন। বম্বেতে প্রকাণ্ড বাড়ী আছে বটে, তবে জুম্মা মসজিদ কিম্বা লাল কিল্লা নেই। আপনি চিঠির শেষে ফিরতি পথে দিল্লী আসার

যে শুভ কামনা প্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ে কিছু না লেখাই ভালো। বারবণিতা ও বামুনের কথায় বিশ্বাস আমার নেই। তবে আপনিও যে গতানুগতিক বামুন সেটা জানা ছিলনা।

এখানকার খবর—শালার কোনো খবর নেই। তবে আজকাল রাত একটার সময় অফিস থেকে ফিরি। তার ওপর দিন তিনেক হঠাৎ বেজায় ঠাণ্ডা পড়েছে।

দার্শনিক আলোচনার সুযোগও ফুরিয়ে গেল। কাল খুচু আমাদের কাঁদিয়ে ও পথে বসিয়ে আজমীর চলে গেল; ওখানে চাকরী পেয়েছে। তবে খুচু কেষ্টর চেয়ে ভালো। একটা রাইটিং টেব্‌ল আমাকে দিয়ে গিয়েছে, তার জন্য দাম নেয়নি। টেব্‌লটার কথা যখন বলল তখনি এত আশ্চর্য হয়েছিলাম যে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম।

এখানে I. F. A. vs Delhiর খেলা দেখতে গিয়ে মুখ নীচু করে ফিরতে হল। অনেক লোক হয়েছিল, জঙ্গী লাটও ছিলেন। দু টাকা চার আনার সীটে গিয়েও শালা বাঙ্গালীদের জেতাতে পারলামনা।

...আপনারা দুজনেই আমার ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর সেন

সুলেখা খুব সম্ভব বায়োস্কোপ দেখতে গিয়েছে। ওর হয়ে বিজয়ার প্রীতি-সম্ভাষণ আমিই জানাচ্ছি। সুলেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকলে চিঠিটা পাঠাতে ভয়ানক দেরী হয়ে যাবে।...আপনারা ফিরতি পথে এলে খুশী হবো বলা বাহুল্য।

৪৩

২৯।৭

দেবীবাবু,

শুনলাম নাকি বম্বে থেকে আপনি আমাকে অনেক অনেক চিঠি লিখেছেন, কিন্তু কোনো উত্তর পাননি। বেড়ে আছেন। যাহোক, কলকাতায় ফিরে এতদিনে নিশ্চয়ই আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরেছেন, এবং চিঠি লেখবার সময় পাবেন। কী করছেন? ফেরবার পথে দিল্লী হয়ে গেলে পারতেন। চিঠি লিখবেন।

ইতি

সমর

৪৪

১২।৮

দেবীবাবু

আপনার চিঠি পেয়েছি। তাহলে আপনি বম্বে থেকে কোনো চিঠি লেখেননি। ভেবেছিলেন যে সার আম্বালাল সারাভাই-এর মতো বিরাট টাকা জমিয়ে একেবারে চমকিয়ে দেবেন। আপনি বম্বেতে যাবার পর আমাদের অনেকের মাথায় ঢুকেছিল যে রেলের টিকিট একবার কেটে ওখানে পৌঁছুতে পারলেই হয়, ফিলমসুন্দরীরা আর কুবের এক সঙ্গে হাত হয়ে যাবে।

টাকা ব্যাপারটা মশাই কিস্সু নয়। অবশ্য কবিতা, গান ইত্যাদিও কিস্সু নয়। আসলে কিছুই কিস্সু নয়। সবচেয়ে জরুরী জিনিষ হচ্ছে সকাল বেলায় কোষ্ঠ পরিষ্কার করে পাইখানা, রাত্রে ঘুম...অফিসে সাহেবের সোনা বাঁধানো দাঁতে হাসি, আর মাঝে মাঝে তরল সান্ত্বনা। এসব যদি ভালো না লাগে তাহলে কম্যুনিষ্ট হয়ে যেতে পারেন। আমার মাঝে মাঝে ভয়ানক ইচ্ছে হয়, কিন্তু মাত্র ৩৫-এ চলবেনা।

শিগগীরই কলকাতায় দেখা হবার সম্ভাবনা আছে। আপনি কথা বলবেন কিনা সন্দেহ, হাতে টিউশ্যনী আছে; আমার হাত বোধহয় বেমালুম খালি থাকবে। যাই হোক্, কলকাতায় জমবে ভালো।

...ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর

৪৫

৩০।১১

দেবীবাবু,

আপনারা দু' ভাই স্বর্ণগর্ভ স্তব্ধতার আশ্রয় নিয়েছেন কেন বুঝতে পারছিনা। আশা করি ভালো আছেন। খবর দেবেন।

কলকাতায় থাকার সময় সুভাষ টাকা চেয়েছিলো। আপনার নামে একটা চেক পাঠাচ্ছি. চেকটা ভাঙ্গাতে দিন পোনেরো সময় লাগবে, কারণ ব্যাঙ্কটা দিল্লীতে। আপনার হাতে টাকা থাকলে সুভাষকে আগাম দিয়ে দিতে পারেন।

ভালোবাসা নেবেন। ইতি

সমর

৪৬

২০।১২।৪৫

দেবীবাবু

গোস্তাকি মাপ্ করবেন। পোস্টকার্ডের এ পিঠে লিখতে বাধ্য হলাম, কারণ খাম কিনতে কিনতে এ মাস কেটে যাবে। বেজায় শীত। অফিস, বাড়ী, লেপ, এই করে সময় কাটছে। ভোরবেলায় যে পোষাকে বেরোই, তাতে অনেক কুকুরের পিলে চম্‌কে যায়।

আমার পদোন্নতির খবরটা ভুল। দিলীপকে বলবেন। আপনাদের বিজ্ঞাপনী ব্যবসার কথা শুনে আবার ধড়ে প্রাণ এসেছে। কতদূর এগোল ?

বাংলা কবিতার উপর প্রবন্ধটা (M. Miscellany) পড়িনি। আজ ধরব। আশা করি খবর সব ভালো। ইতি

সমর

৪৭

৫।৫।৪৭

দেবীবাবু

আপনার সে কাজের কথা মনে আছে। কোনো গুপ্ত কিম্বা প্রকাশ্য খবর পেলেই জানাবো। সেই টেকো ভদ্রলোকটির সঙ্গে একদিন দেখা হয়েছে, তিনি নিজের ছেলেকে ভালো চাকরীতে বিলেত পাঠিয়ে এত খুশী আছেন অন্যান্য বিষয়ে আলাপ করা গেলনা।

এখানকার খবর কাল থেকে ভালো। এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়ে বেড়ে লাগছে। নলিনীবাবুর কাছে রাখা বারো বোতল mythical ভাল্লুকের কথা খালি মনে পড়ছে।

আমার বড়ো চাকরীর কথা অনেকটা কংগ্রেস-লীগ ঐক্যের মত অসম্ভব ব্যাপার। গুজবে কান দেবেন না।...ইতি

সমর

৪৮

৬. ১১. ৪৭

দেবীবাবু

আপনার চিঠি দিন তিনেক আগে পেয়েছি। বাড়ীতে একজন অতিথি থাকাতে

ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম বলে জবাব দিতে দেরী হয়ে গেল। যে ভদ্রলোক ছিলেন তাঁর সঙ্গে একদিন গান্ধিজীর কাছে গিয়েছিলাম। বিরলা-হাউসে যাবার আগে একটা হোটেল হয়ে গিয়েছিলাম, ফলে দু জনেরই অবস্থা রীতিমত 'বিচলিত' ছিল। মহাত্মা গন্ধ পেয়েছিলেন কিনা সেটা আমরা ধরতে পারিনি। বুড়ো কিন্তু বেড়ে লোক। ইংরেজীটা এতো ভালো বলে যে তাতেই আমি impressed.

এখানে মাঝে খুব হৈ চৈ হয়ে গেল। পরে শুনলাম আমাদের খুব ফাঁড়া কেটেছে। আপনাদের ওখানে tension (মন কষাকষি) কেমন ?

আপনি বম্বে মাদ্রাজ বর্ধমান অনেক জায়গা ত ঘুরলেন, দিল্লীতে আর আসতে পারলেন না। একবার কোরশীশ [যি করবেন।

চাকরীটা এখনো ছাড়িনি, বুড়োরা ভয়ানক তাড়া দেওয়াতে একটা 'representation' করেছি। মতলব আছে সমর্পণে জবাব দেওয়া। দেখা যাক্ কী হয়।

গীলু কি বম্বেতে ? আপনি রীতিমত শ্যালীবাহন হয়ে তাহলে আছেন। ইতি

সমর

৪৯

১৯. ২. ৫২

দেবীবাবু

আজ প্লেন ছাড়েনি। খুব সম্ভব কাল রওনা হবো। আজ সকালে পি. কে. র সঙ্গে দেখা করেছিলাম ; যদি পূরণ চাঁদ নন্দীকে বলেন তাহলে খুব কাজ দেবে।

অশোক দিল্লী স্টেশনে এসেছিল. নানা ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছে। না থাকলে অসুবিধেয় পড়তাম।

ঠিক জানিনা, কিন্তু মনে হচ্ছে কামাক্ষীর কয়েকটা বই, কাগজে মোড়া, শেষ পর্যন্ত হয়ত কোনো বাক্সে রাখা হয়নি। দাদাকে একবার জিজ্ঞেস করবেন। শোবার ঘরে না থাকলে নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে।

আসবার সময় গীতা ও সুভাষের সঙ্গে দেখা হলে ভালো হত।

সুনীল ও শোভাকে ভালোবাসা দেবেন। আপনিও নেবেন ও অন্যান্যকে দেবেন।

পূরণ চাঁদের কথা ভুলবেন না। সেই জন্যই তাড়াতাড়ি এইটা লিখছি।

সমর

৫০

৩০. ৪. ৬০

দেবীবাবু,

আপনার বই ত খুব বেচে, তাহলে অর্থকষ্টের কী কারণ? আর একতলা গড়বার মতলব না কি? এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমার একটা বোঝাপড়া হয়েছিল, সেটার কথা ভুলে যাবেন না। খুব সম্ভব জানুয়ারিতে ফিরব। তার আগে অবশ্য একবার নোকরীর খোঁজ নিতে হবে।

ফিরে এসে গেঁড়াকলে পড়েছি—আড্ডার বেজায় অভাব। যাহোক, ইংরেজরা শুনেছি অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে থাকে, স্কচ খায়, বইপত্র পড়ে। আমিও চেষ্টা করি সেভাবে সন্ধ্যেবেলা কাটাতে। গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে, মাঝে মাঝে রেখা ও অলকার কথা ভেবে মন কেমন করে উঠলে দু এক ঢোঁক খেয়ে নিই।

একদিন রুশী মেয়ের সঙ্গে জুটে-পড়া একটি অবাঙালীর বাড়িতে সকালে গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক প্রথমে অল্প কনিয়াক, তারপর কাঁচা ডিম দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খেলেন। ভদ্রমহিলা একটা ডিম আর চিনি। সুলেখাকে বলাতে কয়েকদিন আমাকে ডিম-দুধ খাওয়াল। ফলে বায়ুরোগ। ছেড়ে দিয়েছি।

সুনীল ও শোভার কথা বলবেন না। বীথি জুজু ও সুলেখার ছবি বলেছিল পাঠিয়ে দেবে। কিন্তু তার কোনো আশা নেই। ঐ-রকম আত্মকেন্দ্রিক দম্পতি কখনো দেখিনি।

শমিতা ব্যানার্জি নামের একটি ভদ্রমহিলা কাল ফোন করছিলেন—উমার কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে এসেছেন। আজ হয়ত দেখা হবে: সকালে স্নান সেরে টাই ইত্যাদি পরে বসে আছি ফোনের অপেক্ষায়। ওঁর বয়স কত জানিনা।

সুভাষ কেমন আছে? আর গীতা?

গরমের ছুটিতে কোথাও যাচ্ছেন না কি?

কামাক্ষীকে বলবেন একদিন বুইয়া-র সঙ্গে দেখা হওয়াতে জিজ্ঞেস করল—How is your better half? পরে বুঝলাম কামাক্ষীর কথা জিজ্ঞেস করছে। একেই বলে গুরু মারা চেলা।

কাল পয়লা মে। মন উড়ু উড়ু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ত জমবেনা।

ভালোবাসা নেবেন ও অলকাকে দেবেন।

সময়

আমার রাগ বিদ্বেষ একেবারে কমে গিয়েছে। আপনার ওপর চটব কেন?

৫১

৫. ৩. ৬১

দেবীবাবু

সেদিন তো আর দমদমে এলেন না। এলে হয়ত বাড়ি ফেরার পথে কোথাও নেমে যেতেন।

এখানকার খবরে কোন বৈচিত্র নেই। আপনার বই-এর বিষয়ে নতুন কিছু শুনলেন? কোথায় খোঁজ নিতে হবে জানলে চেষ্টা করতাম।

ফিরে এসে সাধুর মতো জীবন যাপন করছি। তবে তান্ত্রিক সাধু নয়। এমন কি কারণবারিতে অরুচি। অফিসের কাজে সকাল কাটে, সন্ধ্যেবেলাগুলো নিয়ে মুশকিল। জুজু বলছে আমরা হলাম অনেকটা 'A' class prisoner এর মতো। কথাটা আমার বেশ লেগেছে।

অলকা কেমন আছে? আপনাদের কাগজ থেকে পার্টি দিচ্ছেন না তো? কিছু দিন সবুর করুন। ভালোবাসা নেবেন। সবাইকে দেবেন।

সমর

৫২

18. 7. 61

দেবীবাবু,

শনিবার (১৫ই) অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে আপনার চিঠি পেলাম। সোমবার গিয়েছিলাম খোঁজ করতে; জায়গাটা জানা ছিল না, বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে ফিরলাম। আজ সাক্ষাৎ হয়েছে। আপনার বই-এর exemplar (নমুনা কপি) আজকেই এসেছে—বেশ ভারি চেহারার দেখলাম—তবে অন্যদের দেবার মতো বই দিন পোনেরোর আগে তৈরী হবেনা। তখন দু কপি আপনাকে ডাকে পাঠাবে, আর দু কপি আমাকে দেবে। বলল বাজারে বেরোতে মাস দেড়েক দুয়েক লাগবে।

আপনি টাকার কথা ওদের লিখেছেন। ওরা বলল যে, দেশে টাকা পাঠানো নিয়ম নয়, তবে আপনি যদি অতিথি হয়ে আসেন তাহলে অত্যন্ত খুশি হবে। আপনাকে অভিনন্দন ও নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। নিমন্ত্রণ অবশ্য বেসরকারি; চিঠি লিখে সরাসরি নেমন্তন্ন করার অধিকার প্রকাশালয়ের নেই। সত্যি, আমরা থাকতে থাকতে যদি আপনি আসতে পারতেন, দারুণ জমত। কিন্তু আমাদের আয়ু বড়ো জোর মাস খানেকের।

অলকার কথা শুনে খারাপ লাগল। স্বামী মাল খেলে স্ত্রীর আলসার হয়? ওটা কি যৌন ব্যাধির মতো? আশা করি এখন ভালো আছে। কে দেখছেন?

লেবুর বিষয়ে আপনি যা লিখেছেন তাতে বিচলিত হলাম না। দারুণ নিরাসক্তি চলছে।

কামাক্ষী রেখার খবর কী? শুনলাম এমন তেরস্পর্শ চলেছে যে অন্যদের সঙ্গে কালেভাদ্রে দেখাসাক্ষাৎ হয়। কামাক্ষীকে বলবেন যে তুষারকান্তিবাবুর সঙ্গে দিন তিনেক দেখা হয়েছে।

আজ শুনলাম প্রশান্তবাবু ২১শে এখানে আসছেন। ধ্রুব কেমন আছে? আর গীতা?

সুভাষের কাগজ কেমন চলছে? বীথির সঙ্গে দেখা হয়েছে?

ভালোবাসা নেবেন ও সবাইকে দেবেন। আগস্ট মাসে আবার দেখা হবে।

সমর

সস্তায় একটা বাড়ি পাওয়া যায়না?

চিঠিপত্র

প্রাসঙ্গিক নিবেদন :

১. চিঠিপত্র-সম্পাদনার সাধারণ নীতি ও রীতি অনুযায়ী চিঠির পাঠে কোন পরিবর্তন করা হয়নি। পত্রলেখকের মূল বানান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বানান বা অন্য কোন বিষয়ে শুধু, কোথাও সংশয় উৎপন্ন হলেই তৃতীয় বন্ধনীতে 'য' অর্থাৎ 'যথাপ্রাপ্ত' উল্লেখের মধ্য দিয়ে, সেই সংশয় প্রকাশ করা হয়েছে।

তবে, সংকোচ এবং দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করে নেওয়া প্রয়োজন, এই কাজে সম্পূর্ণ সুবিচার আমরা করে উঠতে পারিনি। সীমিত সময়ের অস্বাভাবিক চাপে, সমতারক্ষার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসংগতি এবং কিছু ভ্রান্তিও, অনবধানতাবশত, থেকে গিয়েছে।

২. কোন কোন জীবিত ব্যক্তির পক্ষে অস্বস্তিজনক হতে পারে আশঙ্কায় কিছু চিঠির অংশবিশেষ বর্জিত হয়েছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিপত্রের ক্ষেত্রে বর্জনের কাজটুকু হয়েছে স্বয়ং দেবীপ্রসাদেরই অনুমোদনক্রমে।

৩. অধিকাংশ খামই পাওয়া যায়নি। প্রাপকের ঠিকানার বিষয়ে তাই পোস্টকার্ডে প্রাপ্ত তথ্যে আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

৪. পত্রধৃত প্রসঙ্গ বা টীকা নির্দেশের সময় পাঠকের পূর্বজ্ঞানের একটি স্তরকে অনুমান করে নিতে হয়েছে। তাছাড়া, যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়াও ছিল লক্ষ্য। অন্যদিকে, চিঠিতে উল্লিখিত অনেক ব্যক্তির পরিচয় বা প্রাসঙ্গিক তথ্য আমাদের এখনও অজ্ঞাত। সুতরাং ঐ বিষয়ে ভবিষ্যতে আরো সম্পূর্ণ ও আরো নির্ভুল হবার প্রতিশ্রুতি আমরা নিশ্চয় দিতে পারি।

স্বপন মজুমদার
পুলক চন্দ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমর সেন-কে

১ তোমরা কবির দল : ঈস্টার ১৯৩৮-এ বিষ্ণু দে, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু ও তাঁর পরিবার শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন।
প্রশান্ত : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, সংখ্যাতত্ত্ববিদ্ ও পরিকল্পনা-বিশারদ।
২ তোমার লেখনী : 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' প্রসঙ্গে মন্তব্য।

সমর সেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-কে

১ আমার কবিতার বইএর : 'কয়েকটি কবিতা' (কবিতা-ভবন ১৯৩৭)।
২ কলকাতায় ফিরে : দ্র. রবীন্দ্রনাথের চিঠির টীকা ১।
৩ ভ্রমণ কাহিনী : 'সবপেয়েছির দেশে' (কবিতা-ভবন, অগাস্ট ১৯৪১)।
কামাক্ষীবাবু : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কবি, শিশুসাহিত্যিক ও আলোকচিত্রী। 'লোকায়ত'র লেখক, দার্শনিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-এর অগ্রজ।
৪ দ্বিতীয় কবিতার বই : 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' (কবিতা-ভবন ১৯৪০)।

সমর সেন বুদ্ধদেব বসু-কে

১ খাম। ঠিকানা : Mr. Buddhadeva Bose / c/o Mr. Jatish Ch. Bose (Kal.../Nam-Kum/*Near Ranchi*/ CHOTA-NAGPUR.) ডাকমোহর : নাম-কুম, ২ জানুয়ারি ১৯৩৬।
কবিতা : বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা'। প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৪২ (অক্টোবর ১৯৩৫)।
মিসেস্ বোস্ : বুদ্ধদেব বসুর স্ত্রী প্রতিভা বসু, গায়িকা ও ঔপন্যাসিকা।
মিস্ বোস : বুদ্ধদেব বসুর প্রথমা কন্যা মীনাক্ষী (এখন দত্ত)।
২ খাম।
পাঠ্যপুস্তক : সম্ভবত ওরিয়েণ্ট লংম্যান্স প্রকাশিত *India Reader*।
রাম : রামনারায়ণ সিং।
মিমি : বুদ্ধদেব বসুর কন্যা মীনাক্ষীর ডাকনাম।

৩ খাম। নীল কাগজ।

পরীক্ষা : এম. এ.।

বিষ্ণুবাবু : কবি বিষ্ণু দে।

Indian Affairs : বুদ্ধদেবের চাকুরী পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছিল।

৪ খাম।

বাবু পঞ্চানন ভট্টাচার্য : সহপাঠী বন্ধু দেবীভূষণ ভট্টাচার্যের পিতা।

আপনার দীর্ঘ সমালোচনা : রবীন্দ্রনাথ সংকলিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর। 'কবিতা' ১৪। বর্ষ ৪/১ সংখ্যা, ১৩৪৫ আশ্বিন, পৃ. ৫৫-৭৫।

গুরুদেব : রবীন্দ্রনাথ।

'চতুরঙ্গ' : হুমায়ুন কবীর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা।

মিঃ আইয়ুব : আবু সয়ীদ আইয়ুব, দার্শনিক ও প্রাবন্ধিক। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে দার্জিলিং স্যানেটেরিয়মে যাওয়ার প্রসঙ্গে।

৫ খাম।

স্নো ভিউ : দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত হোটেল।

অশোকবাবু : অশোক মিত্র, সহপাঠী, পরে আই. সি. এস্.।

৬ —আগের চিঠির উল্টো পিঠে প্রতিভা বসুকে লেখা।

বর্মা যাওয়া : প্রায় দুই মাস বর্মা ভ্রমণ। সঙ্গী ছিলেন অজিত মুখোপাধ্যায় ও দেবীভূষণ ভট্টাচার্য।

৭ খাম।

৮ পোস্টকার্ড। ঠিকানা : Sj Buddhadev Bose / 202 Rashbehary Avenue / P. O. Ballygunje / Calcutta. ডাক-মোহর : ২৫ ও ২৬ নভেম্বর ১৯৩৮।

৯ খাম। সম্ভবত 21/6 Bakshi Bazar ঠিকানায় লেখা।

হীরেনবাবু : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, পরে সংসদ সদস্য।

তাঁর ভূমিকায় : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কাবিতা'র (কবিতা-ভবন ১৯৪০) অন্যতম সম্পাদকীয় ভূমিকায়।

অরুণ মিত্র : কবি ও ফরাসি সাহিত্যবিদ্।

অগ্রণীতে...সমালোচনা : সরোজ দত্ত-কৃত। বর্তমান সংকলনের পুনমুর্দ্রণ পর্যায় দ্রষ্টব্য।

চঞ্চল : চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়, কবিবন্ধু ও লাতিন ভাষাভিজ্ঞ।

ভাবী বধূ : অমিতা চট্টোপাধ্যায়।

দেবী : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কবিবন্ধু, দার্শনিক।

দুর্গানন্দবাবু : দুর্গানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদের জ্যেঠশ্বশুর।

বাবা : অরুণচন্দ্র সেন, দীনেশচন্দ্রের পুত্র, ইতিহাসের অধ্যাপক।

১০ খাম।

কাঁথিতে পাঠাবার জন্য : কাঁথি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেওয়ার প্রসঙ্গে।

অধ্যক্ষদের : অধ্যাপকদের হবে।

অন্নদাশঙ্কর : অন্নদাশঙ্কর রায়, সাহিত্যিক, আই. সি. এস্.।

Anthology : *India Reader*।

রাধারমণবাবু : রাধারমণ মিত্র, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িত, পরে কলকাতা-বিশেষজ্ঞ।

১১ খাম।

৺দীনেশ সেন : দীনেশচন্দ্র সেন, বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক-গবেষক। সমর সেনের পিতামহ।

দিল্লী থেকে প্রায়ই টেলিগ্রাম : দিল্লীর কমার্শিয়ল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে নিয়োগের জন্য।

১২ খাম।

আপনার বই : 'নতুন পাতা'। প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৪০।

'সম্রাট' : প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যগ্রন্থ; সমালোচনা করেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে। 'কবিতা' ২৪। বর্ষ ৬/২ সংখ্যা, ১৩৪৭ কার্তিক, পৃ. ৪৭-৫৩।

কামাক্ষীর বিয়ের কবিতাটা : ''সাফাই'', 'আষাঢে' (১৩৪৭), পৃ. ১২।

দেবপ্রসাদবাবুর ব্যাপারটা : দেবপ্রসাদ ঘোষ, গাণিতিক ও ভাষাবিদ্, রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজের অধ্যাপক, হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সদস্য। তরুণ কবিগোষ্ঠীর কঠোর সমালোচক।

অমিয়বাবু : অমিয় চক্রবর্তী, কবি অধ্যাপক, রবীন্দ্রনাথের একদা সচিব।

"গ্রহণ"-এর সমালোচনা : 'কবিতা' ২৪। বর্ষ ৬/২ সংখ্যা, ১৩৪৭ কার্তিক, পৃ. ৩৭-৪৮। বর্তমান সংকলনের পুনর্মুদ্রণ পর্যায় দ্রষ্টব্য।

১৩ খাম।

গায়ক : পৃথ্বীশ [?], দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা ৩নং চিঠি দ্রষ্টব্য।

বাদ্যকার : প্রতুল মুখোপাধ্যায়, সেতার-বাদক।

অতুলবাবুর অপরূপ ওকালতী : আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সমালোচনা। 'কবিতা' ২৪। বর্ষ ৬/২ সংখ্যা, ১৩৪৭ কার্তিক, পৃ. ১-১৪।

অমিয়বাবুর লেখা : "ঝর্ণা ছন্দের কাব্য", 'গ্রহণ'-এর সমালোচনা। 'কবিতা', তদেব।

অজিতবাবু : অজিত দত্ত, কবি, অধ্যাপক।

১৪ খাম। ধূসর সবুজ কাগজ। কীটদষ্ট অংশ ... চিহ্নযুক্ত।

প্রেমেন্দ্র বাবু : কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র।

উপন্যাস শেষ করলেন না কি : 'কালো হাওয়া'।

প্রবোধ সান্ন্যালের : 'দেবতাত্মা হিমালয়', 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনীর লেখক, কথাসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল।

১৫ খাম। কীটদষ্ট অংশ '...' চিহ্নযুক্ত। এই চিঠির রচনা কাল নিয়ে একটি সঙ্গত সংশয় আছে। মূল চিঠিতে অবশ্য অত্যন্ত স্পষ্টাক্ষরে ১৩. ১. ৪১ লেখা। কিন্তু সমর সেনের বিবাহের তারিখ আমরা জানি ২৮. ৪. ৪১। সুতরাং সংশয়ের কারণ পাঠক চিঠির বিষয় থেকে সহজেই অনুমান করতে পারবেন।

কলকাতার অবস্থা : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে কলকাতার জনশূন্যতার কথা।

দাদা : ডাক্তার অমল সেন, হোমিওপ্যাথ।

সুলেখা : ভাবী স্ত্রী।

জ্যোতির্ময় বাবু : জ্যোতির্ময় রায়, চিত্রকার লেখক।

সুভাষ : কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৬ খাম। মাখন রঙের ক্রস-কিজ কাগজ।

New Indian Literature : লখ্‌নৌ থেকে ভারতীয় প্রগতিলেখক সংঘ-এর তরফে প্রকাশিত সাহিত্যপত্র।

নিখিল সেন : সাংবাদিক, সাহিত্যিক, 'নারদমুনি' ছদ্মনামে লিখতেন।

শনিবারের চিঠি : সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত পত্রিকা।

'বন্দীর বন্দনা' বেরুল : দ্বিতীয় সংস্করণ : অক্টোবর ১৯৪০।

১৭ খাম। ক্রম বিষয়ে সংশয় আছে।

আমার বন্ধু : অমিতাভ সেন (খুচু), দিল্লীর বন্ধু।

জ্যোতির্ময় লাহিড়ী : ডাক নাম 'জুটলু', দিল্লীর বন্ধু।

আপনার উপন্যাস : 'কালো হাওয়া'। প্রকাশ : জুলাই ১৯৪২।

অশোক মুখুজ্যে : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহপাঠী বন্ধু।

আপনাদের youngest : রুমি বা দময়ন্তী।

'কবিতা'র সম্পাদক হিসেবে আমার নাম : প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষে সহকারী ও তৃতীয় থেকে পঞ্চম বর্ষে বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পূর্ণ সম্পাদক হিসেবে সমর সেনের নাম মুদ্রিত ছিল।

১৮ খাম। বালিগঞ্জের ঠিকানা কেটে রতন কুঠি, পোঃ শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)

এবং সে-ঠিকানা কেটে আবার বালীগঞ্জের ঠিকানা লেখা। ডাক-মোহর : ২৫, ৩০ মে এবং ১, ২ জুন ৪১।

বীরেন গাঙ্গুলী : ডাক্তার।

১৯ খাম। ডাক-মোহর : ১৮ ও ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৪১।

'সবপেয়েছির দেশে' : শান্তিনিকেতন ভ্রমণস্মৃতি। প্রকাশ : অগাস্ট ১৯৪১।

বিষ্ণুবাবুর বই : 'পূর্বলেখ', কবিতা-ভবন প্রকাশিত।

সুধীনবাবুর এক কপি বই : কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র 'উত্তর ফাল্গুনী'। সমর সেন-কৃত সমালোচনা : 'কবিতা' ৩০। বর্ষ ৭/৩ সংখ্যা, ১৩৪৮ পৌষ, পৃ. ৩১-৩৪।

লম্বা কবিতা : "নানা কথা", 'কবিতা', তদেব পৃ. ২-৭।

লাহিড়ীকে : জ্যোতির্ময় লাহিড়ী।

২০ খাম। ঠিকানা : Sj Buddhadev Bose / C/o Asutosh Shome Esq./ 15, Bakshi Bazar / DACCA / BENGAL। ডাক-মোহর : ৩১ ডিসেম্বর ৪১ ও ৩ জানুয়ারি ৪২।

"কবিতা" বেরুতে : 'কবিতা' ৩০। প্রাগুক্ত।

২১ খাম।

একটি মাত্র কবিতা : "আকাল"।

আতওয়ার রহমান্ : 'ত্রিকাল'-এর সম্পাদক। হুমায়ুন কবীরের সহকারী, 'চতুরঙ্গ' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।

কেস্ট : কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত, সহপাঠী বন্ধু।

কামাক্ষীর নতুন বই : 'শিবির' (১৯৪২)।

২২ খাম। ডাক-মোহর : ৮ ও ১০ ডিসেম্বর ৪২।

আপনার ফরমায়েসে একটি কবিতা : "উপসংহার", 'কবিতা' ৩১। বর্ষ ৭/৪ সংখ্যা, ১৩৪৮ চৈত্র, পৃ. ১৩।

২৩ খাম। ডাক-মোহর : ২৭ ফেব্রুয়ারি ও ১ মার্চ ৪২।

'এক পয়সায় একটি' : গ্রন্থমালার প্রথম বই, বুদ্ধদেব বসুর 'এক পয়সায় একটি'। প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৪২।

২৪ পোস্টকার্ড। ডাক-মোহর : ১১ ও ২০ অগাস্ট ৪২।

'২২শে শ্রাবণ' : এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালার পঞ্চম পুস্তিকা। প্রকাশ : অগাস্ট ৪২।

'নানাকথা' : সমর সেনের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ (১৯৪১)

২৫ খাম। নীল কাগজ। চিঠির সঙ্গে "পিঁপড়ের পাখা" কবিতার পাণ্ডুলিপি, বুদ্ধদেব বসুর সংশোধন-সহ।

আপনার বই : 'কালো হাওয়া'।

চঞ্চলের বই : 'বসুন্ধরা'।

রেখা : কামাক্ষীপ্রসাদের স্ত্রী।

২৬ খাম। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আমার...রিভিয়্ : 'উত্তর ফাল্গুনী' কাব্যগ্রন্থের। প্রাগুক্ত।

'টাইমস্' : এডওয়ার্ড টমসনের বাংলা কবিতা বিষয়ে প্রবন্ধ সমন্বিত 'টাইম্‌স্'-এর সংখ্যা। বর্তমান সংকলনের ইংরাজি রচনা পর্যায় দ্রষ্টব্য।

Escapist : চিঠির ইংরেজি পদ্যাংশ 'কয়েকটি কবিতা'র অন্তর্গত "মুক্তি" কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ।

'কালো হাওয়ার' রিভিয়্ : লেখাটি বুদ্ধদেব বসুর হাতে পৌঁছয়নি। তার কারণ জানা যাবে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি ২৮নং থেকে।

২৭ খাম। ডাক-মোহর : ১৭ ও ২০ অক্টোবর ৪২।

রিভিয়্ : 'কালো হাওয়া'র।

এ সংখ্যা কবিতা : 'কবিতা' ৩৪। বর্ষ ৮/২ সংখ্যা, ১৩৪৮ কার্তিক, পৃ. ৫০-৬৭।

যোগাযোগে : সংশোধন বুদ্ধদেব বসু-কৃত।

এ সংখ্যা আনন্দবাজার : ১৩৪৯ শারদীয়।

সঙ্গে আর একটা অনুবাদ : কয়েকটি কবিতা'র অন্তর্গত '১৯৩৭' কবিতার অনুবাদ "January 1937"। বর্তমান সংকলনের ইংরাজি রচনা পর্যায় দ্রষ্টব্য। Maginot Line : জর্মন সীমান্তে ফরাসি প্রতিরক্ষা-ব্যূহ।

[২৮ নভেম্বর ৪২ কলকাতার ডাক-মোহর-যুক্ত একটি খাম আছে, কিন্তু চিঠি নেই।]

২৮ খাম। কলকাতার ডাক-মোহর : ১৮ জানুয়ারি ৪৩।

হারীনবাবু : হরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, লেখক গায়ক ও অভিনেতা। সরোজিনী নাইডুর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

Boatman Boy : ওড়িশি কবি শচী রাউৎরায়ের অনুবাদ কবিতা।

'একসূত্রে' : ফ্যাসি-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘ প্রকাশিত সমর সেন-কৃত সমালোচনা : 'কবিতা' ৩৬। বর্ষ ৮/৪ সংখ্যা, ১৩৪৯ চৈত্র, পৃ. ২১৩-১৫।

কালো হাওয়ার রিভিয়্ : দ্বিতীয়বার-কৃত এই গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'চতুরঙ্গ'-এ, চৈত্র, ১৩৪৯ সংখ্যায়।

ডঃ গুহঠাকুরতা : ডঃ প্রভু গুহঠাকুরতা, বাংলা নাটকের ইতিহাসকার।

২৯ খাম।

পুনরুজ্জীবন : য়েট্‌স্-এর Resurrection নাটিকার সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-কৃত অনুবাদ।

৩০ খাম। ডাক-মোহর : ৫ ও ৭ মার্চ ৪৩।

প্রাচীর : সোমেন চন্দের স্মৃতিতে দক্ষিণ কলিকাতা ছাত্র ফেডারেশন প্রকাশিত কবিতা-সংকলন।

শচীরৎরয়ের : শচী রাউৎরায়, ওড়িশি প্রগতিবাদী কবি ও গল্পাকার।

৩১ নীল খাম। ডাক-মোহর : ১৪ ও ১৭ মার্চ ৪৩।

'অপরাজিত' : বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস।

৩২ খাম।

হাবুলবাবু : হিরণকুমার সান্যাল, 'পরিচয়'-এর একদা সম্পাদক।

ভারতী সারাভাই-এর বই-এর রিভিয়ুটা : The well of the people।

সমালোচনা প্রকাশ : 'কবিতা' ৩৮। বর্ষ ৯/১ সংখ্যা, ১৩৫০ আশ্বিন, পৃ. ২৫৮-৬১।

অজিতবাবুকে : অজিত দত্ত সম্পাদিত 'দিগন্ত' পত্রিকার জন্য।

৩৩ পোস্টকার্ড। ডাক-মোহর কলকতা ১১ অক্টোবর ৪৩।

৩৪ খাম। নীল কাগজ। ডাক-মোহর : ৭ ও ৯ নভেম্বর ৪৩।

বড়ো কবিতা : "গৃহস্থবিলাপ", 'কবিতা' ৪০। বর্ষ ৯/৩ সংখ্যা, ১৩৫০ পৌষ, পৃ. ১৪০-৪৩।

৩৫ খাম।

স্নেহাংশু : স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী, সহপাঠী, আইনজীবী।

৩৬ পোস্টকার্ড। ঠিকানা : Sri Buddhadev Bose, New Ministers' Quarters, No. 1, Narasimharaja Boulevard, Mysore. ডাক-মোহর : ১৩ ও ১৫ মে ৫৩।

মহিশূর : বুদ্ধদেব বসু য়ুনেস্কো পরিচালিত সেমিনার অব অ্যাডাল্ট এডুকেশনের উপদেষ্টা হয়ে ১৯৫৩ সালে কয়েক মাস মহিশূরে ছিলেন।

সুকান্ত : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য।

সমর সেন বিষ্ণু দে-কে

১ খাম।

২ খাম।

'কবিতায় আপনার সনেট' : 'চতুর্দশপদী', কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৫।

অশোকবাবু : অশোক মিত্র, আই. সি. এস্.।

আপনাদের কলেজ : রিপন কলেজ।

বুদ্ধদেববাবুর সমালোচনা : রবীন্দ্রনাথ-সংকলিত 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এর, 'কবিতা' আশ্বিন ১৩৪৫।

চঞ্চলবাবু : চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৩ খাম।

কেশববাবু : কেশব দে, বিষ্ণু দের মেজ ভাই।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, কবি, সুরকার।

৪ খাম।

মিসেস দে : প্রণতি দে।

দেবী : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

৫ খাম।

ধূর্জটীদা : ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সমাজতাত্ত্বিক, অধ্যাপক, ঔপন্যাসিক।

৬ খাম।

Emmerson : Lindsay Emmerson, স্টেটসম্যানের এককালীন সম্পাদক।

যামিনীবাবু : যামিনী রায়, শিল্পী।

৭ খাম।

৮ খাম।

রাধারমণবাবু : রাধারমণ মিত্র।

অনিলা : অনিলা বনার্জি (আইলিন গ্রেহাম), সহ-পাঠিনী, ডবলিউ. সি. বনার্জির পৌত্রী।

৯ খাম।

১০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : 'Bishnu Dey Esq, 1/10, Prince Golam Md. Road, Calcutta.

১১ খাম।

১২ খাম।

আপনার বই : 'পূর্বলেখ'।

খুচু : অমিতাভ সেন।

সুভাষবাবু : সুভাষচন্দ্র বসু।

ইরা ও তারা : বিষ্ণু দে-র দুই কন্যা যথাক্রমে রুচিরা [চক্রবর্তী] ও উত্তরা [বসু]।

১৩ খাম।

গাবু : সমর সেনের ভাই।

রাম সিং : রামনারায়ণ সিং।

১৪ খাম।

নিখিলদা : নিখিল সেন।

কামাক্ষী : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

১৫ খাম।

দেবীর বোনের বিয়ে : সহপাঠী দেবীভূষণ ভট্টাচার্যর বোন অপর্ণা (স্বাগতা চক্রবর্তী)।

১৬ খাম।

১৭ খাম।

১৮ পোস্টকার্ড, ঠিকানা: 'Sj Bishnu Dey, C/o Sj Jamini Roy, Beliatore Bankura.'

স্নেহাংশু : স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী।

সুভাষ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

১৯ পোস্টকার্ড ঠিকানা : তদেব।

অরুণবাবু : অরুণ মিত্র।

কবিতার বই : 'নানা কথা'।

বসন্তবাবু : বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, দার্শনিক, পণ্ডিত, কামাক্ষীপ্রসাদ – দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের পিতা।

হিরণবাবু : হিরণকুমার সান্যাল।

২০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

চঞ্চল তার বই : 'বসুন্ধরা', কাব্যগ্রন্থ।

দোদো : স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী।

২১ খাম।

পরিচয়ে আপনার দুটি কবিতা : পরিচয়, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৯ সংখ্যায় প্রকাশিত দুটি কবিতা, যাদের পরিচিতনাম 'বুড়ো ভোলানো ছড়া' ও 'আজকে এসেছি দুর্গ-শিখরে'।

২২ খাম।

মণীন্দ্র : কবি মণীন্দ্র রায়।

ফসিল ঘোষ : সুবোধ ঘোষ, সাহিত্যিক, 'ফসিল'-এর গল্পকার।

২৩ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।

দুর্যোগে আপনার বই : '২২শে জুন', কাব্যগ্রন্থ।

২২শে শ্রাবণ : বুদ্ধদেব বসুর কাব্যগ্রন্থ।

২৪ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

Fantasia : ওয়াল্‌ট ডিজ্‌নির ছবি।

২৫ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব

২৬ পোস্টকার্ড ঠিকানা : বেলিয়াতোড়ের ঠিকানা কেটে 'P. K. Mitra, Civil Surgeon, Purulia, Manbhum.'

২৭ খাম।

২৮ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
হাবুলবাবু : হিরণকুমার সান্যাল।

২৯ খাম।
আরুইন : জন আরুইন, ভারতীয় শিল্প বিশেষজ্ঞ।
বুদ্ধদেববাবু Realisation : Modern Bengali Poems (Signet)-এর অন্তর্ভুক্ত।

৩০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
Us : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত *Us—People's Symposium*, সংকলন, প্রকাশক : ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ।

৩১ খাম।

৩২ পোস্টকার্ড, ঠিকানা গোলাম মহম্মম বোডের।
ঈশ্বর গুপ্তের উপরে লেখাটা : 'ঈশ্বর গুপ্ত', কবিতা, কার্ত্তিক, ১৩৫০।
এলিয়টের উপর মহৎ প্রবন্ধটি : বিষ্ণু দে-র 'টি. এস, এলিয়টের মহাপ্রস্থান' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় পরিচয়, কার্তিক ১৩৫১ সংখ্যায়। এখানে সম্ভবত তারই কোন প্রাক-প্রকাশ প্রসঙ্গ।
ধূর্জটিবাবুর বই দুটো : সম্ভবত *Modern Indian Culture* (1942) এবং *Tagore—A Study* (1943)-র উল্লেখ।

৩৩ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
চাকুরীতে ঢুকে : অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র চাকরি।
Statistical Laboratory : তৎকালীন Statistical Institute, বিষ্ণু দে কিছুদিন সেখানে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন।

৩৪ পোস্টকার্ড ; ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
কার্কম্যান : মার্টিন কার্কম্যান, যুদ্ধের সময় সৈনিক হিসেবে আসেন, সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত *Modern Bengali Poems* (1945)-এর মুখ্য অনুবাদক।

৩৫ পোস্টকার্ড ; ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
প্রশান্তবাবু : প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ

৩৬ খাম।
জ্যোতিরিন্দ্রের বই : 'মধু বংশীর গলি' [?]

৩৭ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের ঠিকানা কেটে 'C/o K. P, Mitra, Civil Surgeon, Monghyr.' ২৬ নং চিঠির ঠিকানার নামটি সম্ভবত সঠিক ছিল না।

৩৮ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।

৩৯ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
৪০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা, তদেব।
৪১ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
নীরোদবাবু : নীরদচন্দ্র চৌধুরী, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর তৎকালীন সহকর্মী, **Autobiography of an Unknown Indian**-এর রচয়িতা।
৪২ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
৪৩ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
কবিতা ভবন : বুদ্ধদেব বসু—প্রতিভা বসুর বাসভবন, ২০২, রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, 'কবিতা' পত্রিকার কার্যালয়।
৪৪ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
৪৫ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
৪৬ খাম, পেন্সিলে লেখা চিঠি।
৪৭ খাম।
একটি মেয়ে হয়েছে : ছোট মেয়ে যূথী।
৪৮ খাম।
৪৯ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের ঠিকানা কেটে 'Sagarika, Chakratirtha, Puri.'
'সন্দ্বীপের চর' : 'সন্দ্বীপের চর', প্রথম প্রকাশ ১৩৪৪।
৫০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : গোলাম মহম্মদ রোডের।
রুচি ও প্রগতির সমালোচনা : বিষ্ণু দে-র প্রবন্ধ গ্রন্থ 'রুচি ও প্রগতি' (১৯৪৬)-প্রসঙ্গ।
৫১ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : 'Sri Bishnu Dey, Babudi, Rikhia, off Deoghur, Eastern Railway.
৫২ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।
৫৩ খাম।
৫৪ খাম।
দেবীর বই : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগ্রন্থ 'লোকায়ত দর্শন'-এর রুশ অনুবাদ-প্রসঙ্গ।

সমর সেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

১ খাম।

রাম : রামনারায়ণ সিং

২ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : K. P. Chatterjee Esq, 3 Sombhunath Pandit Street, P. O. Elgin Road, Calcutta. পোস্টকার্ডের অপর পিঠে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি।

সমর সেন চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-কে

১ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : Sri Chanchal Chatterjce, 12 Mysore Road, Kalighat, Calcutta.

তোমার বই : 'বসুন্ধরা', কাব্যগ্রন্থ।

গুরুদেব : বিষ্ণু দে।

নীরোদবাবু : নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

২ খাম।

৩ খাম।

মন্ত্রীপুত্র : পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়. আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর জামাতা প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায়েব পুত্র। প্রমথনাথ বন্দোপাধ্যায় তখন ছিলেন কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য (১৯৩৫-৪৬)।

৪ ইনল্যাণ্ড।

৫ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : মাইশোর রোডের।

৬ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

৭ খাম। চিঠিতে বছরের উল্লেখ নেই। বিষয় থেকে নিশ্চিতভাবে অনুমান করা চলে এটি ১৯৪৭ সালে লেখা।

সমর সেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

১ খাম। কাঁথি থেকে লেখা।

বেবী : সুধীর গুপ্ত।

রেখা : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

সুভাষ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

২ খাম। কাঁথি থেকে লেখা।

৩ খাম। প্রতুল : প্রতুল মুখোপাধ্যায়।

কলেজ : রামযশ কমার্শিয়াল কলেজ।

৪ খাম।

বিমলজ্যোতি : স্কটিশের ছাত্র।

গীতা : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বর্তমান স্ত্রী।

ধ্রুব মিত্তির : সুচিত্রা মিত্র-র প্রাক্তন স্বামী।

৫ খাম।

৬ খাম।

লাহিড়ী : জ্যোতির্ময় লাহিড়ী (জুটলু)।

৭ খাম।

৮ খাম।

অশোক মিত্র. পরে আই সি. এস.।

পূর্ণেন্দু : পূর্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯ খাম।

দাদার চিঠিতে : অমল সেন।

ক্ষিতীশবাবু : ক্ষিতীশ রায়, অধ্যাপক, অনুবাদক, 'বিশ্বভারতী কোয়ার্টাবলি'র একদা সম্পাদক।

১০ খাম।

১১ খাম।

দিলীপ রায় : দিলীপকুমার রায়, গায়ক, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র।

১২ খাম।

১৩ খাম।

দত্ত সাহেবের...বইটা : রজনীপাম দত্তর *India Today*।

১৪ খাম।

'গ্রহণ' : সমর সেনের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ।

সুধীনবাবু : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।

কেষ্ট : কৃষ্ণচন্দ্র গুপ্ত।

রাম : রামনারায়ণ সিং।

১৫ বঙ্কিমবাবু : বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়, শ্রমিক আন্দোলনের নেতা, কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম সংগঠক।

১৬ খাম।

১৭ খাম।

সতী ও অমলবাবু : দেবীপ্রসাদের ছোট বোন ও ভগ্নীপতি অমল মুখোপাধ্যায়।

সোমবার একটি কন্যা : বড় মেয়ে বীথি।

১৮। পোস্টকার্ড ঠিকানা : 'Debiprasad Chatterjee, 3 Sambhunath Pandit Street, P.O. Elgen Road, Calcutta

১৯ খাম।

সুকুমার দত্ত : রামযশ কলেজের এক সময়ের অধ্যক্ষ, *Supernatural in English Romantic Poetry*।

'শিবির' : কামাক্ষীপ্রসাদের কাব্যগ্রন্থ।

২০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : এলগিন রোডের।

২১ খাম।

২২ খাম।

অমিয়বাবু : কবি অমিয় চক্রবর্তী।

একটা কবিতা পাঠাচ্ছি...

ছাপা হবে কিনা জানিনা : কবিতাটি ছাপা হয়েছিল 'দুর্দিন' শিরোনামে 'প্রতিরোধ'-এর শারদীয় সংখ্যায় ১৩৪৯ সালে।

২৩ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : এলগিন রোডের।

২৪ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

২৫ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

২৬ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

২৭ খাম।

'ধূর্জটিবাবুর একটি ছাত্র' : অমিতাভ সেন।

২৮ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : এলগিন রোডের।

২৯ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

'আপনার বই' : কয়েকটি নায়ক'। 'এক পয়সায় একটি' পুস্তকমালায়।

স্নেহাংশু : স্নেহাংশুকান্ত আচার্যচৌধুরী।

নবেন্দুবাবু : নবেন্দু ঘোষ [?]

৩০ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

৩১ খাম।

৩২ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : 'Prof Debiprasad Chatterjee, Vidyasagar College, Suri, Birbhum, Bengal.

৩৩ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : তদেব।

৩৪ খাম।

৩৫ খাম।

৩৬ খাম।

৩৭ খাম।

চক্রবর্তী : যুধাজিৎ চক্রবর্তী, সার্ভিস এ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সী-'র মালিক।

Service : Service Advertising Agency'

৩৮ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : এলগিন রোডের।

যেখানে ঢুকেছি : 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও।'

দিলীপ : সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত (ডি. কে.)।

আপনার অফিসে : সার্ভিস এ্যাড্ এজেন্সি।

৩৯ পোস্টকার্ড, ঠিকানা : এলগিন রোড।

ছকুবাবু : যুধাজিৎ চক্রবর্তী।

বিষ্ণুবাবুর কাজ হওয়াতে : সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজ, বর্তমান মৌলানা আজাদ কলেজ-এ।

৪০ খাম। 'কার্কম্যানের অনুবাদ' : সিগনেট প্রেস-প্রকাশিত *Modern Bengali Poems* (১৯৪৫)-এর অনুবাদ-প্রসঙ্গ।

৪১ খাম।

৪২ খাম।

৪৩ খাম।

চিঠিতে বছরের উল্লেখ নেই, খাম পাওয়া যায়নি, বিন্যাস আনুমানিক।

৪৪ খাম। বছরের উল্লেখ নেই, বিন্যাস আনুমানিক।

৪৫ খাম। বছরের উল্লেখ নেই, বিন্যাস আনুমানিক।

৪৬ পোস্টকার্ড। প্রথম পিঠে কামাক্ষীপ্রসাদকে লেখা।

বাংলা কবিতার উপর প্রবন্ধটা : *Marxist Miscellany*-তে প্রকাশিত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ, 'Modern Bengali Poetry', বর্তমান সংকলনের ইংরাজি পর্যায় দ্রষ্টব্য।

৪৭ খাম।

নলিনীবাবু : নলিনী মুখোপাধ্যায়।

৪৮ খাম।

গীলু : গীতা মুখোপাধ্যায়।

৪৯ খাম।

সুনীল ও শোভা : সুনীল জানা, ফোটোগ্রাফার, শোভা জানা, ডাক্তার, বন্ধু।

৫০ খাম। মস্কো থেকে লেখা।

৫১ খাম।

৫২ খাম। মস্কো থেকে লেখা।

আপনার বই... : 'লোকায়ত'

তুষারকান্তিবাবু : তুষারকান্তি ঘোষ, সাংবাদিক, সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা।

পুনর্মুদ্রণ

বুদ্ধদেব বসু

নবযৌবনের কবিতা

('কয়েকটি কবিতা')

মানুষের জীবনে নবযৌবন স্বভাবতই বিদ্রোহের ঋতু। এত বড়ো দুর্ভাগা কোনো মানুষই বোধহয় নেই যার জীবনে ষোলো থেকে কুড়ি বছরের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও কোনো মহৎ প্রেরণা বা কল্পনা আসেনি। আমাদের দেশের পেন্সনপ্রাপ্ত বৈষয়িক বৃদ্ধদের দেখে অবশ্য এ-কথা মনে আনা শক্ত; কিন্তু খুব সম্ভব ঐ ইনভেস্টমেণ্ট-সবস্ব মহাশয়গণও বয়ঃসন্ধিকালে একবার কোনো ভাবের আগুনে জ্ব'লে উঠেছিলেন। সাধারণ মানুষের সম্বন্ধেই যখন এই কথা, তখন কবিপ্রকৃতিতে নবযৌবন যে হবে বন্যার মতো, সেটা আশাই করা যায়। সাধারণ মানুষের জীবনে সেই ক্ষণিক ও দুর্বল স্ফুলিঙ্গ এক ফুঁয়েই নিবে যায়, তারপর দেহের মেদ আর ব্যাঙ্কের খাতা একযোগে স্ফীত হ'য়ে উঠতে থাকে। নয়তো নানা সংগ্রামের আঘাতে হতভাগ্য জীবনসৈনিক কোথায় যে তলিয়ে যায় তার চিহ্নই থাকে না। আর কবির নবযৌবনের বিদ্রোহ ক্রমে থিতিয়ে দানা বাঁধে, হ'য়ে আসে গভীর ও গম্ভীর; হয়তো গ'ড়ে ওঠে শান্তি সকল বিরোধ ও বিক্ষোভ ছাপিয়ে, হয়তো দেখা দেয় কোনো নবনির্মাণের পরিকল্পনা। যে-কবির দীর্ঘকাল বাঁচার সৌভাগ্য হয়েছে তাঁর প্রথম ও শেষ বয়সের রচনা পাশাপাশি পড়লে এইটেই আমরা দেখতে পাই।

এই বিদ্রোহের ঝোঁক বিভিন্ন কবিতে বিভিন্ন পথ নেয়; কিন্তু মোটের উপর কতগুলো লক্ষণ প্রায় সমান থাকে। পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে; নিজের মধ্যে যত গ্লানি ও বিরোধ, তার বিরুদ্ধে; ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা; আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা—কবি-কিশোরের প্রথম রচনার গতি-প্রবাহ দেখা যায় এ-সব দিকেই। কিছু হয়তো থাকে আতিশয্য, কিছু ফেনা; কিন্তু প্রেরণা যেখানে সত্য, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকার ক'রে খুশি হই।

সমর সেনের কবিতায় এই বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। প্রথমে রীতির কথা বলি। তাঁর কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো পদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি গদ্যে ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এমন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোনো কবির ছাঁচে ঢালাই

করা নয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলি ; অর্থাৎ এটা আমরা ধ'রেই নিই যে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব আধুনিক বাঙালি কবির প্রচেষ্টায় অনিবার্য। কিন্তু এই যুবক-কবি যেন রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কখনোই পড়েননি, সেটা আমার আশ্চর্য লাগে। 'কয়েকটি কবিতা'য় যে-রকম সচেতন ও তির্যক ভঙ্গিতে রবীন্দ্র-কাব্য উদ্ধৃত করা আছে, তাতেই বোঝা যায় যে আমাদের যেমন প্রথম যৌবনে নিঃশ্বাসের বাতাসই ছিলো রবীন্দ্র-কাব্য, এ-কবির সে-রকম নয়। বাংলা কবিতার যে-ঐতিহ্যসম্পদ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি, এই নবীন কবি সেখানে যেন কোনো অবলম্বন খুঁজে পাননি। আমি নিজেও সেই ঐতিহ্য থেকেই যাত্রা করেছিলুম, তাই তার লক্ষণসমূহ মোটামুটি বুঝতে পারি। আমাদের সাহিত্যিক জীবনের প্রথম অধ্যায়ে যে-প্রেরণা আমাদের মনে সবচেয়ে প্রবল ছিলো, আজ যদি তার কোনো নাম দিতে হয় সেটাকে সৌন্দর্যানুভূতি বলা যেতে পারে। সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে নিজের ভিতরে যত বাধা, যত প্রলোভন ও দুর্বলতা, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ; একদিকে মহৎ ও রোমাঞ্চকর স্বপ্নের সঞ্চার, অন্যদিকে পঙ্কিল ও ক্ষুদ্র কামনা—এই আত্মবিরোধের তীব্র যন্ত্রণা ও সেই কারণে স্রষ্টার উপর অভিসম্পাত। এই অভিসম্পাতের অংশটা অবশ্য আমাকেই মাথা পেতে নিতে হচ্ছে, কেননা আমি যে 'বন্দীর বন্দনা' লিখেছিলুম তার মূলে এই কথাটাই ছিলো।

নিজের কথা উল্লেখ করতে হ'লো ; পাঠক মার্জনা করবেন। যে-রকম বয়সে সমর সেন তাঁর 'কয়েকটি কবিতা' লিখেছেন, সে-রকম বয়সেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম ; এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে-মনে তুলনা করতে ভালো লাগছে। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে ; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে ; তুলনা করলে এইটেই দেখা যাবে যে 'কয়েকটি কবিতা' কালপ্রভাবে কিছু বেশি 'আধুনিক', এবং লেখকের স্বভাবের প্রভাবে কিছু বেশি সীমাবদ্ধ। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ ছিলো ব্যক্তিগত বা মানবিক, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, আর বিধাতাকে, অভিশাপ দেবার জন্যও, কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে ভিতরকার নয়, বাইরের ; আত্মবিরোধ নয়, বৃহৎ সমাজ-স্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। সৌন্দর্যের শত্রু, তাঁর মতে, মানুষের আত্মার কলুষ নয়, সামাজিক দুর্ব্যবস্থা। তাকে মেরেছে ধনিকের লোভ, নষ্ট করেছে রোগ ও দুর্ভিক্ষ, তাকে পঙ্কিল করেছে স্থূল, নির্বোধ মধ্যবিত্ততা, তাকে বিক্ষত করেছে আধুনিক জীবনে বণিক-শক্তির ব্যাভিচারী প্রতাপ—এক অনিপুণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমান মানবজীবনের ভারসাম্য গেছে নষ্ট হ'য়ে। এখানে সৌন্দর্য আসবে কেমন ক'রে ?

উর্বশী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে ;
কতো অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি
কতো দীর্ঘশ্বাস,
কতো সবুজ সকাল তিক্ত রাত্রির মতো.
আর কতো দিন।

উপরে যা বলেছি, হয়তো একটু কাঁচা শোনাতে পাবে। আশা করি সমর সেনের বলবার কথা এ-রকম নয় যে মানবসমাজ আজ এই অর্থনৈতিক দুর্বাবস্থার অধীন ব'লে কবি তাঁর নিজস্ব ভাবমণ্ডলে সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। মুষ্টিমেয় প্রতাপশালীর দ্বারা বৃহৎ সমাজের শোষণ পৃথিবীতে কিছু নতুন ঘটনা নয় ; মধ্যযুগে তার রূপ হয়তো আরো ভয়াবহ ছিলো। কিন্তু প্রায় সকল যুগেই এমন কবির উদ্ভব হয়েছে, যিনি জীবনের সমগ্র ও চিরন্তন মূল্যকে দেখেছেন ; স্থানীয় ও সাময়িক ঘটনায় আবদ্ধ হ'য়ে থাকেননি। তা'হলেও এ-কথা সত্য যে কবিও তাঁর যুগেরই সৃষ্টি ; সমকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, এবং কবির ব্যক্তিগত জীবন, অচেতনভাবেই তাঁর কাব্যের রক্তমাংসকে গ'ড়ে তোলে। যে-যুগে বিশ্বাস করা সহজ নয়, কবির পক্ষে সেটা দুঃসময়। বর্তমান সময়ের সংশয়াচ্ছন্ন অন্ধকার যে-তরুণ চিত্তকে আবিষ্ট করেছে, সমর সেন তারই প্রতিনিধি। তাঁকে দোষ দিইনে, বরং এ-কথাই বলি যে নতুনের সুস্পষ্ট আবির্ভাব যতদিন না হচ্ছে, ততদিন পুরোনোকে দীর্ণ ক'রে বেরিয়ে আসার ইচ্ছেটা শ্রদ্ধেয়. সেই ইচ্ছার দ্বারাই নূতনের পথ প্রস্তুত হয়।

২

বাংলাদেশে বিশ শতকের এই চতুর্থ দশকে যে-কবিব যৌবনের উন্মেষ হ'লো কতগুলো তথ্যের প্রতিক্রিয়া তার মধ্যে প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। সে দেখবে তার চারদিকে মধ্যবিত্ততার নিরেট দেয়াল ; তার যৌবনের আবেগ যেদিক দিয়ে বেরোতে চাইবে সেদিকেই ব্যাহত হবে। ভালো পাশ করবে, সম্ভব হ'লে আই. সি. এস.-এ ঢুকবে, নয়তো অন্য কোনো বড়ো চাকরিতে আমলারাজ্যের উজ্জ্বল মণি হ'য়ে রায়বাহাদুরি গোধূলিতে জীবনের অবসান করবে, তার পরিবারের ও

সমাজের এ-ই তো উচ্চতম আদর্শ। তার পারিপার্শ্বিক একেবারে বেখাপ্পা, এমনকি প্রতিকূল, তার মনের আগ্নেয় উদ্দীপনাকে ধ্বংস করতে সচেষ্ট। শহরে সে দেখবে বৈশ্য আদর্শের আধিপত্য; অর্থস্ফীতির কোনো উপায়ই অন্যায় নয়; প্রত্যেকেই নিজ-নিজ স্বার্থের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে ব্যস্ত; ছোটো-ছোটো গণ্ডির দ্বারা রক্ষিত স্বার্থের খাতিরে বহুর দৈহিক ও আত্মিক বিনাশ। আর দেখবে বড়ো-বড়ো নীতি-কথার আড়ালে অনাচার, অত্যাচার, যৌবন-বাসনার বিকৃতি ও অবমাননা, নিরানন্দ যান্ত্রিক কাজের নিষ্পেষণ আর নিরানন্দ ক্লীব সম্ভোগের ক্লান্তি। কোনোখানে কোনো বড়ো আদর্শ নেই, নেই মানুষের দেহ-মনের সহজ স্ফূর্তি, সারাটা জীবন যেন এক কঠিন নিষ্ঠুর নিয়মের ক্রীতদাস। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ও তা থেকে মুক্ত নয়।

একটি মেয়ে

আমাদের স্তিমিত চোখের সামনে
আজ তোমার আবির্ভাব হলো :
স্বপ্নের মতো চোখ, সুন্দর, শুভ্র বুক,
রক্তিম ঠোঁট যেন শরীরের প্রথম প্রেম,
আর সমস্ত দেহে কামনার নির্ভীক আভাস :
আমাদের কলুষিত দেহে
আমাদের দুর্বল ভীরু অন্তরে
সে উজ্জ্বল বাসনা যেন তীক্ষ্ণ প্রহার।

এই সামাজিক পরিবেশে কবির উন্মীলমান যৌবন পীড়িত হবেই, এবং সেই পীড়া থেকে তার কাব্য একেবারে মুক্ত হবে না। সমর সেনের কবিতায় এই অসুস্থতাবোধ খুব বড়ো একটা লক্ষণ। নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড-খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো-কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটা ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।

মহানগরীতে এলো বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাৎরার মতো রাত্রি

* * *

আর কতো লাল শাড়ি আর নরম বুক, আর টেরিকাটা মসৃণ মানুষ
আর হাওয়ায় কতো গোল্ড ফ্লেকের গন্ধ,
হে মহানগরী!

যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্তবাতাসে
—স্কুল আর কলেজ হোলো শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন,
দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে,
সন্ধ্যা নামলো :
মাঝে মাঝে সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ,
দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চীৎপুরে ভিড় ;
কাল সকালে কখন সূর্য উঠবে ! ('নাগরিক')

এই কথাগুলিতে আছে শহরের উচ্ছৃঙ্খল তোলপাড়ের প্রতিধ্বনি ; আছে ব্যঙ্গ ও বিক্ষোভ : আছে নীরক্ত মানুষের ক্লান্তি ; আর আছে দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদের ইঙ্গিত —সেটাও অগ্রাহ্য নয়।

৩

সমর সেনের রচনায় একটি স্পর্শকাতর সুন্দর যৌবনকে আমি দেখলুম, তাকে আমার শ্রদ্ধা জানাই। বাংলাদেশে আজ যেন যৌবনের বড়ো অভাব ; পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো যে-অনাসৃষ্টি—"practical young men"—তাদেরই সংখ্যা এদেশে আজকাল বেশি মনে হয়। জীবনের যে-ঋতুতে অসম্ভবের কুঁড়ি-ধরার কথা তখনই যারা মুনাফার চুলচেরা হিশেব করতে বসে, তাদের ভবিষ্যতের কথা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। নিষ্প্রাণ চাকরি, ব্যবসাদারি বিয়ে, কর্মজীবনে সংকীর্ণ স্বার্থপরতা—মোটের উপর এমন একটি স্থাবর ও ক্ষীণদৃষ্টি মনোভাব, যা জীবনের যে-কোনোরকম বিকাশের প্রতিকূল। আমাদের দেশে যেন যৌবনই নেই ; আমরা বুড়ো হ'য়ে জন্মাই, যদিও সাধারণত বুড়ো না-হ'য়েই মরি।

এরই মধ্যে 'কয়েকটি কবিতা'য় খাঁটি নবযৌবনের দেখা পেলাম। প্রচলিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এ-বিদ্রোহ নতুন নয় ; কিন্তু সমর সেনের সুর নতুন ব'লেই বিষয়ও নতুন মনে হয়। প্রথম অংশের কবিতাগুচ্ছ লিরিকধর্মী ; সেখানে শুধু সুরটাই আমরা শুনি, তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যের দিকে আমাদের নিয়ে যায় না। সুরে ধরা পড়েছে হঠাৎ মনের এক-একটি ঝোঁক ; আর সেই ঝোঁকের একটি বিশেষ চেহারাও আছে। বাংলা গদ্যছন্দকে এই তরুণ কবি যে-রূপ দিয়েছেন সেটা আর কারোরই নয় ; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি। এ-গদ্য গল্পে বা প্রবন্ধে ঠিক ব্যবহার্যই নয় ; এ যেন বিশেষভাবে কবিতারই বাহন। 'কয়েকটি কবিতা' বইখানা ছোটো, কবিতাগুলোও ছোটো-ছোটো, একটি ছাড়া প্রায় সব ক-টি কয়েক লাইনে পর্যবসিত। কিন্তু এই রূপের অভিনবত্বই শেষ কথা নয় ; এই ছোটো বইখানার মধ্যেই আছে পরিণতির আভাস। কাব্যের রূপ দখলে আনার প্রাথমিক চেষ্টার অল্প পরেই দেখা যায়, ভিতরকার কথাটা চাপা আলোর মতো বিচ্ছুরিত। শক্তিশালী তরুণ কবি প্রথম

উচ্ছ্বাসের ঝোঁকে যে-আতিশয্য ক'রে থাকেন এবং যে-আতিশয্য মার্জনীয়, এমনকি শ্রদ্ধেয় হ'তে পারে—অবাক হ'য়ে দেখছি এই রচনাগুলিতে তার কোনো চিহ্ন নেই। প্রায় প্রথম থেকেই এই পরিণত আত্মপ্রত্যয়ের ভাব শক্তিশালী কবিতেও বিরল। সেটা আছে ব'লেই সমর সেনের প্রভাব, বিষয়বস্তু ও কলাকৌশল উভয় দিক থেকেই, নতুন উদ্যোগীদের মধ্যে তো বটেই, কখনো-কখনো প্রতিষ্ঠাবান কবিতেও দেখা যাচ্ছে—প্রায় তাঁর প্রথম কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হবার পর থেকেই।

এ-কথাও বলবো যে সমর সেনের পরিণতির এটা প্রথম পরিচ্ছেদ মাত্র। আরো অনেক কিছু তাঁকে করতে হবে। 'কয়েকটি কবিতা'র রচনাগুলো মোটামুটি একই ধরনের; শব্দ ও বাক্যাংশ, উপমা ও বিশেষণের পুনরুক্তি কিছু দূর পর্যন্ত অনিবার্য ব'লে মেনে নিয়েও বইখানার ছোটো আকারের পক্ষে কিছু বেশি ব'লে মনে হয়। তাছাড়া পরিবর্তন প্রয়োজন; কেননা পরিবর্তনের ভাঙাচোরার ফলেই নতুন গঠন সম্ভব হয়। কোনো কবি হয়তো একটি কাব্যরূপ একবার পেয়ে যান—তারপর সেটারই মোহে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন, শুরু হয় নিজের অনুকরণ। এটা বড়ো শোচনীয়। বাংলা কাব্যে এর চমৎকার উদাহরণ 'মরীচিকা'র যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নিজের সৃষ্টিকে ছাড়িয়ে যেতে না-পারলে বড়ো কিছু করা যায় না; এর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। সমর সেনের এখন একটা মোড় নেবার সময় হয়েছে।

মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।
সমস্ত দিন কাটে দুঃস্বপ্নের মতো;
রাত্রে ধূসর প্রেম: কুসুমের কারাগার।
কতো দিন, কতো মন্থর দীর্ঘ দিন,
কতো গোধূলি-মদির অন্ধকার,
কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ
দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
বিষণ্ণ নাবিকের গান।

—পুরো বইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করলাম। গদ্যের ছন্দটি নিখুঁত; পর-পর কয়েকটি জোরালো রেখায় ফুটে উঠেছে গভীর ইঙ্গিতময় ছায়া-ছবি। আশা করি যে-নাবিকের গান কবির কানে এসে পৌঁচেছে, তার টান তাঁর কাব্যকে নিয়ে যাবে দূর সমুদ্রে, জয় করবেন তিনি নতুন কল্পনার উপনিবেশ,

বাংলা কাব্যকে দিগন্তবিহারিণী করবেন ঢেউয়ের আঘাতে আর ঝড়ের ঝাপটায়। আর এই যাত্রার শেষ প্রান্তে যে-নিবিড় সবুজ তটরেখা অপেক্ষা ক'রে আছে, তার পূর্বাভাস যেন এখনই ধরা পড়েছে নবযৌবনের বিষণ্নমধুর দীর্ঘশ্বাসে।

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘমদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

('মহুয়ার দেশ')

কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৪

['কালের পুতুল' প্রবন্ধ-সংকলন-ভুক্ত এবং লেখক কর্তৃক ঈষৎ পরিমার্জিত]

বিষ্ণু দে

কয়েকটি কবিতা : সমর সেন

চিরাচরিত কাব্যে অভ্যস্ত আমাদের পক্ষে নতুন কোনো কাব্যরূপ ভাবনার বিষয় হয়ে ওঠে। শ্রেণীবিভাগের সহজ চেষ্টায় তখন কাব্যপাঠ হয়ে ওঠে বিড়ম্বনা। বিশেষ করে বাংলা গদ্য কবিতার প্রথম সাক্ষাতে। কারণ ইংরেজি গদ্য আর পদ্যের চেয়েও বাংলা গদ্য আর পদ্যের মধ্যে বিরোধ বেশি। রবীন্দ্রনাথের কাব্য পাঠ এবং আমাদের প্রাত্যহিক আলাপ তুলনা করলে এই লজ্জাকর সত্য বুঝি। অথচ গদ্য ও পদ্য শত্রু নয়, সে কথা বুঝতে সংস্কৃত অলঙ্কার বা এরিস্টটলের কাছে যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। এবং গদ্য ও পদ্যের এই আপাতবৈষম্য দূর করতে যিনি পুরোধা, সে মহাকবির কাছে কৃতজ্ঞ থাকাই আমাদের অভ্যাস।

সাধারণ জীবনে যদি সাহিত্যের ভিত্তি গাঁথতে হয়, তাহলে যে বাংলা কবিতার নিতান্তই কবিজনোচিত ও উন্মার্গ সৌখীন চাল পরিত্যাজ্য, সে বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই। এবং যতদিন না গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি থাকবার ব্যবস্থা বাংলা কবিতায় হচ্ছে, ততদিন সামাজিক জীবনের অলিগলিতে বাংলা কবিতার যাতায়াত নেই। আর রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রায়ই উদাসীন, কবিতার পাঁচিল তিনিও ভাঙেন না, দরকার মতো শুধু গদ্যকে চমৎকার কাব্যমণ্ডিত করে পাংক্তেয় করেন। কিন্তু কায়স্থরা পৈতা ধরলেই কি সমাজসংস্কার শেষ? বিকালে এলবার্ট হলে বক্তৃতা দিয়ে বা চাঁদা দিয়ে ফ্রি-রীডিংরুম করে, সন্ধ্যায় ড্রয়িংরুমে নাগরজীবন যাপন করার মতোই এ সংস্কার নিবারণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের আগেকার নানা গদ্য লেখায়, অবনী ঠাকুরে, এমনকি রমেশ দত্তের জীবন-সন্ধ্যায়, স্বভাবতই এই গদ্যচর্চা ঘটেছে। তফাৎ শুধু এই হয়তো যে সেকালে বড়ো-বড়ো গদ্যরচনায় এই রঙীন অংশগুলি অংশমাত্র, আর একালে এগুলি সর্বস্ব করে লিখলে ও লাইন ভাগ করে ছাপলে তাদের নাম দেওয়া হয় গদ্যকবিতা।

একান্ত সুখের বিষয়, সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা'য় সংস্কারের অন্যদিকে সম্ভাবনা আছে। তিনি আঙ্গিকের দিক থেকে, আমাদের দুর্ভাগ্যত, কবিতা থেকে গদ্যে, গদ্য থেকে কবিতায় না গেলেও তাঁর ভাষাব্যবহার কবিতারই, গদ্যের নয়। ভাষা তাঁর অবশ্যই গদ্য ব্যাকরণের, কিন্তু তার প্রয়োগরীতি কবিতার মতো ঐন্দ্র-জালিক, গদ্যের মতো বিতর্কবাহক নয়। প্রত্যয়প্রতিজ্ঞায় তাঁর মন চলে না, তাই তাঁর গদ্য কাব্যালঙ্কারে মণ্ডিত হয়ে নিজেকে ও পাঠককে স্তম্ভিত করে না; তাঁর কবিতার আধার স্বকীয় জগৎ বানিয়ে প্রজ্ঞাপথে এসে সাক্ষাতে দাঁড়ায়। অর্থাৎ বিষয়-বিষয়ীর সম্পূর্ণ সাযুজ্য তাঁর কবিতায় ঘটে, ফলে হয়তো ক্রোচের মতেই, কবিতা আর তার ভাষায় আলঙ্কারিক বুদ্ধির স্থান থাকে না। থাকে থাকে গদ্যপন্থী

নির্বাহকাব্যে বাক্যবহুল তাই সমর সেনকে হতে হয় না, নাটকের পাত্রপাত্রীর মর্মোক্তির মতোই তাঁর কবিতা আমাদের সামনে একেবারে আবির্ভূত হয়। এই হিসাবেই পাউণ্ড-এর গদ্যকবিতা কবিতাপন্থী আর হুইট্‌ম্যানের কবিতা গদ্যপন্থী বলতে হয়। সমর সেনের যে সব কবিতায় বিষয়মাহাত্ম্য নেই সেরকম একটি কবিতারই সঙ্গে, ধরা যাক 'পুনশ্চ'-র কোনো কবিতা, যথা কোপাই নামে কবিতার তুলনা করলে কথাটা স্পষ্ট হবে।

> ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি।
> বাতাসে ফুলের গন্ধ ;
> বাতাসে ফুলের গন্ধ
> আর কিসের হাহাকার।
> ধূসর সন্ধ্যায় বাইরে আসি
> নির্জন প্রান্তরের সুকঠিন নিঃসঙ্গতায়।
> বাতাসে ফুলের গন্ধ,
> আর কিসের হাহাকার।
>
> ঘনায়মান অন্ধকারে
> করুণ আর্তনাদে আমাকে সহসা অতিক্রম করল
> দীর্ঘ দ্রুত যান—
> বিদ্যুতের মতো :
> কঠিন আর ভারি চাকা, আর মুখর—
> অন্ধকারের মতো ভারি।
> বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে দেখি ;
> দেখি আর শুনি
> গন্ধ-অন্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার :—
> অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
> দীর্ঘ লৌহরেখার সহসা শিহরণ—
> আর অস্ফুট শীর্ণ বহুদূরে কিসের আর্তনাদ
> কঠোর কঠিন।
> বাতাসে ফুলের গন্ধ
> আর কিসের হাহাকার।

এ-কবিতাতে বিষয় মহৎ কিছু নয় এবং আবেগতাপও প্রবল নয়। সেই কারণেই এর কাব্যগুণ স্পষ্ট। আর এ-কথা বোঝা যায় যে সমর সেনের কাব্যলোকের জল-বায়ুও একান্তই কবিতার, রবীন্দ্রনাথের কবিতার। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো

কবিতার নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অজস্র কবিতা, গান ও লিপিকা, শরৎ, আষাঢ় ইত্যাদি নানা লেখার মধ্যে দিয়ে দেশব্যাপী যে আবহ সেই জলবায়ুই তাঁর সার্থক পটভূমি। সমর সেনের কবিতা যে-কোনো লোকোত্তর শূন্যের জীব নয়, সেইটেই তাঁর কীর্তির সূচনা। তাই তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রনাথ-লালিত ক্লান্ত করুণ বিষাদ শাল-মহুয়া-বনে, কৃষ্ণচূড়ার ডালে-ডালে, চাঁদের পাণ্ডুর আলোয়, পাহাড়ের দূর নীলে, শহরের এলোমেলো গলিতে, দূর দিগন্তে স্থিতি পায়। আর সে স্থিতি স্বকীয় ভারসাম্য পায় কবির নিজের প্রথম যৌবনের স্বাভাবিক দেহবিতৃষ্ণা আর ফ্লিলি-স্টাইন শরীর-সর্বস্বতার দ্বন্দ্বে আতুর ক্লান্ত আবেশে এবং সমাজ-জীবনের মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধে। এই ব্যর্থতাবোধের সম্ভাবনার জন্যই সমর সেনের বর্তমানে ক্ষান্ত না হয়ে পাঠকেরা তাঁর ভবিষ্যতে আশান্বিত।

ব্যক্তিস্বরূপের কি কৈবল্য থাকলে প্রথম যৌবনের আবেশকে জগচ্চিত্র না ভেবে সেই রোমান্টিকমন্যমাত্র ভাবকে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেওয়া যায়, তা হঠাৎ কল্পনা করা শক্ত। কিন্তু যখন এদিকে মোহিতলাল বা ওদিকে জীবনানন্দ দাশের মতো দক্ষ কবিকে এই সঙ্গতির অভাবে পীড়িত দেখি, তখন এই নবীন কবিকে প্রশংসা করতেই হয়। এবং এতই সৎ এই কবির ব্যক্তিস্বরূপ যে তাঁর মধ্যে এই শ্রেণী-বিরোধের ব্যথা গোপনই আছে—কারণ তাঁর নিজের কবিপরিণতি, আর বাংলা কাব্যের বিকাশে এ-ব্যথা এখন শিকড়ই গাঁথতে পারে, স্বভাবত বনস্পতি হয়ে উঠতে পারে না। অথচ এই বিষয়ে আত্মবঞ্চনার লোভ সমর সেনের মতো সজাগ কবির কাছে যে বেগে আসতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। মার্কস এবং প্লেখানভের অনুমোদন কবিরই পক্ষে, শিষ্যেরা যাই বলুন।

তাই সমরের বিষাদ যৌবনোচিত বাসনা ও ক্লান্তির নেতিতেই উৎস খোঁজে। ফলে অন্যমনস্কের কাছে 'কয়েকটি কবিতা' একঘেয়ে লাগতে পারে। তার যথার্থ কারণও আছে। যথারীতি পদ্য এবং সংস্কৃতজ্ঞ গদ্যের গম্ভীর তালমানবিলম্বিত ছন্দের সফল প্রয়োগে যে বৈচিত্র্য ও প্রচণ্ড জোর পাওয়া যায়, তা সমর সেন অবহেলা করেছেন। তাঁর নেতিবাচক ছন্দ আর ভবিষ্যতের প্রবলসত্তাব্যঞ্জক ছন্দ একই রেশে বাজে। কয়েকটি কবিতায় তিনি ভিন্নপ্রয়োগ করতে চেয়েছেন। কিন্তু ১৯০০, বসন্তের গান, একটি প্রেমের কবিতা, সিনেমায়, মেঘদূত ইত্যাদি কি এদিক থেকে অন্যথা নয়? অবশ্য শিথিলসমাধি সব লেখকেরই হয়। আর গদ্যকবিতায় মুশকিল হচ্ছে যে এখানে কোনো অধিদৈবত প্রমাণ বা প্রতিমাণ নেই, এমনকি কোনো কবিনিরপেক্ষ সংকেতিত মার্গও নেই। তাই কবির আবেগ এবং পাঠক মুখোমুখি বলে কান দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে বিপদে পড়ে। এবং সমর সেন যখন কাব্যের এই Archetypal Pattern বা কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথই নিয়েছেন, তখন তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। প্রথম কবিতাতেই তিনি লাইনভাগে অনবহিত হয়েছেন। সে ত্রুটি 'Amor stands upon you'-তেও দ্রষ্টব্য। নাগরিক নামে

উৎকৃষ্ট কবিতাতে তাই ৪২ লাইনে যে হুঁচট্ খেতে হয় তা কোনো নাটকীয় কারণে নয়। ২৫ পৃষ্ঠার মুক্তি-তে ডাস্টবিনের সামনে মরা না হয়ে মরে যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে। মৃত্যু, পোস্টগ্রাজুয়েটেও ছন্দ ঢিলে হয়ে গেছে এক-আধবার। দু-একবার বোধহয় শব্দ বা কথা সম্বন্ধেও কবির অসতর্ক ভাব দেখা যায়—লাইনের শেষে ক্রিয়া বা কঠিন, বর্ণান্তক শব্দে, হতে শব্দটার সর্বদা ব্যবহারেও হয়তো, এবং বিশেষণের দুর্বলতায়, যথা চমৎকার কবিতা এই মদনভস্মের প্রার্থনায়—

> মাস্তুলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে,
> জাহাজের অদ্ভুত শব্দ,
> দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে
> বিষন্ন নাবিকের গান।

এ-রকম জায়গায় মালর্মে বা বদলেয়র কি 'অদ্ভুত' বলে স্থির থাকতেন? সমর সেনের কবিতাতে এগুলি চোখে পড়ে, তিনি তো গদ্যকবিতায় লরেন্স-মার্গী নন, তিনি পাউণ্ড-পন্থী। ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণার্থে তাঁর ছন্দ বা ভাষা প্রয়োগ তো ঢিলে হবার কথা নয়, কারণ কবিতার উপযুক্ত তাঁর ভাষাব্যবহার ব্যঞ্জনায়, কৃতার্থে গভীর, সমগ্র কাব্যের তাৎপর্যার্থে অখণ্ড।

কিন্তু ছিদ্রান্বেষীকেও থামতে হয়, এত সার্থক তাঁর অধিকাংশ রচনার আত্মস্থ শিল্পসৌন্দর্য। আর এ কবির মনই শুধু বৃহত্তর পারিপার্শ্বিক সমাজ সম্বন্ধে উগ্র নয়, দৃষ্টিও প্রখর। বিস্মৃতি কবিতাতে এর ব্যতিক্রম হয়তো কেউ পাবেন, কিন্তু ক্ষণে-ক্ষণে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞা রসঘন উপমা-উপচারে অন্বিত। রাত্রি বা বিরহ নামে কবিতাগুলি প্রায় জাপানী কবিতার মতো সরল স্পষ্ট ব্যঞ্জনায় গভীর, তাই রক্ত-করবী, মহুয়ার দেশ ইত্যাদিতে উপমাউপচারের জটিলতার সহজ সাহস ও ব্যঞ্জ-নাঢ্যতা বিস্ময়কর লাগে। এবং এগুলি কবির গভীর চৈতন্যের মননজীব বলেই দেখি এই উপমাউপচারাদি এলিঅটের মতো মধ্যে-মধ্যে হয়ে ওঠে পরোক্ষপ্রতীক, যার লীলা বিশ্বজনীন। সেই জন্যেই একটু বিড়ম্বিত হতে হয় যখন একই প্রতীক কখনো পরোক্ষদীপ্ত হয়ে ওঠে আর কখনো প্রত্যক্ষেই লুপ্ত হয়।

কিন্তু ঝড়ের নিঃশব্দ সঞ্চারণ এই নাগরিক কবিকে আশা দিয়েছে, সেই আমাদের আশা। তাঁর সম্পদ তাঁর মননে, যার সাহায্যে তাঁর আত্মজ্ঞান ব্যঙ্গে হয়ে ওঠে নবসম্ভাবনায় চঞ্চল—শেষ কবিতা একটি বেকার প্রেমিক-এ—

> চোরাবাজারে দিনের পর দিন ঘুরি
> সকালে কলতলায়
> ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে
> খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি

মাঝে মাঝে ক্লান্তভাবে কি যেন ভাবি—
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম যে আসে না, সিগারেট টানি
আর শহরের রাস্তায় কখনো প্রাণপণে দেখি
ফিরিঙ্গি মেয়ের উদ্ধত নরম বুক।
আর মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি—
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন।
কলকাতার ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙ্গে
আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

পরিচয়, ভাদ্র ১৩৪৪

বুদ্ধদেব বসু

বাংলা কাব্য পরিচয়

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত সংকলনের সমালোচনা)

··· গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ নেননি ; না নেবার অধিকার তাঁর সম্পূর্ণ আছে। সেই জন্য সমর সেন বাদ পড়েছেন। ১৯২৭-২৮-এর পরে, অর্থাৎ 'কল্লোলে'র সময়ের পর, বাংলা কাব্যসাহিত্যে নতুন শক্তির আবির্ভাব সমর সেনেই। খুব কম বাঙালি কবিতেই এত অল্প বয়েসে এতখানি বুদ্ধির পরিণতি ও আঙ্গিকের উপর দখল পাওয়া গেছে। বাংলা গদ্যছন্দকে সমর সেন নতুন ক'রে সৃষ্টি করেছেন ও করছেন। তাঁর প্রভাব এর মধ্যেই যথেষ্ট ব্যাপক। আজকের দিনে দেখা যাচ্ছে প্রায় কোনো যুবকই তাঁকে অনুকরণ না-ক'রে লিখতে পারেন না। সমর সেনের প্রভাব পাওয়া যায়, এমন কবিতা 'বাংলা কাব্য পরিচয়ে'ও আছে। সমর সেনকে নিতে হবে বলেই গদ্যছন্দকে স্বীকার করা অযৌক্তিক হত না, তবে রবীন্দ্রনাথ যখন গদ্যছন্দকে নেনই নি, তখন ভুলক্রমেও কোনো গদ্যকবিতা যাতে ঢুকে না পড়ে সে-বিষয়ে তাঁর লক্ষ্য নিশ্চয়ই প্রখর ছিল। কিন্তু নিশিকান্তর 'পণ্ডিচেরির ঈশান কোণের প্রান্তর' কেমন করে ঢুকলো ?···

কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৫

অশোক মিত্র

বাংলা কাব্য পরিচয়

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত সংকলনের সমালোচনা

... ভূমিকায় আর একটি কথা আমরা পাই, 'এই সংকলন গ্রন্থে আধুনিক বাংলার গদ্যকাব্য থেকে সংগ্রহ করা হয়নি। সে-কাব্যের ভাণ্ডার অতি সংকীর্ণ, তার থেকে বাছাই করে নেওয়া সহজ নয়।' দ্বিতীয় বাক্যটি আমাদের হতবুদ্ধি করেছে। সাধারণ বুদ্ধিতে অবশ্য এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ভাণ্ডার যতই সংকীর্ণ হবে ততই বাছাই করে নেওয়া সহজ; কারণ বাছাই করবার জিনিষের অপ্রাচুর্য্য। এবং গদ্যকাব্য লেখক বলতে প্রকৃতপক্ষে বোঝায় দুটি কবিকে; রবীন্দ্রনাথ ও সমর সেন। তা ছাড়া এই নিকৃষ্ট সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা কাজটি প্রকৃতই খুব দুরূহ ও আয়াস-সাধ্য হয়েছে বলে আমাদের মনে হয় না। গদ্যরীতি সম্বন্ধে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বর্তমান যুগের পথ প্রদর্শক, সে সম্বন্ধে তাঁর বিচারই শিরোধার্য্য করে নিতে হবে।... গদ্যরীতির প্রতিষ্ঠাতা সমর সেনের রচনা যে আদ্যন্ত পদ্য ছন্দোময় সে সম্বন্ধে কারুর কোন সন্দেহ থাকাই উচিত নয়। এবং সে যুক্তি অনুসরণ করলে সমর সেন যে কেন 'কাব্য পরিচয়'-এ স্থান পেলেন না সেটা একটা রহস্য।...

চতুরঙ্গ, আশ্বিন ১৩৪৫

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

গ্রহণ

('পদাতিক'-এর সঙ্গে একত্রে)

কবিতা, তথা সংস্কৃতির সব অঙ্গই যে পীড়িত ও পরাজিত মনের ইচ্ছাপূরণ, এ সম্বন্ধে ফ্রয়েড-ভক্তদের সংশয়মাত্র নেই। অথচ এই কবিতাই যখন অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ করতে সুরু করে সমালোচক বাধ্য হন কবির আধ্যাত্মিক সন্ধান ছেড়ে বিষয়ী পৃথিবীতে তার কারণ খুঁজতে। সভ্যতার বিচারে ফ্রয়েডের একদেশদর্শিতা এখানেই ধরা পড়ে। মনের জগত, এবং সেখানকার যৌন দিককেই বিশেষ করে তিনি এর ভিত্তি মনে করলেন অথচ ভুলে গেলেন শরীরের কাঠামো বাদ দিয়ে এবং দৈনন্দিন পৃথিবীর ঘাত প্রতিঘাত ছেড়ে মন বলে একটা কিছু শুধু কল্পনার ক্ষেত্রেই রাজ্য বিস্তার করতে পারে। অবশ্য মানসিক রোগগ্রস্ত রোগী পরিবৃত অবস্থায় বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে উদাসীনতা সহজই। এবং নাৎসী বর্বরতায় বিতাড়িত হয়েও তাই শেষ পর্যন্ত হঠাৎ বিষয়ী পৃথিবীকে প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হল না। সভ্যতার ভবিষ্যৎ তিনি দেখলেন অন্ধকার। অথচ বহিঃপ্রকৃতিকে বদল করার সঙ্গে সঙ্গে মনের কাঠামোও যে বদলাতে পারে বহিঃপ্রকৃতি সম্বন্ধে অর্দ্ধান্ধ বলেই তাঁর মনে তা এল না।

আধুনিক কবিতায় অসুস্থতার লক্ষণ প্রত্যক্ষ। কবির অতৃপ্তি ও অশান্তি আর রাখা চলে না। এবং উপরোক্ত কারণের জন্যেই এই অসুস্থতা শুধু কবির মনোবিকলনে ধরা পড়া সম্ভব নয়। সে কারণ জানতে সমাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকদের দ্বারস্থ হতে হয়। বাংলা আধুনিক কবিতায় দুটি শ্রেষ্ঠ বই-এর আলোচনা প্রসঙ্গে সেই কথাই প্রথম মনে হল। কারণ, কলাকৌশলের অনেক তফাৎ সত্ত্বেও এঁদের বক্তব্য অনেকাংশেই সহধর্মী।

'কালসন্ধ্যার এই কুটিল লগ্নে / রাস্তায় হাসির গর্‌রায় ঘোরে তুখোর ইয়ারের দল, / রেস্তহীন গুলিখোর, গেঁজেল, মাতাল, / অবশেষে শূন্যের সরাইখানায় / ভ্রাম্যমাণ বিলোল দিন অদৃশ্য হয়, পিছনে রেখে যায় শুধু কারণের গন্ধ / কয়েক প্রহরের নিশাচর শান্তি। / আবার ব্রাহ্ম মুহূর্তে চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে, অলস হাই তোলে বেকার কুকুর। / দেবনখরে লোল চর্ম, পীত চোখ / ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারী দল জমে' (সমর সেন)। (উঞ্ছজীবী ডাস্টবিন নির্জন বলেই) অনেক আগ্নেয় রাত্রে নিষিদ্ধ আমরা / দেখেছি বৈষ্ণব বেনে অকৃপণ হাত দেয় পণ্য যুবতীকে / অবশ্য নেপথ্যে চলে নিরামিষ নাচ আর গান, / কখনো নিষ্ঠুর হাতে তারা মারে নাকো মশা একটিও। / ···(তন্বী চাঁদ ক্রোড়পতি ছাদের সোফায় !) / চীনা লাল সৈনিকের শরীরে এখন / নিবিড়

নির্বাণ-বিদ্যা বীক্ষণ করে বেঅনেট? / বোমাত্মক এরোপ্লেন গান গায় দক্ষিণ সমীরে—/ মরণ রে তুহুঁ মম শ্যাম সমান' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

অবশ্যই এই নেতিবাচক কথায় আধুনিক সচেতন কবির বক্তব্য শেষ হতে পারে না। এদেরও তা হয়নি। এই মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে জীবনের যে অঙ্কুর জেগে উঠছে সে সম্বন্ধেও তাঁরা উভয়েই (যদিও তারতম্যহীন ভাবে নয়) বিশ্বাসী। সভ্যতার গতি দ্বন্দ্ব-সংশ্লেষণকে নির্ভর করে তাঁরা তা জানেন বলেও সভ্যতার এই মুমূর্ষু অবস্থা দেখে হাত পা শিথিল করে দেন নি। তাই তাঁদের কবিতা শুধুই আশাভঙ্গের ইতিহাস নয়।

'তবু জানি, কালের গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী / যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে, / তবু জানি / জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে ভস্ম হবে / আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে' (সমর সেন)। 'অগ্নিবন সংগ্রামের পথে গ্রীষ্মায় / এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর / গলিত নখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো / সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস। / ···তবে যুদ্ধ আজ। / রাজন্যের অনুকম্পা নেই, / প্রজাপুঞ্জের স্বপ্নভঙ্গ। / বণিক প্রভু চোখ রাঙ্গায় / কারখানায় বন্ধ কাজ! (ইতিহাস আমাদের দিক নেয়)'। (সুভাষ মুখোপাধ্যায়)।

আপাতদৃষ্টিতে একে নিছক স্বপ্নবিলাস বলা সম্ভব হয়তো। তবুও এ স্বপ্নের নির্ভর রয়েছে ইতিহাস সম্বন্ধে সম্যক অনুভূতি। তাই স্বপ্নই যদি বলতে হয় একে তো কডওয়েলের কথা তুলে বলব—

'It is the dream not of an individual but of a man reflecting in his individual consciousness the creative note of a whole class, whole movement is given in the material conditions of a society.'

শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় বাংলার তরুণতম কবি। তাই তাঁর আশা তারুণ্যের উৎসাহে দীপ্ত, বিশ্বাসের কাঠামো কঠোর। এবং শ্রীযুক্ত সেন প্রধানতই বুদ্ধিজীবী—আশ্চর্য সূক্ষ্ম রসানুবোধসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। তাই সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখতে পেরেছেন 'মে দিনের কবিতা' বা 'সকলের গান'।

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য / এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা / দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য / চিনে নেবে যৌবনআত্মা' (মে দিনের কবিতা), 'কমরেড আজ নব যুগ আনবে না? / কুয়াশা কঠিন বাসর যে সম্মুখে / লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা···' (সকলের গান)।

এখানে ছন্দ direct, বক্তব্য দ্বিধাহীন। যে সভ্যতার পত্তন আজ হতে চলেছে তাকে বুদ্ধিজীবীর সূক্ষ্ম বিচার দিয়ে, রসানুভূতির delicate মাপকাঠিতে যাচিয়ে নেবার সময় এঁর নেই। আপাতত জনগণের সঙ্গে পা মেলানোই তাঁর লক্ষ্য।

সমর সেন এ ধরনেব আত্মহারা হতে পারেন নি। সংগ্রামে, এবং সংগ্রামের

পর মুক্ত জীবনের ইঙ্গিতে তিনি সাড়া দেন। তবুও বুদ্ধিজীবী মনের পক্ষে ব্যক্তি-কেন্দ্র সম্পূর্ণ কাটিয়ে ওঠা হল না। দ্বিধা ও দ্বন্দ্ব, এবং কখনো কখনো ব্যাহত সূক্ষ্ম মতি, সূক্ষ্ম কল্পনা তাঁর কবিতায় পুনরাবৃত্তির রূপ গ্রহণ করেছে।—

> 'নিষ্ফল দিন কাটে ক্ষয় রুগীর কামার্ত প্রার্থনায়; সূর্য / তাই ঘরে বসে সর্বনাশের সমস্ত ইতিহাস শূন্য / অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মত বিচলিত শুনি, / আর ব্যর্থ বিলাপের বিকারে বলি: আমাদের মুক্তি নেই আমাদের জয়াশা নেই নামে, / তাই ধ্বংসের ক্ষয় রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন / সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে ' অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।' (একটি বুদ্ধিজীবী)।

এই দ্বিধা তিনি কখনোই সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বাস যখন খুব গাঢ় হয়েছে তখনও তিনি direct নন, প্রায়ই কোন প্রতীকের সাহায্য গ্রহণ করেছেন।

> 'গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এল / প্রবাসী নাবিক এখনো নরকে ঘোরে। / আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর / সমুদ্রের শব্দের মত শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি।'

এঁদের দুজনের কবিতাই অনেক সময় বিদ্রূপাত্মক। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রস্তাব' 'অতঃপর' 'নারদের ডাইরি' ইত্যাদি অনেক কবিতাই এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এবং সমরবাবুর বইয়ের যে-কোন পাতা খুললেই বোধ হয় শ্লেষের কবিতা পাওয়া যায়, যদিও ব্যক্তিগতভাবে তাঁর 'অজ্ঞাতবাস' এদিক থেকে আমার সবচেয়ে প্রিয়। এই বিদ্রূপ কবিতার কারণ তাঁদের শ্রেণী ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে এঁরা কেউই প্রোলেটারিয়েট দলভুক্ত নন এবং যেহেতু শুধু রুটির তাগিদেই মরীয়া হওয়া সম্ভব, তাই মরীয়াও এঁরা নন। অথচ আধুনিক বৈশ্য আদর্শে পীড়িত মন এঁদেরও—কারণ এই আদর্শ 'সভ্যতার আনন্দলোককে' ধ্বংস করতে চলেছে।

প্রকৃত মসদুর বোঝে পায়ের শেকল ছাড়া তার হারাবার কিছু নেই, অথচ সামনে একটা পুরো পৃথিবী জয় করবার, কিন্তু মধ্যবিত্তের তা বোঝা সম্ভব নয়। তাই বৈশ্য সভ্যতার অস্বীকৃতি প্রোলেটারিয়েটের কাছে রূপ নেয় নিছক বিপ্লবের, এবং মধ্যবিত্তের কাছে রূপ নেয় অন্তত আংশিকভাবে বিদ্রূপের। অবশ্য মধ্যবিত্তে বিদ্রূপের লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয় প্রচুর। কারণ তাঁদের মধ্যে একদলের দৃষ্টি সমাজের উপরের বিলাসী শ্রেণীর প্রতি এবং যাঁদের এ দিকে দৃষ্টি তাঁদের বিদ্রূপ মাৎসর্য্যে পরিণতি স্বভাবতই হতে পারে। শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দের 'শিখণ্ডীর গান' এর উদাহরণ। আলোচ্য কবি দুজনের কারুরই এ রকম ঘটে নি বলে এঁদের বিদ্রূপ কবিতা স্মরণীয়।

কবিতার আলোচনা নিছক বক্তব্যের আলোচনা হতেই পারে না। বস্তুত সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা যে সার্থক হতে পেরেছে তার জন্যে তাঁদের আঙ্গিক অনেকখানি দায়ী। সমরবাবুর আঙ্গিক নিয়ে বহু আলোচনাই ইতিপূর্বে

অনেকে করেছেন। সে সম্বন্ধে ভারাক্রান্ত আলোচনার তাই প্রয়োজন বোধ করিনে। তাঁর গদ্য-আঙ্গিক সম্বন্ধে চলতি দুটো ভ্রান্তি যেন মনে না রাখি। প্রথম ভ্রান্তি হল এটা রবীন্দ্রনাথের থেকে নেওয়া, দ্বিতীয়, সহজে অনুকরণ করা যায়।

বস্তুত রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার এঁর কোন প্রভাব নেই। দ্বিতীয়ত, এঁর গদ্য-আঙ্গিক অনুকরণ অসাধ্য। অবশ্য তাঁর প্রভাব যথেষ্ট ব্যাপক ; নতুন কবিদের থেকে সুরু করে বিষ্ণু দের মত কবিতেও তা পাওয়া যায়। উদাহরণ 'টপ্পা ঠুংরী' কবিতা (চোরাবালি)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় মোটের উপর আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা কবিতার ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পয়ার ও রবীন্দ্রনাথের বহু ছন্দকে অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে নিজের মত করে ব্যবহার করেন এবং সেই পথে বিষ্ণু দে আরও অগ্রসর হন। মোটের ওপর সুভাষ মুখোপাধ্যায় উক্ত দুই কবির কাছেই প্রত্যক্ষভাবে ঋণী। অবশ্য তাই বলে এ কথা বলতে চাইনে যে সুভাষবাবুর নিজস্ব ছন্দ-নিপুণতা নেই। কারণ 'অতঃপর' প্রভৃতি কবিতা সে কথার বিপক্ষে যাবে।

প্রতিরূপের ব্যবহারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমরবাবুর দক্ষতা দেখাতে সমর্থ নন। কারণ সমর সেনের প্রতিরূপ স্পষ্ট অভিনব। শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় অনেক সময় বহু প্রতিরূপের ব্যবহার করে কবিতাকে অযথা ভারাক্রান্ত করে তোলেন। এ অভ্যাস তাঁকে কাটিয়ে উঠতে হবে।

উক্ত দুটি বই-ই ছাপা ও বাঁধার দিক থেকে প্রায় নিখুঁত। শ্রীযুক্ত অনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের আঁকা 'পদাতিকের' প্রচ্ছদপট বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

চতুরঙ্গ, চৈত্র ১৩৪৬

অমিয় চক্রবর্তী

ঝর্না-ছন্দের কাব্য

(গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা :–)

"মাথার উপর আসন্ন পৃথিবীর
অন্ধকার-বিরহিত সূর্য-সংস্কৃত আকাশ,
তবু সত্য শুধু পতন-বন্ধুর পথ,
বন্ধ্যা ভূমি আর নিষ্ঠুর দিগন্ত।" (পৃ. ১১)

নিয়তিচক্রের আবর্তনধ্বনি সমর সেন-এর কবিতায় শোনা যায়। উদ্ধৃতপদে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত যে তিনি কবি। গ্রহণ লেগেচে। সংসারের ছায়া নাক্ষত্রিক বিশ্বলোক ঘুরে তাঁর কবিতায় এসে ঠেকল। বোঝা যাচ্চে আধুনিক মানস-মুহূর্তের ঘেরে তাঁর রচনা আবিষ্ট। কবি সহজে গ্রহণ করতে পারচেন না। অতৃপ্ত জীবনের মানসিকতা লেখকগোষ্ঠীর সম্পত্তি নয়, সমস্ত মানবসভ্যতায় আজ বিচিত্র সম্ভব-পরতার অন্তরে শান্তি নেই। লোকালয় এবং বৃহৎ সৃষ্টির আকাশ একই সত্তার অন্তর্গত অথচ জোড় মিলচে না—উদ্ধৃত অংশে "তবু" কথাটার মধ্যে দ্বন্দ্ব র'য়ে গেল। এই দ্বন্দ্ব নিয়েই "গ্রহণে"র কাব্য।

"শান্তি নেই
লোকারণ্যে ঐশ্বর্যের সূর্য ছড়ায় ছায়ার দুঃস্বপ্ন।" (পৃ. ১০)

ছায়া করচে "নিঃশব্দ শকুনের দল," নখাগ্রে চিরচে প্রাণকে—এরা কারা? ধনীর লোভ, বুদ্ধিজীবীর ক্ষুদ্র শাণিত ভ্রষ্টতা, বণিকের চক্রান্ত, বাসনার আন্দোলন। বাহিরে ভিতরে কোনো প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। যুগের অভিশাপকে নিষ্পলক চোখে দেখানোর উৎসাহে জীবনের অজেয় শিবিরগুলিকে সমরবাবু ভুলেচেন অথবা যথেষ্ট জায়গা দেন নি। প্রাণের সহজ আনন্দে সেই শক্তির দুর্গ। সেখানে শুধু বিচিত্র আশ্রয় নয় ঝল্‌মলে অস্ত্র সাজানো; অভাবনীয় অক্ষৌহিণী বেরিয়ে আসচে বাজনা বাজিয়ে। বিচারনিষ্ঠ মনের সঙ্গে প্রাত্যহিক আনন্দক্ষমতাকে কল্পনায় মিলিয়ে দেখানোর কাজ শিল্পীরও। কলকাতার ধোঁয়া-ধরা বাড়ির ভাড়াটে হয়েও আমরা কবিজনোচিত মুহূর্তের সন্ধান জানি। পাশে ঘেয়ো কুকুরের আর্তনাদ, কর্কশ রাষ্ট্র-শক্তির ঔদাসীন্যে পুষ্ট নিরন্ন ভিক্ষুকের দল, চাকরিহীন বাঙালিত্বের পরিবেষ্টন জুড়ে দেওয়া ভালো। অদ্ভুত অসঙ্গতির সংসারকে ব্যক্ত করবার একটা সদুপায় দুটো দিক হাজির করা, তাথ্যিক কাঠগড়ায় নয় নিপুণ তুলির ব্যঞ্জনায়। অনুভূতির সূক্ষ্ম মানরক্ষা হয় কী উপায়ে জানি না। কালো-শাদা ছবিগুলিতে আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় আছে কিন্তু শাদার অভাবে কালোর জোর কমেচে "গ্রহণে"র কয়েকটি

কবিতা সম্বন্ধে এই আমার অনুযোগ। দর্শকের দিক থেকে ক্লান্তির কথা বল্‌চি, সামাজিক কণ্ঠে বল্‌তাম কালো কেন্দ্রকে হান্‌বার সুবিধে হত ম্যাপের রেখা ফুটিয়ে তুল্‌লে।

শুধুমাত্র জয়াশা কীর্তন করা মূঢ়তা যেখানে সহুরে এবং গ্রাম্য সংসার দিকে দিকে অচলপক্ষের করায়ত্ত। তুচ্ছ জীবনের দৃশ্য ব্যথিত ঔদাসীন্যে নয়তো সাংঘাতিক রসিকতায় সমরবাবু দেখিয়েছেন। আবর্তনক্ষুব্ধ ইতরতা এবং অন্যায়-মানা আরামে তিনি অভিভূত হননি কিম্বা বাহিরে ব'সে কবিত্ব করেননি। কয়েকটি মূল সুরের অভাব লক্ষ্য করেচি কিন্তু সমরবাবুর "গ্রহণ" কাব্যকে যাঁরা হারের আখ্যা দিয়ে সরিয়ে রেখে অভ্যস্ত বাসিফুলের বন্দনাকে বাহবা দেবেন তাঁরা ভ্রান্ত। রুগ্ন আত্ম-ঘাতী মানুষের ক্ষয় এবং ক্ষতির চরম দশায় "আসন্ন পৃথিবীর" একটা ঘনিমা দেখা দিল। মেঘের গর্জনটা কি নৈতিক পাণ্ডাদের মনঃপূত ? কাব্যের পক্ষে জীর্ণ সমাজের বুকে বিদ্যুৎচেরা বিপ্লবের উদয় শুভলক্ষণ।

"গম্ভীর পাহাড় থেকে দুরন্ত ঝড় এলো :
প্রবাসী নাবিক নরকে এখনো ঘোরে।" (পৃ. ১১)

"এখনো" কথাটির মধ্যে অনেকখানি অর্থ গোঁজা রয়েচে। দ্রুত ব্যঞ্জনায় সমর সেন সিদ্ধহস্ত।

"অন্তিম দূর, খর শব্দ স্বর,
চক্রপথে পৃথিবী ঘোরে আকাশমণ্ডলে,
মুখে মুখে কী গান কালো হাওয়ায় আসে।" (পৃ. ১৮)

সৌরসঙ্গীত মানুষ কানে শুনতে চেয়েচে এবং "কালো" হাওয়ার মধ্যে বাস ক'রেই উত্তরের গান বেঁধেচে। "কালো" কথাটা অসতর্ক পাঠককে এড়িয়ে যাবে। অথচ গ্রন্থি বাঁধা ঐখানে। ছন্দ-বিশেষে কয়লা বা চিমনির ধোঁয়াকে আনা যেত, অতি প্রকট বাক্য দূরে রেখেই, যদিচ আন্তর্নাক্ষত্রিক তত্ত্বের সঙ্গে চিম্‌নির প্রসঙ্গ-মানা আধুনিকতা অনেকের কাছে রসিকতার সামিল। মজার কবিতায় বা প্যারডিতে চলে, খাঁটি কবিতার জাত নষ্ট হবে। তন্ময় মুহূর্তের ঘেরে চৈত্রের স্বচ্ছ আকাশ এবং পাটকল চটকলের কীর্তি, বস্তির শব্দ এবং তারার অশ্রুত নিক্বণ ঘনিষ্ঠ কাব্য-রূপে দেখা দিতে পারে তার প্রমাণ পেয়েও অনেকে গ্রহণ করেন না। সমর সেন-এর কবিতায় নমুনা মিল্‌বে।

আধুনিক কাব্যের আভিজাত্য নিহিতার্থের গভীরতায়। আবেগের বিষয় নিয়ে অতিরঞ্জিত উক্তি আত্মশ্রদ্ধার পরিচয় না হতেও পারে। যাঁরা সংহত, এমনকি যেন অনিচ্ছিত প্রকাশকে হৃদয়বৃত্তির অভাব ব'লে মনে করেন তাঁদের সঙ্গে তর্ক করব না। যুদ্ধে মর্মান্তিক সংবাদ রিপোর্টিং-এর মতো শোনাতে পারে কিন্তু শুষ্ক কথার ঈষৎ আভাসে সমগ্র জাতির বুক ফাটে। প্রাত্যহিক জীবনেও কথার মূল্য

দিয়ে থাকি পরিমাণ ওজন ক'রে নয় এবং ঝঙ্কার না গুণেই—এমনকি, হৃদয়-সংঘটিত ব্যাপারে। চরম উপলব্ধির বাহন হয়েচে মন্ত্র, মহাকাব্যের চেয়ে তার জোর কম নয়। অন্যরকমের। আধুনিক কাব্যে বৈজ্ঞানিক সঙ্কেত, মন্ত্রের ইঙ্গিত, একান্ত ক্ষণের দুটো কথা দিয়ে বল্‌বার চেষ্টা কৌশলের জন্যেই নয়, নিবিড়তার তাগিদে। সব জায়গায় আধুনিকেরা পেরেচেন তা নয়, অনেকস্থলেই পারেন নি, কিন্তু কুণ্ঠিত বাক্য যেখানে বিদীর্ণ বুকের সাক্ষ্য দিচ্চে সেখানে অতি-সংহতিকেও পাঠক ক্ষমা করবেন। মর্মান্তিক ঠাট্টার হাসিও এই পর্যায়ে পড়ে—গীতিকবিতায় তার পরিচয় পাওয়ামাত্র দরজা বন্ধ করলে কাব্যরসিক ঠকবেন।

বলা বাহুল্য কাব্য একরকম নয়। অলঙ্করণ প্রসাধনের চমকে ললিতকলার বিকাশ আমরা দেখেচি। কথার ইন্দ্রজাল বুনে আসল কথার ঔৎসুক্য বাড়ানো কাব্যরীতির অন্তর্গত। সযত্নরচিত এলোমেলো চিঠির ছাঁদে গীতিকবিতা রচ্‌তে বাধা কী? এখানে কাব্যের বিশেষ একটি উৎকর্ষধারাই আলোচ্যবিষয়। একথাও বল্‌ব মনের এবং আঙ্গিকের ধরন বদ্‌লায়—একালে হয়তো আমরা পরিচ্ছন্ন স্বল্প-ভঙ্গের পক্ষপাতী। হিতাহিতের কথা উঠচে না: জীবনযাত্রার পদক্ষেপ দ্রুততর, ট্রেন ধরতে হয় মিনিট গুণে, বাড়ি গাড়ির স্ট্রীম-লাইন খরচও কমায় চোখেও ভালো লাগে, ইত্যাদি। রেডিয়ো-টেলিফোনের যুগে কথার দায়িত্ব বেড়েচে—রক্ষা হয়েচে কিনা বল্‌চি না—কাগজী লেখারও শ্রেষ্ঠত্ব দুকথায় দশ কথার কাজ সারা। সাহিত্য-শিল্প চতুর্দিকের প্রভাবমুক্ত নয়। সংহতির তাগিদে বিনোদনপর্ব যদি শেষ হয়ে থাকে সেটা সাংঘাতিক খবর. আশা করা যাক্ পত্রে পল্লবে ঝিনুকের গায়ে মানুষের কথায়—এবং কবিতায়—দস্তরমতো দরবারী সুরটা এমনকি প্রলাপের বর্ণচ্ছটাও থেকে যাবে। মনোরঞ্জনের নূতন সুরও দেখা দেয়—সাম্প্রতিক কাব্যে যাদের মন ভুলেচে তারাই জানে।

ঝর্নাছন্দের বিপদ সহজেই কথা এলিয়ে পড়ে। এইখানে তার ইমান নষ্ট কেননা দৃঢ়তার বিশেষ দাবী তার আঙ্গিকে। প্রচলিত ছন্দ এবং মিল পরিহার ক'রে তার ঝোঁকটা পড়ে মেরুদণ্ডের উপর। ঝর্নাকাব্য বিচিত্ররূপী—রবীন্দ্রনাথের রচনায় দেখি দুরকম নয় বহুশ্রেণীর উৎকর্ষের চূড়ান্ত—কিন্তু সাধারণভাবে বলা চলে ঝর্নাছন্দে স্মরণীয়তা এবং পরিমিতির মাধুর্য আন্‌তে হয় সুযৌক্তিক সুঠাম বাক্যের গাঁথুনিতে। কারিগরির বিশেষ আইন এই জাতীয় শিল্পকে মান্‌তে হবে। পরিমাণের স্বল্পতা এবং উপমা অলঙ্কারের ঘনিষ্ঠ বর্ণিকাভঙ্গ নিয়ে ঝর্নাছান্দসিক কাব্যের একটি মহল গ'ড়ে উঠল। বাংলা কবিতায় তার পরিচয় পাই—সমরবাবুর "গ্রহণ" তার অন্তর্গত।

আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে ঝর্নাছন্দ এসেছিল হুইটমান্ প্রবর্তিত বন্যাছন্দের প্রতিক্রিয়ারূপে—যদিও মার্কিন কবিকে প্রেরণার মূল্য আধুনিকেরা দিয়েছিলেন। অবশ্য প্রধান আপত্তি ছিল ছন্দে-গাঁথা মিলান্ত ভিক্টোরীয় বাক্‌বাহুল্যের প্রচলনে।

ছন্দের মিলের এবং ভিড়-করা উপমার ক্ষুধা মেটাতে বিস্তর জায়গা লাগ্‌ত। কাব্যিক সংস্কারের দাবী নিয়ে বক্তব্যের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয় উপস্থিত—প্রথাগত ছন্দ-বংশীয়ের দল। ঝঙ্কৃত বাচনিকতায় ফাঁপা ভাবকে অনন্তের রূপ দেবার বিদ্যা সংসারে পাকা হয়েছিল, আচ্ছন্ন পাঠকের মন সম্ভ্রমে অসতর্ক হয়ে থাকৃত। ঘন-নিবিষ্ট পরিসরের মধ্যে কেন্দ্রিক তন্ময়তা জাগানোর শিল্প অন্যপর্যায়ের, পূর্বেও ছিল এখনও আছে, কিন্তু গত বড়ো যুদ্ধের আগেই ইংরেজ কাব্যে তার দিকে মন ঝুঁকল। ঝর্নাছন্দের লীরিকে এই টেক্‌নীকের সাধনা চলেচে। ওঁরা ভাবলেন সাহিত্যিক আসর হতে কথা-ছাঁটাই আইন জারি ক'রে অন্ততপক্ষে কাঁচা লেখকগুলিকে চেতিয়ে তুল্‌বেন। পদের অন্তস্থ মিল বর্জন ক'রে মিলের বিন্যাস দেখাও। স্রোতবৃদ্ধির জন্যে টেম্‌স্‌-এর জল না ঢেলে স্রোতটাকেই বেগবান করো। যেমন, যেন, মতো, সেইমতো, মনে হয় যেন, তেমনই ইত্যাদি কথা (এর ইংরেজি প্রতিশব্দ) যথাসম্ভব কমিয়ে, এমনকি, বর্জন ক'রে উপমার অব্যবহিতা রক্ষা হোক্‌। যেখানে জোরালো একটি উপমায় চলে, একই স্থানে হৃদয়কে অরণ্য সমুদ্র এবং মরুভূমি বল্‌লে পাঠকের হৃদয়ের দিক থেকে লাভ নেই। লাইন বিভাগ সম্বন্ধে কানের সূক্ষ্ম মাত্রাবোধই শ্রেষ্ঠ বিচারক, অভ্যাসমুক্ত কান। উপক্রমণিকা এবং পরিশিষ্ট বাদ দিয়ে সোজা আরম্ভ করো এবং নির্ভয়ে থামো। "আমি" ব্যক্তিটিকে আড়ালে রাখা ভালো; খুসি হয়েচি কি হইনি না ব'লে অবস্থাটার ভিতর থেকে বলো, আমরা বুঝে নেব। চাঁদের আলোর ছবিতে চাঁদা মামাকে প্রকাণ্ড ক'রে না-ই দেখালে, এতটুকু দৃশ্যে জ্যোৎস্না গাঢ় হোক্‌। সংস্কারের প্রতিষ্ঠা রইল বাক্যের আবহাওয়ায়—প্রচ্ছন্ন সংস্কারে—দলিলসুদ্ধ উপস্থিত করা পণ্ডশ্রম। উল্লেখ, ব্যঞ্জনা, প্রাসঙ্গিক শব্দের ইঙ্গিত রচনা করো। সায়ান্স যেখানে বিশ্বরহস্য জাগাবার কথা জুগিয়েচে, নূতন প্রতিষ্ঠিত শব্দ ব্যবহার্য। অনুভূতি এবং আঙ্গিকের যুগসম্মত নবীনতা পরিত্যাজ্য নয়, গ্রহণীয়। মনে পড়চে না আরো কত অনুশাসন ছিল, ভাবার্থ দেওয়া গেল। দেখা যাচ্চে আধুনিক সংহতির আদর্শ শুধু কায়িক নয়, মনোধর্মী।

আইন-জারি ক'রে কাব্য হয় না। কারুকৌশল্য হারিয়ে ঝর্নাছান্দসিকের দল শিথিলবাক্যে ফিরে এলেন। মিল-বর্জনটাই রইল সঙ্কল্পের চিহ্নস্বরূপ; চার পাতা ধ'রে পা ছড়িয়ে এলোমেলো কথা বল্‌বার বিলাস আধুনিক সংস্করণে দেখা দিল। উদ্যোক্তা যাঁরা ছিলেন, দল সম্বন্ধে হাল ছেড়েও নিজেরা ছাড়লেন না। নূতন সচেতনার ফলে যাঁরা টিকে গেলেন তাঁদের দুএকজন আজ য়ুরোপীয় সাহিত্যে অগ্রণী। য়েট্‌স্‌ ঝর্নাছন্দে নামেন নি, ছন্দমিলের মধ্যেই রচনা সংস্কৃত করলেন। আশ্চর্য ঘন দৃঢ়তা তাঁর শেষ লেখায় দেখা দিল।

সমরবাবুর লেখায় পরিচ্ছন্নতার আদর্শ লক্ষ্য করেচি। অনন্যতার সাধনায় ভাবের মূল সূত্র অদৃশ্যপ্রায় হয়েচে, সংশ্লিষ্ট বাক্যের তির্যকভঙ্গী ইসারায় কথা না ব'লে জটিলতার সৃষ্টি করেচে তারও প্রমাণ আছে। উগ্র উপমা যেখানে মনকে

প্রতিহত করেচে, তাঁর দৃষ্টির সঙ্গে মেলেনি তাকে মানব কেন—অবশ্য পাঠকের মনেও ব্যক্তিগত বাধা লুকিয়ে থাকে। কিন্তু বিচারকের আসনে ব'সে ত্রুটির তালিকা বার করবার অধিকার বা শক্তি আমাদের অনেকেরই নেই যেহেতু দেশ এবং কালের দ্রুত ধারায় আবর্তিত হয়ে কূলের সন্ধান পাইনি। সমসাময়িক কবিত্বের সন্ধান পেলে সেইটে পরম লাভ। সেই পরম লাভের খোরাক "গ্রহণ"-এ ছড়ানো।

> "জীবিকার স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন,
> আশেপাশে ব্যর্থতায় চিরকাল মৃত্যু আসে আর যায়।" (পৃ. ৬)

এতে প্রায় কেউ আপত্তি করবেন না। এমনকি, "জীবিকা" কথাটায় কবিত্বের স্বাদই পাবেন।

> "আজ বহুদিনের তুষার স্তব্ধতার পর
> পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ!
> তাই বসন্তের কার্জন পার্কে
> বর্ষার সিক্ত পশুর মত স্তব্ধ বসে
> বক্রদেহ নায়কের দল।" (পৃ. ১৬)

ঠিক উৎরেচে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু ইঙ্গিতগুলি ভঙ্গীকে অতিক্রম ক'রে, কখনো বা ভঙ্গীকে বাহন করেই, পৌঁছেচে। উল্লেখের নিপুণতা উপভোগ্য—আধুনিক কাব্যে উল্লেখের পনেরো আনাই অবশ্য রবীন্দ্রনাথের রচনা নিয়ে কেননা তাঁর সৃষ্টি আমাদের মানসিক, এমনকি যেন জৈবিক সত্তার অন্তর্গত।

> "আজ সহর হতে বহুদূরে শালবনের পথে
> বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
> বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য,
> বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শৃগাল, কোকিল ডাকে।" (পৃ. ৭)

এই ছবিতে কারো বাধবে না, শেয়াল-কোকিলের সমবায় লাল সন্ধ্যায় মিলেচে।

> "দীর্ঘদিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
> উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
> গরুর গাড়ির ছায়ার পিছনে
> স্খলিতস্মৃতি ভ্রান্ত কুকুর ঘোরে।" (পৃ. ৭)

এটাও বাধা উচিত নয়, ছায়া আলোর সংঘাতে শুকনো কবিত্বের রস আছে, যেমন খেজুর গাছে।

> "ধাবমান কাল
> ট্রেনের লৌহরেখার উপরে আজো আনে লোহিত-হলুদ চাঁদ।" (পৃ. ৮)

আধুনিক কাব্যে এর চেয়ে নিবিড় এবং নিখুঁত উপমার ব্যবহার জানি না। অনেকগুলি ভাব এবং ছবি একীভূত হয়েচে সন্ধিক্ষণে—জ্ব'লে উঠেচে। চলন্ত মহাকালের প্রসঙ্গ আন্‌ল লোহিত-হলুদ চাঁদ; তাতে প্রাচীন অথচ শঙ্কিত আশার ভাব জড়ানো; পৃথিবীর অন্ধকারে ঝল্‌চে ইস্পাতী রেখা মর্ত্য চলাচলের। "আজো আনে" কথা দুটিতে কালের নৈর্ব্যক্তিকতা অথচ ঔদাসীন্য ছাপিয়ে সংসার সম্বন্ধে একটি প্রতীক্ষা র'য়ে গেল। আসন্নতার ইসারায় রেলোয়ে লাইন মিলেচে—যে-কোনো মুহূর্তে ট্রেন আস্‌তে পারে। অথচ এক আঁচড়ের টান।

"বসন্ত" নামক পাঁচ লাইনের কবিতাটি উদ্ধৃত করি :—

> "বসন্তের বজ্রধ্বনি অদৃশ্য পাহাড়ে।
> আজ বর্ষশেষে
> পিঙ্গল মরুভূমির প্রান্ত হ'তে
> ক্লান্ত চোখে ধানের সবুজ অগ্নিরেখা দেখি
> সুদূর প্রান্তরে।" (পৃ. ১৬)

সুন্দর ছবি কিন্তু শুধু জাপানী অর্থে নয়। "বসন্তের বজ্রধ্বনি" এবং "অদৃশ্য পাহাড়ে"র মর্মে ঢুকলে ছবিটা গভীরতর সুন্দর হয়ে দেখা দেবে। একদিকে "পিঙ্গল মরুভূমি" "ক্লান্ত চোখ" "বর্ষশেষ", অন্যদিকে "ধানের সবুজ অগ্নিরেখা" "বসন্তের বজ্রধ্বনি"—সংক্ষিপ্ত কটি কথায় এতখানি ধরল। ধরা সম্ভব হল তার একটি কারণ রবীন্দ্রনাথের "বর্ষশেষ" এবং অন্য কবিতার সংস্কার আমাদের মনে জমা আছে—বেশি বলার দরকার ছিল না। (অন্য কবিতায় একটি লাইন আছে "নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা"—কালীপ্রসন্ন সিংহের লাইনটা মনে পড়বে। তা ছাড়া "তাজমহল" কবিতা পড়া থাকলে এর মধ্যে পাঠক আরো অনেকখানি পাবেন। সমরবাবু জানেন আমরা "তাজমহল" পড়েচি, না পড়ে থাকলে দায়িত্ব আমাদের। "শুধু" কথাটা স্মারক।)

> "গম্ভীর শব্দে সহরের উপরে আকাশ কাঁপে
> নিচে বিবর্ণ বস্তি
> আর হলুদ ঘাসের মাঠ
>
> মাটির উপরে গ্রীষ্মের পাতাগুলি কঠিন পাথর।" (পৃ. ১)

অথবা

> "নরকের ধিক্কারের পর
> দিনশেষের নিমেষের সোনার ঝঙ্কারে
> নীল প্রশান্তি শূন্যে ডানা মেলে
> রক্তসন্ধ্যায়।" (পৃ. ৩৩)

ছবির পরে ছবি। ধরনটায় নূতন চেতনা আছে এবং নিজস্ব খনির সন্ধান। "যাত্রা" নামক কবিতাটি চার লাইনের—

"একচর সূর্য গেল চলে
রাত্রে মরুভূমিতে শিশির ঝরে,
পৃথিবীর সীমান্তে দেখি যাযাবর নক্ষত্রের
এক রাত্রির নীড়।" (পৃ. ৩১)

স্নিগ্ধ রাত্রে মরুভূমির বক্ষে নয় উর্ধ্বে আকাশযাত্রীর কারাভান।
মিলের বিন্যাসের কথা বলেচি : কিছু পরিচয় মিলবে "গ্রহণ" নামক কবিতায়।

"দীর্ঘ দিন গ্রীষ্মের পিচে কেঁপে
সন্ধ্যায় শূন্যগর্ভ, স্বস্তিহীন।
কিসের আগ্রহে আদিম আকাশ
নিঃশব্দে নেমে আসে
শ্বাসরোধ করে"··· (পৃ. ২৯)

উপভোগ্য। মিলের পাশে এসে ছেড়ে দেওয়া শক্ত। কলম ধরলেই আজ ঝাঁকে ঝাঁকে তৈরি মিল আমাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়। ইচ্ছামতো তাদের রাখা ঢাকা এবং প্রচ্ছন্ন পরিচয় দেবার সজাগ কারিগরি দরকার হয়েচে। তৎসত্ত্বেও আশা করচি সমরবাবু লাইনের শেষে মিল বা অর্ধমিল পরীক্ষা করে দেখবেন।

সূক্ষ্মবুদ্ধিজাত রসিকতাকে কবিত্বে পরিণত করার শক্তি সমরবাবু নানা জায়গায় দেখিয়েচেন। পশ্চিমী গীতিকাব্যে তার বিশেষ উৎকর্ষ দেখা দিয়েচে।

(ক) "ছিন্নভিন্ন সময়ের জালে
বন্যার জলে মাছধরা।" (পৃ. ৩১)

(খ) "বন্ধ মহাকাল
ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা।" (পৃ. ১০)

(ক) রসাত্মক এবং (খ) শ্লেষাত্মক নমুনা। অথচ কবিত্বে গ্রথিত। এরকম দৃষ্টান্ত "গ্রহণ"-এ খুব বেশি নেই, কেননা রসিকতার মাত্রা রেখে গীতিকাব্য রচনা করা সহজ নয়। বিদ্রূপের প্রহরণ ব্যবহার করতে গিয়ে সমরবাবু শেষটায় গদা হাতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে নেমেচেন তার প্রমাণ আছে, ফ্যাসিজম্‌-কে মারতে গিয়ে যেমন ফ্যাসিস্ট হয়। কিন্তু সমস্ত ভাঙ্‌-চুর ঘৃণ্যতা অতিক্রম ক'রে "গ্রহণ"-এর শাঁখ বেজেচে, সেখানে গদা বা প্রহরণের কথাই ওঠে না।

"তবু জানি
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।" (পৃ. ৫)

সাধারণভাবে কথাটা বলেই সমরবাবু ছাড়েন নি। তীক্ষ্ণ সামাজিক দৃষ্টি পড়ল মর্ত্য সম্ভাবনায় ; দেখা দেবে

> "হয়ত অনেক যন্ত্রণার পর
> নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
> এক শ্রেণীহীন সাম্যরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত পৃথিবী" (পৃ. ২৪)

বলা বাহুল্য এটা গ্রহণের পরবর্তী অবস্থা। ছায়ার সংগ্রাম কেটেচে, কিম্বা আর্মিষ্টিস্, কেননা

> "তবু কিছুদূরে প্রখর রৌদ্রে ঘোরে
> মহাযুদ্ধের ভগ্নদূত…" (পৃ. ৪)

আধুনিক কাব্য কী বলতে চেষ্টা করচে তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আমাদের বক্তব্য যদি ফুরিয়ে থাকে তাহলে আরম্ভ করেচি কেন ? সৃষ্টিরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি কিন্তু ভাবের এবং টেক্‌নীকের বহু পরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাংলার নূতন সাহিত্যে একটি বিচিত্রমুখী উদ্যম দেখা দিয়েচে না স্বীকার ক'রে উপায় কী ?

> "আবার দিকে দিকে যুগান্তরের ডম্বরু বাজায়
> উদ্যত জীবন্ত পৃথিবী।" (পৃ. ২)

নূতন কবি এই ব'লেই আরম্ভ করেন।

সরোজকুমার দত্ত

অতি আধুনিক বাংলা কবিতা

(গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা)

১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি সম্মেলনের যে অধিবেশন হয় তাহাতে শ্রীবুদ্ধদেব বসু ও শ্রীসমর সেন আপন আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করিয়া দুইটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। শ্রীযুত বুদ্ধদেব বসু-র প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা প্রথম বর্ষের 'অগ্রণী'র দ্বিতীয় সংখ্যায় আলোচনা করিয়াছি, উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শ্রীযুত সমর সেনের রচনার সমালোচনা করিতে বসিয়া তাঁহার প্রবন্ধের বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন। কারণ, প্রথমত ঐ প্রবন্ধটি (In Defence of the Decadents) নাকি বিশেষ প্রতিপত্তিশালী উদীয়মান এক লেখক-সম্প্রদায়ের সাহিত্যিক অভিমত সুসম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত করিতেছে, অর্থাৎ উহা কোনো সুসমৃদ্ধ দলবিশেষের সরকারী ইস্তাহারের সামিল এবং দ্বিতীয়ত উহা আলোচ্য কাব্যপুস্তিকার গ্রন্থকারের আত্মসমর্থন—In Defence of the Decadents। সমালোচকের সময়াভাব ও 'অগ্রণী'র স্থানাভাব-বশত প্রবন্ধটি হইতে বিস্তৃত আক্ষরিক উদ্ধৃতি সম্ভব নহে।* সংক্ষেপে উহার মুখ্য বিষয়গুলি এই : (১) ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী : (২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজীর ইংরেজ কবি T. S. Eliot এর কাব্য ; (৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি : (৪) কিষাণ-মজদুর লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাঁহাদের উত্তেজক সাহিত্য রচনার নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমাণ্টিক হইবার ভয়ে ঐ নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

কবির (১) অভিমত সম্পর্কে কবির সহিত আমাদের কোনো বিরোধ নাই, আমরাও আশাবাদী ও সাম্যবাদী সমাজ ও প্রগতিতে বিশ্বাসী। কিন্তু (২) অভিমতে কর্মভীরু বুদ্ধিজীবীর চিন্তার অন্তঃসারশূন্যতা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। ধ্বংসোন্মুখ

* 'In Defence of the Decadents' প্রবন্ধটির পূর্ণাঙ্গ পাঠের জন্য বর্তমান সংকলনের 'English Section', এবং New Indian Literature-এর প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় 'Commentary'-র জন্য 'জীবন-পঞ্জি' দ্রষ্টব্য।

ধনতন্ত্রী সমাজ (আমাদের সমাজ কি সম্পূর্ণরূপে ধনতন্ত্রী ?) যে decadent, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের (as they are) সাধনা অসম্ভব, স্বীকার করি। কিন্তু বিগতপ্রাণ সত্যশিবসুন্দরের পুনরুজ্জীবনের (Revival-এর নহে) সাধনাও কি অসম্ভব ? এ সাধনা চক্ষু মুদিয়া, শিরদাঁড়া খাড়া করিয়া পণ্ডিচেরী-মার্কা সাধনা নহে, কিংবা মাঘোৎসবের সাম্বৎসরিক শান্তিপাঠ ও মানবকল্যাণ কামনাও নহে। এ সাধনার অর্থ—সংগ্রাম, struggle। সমাজ যেখানে decadent, সামাজিক কোনো আন্দোলনকে সেখানে বিপ্লবীরূপ পরিগ্রহ করিতে হইলে আপনার অঙ্গ হইতে decadence-এর শেষ দাগ পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে, সেইজন্য decadent-সমাজ হইতে উদ্ভূত সামাজিক বিপ্লবী আন্দোলন communism-এ হতাশা, অবসাদ, আত্মবিলাপ সাফল্য-স্বপ্নভীরু পরাজিতের ক্লীব-কান্নার স্থান নাই। চিন্তা, কর্ম ও উৎপাদনের উদ্দাম বিশৃঙ্খলার মধ্যে classical শৃঙ্খলাই এই আন্দোলনের উপজীব্য ও justification, decadence-এর অবলুপ্তি প্রচেষ্টাই communism-এর সার্থকতা। বর্তমান decadent যুগের যদি কোনো আন্দোলনে যুগধর্মের অজুহাতে decadence প্রবেশ করে এবং যুগধর্মেরই দোহাই পাড়িয়া কায়েমী হইয়া বসে, রাষ্ট্রিক হোক, সাহিত্যিক হোক, সে আন্দোলনকে decadent অতএব reactionary বলিবার নিষ্ঠুর কর্তব্যজ্ঞান যেন আমাদের থাকে। কোনো সাহিত্য যদি ক্ষয়িষ্ণু গলিত সমাজের উপদংশ ক্ষতগুলিকে যথা-সম্ভব যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে, এবং তথাপি উদ্দেশ্যবিহীন হয় কিংবা কোনো ভাবাদর্শের সহিত সংশ্লিষ্ট না হয় তবে উহা যান্ত্রিক ও জড়ের জঞ্জাল হইতে বাধ্য এবং সাহিত্যিকের পক্ষে উহা এক নিকৃষ্ট শ্রেণীর লালসা নিবৃত্তির উপায়ও বটে। উপায় ও ভাবাদর্শই সাহিত্যের অন্তর, ইহাদেরই যুগল নিকষে সাহিত্যের আন্তরিক-তার পরীক্ষা হয়। Decadent সমাজের সাহিত্যে decadence আন্তরিকতার লক্ষণ রহে, ইহা কর্মবিমুখতা ও গোপন বিপ্লব-বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। ইহা subjective initiative-এর অস্বীকার এবং আত্মনিক্রিয়তা সমর্থনকল্পে ঐতিহাসিক অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস। ইহা Marxism নহে। বর্তমান জগতে Marxism ভিন্ন অন্য কোনো ভাবাদর্শ যে বৈপ্লবিক নহে একথা আমি বলিতে চাহি না : আমি বলিতে চাহি যে, যাহা Marxism নহে তাহাকে Marxism বলার মধ্যে বিপ্লব বা প্রগতির নামগন্ধও নাই। নিজের কাব্যের বৈপ্লবিকতা সপ্রমাণের জন্য শ্রীযুক্ত সেন ইংরেজ কবি T. S. Eliot-এর নাম করিয়াছেন কিন্তু একথাটি সুকৌশলে চাপিয়া গিয়াছেন যে T. S. Eliot নিজেকে কোনোদিন Marxist বলেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার সাম্যবাদবিরোধিতা যে Roman Catholic Church ও মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহা তিনি স্পষ্টরূপেই স্বীকার করিয়াছেন। এ-উক্তি তাঁহার সাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ সুসমঞ্জস। ব্রিটিশ decadence-এর সর্বশ্রেষ্ঠ পদকর্তা T. S. Eliot নিষ্কলুষ decadence-এর সুদীর্ঘ পদাবলী রচনা

করিয়া গেলেন অথচ তিনি Roman Catholic Monarchy-তে বিশ্বাসী। বলা বাহুল্য, সাম্যবাদের শত্রু, চিরজীবন ধরিয়া তিনি decadence নিঙড়াইয়া গেলেন, এক ফোঁটা বিপ্লব পাওয়া গেল না। শ্রীযুক্ত সেন হয়তো বলিবেন যে তাহার সাহিত্যের objective মূল্য সম্পর্কে তিনি সচেতন নহেন, প্রতিক্রিয়াশীল সাহিত্যিকের সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ তৈয়ারী করিয়াছে। কিন্তু তিনি গলিত ক্ষত দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া পাতার পর পাতায় তার বর্ণনা-বিলাস করিলেন, গলিত ক্ষত আর কাহারও দেখিতে না হয় তজ্জন্য যাঁহার কাব্যে কোনো উৎকণ্ঠা বা প্রচেষ্টা দেখা গেল না, বিপ্লবী উৎকণ্ঠা বা বিপ্লবী প্রচেষ্টাহীন এই বিশুদ্ধ cynicism-এর উপর ভবিষ্যৎ বিপ্লবী সাহিত্যের ভিৎ যাঁহারা গড়িতে চাহেন তাঁহারা হয় নির্বোধ, না হয় প্রবঞ্চক। সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'People say'।

ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নহে, living, passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে, আন্তরিকতার খড়্গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধী-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনও তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, প্রাক্বলশেভিক গোর্কীর সাহিত্যের বৈপ্লবিকতাকে বলশেভিকরা অস্বীকার করিতে পারেন নাই, অহিংস টলস্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহু-বিদিত। ভাবাদর্শের দিক হইতে দেখিলে D. H. Lawrence-এর সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার চূড়ান্ত কিন্তু ভাবাদর্শ তো এখানে মুখ্য নহে। তাহার ভাববলিষ্ঠ জীবন্ত মন পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে যে রক্তসিক্ত পদচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার বিপ্লবীরূপকে অস্বীকার করিব কোন দুঃসাহসে? অপরপক্ষে অলডাস হাক্সলির গান্ধীবাদে বিশ্বাস কি আন্তরিক? যিনি জীবনে ভালোমন্দ কিছুতেই কোনদিন বিশ্বাস করিলেন না, তাহার এই হঠাৎ-বিশ্বাসের পশ্চাতে কি বিরাট ফাঁকি নাই? মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রম-বিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক বেদনায়, উৎকণ্ঠায়. আর্তক্রন্দনে নিবিড়। Decadence-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণায় আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ, মহাভুজঙ্গের নির্মোক পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক—Revolutionary evolution towards a revolutionary ideology। ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে।

ইহা decadent সমাজের progressive বুদ্ধিজীবীর প্রাক্‌বিপ্লবী জীবনের বৈপ্লবিক পাথেয়। বর্তমান ইয়োরোপীয় সাহিত্যে রোলাঁ, বার্বুস ও মালরোর শ্রেণীবিচ্যুতির পশ্চাতে এই প্রচণ্ড বেদনার ঐতিহ্য বর্তমান।

শ্রীযুত সেন ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত সমাজের অধিবাসী অথচ বিপ্লবী। অতএব, স্বভাবতই আমরা তাঁহার কাব্যে ভাবাদর্শের বেদনাময় পরিণতির একটি পথরেখা আবিষ্কার করিব। কিন্তু কোথায় সে পরিণতি? ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ক্ষয়িষ্ণু কবি শ্রীযুত সমর সেনের সাম্যবাদী ভাবাদর্শ উর্বশীর মতো 'যখনি জাগিলে বিশ্বে যৌবনে গঠিতা পূর্ণ প্রস্ফুটিতা'। কবি ক্ষয়িষ্ণু বলিয়া কাব্যও ক্ষয়িষ্ণু হইবে, কিন্তু ভাবাদর্শ হইল সমস্ত ক্ষয়, অপচয়ের উর্ধ্বে সুগঠিত, সুসম্পূর্ণ, সুসমৃদ্ধ সাম্যবাদ। কোকেনের প্যাকেটে ঔষধের লেবেল মারিয়া দিবার মধ্যে যেটুকু বাহাদুরী আছে তাহা শ্রীযুত সেনেরই প্রাপ্য। একটি উদাহরণ দিই :

'তবু জানি,—
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে
ততদিন
ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস'

'তবু জানি'—কিন্তু তিনি জানিলেন কি উপায়ে? জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে, চূর্ণ হবে ভস্ম হবে, এ জ্ঞান তাঁহার কোথা হইতে আসিল? বিপ্লবী আন্দোলনের ভিত্তিমূল শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তো তাঁহার নাই। অভিজ্ঞতার পরিধি তো একদিকে অশিব, অসত্য, অসুন্দর মধ্যবিত্তজীবন ও অন্যদিকে—

'আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে,
রক্ত-পতাকা আকাশে ওড়ে,'

এই পর্যন্ত। তিনি তো Marxist—তিনি তো গান্ধীর মতো inner voice কিংবা সুভাষ বসু-র মতো intuition-এ বিশ্বাস করেন না। এ ভাবাদর্শ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন কোন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ও বেদনার সংঘাতে? বর্তমান decadent মধ্যবিত্ত সমাজে বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর ভিড়ের মধ্যে Text Book Marxism-এর যে সহজ সিদ্ধির পথ শ্রীযুত সেন আবিষ্কার করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বৈষয়িক ধূর্ততার প্রশংসা না করিয়া আমরা থাকিতে পারি না। 'রোমান্টিসিজম'-ভীরু কবির ভাবাদর্শ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিচ্যুত হইয়া রোমান্টিক হইয়া উঠিয়াছে, কবির কি সে খেয়াল নাই।

কিষাণ-মজদুর, লালঝাণ্ডা-ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া উত্তেজক কাব্য-রচনার হুকুম কেহ কোনোদিন শ্রীযুত সেনকে দিয়েছেন কিনা জানি না, বোধহয় এ অভিযোগ শ্রীযুত সেনের স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু কেহ যদি বিপ্লবী-কবিযশাকাঙ্ক্ষী কাহাকেও

সমাজের অগ্রগামী বিপ্লবীশ্রেণীর জীবন বৈপ্লবিক ভঙ্গীতে দেখাইবার অনুরোধ করেন, তবে কি তাঁহার অনুরোধ অযৌক্তিক হইবে? শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। **Revolutionary Training** এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল। শ্রীযুত সেনের এ ফাঁকিকেও না হয় আমরা ক্ষমা করিলাম, কিন্তু যে মধ্যবিত্ত জীবনের সহিত তাঁহার জন্মগত ও ঐতিহ্যগত প্রাত্যহিক পরিচয় তাহার গলিত, স্থাবর ও নপুংসক রূপটিই তাঁহার চোখে পড়িল, অথচ ইস্পাত-কঠিন যে অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লব-প্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে ও দিতেছে তাহার কঠোর সুন্দর রূপ, তাহার শ্রেণীবিচ্যুতির বেদনা-ইতিহাস, তাহার বুদ্ধিবিদগ্ধ আশাবাদের কোনো আভাস শ্রীযুত সেনের কাব্যে মেলে না। শ্রীযুত সেন যে কাব্য-আন্দোলনের উত্তর-সাধনা করিতেছেন তাহা অতীতে মধ্যবিত্তপরিচালিত বিপ্লবী আন্দোলনকে উপেক্ষা করিয়াছে—অসহযোগ, আইন অমান্য ও সন্ত্রাসবাদের সহিত কোনো সম্পর্কই রাখে নাই, তাই আজ সাম্যবাদী আন্দোলনের সহিত তাহার এই ঐতিহ্যহীন একত্ববোধের পশ্চাতে যে বিরাট প্রবঞ্চনা রহিয়াছে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই।

সমালোচনা দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে. এইবার শ্রীযুত সেনের কাব্যের আঙ্গিক সম্পর্কে কিছু বলিয়া উপসংহার করিব। শ্রীযুত সেনের কবিতা সাধারণের বোধগম্য নহে—কেবলমাত্র 'chosen few'-এর উপভোগ্য। আমি যথেচ্ছ দুইটি স্থান উদ্ধার করিতেছি:

আকাশচরের শব্দ আকাশ ভরায়।
নীবিবন্ধে কূটগ্রন্থি,
শিবিরে আর নিবিড় মায়া নেই
তুষার পাহাড়ের শান্তি যদিচ শিশিরে ঝরে।

কিংবা,

পেস্তাচেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া
অন্ধকূপে স্তব্ধ ইন্দুরের মতো,
ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে
বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।

এ কবিতা **'Intellectual clique'**-এর জন্য লেখা, আমার আপনার জন্য নহে। পাঠক-সম্প্রদায়ের প্রতি এই সানুনাসিক অবহেলা, আপনার কাব্যকে সর্বসাধারণের উপভোগ হইতে বাঁচাইয়া দুর্বোধ্য করিবার এই গলদঘর্ম প্রয়াস, ইহা আর যাহাই হউক, বিপ্লবী মনোভাবের পরিচায়ক নহে। মসীকৌলীন্যের অভিমানে শ্রীযুত সেন

আজ আর্টের প্রচাররূপ ও communicativeness-কে পরোক্ষভাবে অস্বীকার করিতেছেন। রচনার আবেদনের পরিধি সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া ক্রমে-আত্মতৃপ্তিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। এই শম্বুকবৃত্তিকে কি বিপ্লব প্রচেষ্টা বলিব? ইহা বিপ্লবের নামে individual anarchy-র চরম অবস্থা মাত্র। সমুদ্রপারে subjective individualism-এর যে ঐতিহাসিক আন্দোলন একদা বিপ্লবরূপে উদ্ভূত হইয়া অবশেষে কালের কঙ্কালপথে বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছে, সাম্যবাদের ছকরূপে ইহা তাহারই অনুকরণহীন অনুকরণ মাত্র।

কাব্যের বিষয়বস্তু, কাব্যের উৎসমুখ, কাব্যের দায়িত্বের প্রশ্নকে ছাপাইয়া আজ কাব্যের আঙ্গিকের প্রশ্ন বড় হইয়া উঠিয়াছে। যৌবনের তাগিদে বল্কল পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, খুশিমতো বল্কল পরিবর্তন করিলে সঙ্গে সঙ্গে দেহেরও পরিবর্তন হইবে ইহা মনে করা বাতুলতা। বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও অভ্যন্তরীণ তাগিদেই আঙ্গিকের পরিবর্তন হইবে, ইহার জন্য সচেতন প্রচেষ্টা হয় নির্বোধ কালক্ষয় নতুবা সংগ্রাম এড়াইবার প্রচেষ্টা। Technique fetishism-এ ইহার অনিবার্য পরিণতি। ঘোড়া আসিলে চাবুকের জন্য ভাবিতে হইবে না। স্বল্পপরিসর প্রবন্ধে আমাদের বক্তব্য যথাযথভাবে বলিবার সুযোগ মিলিল না, বারান্তরে এ সম্বন্ধে আরও লিখিবার ইচ্ছা রহিল। ইতিমধ্যে শুধু এই কথাটি পাঠককে স্মরণ রাখিতে বলি যে, ইণ্টেলেক্টুয়ালী কুসংসর্গ হইতে সাম্যবাদের সাবধান হইবার দিন আসিয়াছে।

অগ্রণী, ২য় বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৪০

সমর সেন

উপরোক্ত নামের একটি সমালোচনা 'অগ্রণী'র এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে আমার কিছু বলার আছে, কারণ সমালোচক বিনা কারণে শূন্যে ঘন ঘন ছোবল মেরেছেন, এবং আমার লেখা 'In Defence of the Decadents' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি সম্বন্ধে তাঁর ঘোরতর আপত্তি, তার সারাংশ দিতে গিয়ে আমার বক্তব্যের বিকৃতি অনেক জায়গায় করেছেন। 'In Defence of the Decadents' New Indian Literature-এর দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পত্রিকাটি কাছে না থাকায় পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতে হয়েছে, ফলে দু'এক জায়গায় ভাষার অদল-বদল থেকে যেতে পারে। কিন্তু তাতে ভাবের দিক দিয়ে কোনো পার্থক্য নেই। হাওয়ায় ছোবল মারার কথা এক্ষেত্রে নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমালোচকের কী কারণে জানি না দৃঢ় ধারণা হয়েছে যে আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' কবি বলে প্রচার

করি, অথচ আসলে আমি নির্বোধ, কিংবা প্রবঞ্চক, বিপ্লবী নই ; এ নিদারুণ জুয়াচুরীর জন্য তিনি মর্মাহত ও ক্ষিপ্ত বোধ করছেন। এই মূল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা কিংবা অন্য লেখায় আমি নিজেকে 'বিপ্লবী' বলে জাহির করি নি, উপরন্ত কর্মভীরু পলাতক, আধাবাস্তব আধা-রোমান্টিক ভাবেই আমার কাব্যের নায়ককে বর্ণনা এবং বিদ্রূপ করে এসেছি। 'গ্রহণ'-এর নাম-কবিতায় যে টাইপের জীবন, এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক, সেটা বোঝাবার জন্য একটি লাইনও উদ্ধৃত হয়েছিল : The waking have a common world but the sleeping turned aside each into a world of his own. যদি লোকমুখে 'অগ্রণী'র সমালোচক 'বিপ্লবী' বিশেষণ আমার সম্বন্ধে শুনে থেকে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন, তাহলে আমি নিরুপায়। আমার প্রবন্ধটি বাংলা কবিতা এবং সমালোচনার কয়েকটি ধারার বিষয়ে লিখিত, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা…ব্যাখ্যা' করার কোনো উদ্দেশ্য তাতে ছিল না ; বাংলা কবিতার আলোচনাকে নিজের কবিতার আস্থায় রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হই নি। বরং তাছাড়া উপরোক্ত প্রবন্ধটির যে ব্যাখ্যা সোজা বাংলায় তিনি করেছেন, তাতে আমার মতো বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীর বিস্মিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি নম্বর করে প্রবন্ধটির সারাংশ (!) দিয়েছেন ! সে নম্বরগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে প্রবন্ধের কয়েকটি অংশ পড়লে মন্তব্যের প্রয়োজন আশা করি বিশেষ হবে না। '(২) ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ 'decadent' অতএব এ সমাজে সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।' (অগ্রণী, ২১৩ পৃঃ)

আমার প্রবন্ধের একটি অংশ : In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most.... Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralized pettybourgeoisie and lack the vitality of a rising class.'

'(৩) ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি।'

'Consciousness of decadence is certainly a power.' (In Defence of the 'Decadents') এখানে 'শক্তির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বৈপ্লবিক বিশেষণটি সমালোচক যোগ করেছেন। উপরোক্ত পংক্তিতে সচেতনতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে : 'Subjective initiative' আধুনিক কবিতায় অত্যন্ত প্রয়োজন সে কথা সমালোচক স্বীকার করেছেন। তাঁর অভিধানে সচেতনতার কী অর্থ সেটা আমার জানা নেই।

আর একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন : 'শ্রীযুত সেন বলিবেন, তিনি বিপ্লবী কবি বটে তবে বিপ্লবী শ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহার নাই, অর্থাৎ কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করিতে হইলে বিপ্লবীশ্রেণীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, সাহিত্যে কিংবা কাব্যে নহে। Revolutionary training এড়াইয়া বিপ্লবী সাজিবার ইহা এক অদ্ভুত কৌশল।' এ প্রসঙ্গের প্রথম বক্তব্য যে, আমার প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা কবিতা কী আমার নিজের কবিতা সম্বন্ধে 'বিপ্লবী' বিশেষণ একবারও ব্যবহৃত হয় নি, শুধু বলা হয়েছে যে গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, উন্নতি এবং বিপ্লব আশা করি এক কথা নয়। তাছাড়া গণ-আন্দোলনে যোগদানের সম্বন্ধে আমার প্রবন্ধে এই কয়েকটি কথা শেষের দিকে ছিল : 'Consciousness of decay is certainly a power. But a critical situation arises where we find that at a certain stage this also is not enough.... We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire re-construction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. . He who is bent on living in a little cell, all will be dying with a little patience.'

এলিয়টের নাম উল্লেখ করে আমি সমালোচকের বিরাগভাজন হয়েছি। তিনি লিখেছেন : 'সাম্যবাদীগণ ইলিয়টী সাহিত্যকে প্রতিক্রিয়াশীল বলেন, Marxist সেন তাহাকে বিপ্লবী বলেন, কারণ 'people say.'

আমার প্রবন্ধে এলিয়টকে বিপ্লবী কবি বলা হয় নি, তবে এটা বলা হয়েছে যে আধুনিক প্রগতিক ইংরেজ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব অসামান্য। অডেন প্রমুখাদি সাম্যবাদী কবিরা এলিয়টের প্রভাব এবং ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করতে কখনো কার্পণ্য করেন নি, এবং সাহিত্যে যে অন্তর্দৃষ্টি থাকলে এলিয়টী সাহিত্যের মূল্যবিচার সম্ভব তার উপস্থিতি কডওয়েলের 'Illusion and Reality' নামক পুস্তকে আছে। এবং আমার যতদূর জ্ঞান তাতে কডওয়েলকে সাম্যবাদী বলেই জানি। শক্তি থাকলে ধনতন্ত্রের অনেক গলিত অংশ নিঙড়ে বিপ্লবের ফোঁটা সংগ্রহ করা যে সম্ভব সেটা আমাদের সাম্যবাদী সমালোচক জানেন না কিংবা মানেন না, কিন্তু এলিয়টের 'decadence' নিঙড়ে অনেক ফোঁটাই আধুনিক ইংরেজ কবিরা কাজে লাগিয়েছেন (এ প্রসঙ্গে Day Lewis-এর 'A Hope for Poetry', Spender-এর 'The Destructive Element', 'The Arts To-day'-তে Macniece-এর প্রবন্ধ পঠিতব্য)।

আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁদের অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নি, সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই

শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন। এর কারণ কী? কারণ এদের অনেকে মধ্যবিত্ত জীবনের গ্লানি এবং বহুমুখী ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন, এবং সত্য শিব সুন্দরের অবাস্তব মায়া কাটিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী এবং প্রকাশভঙ্গীতে পরিবর্তন এনেছেন। নিপীড়িত শ্রেণীর আশা-ভরসা, কিংবা সংগ্রামের সংযম এঁদের লেখায় আজ পর্যন্ত বিশেষ মেলে না, কারণ গণআন্দোলনের সঙ্গে এরা সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন (মধ্যবিত্ত সমাজের 'ইস্পাতকঠিন যে অংশ ব্যক্তিগত ভাবাদর্শে কিংবা নিষ্ঠুর পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে বিপ্লব প্রবাহের সহিত আপনাকে মিশাইয়া দিয়াছে বা দিতেছে') তারা এখন পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসেবে নেওয়াই কর্তব্য। নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়। ভবিষ্যতে ইতিহাস অন্তত কানা মামা হওয়ার জন্য এঁদের মূল্য দেবে, এবং যদি তাঁরা জীবন ও সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত বিপ্লবী পরিবর্তন আনতে অক্ষম হন, তাহলে বিদায় দেবে। কিন্তু সে সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ বোধহয় সাম্যবাদী সমালোচনা-সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাবে। বর্তমানে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিষ্ফল আক্রোশ Marxist সমালোচনার নামে যদি চলে তাহলে বিস্মিত হওয়াটা মানসিক বিলাস, কারণ বাংলাদেশের আজ যে অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডারকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালি-গালাজ, যে উগ্র বামপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা পূর্বতন বাঙালী সন্ত্রাস-বাদের দায়ভাগ।

অগ্রণী, ২য় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৪০

সরোজকুমার দত্ত

১৯৩৬ সালের এপ্রিল লক্ষ্ণৌ-এ নিখিল ভারত প্রগতি সাহিত্যিক সঙ্ঘের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাহাতে গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটিতে বলা হইয়াছে: 'We consider that collectively and individually we stand in the ranks of those who are striving to build up a new social order...'

উক্ত সঙ্ঘের যে দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯৩৮ সালের শেষভাগে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতেই এই অংশের কোনো পরিবর্তন করা হয় না, উপরন্তু মোটামুটিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিজম্-বিরোধী পূর্বতন চারিটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক,

সংগ্রামাত্মক প্রস্তাবই গৃহীত হয়। মত প্রকাশের স্বাধীনতা হরণার্থ ভারতগভর্নমেণ্ট কতকগুলি স্বেচ্ছাচারী দমন আইন প্রণয়ন করিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে প্রগতি চিন্তাধারার কণ্ঠরোধ করিতে যে অভিযান চালান, তৎসম্পর্কে প্রথম প্রস্তাবটির শেষাংশে বলা হয়, 'The conference considers these restrictions to be a serious attack on the free cultural development of the country and calls upon all Indian writers to organise country-wide protests against the Govt. policy and to support all other efforts to secure the repeal of these laws.' চতুর্থ প্রস্তাবে বলা হয়, 'This conference considers that it is necessary for free cultural development of the students that they should have freedom to express themselves on all social and political subjects.' এই প্রস্তাবটিতেও পরোক্ষভাবে সংগ্রামের সংকল্পই প্রকাশ পাইয়াছে। সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস হইতে সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার যে সংকল্প এই অধিবেশনে গৃহীত হয় তাহাও সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সংগ্রামের রূপেই আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছিল। কারণ, যে দেশে 'huge and vital section of our population illiterate', অর্থাৎ সংস্কৃতি-বর্জিত, যে দেশে সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার অর্থ এই huge and vital section-এর অশিক্ষা অসংস্কৃতির নগ্নরূপ, ইহার কারণ ও প্রতিকারের নির্দেশ, 'aesthetic medium' এর সাহায্যে সংগ্রামমূলক মনোভাব লইয়া প্রস্ফুটিত করিয়া তোলা, রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী বা মেঘনাদ সাহার গবেষণাবলী এই 'huge ও vital section'-এর আয়ত্তাধীনে আসিবার পথে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়া সাহিত্যসম্ভোগ-ক্ষম পাঠক-সাধারণে রাজনৈতিক চেতনায় ও সংগ্রামে উদ্‌বুদ্ধ করা।

এই স্বীকৃতি, এই ইস্তাহার ও এই প্রস্তাবাংশসমূহ হইতে আমার ধারণা হইয়াছিল, প্রগতি সাহিত্য সঙ্ঘ একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান, কারণ তাহার গৃহীত কার্যসূচী বৈপ্লবিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ভিত্তিতে রচিত। এই কার্যসূচী উক্ত সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখা কতদূর অনুসরণ করিয়াছে, সে প্রশ্ন এখানে না তোলাই ভালো। তবে বঙ্গীয় শাখার একজন বিশিষ্ট ও উদ্যোগী সভ্য হিসাবেই শ্রীযুক্ত সেনকে জানি। তাই ভাবিয়াছিলাম কোনো বিপ্লবী সঙ্ঘের সহিত পরোক্ষ ও [illegible] তিনি নিজেকে বিপ্লবী না বলিলেও বলেন বৈ কি? তাঁহাকে বিপ্লবীমনা ভাবিবার আরও কারণ আছে। প্রবন্ধকাররূপে যখন শ্রীযুত সেনের সাক্ষাৎ পাই, তখন দেখিতে পাই ভাবাদর্শে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে সম্পূর্ণ সাম্যবাদী ঢং আনিবার চেষ্টা তিনি করিয়াছেন। 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের ১৩৪৫ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বাংলা কবিতা' শীর্ষক যে প্রবন্ধ তিনি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে লেখকের সাম্যবাদীমন্যতা সম্পর্কে পাঠকের বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

'পারিপার্শ্বিকের প্রভাব বিশিষ্টভাবে উপলব্ধি করা মেনে নেওয়া স্বাধীনতার 'সূত্রপাত' (Freedom is the recognition of necessity)।

'কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির স্থান কাল পাত্রের মুখাপেক্ষী'…

'ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী না থাকলে কাব্যের মূলসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব…'।

'দাস দেশে বুর্জোয়া (?) সভ্যতার অগ্রগতি অল্পদিন পরেই দমিত হয়, কারণ বর্ধিষ্ণু দাস দেশ বুর্জোয়া প্রভুর স্বার্থবিরোধী'।

'রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গী, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ।'

এই সকল বিপ্লবী মূলসূত্রের (Revolutionary principles of criticism) ভিত্তিতে যিনি সমালোচনা-সাহিত্য (Critical Literature) রচনা করেন এবং বলেন, 'জ্ঞাতসারে কোনো কবিতা বা অন্য লেখায় আমি নিজেকে বিপ্লবী বলে প্রচার করি নি' তাঁহাকে বলিবার আমার কিছুই নাই। In defence of the 'Decadents' প্রবন্ধটির বেলায়ও ঐ কথাই প্রযোজ্য।

তাঁহাকে বিপ্লবীমন্য ভাবিবার তৃতীয় কারণ, 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্রিকায় একাধিকবার তাঁহাকে বিপ্লবী বা সাম্যবাদী বলা হইয়াছে, 'বিপ্লবী অঙ্গীকার সমর সেন ও বিষ্ণু দের মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট।'—কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৮৭।

'সাম্যবাদীশিল্প যে নিছক বন্ধ্যাপ্রসূতি নয় তার উদাহরণ তো বিদেশে মাইকেল শোলোকভ, আপটন সিনক্লেয়ার, অডেন, ইশারউড ইত্যাদি। বাংলা কবিতাতেই বা সম্ভব হবে না কেন? সমর সেন বা বিষ্ণু দে তো এ ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় অপূর্ব সাফল্য দেখিয়েছেন।'—কবিতা, আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৯০।

শ্রীযুত সেন 'কবিতা' ত্রৈমাসিকের অন্যতম সম্পাদক, প্রত্যেক প্রকাশিত প্রবন্ধ সম্পর্কে তাঁহার সম্পাদকীয় দায়িত্ব রহিয়াছে।

এই সকল কারণে আমার ধারণা হইয়াছিল শ্রীযুত সেন নিজেকে বিপ্লবী বলিয়া মনে করেন। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, বিপ্লবী তো তিনি ননই, উপরন্তু কর্মভীরু, পলাতক, আধাবাস্তব, আধারোমান্টিকভাবেই তিনি তার নায়ককে বর্ণনা ও বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য, তাঁহার এই উক্তি যদি সত্য হয় (অর্থাৎ মহাত্মা ব্যক্তির বৈষ্ণব বিনয় না হয়) তবে এই উক্তিটি তাঁহার বহু পূর্বেই করা উচিত ছিল, বিলম্বে সত্যভাষণ সত্যগোপনের নামান্তর মাত্র।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য, 'আধাবাস্তব ও আধারোমান্টিক' কথাটি ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার সাম্প্রতিক আধা-সমাজতন্ত্র আধা-সাম্রাজ্যবাদের মতোই অর্থহীন ও কৌতুকাবহ। 'আধা-বাস্তব আধা-রোমান্টিক' না লিখিয়া শুধু রোমান্টিক লিখিলে শ্রীযুত সেন মানসিক সততার পরিচয় দিতেন। তৃতীয় বক্তব্য, এই স্বীকৃতি উপযুক্ত সময় করিলে আমার পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হইত।

ছোবল হয়ত শূন্যেই মারিয়াছি, কিন্তু বিষ বোধকরি যথাস্থানেই পৌঁছিয়াছে, নচেৎ অবিলম্বে এই তাগা বাঁধিবার প্রয়োজন হইত না। আত্মপরিক্রমাপথে 'মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীকে'র যদি এই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, The waking have a common world but the sleeping turn aside each into his own, অর্থাৎ তিনি যদি নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নজগতের অবাস্তবতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়া থাকেন তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, মুমূর্ষু শ্রেণীর হইলেও তাঁহার স্বীয় শ্রেণীর 'প্রতীকত্ব' ঘুচিয়া গিয়াছে, তিনি declassed বা শ্রেণীবিচ্যুত হইয়াছেন, এবং তখনও যদি তাঁহার আত্মপরিক্রমা অবিশ্রাম চলিতে থাকে, তখন তাঁহাকে সুকৌশলী জ্ঞানপাপী ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া চলিতে পারে? In Defence of the 'Decadents' প্রবন্ধ সম্পর্কে আমার অভিমতকে খণ্ডনোদ্দেশ্যে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, 'আপন সাহিত্য রচনার বৈপ্লবিকতা…ব্যাখ্যা' করার উদ্দেশ্য তাতে ছিল না। প্রবন্ধটির নাম In Defence of the 'Decadents' এবং তাঁহারই স্বীকৃতি অনুসারে তিনি নিজে একজন Decadent (অবশ্য সচেতন) এবং বর্তমান সমাজে এই সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রয়োজনীয়তাই যে এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, প্রবন্ধকার যদি তাহা অস্বীকার করেন, তবে তিনি সত্যকে অস্বীকার করিবেন। এই সমাজ-বিপ্লবের যুগে (In these times of…wars ..and revolutions—In Defence of 'Decadents') সামাজিক প্রয়োজনীয়তা বলিতে সমাজবিপ্লবের পরিপোষকতা—অর্থাৎ বৈপ্লবিকতাই বুঝিয়াছি, বোধ হয় ভুল বুঝি নাই। 'There is no middle position between Revolution and Reaction'—T. Cornford.

শ্রীযুত সেনের তৃতীয় অভিযোগ, আমি তাঁহার মূল প্রবন্ধটির কয়েকটি অংশের অর্থ বিকৃত করিয়াছি। কি কারণে আমি প্রবন্ধটি হইতে আক্ষরিক উদ্ধৃতি করিতে পারি নাই, আমার সমালোচনায় তাহা পরিষ্কাররূপেই লিখিয়াছি। শ্রীযুত সেন লিখিতেছেন, 'In these times of dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and horror, rather than glory of life is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralized petty-bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult in the future glories of a classless society.' (কে তাঁহাকে exult করিতে বলিয়াছে জানি না, তবে এই প্রফেসরীয়, একাডেমিক ও নিতান্ত শিশুসুলভ আশাবাদ তাঁহারই কবিতা পড়িতে গিয়া পাতায় পাতায় চোখে পড়িয়াছে, যথা, 'তবু জানি… আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে…) কারণ consciousness of decay

is also a power অবশ্য এ conciousness honest (আন্তরিক) হওয়া চাই (If he tries to be honest ইত্যাদি, ২য় প্যারা In Defence of the 'Decadents'), অর্থাৎ নৈতিক শক্তিহীন পেটিবুর্জোয়া সমাজের প্রাণশক্তিহীন লেখকের রচনায় যদি নিষ্ক্রিয় সচেতনতার (লেখকের শ্রেণীরূপ নিষ্ক্রিয় হইতে বাধ্য) আভাস পাওয়া যায় (এই নিষ্ক্রিয় প্রাণশক্তিহীন ও consciousness-সর্বস্ব সাহিত্যকে আমি decadent সাহিত্য বলিয়াছি) তবে তাহা আন্তরিক, কারণ তাহা 'Eternal principles of art, truth and beauty'-তে বিশ্বাস করিয়া মানসিক অসাধুতার পরিচয় দেয় না। এই সচেতনতাই একটি শক্তি।

শ্রীযুত সেনের এই বক্তব্যকেই আমি আমার ভাষায় লিখিয়াছিলাম, 'ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রীসমাজ আজ decadent, অতএব এ সমাজে সত্য, শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান।' সমাজবিপ্লবের যুগে সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে চেতনা যদি শক্ত হয়, তবে সমাজে বা সমাজসাপেক্ষ সাহিত্যে তাহা বৈপ্লবিক শক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ইহা কি অর্থবিকৃতি? 'Consciousness of decadence is certainly a power' (In Defence of the 'Decadents')। আমি ইহার অর্থ করিয়াছি, ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে কোনরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি। শ্রীযুত সেনের আপত্তি 'বৈপ্লবিক' বিশেষণটির ব্যবহারে। এ আপত্তির অযৌক্তিকতা আমি পূর্বে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। Consciousness ও Subjective Initiative-এর অর্থ এক নহে। নিছক নিষ্ক্রিয় চেতনার উদ্দেশ্যহীন অভিব্যক্তি ও সক্রিয় চেতনার উৎকণ্ঠা উদ্যম ও কর্মরূপের মধ্যে পরিবর্তন আছে বৈ কি? কর্মভীরু জ্ঞান ও সজ্ঞান কর্ম এক বস্তু নহে।

শ্রীযুত সেন যখন স্বীকার করিয়াছেন তিনি বিপ্লবী কবি নন তখন তাঁহার পরবর্তী অনুযোগ সম্পর্কে উত্তর প্রদান করিয়া পূর্বতন বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না। তিনি বলিতেছেন, 'গত দশবছরের বাংলা কবিতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।' এই দশ বৎসরের মধ্যে বাংলা দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা অবিশ্বাস্যরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অতি দ্রুত বৈপ্লবিক পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে, সারা প্রদেশময় শ্রমিক ও কিষাণ অশান্তি দিনে দিনে সঙ্ঘবদ্ধ বিপ্লব-প্রচেষ্টার রূপ পরিগ্রহ করিতেছে, নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে বেকারের সংখ্যা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে অতিদ্রুত শ্রেণীবিচ্যুতি চলিয়াছে, গভর্নমেণ্টের দমনমূর্তি রুক্ষ হইতে রুক্ষতর হইয়া উঠিয়াছে, চাষী ও দিনমজুরের দৈনন্দিন খণ্ড সংগ্রামের মধ্য দিয়া সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যাপক সংগ্রাম সংহত হইয়া উঠিয়াছে, মধ্যবিত্তশ্রেণীর নিম্নাংশ কিষাণ মজুরশ্রেণীর সহিত স্বার্থসাম্যে ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে এবং রাজনীতি সাধারণের জীবনের সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে।

অথচ এই দশ বছরের বাংলা কবিতায় স্থানীয় রাজনীতির ছায়ামাত্র পড়ে নাই, 'Sickening Sentimentalism' বলিয়া ভাবাবেগকে পরিহার করা হইয়াছে এবং সৌখীন সাম্যবাদের বাক্‌বিভূতি দিয়া নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাসের প্রবর্তন করা হইয়াছে। শিক্ষিত সাধারণের নিকট কবিতাকে ক্রমশ দুর্বোধ্য করিয়া তোলা হইয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যেকার স্বাভাবিক ব্যবধানকে অস্বাভাবিক উপায়ে বহুবিস্তৃত করিয়া তোলা হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের কবি সত্যেন্দ্র দত্ত ও নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের কবি কাজী নজরুলকে বিদ্রূপ করা হইয়াছে। টেকনিকের বহু পরিবর্তন করা হইয়াছে, অর্থাৎ একই কথা বহুবার বহুভাবে বলা হইয়াছে। গত দশ বছরে যখন মানুষের জীবনে রাজনীতি অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের কাব্য হইতে নজরুল-সত্যেন দত্তীয় সামান্য রাজনৈতিক ঐতিহ্যটুকু পর্যন্ত মুছিয়া ফেলা হইয়াছে, অবশেষে ১৯৪০ সালের মে মাসে সাম্প্রতিক কালের বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট প্রগতিক কবি স্বীকার করিলেন, আধুনিক বাংলা কবিতা যাঁরা লেখেন তাঁরা অনেকেই রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন নি, সেটা তাঁহাদের দুর্ভাগ্য। 'কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকেই শক্তিমান লেখক, তাঁরাই এতদিন রাজত্ব করে এসেছেন এবং মধ্যবিত্ত সমাজের উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছেন।' এই প্রভাব বিস্তারের একটু নমুনা দিতেছি; 'The damning is thus complete. He then thinks of perhaps of a dozen or so of his admirers and continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves to a dozen or so...' (In Defence of the 'Decadents'.) প্রভাব বিস্তারের নমুনাই বটে। ভয় হয়, পাছে এই সাংঘাতিক উন্নতি আমাদের কপালে না টেঁকে। বর্তমানে তাঁহাদের সামাজিক চেতনা যথেষ্ট উদগ্র হইয়াছে, সামাজিক ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে অনুভূতি সুতীব্রতম হইয়াছে, সাম্যবাদী সমাজের অবশ্যম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইয়াছেন, কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রীত্বগ্রহণ মন্ত্রীত্ববর্জনে তাঁহাদের কাব্যের তুলাদণ্ড উঠানামা করিতেছে (It would have been easier with the congress out of office and an activer body in the anti-imperialist front—Ibid.) তথাপি এখনও রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রতিফলিত করিবার সময় তাঁহাদের আসে নাই, তবে ভয় নাই বোধ হয় শীঘ্রই আসিবে, কারণ উপসংহারে শ্রীযুত সেন আমাদের বড় আশার বাণী শুনাইয়াছেন: 'But a critical situation arises when we find that this (consciousness) also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in

the mass movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity···He will perhaps then cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty' অর্থাৎ এখনও তাঁহারা আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া, 'dozen or so' হাত ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতিবাহিত করিবেন, তারপর গণআন্দোলন আরম্ভ হইলে (অর্থাৎ এখনও হয় নাই, অতএব তাঁহাদের আপাতত কোনো কর্তব্য নাই) তাঁহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি পরিত্যাগ করিয়া গণ-কবি হইয়া বসিবেন। রাতারাতি তখন তাঁহারা জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ বদলাইয়া ফেলিবেন, কিন্তু মুস্কিল হইবে সেইসব কবিদের লইয়া যাহাদের বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, এবং জীবনযাত্রা একরূপ পাকা হইয়া গিয়াছে। সাংঘাতিক 'প্রবলেম', ভাবিয়া কুলকিনারা পাইতেছি না। দশ বছরের প্রগতির কি এই পরিণাম ? কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন, 'To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a dangerous sacrifice।'

আমি 'গ্রহণ' পুস্তিকার সমালোচনায় বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি সরাসরি প্রোপাগাণ্ডা দ্বারা গণ-জাগরণ আনয়নের জন্য কেহ তাঁহাকে বলে না, বলিবেও না ; কিন্তু নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের শ্রেণীবিচ্যুত দুর্গতগণের দুর্গতির বাস্তব ইতিহাস রচনা কিংবা শ্রমিক-কৃষকশ্রেণীর বাহিরে শ্রীযুত সেনের নিজের শ্রেণীর যে অংশ নানা কারণে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে অক্ষম, তাহাদের জন্য aesthetic medium-এর সাহায্যে 'Literature of exposure' (Lenin) রচনা, তাহাদিগকে গণআন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন করিয়া তোলা, এক কথায় যে সাহিত্যিক-ঐতিহ্যের তাঁহারা উত্তরাধিকারী তাহার নিঃস্বার্থ সামাজিক সদ্ব্যবহার—তাঁহাদের আয়ত্তাধীন এইটুকুই যদি তাঁহারা করিতেন তবে নিঃসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে আমরা প্রগতিক ও বিপ্লবী বলিতাম। (আশা করি ইহা অগ্রগামী ব্লক বা তাহার অনুচরী দলের উগ্র বামপন্থী ভাবাদর্শ নহে)। কিন্তু শ্রীযুত সেন বলিতেছেন: 'With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background...We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.' কিন্তু এই 'real audience' (গণ-সাধারণ কিংবা Dozen or so নহে) address করিবার ক্ষমতা, ঐতিহ্য ও সাহিত্যিক উত্তরাধিকার তাঁহাদের আছে, অভাব subjective initiative-এর। এই অভাবকেই কি বলে 'To preserve one's personal integrity?' ইহাই কি 'in the long run' 'progressive cause'-কে help করিবে ? করে তো ভালোই। শ্রীযুত সেনের সম্প্রদায় গণ-আন্দোলনের

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন। এবং যেহেতু যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং আছেন তাঁরা এখনও পর্যন্ত বিপ্লবী সাহিত্য রচনা করিতে পারেন নি, সেহেতু প্রথমোক্ত ভদ্রলোকদের কানামামা হিসাবে নেওয়াই ভালো। 'নেই মামার চেয়ে কানামামা শ্রেয়' (আমার সমালোচনার উত্তরে শ্রীযুত সেনের উক্তি)। আমার বক্তব্য, কানামামা যখন জানেন তিনি কানা (অর্থাৎ, এ সম্পর্কে তাঁহার consciousness আছে) এবং ছানি কাটানো যখন তাঁহার আয়ত্তাধীন তখন অন্ধ অবস্থায় নিক্রিয় বিলাপ-বিলাসে দিন যাপন করা বিপ্লবে বিশ্বাসী কানামামার পরোক্ষে বিপ্লব-বিরোধিতা। অতএব, ছানি না কাটিলে ভবিষ্যৎ ইতিহাস ইহাকে মূল্য দেওয়া দূরের কথা, সমাজ-বিপ্লবের যুগে Demoralized petty bourgeoisie-এর এই স্বার্থপর সংক্ষোভের প্রতি হয়ত কোনো মনোযোগই দিবে না। না হয় বড় জোর উহাব কাপুরুষ পলায়ন প্রবৃত্তিকে ঘৃণার সহিত অঙ্কিত করিবে। এবং সে সময় 'নির্বোধ', 'প্রবঞ্চক' ইত্যাদি ছাড়া অন্যান্য বিশেষণ সাম্যবাদী সাহিত্যের অভিধানে পাওয়া যাইবে সত্য (এখনো যায়) কিন্তু ঐ দুইটি বিশেষণও থাকিবে। যদি সাম্যবাদ-অসহিষ্ণু অথচ honest কোনো বুদ্ধিজীবীর রচনার সমালোচনা আমাকে করিতে হইত, তবে আমাকে আরও objective আরও ব্যাপক ও আরও নৈর্ব্যক্তিক হইতে হইত, কিন্তু, সাম্যবাদে বিশ্বাসী ও সাম্যবাদী আন্দোলনে সহানুভূতিশীল শ্রীযুত সেনের কাব্যের আলোচনায়, আমি কতকগুলি কাব্যের বিশেষণ ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছি, এই প্রসঙ্গে Marxist সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত আক্রমণ ও নিষ্ফল আক্রোশের অভিযোগ আনিয়া শ্রীযুত সেন ব্যবহারিক সুরুচি ও মানসিক শুচিতার পরিচয় দেন নাই।

গত দশ বছরের বাংলা কবিতায় প্রগতি (?) আলোচনা আমি পূর্বে করিয়াছি এবং তৎসম্পর্কে 'To be able to preserve one's personal integrity'-র (Ibid) তাৎপর্যও দেখাইয়াছি। এই personal integrity সংরক্ষণ সম্পর্কে শ্রীযুত সেন আধুনিক ইংরেজী কাব্য হইতে ইলিয়টকে নজীর টানিয়াছেন ও ইলিয়টী কাব্যের দুর্বোধ্যতা ও সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্পর্কে সুতীব্র চেতনার বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে গত দশ বছরের বাংলা কাব্যধারার সহিত ইলিয়টের কাব্যধারায় সমান্তরালতা প্রদর্শনের ইঙ্গিত পাঠক-মাত্রের নিকট স্পষ্ট হইয়া ওঠে। অবশ্য যাঁহারা ভারতীয় বা বঙ্গদেশীয় অবস্থা সম্পর্কে 'বুর্জোয়া যুগ' 'বুর্জোয়া সভ্যতা' 'বুর্জোয়া সমাজ' 'বুর্জোয়া কবি' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করেন না, তাঁহাদের নিকট হইতে ইহার বেশী আশা করাও অন্যায়; ঐতিহাসিক বস্তুবাদ যে বহু কমরেডকে ইতিহাস পাঠের পরিশ্রমের হাত হইতে নিষ্কৃতি দিয়াছে, একথা একদা ফ্রেডরিশ এঙ্গেল্‌স বহু দুঃখেই বলিয়াছিলেন। আমার বক্তব্য ছিল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে ইংল্যাণ্ডে বসিয়া সভ্যতার ক্ষয়িষ্ণুতা সম্বন্ধে যে মনোভাব বা attitude লইয়া ইলিয়ট কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহার surrealism ও anarchist রূপ ব্রিটেনের

সমাজবিপ্লবের বিন্দুমাত্র সহায়ক নয়, বরঞ্চ তাহার ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে পরিণতিই স্বাভাবিক বেশী। পরবর্তী সাম্যবাদী লেখক তাঁহার কাব্যের কতটুকু বৈপ্লবিক সদ্ব্যবহার করিতে সক্ষম হইবেন সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর, স্পেংলার ও হাক্সলির লেখা পড়িয়াও অনেক বিপ্লবীর উপকার হইতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে যে Decadence নিঙড়ায়, তাহার কপালে (অন্যের নয়) যে তাহা হইতে এক ফোঁটা বিপ্লবও জোটে না, বরঞ্চ ভয়াবহ ফ্যাসিস্ত ভাবাদর্শে তাহার পরিণতি হয়, যে বঙ্গীয় কবিগোষ্ঠী ইলিয়টী ঢং-এ কাব্য রচনা করিয়া ভবিষ্যৎ বিপ্লবী কাব্যের ভিৎ রচনা করিতে চাহিতেছেন, একথা তাঁহাদের মনে রাখা উচিত ; তাঁহারা যেন নিজের ভবিষ্যৎ আগে ভাবিতে বসেন। ইংল্যাণ্ডের সামাজিক পরিমণ্ডলীতে ইলিয়টের হয়ত কোনো সামাজিক উপযোগিতা আছে, বাংলাদেশে ইলিয়ট সম্পূর্ণ সমাজসম্পর্কহীন, তাঁহার অবস্থা কলিকাতার ছাদের টবে বিলাতী মৌসুমী ফুলের মতো। কাব্যে ঐতিহ্যবাদী ইলিয়টের সহিত বঙ্গীয় কাব্যের কোনো ঐতিহ্যগত সম্পর্ক নাই। তথাপি যদি ইহারা কাব্যে বিপ্লবের হাবিলদার সাজিবার জন্য বাংলাদেশের কাব্যবেদীতে ইলিয়টের প্রতিষ্ঠা করেন, তবে তাহাদের প্রবঞ্চকই বলিব। এই নজীর প্রদর্শনের মধ্যে মমত্ববোধ ও একত্ববোধ যে পুরামাত্রায় রহিয়াছে তাহা যে-কোনো পাঠকের চোখে পড়িবে। কর্নফোর্ড, কডওয়েল ও হেণ্ডারসনের লেখায় কোথায় ইলিয়টকে বিপ্লবী-কাব্যের পুরোধা বলা হইয়াছে, জানাইলে সুখী হইব। কডওয়েলের 'Illusion and Reality' যদি সাম্যবাদী সমালোচনার স্ট্যাণ্ডার্ড হয়, তবে অডেন, স্পেণ্ডার ও ডে-লুইসকে সাম্যবাদী লেখক বলা চলে না, অতএব উহাদের রচনা বিতর্কের মধ্যে না আনাই ভালো। ইংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক কাব্যের সমালোচনায় কনফোর্ডের কথাটা আবার স্মরণ করি : 'There is no middle position between Revolution and Reaction' এই মূলসূত্রই 'united front' আন্দোলনের ভিত্তি।

উপসংহারে শ্রীযুত সেন বলিয়াছেন, 'বাংলাদেশের আজ যা অবস্থা তাতে অগ্রগামী ব্লক রাতারাতি গুণ্ডাব্লকে পরিণত হলেও বাহবা পায়। যে গালিগালাজ, যে উগ্রপন্থা আজ সাম্যবাদের নামে সমালোচনা-সাহিত্যে আস্ফালনরত সেটা নানা কারণে অবশ্যম্ভাবী, সেটা পূর্বতন সন্ত্রাসবাদের দায়ভাগ।'

কথাটা সাম্যবাদীগণও বলেন, শ্রীযুত সেনও বলেন, আমিও বলি। কিন্তু কথাটির সত্যতা নির্ভর করিতেছে context-এর উপর! কঠোর বিরুদ্ধ সমালোচনাকারীকে কৌশলে সাম্যবাদ-বিরোধী দলভুক্ত বলিয়া প্রচার করিয়া শ্রীযুত সেন কি ভারতবর্ষের অফিসিয়াল সাম্যবাদের সমর্থন ও সহানুভূতি লাভ করিতে চাহেন? কারণ এই অতিসত্য উক্তিটি এত অবান্তর, এত অসঙ্গত ও এত অপ্রত্যাশিত যে ইহাকে অপ-কৌশলী ডিমাগগী ছাড়া আর কোনো আখ্যা দান সম্ভব নহে।

অগ্রণী, ২য় বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা, মে ১৯৪০

সমর সেন

উড়ো খৈ : ৬

১৯৭১ সাল বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন লোকের মনে থাকবে অনেক দিন। ফিল্ড মার্শাল মানেকশ সেদিন বম্বের রোটারি ক্লাবে বলেছেন (টাইমস অব ইণ্ডিয়া, বম্বে, ১৭ নভেম্বর) যে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ (ডিসেম্বর ১৯৭১) শুরু হবার মাস কয়েক আগে (অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানে বিক্ষোভ ও দমন শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে) কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তাঁকে তলব করে বলে যে ইয়াহিয়া খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে 'অ্যাকশন' নিতে হবে। মানেকশ বলেন অ্যাকশনের অর্থ হ'ল যুদ্ধ। 'Go to war then', মন্ত্রিসভার মন্তব্য। মানেকশ রাজী হননি, কেননা তখন যুদ্ধ লাগলে ভারতেব পরাজয় নিশ্চিত, সৈন্য সমাবেশের জন্য অন্তত মাস খানেক লাগবে তারপর বর্ষা শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ করার প্রশ্ন ওঠে না। প্রস্তুতির জন্য বেশ কিছু সময় ও সর্বপ্রকারের সাহায্য চান মানেকশ। তখনো ইন্দিরা গান্ধী এ-দেশের সম্রাজ্ঞী হননি এই যা রক্ষে। মানেকশর স্মৃতিশক্তি প্রখর। কিন্তু তাঁর কথার মানে এই দাঁড়ায় যে অগণন শরণার্থীর ভিড়ে রুদ্ধশ্বাস ভারতকে রক্ষা করার জন্য আমরা যুদ্ধে নামিনি।

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আগে অভ্যন্তরীণ অবস্থার মোকাবিলা করা দরকার। নকশালপন্থীদের বিরুদ্ধে তৎপরতা ১৯৭১-এ তুঙ্গে ওঠে। বীরভূমে সৈন্যবাহিনী পাঠানো হয়। কলকাতা ৭১। অগস্টের একটি করাল রাত্রে সরোজ দত্ত নিখোঁজ হন। শেষের সেই ভয়ঙ্কর মুহূর্তের মুখোমুখি কিভাবে তিনি হন শুধু ত্রিকালজ্ঞ পুলিশ জানে।

সরোজবাবুর সঙ্গে শেষ দেখা কবে হয়েছিল? খুব সম্ভব তিরিশের দশকের শেষে দিল্লী যাবার আগে? একটি বন্ধু সবিস্ময়ে মনে করিয়ে দিলেন, ১৯৬৬-র জানুয়ারিতে একটি বৌভাতের নিমন্ত্রণে সরোজ দত্তের সঙ্গে আমার গল্পগুজব হয়, খেতে বসেছিলাম পাশাপাশি। মনে না-থাকাটা অহমিকার দরুন নয়, ক্ষীণ স্মৃতি-শক্তি প্রায়ই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। অনেকদিন অদেখা প্রিয় বান্ধবীদের মুখ পর্যন্ত অস্পষ্ট ধূসর হয়ে আসছে।

একটি বাংলা পত্রিকায় সেদিন সরোজ দত্তের কলমের তীব্র ধার আবার অনুভব করলাম। অতি আধুনিক বাংলা কবিতা বিষয়ে একটি প্রবন্ধের সমালোচনা ১৯৪০এ লেখা। সরোজবাবুর সংক্ষিপ্তসার ও তাঁর ভাষা অনুযায়ী আলোচ্য প্রবন্ধের বক্তব্য হল: ১. ধনতন্ত্রী সমাজে যে প্রগতি স্তব্ধ হইয়াছে বিপ্লবোত্তর সাম্যবাদী সমাজে সেই প্রগতি অব্যাহত চলিবে, অতএব প্রবন্ধকার আশাবাদী ও প্রগতিতে বিশ্বাসী; ২. ধ্বংসোন্মুখ ধনতন্ত্রী সমাজ decadent অতএব এ সমাজের সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনা অসম্ভব এবং decadent সাহিত্যই একমাত্র আন্তরিক সাহিত্য। এই

আন্তরিকতার জন্য decadent হইয়াও তাঁহাদের সাহিত্যে বৈপ্লবিক শক্তিমত্তা বর্তমান। নজির ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়েটের কাব্য; ৩. ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি; ৪. কিষাণ মজদুর লালঝাণ্ডা ব্যারিকেড সংঘর্ষ লইয়া নাকি তাহাদের উত্তেজক সাহিত্য রচনার নির্দেশ অথবা ফরমাইস দেওয়া হইতেছে এবং ঐ সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁহাদের না থাকায় রোমান্টিক হইবার ভয়ে ঐ নির্দেশ বা ফরমাইস তাঁহারা পালন করিতে পারিতেছেন না।

সংক্ষিপ্তসার দেবার পর সরোজ দত্ত জোরালো ভাষায় বলেন যে 'ধনতন্ত্রী সভ্যতার বর্তমান অবস্থার অন্তঃসারশূন্যতার যে-কোনোরূপ অভিব্যক্তিই বৈপ্লবিক শক্তি নয়, Living, Passionate ও sensitive মনে এই অন্তঃসারশূন্যতার প্রতিক্রিয়াই প্রতিফলিত হয় বিপ্লবী সাহিত্যে। আন্তরিকতার খড়্গাঘাতে নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কবিলাস সেখানে মুহূর্তে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়ে। তাই একদা যখন রোমাঁ রোলাঁ গান্ধী-রামকৃষ্ণে বিশ্বাসী ছিলেন তখনও তাঁহার সাহিত্য বিপ্লবী সাহিত্য ছিল, অহিংস টলষ্টয়ের সাহিত্য সম্পর্কে লেনিনের প্রশংসোচ্ছ্বাস তো বহুবিদিত।···মন যেখানে জাগ্রত ও জীবন্ত, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও প্রবহমান পারিপার্শ্বিকতার আঘাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও ভাবাদর্শ সেখানে আন্তরিকতায় উদ্বেল এবং ক্রমবিবর্তনের বেদনাময় পথে সত্য উপলব্ধির অভিমুখে গতিমান। এই সত্য উপলব্ধির পথে পরিবর্তনশীল ভাবাদর্শের প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক, বেদনায়, উৎকণ্ঠায় আর্তক্রন্দনে নিবিড়। 'Decadence'-এর প্রতিটি বন্ধনরজ্জু ছেদনের সঙ্গে সঙ্গে তাই তাহার আর্ট হইতে যন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত হইয়া ওঠে। শেষরজ্জু ছিন্ন হইবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাহার শান্তি নাই। এই অশান্তি, উদ্বেগ ও আর্তনাদ মহাভুজঙ্গের নির্মোক পরিহারের এই প্রতিটি মুহূর্ত বৈপ্লবিক···ইহা নিষ্ক্রিয় মস্তিষ্কজীবীর বিলাপ-বিলাস নহে!'

সরোজ দত্তের বক্তব্য বলিষ্ঠ। উপসংহারে তিনি কবি-প্রবন্ধকারকে নির্বোধ প্রবঞ্চক ইত্যাদি বলেছেন।

বহুদিন পরে লেখাটি পড়ে মনে হল সরোজ দত্ত ঠিক লিখেছিলেন। তিরিশের দশকে অনেক লেখক বোধ হয় বিপ্লবীর অভিনয় করে বাহবার চেষ্টায় থাকতেন তাঁদের আসল চেহারা সরোজ দত্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।

কিন্তু পরের দু-তিনটি পৃষ্ঠায় আক্রান্ত প্রবন্ধকারের জবাব পড়ে মনে হ'ল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রবন্ধকার বলেছেন যে নিজেকে তিনি কখনো বিপ্লবী বলেননি। তার কবিতায় যে টাইপের জীবন এবং আত্মপরিক্রমার কথা আছে, সে টাইপ বিপ্লবী নয়, মুমূর্ষু শ্রেণীর প্রতীক। অবক্ষয় এদের আকর্ষণ করে তার কারণ বোধ হয় এই যে উদীয়মান কোনো শ্রেণীর প্রাণশক্তি এদের নেই, বরং পাতিবুর্জোয়ার গভীরে এদের শিকড় ইত্যাদি। অবক্ষয় বিষয়ে সচেতনতা এক ধরনের শক্তি কিন্তু

এমন একটা সময় আসছে যখন এই শক্তিটুকু দিয়ে চলবে না, তখন মনস্থির করতে হবে। যে কবি তাঁর ব্যক্তিসত্তা অটুট রাখতে পেরেছেন গণআন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলে তাঁর উপকার নিশ্চয় হবে। আর…'He who is bent on living in a little cell will be dying with a little patience' প্রবন্ধকারের জবাবটা বালখিল্যসুলভ নয়, যদিও কোথাও একটা ফাঁকি রয়ে গিয়েছে। সরোজবাবুর প্রত্যুত্তরটা কিন্তু অনেকটা উকিলসুলভ। যেমন, কবি প্রবন্ধকার যে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সেই পত্রিকায় তাঁকে এবং অন্যদের মাঝে মাঝে বিপ্লবী বলা হয়েছে। প্রবন্ধকারের কবিতায় বিপ্লবীসুলভ উক্তি আছে, অতএব বিপ্লবী শব্দটি আরোপ করা অযৌক্তিক হয়নি ইত্যাদি ; সে সময়কার মনোভাব বিষয়ে সরোজ দত্ত যা লিখেছিলেন তা উপভোগ্য—'এখনও আলগোছে গণস্পর্শ বাঁচাইয়া 'dozen or so' হাত ধরাধরি করিয়া কিছুকাল আত্মপরিক্রমায় অতিবাহিত করিবেন তারপর গণআন্দোলন আরম্ভ হইলে…তাহারা রাতারাতি স্বগতোক্তি করিয়া গণকবি হইয়া বসিবেন'। তবু নির্বোধ প্রবঞ্চক কথাগুলি অস্বস্তিকর ঠেকল, কেননা প্রবন্ধটি আমার লেখা ১৯৩৮ সালে ; এম. এ. পাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বৃত্তি পেয়ে তখন জীবনটা মন্দ কাটছিল না।

তারপর অনেককাল অতিবাহিত হয়েছে। সাহিত্য বিষয়ে বিতর্ক নানা রূপ নিয়েছে. চল্লিশ দশকের শেষাশেষি রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসের ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করার প্রস্তাব উঠেছে, তারপর গান্ধী রবীন্দনাথ আবার কম্যুনিস্টদের অনুরাগ আকর্ষণ করেছেন, নকশালপন্থীরা আবার তাঁদের বর্জন করেছেন। তিরিশ দশকের বেশ কিছু লেখক এখন বিগত। গণআন্দোলনে যোগ দিয়েও অনেকে লেখক হিসেবে মহান হতে পারেন নি ; পার্টির ভাবাদর্শ অনেক সময় বাঁদর নাচ নাচিয়েছে। এর জন্য দায়ী অবশ্য গণআন্দোলন নয়, লাইন বেঠিক হলে আন্দোলনে যোগ দিয়েও ব্যর্থতা আসে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শক্তিমান লেখক পার্টির প্রভাবে কোনো মহারচনা করতে পেরেছিলেন ? তাঁর বিচ্ছিন্ন ডায়েরিতে একটা অবিশ্বাসের ভাব তো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিরিশের দশকে ও পরে কবিদের মধ্যে সহজ ও বলিষ্ঠ ভাষায় লেখেন সুভাষ, সুকান্ত, পার্টির সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ ছিল। মাও থেকে মেয়াওতে সুভাষের উত্তরণ যুগান্তকারী কিছু একটা হয়নি এবং সুকান্ত বেঁচে থাকলে মস্কোমুখী সি পি আই-এর জালে আটকে পড়ার যথেষ্ট ভয় ছিল। সি পি এম-এ অবশ্য সাহিত্যিক ও বিলেত ফেরতের সংখ্যা অনেক কম। সাংসারিক বিবিধ ক্ষেত্রে সি পি আই-এর মত সি পি এম তাই গুছিয়ে নিতে বড় একটা পারে নি।

তিরিশের দশকের শেষে নবীন কবিদের ভাষা স্বচ্ছ হওয়াতে আশার কারণ ছিল। তার আগে কবিদের অনেকেই ইংরেজির ছাত্র ও পরে অধ্যাপক হওয়াতে পেশার দোষে বড় বেশী পাউণ্ড-ইয়েটস-এলিয়ট-অডেন চর্চা করতেন, কবিতার ভাষা ও ভাবভঙ্গী সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হতো না। কিন্তু কিছুদিন কিছু কবির

সহজ ভাষার পর ব্যাপারটা আবার গোলমেলে হয়ে গেল, খুব সম্ভব অনেকটা জীবনানন্দ দাশের ক্রমশ প্রসারিত প্রভাবের ফলে। জীবনানন্দের অসাধারণ শক্তি যাদের নেই তাঁদের সন্ধ্যা ভাষা হজম করা কঠিন। তাঁরা গণআন্দোলনে গেলে দেশের দশের সুবিধে হবেনা।

আনন্দবাজার, ৩০শে নভেম্বর ১৯৭৭

বিনয় ঘোষ

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা

··· সাম্প্রতিক কবিদের দ্বিতীয় দলের মধ্যে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা সকলেই প্রায় উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত পণ্ডিত অধ্যাপক, পৃথিবীর হালচাল ভালভাবে জানেন, এবং নিভৃতে মনীষা-সাধন করাই এঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত। এঁদের ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর বাইরে দেশের বাকি সব মানুষকে এঁরা অপাগণ্ড ও মূর্খ ভাবেন, সুতরাং এঁরা যা কিছু রচনা করেন তা শুধু গোষ্ঠীর সভ্যবৃন্দের জন্যে।···

··· বিষ্ণু দে ও সমর সেন-এর কাব্যালোচনার সময় কে কার কার্বনকপি বোঝবার উপায় নেই। আঙ্গিকের দিক থেকে দুজনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ভাব ও বিদ্রূপ-প্রকাশের ভঙ্গিমার মধ্যে দুজনেরই অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। কাঠিন্য ও সরলতায় দীপ্যমান 'উর্বশী ও আর্টেমিস'-এর কবি বিষ্ণু দে-র সঙ্গে 'চোরাবালি'-র কবির কোনো সম্বন্ধ নেই, এবং 'চোরাবালি'র কবি ও 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ'-এর কবি সমর সেন-এর অনেকদিক থেকে মিল আছে। নির্বীর্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতি দুজনেই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন, বিষ্ণু দে-র বাণগুলি চোখা, সমর সেন-এর ভোঁতা। উদাহরণ-স্বরূপ আধুনিক প্রেম সম্বন্ধে দুই কবির মনোভাব লক্ষ্য করা যেতে পারে।

মহা মুস্কিল !
ঝগড়া করতে গেলেও ডলুর প্রেমই জাগে !
··· ···
কিন্তু ডলুর দেহ ও মনের অলিগলি যত সবই জানা,—
···
ডলুর মনের ন্যাকামি পাকামি সবই জানি,
ডলুর সুশ্রী দেহের অনেক খোঁজও দিয়েছে
ডলুই নিজে।
এমন কি সেই আঁচিলটা—তা-ও !
সেটাও জানি !
নতুন ত নেই কিছুই ! এখন করব কি যে !
করব কি যে !
বেজায় ক্লান্ত, শ্রান্ত লাগে !—
কিন্তু ডলুর সমস্যার এই সমাধান আর
পাব নাকি আমি

জীবনের শেষ দিনের আগে ?
ক্লান্ত লাগে।

(বিষ্ণু দে)

বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে,
অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ,
সহরের রাস্তায় যখন
সদলবলে আর্তনাদ করবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক,
তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমিকের কাছে।
হে ম্লান মেয়ে, প্রেমে কী আনন্দ পাও,
কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে ?

(সমর সেন)

দুজনের বিদ্রূপের ভঙ্গী প্রায় একই। রবীন্দ্রনাথের কবিতার বা কোনো প্রাচীন কবিতা ও গানের লাইন কবিতার মধ্যে জুড়ে এঁরা রাবিন্দ্রিক ও প্রাচীন মনোভাবকে বিদ্রূপ করেন। তাছাড়া বিদ্রূপের নাগরিক উপকরণও প্রায় দুজনেরই এক।

মরীয়া লিবিডো আজো কাউন্‌সিলের প্রবল গলায়,
ওড়েনি, ওড়েনি আজো কঠিন সন্ধান
সবকামপরিত্যাগী কর্পোরেশনের সুহৃদ্বারে।

(বিষ্ণু দে)

প্রভু, পৃথিবীতে তোমার লীলা অবিরাম,
এ্যাসেম্‌ব্লি হলে বিরহছলে মিলন আনো,…

(সমর সেন)

দিনের ভাটার শেষে
গলিত অন্ধকারে মরা মাঠ ধু ধু করে,…

(সমর সেন)

সবার উপরে আমিই সত্য,
তার উপরে নেই।

(সমর সেন)

সখি, শেষে কি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধরে
ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরী যাবো !

(সমর সেন)

মেম্‌ননের স্তব্ধ মূর্তি
রাত্রি হয়ে এল শেষ
এবার ফিরাও মোরে।

(সমর সেন)

আজ বহুদিনের তুষার স্তব্ধতার পর
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

(সমর সেন)

কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও
লম্পটের পদধ্বনি
কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
হে সহর হে ধূসর সহর!

(সমর সেন)

কতো মধুরাতি রভসে গোঙায়নু,
আজ মৃত্যুলোকে দাও প্রাণ…

(সমর সেন)

পঞ্চশরে দগ্ধ করে' করেছ একি সন্ন্যাসী
বিশ্বময় চলেছে তার ভোজ!
মরমিয়া সুগন্ধ তার বাতাসে উঠে নিঃশ্বাসি,
সুরেশ শুধু খায় দেখি গ্লুকোজ্‌!

(বিষ্ণু দে)

জনস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান,
আশে আর পাশে, সামনে পিছনে
সারি সারি পিঁপড়ের সার,
জানিনি আগেও ভাবিনি কখনো…

(বিষ্ণু দে)

এছাড়া প্রতীচ্যের সাম্প্রতিক কবিদের কাছ থেকে উপমা ও প্রতিরূপ পর্যন্ত এঁরা ধার নিয়েছেন। যেমন

আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্‌ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?

(বিষ্ণু দে)

Living from day to day provides no clue
From certain happiness—

The rakes bravado and tedious libido
Gin in small hours, praise for the cunning ruse,

(Clere Parsons)

আমার স্নায়ুতে এসে কাঁপে থরো থরো
দুয়ারে প্রতীক্ষারত উদ্যত ট্যাক্সির মতো :

(বিষ্ণু দে)

When the human engine waits
Like a taxi throbbing waiting

(T. S. Eliot)

—ইত্যাদি। ভাবকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করবার জন্যে উপমা ও অনুপ্রাস কাব্যে অবশ্যম্ভাবী। রূপের সাদৃশ্য থেকে যেমন উপমার জন্ম, শব্দের সাদৃশ্য থেকে তেমনি অনুপ্রাসের জন্ম কিন্তু উক্ত কবিরা কৃত্রিম উপমা ও নিরবচ্ছিন্ন অনুপ্রাস ব্যবহার করেন তাদের শোচনীয় দৈন্য এবং অন্তরের অকবিসুলভ শুষ্কতা ঢাকবার জন্যে। এইরকম নীরস কৃত্রিম উপমার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

দুরন্ত অন্ধকার ডানা ঝাড়ে
উড়ন্ত সাপের মতো।

(সমর সেন)

এখানে সন্ধ্যা নামলো,
শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূকরের চামড়ার মতো,

(সমর সেন)

হাওয়ায় ওড়ে শুধু শেষহীন ধুলোর ঝড় ;
এখানে সন্ধ্যা নামলো শীতের শকুনের মতো।

(সমর সেন)

তুমি ক্লিন্ন অস্থিহীন পিচ্ছিল স্বেদাক্তত্বক্ সাপ।

(বিষ্ণু দে)

ডিমের মতো, পাণ্ডু তব মুখে
কি কথা পাই ?

(বিষ্ণু দে)

শূকরের চামড়ার মতো যখন অন্ধকার ঝুলতে থাকে, বা উড়ন্ত সাপের মতো ডানা ঝাড়তে থাকে, সন্ধ্যা যখন নামে শীতের শকুনের মতো, স্বেদাক্তত্বক্ যখন সাপের মতো পিচ্ছিল, আর মুখ যখন ডিমের মতো পাণ্ডু, তখন ঠিক এই শ্রেণীর উপমা দিয়ে বলা যায় না কি, যে এই কবিদের মন, কোনো ঘিনঘিনে গলির মধ্যে ডোমের

দৃষ্টির বহির্ভূত মরা ঘেয়ো কুকুরের মাস্তে-পড়া নাড়ীভুঁড়ির মতো? কবির অনু-করণে সমালোচকের কোনো দোষ নেই।

তারপর এঁদের নৈরাশ্য, ক্লীবত্ব, ধূসরতা ও 'হাহাকারত্বের' সামান্য পরিচয় দেওয়া উচিত। নিজের পৌরুষহীনতা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন যে বিষ্ণু দে তা তাঁর 'ফাঁকা' লিবিডোর উল্লেখ দেখেই বোঝা যায়। তাছাড়া তিনি যখন বলেন—

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর,
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

(ঘোড়সওয়ার)

—তখন তাঁর সাময়িক পৌরুষহীনতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে না, এবং সমর সেন যে নপুংসক-মনোভাবাপন্ন তা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন,

আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই;
তাই ধ্বংসের ক্ষয়রোগে শিক্ষিত নপুংসক মন
সমস্ত ব্যর্থতার মূলে অবিরত খোঁজে
অতৃপ্তরতি উর্বশীর অভিশাপ।

(একটি বুদ্ধিজীবী)

সমর সেন-এর কবিতার মধ্যে 'হাহাকার' ও 'ধূসর' শব্দের অসহ্য পুনরাবৃত্তি দেখে মনে হয় ভিতরটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। যেমন—

হাওয়ায় এলোমেলো ফুলের গন্ধ
আর দীর্ঘ রাত্রি ভ'রে তীব্র, নিঃশব্দ কিসের হাহাকার।

(গোধূলি)

দেখি আর শুনি
গন্ধ-স্নিগ্ধ হাওয়ায় কিসের হাহাকার:

(একটি রাত্রের সুর)

ক্লান্ত স্তব্ধতার মতো,
সে পথে দক্ষিণ হ'তে হঠাৎ হাহাকার এলো।

(নাগরিকা)

শুধু কিসের ক্ষুধার্ত দীপ্তি, কঠিন ইশারা,
কিসের হিংস্র হাহাকার সে চোখে।

(নাগরিকা)

উর্বশীর দীর্ঘশ্বাস
মৃত্যুহীন অতীতের শেষ হাহাকার।

(মেঘদূত)

সহসা এসেছে অরণ্যের হাহাকার
পাষাণের দীর্ঘ রেখায়।

(সাড়া)

রাত্রিশেষে কলের বাঁশীর তীব্র হাহাকার
ধ্বনিত হলো দিগন্ত থেকে দিগন্তে

(শেষরাত্রে)

অন্ধকার ধূসর, সাপের মতো মসৃণ,
দীর্ঘ লৌহ-রেখার সহসা শিহরন,—

(একটি রাত্রের সুর)

রাত্রে, ধূসর সমুদ্র থেকে হাহাকার আসে,
আর দিগন্তে জমে ইস্পাতের মতো
ধূসর আকাশ ;

(একটি প্রেমের কবিতা)

তোমাকে বললাম—এসো,
তোমার ধূসর জীবন হ'তে এসো,

(ইতিহাস)

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি···

(মুক্তি)

কত ধূসর চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ,
পিচের পথে—

(ভোরের কলকাতা)

এইরকম উদ্ধৃতিতে অনেকগুলি পৃষ্ঠা পূরণ করা যায়, কিন্তু অনর্থক পৃষ্ঠা পূরণে আপত্তি আছে। সমর সেন-এর কবিতাগুলির ভিতর থেকে যদি 'ধূসর' ও 'হাহাকার' শব্দ দুটি বাদ দিয়ে পড়া যায় তাহলে বাকি যা থাকবে তাতে মনোবৈজ্ঞানিকের কৌতূহল জাগতে পারে, সমালোচকের নয়। অতএব এইখানেই 'আইয়ুবীয় সাম্য-বাদী' কবির আলোচনায় পূর্ণচ্ছেদ টানলাম।

নূতন সাহিত্য ও সমালোচনা, ১৯৪০

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

নানাকথা

[অন্য কয়েকটি বই-এর সঙ্গে]

গত কয়েক মাস যাবৎ একটা প্রশ্ন কেবলই মনে উঠছে। তিন চার বছর আগে 'প্রগতি' সাহিত্যের ধুয়ো শুনি। সে সম্বন্ধে কাণাঘুষোও চলেছিল কিছু, কেউ বলেছিলেন সাহিত্য সাহিত্য, তার আবার প্রগতি কি? কেউ উত্তর দিলেন জীবনের সহযোগেই সাহিত্যের সার্থকতা, এবং সে-জীবন যখন বদলাচ্ছে তখন সাহিত্যের বিষয় ও রূপও বদলাবে নিশ্চয়। প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা দলবদ্ধ হতে চেষ্টা করলেন, দু' একখানা পত্রিকাও বেরুল, তারপর যুদ্ধের হাঙ্গামা সুরু, ২২শে জুন হিটলার রাশিয়াকে আক্রমণ করলে, কম্যুনিষ্ট পার্টি আইন সঙ্গত হ'ল (পার্টির কাজ অবশ্য বে-আইনী রইল) সঙ্গে সঙ্গে প্রগতি গতি পেল, খানিকটা মতিও এসে পড়ল বৈকি! মতি যোগাড় দিলে মার্ক্‌সিজম। খানিকটা, কারণের মধ্যে সোভিয়েট-প্রীতিটাই বেশী। এগুলো ঘটনা, অতএব তর্কাতীত। এখন প্রশ্নটা হল, আমাদের আধুনিক প্রগতিশীল সাহিত্যে মার্ক্‌সিজম-এর প্রভাব কতটুকু? আমি এমন উত্তর চাইনা যার সাহায্যে কোন বিশেষ রচনাকে প্রগতি (বিপ্লব)-বিরোধী নাম দিয়ে অগ্রাহ্য করতে পারি। যাঁরা পার্টির সভ্য হয়ে কাজে নেবেছেন তাঁদের পক্ষে সূক্ষ্ম মতান্তরতার মূল্য অনেক। সাহিত্যে কিন্তু ততটা মূল্য যখন নেই তখন প্রাথমিক দৃষ্টিভঙ্গীটাই বিচার্য্য, অর্থাৎ তারই দ্বারা প্রমাণ হবে প্রভাবটি বেশী না কম।

কবিতাতেই যেন মার্ক্‌সিজম প্রচারিত হচ্ছে বেশী। অন্ততঃ সমর সেনের 'নানাকথা', চঞ্চল কুমারের [চট্টোপাধ্যায়] 'বসুন্ধরা', বিষ্ণু দে'র 'পূর্বলেখ' ও '২২শে জুন' প্রভৃতি আধুনিক কবিতার বই, 'কবিতা', 'নিরুক্তে'র ইদানীংকার সংখ্যা প্রভৃতি দেখে তাই মনে হওয়া স্বাভাবিক। কামাক্ষীপ্রসাদের 'শিবির'কেও এই দলে ফেলা যায়।...

প্রায় বছর দশেক আগে আমাদের কবিতায় হতাশা ফুটে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর ছিল অস্তি ও আনন্দের, যার সঙ্গে বিদেশী Optimum-এর কোনো ঐক্য নেই। নতুন সুর নাস্তিকতার, বা nihilism-এর নয়, মায়াবাদের দুঃসাহসিকতারও নয়, মাত্র সন্দেহের, অসন্তোষের, প্রশ্নের খুঁতখুঁতুনি। আনন্দের পরিবর্তে যে নিরানন্দ এলো তার পিছনে এমন কোনো জীবন-দর্শন ছিল না যার জন্যে অসন্তোষকে সদর্থক ভাবা যায়। হার্ডির কবিতায় যা পাই তা যতীন সেন-গুপ্তের কবিতায় নেই। অসন্তোষের দুটি অঙ্গ ছিল, জৈব ও আর্থিক। কোনো কোনো কবির হাতে দুটি মিশে গিয়ে একটা বিপ্লবী ঢঙ যে আসেনি তা নয়। সাধারণত কিন্তু মিশল না, কেবল যৌন-ব্যাপারে সমাজের বিপক্ষে ব্যক্তি পরিপূর্ণতার

নামে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার প্রয়োজন ছিল অবশ্য, এবং কাম জিনিষটাই বিপ্লবী। কিন্তু সে-বিপ্লবের সূত্রপাতটা নিতান্তই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। আমাদের সংস্কৃতিও ইংরেজ আমল থেকে ঐ মুখো। অতএব এই ধরনের কবিতায় একটা anarchic element ছিল, যার অস্তিত্ব সন্দেহ ক'রে, না বুঝে, অনেকে তীব্র প্রতিবাদ সুরু করলেন। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল হয় নি, কারণ, অসন্তোষের অন্ত অঙ্গটি জৈব-অঙ্গকে সাহায্য করতে সদা-তৎপর। ঠিক ঐ সময় আমাদের দেশের সামনে এল বেকার-সমস্যা তার দৈন্যের রূপ নিয়ে। 'দৈন্য'-কথাটির অর্থ আশা-শূন্যতা নয়, কারণ আমাদের দেশের বে-কার-সমস্যা একটু অন্য জাতির, সেটা প্রাণ-রক্ষা নয়, ভদ্রতা-রক্ষা, এবং যে-ভদ্রতার মধ্যে ইংরেজী বুর্জোয়ার নিঃশঙ্ক নিশ্চয়তা নেই, ঐতিহ্যের যোগ কোথাও নেই, এবং যে-রক্ষার কবচ অফিসের বড় বাবুর আশীর্বাদ ও মুরুব্বীর জোর এবং যার মূল্য মাসিক চল্লিশ টাকা ও কিছু উপরি। এর সঙ্গে জুটল ইংরেজী সাহিত্যের পূর্বতন দশকের হতাশবাদ। 'প্রভাব' কথাটি ব্যবহার করতে চাই না, কারণ, সেটা একটু একপেশে, তাতে আমাদের দিকটা বাদ পড়ে। আমাদের ওপর নানা দিক থেকেই প্রভাব এসেছে, কিন্তু তার থেকে বেছে নেওয়াটাই কৃতিত্ব। এক হিসেবে টি. এস. এলিয়ট-এর Waste Land যে বাঙলা আধুনিক কবিতার জন্মস্থান তার বহু প্রমাণ মেলে। ১৯২২ সালের সাম্য-বাদী পদ্য ও গদ্য-কবিতায় 'ফণিমনসা' প্রতীকটির, রঙের মধ্যে 'হলুদে' এবং স্থানের মধ্যে 'বালুচরের' ছড়াছড়ি। সুধীন্দ্র দত্তের এলিয়ট সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রায় দশ বছর আগেকার, মধ্যে রবীন্দ্রনাথের Journey of the Magi-র বিখ্যাত অনুবাদ, এবং এখনও পূর্বলেখ-এ বিষ্ণু দে-র 'ফাঁপা মানুষ'। এলিয়ট-এর ব্যর্থতাবোধকে পরিমিত মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাঁর 'স্বইনী' ও 'প্রুফ্রক' আমাদেরই মত ব্যবহার করে। তাদেরও ভবিষ্যৎ নেই, আমাদেরও নেই, কেন নেই তার কারণ তারাও স্থবির, আমরাও তাই, তাদের প্রেম ও প্রাণ দুই-ই পাণ্ডুর, আমাদেরও তাই। কিন্তু এলিয়ট-এর আরেকটি অন্তরের দুঃখ ছিল, যার খোঁজ আমরা করিনি, সেটি হল খৃষ্টান সভ্যতার সর্বনাশে বিক্ষোভ। সেটা আবার সক্রিয় বিক্ষোভ, জাতে ভদ্রলোক আমেরিকান, তাই নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন না। কতটা সক্রিয় তার জ্বলন্ত প্রমাণ তাঁর আজকাল-কার নাটক ও কবিতার এবং সর্বোপরি তাঁর একটা Christian Sociology দাঁড় করবার প্রাণপণ চেষ্টায়। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে এলিয়টের সক্রিয়তা ধরিয়ে দেন, কিন্তু তাঁর নির্দেশ তাঁর অন্যান্য নির্দেশের মতনই আমরা অবহেলা করি। সে যাই হোক, এলিয়টের ব্যর্থতার (frustration) সঙ্গে আমাদের বড় চাকরী ও মাঝা-মাঝি রকমেরও চাকরী না পাওয়ার আফ্‌শোষটা জুড়ে দিলাম। প্রথম থেকেই সমাজের চাপে যৌন-নিষ্ফলতা ছিল। এখন মিলে জুলে একটা ছক্ হয়ে গেল। তাই আধুনিক কবিতার মনোভাবে একটা জোড়াতাড়া, একটি ফাঁকি রয়ে গেছে। আমার বিশ্বাস যে আধুনিক কবিতার দোষ দক্ষতার অভাবে নয়, প্রধানত তার

ভাবগুচ্ছের অসংলগ্নতায়। শেষে দাঁড়ায় ঐ সামাজিক-বিপ্লবের অপূর্ণতা। কিন্তু কার্যকারণভাবে নয়। তাই যদি হত তবে কম্যুনিষ্ট সমাজেই সব কবিতা সর্বাঙ্গীন হত। যদি কারণ খুঁজতেই হয় তবে বলব, ঐ জোড়াতাড়ার জন্য দায়ী আমাদেরই অজ্ঞতা, নিজেদের পরিস্থিতি ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে, সামাজিক অভিব্যক্তির নিয়ম ব্যাপারে। আমি চাইনা যে আমার বক্তব্য ভুল বোঝা হয়। অসংলগ্নতা, অজ্ঞতা রয়েছে নিশ্চয়ই। তবু আধুনিক কবিতার খাপছাড়া নক্‌সাটাও নতুন, তার অন্তরে নতুনত্বের চাহিদা আছে। আমাদের আধুনিক কবিতা কেবল সৌখীন ফ্যাসান নয়। দু একজনের পক্ষে এখানে ওখানে ভাববিলাস, কিন্তু একত্রে ধরলে তার মধ্যে বিপ্লবের বীজ আছে। অবশ্য খানিকটা অজানা বলে তার বিপদও আছে, কিন্তু সম্ভাবনাও কম নয়। শক্তি উন্মুক্ত হবার পর এই রকম দ্বিধা বিভক্ত হবার সম্ভাবনা থাকবেই। মার্ক্‌সিষ্ট কবিদের উদ্দেশ্যই হল যাতে শক্তিটা বাঞ্ছনীয় প্রণালীতে চলে। আমি তাই মার্ক্‌সিষ্ট কবিতার বহুল প্রচার কামনা করি। পূর্বেকার হতাশা আজ আশায় পরিণত হতে চাইছে, এই হল মোট কথা। তারপর সাহিত্যিক বিচার।

পরিণতি চাইছে, কিন্তু পরিণত হয়নি। গোটাকয়েক চিহ্ন দেখেছি দুর্বলতার। বিষ্ণু দে, সমর সেন ও চঞ্চলকুমারের অধিকাংশ কবিতাতে অন্যান্য কবিদের, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথের পদের উদ্ধৃতি আছে, এবং সেগুলো সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পদের সঙ্গে গলাগলি করে দাঁড়িয়ে থাকে। উদ্দেশ্য অবশ্য নতুন পুরাতনের বৈপরীত্য-বোধ জাগান। উদ্ধারটা স্মৃতির, এবং বোধ জাগান চেতনার কাজ। দুটি কাজের সমন্বয়-সাধন, দুই রাজ্যে অবাধ বিচরণ আজকালকার স্বাভাবিক চিত্তবৃত্তি, অতএব কাব্যপ্রয়াসের অধীন। আধুনিক কবিতাকে সমসাময়িক হতেই হবে। কিন্তু সমন্বয়ে এমন একটা কিছু থাকে যেটা নিছক দ্বন্দ্বের (Contrariety) অতিরিক্ত।...

সমর সেনের 'নানাকথা' নিয়ে লক্ষ্ণৌএর জন কয়েক সাহিত্যানুরাগী ভদ্রলোক দু' তিন বার আলোচনা করেছিলেন। আলোচনার সময় দেখা গেল যে সমরের ছোট কবিতাই সকলের প্রিয়। 'নানাকথা' কবিতাটি বার বার পড়বার পর মন্তব্য হয়েছিল, 'খাপ ছাড়া, অন্য ছোট কবিতার মতন ঘন নয়।' এই মন্তব্য থেকে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে। সমর সেন কি miniature poet হিসেবেই সফল? তাঁর কবিতা অবশ্য চিত্রানুগম। অন্যান্য দেশে যে-সামাজিক অবস্থায় miniature painting-এর প্রচার হয়, আমাদের দেশের অবস্থা তা নয়। অবশ্য সমর সেন খুব sensitive, কিন্তু sensitiveness থেকে sensibility-তে আসার অন্তরায় কি তার পক্ষে? 'যার ধর্ম তারই সাজে অন্যের লাঠি বাজে' ভাবলে একজন কবিকে খোপের মধ্যে পুরে রাখাই ভাল, সেখানে সে বক্ বকম্ করুক গে! কবিরও কি পরিণতি নেই, তার কাব্যবোধ যদি প্রসারিত হয়ে সমাজ বোধের দিকে অগ্রসর হয় তবে কোনো পাঠকের, কোনো সমালোচকেরই অধিকার নেই, ক্ষমতা নেই, বাধা দেবার। সমর সেন এগিয়ে চলেছে ঐ দিকে এটা আমাদের গ্রহণ করতেই হবে—তারপর

অন্য কথা। কিন্তু এই অন্য কথার মধ্যে একটা দরকারী কথা এই, অগ্রগতিটা জোর পায়ে, না খুঁড়িয়ে, তার পিছন-টান আছে কি নেই। যদি জোর কদমে হয়, যদি পিছন-টান না থাকে, তবেই সমন্বয় পাওয়া যাবে। কিন্তু খুব মন দিয়ে পড়েও তা পাইনি। আমি রসোত্তীর্ণতার উল্লেখ করছি না। এটা Smiles-এর Self-Help-এর success-এর কাব্য সংস্করণ। আধুনিক কবিদের মতন আধুনিক পাঠকও status-এর চেয়ে process-এর ওপর জোর দিতে চান। তবু বলি ঐ process-এর জন্যও integration-এর প্রয়োজন। তবে সেটা চৈতন্যের। আমার বিশ্বাস যে সমর সেন এবং অন্য আধুনিক কবিরাও নিজেরাই বুঝেছেন নিজেদের অভাব—প্রমাণ, সকলে এপিগ্রাম, সনেট, অন্যান্য ছোট কবিতা লিখছেন। ভারী মজার এই ডায়েলিকৃটিক্—চৈতন্য যত প্রসারিত হচ্ছে কবিতা আকারে ততই ছোট হচ্ছে। কেবল তাই নয়, সমাজ বোধ যতই উদার, বিদ্রূপ ততই সঙ্কীর্ণ। আধুনিক কবিদের বিদ্রূপ, যেমন বিষ্ণু দে-র বিস্তর কবিতায়, সমরের 'ব্রতচারী', চঞ্চলের 'পলাতকে' পাচ্ছি, সেটা নিতান্তই নিষ্ফলতা-প্রসূত। এ-বিদ্রূপ মেয়েদের মাথার কাঁটার মতন বাঁকা, গোপন প্রেমিকের মতন ভীরু, যার চাহনী হল চোরা, যার ফোটান হল খোঁচান, আর চলন হল ছেনালি মাখান। এর সঙ্গে উইণ্ড্যাম লিউস-কল্পিত 'স্যাটায়ার'-এর কোনো সম্বন্ধ নেই, গ্রীক এপিগ্রামেরও সঙ্গে নেই।···

···মার্ক্‌সিষ্ট মনোভাবের দায়িত্ব ভীষণ। অন্ততঃ সেখানে একটা intellectual honesty-র চাহিদা সর্বদাই থাকে। কিন্তু কবি যখন নিজের নৈরাশ্যকে বড় ভাবেন তখন তিনি মাত্র আত্মকেন্দ্রিক, কেবল একটিমাত্র fact নিয়ে ব্যস্ত। মার্ক্‌সিষ্ট-এর মনোভাব বিপরীত, তার কাছে factগুলো data। মার্ক্‌সিষ্ট কবিদের কেন্দ্র ব্যক্তি নয়, পুরুষ, সমষ্টি-বোধে জাগ্রত পুরুষ। আমাদের কবিতায় সমষ্টিবোধ আসেনি, পুরুষ আর ব্যক্তির পার্থক্য এখনও ধরা পড়েনি। তাই যে-বাস্তবতার চর্চা চলছে সেটা জোর populist realism, social realism নয়। জনগণের উল্লেখ আর গণবোধের মধ্যে পার্থক্য আছে। পার্থক্য ঘুচতে পারে, আপাততঃ, চেতনার উন্নতিতে। যতটা সংখ্যাবৃদ্ধির ওপর উন্নতি নির্ভর করে ততটার প্রসার আমি মার্ক্‌সিষ্ট কবিতার জন্য চাই। আমার বক্তব্য এই: দুর্বলতা সত্ত্বেও ১৯৪২ সালের 'আধুনিক' কবিতা পূর্বেকার 'আধুনিক' কবিতার চেয়ে উন্নত। এগুলো মধ্যবিত্তের চাকরী না পাওয়ার দুঃখ থেকে জন্মায়নি, অনুকা-দেবীর মুখ চেয়েও লেখা নয়। যে-লেখক ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করেন, আমাদের ভবিষ্যৎ নেই কেন ভাবেন, যে-কবি প্রেমে পাগল নয়, বন্ধুত্বের সন্ধানী, যে ব্যক্তি সমাজ অভিব্যক্তির নিয়ম খুঁজতে ব্যস্ত, তিনিই ১৯৪২ সালের আধুনিক, অতএব আমাদের সকলেরই শ্রদ্ধার্হ। অবশ্য লেখক হওয়া চাই, বলাই বাহুল্য। এবং রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয়ের পর আমাদের কবিরা লিখতে জানেন না কে বলে?

পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৪৯

মণীন্দ্র রায়

'নানাকথা'

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী যে নানাভাবে পীড়িত ও বিব্রত এটা আমার নতুন আবিষ্কার নয়, সকলেরই মর্মে মর্মে এ গ্লানিকর তথ্য জানা আছে। এবং এর তত্ত্বের দিকটাও খুব বেশী অননুভূত বা অজ্ঞাত নয়,—মূলত অর্থনৈতিক, কিন্তু এটা দাসদেশ ব'লে রাজনৈতিক দিকটারও উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক। কিন্তু এ সমস্তই জানা কথা। পুনরাবৃত্তি করা যে কেবল অনর্থক তাই নয়, বিরক্তিকরও। তথাপি বতমান পুস্তকের আলোচনা ও রসোপভোগের জন্য এ প্রসঙ্গের অবতারণা পশ্চাদপট হিসাবে কার্যকরী ছিল।

কারণ, সমর সেনও বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একজন; এবং তাঁর কবিতাও ঐ শ্রেণীরই মালমশলা থেকে রচিত, অথবা নির্মিত। বলা বাহুল্য একথার দ্বারা কবিকে ছোট ক'রে দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয় (কারণ, কবি বড় কি ছোট সেটা কেবল তিনি কোন অর্থনৈতিক শ্রেণীর লোক, তাই দিয়েই নিরূপিত হয় না) আমার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র ঘটনাটা জানানো।

বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর নানা দিকেই ক্ষয়িষ্ণুতার (অথবা সমরবাবুর লাগসই শব্দ চয়নে—অবক্ষয়ের) চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট। মনে হয় যেন কোনো-দিকেই আর কোনো পথ নেই, আশ্বাস নেই, এখন কেবল গভীর বিপদে হাত পা গুটিয়ে হা-হুতাশ করতে করতে ঘটনা স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করণীয় নেই। এবং যদিও বোঝা যাচ্ছে এভাবে কখনো চলতে পারে না, সবনাশ সুনিশ্চিত, তথাপি কেমন ক'রে যেন নিজের জালে নিজেই তারা জড়িয়ে পড়েছে, কেটে বেরোবে—দাঁতে এমন ধারটুকু পর্যন্ত নেই। এতদিন সমর সেনের কবিতার নায়কগুলিও ছিল প্রায়শঃ এই শ্রেণীরই প্রতিনিধি। 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অন্যান্য মধ্যবিত্ত পুঙ্গবের মত তারাও দেখি সেখানে হা-হুতাশ করে, মাঝে মাঝে অক্ষম আক্রোশে নিজের গায়েই নিজে দাঁত বিঁধিয়ে দেয়, কিন্তু জ্বালা তাতে কমে না, পথের রেখাও চোখে পড়ে না, কেবল অন্তরে বাইরে বেদনার অন্ধকারই পাথর কঠিন হয়।

তবু আশা যায় না। মনে হয় যেন কোথায় একটা পথ আছে, অলক্ষ্যে কোথায় যেন মন্ত্রধ্বনি মেঘের গুরু গুরু ধ্বনিতে ভাষা খোঁজে, দূরে থেকে যেন অগাধ বিস্তারের উদ্বেলিত সমুদ্রগর্জন কানে আসে। কিন্তু বারে বারেই ব্যর্থতার প্রতারণা। আবার জমে ক্ষোভ। অতলস্পর্শী ঘৃণা, আর বিষ নীল বিদ্রূপের জ্বালা। তবু আশা যায় না।

সমস্ত কবিতাতেই ছিল এই সুর। রকমফের ছিল, ঘটনা সংস্থান নৈপুণ্যে এবং

নানা রকম কাব্যালঙ্কারের সার্থক প্রয়োগে বাহাদুরীও অবশ্যই ছিল, ('বাহাদুরী' কথাটা সস্তায় মেরে দেওয়া অর্থে ব্যবহার করিনি, ভাল অর্থে ব্যবহার করেছি ।)

কিন্তু বর্তমান কবিতা পুস্তকে পৌছে দেখি দৃষ্টিভঙ্গী রীতিমত পৃথক্। কবির কাব্যাদর্শ এখানে আগেকার বই দুইখানির মত কেবলমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবক্ষয়ের লক্ষণ চিত্রণেই সাঙ্গ নয়। এখানে কবি চোখ ফিরিয়েছেন প্রথমত নিজের দিকে, তারপর সমাজের দিকে—সাধনা চলেছে ব্যষ্টিকে কী করে সমষ্টির মধ্যে বিলীন করা যায়। তাই, যদিও

বুঝি পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক, অবিনশ্বর (রোমন্থন)
আমার দেশে দুধারে স্তব্ধ ধূসর মাঠ (হসন্তিকা)
বন্ধু তোমরা ফিরে যাও ঘরে (ঘরোয়া)
আমাদের বসন্ত বাগান ভেসে যাবে রক্ত স্রোতে (কয়েকটি মৃত্যু)
একা কাক অধোমুখে, জাগে জীর্ণ গাছের উপরে (সারনের গান)
পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে
দিন শেষের জানোয়ার (শব যাত্রা)
দিন রাত্রি লোহিত ধূলোয় রুদ্ধমুখ আকাশ ;
বিতর্ক বৃথা ; আজ হৃদয় সঙ্কীর্ণ গলি । (ঐ)
সত্তার কৌলীন্য খোয়াবেনা কোনো দিন
এ গর্বে জিইয়ে থাকে বুদ্ধিজীবীরা (নববর্ষের প্রস্তাব)
চলিত সভ্যতাব মোড়ে বিপরীত মতামতে ধাঁধা লাগে
কোন্ ঘাটে তরী ভিড়াই (ঐ)

তথাপি সংগ্রামের শেষ নেই,—শেষের কবিতা কটিতে এ প্রয়াস রীতিমত স্পষ্ট,—সেখানে :

আমার এ স্তব্ধতা ভেঙে দাও
মাঠে সকালে সবুজ ফসল জ্বালো,
শূদ্রের অসমাপ্ত বৃত্ত পূর্ণ করো
তোমার দানে । (শবযাত্রা)
অগণন জনগণ অচিরাৎ মিশে যাবে এ ভিড়ে
রক্তাক্ত শরীর (ঐ)
আশ্বিনের সকালে মনে হয়, দূরে সমুদ্রের ধারে
অসংখ্য অশ্বারোহী
বিচ্ছুরিত নীল অন্ধকারে
ক্ষণে ক্ষণে বালুতে নামে
হলুদ বালি দিন রাত্রি জ্বলে, দূরে ফণি মনসার ঝাড় ।

ফেরার হাওয়ায় শুনি ক্রমশ নিঃশব্দ গান
আমার এ মরুভূমি বসন্তের বাগান। (নানাকথা)
গ্রহণ লেগেছে প্রাচীন সূর্যে ;
এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হবো,
যে মৃত্যু প্রাণ আনে তার ফিনিক্স গানে
প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে। (বসন্ত)
মাঝে মাঝে ঝোড়ো হাওয়ায় শুনি আর এক গান।
নেহি দেঙ্গে হমরা হিন্দুস্থান। (পঞ্চম বাহিনী)
অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে
কালের ঘোলাটে জলে জোয়ার লাগায়
সম্ভব হয় অনেকের খেয়া পারাপার
গভীর জলে একের শবদেহ ডোবে। (নববর্ষের প্রস্তাব)

ব্যষ্টি সমষ্টির মধ্যে বিলীন হবার পথ পেয়েছে। ব্যক্তি এখানে পরিপূর্ণ সামাজিক চেতনায় ও সক্রিয় আদর্শোপলব্ধিতে সার্থক ; কবিও অবকাশ পেয়েছেন সুস্থ হবার। কাব্যের দিক থেকে সেটা খুবই সুলক্ষণ।

পূর্বের বই দু খানির মত এ বইয়েরও সমস্ত কবিতাই গদ্যরীতিতে লেখা.—বাংলাদেশে শুধু অমিয় চক্রবর্তী আর সমর সেনই নিয়মিত গদ্য-কবিতা লেখেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের মত গদ্যরীতির আগমনও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতই এ রীতির মূল সমসাময়িক সমাজ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির গভীরে নিবদ্ধ। আপাতত সে-বিশ্লেষণ ও প্রতিপাদনের দায়িত্ব যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি শুধু এখানে বলতে চাই, সমর সেন যদিও এ রীতির প্রথম পথ-প্রদর্শক নন—সে গৌরব আরো অনেক কিছুর মতই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের, তথাপি এর চরমোৎকর্ষ তাঁরই হাতে। শব্দচয়নে তিনি রীতিমত রাবীন্দ্রিক, কিন্তু আঙ্গিকের অভিনবত্বপ্রসাদে স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। এঁর সবচেয়ে বড় যা গুণ তা হ'ল সংহৃতি। নিখুঁত ছোট গল্পের মত সুরু ও শেষ, সঙ্গে সঙ্গে নাটকীয় ঘটনা সংস্থান এবং গীতিকবিতার ব্যঞ্জনা,—এ সমস্তই এঁর কবিতাগুলিতে পাশাপাশি নয়, অঙ্গাঙ্গীভাবে এক ধারায় ব'য়ে চলে। আমি যা বলতে চাই, হয়ত কয়েকটি কবিতা নিয়ে ভাল রকম আলোচনা করতে পারলে স্পষ্ট ক'রে বোঝাতে পারতাম, কিন্তু তাতে সমালোচনা সাময়িক পত্রের গণ্ডী অতিক্রম করত।

এ বইতে শেষের কবিতা কয়টিতে পংক্তির শেষে মিলের সাক্ষাৎ মেলে। গদ্য-

কবিতায় মিল দিলে অনেক অজ্ঞ পাঠক সেটাকে কবির মিলের কবিতা লেখবার অক্ষমতা ব'লে মনে করতে পারে ; কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সমর সেন গদ্য কবিতার ধর্মকে কোথাও বিকৃত করেননি, মিলের চরণে বিক্রীতও করেননি ; মিল সেখানে অনিবার্য নয়, হয়েছে শুধু একটা অধিকন্তু আকর্ষণ।

গদ্যের স্বাভাবিক চালটা পয়ারের। তাই সমর সেনের গদ্য কবিতাও পয়ার-ধর্মী। কিন্তু দেখে আশ্চর্য হয়েছি, এক জায়গায় তিনি অক্লেশে তিন মাত্রার ছন্দকেও গদ্যের কাঠামোয় ভেঙে দাঁড় করাতে পেরেছেন। বাইশ পৃষ্ঠার ওপরের দিকের কয়টা লাইন আমার বক্তব্যের উদাহরণ,—লাইন কটি ছন্দের কবিতা হ'য়ে উঠতে কেবল সামান্য ওলট-পালট ও সাজিয়ে দেবার মুখাপেক্ষী।

চিত্রে, চিত্রকল্পে, প্রতীকে কবিতাগুলি অদ্ভুতভাবে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। জানি না, সমর সেন মনে মনে এরকম কোনো অভিসন্ধি পোষণ করেন কি না যে, ছন্দোমিলবদ্ধ কবিতা ছাড়া অন্য কিছুকে কবিতা বলতে চাও না? কিন্তু দেখ, ছন্দ (অর্থাৎ পদ্য ছন্দ) ও মিল ছাড়াও কী রকম সার্থক কবিতা লেখা যায়! কয়েকটি প্রতীক আছে, ঘুরে ঘুরে যাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। যেমন—পাহাড় (বিরাটত্ব এবং কখনো স্থাণুত্বের প্রতীক), বর্গী (দুর্ভাবনা ও দুর্বিপাকের প্রতীক), কৃষ্ণচূড়া (যৌবন ও উচ্ছলতার প্রতীক), ফণিমনসা (রুক্ষতা ও ব্যর্থতার প্রতীক), শবযাত্রা (যুগপরিবর্তন ও পুরানো যুগের মৃতদেহ বহনের প্রতীক)। আবার এমন কয়েকটি কথা আছে যা অভিভাব (association) সৃষ্টিতে অপূর্ব: 'কানা গরু'—কলুর বলদ, রামপ্রসাদের গান, 'নবাবী আমল'—অতীত সামন্ততান্ত্রিক যুগ, কালীপ্রসন্নের রচনা; তাছাড়া বৈষ্ণব কবিতা ও রবীন্দ্রনাথের নানা টুকরো লাইন তো আছেই।

মোটের ওপর 'কয়েকটি কবিতা' ও 'গ্রহণ' পেরিয়ে 'নানাকথা' বিষয়বস্তু ও আঙ্গিক, এই দুই দিক থেকেই আর একটি বিশিষ্ট ধাপ। এবং বলতে আপত্তি নেই আমরা অনেকে যে আশঙ্কা করেছিলাম—সমর সেন যে-ধরনের গদ্য লেখেন তাতে অচিরেই রীতিমত অরুচি সুরু হবে—কবি এই বই প্রকাশ ক'রে সেটাকে একেবারে অযথা প্রতিপন্ন ক'রে দিয়েছেন।

কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৯

সুরেশ মৈত্রেয়

খোলা চিঠি

[অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে]

…প্রচলিত কারুকর্মে বিমোহিত না হয়ে যে নবতর আঙ্গিক ও ভাবৈশ্বর্যের বন্যা আধুনিক বাংলা কাব্যের তটে এসে লেগেছে তার অন্যতম নিয়ন্তা হলেন সমর সেন। বক্রহাসি, ছোটোখাটো অথচ বিলক্ষণ আঁট সাঁট দেহ নিয়ে তাঁর কাব্যদেবী চলা ফেরা করেন ; যদিও যতীন সেনগুপ্ত ও বিষ্ণু দে সে পথ কেটেছেন কিছু। পূর্ববর্তীর পথে তাঁর যাত্রা সুরু হলেও কয়েক পদ অগ্রগতির পরেই তিনি পথ পরিবর্তন, তথা পরিবর্দ্ধনে ব্যস্ত হলেন। 'গ্রহণ' অবধি, বলা যেতে পারে তারই একটানে ইতিহাস, সম্প্রতি সমর সেনের কাব্যদক্ষতায়, গুণীমহলের কানাকানিতে, ভাঁটা এসেছিল। কিন্তু 'খোলা চিঠি' খুলে মনে হল তিনি 'গ্রহণে'র মুক্ত সূর্যের মতই বলিষ্ঠ প্রহারে আবির্ভূত হলেন। এবং নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে এর 'জাতীয় সংকট' বর্তমান বছরের একটি সেরা কবিতা ; এমনকি সমর সেনের অন্যান্য সার্থকতম কবিতার পার্শ্বেও এ রসতারতম্যে মলিন হবে না। সবচেয়ে কৃতিত্বব্যঞ্জক এই যে, এত বড় লম্বা কবিতাতেও কবি সর্বত্র ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থ-স্বচ্ছতা সংরক্ষণে সক্ষম হয়েছেন। কয়েকটি কবিতায় সমর সেনের প্রয়োগনৈপুণ্যও লক্ষণীয়। নানাবিধ উর্দু, ফারসী ও ইংরেজী শব্দের ব্যবহারে যে ঝাঁঝালো রসবিকাশ তিনি ঘটিয়েছেন তা সকল বিপ্লবী কবির পক্ষেই শ্লাঘার। গতানুগতিক অপচ্ছায়া থেকে মুক্তির প্রয়াস এতে এত সুস্পষ্ট যে বাংলাকাব্যের নবতর প্রচেষ্টায় তিনিও যে অন্যতম হোতা, অকুন্ঠিত অন্তরে তাতে স্বীকৃতি দিতে হয়।

চতুরঙ্গ, পৌষ ১৩৫০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

কাব্যদৃষ্টি ও সমর সেনের 'তিন পুরুষ'

আধুনিক বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক হিসেবে একটা প্রশ্ন বহুকাল ধরে আমাকে ভাবিয়েছে। প্রশ্নটি—কাব্যবস্তু সম্বন্ধে একটা জিনিস আমরা সকলেই স্পষ্ট অনুভব করছি যে, আমাদের আধুনিক কবিদের, বিশেষ করে অত্যন্ত হালে যাঁরা কলম ধরেছেন—তাঁদের, জীবনদৃষ্টি যতই প্রগতিশীল হচ্ছে সত্যিকার সার্থক কবিতাও সেই অনুপাতে দেশে ক্রমশ দুর্লভ হয়ে উঠছে। এই স্ববিরোধী অবস্থার একটা সস্তা সমীকরণ অবশ্য বাজারে চলতি। এই দলের সমালোচকদের মতে, প্রগতিশীল জীবনদর্শনের আওতায় যখন মহৎ কবিতার জন্ম হচ্ছে না, তখন তার জন্যে দায়ী একমাত্র কাব্যসৃষ্টির অক্ষমতাই। ফলে, অত্যন্ত সহজেই এই পরিচিত সিদ্ধান্তে এসে এঁরা পৌঁছেছেন,—বাংলাদেশে ভালো গল্পলেখক, প্রাবন্ধিক ইত্যাদির অভাব নেই, অভাব শুধু মহৎ কবির!

অত্যন্ত দুরূহ কোনো সমস্যার এমন সুলভ সমাধানে মন ভুললেও, সমস্যা শেষ-পর্যন্ত থেকেই যায়। সহজ বলেই এই রকম সমাধান মূল সমস্যাকে সব সময়ে এড়িয়ে চলে।

আসলে আমার মনে হয়েছে, এইসব সমালোচকের মূল দৃষ্টিভঙ্গিটাই গোল-মেলে। নিসর্গ-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ প্রত্যেক মানুষের স্বভাবের গভীরে, কিন্তু সব সময়ে সে আবেদন সমান কার্যকরী না হওয়াও আবার তেমনি স্বাভাবিক—মনের বিশেষ অবস্থার সঙ্গে প্রতিবেশের স্বাভাবিক সংযোগের উপরই এর নির্ভর। এখন কোনো কালাপাহাড়ী রসজ্ঞ যদি উপভোগের এই আপেক্ষিক রীতিকে অস্বীকার করে তার বিশুদ্ধতাকেই চিরন্তন বলে দাবী করেন এবং রসগ্রহণে অসমর্থ হতভাগ্যকে শেকস্‌পীরীয় সংজ্ঞার চলতি অপব্যাখ্যা অনুযায়ী অপরাধ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় বলে গণ্য করেন তাহলে অন্তত বাস্তবচেতনা যে মাঠে মারা পড়ে এ-বিষয়ে নিশ্চিত। এবং এ-মনোভাব যে বাস্তবতার বিরুদ্ধে উৎকট কালাপাহাড়ী দৃষ্টিভঙ্গির ফল তা শুধু এই কারণেই যে, এই ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তিবিশেষের মন নির্জীব দর্পণ মাত্র, সক্রিয় কাব্যচেষ্টা সংজ্ঞাধীন যে নিষ্ক্রিয় মনের কাছে অকল্পনীয়!

সত্যিই, আজকের সমাজজীবনে কাব্যরচনার উপাদান তো যথেষ্টই, অথচ তা সংহত সার্থক কাব্যবস্তুতে রূপান্তরিত হচ্ছে না কেন?—অনেক সময় মনে হয়েছে খাঁটি দার্শনিকতার সঙ্গে কবিতার মেজাজের একটি মৌল পার্থক্য থেকেই বোধ হয় এই সংকটের উদ্ভব। পরে আবার মনে হয়েছে, কিন্তু কোনো কবির মনে বিশুদ্ধ তত্ত্বকথা (রাজনীতির ভাষায়—শ্লোগান) যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রসে জারিত হয়ে একেবারে জীবন্ত হয়ে ওঠে তবে খাঁটি কাব্যবস্তু হতেই বা তার বাধা কি?

অন্যপক্ষে বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ সাহিত্যিকরা সমস্যাটিকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। কাব্য ও দর্শনের মৌল বিরোধের সমীকরণ (অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যক্তি-চেতনার একাত্মতাসাধন) তাঁদের মতে অসম্ভব, তাই এই উনিশশো পঁয়তাল্লিশেও তাঁরা সাহিত্যিক ছুৎমার্গে আশ্চর্যরকম আস্থা রাখেন এবং মনে করেন, যেকোনো রকম কবিতা ('একটু সুর একটু হৃৎস্পন্দনে'র কবিতাও হতে পারে) লিখেই তাঁরা গুরুতর সামাজিক দায় পালন করছেন। কিংবা অনেক সময় এই সমস্যার একটা কৃত্রিম সমীকরণের চেষ্টাও তাঁরা করেন, যখন সক্রিয় 'কর্মলোক' (দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্র)-কে সচেতনভাবে এড়িয়ে তাঁরা 'রাজনীতির যে প্রেরণা ভাবলোকে'র সেই বিশুদ্ধ 'প্রেরণা'য় কবিতা লিখতে রাজি হন।

এক্ষেত্রে মুশকিল এই যে, রাজনীতির 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' কাব্য-চেষ্টারও প্রেরণা মাত্র—কিন্তু তার বেশি আর কিছু নয়! এই বিশুদ্ধ প্রেরণার ভিত্তিতে যদি দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বাস্তব ক্ষেত্রটি না থাকে বা ক্রমশ না গড়ে ওঠে, তবে একদিন সেই ছিন্নমূল প্রেরণা তার আকাশবাসরের বিশুদ্ধতা বজায় রাখতে গিয়েই অকালে প্রাণ হারাবে। এ-প্রসঙ্গে সমর সেনের ব্যক্তিগত সাহিত্যিক ইতিহাসও বিশেষভাবে স্মরণীয়। সমরবাবু একজন শক্তিমান আধুনিক কবি এবং তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ, ১৯৪০-এ প্রকাশিত 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা'র রচনাকাল থেকে 'রাজনীতি'র (মার্কসীয় রাজনীতির) ও 'ভাবলোকের' (মূল দার্শনিক মতবাদের এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের বহুমুখী ব্যাখ্যার) 'প্রেরণা'য় আস্থাও তাঁর অকৃত্রিম, অথচ ১৯৪৪-এ প্রকাশিত তাঁর আধুনিকতম কবিতার বই 'তিন পুরুষ' পড়তে গিয়ে এই কথাটাই বারবার মনে হ'লো যে, 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' বিশুদ্ধ 'প্রেরণা' গত চার-পাঁচ বছরে কবির ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে সমষ্টিচেতনার সমীকরণের কাজে তাঁকে একতিলও অগ্রসর হতে সাহায্য করেনি!

ফলে 'তিন পুরুষ' পড়তে পড়তে আমার সেই মূল প্রশ্নের জবাব আমি নিজের মনেই খুঁজে পেলুম। মনে হলো দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশুদ্ধ কাব্যবস্তুর মধ্যে বিচ্ছেদ প্রকাণ্ড কিন্তু সেই বিচ্ছেদে সেতু বাঁধার দুরূহ কাজটিই আবার আজকের সার্থক কবির। এবং এই কাব্যচেষ্টা 'রাজনীতির' 'ভাবলোকের' 'প্রেরণা'র আস্থায় মাত্র নয়, এটি একটি রাজনৈতিক কর্মসূচীর অনুসরণেই সক্রিয়।

আর বাংলা কবিতার আসল গলদ এখানেই। ইংরেজ লেখক জ্যাক লিণ্ডসে তার সংক্ষিপ্ত কিন্তু মূল্যবান কাব্য-আলোচনাগ্রন্থ 'Perspective for Poetry'-তেও আধুনিক ইংরেজি কাব্যপ্রকৃতির বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তার এই মৌল নিষ্ক্রিয়তা-বোধ বা 'Flaw of Passivity'র উপর খুব বেশী জোর দিয়েছেন, দেখলুম। আমার ধারণা, সমরবাবু এবং আমাদের আধুনিক অন্যান্য কবির কাব্যচেতনার মূলে আসলে লিণ্ডসে-বর্ণিত এই 'Flaw of passivity'ই গভীরভাবে কাজ করছে।

এই শেষোক্ত লেখক তাঁর বইটিতে বারবার এমন একটি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার

প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন—শ্রেণীসমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রয়োগক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রগতিশীল শ্রেণীর সঙ্গে কবির ব্যক্তিস্বরূপের একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অঙ্গাঙ্গী। কিন্তু এ-কথাও এ-প্রসঙ্গে স্বীকার্য যে, কবির ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং সেই ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে শ্রেণীসমাজের অনবরত বিরোধ, একাত্মতা উপলব্ধির এই পদ্ধতিকে সর্বদাই সংকটসংকুল করে রাখে। সংকটের এই আবর্তে তাই কবির পক্ষে শেষ পর্যন্ত দুটি পথ খোলা : হয় তিনি এই সংঘাতের মধ্যেই নতুন সংহতির ভিত্ রচনা করে সামাজিক অগ্রগতিকে রক্তমাংসে সঞ্জীবিত করে তুলবেন, আর তা না হলে, অন্ধ ঘূর্ণিপাকের জটিলতায় তিনি তলিয়ে যাবেন এবং হয়তো শেষকালে পালিয়ে বাঁচবেন কিংবা হার মেনে কবিতা লেখাই ছেড়ে দেবেন। এবং প্রায়ই দেখা যায় যে, ঠিক এই কারণেই—এই রাহুময় আত্মজিজ্ঞাসার হাত এড়াতেই—কবির হংসৈর্যথা ক্ষীরমিবাম্বু মধ্যাৎ'-এর পলায়নী পদ্ধতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানের নিরাপদ আশ্রয়ে নীড় বাঁধেন।

আধুনিক বাংলাদেশের কাব্যপ্রকৃতির নিষ্ক্রিয়তা-বোধের মূল উৎস এইখানে। এবং এই কারণেই সমর সেন ও অন্যান্য আধুনিক কবি থিয়োরির ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বাবুর সঙ্গে একমত না হলে কার্যত এঁরা 'রাজনীতির' এই 'ভালোকের'ই ব্যাপারী। সমাজজীবনের উন্নততর পরিবর্তনে তাই বিশ্বাস রেখেও ব্যক্তিগত জীবনে সেই পরিবর্তনের সক্রিয় চেষ্টায় একাত্মতা-বোধের অভাবে এঁদের কাব্য-চেষ্টার করুণ পরিণতি অবশেষে অত্যন্ত ব্যক্তিগত, স্বল্পপ্রাণ 'আশা' 'ভরসা'র প্রতিচ্ছবিতে :

> "একটি একেলা বট খাপছাড়া ছায়া দেয়,
> প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ
> কিন্তু তার শিকড়েরা ঊর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে।"
>
> (তিন পুরুষ : জোয়ারভাটা)

'তিন পুরুষ'-এর কবি এই ছিন্নমূল প্রাণের উৎকেন্দ্রে নিঃসঙ্গ, একক—গতপত্র, আকাশসন্ধানী 'বট'ই দারুণ দুর্দিনে তার কাছে জীবনের একমাত্র প্রতীক। তাই শেষপর্যন্ত মিলিত অগ্রগতিতে আস্থা রেখেও কার্যকালে স্বাতন্ত্র্যের দৃঢ়দুর্গ থেকে এই কবি বলছেন :

> "আশা রাখি একদিন এ-কান্তার পার হয়ে পাবো
> লোকের বসতি, হরিৎ প্রান্তরে শ্যামবর্ণ মানুষের
> গ্রাম্যগানে গোধূলিতে মেঠো, পথ ভরে···"
>
> (২২শে জুন, ১৯৪৪)

অর্থাৎ, সেই একাত্মতা-বোধের অভাব আর নিষ্ক্রিয়তা আর উগ্রতর স্বাতন্ত্র্য! এবং আমাদের আলোচ্য বইটিতে কাব্যপ্রকৃতির এই মৌল নিষ্ক্রিয়তাবোধ দু'দিকে দু'টি বিশেষ লক্ষণে পরিস্ফুট। একদিকে, যেখানে কবি ইতিহাসের ব্যাপক

পটভূমিতে সমাজ-বিবর্তনের ধারাবাহিকতা দেখাবার চেষ্টা করেছেন, জোড়া-দেওয়া খণ্ডচিত্রে সেখানে তা সিনারিয়োধর্মী হয়ে উঠেছে—জীবন হয়ে উঠেছে সেখানে জীবনের abstraction। এর প্রমাণ এ-বইটির "কালের যাত্রা" কবিতাটি। এখানে তিনটি বিচ্ছিন্ন কালের পটভূমিতে তিনটি টাইপ চরিত্র-চিত্র এঁকে এবং সেই তিনটি চরিত্রের মধ্যে মোটামুটি একটা রক্তসম্বন্ধের যোগসূত্র টেনে তাঁর স্ব-কৃত জীবনচিত্রের বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ক্রমিক ধারাবাহিকতা দেখাবার যে চেষ্টা সমরবাবু করেছেন তার কৃত্রিমতা অত্যন্ত প্রকট। কারণ, পরপর তিনটি ঐতিহাসিক যুগের সম্বন্ধ পরস্পর বিচ্ছিন্নতায় নয়, পরস্পরনির্ভরে। বরং এই সম্বন্ধের সূত্র আরো গভীরে। সামন্তসমাজ শুধু ধনতন্ত্রের জন্মের অনুকূল অবস্থাই সৃষ্টি করেনি, সেই সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়েই বুর্জোয়া বণিকশ্রেণী নতুন সমাজগঠনের শক্তি অর্জন করেছে, ঠিক যেমন ধনতন্ত্রের বর্ধিষ্ণু উৎপাদন-শক্তি ও তার যন্ত্রশিল্পের প্রসার-সম্ভাবনা সমাজতন্ত্রের জন্মের উপযোগী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, আর তার অন্তর্বিরোধে—সংগঠিত শ্রমিক-কৃষকের চেতনায় সমাজতন্ত্রের জন্মরহস্য। তাই বিবর্তনশীল কালের পটভূমিতে কতকগুলি টাইপ চরিত্রকে বিশেষ বিশেষ কালের প্রতিভূ হিসেবে দেখাতে হলে শুধু তাদের মধ্যে সময়ের বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তুললেই কবির কাজ শেষ হয় না—সেই লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে তাদের সচেতন কিংবা অবচেতন প্রতিরোধস্পৃহাও স্পষ্টভাবে দেখানো দরকার, তা না হলে জীবন্ত চরিত্রগুলোকে আসলে সময়ের নির্জীব প্রতিফলন বলে মনে হয়। এবং সমরবাবু তাঁর আলোচ্য কবিতাটিতে স্বভাবতই এ-বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক না হওয়ায় উল্লিখিত তিনটি বিভিন্ন সময়ের মধ্যেকার জীবন্ত যোগসূত্রও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই ছিঁড়ে গেছে।

আবার অন্যদিকে, নিষ্ক্রিয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত এই খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টিই সমরবাবুর কবিমনের রসবিচারের সম্মুখীন: সেখানে আত্মসমালোচনায় তিনি দুর্বার, কঠিন। কোনো কোনো কবিতায় (গৃহস্থবিলাপ, সাফাই, ২২শে জুন, ১৯৪৪ প্রভৃতি) তাঁর এই আত্মসমালোচনার প্রবৃত্তি স্পষ্ট রূপ নিয়েছে উগ্র বামপন্থী মনোবিকারে। এবং এই সমস্ত কবিতায় মৌল নিষ্ক্রিয়তাবোধ থেকে উদ্ভূত খণ্ডিত কাব্যদৃষ্টির সমালোচনা-প্রসঙ্গে উগ্র বামপন্থী ভাববাদের কুয়াশা সৃষ্টি ক'রে তিনি আরো বেশি প্রমাণ করলেন—এই নিষ্ক্রিয়তা তাঁর কাব্যসত্তায় কত দৃঢ়মূল!

প্রথমে "গৃহস্থবিলাপ" কবিতাটি ধরা যাক। গত মন্বন্তরের উপর এটি সমরবাবুর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কবিতা। এখানে মন্বন্তরে ইতিহাসের যে-অভিব্যক্তি তিনি দেখেছেন তা অনেকটা গ্রীক ট্র্যাজেডির মতো অমোঘ, অবশ্যম্ভাবী। তাই যদিও··· 'দেশের দুর্যোগে কী উপায়ে কাঁচা টাকা ভাঁড়ু দত্ত করে' সে-সম্বন্ধে তিনি অবহিত তবু দুর্যোগের নৈর্ব্যক্তিক অবশ্যম্ভাব্যতা তাঁর রচনায় এত স্পষ্ট যে তাঁর ব্যঙ্গে বিদ্রূপে—

"যে যাদুতে কাগজ-হকার
গিয়েছে একদা লাটের মন্ত্রণাগার,
সে যাদুতে আমরা বঞ্চিত…"

—ইত্যাদি লাইনে একটা অস্পষ্ট আত্মকরুণার সুর কানকে ফাঁকি দিতে পারে না। তবু শেষপর্যন্ত যেহেতু 'বড়লোকে আস্থা নেই আর' তাই মন্বন্তরের পরবর্তী সময়ে তাঁর সিদ্ধান্ত এইরকম :

"অকাল মরণ শেষে এ-কাল সমরে!
তোমাকে জানাই বন্ধু :
পথে বাধা পর্বত আকার,
পণধরা আমাদের হাড়,
শ্রেণীত্যাগে তবু কিছু
আশা আছে বাঁচবার।"

আশ্চর্য এই যে, মন্বন্তর যাঁর কাছে কালের অমোঘ প্রকোপ—অনেকটা দৈব-দুর্বিপাকের মতো, সামাজিক ভাঙন যাঁর কাছে এক অপ্রতিরোধ্য বিভীষিকার সামিল, অবশেষে তিনিও এইভাবে 'শ্রেণীত্যাগে' বাঁচবার উপায় সন্ধানে ব্যস্ত! কিন্তু 'শ্রেণীত্যাগ' তো জীর্ণ কাপড় পরিত্যাগের মতো কোনো একটি বিশেষ কাজ নয়, সেটি একটি আয়াসসাধ্য কর্মপদ্ধতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট। যুগসঞ্চিত শ্রেণীসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পেছনে দীর্ঘকালের যে সক্রিয় ইতিহাস আছে, সমসাময়িক কালের সঙ্গে ব্যক্তিচেতনার একাত্মতা উপলব্ধির পদ্ধতির যা অনুষঙ্গী, সমরবাবুর বর্ণিত এই মন্বন্তর ও মারীগ্রস্ত ভগ্নমন মধ্যবিত্ত-জীবনে তার স্বীকৃতি কোথায়? অথচ আসলে গত কয়েক বছরের বাংলাদেশে সে ইতিহাস দুর্লভ ছিল না। অব্যবস্থিত সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অমোঘ আর্থিক বিপর্যয়কে মেনে নিয়েও উনিশশো বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বাংলাদেশের বিশেষ অবস্থায় যে জনসাধারণ আমলাতন্ত্রের অবাধ-বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে, তেতাল্লিশ-চুয়াল্লিশ-পঁয়তাল্লিশে আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি ও মজুতদারের চোরা-বাজারের বিরুদ্ধে সমস্বার্থে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গণসংহতির ভিত্ যারা রচনা করেছে—মন্বন্তর একমাত্র তাদের কাছেই দৈবদুর্বিপাক নয়, সামাজিক ভাঙনও তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য নয়, অবসিত সমাজের পুনর্গঠনের দায় তাই তাদেরই দৈনন্দিন কর্মতালিকার অঙ্গ। প্রবল ধ্বংসশক্তির বিরুদ্ধে এই সক্রিয় সচেতন প্রতিরোধবৃত্তি সংখ্যাশক্তিতে হয়তো অকিঞ্চিৎকর, তবু এই সক্রিয় সংঘর্ষই সমসাময়িক বাংলাদেশের একমাত্র ইতিহাস এবং এই ইতিহাসই আমাদের শ্রেণীচেতনাকে তীব্রতর করতে সমর্থ। একে অস্বীকার ক'রে শ্রেণীচেতনার কথা চিন্তা করা খানিকটা কাব্যিক ইচ্ছাপূরণ মাত্র।

এবং সমরবাবুর এই উগ্র বিভ্রান্তির পরিণতি ঘটেছে অবশেষে আত্মগ্লানিতে —সাফাই, ২২শে জুন, ১৯৪৪ প্রভৃতি কবিতায়—যেখানে আত্মসমালোচনাচ্ছলে তিনি সমসাময়িক অন্যান্য তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিদেরও বিদ্রূপ করেছেন। বলা বাহুল্য, আমার আপত্তি তার বিদ্রূপে নয়; এ-উল্লেখ তার লক্ষ্যভ্রষ্টতার আর একটি দৃষ্টান্ত মাত্র:

"কিন্তু জড়বাদী সুবুদ্ধির জোরে আজ আমি
দু-নৌকায় স্বচ্ছন্দে পা দিয়ে চলি,
বুর্জোয়া মাখন আর মজুরের ক্ষার
ভাগ্যবান এ-কবিকে বিপুলা যশোদা
নিশ্চয় দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস"

(সাফাই)

এখানে তাঁর বক্তব্য অবশ্য খুব স্পষ্ট হয়নি। তবু আমার মনে হয়েছে, হয়তো সমরবাবু 'মার্ক্সিস্ট' কবিদের সততার অভাবকেও বড়ো ক'রে দেখাতে প্রয়াস পেয়েছেন, শুধুমাত্র এইসব কবির মনে সক্রিয় শ্রেণীচেতনার অভাবের কথাটাই এখানে তাঁর বিশেষ বক্তব্য নয়। কিন্তু আমার অনুমান সত্যি হলে বলতে হয় এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্ত নির্ভুল হয়নি। কারণ, প্রথমত শ্রেণীচেতনা তো কারো জন্মগত অধিকার নয়, এটি একটি ঘনিষ্ঠ বাস্তব চেতনা অর্জনের বিলম্বিত পদ্ধতির পরিণতি। এবং এইসঙ্গে একথাও ভুললে চলবে না যে, এই শ্রেণীসমাজে কবিরা, এমন কি তথাকথিত 'মার্ক্সিস্ট' কবিরাও সাধারণত মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকে আসেন। এবং এই নয়া মধ্যবিত্তশ্রেণীর সামাজিক অবস্থানটাও বেশ কিছুটা গোলমেলে: উৎপাদনরীতির বিশুদ্ধ আর্থিকক্ষেত্রে এর স্বার্থসঞ্জাত ঘনিষ্ঠতা ক্রমশই প্রোলেটারিয়েটের অভিমুখী অথচ শিক্ষাদীক্ষায় ও সামাজিক সংস্কারে এখনো এর আত্মিক যোগাযোগ বুর্জোয়ার সঙ্গেই। ফলে কোনো বিশিষ্ট শ্রেণীগত চারিত্র্য এর নেই; তাই এই শ্রেণী থেকে যে কবি আসেন—মার্ক্সীয় জীবনদর্শনে চরম আস্থা কিংবা মন্বন্তর-মড়কের প্রত্যক্ষ বিভীষিকাই তাঁর মধ্যে রাতারাতি শ্রেণীচেতনার সঞ্চার করতে পারে না।

আসলে এই চেতনা অর্জনের জন্যে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অবকাশ আছে। ধ্বংসের মুখোমুখি জীবনসংগ্রামে কবির সক্রিয় সহযোগিতার সাফল্য এবং তার ফলে গণশক্তির ক্রমবর্ধিষ্ণু দৃঢ়মূল সংহতিই কালক্রমে এই চেতনাকে পুষ্ট করবে, তাই এ-প্রসঙ্গে কবির ব্যক্তিগত সততার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

বলা বাহুল্য, বাস্তব পরিবেশের প্রশ্রয়ী আপেক্ষিক এই শ্রেণীচেতনা মূলত নিশ্চয়ই কবির ব্যক্তিগত সক্রিয় চেষ্টার ফল; তা না হলে যে-কোনো কাব্যবিচারই অসম্ভব হতো। এখানে আমি শুধু শ্রেণীসমাজের বিশেষ অবস্থায় মধ্যবিত্তশ্রেণী-

সম্ভূত লেখকের বিশেষ অসুবিধের কথাটাই উল্লেখ করেছি মাত্র। কিন্তু যদি কেউ এর ফলে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে সমরবাবুর কবিতা-আলোচনাকেও নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তো তাঁকে আমি সক্রিয় কাব্যচেষ্টার দোহাই দিয়ে বলব যে, সার্থক কাব্যরচনা সমরবাবুর সাধ্য বলেই তাঁর কাছে এখনো আমাদের অনেক প্রত্যাশা। এবং যদিও দু'টি বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে জীবনের অখণ্ড রূপটি তাঁর কাব্যসত্তায় রক্তমাংসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠেনি তবু জীবনের অনুষঙ্গী এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কোনোদিনই সমরবাবুর চোখ এড়ায়নি। বিশেষ করে, এই শ্রেণীসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের পাকচক্রে ব্যর্থ মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমানসের হাস্যকর অসঙ্গতি আর তার ক্লান্তিকর আবহাওয়া যেখানে তাঁর পয়ারধর্মী গদ্যরচনার সহজাত স্বধর্মী, সেখানে তাঁর জীবনদৃষ্টি আশ্চর্য রকম অভ্রান্ত। কিন্তু যেহেতু শুধুমাত্র সংঘর্ষই নয়, সংগ্রাম-পরবর্তী জীবনের উজ্জীবনও সমসাময়িক বাস্তবের অঙ্গীভূত এবং যেহেতু সমরবাবু এই পরবর্তী জীবনের দিকে পিঠ না ফেরালেও মৌল নিষ্ক্রিয়তাবোধের অবশ্যম্ভাব্যতায় অন্তত সে ক্ষেত্রে তিনি বিশুদ্ধ ভাববাদী, শেষপর্যন্ত তাই আমরা 'গ্রহণ ও অন্যান্য কবিতা' থেকে 'তিন পুরুষ' পর্যন্ত সেই একই ত্রুটির পুনরাবর্তন লক্ষ করি, যে ত্রুটিতে কাব্যচেষ্টার আন্তরিকতা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁর জীবনদৃষ্টি শোচনীয়রকম খণ্ডিত।

'তিন পুরুষ'-এর রচনারীতিতেও কোথাও কোথাও এই খণ্ডিত জীবনদৃষ্টির প্রতিফলন সুস্পষ্ট। অবশ্য এ বইটির অনেকগুলো কবিতায়, কোথাও পুরোপুরি কোথাও বা অংশত, যেখানে তিনি পয়ারের পদের সঙ্গে একেবারে হাল আমলের অত্যন্ত ক্রুত শব্দ কিংবা বাক্যাংশকে মিশিয়েছেন :

> "বছর পঁচিশ হল পৃথিবীতে বাসা।
> কেরানী-সন্তান আমি, চতুর মানুষ
> কৈশোরে শুনেছি নানা মজাদার কথা,
> কেরামৎ! এরি মধ্যে করতলগত
> কত ছলা...... ।"

(আকাল)

এবং কোথাও বা মেশাতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দিয়েছেন, যেমন :

> "ঘৃণ্য শূদ্র যত শত হস্ত দূরে রেখে
> গৌরবে পড়েছি গীতা শ্রীমদ্ভাগবত,
> দুর্দান্ত যবনকালে পড়েছি উপনিষদ।
> ভাগ্যক্রমে ইংরাজ এলো, স্বাগতম!"

(বাবু বৃত্তান্ত)

এমন কি যেখানে একটি কবিতায় (স্তোত্র) তিনি প্রবহমান পয়ারেরও পূর্ববর্তী যুগের আড়ষ্ট যৌগিক ছন্দকে পুরোপুরি গ্রহণ করেছেন :

"আদিদেব একা সাজে পুরুষ প্রকৃতি।
মহাজন চাষী তিনি সবাকার গতি ॥
কৃষ্ণকালো বড়ো মেঘ জুড়েছে আকাশ।
শ্যামবর্ণ মূর্তি তার চাষীর আশ্বাস।
ধান দেখে মহাজন বলেছে সাবাস ॥"

সেখানে আমার মনে হয়েছে, এই পদ্ধতিতে বর্তমান জীবনের গ্লানি ও অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা করে তিনি সফলও হয়েছেন এবং এই সাফল্য অর্জনে কয়েক জায়গায় রীতিমত শক্তিরও পরিচয় দিয়েছেন। এর কারণ অবশ্য এ-পর্যন্তও তার দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবানুগ। আজকের সমাজে সৃষ্টিক্ষমতার দানবশক্তিকে উৎপাদনরীতির প্রাচীন কাঠামোয় বেঁধে রাখার হাস্যকর অথচ অত্যন্ত স্থূল বাস্তব চেষ্টার ফলে যে সামাজিক সংঘর্ষের উৎপত্তি ও প্রসার, সমরবাবুর কবিতার এই সমস্ত অংশ সেই সংঘর্ষেরই অবিকৃত প্রতিচ্ছায়া। এইসব লাইন আমাদের হাসায় আবার চেতনাকেও উত্তেজিত করে।

এমন কি, এক এক সময় যখন তিনি প্রাচীন পয়ারের এই পঙ্‌ক্তিতে এমন সব বাক্যাংশ যোজনা করেন, যেগুলি হুবহু ইংরেজির তর্জমা বলে মনে হয়, যেমন :

"বিষণ্ণ বাড়ীতে, নিরানন্দ যে যুবক
দিন আনে দিন খায়, সহধর্মিনীকে,
কুড়িতে বুড়ী সে, তাই বাপান্ত করে।"

(কালের যাত্রা)

তখন তা-ও যেন সব সময়ে কানে লাগে না, আমাদের জীবনযাত্রার অসঙ্গতির সঙ্গে বলার ধরন যেন এখানে চমৎকার খাপ খেয়ে যায়।

কিন্তু বক্তব্য আর এই প্রকাশরীতির অসঙ্গতি সেখানেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যেখানেই সমরবাবু অনাগত সামাজিক সম্ভাবনাকে তাঁর কাব্যবস্তুর মধ্যে পরিপাক করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে এখানে এসে তাঁর কাব্যদৃষ্টির বিশুদ্ধ abstraction-এই পর্যবসিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। ভারতচন্দ্রের পয়ারের যৌগিক ছন্দের সঙ্গে চলতি বাকভঙ্গির বিচিত্র ধ্বনিবিন্যাসের সমন্বয় ঘটিয়ে জীবনের অসঙ্গতিকে রূপ দেবার চেষ্টা সমরবাবুর আগেও চঞ্চল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা করেছেন এবং তাঁরাও এ-বিষয়ে কম-বেশি সফলও হয়েছেন এবং জীবন যেহেতু এখনো অসঙ্গতিতে পূর্ণ, আমাদের কবিতায় ছন্দের এই অভিনব প্রয়োগপদ্ধতির সম্ভাবনাও তাই এখনো নিঃশেষ হয়নি ; কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ছন্দের বিবর্তনের স্বাভাবিক ইতিহাসটিকেও মনে রাখতে হবে এবং ভুললে চলবে না যে, বলিষ্ঠ ভাব-প্রকাশের বাহন আজকের উপযোগী যে বলিষ্ঠ ভাষা—বাংলা পয়ারের সুবিদিত আতিথেয়তাকে সুদশুদ্ধ উদ্বল ক'রেও তার বাঁধাধরা চোদ্দমাত্রার এই

সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ কাঠামোয় সে-ভাষার নাটকীয় বিকাশ ও বিস্তারের সম্ভাবনাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সমরবাবু নিজেই এর আগে বরাবর 'মানসী'র 'নিষ্ফল কামনা'র পরবর্তী যুগের ভাঙাপঙ্‌ক্তির পয়ারের ছন্দকে (মুক্তক ছন্দকে) তাঁর রচনারীতির ভিত্তি হিসেবে মেনে নিয়েই তাঁর পয়ার রচনাকে সার্থক গদ্যরূপ দিয়েছেন। অতএব আমার বক্তব্যের সত্যতা ইতিপূর্বেই প্রমাণিত।

'তিন পুরুষ'-এ এই উপরোক্ত ত্রুটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে "কালের যাত্রা" কবিতাটির কয়েকটি লাইনে, যেখানে সমরবাবু আগামীকালের অগ্রদূতের কাহিনী বর্ণনা করছেন :

"অন্ত্যযুবা, ছন্নমতি কালের সম্বল !
প্রায় পথের ভিখারী, চালচুলোহীন,
অতীত সঞ্চিত গ্লানি খর অসংকোচে
সে মুছবে……"

এখানে 'প্রায় পথের ভিখারী, চালচুলোহীন' বাক্যাংশটি পয়ারের প্রায়-অসীম সাংকুতার সামাও যেন লঙ্ঘন করেছে ! বক্তব্যের Contrast-সৃষ্টিতে সাহায্য করতে গিয়ে এ-লাইনটি এবং সমস্ত স্তবকটির উপযোগী গাম্ভীর্যকেই নষ্ট ক'রে দিয়েছে। অথচ এটা বোঝা খুবই সহজ যে, আসলে এই একটি জোরালো বাক্যাংশে শুধুমাত্র নিয়মিত চোদ্দমাত্রার ছন্দের বর্বলিত হয়েই এখানে তার সমস্ত ব্যঞ্জনা হারিয়েছে।

অন্যত্র, যেখানে তিনি যথারীতি ভাঙা-পঙ্‌ক্তির যৌগিকছন্দের স্মরণ নিয়েছেন সেখানে তাঁর বক্তব্য ও প্রকাশরীতির সমন্বয় কিন্তু সুস্পষ্ট :

"সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা,
তাদের মিতালি খুঁজি।"

(গৃহস্থবিলাপ)

কিংবা এই সমস্ত পঙ্‌ক্তিতেও :

"তবু তারা কালের সারথি,
তাদের দোস্তি, তাদের গতি
আমার পরমা যতি।"

(ঐ)

বলা বাহুল্য, বক্তব্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের জীবন্ত প্রকাশ এবং শেষপর্যন্ত সেই দ্বন্দ্বের সামঞ্জস্যবিধানেই কবিকর্মের সার্থকতার নির্ভর। আর এ-সমস্যা আজকের প্রত্যেক সক্ষম কবির। এবং সমরবাবুর সামনেও আজ এই মৌল প্রশ্ন : কাব্যবস্তুর অন্তর্বিরোধের গোলকধাঁধায় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল expressionএর কবিরূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে ?

আজকাল তিনি ক্রমশই কম লিখছেন দেখে আমরা রীতিমত শঙ্কিত।

পরিচয়, পৌষ ১৩৫২

অমলেন্দু বসু

‘সমর সেনের কবিতা’

‘সমর সেনের কবিতা’র দ্বিতীয় সংস্করণটি আমি প্রথম সংস্করণের সঙ্গে তুলনা করে পড়তে পারিনি, প্রথম সংস্করণ আমার কাছে নেই, তবে দুয়েকটি কারণবশত মনে হয় যে গ্রন্থকার এবং প্রকাশক ‘সংস্করণ’ শব্দটির প্রয়োগ দ্বারা আসলে বোঝাচ্ছেন পুনর্মুদ্রণ, নতুবা দ্বিতীয় সংস্করণে যদি পরিমার্জনা কিছু হয়ে থেকে থাকে সে-বিষয়ে দু-ছত্র বিজ্ঞপ্তি কোথায়ও থাকা উচিত ছিল। গ্রন্থকার ও প্রকাশক অবশ্য কোনো রকম বিজ্ঞপ্তিই দেননি, ইদানীংকার গ্রন্থপ্রকাশন-পদ্ধতিসম্মত ন্যূনতম সম্পাদকী কর্মের পরিশ্রমেও প্রবৃত্ত হননি। কবিতাগুলি কোন্ কোন্ কাব্যগ্রন্থ (অথবা অন্য আকর) থেকে নেওয়া হয়েছে অন্তত এতটুকু তথ্যও তাঁরা পাঠককে দেননি। কবিতাগুলিকে রচনাকালের পর্ব (প্রতি পর্বে তিন-চার বৎসর বিধৃত হয়েছে) হিসেবে সাজানো হয়েছে যদিও এই পর্বগুলিকে প্রথম প্রকাশ-তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হলে পাঠককে পরিশ্রম করতে হবে। তেমন পরিশ্রম আমি সামান্যই করতে পেরেছি। ‘কবিতা’ পত্রিকার পুরানো সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত কবিতা-গুলির সঙ্গে কিছুটা মিলিয়েছি (অবশ্য ‘কবিতা’য় প্রকাশিত অনেক কবিতা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি) এবং এই মিলিয়ে পড়ার ফলে দেখতে পেলাম সামান্য কিছু পাঠ-ভেদ আছে। যতিচিহ্নের পরিবর্তন (বেশিরভাগই দেখলাম কমা ও ড্যাশ্ চিহ্নের পাল্টা-পাল্টি) এবং বানান (সোনালি হয়েছে সোনালী, কি হয়েছে কী, কাবুলি হয়েছে কাবুলী, ইত্যাদি) এই কাব্যপাঠে কোনো নতুন ইশারা আনতে পারে না। বাচনিক ভেদ লক্ষ করলাম অল্প কয়েকটি (হয়তো আরও আছে, আমার নজরে পড়েনি)—

পৃ. ২৩, “মুক্তি” শেষ দু'ছত্র—

> আমার অন্ধকারে আমি
> নির্জন দীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

‘কবিতা’ পত্রিকার প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা—

> আমার অন্ধকারে আমি
> নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

ভাবতে ইচ্ছে হয় যে পুরোনো পাঠটিই শুদ্ধ কেননা শব্দটি ‘দ্বীপ’ হলেই প্রায়-সমার্থ শব্দ দু'টির (নির্জন, নিঃসঙ্গ) প্রয়োগ গ্রাহ্য হতে পারে—দ্বীপটি জনহীন তো বটেই, তার নিকটে কোনো সঙ্গী দ্বীপও নেই—এবং সুদূর কথাটিরও লক্ষণা গভীরতর হয়, অন্ধকারে ঘেরা দ্বীপটি যেন সুদূর মনে হয়। কবি স্মৃতিতে ম্যাথিউ আর্নল্ডের In the sea of life enisled / We mortal millions live alone এই কাব্য-

ভাবনার সংশ্লেষ থাকা বিচিত্র নয়। সুপ্রযুক্তি আমি 'দীপ' শব্দে পাইনে। কে জানে হয়তো ব-ফলার অভাব ছাপারই ভুল। ছাপার ভুল তো কয়েকটিই পাচ্ছি'

৪৬ পৃ.—বর্ষার শিক্ত পশু

৫৫ „ —আপনি বাঁচালে বাপের নাম

৫৭ „ —র-ফলা বাদ দিয়ে ছাপা হয়েছে 'বক্ষ'

৬০ „ —পাহাড়ের পাথরে আমার নাম লিখ

৭৫ „ —নব্য 'বলশেভিক' সাঙ্গপাঙ্গ

৯৪ „ —ভারত সীমান্তে উদ্যত, হস্র পীত বন্ধু তার (সহস্র ?)

১০৩ „ —গরিয়ান

আরেকটি বাচনিক ভেদ দেখতে পাচ্ছি ৪৭ পৃষ্ঠায়। "কয়েকটি দিন" যখন 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল (আষাঢ় ১৩৪৫) তখন কথাটি ছিল শৃগাল, এই গ্রন্থে বদলে হয়েছে শেয়াল : "বন্ধুর মাঠে সন্ধ্যায় শেয়াল, কোকিল ডাকে"। বদলের কারণ আমি বুঝতে পারিনি। যদি শব্দপ্রয়োগের তৎসমতা কমানোই অভিপ্রেত ছিল তাহলে 'লোহিত-হলুদ চাঁদ' হত লালচে-হলদে চাঁদ', 'গলিত উলঙ্গ শব' রূপান্তরিত হত। সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বাচনিক প্রভেদ পাচ্ছি ২৫ পৃষ্ঠায় : নিম্নোদ্ধারে দুই বন্ধনী সীমিত ছত্র দু'টি কবিতাটির আদি রূপে ছিল, এখন নেই।

কিন্তু সাইকেলে-ফেরা কেরাণীর ক্লান্তিতে

দিনের পর দিন

ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে :

(মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায় ;)—[বর্তমান সংস্করণে নেই]

ডাস্টবিনের সামনে

মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়

সময় এখানে কাটে

[ছত্রটি আদিতে ছিল—মরে-যাওয়া কুকুরের মুখের যন্ত্রণায়]

বন্ধন-সীমিত প্রথম ছত্রটির বর্জন এবং দ্বিতীয়টির পরিবর্তন সর্বতোভাবে সঙ্গত হয়েছে। তৃতীয় ছত্রের 'মুহূর্তগুলি মরে'র পরে 'মৃত্যু-মুখর রক্তের কান্নায়' বড়োই অতিকথন ; মরে-যাওয়া কুকুরের চেয়ে 'মরা কুকুরের' সুষ্ঠুতর বাক্‌বিধি. আমার মনে হয়, একটি মৃত কুকুরের বদনমণ্ডলে মৃত্যুযন্ত্রণার ছাপ এ হেন যে-ছবিটির রেখাঙ্কন করা হয়তো কবির উদ্দেশ্য ছিল সে-উদ্দেশ্য সফল হয়নি।

অন্য এক ধরনের পাঠভেদ শিরোনামা সংক্রান্ত। ২৩ পৃষ্ঠার কবিতাটির বর্তমান শিরোনামা "তুমি যেখানেই যাও" আদিতে ছিল না, তখন ছিল শুধু

Amor stands upon you

Ezra Pound

"একমাত্র তোমাকে সত্য বলে মানি" এই শিরোনামার পরিবর্তে 'কবিতা'য় প্রকাশ-কালে (আশ্বিন ১৩৪৫) ছিল : For thine is the Kingdom।
৩০ পৃষ্ঠার কবিতাটির বর্তমান শিরোনামা 'মৃত্যু' আদিতে ছিল না, তখন ছিল শুধু

Lo the fair dead !
Ezra Pound

তাছাড়া এই পঞ্চখণ্ডী কবিতার প্রতিখণ্ডের জন্য আলাদা শিরোনামা ছিল 'শেষ রাত্রে', 'ভোরের কলকাতা', 'আমন্ত্রণ', 'নাগরিক', 'মৃত্যু', এখন এসব শিরোনামা নেই : চারখণ্ডী কবিতা "চার অধ্যায়ে"র তৃতীয় খণ্ডের আদিরূপে একটি সুস্পষ্ট শিরোনামা ছিল—'একটি নিউরটিক কবিতা'—এখন আর পাঠককে শিরোনামার চাবিকাঠি কবি দিচ্ছেন না।

১

সমর সেনের সমগ্র কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে এহেন কয়েকটি পাঠভেদ কোনো মস্ত কথা নয়। স্পষ্টতই সমর সেনের কবিকৃতি কীট্‌স্ বা টেনিসন্ বা ইয়েটস্ বা রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন দত্তের কবিকৃতির ধর্মাংশী নয়। এসব কবির রচনা কখনো সম্পূর্ণ হয় না, তাদের রচনায় সত্যিকারের কোনো definitive reading থাকে না, যদি তাঁরা সময় ও সুযোগ পেতেন তাহলে কবিতার অঙ্গে অনেক ঘষা-মাজা করতেন, সুতরাং তাঁদের প্রতিটি কবিতায় (অন্তত অধিকাংশ কবিতায়) বিবর্তনশীল রূপ। এঁরা মূলত শিল্পী। সমর সেনের রচনায় তাঁর সচেতন এবং মুখ্য উদ্দেশ্য শৈল্পিক নয় যদিচ তিনি যে-কবিতাটি শেষ পর্যন্ত রচনা করলেন সেটি বাক্‌শিল্পের নিখুঁত দৃষ্টান্ত হতে পারে। (আমার বিবেচনায় তার কয়েকটি কবিতাই এহেন নিখুঁত দৃষ্টান্ত।) তিনি লেখেন মূলত মনন-সঞ্জাত আবেগের তাড়নায়। একথা বলার মানে এই নয় যে সমর সেনের ধীশক্তি রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুধীন দত্তর ধীশক্তির চেয়ে প্রখরতর। অথবা কীট্‌সের ও টেনিসনের ধীশক্তি শেলির ও ব্রাউনিংয়ের ধীশক্তির চেয়ে বেশি তীক্ষ্ণ। এ কথার মানে শুধু এইটুকু যে কোনো কবির সৃজনীচিত্তে আলোড়িত অজস্র উপাদানের মধ্যে ধীশক্তি অধিক ক্রিয়াশীল, অন্য কোনো কবির বেলা রূপ-ব্যাকুলতা অধিক ক্রিয়াশীল। বস্তুত আমার মনে হয় শুধু যদি ধীশক্তিরই বিচার করি (রচিত কাব্যের প্রমাণে) তাহলে রবীন্দ্রনাথ সুধীন দত্তের কথা ছেড়েই দিলাম, দিব্যদর্শী জীবনানন্দর ধীশক্তিও সমর সেনের ধীশক্তির চেয়ে গভীরতর। তথাপি এঁদের তুলনায় সমর সেনের কবিকৃতি মুখ্যত ধী-নির্ভর। একটি প্রবন্ধে সমর সেন লিখছেন :

> এখনো অনেকে বিশুদ্ধ কবিতায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখেন।...একটি সহজ সত্য এঁরা ভুলে যান যে ভিতরের প্রেরণা যদি কবিতার মূল এবং একমাত্র উৎস

হত তাহলে প্রতি বছরে, প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে মহৎ কবিতা রচিত হবার পথে কোনো অন্তরায় থাকত না। কাব্যের ইতিহাসে অন্তরায় আসে, তার কারণ কবিতা বিশুদ্ধ কল্পনা নয়, পরিবর্তনশীল শ্রেণীগতির, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, এবং মুখাপেক্ষী হলেও মাঝে মাঝে সমাজের মুখ বদলানোর কাজে সাহায্য করতে পারে। সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য।…যাঁরা বিশুদ্ধ সাহিত্যে বিশ্বাস করেন, এবং তাঁদের সংখ্যা বাঙালি কবিদের মধ্যে এখনো বেশি, তাঁদের লেখায় ভারসাম্য ক্রমশই কমে আসতে থাকে, এবং তাঁদের প্রতিভা শেষ পর্যন্ত কয়েকটি ম্যানারিজমের প্রকাশে, পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়।

("বাংলা কবিতা", 'কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫)

এই প্রবন্ধের যুক্তি নিশ্ছিদ্র নয় কিন্তু এসব উক্তির তাত্ত্বিকতা বিচার করা আপাতত আমার উদ্দেশ্য নয়, আমি বাক্য কয়টির উদ্ধার করেছি আমার উপরোক্ত ধারণার সমর্থনে।– সমর সেনের কবিতার উদ্ভব অন্তঃপ্রেরণায় নয়, উদ্ভব সমাজগতি সংক্রান্ত চিন্তায়; কবিতার পরিণতি শিল্পোত্তীর্ণ হতে পারে কিন্তু কবির মুখ্য উদ্দেশ্য শিল্পোত্তরণ নয়, কালসংবিৎ প্রকাশ। সে-সংবিতেও মহাকালের চেয়ে বরং চলন্ত নিমেষই প্রবল। সব চেয়ে বড়ো কথা এই কবিতার আবেগ অন্তর্বিলাসী তো নয়ই, নির্বস্তুকও নয়, নিরালম্ব নিরাশ্রয় বায়ুভূত নয়, সদাচেতন প্রত্যয়তায় ওতপ্রোত, বস্তুনির্ভর। সমর সেনের প্রবন্ধটির রচনাকালে উপরোক্ত ধরনের কথা আরও অনেক শোনা গেছে। তিরিশের দশকে পশ্চিম ইওরোপের অনেক সাহিত্যিক যে-প্রবাহে চিন্তা করতেন তাকে বলা হত প্রগতি-পন্থা, বাম-পন্থা, দ্বান্দ্বিক জড়বাদ, ইত্যাদি আমাদের বাংলা সাহিত্যেও সে-প্রবাহে অগ্রসর হয়েছিলেন অনেক লেখক। সমর সেনের উক্তির নিকট-প্রতিধ্বনি পাই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধে এবং সে-প্রবন্ধের যুক্তিতেও ইতস্তত ফাঁক থেকে গেছে: 'কাব্যের একমাত্র উৎস যদি শুধু অতীন্দ্রিয় অন্তঃপ্রেরণার মোহই হয়, তাহলে কবি সমাজের পক্ষে কতটা দুর্বিষহ হবে প্লেটো নিজেই তা ক্রমশঃ বুঝেছিলেন বলে হয়ত তাঁর আদর্শ সমাজ থেকে কবির নির্বাসন শেষ পর্যন্ত যুক্তিযুক্ত মনে করেন।…লোকায়ত রূপই যে কবির প্রকৃত রূপ, দিব্যোন্মাদ সে আসলে নয়, এ কথার দীর্ঘ প্রমাণ আজ আর বোধ হয় বুদ্ধিমান পাঠকের পক্ষে প্রয়োজন নেই।' "বিপ্লব ও বাংলা কবিতা", ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৬, ৮৪ পৃ.) 'বিশুদ্ধ' সাহিত্যে বিশ্বাস নিয়ে সমর সেন অন্যত্র বিদ্রূপ করেছেন: 'বাঙালী সাহিত্যিকেরা উনবিংশ শতাব্দীর স্বেচ্ছাচারবিলাসী কবিদের আদর্শে বড়ো হয়েছেন…কাব্যকে আমরা কলের জলের মতো দেখতে অভ্যস্ত; হৃদয়ের কল একটু ঘোরালেই যা প্রবল তোড়ে বেরিয়ে আসে তার নামই আমাদের কাছে মহৎ কাব্য।' ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৬, ৯৭ পৃ.)

হৃদয়ের প্রতি অবজ্ঞাশীল, মনন-প্রধান, স্থানকালপাত্রের মুখাপেক্ষী, সমাজগতিতে

সক্রিয় অংশীদার—এ-ই হল সমর সেনের আত্মসচেতন কবিস্বরূপ, এমন কবিই তিনি হতে চেয়েছেন।

৩

কোন্ সামাজিক পরিস্থিতিতে সমর সেন কবিতা লিখতে শুরু করেন? দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগে সমর সেন একদা ('কবিতা', কার্তিক, ১৩৪৭) প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন তার কয়েকটি বাক্য লক্ষ করুন:

> 'প্রথমা' প্রকাশিত হয় ১৩৯২-এ: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য তারিখ এটা। গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন তখন প্রায় চূড়ান্তে পৌঁছেছে এবং তার গণ-আন্দোলনে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। ঠিক সেই সময়ে গান্ধীজীর সহসা-নির্দেশে সমস্ত আন্দোলন বন্ধ হয়ে গেল, অন্তত তার পেছন থেকে জনশক্তি সরিয়ে নেওয়া হ'ল। কিন্তু দেশের যুবকবৃন্দ সম্পূর্ণ সরে আসতে সম্মত হ'ল না এবং যে সন্ত্রাসবাদের বীজ ছিল দেশে, হঠাৎ তা যেন আবার চারদিকে ফেটে পড়ল। সন্ত্রাসবাদের রাজনৈতিক মূল্য নিয়ে যতই মতবিরোধ থাক না, এটা যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অভিব্যক্তি সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। মোটের উপর জনগণের দৃষ্টিকে সরিয়ে রাজনীতিতে এল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের দৃষ্টি।... এ ক'বছরের মধ্যে [অর্থাৎ ১৯৪০-এর মধ্যে] **বাঙালী সমাজমনের অনেকটা পরিবর্তন হয়ে গেছে।** সন্ত্রাসবাদ শেষ হয়ে গেল; তার রাজনৈতিক মূল্যে বাঙালী বিশ্বাস হারাল। যে সহজ মানবধর্মী বিশ্বাস প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহায় ছিল তা আজ যথেষ্ট বলে বিবেচিত নয়। মানবধর্মে বিশ্বাস আজ বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। সামাজিক বৈষম্য, অনাচার, অত্যাচার ও নানাবিধ বিড়ম্বনায় **মধ্যবিত্ত কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে,** কাব্যে ও জীবনে মুক্তি ও প্রগতির পন্থা তাঁদের কাছে অন্য রকম।

এ-প্রবন্ধটির মূল্য প্রেমেন্দ্র-কাব্যের বিশ্লেষণ হিসেবে ততটা নয় যতটা সমর সেনের কাব্যচিন্তার সূচী হিসেবে। তিরিশের যুগ সম্বন্ধে লেখকদ্বয়ের দৃষ্টিভঙ্গীও আমার বিবেচনায় অসম্পূর্ণ, একপেশে। সে-যুগে বাঙালী সমাজমনে অবশ্যই পরিবর্তন এসেছিল। কোন্ যুগেই বা না আসে? অতীতের ক্রমসঙ্কীর্ণ vista-র মধ্য দিয়ে দেখলে হাজার বছর আগের কোনো যুগ হয়তো আজকের দর্শকের কাছে মনে হবে স্থবির, নিশ্চল, নিরগ্রসর, কিন্তু সেই হাজার বছর আগের সমকালীন দৃষ্টিতে সেই যুগই মনে হত অস্থির, দ্রুতধাবী, বিপ্লবক্ষুব্ধ। সে হিসেবে তিরিশের যুগের উদ্ভিন্ন-প্রতিভা কবি সমর সেন যদি মনে করেন যে সে যুগের 'কবিদের মনে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহ জমেছে', তাহলে তাঁর মনোভঙ্গী সময়োচিত বটে কিন্তু অনিবার্য নয়, অর্থাৎ অন্য কোনও সৎ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কবির পক্ষে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহমুক্ত মনোভঙ্গীর অধিকারী হওয়া অসম্ভব ছিল না। বস্তুত এহেন মনোভঙ্গীর অধিকারী ছিলেন

কিছু কবি, তাঁরাও সমকাল সম্বন্ধে তীক্ষ্ণভাবেই সচেতন ছিলেন, কি জীবনে কি কাব্যচর্চায় তাঁরাও অমলিন ছিলেন, তাঁদেরও সংবেদনায় জীবন ও কাব্য অঙ্গাঙ্গী-সম্পৃক্ত ছিল, তাঁদের মনোভঙ্গীর সমর্থনেও যথেষ্ট যুক্তি ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। তিরিশের দশকের কাব্যে বিদ্রূপ এবং বিদ্রোহের উৎসার অরোধ্য এমন তত্ত্ব সম্পূর্ণ না মেনেও সমর সেনের কাব্য-পাঠক হিসেবে একথা মানতে হবে যে তাঁর বিশিষ্ট সংবেদনায় ও তাঁর সমকাল-চেতনায় ও ঐতিহ্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর পক্ষে (এবং সে যুগের আরো কিছু কবির পক্ষে) বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ মুখ্য এবং এমনকি একমাত্র কাব্যসার হয়ে উঠেছিল। বিদ্রূপ ও বিদ্রোহ তাঁর নিজস্ব কাব্যাদর্শ, যে-কাব্যাদর্শ তিনি মনে করতেন সকল সমসাময়িকের পক্ষেই অবশ্যম্ভাবী, সে-আদর্শ অন্য অনেক কবি ও কাব্যতাত্ত্বিক মেনেছেন, এদেশে ও বিদেশে, একালে ও সেকালে।

৪

বস্তুত এই বিদ্রূপ ও বিদ্রোহের মিলিত রাগিণী সৃষ্টি বাংলা কাব্যে সমর সেনের একান্ত নিজস্ব এবং (আমার দৃঢ় বিবেচনায়) স্থায়ী অবদান। বিদ্রোহের কাব্য বাংলায় ইতিপূর্বেও ছিল। সমর সেনের নিকটবর্তী ঐতিহ্যেই ছিল নজরুল ইসলামের বহুস্পর্শী বিদ্রোহ। আরো সাম্প্রতিক বিদ্রোহ ছিল বুদ্ধদেব বসুর 'বন্দীর বন্দনা'য়। বুদ্ধদেব এ-বিষয়ে লিখেছেন :

> যে-রকম বয়েসে সমর সেন এই কবিতাগুলো লিখেছেন, সেইরকম বয়েসেই আমি 'বন্দীর বন্দনা'র কবিতাগুলি লিখেছিলুম : এই দুই নবযৌবনের কাব্য মনে-মনে তুলনা করতে ভালো লেগেছিল। ইতিমধ্যে আট-দশ বছর কেটে গেছে ; দেশের হাওয়া আরো কিছু বদলেছে ; তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে 'কয়েকটি কবিতা' অনেক বেশি 'আধুনিক'। 'বন্দীর বন্দনা'র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, 'কয়েকটি কবিতা'র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ। নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন, বিধাতাকে অভিশাপ দেবার জন্যও কখনো তাঁর কাব্যে টেনে আনেননি। সৌন্দর্যের উপলব্ধির পথে যে-বাধা সেটা তাঁর পক্ষে আত্মবিরোধ মোটেও নয় ; সেটা বৃহৎ সমাজস্বার্থের সঙ্গে ক্ষুদ্র শ্রেণী-স্বার্থের বিরোধ। ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৪৪, ৫৩ পৃ.)

অতি সত্য কথা : "নিজের মুক্তির জন্য সমর সেন ব্যস্ত নন।" ব্যস্ত নন তার কারণ তাঁর পক্ষে কোনো নিছক নিজস্ব মুক্তির প্রয়োজন বা বাসনা নেই, তাঁর মুক্তি সমাজমুক্তির সঙ্গে একাত্ম, অচ্ছেদ্য। এবং সেজন্যই তাঁর মানসে আত্মবিরোধও নেই কেননা আত্মবিরোধ নিতান্তই রোমান্টিক মনোবৃত্তিতে সংলগ্ন, যে-মনোবৃত্তি মানুষকে পলায়নপন্থী করে তোলে। সমর সেন এই পলায়নপন্থা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, লিখেছেন উত্তম পুরুষের জবানীতে যে-উত্তম পুরুষ আসলে কবির নিজসত্তা-বহির্ভূত মানসের নাট্যায়িত রূপ।

বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা,
মাঝে মাঝে মনে হয়,
দুর্মুখ পৃথিবীকে পিছনে রেখে
তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।

(নিরালা)

তুমি ধন্য, সম্মুখ সমরে হত।
দুর্দিনের আগে কী করে জানাই,
পলায়নজীবিকা আমার,
পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন অসংখ্য প্রহারের।

(অজ্ঞাতবাস)

নিজের ছায়াভীরু,
ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই ;
অদৃষ্ট বিরূপ হলে নিষ্ফল পুরুষকার,
. . . .
তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে
ময়দানে উধাও

পলায়ন ছাড়া বেরোবার পথ জানা নেই,
চক্রব্যূহে ঢোকা কেন প্রয়োজন।

(গ্রহণ)

এই নাট্যায়নে আমি-নয় হয়ে গেছে আমি, এবং তাতেই মিথ্যাধ্বংসী 'বক্রোপের সূচিকাভরণও হয়েছে তীক্ষ্ণ ও অব্যর্থ। যে নিজের ছায়াভীরু ; পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে অসামর্থ্য ও অনিচ্ছার ফলে যে জীবনে পর্যুদস্ত ; যার পৃষ্ঠদেশের প্রহারচিহ্নে তার নিয়ত-পলায়ন-পরায়ণতার প্রমাণ ; যে মুক্তকচ্ছ জীব (পর্যুদস্ত বাঙালীর সুপরিচিত আদর্শ) চক্রব্যূহ থেকে দূরে সরে (যৌবন-প্রতীক অভিমন্যু এবং প্রাণঘাতী কূট চক্রব্যূহের ভাবানুষঙ্গ) পৈত্রিক প্রাণরক্ষা করছে এবং অদৃষ্ট-নির্ভর হয়ে পুরুষকারকে জলাঞ্জলি দিয়েছে, সে-ব্যক্তি যে "তবু সাহসে বুক বেঁধে, প্রায়-খালি বাসে চেপে ময়দানে উধাও" হয়—সমর সেনের এই শ্লেষ তীক্ষ্ণতায় অনতিক্রম্য, প্রপার্টিয়াস অথবা ভর্তৃহরির বক্রোক্তির মতো ব্যক্ত ও অব্যক্তের সংযোজনায় সমৃদ্ধ। লক্ষ করা একান্ত দরকার যে কাব্যবস্তু হিসেবে সমর সেনের বিদ্রোহ অন্য কবিদের বিদ্রোহের তুল্য নয়। তাঁর বিদ্রোহ বলে না "ভাঙ্ ভাঙ্ ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর্", অথবা,

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন
ভেঙ্গে ফেল মঠ-মন্দির-চূড়া, দারু-শিলা কর নিমজ্জন !
বলি-উপাচার ধূপ-দীপারতি রসাতলে দাও বিসর্জন !

অথবা, রুক্ষ দস্যুবেশে তাই হাস্যমুখে ভেসে যাই উচ্ছ্বসিত স্বেচ্ছাচার-স্রোতে,
উপেক্ষিয়া চলে' যাই সংসার-সমাজ-গড়া লক্ষ-লক্ষ ক্ষুদ্র কণ্টকের
নিষ্ঠুর আঘাত।

অথবা, রুখবে কে আজ ? চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
হাতের মুঠোয় বজ্র, আমরা মিছিলে হাঁটি।
জমিজমা নেই, উপবাস পেশা, কেয়ার কার ?
অগ্নিগর্ভ ভাষা আমাদের গানের ঘাটি।

অথবা, Rise like lions after slumber
In unvanquishable number !
Shake your chains to earth, like dew
Which in sleep had fall'n on you :
Ye are Many—they are few.

(Shelley, *The Masque of Anarchy*)

অথবা,

"On we march then, we the workers, and the rumour that ye hear
Is the blended sound of battle and deliv'rance drawing near,
For the hope of every creature is the banner that we bear,
And the world is marching on."
Hark the rolling of the thunder
Lo the Sun ! and lo thunder
Riseth wrath, and hope, and wonder,
And the host comes marching on.

(William Morris, *Chants for Socialists*)

এই কবিতা কয়টিতে এবং এতৎতুল্য দেশী ও বিদেশী ভাষায় রচিত আরো কিছু বিদ্রোহ বিষয়ক কবিতাতে বাক্‌ভঙ্গী ও বাক্‌প্রতিমার সাদৃশ্য লক্ষ করার বিষয়। কয়েক বৎসর পূর্বে আমি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্বন্ধে একটি আলোচনায় দেখিয়েছিলাম যে কয়েকটি বিদ্রোহাত্মক ইংরেজি কবিতার সঙ্গে তাঁর কবিতার বাক্‌ভঙ্গীর প্রবল সমান্তরাল লক্ষ্যযোগ্য, যদিও ঐসব অখ্যাত ও বিস্মৃত কবি ও কবিতার সঙ্গে সুভাষের পরিচয় না থাকাই নিতান্ত সম্ভব এবং সেকারণে কোনো প্রভাব বা ঋণ এক্ষেত্রে খুঁজতে যাওয়া মিথ্যা হবে। আসলে বিদ্রোহের বোধ, কাব্যবস্তু হিসেবে, বড়োই স্বল্পায়তন বোধ; এর মধ্যে বৈচিত্র্যের সুযোগ অতি সামান্য। প্রেম বা নিসর্গপ্রীতি বা মনুষ্যচেতনার মধ্যে অভিনবত্ব অপরিসীম। অপর

পক্ষে দেশপ্রেম, ঈশ্বরভক্তি, বিদ্রোহেচ্ছা, এসব যতই উচ্চগ্রামের অনুভূতি হোক না কেন, সে-অনুভূতির পরিসর সঙ্কীর্ণ, তার প্রকাশভঙ্গীও অতএব সঙ্কীর্ণ। তুলনায় দেখবেন এই কাব্যবস্তু নিয়ে রচিত সব কবিতাতেই কয়েকটি ক্রিয়াপদ—ভাঙা, চূর্ণ করা, (বিষাণ) বাজে, (প্রহরী) জাগে, (বাণ) ডাকে, ইত্যাদি—কয়েকটি শব্দ—কলরোল, আওয়াজ, দুশমন, হামলা, বিক্ষোভ ইত্যাদি—কয়েকটি বাক্‌প্রতিমা—পোড়ামাটি, মুহূর্তের খড়্‌গ, ফণিমনসার ঝাড়, লাল ধ্বংস, বিপ্লবের ধাত্রী, ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন, ইত্যাদি কথাগুলি কবিতায় কবিতায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। (সব কয়টি কথাই সমর সেনের কবিতা থেকে সংগৃহীত, অন্যান্য কবির বিদ্রোহাত্মক বাক্‌ভঙ্গীর সঙ্গে তুলনাকৃত)। এই বাচনিক পুনরাবৃত্তি বিদ্রোহবস্তুর সীমিত পরিসরেই নিবদ্ধ। অনুরূপ পুনরাবৃত্তির ঘষা পয়সা যে দেশ-প্রেমাত্মক এবং ঈশ্বর-ভক্তিসূচক কাব্যেও অবশ্যম্ভাবী সেকথা দক্ষ পাঠক নিশ্চয় লক্ষ করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচুর অভিনবত্ব দেখেছেন।

৫

বাচনিক তুল্যতা সত্ত্বেও অন্যান্য বিদ্রোহাত্মক কবিতার সঙ্গে সমর সেনের কবিতার একটি মস্ত প্রভেদ আমি দেখতে পাই। সচরাচর বিদ্রোহ ক্রিয়াশীল, এনার্জি-সংক্ষুব্ধ, বেগবান, সম্মুখদৃষ্টি। ক্বচিৎ কখনো সমর সেনের কবিতায়ও এনার্জির সংক্ষোভ উত্তাল হয়।

> আমাদের মতো সাধারণ লোক
> আজ দেশে দেশে
> মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
> জীবনের বনিয়াদ গড়ে। যেন মনে রাখি
> চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
> যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান
> স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ পাকিস্তান।
>
> (লোকের হাটে)

> এ বসন্ত কাদের? লক্ষ লাল সৈন্য অগ্রসর বলিষ্ঠ জয়গানে,
> রক্তলোভী বন্য সৈন্য হত নয় অক্লান্ত অভিযানে,
> উদয়ী সূর্যের দেশ প্রাচ্যে ছায়া ফেলে, লড়ে বীর চীনে
> নির্মম সঙ্গিনে।
> অসংখ্য বর্গীর গোরস্থানে
> পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্থানে,
> হে সরকার, হুজুর সরকার

হুজুর বড়োলাট, জঙ্গীলাট, বর্মাবীর আলেকজাণ্ডার,
আমরা বান্দা এখনো, তবু বন্দী তোমরা নিজেদের জালে
ইতিহাসের জাঁতাকলে, আত্মঘাতী নসীবের ফলে।

(খোলা চিঠি)

উদ্দীপনার উক্তি এ-দুটির বেশি আমার নজরে পড়েনি 'সমর সেনের কবিতা'য়, আরো উক্তি যদি থেকেই থাকে তারা সর্বসাকুল্যে নেহাৎই অল্পসংখ্যক। উদ্দীপনা সমর সেনের ধাতে নেই। তাঁর চিত্ত স্বভাবত বেগবান নয়, ক্রিয়াশীল নয়। উদ্দীপিত ক্রিয়াশীলতা তাঁর রচনায় কাব্যপ্রাণ সঞ্চার করে না। বস্তুত যে-দু'টি স্তবক উপরে উদ্ধৃত করেছি সে-দু'টিকে কবিতা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলো নেহাৎই rant, সমর সেন যেন আচম্বিতে পার্টির প্রতি নিজ কর্তব্য স্মরণ করে স্তবক দু'টি লিপিবদ্ধ করেছেন। আসলে সমর সেনের মেজাজ কর্মীর নয়, রোমন্থকের, তাঁর চিৎশক্তি উদ্দীপনায় নয়, বিষণ্ণ স্মৃতির মন্থর বিশ্লেষণে। স্মৃতি-ভারাক্রান্ত বিষাদ তাঁর কবিতার পরে কবিতায় চিহ্নিত। আমার ধারণা বাংলা ভাষায় স্মৃতিমন্থর মননের কবি হিসেবে সমর সেনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কেউ এতাবৎ নেই। সমর সেনের কবিচরিত্র অ্যাক্টিভ্ নয়, ধ্যানী, জাবরকাটা স্মরণে তাঁর কাব্যসৃষ্টির প্রকৃত প্রকাশ:

আজ শুধু মনে হয়,
ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,
পাথর-কঠিন যুগে যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু প্রতিধ্বনি!

(কয়েকটি দিন)

নিরালা কাল আপন মনে
পুরোনো বিষণ্ণতা হাওয়ায় বোনে।

(নিরালা)

বিষণ্ণ ফিরি, কানে কানামাছির গান।

(পঞ্চম বাহিনী)

কী অতীত, কী স্মৃতি মনে জাগে,
শুধু শূন্যমাঠ, পোড়োবাড়ি, গ্রামের শকুন!
তামাটে প্রান্তরে ব'সে মানুষ কি জানে
রাত্রির কালোঘামে মলিন জীবন-উর্বশী
এখনো নৃত্যরতা কালের তপোভঙ্গে।

(শহরে)

মগজ স্মৃতির জাবরে ভরা, চা আর ধূমপান,
নিষিদ্ধ গান।

(কলরোল)

এরি মধ্যে পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে,
দিনশেষের জানোয়ার।

শবযাত্রা)

এই স্মরণপন্থী কল্পনায় দিল্লী নগরীর রূপটি (১৯৪৭-এর পূর্বের পুরানো দিল্লী, যে দিল্লী বাদ্‌শাহী আমলের ধূলিধূসরিত ভগ্নাবশেষগুলি সামনে নিয়ে ধুঁকত) সমর সেনের কবিতায় চমৎকার রকমে ধরা দিয়েছে :

ভাঙা পাথর, মাইলের পর মাইল ;
জরাগ্রস্ত মসজিদ, মন্দির, মোগলাই দুর্গ,
দিনে প্রাচীন বিষণ্ন গর্বে কঠিন,
অন্ধকারে অবাস্তব ; তখন নবীন শৃগাল বারে বারে ডাকে
ভুঁইফোড়ের জয় গর্বে,
কোটরে প্রাচীন পশু শিথিল, শীতে স্তব্ধ।

(শবযাত্রা)

শতাব্দীর কালসন্ধ্যায় দিল্লীর শ্মশান-স্তব্ধতায়
বারে বারে মনে পড়ে : চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ অনেক দিন বন্ধ আবাদ,
ধ্বংস সাম্রাজ্যের ভয়াল সমারোহে জাগে তুগ্‌লকাবাদ।

(পোড়ো মাটি)

এ-ধরনের স্তবক পড়তে পড়তে মনে হয় কবি-কল্পনা যেন একটা কুয়াশার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে গেছে, কুয়াশার ধূসর মাধ্যমে, কুয়াশার প্রায় নিশ্চল মন্থর গতিতে, শহরের দিকে তাকিয়ে শহরের বিষণ্ন আত্মা নিজের আত্মায় শুষে নিচ্ছে, অথবা হয়তো বলতে পারি, নিজেরই অপার রহস্যময় আত্মার অনির্ণেয়তল গহন থেকে বিষাদ প্রয়োগ করছে শহরের উপরে : আমারই চেতনার রঙে পান্না হ'ল সবুজ। সমর সেনের আদ্যোপান্ত কবিতায় কুয়াশা ও ধুলোর উল্লেখ পুনরাবৃত্ত, তাঁর কবিতায় বহু-ব্যবহৃত প্রিয় শব্দগুলির মধ্যে এই কয়টি : ধূসর, স্তব্ধ, ক্লান্ত, ম্লান, ভাষাহীন, নিঃশব্দ, অন্ধকার, দুঃস্বপ্ন, বিষণ্ন।

সমর সেনের বিদ্রোহ তা'হলে বাংলা কাব্যে (আমার যতদূর জানা আছে, বহু বিদেশী কাব্যেরও তুলনায়) একটা তুলনা রহিত, বিশিষ্ট, অনন্যরূপ ধারণ করেছে ; এ-বিদ্রোহ উচ্চকিত নয়, বিষণ্ন এবং চিন্তামন্থর। সমর সেনের কবিচিত্ত আদৌ extrovert নয়, introspection তার ধর্ম।

৬

কিন্তু এই ধ্যানী বিষাদে কোনো ভাবালুতার খাদ নেই কেন না শাণিত মননের তেজবহ্নিতে পোড খেয়ে সে-বিষাদ শুদ্ধ হয়েছে। যদি ভাবলুতা থাকত তাহলে সমর সেনের কবিতা অসহ্য হত। আমি যতদূর বুঝতে পারি সমর সেন তাঁর বিষাদ খুঁজে পান নি কোনো মেটাফিজিক্‌সের উৎস থেকে যেমন পেয়েছিলেন লেপার্দি বা হার্ডি বা এমন কি মোহিত মজুমদার অথবা যতীন সেনগুপ্ত। বিশ তিরিশের দশকের যুগে, বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে, কোনো সৎপ্রত্যয়সম্পন্ন সুশিক্ষিত প্রত্যক্ষজ্ঞানধর্মী বুদ্ধিজীবী যেমনভাবে বস্তুময় ঘটনা প্রবাহের এম্পিরিক্যাল জড়বাদী ব্যাখ্যা করতেন, সমর সেনও তেমনটিই করেছেন। আমার ধারণায় কবিতা হিসেবে সমর সেনের কবিতার মূল্য জড়দর্শনে নয়, তার আদ্যোপান্ত প্রত্যক্ষ চেতনায়, বস্তুময়তায়। (অবশ্য মানতে হবে যে তাঁর বস্তুময়তা একটা শক্তিমান কাঠামো পেয়েছিল দ্বান্দ্বিক জড়দর্শনে।) বস্তুময়তা থাকলেই কাব্য মহৎ হয় না, কিন্তু পক্ষান্তরে কাব্য মহৎ হলেই বস্তুময়তা তার অন্যতম উপাদান হতেই হবে: দান্তে বা শেক্‌স্‌পিয়রে, মহাভারতে, কালিদাসের এবং রবীন্দ্রনাথের কতক অংশে বস্তুময়তার ভিত্তিতে মহত্ত্ব গড়ে উঠেছে। সমর সেনের বস্তুময়তায় মহত্ত্বের সম্ভাবনা ছিল যদিও তাঁর কাব্য শেষ অবধি মহৎ হয়ে উঠতে পারে নি, সে-অপারগতার হেতু পাওয়া যাবে বস্তুময়তায় নয়, অন্যত্র। তাঁর অধিকাংশ সমসাময়িকের কাব্যে যে নির্বস্তুক বায়বীয় ভাববিলাস পাঠকের কাছে হাসপাতালের রোগশয্যার পারিপার্শ্বিকের মতো অস্বস্তিকর তার প্রতিতুলনায় সমর সেনের সাবয়ব, এমন কি স্থূল, বস্তুচেতনা যে কোনো কালে কাব্যানুরাগীর সম্বর্ধনা পাবে।

তাঁর চারদিককার বস্তুজগৎ সমর সেন লক্ষ করেছেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে, লক্ষ করেছেন এবং তাদের মূল্যায়নও করেছেন, সেই মূল্যায়নেই তাঁর সংস্কৃতিবান মননশক্তির পরিচয়। বস্তুজগৎ বিধৃত হয়েছে এমন কয়েকটি বাক্‌প্রতিমার উল্লেখ করছি, পর পর দশটি পৃষ্ঠার প্রত্যেকটি থেকে একটি প্রতিমা নেওয়া হয়েছে:

৪৬ পৃ. বসন্তের কার্জন পার্কে
বর্ষার সিক্ত পশুর মতো স্তব্ধ ব'সে

৪৭ পৃ. দীর্ঘ দিনে করাল রৌদ্র নির্মম ঐশ্বর্য বিলায়,
উপরে ধূর্ত কাকের ভিড়,
গরুর গাড়ির ছায়ার পিছনে।

৪৮ পৃ. ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর

৪৯ পৃ. গলিত দেহের উপরে গভীর রাত্রে ঘোরে
দুঃস্বপ্নের নিঃশব্দ শকুন

৫০ পৃ. কার্নিভাল শুরু হল, রেসখেলা শেষ,
কঙ্কালবর্ণ কুয়াশায় দেখ ছেয়েছে নগর

৫১ পৃ. পড়ন্ত রোদে নগর লাল হল

৫২ পৃ. চোখের সামনে সোনালী আলোয়
অবিশ্রাম ধূলিকণা
দীর্ঘরেখায় আপন মনে নামে,
বর্ণহীন বর্শা কার।

৫৩ পৃ. সেখানে দুপুরে শ্যাওলায় সবুজ পুকুরে
গরুর মতো করুণ চোখ
বাঙলার বধূ নামে

৫৪ পৃ. দেখি,
বিকেলের নদী নির্বিকার নীল,
ধানক্ষেতে সন্ধ্যার সবুজ জমে

৫৫ পৃ. সন্ধ্যার ট্রেণ আকাশে ধোঁয়ার স্তম্ভ আঁকে

কবি বলছেন, দেখি। আর বাস্তবিকও এই বাক্‌চিত্র কয়টির প্রত্যেকটি প্রত্যক্ষতায় প্রদীপ্ত এবং এহেন প্রত্যক্ষসাধ্য বস্তুময়তা এই কাব্যগ্রন্থের প্রথম থেকে শেষ অবধি প্রত্যেক পাতায় পাওয়া যাবে। প্রত্যক্ষতা সমর সেনের উপমাগুলিতেও পাই :

২৩ পৃ. হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল
৩২ পৃ. অন্ধকার ঝুলছে শূয়রের চামড়ার মতো
৩৩ পৃ. নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে
৩৪ পৃ. শূন্য মরুভূমি জ্বলে/বাঘের চোখের মতো
৩৬ পৃ. আদিম জন্তুর মতো বিরাট মেঘ
৪৩ পৃ. অন্ধকারে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো
৪৬ পৃ বর্ষার সিক্ত পশুর মতো

বস্তুময়তা ছাড়াও এই উপমা কয়টি (এগুলি আমি জেনেশুনেই বেছেছি) পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে কেননা উপমান সব কয়টি দৃষ্টান্তেই এক,—পশু। এই পুনরাবৃত্ত উপমানের উৎস কি ইয়েট্‌সের What rough beast...slouches towards Bethlehem to be born ?—যে-কবিতার সঙ্গে সমর সেনের অপরিচয় অসম্ভব, অথবা এই পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যা কি হবে ফ্রয়েডীয় পন্থায় কবির ব্যক্তি-জীবনের অবচেতনে লুপ্ত কোনো জান্তব স্মৃতির সন্ধান? আমি নিজে সাহিত্যা-লোচনার এ-পর্যায়ে উৎস এবং আকরের চেয়ে শিল্পিত রূপান্তরে বেশি আগ্রহী এবং এইটেই আমার বিবেচনায় মূল্যবান কথা যে সমর সেনের বস্তুধর্মিতার স্বাক্ষর তাঁর

নানারকম বাক্‌প্রতিমায় এবং তাঁর অন্যান্য বাগৈশ্বর্যে (যার উদাহরণ আমি আর পেশ করছি না), যথা বর্ণনা-স্তবকে, বিশেষণ-প্রয়োগে, শব্দে শব্দে ও ছত্রে ছত্রে সম-বিপরীতের যোজনায় (যাকে ইংরেজিতে বলা হয় antithesis), ঠাসবুনট শ্লোকে, ইত্যাদি।

এই সর্বব্যাপী বস্তুময়তার প্রসঙ্গে লক্ষ না করে উপায় নেই যে সমর সেন শহরের কবি, মহানগরী কলকাতার কবি এবং (কয়েক বৎসর প্রবাসকালের জন্য) দিল্লীর কবি। নগরজীবনের মাঝে মাঝে সম্ভবত তিনি ছুটি নিতেন এবং আর পাঁচ-জন মধ্যবিত্ত কলকাতা-বাসীর মতোই এক রাত্রির ভ্রমণদূরত্ব অতিক্রম ক'রে সাঁওতাল পরগণার এখানে-সেখানে কয়েকদিন কাটিয়েছেন, সেজন্য আমরা এমন ছত্র পাই :

সাঁওতাল পরগণার নিঃসঙ্গ স্তব্ধতা।
ধুলোভরা নির্জন পথে মোটরের কর্কশ শব্দে
একটি হরিণের উর্ধ্বশ্বাস, ধাবমান বেগ (১৮ পৃ.)

আর অন্ধকারে লাল কাঁকরের পথ
পড়ে থাকে অলস স্বপ্নের মতো (২২ পৃ.)

রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে ;
আজ শহর হ'তে বহুদূরে, শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য (৪৭ পৃ.)

কিছু দূর দেশে দিগন্তে লোহিত সূর্য
কুয়াশায় ঝাপসা পাহাড়
লাল পথে কালো সাঁওতাল মেয়ে (৬৮ পৃ.)

অসাধারণ নয় এই বাক্‌চিত্রগুলি, কোথাও মাত্র একটি শব্দের বহুলক্ষণবিশিষ্ট বাক্‌-নিপুণতা নেই (যেমন, ধরা যাক, পাওয়া যাবে টেনিসনের And crowded farms and lessening towers-ছত্রে অথবা মোহিত মজুমদারের "আসে যথা রাত্রি তমস্বিনী শব্দহীন কলস্বনে") কিন্তু এই চিত্রাণু কয়টিতে একদিকে যেমন দর্শন ও বর্ণনের যথাযথ আনুরূপ্য তেমনি কবিচিত্তের অনতিসংগুপ্ত প্রতিতুলনাবোধ—কলকাতার দৃষ্টিতে মহুয়ার দেশের আবেদন, খানিকটা যেন নস্ট্যালজিক, যেন রোম্যান্টিক মনোভঙ্গীর দূরাভাস। কিন্তু সমর সেনের মন তীক্ষ্ণভাবে, বেদনার্ত ভাবেই বস্তুচেতন, ভাববিলাসী নয়, এবং সেজন্য সাঁওতাল পরগণার নৈসর্গিক সৌন্দর্যের গভীরে যে-সব প্রতিপন্থা নিহিত সেগুলি তাঁর মনোযোগ এড়ায় না :

তারপর এই কর্কশ বালুতে, এই রক্তপথে
আকাশের নিবিড় নীল আগুন লাগল।

আসমানে ও জমিনে কতই প্রভেদ ! এবং এই প্রভেদের সঙ্গে মিলেছে মানুষের জীবন-সংগ্রাম, 'সভ্যতা'র কবলগ্রস্ত হয়েছে মহুয়ার দেশ :

> মহুয়া বনের ধারে কয়লার খনির
> গভীর, বিশাল শব্দ,
> আর শিশিরে-ভেজা সবুজ সকালে
> অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক,
> ঘুমহীন তাদের চোখে হানা দেয়
> কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন ! (২৯ পৃ.)

সমর সেনের কবিতার যে-আঙ্গিক অসতর্ক পাঠকেরও নজরে পড়ে—বিপরীতের সংশ্লেষ—এ-ছত্র কয়টিতে সে-আঙ্গিক অনুপস্থিত নয়। একদিকে শিশিরে-ভেজা সবুজ সকাল, স্নিগ্ধ আলো, প্রাণের উৎস শিশিরকণা, ভোরের সতেজ নবীনতা, অন্যদিকে মানুষের অবসন্ন শরীর, ক্লান্তি, ধূলির কলঙ্ক, বিনিদ্রতার অতৃপ্তি ও জড়তা, নবজীবনের সম্ভাবনা-স্বপ্নের পরিবর্তে দুঃস্বপ্ন। সমাজ-ব্যবস্থা মহানগরীতে আপন 'ক্ষয়কারী প্রভাব বিস্তার করে' নিরস্ত হয়নি, মেঘ-মদির মহুয়ার দেশেও আগন্তুক বিস্মৃতির সুড়ঙ্গ খুঁড়ছে। অতএব যে-ললিত বেদনার রহস্যময় মাদকতায় রোম্যান্টিক চিত্ত শিহরিত হতে পারত,

> অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
> সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
> দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
> আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
> রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
> আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল,
> নামুক মহুয়ার গন্ধ। (২৯ পৃ.)

সেই বেদনার মাধুরী নিয়ে কবি থেমে দাঁড়াতে পারেন না। এই ছত্র কয়টির তুল্য রোম্যান্টিক বাক্‌লক্ষণা যে কোনো ভাষাতেই বিরল, কিন্তু সমর সেনের বস্তুচেতন বিশ্লেষণপরায়ণ নির্মম (কেননা সত্যনিষ্ঠ) সৃজনীশক্তি যুগপৎ শুনতে পায় সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস ও কয়লার খনির বিশাল ধ্বনি, দেখতে পায় দেবদারু-ছায়ার বিলম্বিত রহস্য আর দিবালোকের ধূলি-কলঙ্ক, অনুভব করতে পারে রাত্রির নির্জন নিঃসঙ্গতা আর অপূর্ণনিদ্র প্রভাতের দুঃস্বপ্ন। নিছক রোম্যান্টিক হয়ে থাকার মধ্যে স্বস্তি আরাম ও বিগলিত মাধুর্য অবশ্যই আছে কিন্তু প্রত্যক্ষজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি কম। প্রত্যক্ষচেতন সমর সেন রোম্যান্টিক হতে গিয়েও (১৯৩৪-৩৭ কালপর্বের কয়েকটি কবিতাই রোম্যান্টিকতা এবং রোম্যান্টিক সম্ভাবনায় উচ্ছল) 'এবার ফিরাও মোরে' বলে' তাঁর অনতিদীর্ঘ যাত্রা শুরু করলেন মনন-বিশ্লেষণ-বিদ্রূপের ঊষর বন্ধুর কাব্য-

পথে। ক্রম-ঘনায়মান প্রত্যক্ষতার রূঢ় সংস্পর্শে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ অবলুপ্ত হয়ে গেল, ১৯৪০-এর পরে সাঁওতাল পরগণা অদৃশ্য হয়ে গেল সমর সেনের কবিতা থেকে।

৭

কলকাতার কবি সমর সেন দেখেছেন মহানগরীর ক্লিষ্ট অসুন্দর রূপ।

> ম্লান হয়ে এল রুমালে
> ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—
> হে শহর হে ধূসর শহর !
> কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো শুনতে পাও
> লম্পটের পদধ্বনি
> কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও
> হে শহর হে ধূসর শহর ! (৩৪ পৃ.)

ব্যঙ্গ ও বেদনা মিলেছে অদ্ভুত রকমে। এই ধূসর শহরের রাস্তায় সদলবলে গান গায় দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক (১৬ পৃ.); এখানে আকাশে ধোঁয়ার ক্লেশ, চারদিকে ধোঁয়ার গন্ধ, আর হাওয়ায় অসংখ্য ধুলোর কণা জীবন্ত বীজাণুর মতো (১৯ পৃ.); এখানে সাইকেলে-ফেরা কেরানীর ক্লান্তিতে দিনের পর দিন ঘড়ির কাঁটায় মন্থর মুহূর্তগুলি মরে; ডাস্টবিনের সামনে মরা কুকুরের মুখের যন্ত্রণায় সময় এখানে কাটে (২৬ পৃ.), এখানে কলের বাঁশির তীব্র হাহাকার ধ্বনিত হয় দিক থেকে দিগন্তে, রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা চোখ বোজে, চারদিকে ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ, প্রান্তরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে ক্লান্ত শ্বেতাঙ্গিনী শীর্ণহাতে ঠোঁটে রং মাখে, কত উৎসুক চোখে অশ্লীল, নাগরিক আনন্দ, পিচের পথে অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ, শীতের আকাশে অন্ধকার ঝোলে শূয়রের চামড়ার মতো আর সন্ধ্যা নামে শীতের শকুনের মতো (৩০-৩৩ পৃ); মহানগরীতে আসে বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি, হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ আর সারা-দিন শোনা যায় পাথরের উপরে রোলারের মুখর দুঃস্বপ্ন (৩৭ পৃ.); এখানে যতদূর চাই ইটের অরণ্য, দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাসের পরে ক্লাইভ স্ট্রিট জনহীন, দিগন্তে জ্বলন্ত চাঁদ, চিৎপুরে ভিড়, খিদিরপুর ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শোনা যায় (৩৮-৪০ পৃ.),

> আর সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
> বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি। (৪০ পৃ.)

এই কলকাতা শহর। ক্ষয়, ক্ষয়, ক্ষয়, বিকৃতি, ক্লান্তি, দুঃস্বপ্ন, হাহাকার, মৃত্যুর মতো মন্থর জীবন, মৃত্যু-যন্ত্রণা। এই কলকাতা শহর। মনে পড়ে উনিশ শতকের শেষ

দিককার কবি জেম্‌স্ টম্‌সনের লণ্ডন নগরী—সিটি অব্ ড্রেডফুল নাইট্‌। সমর সেনের কবিতায় প্রেমের বিকৃতিতে বেদনা উত্তাল কেননা সুন্দরের স্বপ্নে কবির চিত্ত এখনো মথিত হয়।

এই আকাশের পিছনে কি কাঁপছে
নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন? (৩০ পৃ.)

ভস্ম অপমান শয্যা ছাড়
হে মহানগরী!
রুদ্ধশ্বাস রাত্রির শেষে
জ্বলন্ত আগুনের পাশে আমাদের প্রার্থনা,
সমান জীবনের অস্পষ্ট চকিত স্বপ্ন (৩৮ পৃ.)

মদির মধ্যরাত্রে মাঝে মাঝে বলি:
মৃত্যুহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনো
হানো ইস্পাতের মতো উদ্যত দিন। (৪০ পৃ.)

তবু জানি, কালের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী
যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে,
তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। (৪৫ পৃ.)

বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহারে বিক্ষত পর্যুদস্ত মহানগরীর সর্বৈব বিকৃতির মধ্যেও কবির স্বপ্ন (পলায়নী বিলাপের নয়, সৃষ্টির) উত্থিত হয়েছে প্রচণ্ড প্রত্যয় থেকে এবং সে-প্রত্যয় স্থায়ী, উচ্চশির হওয়া সম্ভব হত না যদি না মননের দৃঢ় কাঠামো তার সঙ্গে জুড়ে থাকত। জীবন-প্রত্যয়ের কাব্যায়ন বড়ো কঠিন, কোন্ মুহূর্তে যে প্রত্যয়ের উচ্চারণ শোনাবে শূন্যগর্ভ কলসীর নিনাদের মতো, কোন্ ক্ষণে হরিহর হয়ে যাবে খাঁটি ও ভেজাল, সে কথা বলা দুষ্কর, সে-বিষয়ে কোনো আইন নেই, কোনো বিধিবদ্ধ প্রণালী নেই, শুধু রুচিবান্ কবিতা-পাঠক অন্তরের উপলব্ধিতে জানতে পারেন প্রত্যয়ের খাঁটি কবিতায় স্পন্দিত হয়, যেমন হয়েছে উধৃত স্তবকটিতে, একটা বলিষ্ঠ অস্মিতা। সমর সেনের কাব্যে তাঁর সোশ্যালিজ্‌ম্ অচ্ছেদ্য এবং অমূল্য অঙ্গ। যে সমাজ-রাজ-অর্থনৈতিক দর্শন থেকে, যে ইতিহাস-চেতনা থেকে, যে মানবধর্মী দায়িত্ববোধ থেকে, যে সংস্কৃতি-শিক্ষা-অনুশীলনের নির্ভরে, সমর সেনের কাব্যপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার বিপ্রলাপ অসম্ভব নয়, বস্তুত আমাদের দেশ ইদানীং এহেন বিপ্রলাপে এবং বিরোধে মুখর ও অস্থিতপ্রজ্ঞ, কিন্তু সে-মুখরতায়

বিভ্রান্ত না হয়েও আমার সীমিত-সঙ্কল্প কাব্য-আলোচনায় এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতেই হবে যে সমর সেনের কাব্যে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে এই প্রত্যয়ও শ্রেষ্ঠ কাব্যের প্রাণশক্তি হতে পারে।

৮

কিন্তু এই মনন-বলিষ্ঠ প্রত্যয়েই নিহিত সমর সেনের বিদ্রূপভঙ্গী কাব্য। একদা সমর সেন সম্বন্ধে যে কথা বলা হয়েছিল—"নব যৌবনের কাব্য"—সে-আখ্যা আদৌ সুষ্ঠু বলে আমার মনে হয় না। বরঞ্চ আমার মনে হয় সমর সেন শুধু মধ্যবিত্ত সমাজের কবি নন, মধ্যবয়সের কবি, এমন কি মধ্যবয়স পেরিয়ে জীর্ণ জরার কবি।

> বৃদ্ধ মহাকাল
> ক্ষয়িষ্ণু জীবনে এনেছে জরার যন্ত্রণা (৪৯ পৃ.)
>
> কত দিনের ক্লান্তিতে কলের বাঁশি বাজে;
> পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্রগতি বাসের শব্দ (৫৬ পৃ.)

এই ক্ষয়িষ্ণু জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছে boredom একঘেয়েমি:

> সময় কাটে,
> সময় কাটে ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে (৩১ পৃ.)
>
> বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশ,
> তবু নিজেকে কতদিনের জীর্ণ বৃদ্ধ লাগে,
> জিভে স্বাদ নেই. জানি না
> কী পাপে সুস্থ শরীর ঘুণের আশ্রয়। (৭০ পৃ.)

এবং এই ঘুণে-ধরা দেহমনের পরিণাম এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

> তাই দিনান্তে কলের বাঁশিতে
> মনে হয় পৃথিবীর শেষ প্রান্তে
> করাল শূন্যের প্রান্তে
> নাভিচ্যুত শূন্য যেন কাঁদে;
> লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
> শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ। (৭০ পৃ.)

জীর্ণ জরা রূপায়িত হয়েছে অতল শূন্যে, নতিবাদে নিঃসত্তা হয়েছে শব্দ-গন্ধ-স্পর্শময় জগৎ—শূন্যতার এমন রূপায়ণ যে কোনো কাব্যেই অতুলনীয়।

এত ব্যঙ্গ, এত তিক্ততা মধ্যবয়সেরই ধর্ম, যে-মধ্যবয়সে ভাবজগতের চেয়ে বস্তুগত অধিকতর এবং নিষ্ঠুর সত্য, যে-বস্তুজগতের অন্তর্নিহিত বিরোধগুলি স্বচ্ছ

বুদ্ধির সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে বিদ্ধ হতে পারে। (সমরের কবিতায় 'বর্শা' এবং 'ইস্পাতের ফলক' বারংবার বাক্‌প্রতিমায় প্রযুক্ত হয়েছে।) এই কবিতা-সংকলনে আমি একটি কবিতা দেখতে পাচ্ছি না, 'পুনরুজ্জীবন'-শীর্ষক যে-কবিতাটি ছাপা হয়েছিল "কবিতা", ১৩৪৪ পৌষ-সংখ্যায়। আমার মনে হয় সমর সেনের কাব্য-মনোভঙ্গীর অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত এই কবিতাটিতে এবং সেজন্য আমি সম্পূর্ণ কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম।

(১) শান্ত-নীল চোখে জীবনের ক্লান্তি,
সেই পুরাতন স্পন্দমান বাসনা আর নেই,
সেই স্বাধিকারপ্রমত্ত রক্তের অন্ধ জয়গান।
শুধু গোয়ালে গরুর কাশি, অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে,
আর শীর্ণ ছায়ারা ঘোরে শীতের শব্দখর সহরে;
তুচ্ছ পরিণাম!

(২) আবার নিঃশব্দ হিংস্র প্রান্তরে
রক্ত পতাকা আকাশে ওড়ে;
প্রখর, নিঃশব্দ দিন
অমাবস্যার আকাশের ঘনগম্ভীর গান,
মহাশূন্যে শুনি বুঝি গাণ্ডীব টঙ্কার!
—আবার বারে বারে মনে হয়
সঙ্কীর্ণ শেষ মৃত্যু এখনো দূরে, বহুদূরে,
আবার দিকে দিকে যুগান্তরের ডম্বরু বাজায়
উদ্যত জীবন্ত পৃথিবী।

সুন্দর কবিতা, সমর সেনকে বুঝতে হলে এটি অপরিহার্য কবিতা। আঙ্গিকের হিসেবে সমগ্র কবিতাটি যেন একটি দ্বিচরণ শ্লোকের আঠারো শতকী অ্যান্টিথীসিস্, দু'টি বিপরীত চিন্তায় ভারসাম্য পেয়েছে একটি বৃহত্তর চিন্তা। প্রথম অংশটির চতুর্থ এবং পঞ্চম ছত্রে ক্ষয়শীল সমাজের প্রতীক (যদিও আমি 'অগ্নিচক্রে পৃথিবী কাটে'—এই বাক্‌প্রতিমাটির ব্যঞ্জনা বুঝতে পারলাম না); গোয়ালে গরুর কাশি, ইতস্তত ভ্রাম্যমাণ শীর্ণ ছায়ারা। একদিকে এই তুচ্ছতা, সবস্তক প্রত্যক্ষ তুচ্ছতা, এই তুচ্ছতা-ই কবির পারিপার্শ্বিক জগতে, সে-জগৎ বর্ণনা করতে হয় নঙর্থক শব্দপ্রয়োগে। অন্যদিকে প্রতীক হল রক্তপতাকা, একদা-স্বাধিকারপ্রমত্ত, অধুনা-নিবীর্য-অন্ধ রক্তের পুনরুজ্জীবন, সে-রক্ত এখন উর্দ্ধে উড্ডীয়মান পতাকা। গোয়াল ঘরের দৈন্য, জড়তা, নিঃস্পন্দ তুচ্ছতার প্রতিতুলনায় এখন প্রতীকের ব্যঞ্জনায় বিধৃত হয়েছে সংগ্রাম শক্তি, গম্ভীর সমবেত সঙ্গীত, গাণ্ডীব টঙ্কার, ডম্বরুবাদন, এখন পৃথিবী আবার হয়েছে জীবন্ত, উদ্যত।

কিন্তু সমর সেনের কবিতায় নবজীবনের সম্ভাবনা যদি উচ্চারিত হয়ে থাকে একবার, তাহলে লোল জরার স্তিমিত প্রাণধারণের গ্লানি, তার কলুষিত লালসা, তার অক্ষম কামনা, নানাভাবে বিদ্রূপ-কশায়িত হয়েছে পনেরোবার। এমনই হওয়া স্বাভাবিক, কেননা বাস্তববাদী হিসেবে সমর সেন প্রধানত সমকালীন বস্তু-পরিবেশে নিবদ্ধদৃষ্টি, ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় তিনি দৃঢ়প্রত্যয়ী কিন্তু সে-সম্ভাবনা এখনো সন্নিকট নয়। "জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে"। একদিন, কিন্তু সে-একদিন এখনো বড়ো দূর, এখন ব্যক্তি লাঞ্ছিত, ভয়গ্রস্ত, সঙ্কুচিত, এখন পিত্তরসে তিক্তচিত্ত পরাস্ত বাঙালী অনালোক ভূগর্ভ-বিবরে আশ্রয় নিয়েছে, এখন সমাজ রুদ্ধগতি, ক্লেদাক্ত, আত্মপ্রতারণায় নিবিষ্ট। কেউ যদি বলেন, হে কবি, সমাজের দিকে তাকাও কেন, আকাশের দিকে তাকাও, পাখির গান শোন, প্রথম বর্ষা-সিক্ত ধূলির আঘ্রাণে তৃপ্ত হও। বলতে পারেন, কিন্তু সমর সেনের জবাব হবে

কিন্তু বুঝি না তাকে,
দুধ ও তামাকে সমান আগ্রহ যার,
দুনৌকোর যাত্রী এই বাঙালী কবিকে,
বুঝি না নিজেকে। (১২৬ পৃ.)

এই জীর্ণ জরা-পরিহিত নিরানন্দ দেশকে বিদ্যুৎ-জীবনে উচ্চকিত করার পন্থা, সমর সেনের পক্ষে, বিদ্রূপের আঘাত হানা ; যেমন কিনা এদেশে ও বিদেশে, অধুনা ও অতীতে, অনেক কবি-ই স্যাটায়ার-পন্থা অবলম্বন করেছেন। স্যাটায়ারের দুই স্তর : উপরিতলে চূর্ণ করার ধ্বংস করার প্রয়াস, নঙর্থক প্রয়াস ; গভীরতলে সদর্থক প্রত্যয়, নতুনের প্রস্তুতি। সমরের কাব্যে দুটি স্তরই বিদ্যমান। সদর্থক প্রত্যয়ের যৎসামান্য দৃষ্টান্ত ইতিপূর্বে দিয়েছি। তাঁর নঙর্থক প্রয়াসে দুটি পর্যায় : প্রথমে বঙ্গীয় জীবনে, ক্রমে সমকালীন বিশ্বজীবনে, দুই পর্যায়ের পারিপার্শ্বিকে যে হেত্বাভাস ও অনৃতাচার বিষের মতো ছড়িয়ে আছে তাকে ধ্বংস করার জন্য স্যাটায়ার। কাব্যের প্রমাণে মনে হয় সমর সেন সোশ্যালিস্ট্ হয়েছিলেন বলে জীবনকে বিকারগ্রস্ত দেখেন নি, বরং জীবনকে বিকারগ্রস্ত দেখেছিলেন বলেই, বিকারের প্রতিকার খুঁজতে গিয়ে, সোশ্যালিজ্‌মে পৌঁছেছিলেন।

৯

সমর সেনের কাব্যের সৎ পাঠককে নিয়ত খেয়াল রাখতে হবে যে তাঁর রচনা প্রধানত নাট্যধর্মী, অর্থাৎ যে-আবেগ, যে-বাসনা, যে-প্রবৃত্তি, যে-মনোভঙ্গীটি তিনি শ্লেষবিদ্ধ করছেন সেটিকে তিনি নিজের (অর্থাৎ কাব্যের উত্তম পুরুষের) উপরে আরোপ করেছেন। মহৎ নাটকের Fool-চরিত্র যেমন দুনিয়ার ভণ্ডামি এবং নির্বুদ্ধিতার প্রতিভূ সেজে কথা কয়, যদিও আসলে Fool-এর সঙ্গে ভণ্ডামি

নির্বুদ্ধিতার ততই ব্যবধান যতটা সুমেরু-কুমেরুতে, সমর সেনও তেমনি বিকৃত সমাজ-স্বরূপটিকে আত্মচেতনায় নাট্যান্বিত করেছেন। এই নাট্যায়নের দুয়েকটি দৃষ্টান্ত লক্ষ করুন :

নিজের ছায়াভীরু,
ছায়া ঘন হলে বাইরে বেরোই। (৬১ পৃ.)

কলরোল
সামনে বরাবর কালের জোয়ার,
সাঁতারের শক্তি কি সাহস কিন্তু কখনো ধরিনি। (৬৯ পৃ.)

বর্গী আজো দূর।
প্রেম আমার পরিখা, দন্ত প্রাকার,
দুর্গম নিজদুর্গে অন্তরীণ,
মনে শ্রাবণের ঘন মেঘ। (৭১ পৃ.)

হঠাৎ কোথা থেকে এত লোক,
...
ছত্রভঙ্গ, উর্ধ্বশ্বাসে বাড়ি ফিরে আসি। (৭৪ পৃ.)

এসব ছত্রে উত্তম পুরুষের প্রয়োগ বারুদঠাসা ব্যঙ্গের কাজ করছে। ছায়াভীরু, জলস্রোতভীরু, বর্গীভীরু, জনতাভীরু যে-প্রাণীটি আজকের মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের বেনামা বন্দরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় তার ঘুণে-ধরা সত্তায় নিজ কবি-ব্যক্তিত্ব একাত্ম করে নিজ সমীক্ষাপরায়ণ অহংকে এই প্রাণীটির চরিত্রে প্রোজেক্ট করে, কবি তাঁর বিদ্রূপ-শক্তিতে শাণ দিয়েছেন। এই প্রবন্ধের পাঠককে নিশ্চয় বলতে হবে না যে যদিও কবিসত্তার পাদপীঠ ব্যক্তিসত্তা, তবুও ব্যক্তিসত্তা ও কবিসত্তা এক বস্তু নয়। যখন এই প্রবন্ধে সমর সেনের মনোভঙ্গীর আলোচনা করি, তখন ব্যক্তি সমর সেনের মনোভঙ্গীর কথা বলি না, বলি সেই মনোভঙ্গীর কথা যা তাঁর কবিতায় কাব্যান্বিত হয়েছে। এহেন কাব্যায়নে কবি নিজের বিপরীত সত্তাটিকেই প্রকাশিত করেন, অর্থাৎ তিনি স্বয়ং যা নন, স্বয়ং যার বিরোধী ও ধ্বংস-কামী, সেই বি-পক্ষীয় সত্তার মুখোশ লাগিয়ে সেই সত্তারই বিনাশ করেন।

এই মুখোশী স্যাটায়ার বাংলা কবিতায় আর তেমন আছে কি না জানিনা থাকলেও সমর সেনের প্রকরণ-নিপুণতা হীনমূল্য হয় না। গোড়ায় সমর সেনের বিদ্রূপ প্রযুক্ত হয়েছিল বাঙালী সমাজের কিছু ধিক্কারযোগ্য আচরণের প্রতি

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেঘলার মতো শালবনের অন্ধকার

পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ম্বরা প্রেম,
আর আজো তো আছে
কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী,
আর বন্যার মতো পুত্রকন্যা, অরণ্যে রোদন ;
হে ঈশ্বর, এ কী অপরূপ ! (৪৩ পৃ.)

ব্যঙ্গের শূলবেধ তীক্ষ্ণ হয়েছে প্রথম তিন ছত্রের রোম্যান্টিক কালিদাসী সৌন্দর্যের সঙ্গে পরের চার ছত্রের বাস্তব কদর্যতার বৈপরীত্যে, শেষ ছত্রের অপ্রত্যাশিত ঈশ্বর-শরণে, এবং কবিতাটির শিরোনামায়, 'ঘরে বাইরে'। সমর সেনের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হল, 'প্রাচীন সভ্যতা, ধোঁকে ঘেয়ো কুকুরের মতো'। অতি তীব্র কশাঘাত 'কয়েকটি মৃত্যু'-শীর্ষক কবিতার পরিচ্ছেদ কয়টিতে : প্রথমটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

তার মুখে সূর্যের কাঁচা সোনা,
মনে তার নতুন অরণ্যের স্বাদ
তাই সবি ভালো লাগে।
প্রেমের ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া,
শরম নেই।
আর একটি গুণ—
ছেলেপিলে চায় না মোটেই।
পুন্নামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে
স্বচ্ছন্দে চলে যায় দাম্পত্য জীবন।
অবশেষে ঠকঠকে বুড়ি হয়ে মারা গেল,
সংসার খালি :
দুর ছাই, কিছু ভালো লাগে না,
সঙ্গীহীন বুড়ো ভাবে সন্ধ্যায় :
সমাজ বদলেছে অনেক, নিরুপায়,
নইলে, হে হরি,
এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী।

এখানেও প্রকরণে সেই বিপরীতের তির্যক সহাবস্থান। চমৎকার রোম্যান্টিক বাক্‌-পুঞ্জ—'সূর্যের কাঁচা সোনা', 'নতুন অরণ্যের স্বাদ'—তার সঙ্গে জুড়েছে রকবাজি কথা—'পুন্নামের মুখে মস্ত তুড়ি মেরে', 'ঠকঠকে বুড়ি', 'দুর ছাই'—আর স্থূল অনুপ্রাস—'ব্যাপারে দিব্যি বেপরোয়া'—আর শেষ ছত্রের অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত—'এ বয়সে মন্দ লাগত না আর একটি কিশোরী'। ইংরেজ কবি ডান্‌-এর আঙ্গিকে বিপরীতের প্রয়োগ এর সঙ্গে তুলনীয়।

এই কামক্লিষ্ট সমাজের মূলে বিদ্যমান, সমর সেনের বিবেচনায়, একটা সার্বিক রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মিথ্যা দর্শন ও মিথ্যাচার। অতএব অচিরেই সমর সেনের ব্যঙ্গ সমর্পিত হল বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, আর এদিকে তিরিশের দশকের শেষার্ধে বিশ্ব-রাজনীতির পরিস্থিতিও জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠল। 'রোমন্থন' নামে যে কবিতাটি ১৯৪০-৪২ কাল-পর্যায়ে লেখা হয়েছিল, সে-কবিতাটিতে নাট্যায়িত জীবনীর সঙ্গে যথার্থ আত্মজীবনী মিশেছে অদ্ভুত ভাবে ; প্রথম ছয়টি স্তবকে কবি নিজ বয়োবিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে পারিপার্শ্বিক জগৎকে দেখছেন। কৈশোরের ধারণা : যুগল জীবনযাত্রাই আদর্শ, জনগণ বর্বর। বয়ঃসন্ধির সময় হল মহাত্মাজীর আন্দোলন (১৯২১এর অসহযোগ আন্দোলন নয়, ফলে সমর সেন গান্ধীর সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারেননি নিজ জীবনে ; এটি আইন-অমান্য-আন্দোলন, ১৯৩২ সালের), এবং এ-আন্দোলন-কালে লাল পাগড়ির লাঠির সামনে 'বঙ্কিমী সে লাঠি' (কবি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই বিখ্যাত স্তবকটি, 'হায় লাঠি, তোমার সে দিন গিয়াছে'), লাঠির সামনে দাঁড়িয়ে তরুণ কবি ভেবেছেন, 'আর যাই হই নিবীর্য অহিংস ক্লীব নই'। এরপরে কলেজের দিনে, প্রথম যৌবনকালে শোনা গেল অন্য আওয়াজ : 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'। [এখানে একটা কথা না বলে' পারছি না। সমর সেন এক ছত্রে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' লিখে পর ছত্রে কেন লিখলেন 'অর্থাৎ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক' ? যদি শুধু উর্দু স্লোগান্-এর পরে বাংলা স্লোগান থাকত, না হয় থাকত, কিন্তু কবি 'অর্থাৎ' লিখলেন কেন ? তিনি কি বলেছেন, হে বাঙালী কাব্য-পাঠক, তোমার অপার মূর্খতায় যদি তুমি এমন বিচিত্র উর্দু লব্‌জ্ কোনোদিন না শুনে থাক অথবা শুনলেও তার মানে বোঝোনি, সে-সম্ভাবনায় আমি আমার কথাটা fool-proof করে' দিচ্ছি, উর্দু ও বাংলা স্লোগান্ দু'টির ইকোয়েশান করে দিচ্ছি।— আশঙ্কা হয় এই অতিকথন-দৌর্বল্যের ফলে সমর সেনের ব্যঙ্গ বুমেরাং-এ পরিণত হয়েছে।]

বহির্জীবনের সংযোগে আত্মসত্তারও ব্যাপ্তি ঘটল। এখন থেকে সমরের ব্যঙ্গে রাজনৈতিক মিথ্যাচার ও ক্লীবাচার হল প্রধান লক্ষ্য, বিদ্রূপের সঙ্গে মিশলো ঘৃণা, ক্রোধ, অভিশাপ।

> চারিধারে ধানক্ষেত ভেসে গেল, বৃষ্টি আর থামে না,
> দলে দলে তাই চলেছি সভায়,
> দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কী বলেন।
> কী যেন খেয়ে তাঁর ঘোরতর অম্বল, রক্তবর্ণ মুখ,
> তাই স্বল্পভাষী ; বিজয়ী প্রসাদে গেলেন ফিরে ;
> যাতায়াতী খরচ কত
> পৈটিক রসদ কত কঠিন তরল,
> শত্রুপক্ষ নানা কথা বলে। (৭৯ পৃ.)

চাপা ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে লক্ষ্যবস্তুর ঘৃণার্হতা। অন্যত্র প্রযুক্ত হয়েছে, ইঙ্গিত নয়, জ্বলন্ত গ্লানি, ঘৃণা এবং ক্রোধ :

মধ্য ইউরোপে
জারজ সন্তানকে সঙ্গোপনে রসদ জোগায়
মাতা তার, দাঁতচাপা বৃদ্ধা গণিকা,
পশ্চিমী গণতন্ত্র নাম। (৮৬ পৃ.)

ঘৃণা ও ক্রোধ থেকে কবিচিত্তের উত্তরণ ভবিষ্যৎ-প্রত্যয়ে :

পুঞ্জীভূত শতাব্দীর প্রতিশোধ,
এ কঠিন কঙ্কাল দেহে একবার প্রাণ দাও,
হে কাল, হে মহাকাল ! (৭২ পৃ.)

ভবিষ্যৎ-প্রত্যয়ে কবির স্বর গভীর, গমগমে, উদাত্ত। একটি কবিতায় তিনি বলেছেন,

পৃথিবীর বদরক্ত বের হোক,
অস্ত্রোপচার নিতান্ত প্রয়োজন (৭৯ পৃ.)

সেই অস্ত্রোপচারের রক্তরঞ্জিত বাকপ্রতিমার সঙ্গে তাঁর শেষ দিককার কাব্যে বারংবার মিশেছে কতকগুলি বিভীষিকার প্রতিমা, যাকে তিনি বলেছেন 'তান্ত্রিক'। তেতাল্লিশের মন্বন্তরকালে এই তান্ত্রিক চেতনা থেকে উত্থিত হয়েছে একটি বাক্-প্রতিমা যার চেয়ে তুঙ্গতর তন্ত্রপ্রতিমা রবীন্দ্রনাথের 'বৈশাখ' ও মোহিত মজুমদারের 'মোহমুদ্গর' ছাড়া অন্য কোথাও আমি পাইনি,

আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
লণ্ডনের সামনে অস্থিচমসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।
তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে !
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে,
কৃষ্ণবর্ণ, লোলজিহ্বা করালবদন !
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা ! (১১০ পৃ.)

আমরা যারা সেই কলঙ্কিত তেতাল্লিশে 'ফ্যানের কাঙাল' ছিলাম, উপরের প্রথম দু'টি ছত্রে আমাদের মনে পড়বে জয়নুল আবেদিনের অবিস্মরণীয় রেখাঙ্কণগুলি।

সমর সেনের কাব্যে এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে একটা অমূল্য উর্ধ্বপাতন, সাব্লিমেশন্, যেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের সেই যে অবিস্মরণীয় বাক্প্রতিমাটির উল্লেখ করেছেন কবি এক কবিতায়, তারই আভাস তাঁর বিদ্রূপধর্মী কাব্যে আসন্নপ্রায় :

প্রায় পত্রহীন সে প্রৌঢ় বট, বহুদিন মাখেনি সবুজ কলপ,
কিন্তু তার শিকড়েরা উর্ধ্বমুখ, আকাশ সন্ধানে। (১১৭ পৃ.)

আকাশ সন্ধানের কিছু নিদর্শন আছে শেষদিককার কাব্যে।

১০

এই কবিতা-সংকলনের শেষ পরিচ্ছেদের রচনাকাল নির্দেশিত হয়েছে, ১৯৪৪-৪৬। অনতি-অধিক কুড়ি বছর আগেকার কবিতায় সংকলনটি থমকে গেছে। সমর সেন আর লিখছেন না, লিখলেও (আমি সঠিক জানিনে) কচিৎ কদাচিৎ লেখেন এবং মনে হয়, সে-লেখাকে স্মরণীয়তার মর্যাদা দিতে চান না। জীবন-মধ্যাহ্নে, কবিকৃতির উচু ঢালু পথের মাঝামাঝি উঠে, তিনি কেন কবিতা রচনা ছাড়লেন এ-প্রশ্ন নেহাৎ জৈবনিক কৌতূহল নয়, সমর সেনের কাব্য-মূল্যায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমি ভেবেছি, উত্তরের সন্ধানে কবিতাগুলি পড়েছি অনেকবার, কিন্তু এমন কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাইনি যাতে আমার বিবেক সন্তুষ্ট হতে পারে। এই কারণেই সমর সেনের কাব্য-মূল্যায়নও আমার অসাধ্য যদিও সে-কাব্যের কিছু অঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা উপরে করেছি।

কবির গতি নিয়ত অগ্রগতি হবে, উচ্চতর গতি হবে, এমন কোনো অবশ্যতা নেই। বস্তুত অনেক কবির বেলা এগিয়ে যাওয়ার পরে পিছিয়ে যাওয়া আছে, পিছিয়ে তেমন না গিয়েও প্রশস্ত রাস্তা থেকে সরে গিয়ে ইতস্তত আঁকাবাঁকা পথে চলবার ভ্রান্তিও আছে, উঁচুতে না গিয়ে নিচু ঢালুতে অথবা সুদীর্ঘ সমতলেও চলা যায়। দৃষ্টান্তের অভাব নেই এবং সচরাচর এসব ব্যতিক্রমের গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যাও মেলে। কিন্তু যিনি শুরু করলেন উজ্জ্বল ভরসা নিয়ে—যে কোনো ভাষায় কম কবিই সমর সেনের মতো উজ্জ্বল এমন কি চমকপ্রদ সম্ভাবনা নিয়ে শুরু করেছেন—তিনি যদি মধ্যপথে স্তম্ভিত হয়ে যান তাহলে (শুধু কাব্যের নির্ভরে) ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন। আমরা জানি ওয়র্ডস্বোয়র্থ দশ বছর মহৎ কাব্য রচনার পরে মহত্ত্ব হারিয়ে ফেলেছিলেন, যদিও তারপরে প্রায় চল্লিশ বছর বেঁচেছিলেন এবং গাদা গাদা নিরেশ কাব্য রচনা করেছিলেন। ডান্ পাদ্রি হওয়ার পরে কিছু সনেট রচনা করেছিলেন ভগবদ্‌ভক্তি নিয়ে, কিন্তু হারিয়ে ফেলেছিলেন আগেকার বিচিত্র সংবেদনা। ল্যাংল্যাণ্ড একটি প্রায়-মহৎ কাব্যের স্রষ্টা কিন্তু সারাজীবন বসে একটি মাত্র কাব্যই রচনা করেছিলেন। আমাদের ভাষায় কোনো শক্তিশালী কবিই নেহাৎ অল্প লিখে ক্ষান্ত হন নি। নিজ ভাষায় ঐতিহ্যে সমর সেন স্বতন্ত্র।

তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রথম থেকেই প্রকট। এই স্বাতন্ত্র্যের যে-লক্ষণটি সব চেয়ে স্থূলভাবে নজরে পড়ে সেটি তাঁর গদ্যছন্দ। "কবিতা" পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সমর সেনের চারটি ছোট লিরিক প্রকাশিত হয়েছিল। এই পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সম্পাদকের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের এক পত্র, এই পত্রে তিনি

বলেছেন 'পত্রিকাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি' এবং যে সব কবিদের রচনা প্রথম সংখ্যায় বেরিয়েছিল তাঁদের কয়েকজন সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তন্মধ্যে একটি মন্তব্য : 'সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টঁ্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্চে।'—টঁ্যাকসই হবে সে তো ভালো কথা কিন্তু গদ্যের রূঢ়তা বলতে যে কবি কী বুঝলেন সে-রহস্য সেই ১৩৪২ সাল থেকে আজ অবধি আমার হৃদয়ঙ্গম হল না। রহস্যোদ্ধারের চেষ্টা হওয়া দরকার কেন না 'গদ্য কবিতা' বলে যে কবিতার একটি জাতি মানা হয়েছে (যে নামকরণ নিয়ে একদা অন্নদাশঙ্কর রায় কিছু ব্যঙ্গ করেছিলেন), সে-কবিতা সম্বন্ধে আজ অবধি বেশ কিছু আলোচনা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের নিজ অনেক অকৃপণ মত-প্রকাশ সমেত, সে-কবিতার স্বরূপ সম্যক বুঝতে হলে সমর সেন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই অসতর্ক-প্রযুক্ত উক্তিটির সবিশেষ আলোচনা হওয়া একান্ত দরকার। আমার পক্ষে সে-আলোচনায় এখন প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব নয়, কেবল এইটুকু বলব যে সমরের এই কবিতা কয়টিতে যদি 'গদ্যের রূঢ়তা' থেকে থাকে তাহলে বাংলা ভাষায় 'রূঢ়' শব্দটির অভিধা পালটে ফেলা দরকার। ঐ চারটি কবিতার একটি মাত্র আমি উদ্ধৃত করছি :

> তুমি যেখানেই যাও,
> কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
> হঠাৎ শুনতে পাবে
> মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।
>   আর, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?
>   তুমি যেখানেই যাও—
>   আকাশের মহাশূন্য হ'তে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
>   লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।

রূঢ়তা তো দূরস্থান, এ-জিনিস গদ্যও নয়, বিশুদ্ধ কবিতা, যদি না ইংরেজি "গীতাঞ্জলি" ও "লিপিকা" গদ্য হয়, যদি না Song of Solomon গদ্য হয়।

এই কবিতাটি সমরের প্রথম দিককার কাব্যের প্রতিনিধি বলে বিবেচিত হতে পারে, অন্যতম শ্রেষ্ঠ তো বটেই। অবশ্য প্রথম দিককার বলতে আমি কোনো দৌর্বল্য বা অপরিণতি বোঝাচ্ছি না। বস্তুত যদিও তাঁর কবিতায় তিনটি পর্যায় লক্ষ করা সমীচীন বলে আমার মনে হয়—প্রথম দিকে প্রেমের ও নিসর্গপ্রীতির কবিতা, দ্বিতীয় পর্যায়ে বঙ্গীয় সমাজ সম্বন্ধে বিদ্রূপাত্মক কবিতা, চূড়ান্ত পর্যায়ে বিশ্বজাগতিক সমাজ-রাজ-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যুগপৎ বিনাশাত্মক ও প্রত্যয়াত্মক কবিতা—তিন পর্যায়ের সমীচীনতা সত্ত্বেও (সচরাচর অন্য কবিদের বেলা যেমনটি হয়ে থাকে) কোনো পর্যায়েই, প্রথম পর্যায়েও নয়, তারুণ্যসুলভ

অপটুতা নেই। সমর সেন যেন কোনোকালেই কবিতার শিক্ষানবিশি করেননি, এই সংকলনটির প্রথম কবিতা থেকেই সুডৌল পরিচ্ছন্ন বৃত্তসম্পূর্ণতা লক্ষ করি। এ কারণেও তিনি বাংলা কাব্যে স্বতন্ত্র। আরো লক্ষ করার বিষয় যে সমর সেনের কবিতা কদাচ দীর্ঘ হয়ে থাকে (তাঁর দীর্ঘতম তিনটি কবিতা, 'নানাকথা' ও 'ক্রান্তি' প্রত্যেকটি ১২২ লাইন, 'গৃহস্থবিলাপ' ১০৩ লাইন, কোনোটিই দীর্ঘ নয়)। তাঁর কবিতা 'মুড'-প্রধান, এড্‌গার অ্যালান্‌ পো-কথিত আদর্শ কবিতা : **I hold that a long poem does not exist. I maintain that the phrase, "a long poem" is simply a flat contradiction in terms.**

এই সুমিত পরিসরের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের কাব্যে ছিল একটি আশ্চর্য মৃদু অনুচ্চবাক ললিত স্বগতোক্তির সুর যার তিনটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমি উদ্ধৃত করছি :

তোমাকে বললাম—এস,
তোমার ধূসর জীবন হতে এস,
তোমার রাত্রির এই ক্লান্ত স্তব্ধতা পার হয়ে এস (২১ পৃ.)

হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল—
তখন পশ্চিমের জলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল :
সে অন্ধকার মাটিতে আনল কেতকীর গন্ধ,
রাত্রের অলস স্বপ্ন (২৩ পৃ.)

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস (২৯ পৃ.)

আমার মনে হয় এ-ধরনের মৃদু ললিত ভাষণের লিরিকে সমর সেন আমাদের সাহিত্যে অতুলনীয়। কিন্তু এই সুডৌল অনুভূতিঘন রোম্যান্টিক মাধুর্য টি'কল'না বেশিদিন, বাইবেল-উক্ত গার্ডেন অব্‌ ইডেনে প্রবেশ হল বিদ্রোহী, বিদ্রোহ-রচনাকারী সেটান্‌-এর। সমাজচেতনায় সমর সেনের কাব্যে প্রচণ্ড পরিবর্তন ঘটল। এই ললিতভাষণ তিনি শেষ অবধি কখনোই সম্পূর্ণ বিস্মৃত হন নি, শুধু সে-ভাষণ শুনতে চান নি :

ললিত বসন্তের, বেশি কথার দিন বিগত (৯২ পৃ.)

শুনি না আর সমুদ্রের গান
থেমেছে রক্তে ট্রামবাসের বেতাল স্পন্দন।
ভুলে গেছি সাঁওতাল পরগণার লাল মাটি
একদা দিগন্তে দেখা উদ্যত পাহাড় (১৪০ পৃ.)

যে-পরিবর্তন সমরের কাব্যে ঘটল, তাতে মনোভঙ্গীতে এবং কাব্যের প্রকরণে এলো সমান প্রভেদ। প্রথম পর্যায়ের কবিতার শব্দগুলি পুরোপুরি রোম্যান্টিক, উপরের উদ্ধৃতি কয়েকটিতে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। শব্দভাণ্ডার অত্যন্ত সীমিত, কয়েকটি শব্দ ঘুরে ফিরে ব্যবহৃত হয়েছে: প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠায় পাচ্ছি অন্ধকার (৩৫ বার), ক্লান্ত (১৮ বার), স্তব্ধ (১২ বার), তাছাড়া সমার্থ শব্দাদি (নিঃশব্দ, শব্দহীন) ধরা হয়নি: ধূসর (৭ বার), হাহাকার (৭ বার); অন্য পুনরাবৃত্ত শব্দের মধ্যে আছে: মন্থর, ম্লান, দুঃস্বপ্ন, স্বপ্ন, দিগন্ত, উজ্জ্বল, উদ্দাম। এ-পর্যায়ে রূপক প্রায় অনুপস্থিত, কিন্তু 'মতো' 'যেন' প্রয়োগে উপমা বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাপের মতো মসৃণ, কালো পাথরের মতো মসৃণ, শীতের অজগরের মতো, সবুজ পাতায় ম্লান পাখির মতো: শুধু উপমা-প্রয়োগের সমীক্ষায়ও সমর সেনের কাব্যে নিসর্গের প্রভাব বোঝা যেতে পারে, নিসর্গের প্রভাব তাঁর কাব্যে সব পর্যায়েই সমান যদিও তিনি সচরাচরিক অর্থে নিসর্গের কবি নন।

মধ্য পর্যায়ের কাব্যে শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হল অধিক তৎসম শব্দের, ('স্ফীতোদর', 'নীলরক্তবান', 'নারীধর্ষণ'), অ-কাব্যিক শব্দের ('ফেঁপে', 'খোঁয়াড়', 'আত্মম্ভরী', 'ভীমরতি'), প্রাকৃত শব্দের ('রেস্তহীন', 'রন্দা', 'তুড়ি মারি', 'পয়সা খসিয়েছে', 'বই···মেরেছ') প্রয়োগে; অনুপ্রাসের চতুর ব্যবহারে—ব্যঞ্জন ও স্বর দুই বর্ণেরই অনুপ্রাস (মাত্র দু'টি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি: পিত্তরসে তিক্ত ভীরু চিত্তে সঙ্গোপনে এল; স্খলিত দাঁতের ফাঁকে কাঁদে আর হাসে টামে আর বাসে)। এই সঙ্গে এসেছে পূর্বসূরীর কবিতার চরণ-উদ্ধৃতি এমনভাবে পেশ করা যাতে কবিতায় বিদ্রূপাত্মক anti-climax রচিত হতে পারে; আরো এসেছে প্রবচনের প্রয়োগ ('আপনি বাঁচিলে বাপের নাম')। উপমা কমে আসছে, তার জায়গায় এসেছে রূপক, মাঝে-মাঝে প্রতীক। শব্দভাণ্ডারের এসব বৈশিষ্ট্য চূড়ান্ত পর্যায়েও প্রবাহিত হয়েছে, বরং সমৃদ্ধতর জটিলতর হয়েছে এবং অন্তত একটি নূতন উপাদানের আমদানি হয়েছে, হিন্দুস্তানী শব্দ, মাঝে মাঝে ইংরেজি শব্দও।

এই মধ্যপর্যায়ের বিদ্রূপাত্মক কাব্যরচনাকালেই সমর সেন পারিপার্শ্বিক ও সমসাময়িক বাংলা কাব্যের প্রকরণে অতৃপ্ত হয়ে ঐতিহ্য খুঁজতে সচেষ্ট হলেন এবং বিষ্ণু দে'র মতোই মনে করলেন সমুচিত ঐতিহ্য মিলবে ঈশ্বর গুপ্তে। (পাঠক লক্ষ করবেন সমরের শেষের রচনাগুলিতে 'লবেজান' শব্দটি বহুপ্রযুক্ত; বিষ্ণু দে তাঁর প্রবন্ধে 'বিবিজান চলে যান লবেজান করে'—লাইনটির তারিফ করেছিলেন।) দুজন কবিরই ঐতিহ্যবিচার ত্রুটিপূর্ণ এবং যদিও তাঁরা কেউই এ-বিষয়ে পরে আর আলোচনা করেননি (ততদিনে তাঁরা নিজেরাই ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন), আমার ধারণা তাঁরা অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন যে ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বহীন চালাক পদ্যগুলিতে সৃজনী কাব্যের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অধুনা ইংরেজি কাব্যের আলোচনায় যেমন Line of Wit বলে একটি কাব্যধারা রেখায়িত করার রীতি

চলেছে, আমার ধারণা বাংলা কাব্যেও তেমনি সম্ভব যদি (বিষ্ণু দে ও সমর সেন যা করেন নি) আমরা জ্ঞানদাস গোবিন্দদাস থেকে দেখা শুরু করে ভারতচন্দ্র ও কোনো কোনো মঙ্গলকাব্যের কিছু অংশের মধ্য দিয়ে, উনিশ শতকের অযথা-অনাদৃত কবিগানের বাক্‌বিধির সনিষ্ঠ পরীক্ষা করি। তাহলে হয়তো একটা উপকারী ও খাঁটি ঐতিহ্য পাব যার আধুনিক প্রতিনিধিদের মধ্যে সমর সেন নিজেই। যা হোক, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রাকরণিক ঐতিহ্য সম্ভবত পেয়েছিলেন বিদেশী কাব্যে। আমার এ-ও মনে হয় ১৯৪২-পরবর্তী কাব্যে সমর সেনের আর ট্র্যাডিশনের প্রয়োজন ছিল না। তাঁর বস্তুজগতের তুল্য বস্তুজগৎ (এবং সে-জগতের Line of Wit কাব্য) পৃথিবীর ইতিহাসে জানা নেই, অতএব সমর সেন তাঁর নিঃসঙ্গ নিজস্ব পথে চলতে লাগলেন। সে পথে তাঁর কবিকৃতির কিঞ্চিৎ আভাস আমি উপরে দিয়েছি।

সমর সেনের রচনা-ক্ষান্তি আমার কাছে দুর্বোধ্য মনে হয় বিশেষত এই কারণে যে তাঁর চূড়ান্ত কাব্যে আমি কোনো দুর্বলতা, শৈথিল্য, ক্ষয়ক্লান্তি দেখতে পাই না; হয়তো প্রাক্-চূড়ান্ত পর্বে কিছু দুর্বলতা, কিছু অনিশ্চয়তা অল্প দিনের জন্য এসেছিল। কিছু কবিতাতে ('নানাকথা', 'নববর্ষের প্রস্তাব') আমি প্রয়াস-চিহ্নিত উচ্চভাষণের আড়ষ্টতা লক্ষ করি, বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে (বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে তুলনীয় পরিপ্রেক্ষিত নেই) তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয় তিনি প্রকাশ করছেন এমন অসামান্য ঝোঁক দিয়ে, এমন প্রায় নিরবচ্ছিন্ন তৎসম শব্দের উচ্চকণ্ঠ প্রাচুর্যে, যে মনে হয় অনভ্যস্ত বাংলা ভাষার মাধ্যমে এই প্রত্যয়-প্রকাশে তিনি অস্বস্তি বোধ করছেন. কোনো কোনো সময় তাঁর গদ্যের ছন্দ গৈরিশী নাটকের সুরেরই প্রতিবেশী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর প্রকরণ সমৃদ্ধতর হল। দ্বিচরণ শ্লোকবদ্ধ রুদ্ধপ্রবাহ পয়ারের ঠাসবুনট, আকস্মিক অন্ত্যমিল ও অন্তর্মিল, বাক্‌বিধির পরিবর্তন, পদ্যছন্দের নির্ভীক সংমিশ্রণ, ভাবসংশ্লেষ, বিরোধী উক্তির ও উল্লেখের সমাবেশে জটিল আবেগের প্রকাশ, উপমা-রূপক থেকে প্রতীকের গভীরতর দ্যোতনা-সঞ্চার, সর্বোপরি অন্তরতম বেদনার্ত জীবনপ্রত্যয় ও মানবতা—এসব মিলে সমর সেনের শেষকাব্যে সম্ভাবনা আমি প্রচুর দেখতে পাই এবং সেজন্যই তাঁর ক্ষান্তিতে বিচলিত বোধ করি। সমর সেন লিখেছেন, "পৃথিবীর কবিতার শেষ নেই," কিন্তু তবুও তাঁর সৃজনী আকাঙ্ক্ষার ও ক্ষমতার শেষ হয়ে গেল, এটা নিঃসীম ক্ষোভের বিষয়।

চতুরঙ্গ, শ্রাবণ ১৩৭৪

অশোক মিত্র

একটি পত্রিকার কথা

সমর সেন যখন বিখ্যাত, আমি তখনো স্কুলের ছাত্র। বাংলাদেশের মফস্বল, রাস্তায় ধুলো-কাদা কিন্তু সেই সঙ্গে আকাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের ঝলক, কিছু রাজনীতির আলোড়ন কিছু সাহিত্যকবিতাগানের মর্মর, শান্তশ্রীমণ্ডিত ছোটো একটি বিশ্ববিদ্যালয়, ঘোড়াগাড়িসাইকেলরিক্সামুখর মফস্বল। কলকাতা, উজ্জ্বল কলকাতা, 'কবিতা', 'পরিচয়' ইত্যাদি পত্রিকা যেখান থেকে বেরোয় সেই মায়াবী কলকাতা, সেই কলকাতার একটুকু কথা শুনি, মফস্বলের হাবা ছেলে আমরা, তাই দিয়ে মনে-মনে ফাল্গুনী-বৈশাখী-শ্রাবণী সব-কিছু রচনা করি। রাজনীতি নিয়ে তর্ক, কবিতা নিয়ে জটলা। রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে পরস্পরকে আবৃত্তি ক'রে শোনাই: 'রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর'। অথবা কালিঘাট ব্রিজের উপর লম্পটের পদধ্বনি নিয়ে উচ্ছলিত হই, গেরুয়া বসন অঙ্গেতে ধ'রে ব্রহ্মচারী বেশে পণ্ডিচেরি যাওয়ার প্রসঙ্গে কৌতুক খুঁজি। স্কুল থেকে আমাদের কলেজে উন্নতি হলো—মফস্বলেরই কলেজ—, সমর সেন দিল্লিতে, হয়তো সে-রাজধানী থেকেই পাঠানো কিছু ক্লান্ত-কিছু গম্ভীর-কিছু প্রত্যয়-কিছু হয়তো বা বিদ্রূপ-মেশানো সব পঙ্‌ক্তি: জোসেফ স্তালিন কোথায় ট্রাক্টরের দিন আনলেন, ভুলে-ভ্রান্তিতে-উৎকণ্ঠায় নতুন জীবনের ছাপ আমাদের চেতনায় পড়লো, দেশে স্বাধীনতা আনবেন ভদ্রলোক নন্দদুলাল স্থতরাং কুরুক্ষেত্রে ক্লীবের পন্থা ধরো, যে সরায় ময়লা, দুধ দেয় যে গয়লা তাদের দোস্তি ছাড়া কেন গতি নেই, আমাদের হাত থেকে রেহাই পাবে না যে-সব লবেজান সামুরাই, নানা প্রসঙ্গ-অধ্যুষিত ঐতিহাসিক সব পঙ্‌ক্তি। এরই মধ্যে, হঠাৎ বিদ্যুতের ঝিকিমিকি-ছড়ানো আশ্চর্য পদসংযোজন: 'জড়োয়া গয়না গায়ে ভ্রান্তির গণিকা এখনো তোমাকে ডাকে রঙিন গলিতে'।

সমর সেন কবিতা লেখা বন্ধ করলেন, আমার মফস্বলশৈশব কাটলো। তেভাগা আন্দোলন, দেশভাগ, বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা, মিছিল-বোমা-ধর্মঘট, রোজেনবর্গদের ফাঁসি, পিকাসোর পাখি-আঁকা বিশ্বশান্তি আন্দোলন, নেতাদের কেমন বুড়িয়ে যাওয়া, পুরোনো বক্তৃতার চর্বিতচর্বণ। বাংলাদেশ থেকে ছিটকে গেলাম আমি। সমর সেন আর কবিতা লেখেন না, কোথায় যেন গুজব শুনলাম বুদ্ধদেব বসু-কে বলেছেন, 'কবিতা এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দুটো থেকেই মুক্ত হয়েছি,' আমাদের স্থতরাং পুরনো পঙক্তিগুলিকেই সখেদে চেখে-বেড়ানো। বছরের পর বছর আরো গড়ালো, দেশে—এমনকি বাংলাদেশেও—কমিউনিস্ট পার্টি ভদ্দরলোক হলো, যাঁরা গণনাট্যসংঘে গান গাইতেন, নাটক করতেন, তাঁরা আস্তে-ধীরে সচ্ছলতার মুখ দেখলেন, সমর সেন, ফের গুজবেই জানলাম, দিল্লির রেডিয়ো

ছেড়ে কলকাতায় খবরকাগজে, খবরকাগজ ছেড়ে মস্কোতে বিদেশী সাহিত্য প্রকাশনাগারে। আমি নিজেও বিদেশে, শচীন চৌধুরীর ইকনমিক উইকলি-তে মাঝে-মাঝে সমর সেনের মস্কো থেকে লেখা চিঠি। সমর সেনের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় পর্যন্ত নেই জেনে শচীনদার কৌতুকমেশানো বিস্ময়। চকিত হয়ে লক্ষ করতাম, এমনকি সমর সেনের ইংরিজি গদ্যেও সেই শাণিত, নাস্তিকতার-আভাস-আসা স্বর।

আলাপ হলো পনেরো বছর বাদে, ১৯৬৩ সালে, বাংলাদেশে চাকরি করতে ফিরে এসে। চীনেদের সঙ্গে সরকারি হামলা, কমিউনিস্ট পার্টির বড়ো শরিক ফের কারাগৃহে কিংবা আত্মগোপন ক'রে, স্রেফ চটকদার দেশপ্রেমের অশ্লীলতায় ক্লেদাক্ত হাওয়া, সবাই যেন প্রহর গুণছিল এর পর কী হয়। কার সঙ্গে দেখা করতে যেন একটি সংবাদপত্রগোষ্ঠীর দপ্তরে গিয়েছিলাম, যাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম তিনিই সমর সেনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। প্রায় পনেরো বছর আগে যে-কবিতা লেখা বন্ধ ক'রে দিয়েছেন সে-সব কবিতার মতোই মিতভাষী। দেশপ্রেমের -উদ্গারে-ম'ম'-করা মধ্য কলকাতার সেই দপ্তর, নিশ্বাস ফেলেন কী ক'রে তা নিয়ে আমার ঈষৎ বিস্ময়, 'ছ'মাস-আগে-অবস্থা আরো-ঢের-খারাপ-ছিল', এরকম একটা-দুটো উক্তি, আলাপ আর-বেশি এগোলো না, হয়তো ওঁর অন্যত্র যাওয়ার তাড়া ছিল, নয়তো আমার।

তারপর বছর খানেকের মধ্যে তিন-চার বার আরো দেখা হয়েছে সমর সেনের সঙ্গে, এর-ওর-তার বাড়িতে, নয়তো কফিহাউসে। কোনোবারই কথা বিশেষ-কিছু হয়নি, শুধু বোঝা যেত ভদ্রলোক কবিতার ন্যাকামি থেকে দূরে থাকতে চান। ১৯৬৪ সাল, কলকাতায় নতুন ক'রে দাঙ্গা, বস্তিতে-বস্তিতে গরিব মুসলমান সম্প্রদায়ের ঘরবাড়ি পুড়োনো, 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজগুলির বীভৎস ইন্ধন জোগানো। শুনলাম সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন। আমরা বেশির ভাগ লোক আদর্শ জিনিশটাকে জীবিকানির্বাহের হিশেবনিকেশের বাইরে ফেলে রেখে সন্তর্পণে কালাতিপাত করি, সমর সেন কাজ ছেড়ে দিয়েছেন শুনে লজ্জায় বিবেক আরো-একটু কুঁকড়ে এলো।

আরো কয়েক সপ্তাহ যেতে শুনতে পেলাম কলকাতা থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা বেরোচ্ছে—'নাউ'—, সমর সেনকে সম্পাদক হবার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে, এবং ভদ্রলোক রাজি হয়েছেন। পত্রিকা বেরোতে-বেরোতে অবশ্য অক্টোবর মাস প'ড়ে গেল, আস্তে-আস্তে আমিও যেন কোন্-কোন্ ঘটনাপরম্পরায় 'নাউ'র অন্দরমহলে প্রবিষ্ট হলাম।

সব-মিলিয়ে তিন বছরের কিছু বেশি সময় পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলাম; পরিকল্পনা, প্রকাশ, উন্মেষ, প্রসার, এ-বছরের শুরু পর্যন্ত—যখন সমর সেন বিতাড়িত হলেন। এই পুরোটা সময় বিখ্যাত সমর সেনকে সম্পাদক হিশেবে খুব কাছে থেকে

দেখেছিলাম, আমার কৈশোরকে খুব একটা এক-হাত নেওয়ার মস্ত সুযোগ ছিল সেটা, এবং যার আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহারই করেছিলাম। 'নাউ'-র বোধ হয় কোনো বিশিষ্ট আড্ডা ছিল না। সমর সেনের নিজের যে-আড্ডা, তার সঙ্গে পত্রিকাটির চরিত্রের প্রতীপসম্পর্ক শেষদিন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল ; ভদ্রলোক এখন যে-পত্রিকা বের করছেন, তা-ও বোধহয় তাঁর আড্ডার আবহাওয়াকে দীর্ণ ক'রেই। যিনি একদা অম্লান কবুলতিতে লিখতে পেরেছিলেন : 'জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে, চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়,' তিনি কী ক'রে নিজের পরিপার্শ্বকে এভাবে অতিক্রম ক'রে চিন্তার অবৈকল্যে স্থিত থাকতে পারেন, তা নিয়ে প্রায়ই আমি ভেবেছি। আসলে আমাদের বাঙালিদের আড্ডাগুলি বোধহয় নির্মোকের মতো, অভ্যাসের বশে আমরা প্রবেশ করি, বেরিয়ে আসি, অন্তর্গত ভাবনাবোধ আবেগাদির সূত্রের সঙ্গে তাদের কোনো সাযুজ্য নেই।

সমর সেনকে সম্পাদকরূপে দেখে যা আমাকে অবাক করেছিল : ভদ্রলোকের স্খলে ভুল নেই। একটি জীবনদর্শন চেতনার সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে, ট্রামে-বাসে বহুতর শ্রেণীর-প্রকৃতির-সমাজের লোকের সঙ্গে স্মিত হেসে কথা বলছেন, রূঢ়তার প্রসঙ্গ কাছাকাছি আসছে না, বিমিশ্র আড্ডায় সন্ধি অভিসন্ধিগ্রসম্পন্ন ক-খ-গ-র বিচিত্রবাণী শুনছেন, কিন্তু বুধবার সন্ধ্যাবেলা পত্রিকা যখন বেরোলো, অভীষ্টে সামান্যতম বিচ্যুতি নেই, প্রথামত চক্ষুলজ্জার জালে জড়িয়ে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা নেই। যা বলা দরকার, তা স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়া হচ্ছে ; ধাপ্পা-বুজরুকি-ন্যাকামি নির্দয়তার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করা হচ্ছে : যে-সমাজশত্রুদের চাবকানো দরকার তাদের চাবকানো হচ্ছে।

আমার নিজের মনে হয়, বাংলাদেশের ষাটের দশকের সামাজিক ইতিহাসে সমর সেন-সম্পাদিত 'নাউ'-র উল্লেখ না-থাকা ঘোর অসম্পূর্ণতা হবে। এই দাবি-ঘোষণায় হয়তো কেউ-কেউ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠবেন। একে সাপ্তাহিক, তায় ইংরেজিতে, পরম কাটতির সময়েও বাজারে বিক্রি দশ হাজার ছাপিয়ে যায়নি, এমনধারা পত্রিকার প্রভাব আদৌ সর্বব্যাপী হবার নয়, সুতরাং, পত্রিকাটির কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে কিংবা লেখা থাকা উচিত এটা বলা, অনেকেই মনে হয় বলবেন, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। কারা পড়তো 'নাউ' ? দু-চারজন কেরানি, দু-চারজন স্কুল মাস্টার, কিছুসংখ্যক অপোগণ্ড ছাত্র, সদাগরি দপ্তরের একজন-দুজন মাঝারি সায়েব, তাছাড়া কয়েকটি বিশেষ দলভুক্ত পেশাদার রাজ-নৈতিক কর্মীরা। প্রতি সপ্তাহে নেহাৎই এঁদের জন্য কলম মক্সো করা, ইংরেজিতে শব্দের-পর-শব্দ বসিয়ে যাওয়া, এঁদেরই জন্য আবেগে উদ্গত হওয়া, বিদ্রূপে তির্যক হওয়া, এঁদেরই লক্ষ ক'রে তত্ত্বের সরলীকরণ, তথ্যের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান। দেশে ইংরেজনবিশের সংখ্যা ক্রমশ ক্ষীয়মাণ, চায়ের-কফির পেয়ালায় গরম হ'তে-চাওয়া মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত হাড়গিলেদের জন্য কেন তা হ'লে প্রতি সপ্তাহে কথার-উপর-

কথা বসানো? বিদেশে অঙ্গুলিমেয় কয়েকজন অবশ্য 'নাউ'-র ইংরেজি বাচনের তারিফ করতেন, রচনাশৈলীতে প্রতিভার দর্শন পেতেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাতেই কী সব? বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অলিগলিতে তার কতটুকু প্রশ্বাস-প্রবাহ?

ভেবেচিন্তেই বলছি, এবং যতটা সম্ভব আবেগনিরপেক্ষ হয়ে। কৃষিকর্মী-মজুরশ্রেণী নিয়ে যতই বক্তৃতাকণ্ডূয়ন করি, এখনো বাঙালি জীবনযাত্রায়-সামাজিক উপপ্লবে মধ্যবিত্ত মানসতা প্রধান কর্তৃপুরুষ। মধ্যবিত্ত, নাগরিক, কলকাতাসমাচ্ছন্ন বাঙালি চেতনা: লিন পিয়াও আপাতত পরাহত, এমনকি নকশালবাড়ির প্রসঙ্গেও যদি আমাদের কারো-কারো দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, তা হ'লেও সেখানেও, জঙ্গল সাঁওতালের নাম ছাপিয়ে কানু সান্যালের উল্লেখ। এই অবস্থা চলবে আরো দীর্ঘ সময় ধ'রে, হয়তো আরো কুড়ি বছর, হয়তো তিরিশ বছর, যতদিন না নাগরিক প্রভাব বাঙালির জীবনকলায় সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসে, যতদিন না কৃষককুল নিজেদের স্বভাবজ চিন্তায় নিজেদের শ্রেণীস্বার্থে উপনীত হ'তে পারেন, যতদিন না কারখানার মজুর কেম্‌ব্রিজে-পাশ-শ্রমিক-নেতাকে রদ্দা মেরে চেয়ার থেকে ফেলে দিয়ে নিজে সে-চেয়ারে ব'সে কেম্‌ব্রিজে-পাশ-কারখানা-মালিকের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁতখিঁচুনি দিতে পারেন। এই অন্তবর্তী সময়ে, সামান্য কয়েক হাজার পাঠকের জন্যেই, কাগজে কালি বুলোনো, রাগে বিস্ফারিত হওয়া, ঘৃণায়-ব্যঙ্গে সপ্তাহের-পর-সপ্তাহ ধ'রে পাতা ভরানো, ভাবী সমাজের কাঠামো নিয়ে কথার-পিঠে-কথা সাজিয়ে স্বপ্নবুনন। ইচ্ছে থাকলেও আমরা স্থানকালনির্দিষ্ট গণ্ডির বাইরে যেতে পারি না, সুতরাং গণ্ডিকে মেনে নিয়ে যতটুকু বিবেকের দায় মেটানো সম্ভব, ততটুকুই তৃপ্তিদায়ক। তাছাড়া, অন্য কতগুলি গণ্ডির অনুশাসনও আপাতত মেনে নিতে হয়: সাধ্যের গণ্ডি, এই বৈশ্য পৃথিবীতে সামর্থ্যের গণ্ডি। সুতরাং যদি কোনো ইংরেজি পত্রিকার সুযোগই ব্যবহার করতে হয়, বাধ্য হয়ে তা-ই।

আরোপিত শৃঙ্খল মেনে নিয়েছিলেন সময় সেন। কিন্তু সেই শৃঙ্খল সত্ত্বেও ঐ তিন বছরের মধ্যে বাঙালি সমাজের জন্য যতটুকু করতে পেরেছিলেন তিনি, তার তুলনা নেই। ১৯৬৩-৬৪ সালের স্তিমিত বাংলাদেশের, নির্বাপিত কলকাতার কথা একবার ভাবুন। ভয়ংকর তমিস্রার দিন গেছে তখন: ফেউ আর সুবিধাবাদীদের রাজত্ব চলছে, প্রতিদিন খবরকাগজে কূপমণ্ডুক আস্ফালন, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'চীন'-এর সঙ্গে 'রে হীন' মিল দিয়ে পদ্য ফাঁদছেন, যুদ্ধের জিগির তুলে কতিপয় তস্কর সাধারণ মানুষের সর্বস্ব নিংড়ে নিয়ে যাচ্ছে, সেটুকু বলবার সাহস কারো নেই, নতুন দিল্লি থেকে অদ্ভুতকিম্ভূত যা-যা অশ্লীল মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে এমনকি এই বাংলাদেশেও তাদের ভয়াবিষ্ট পুনরাবৃত্তি, যাঁরা একদা 'প্রগতিশীল' খেতাব এঁটে শৌখিন রাজনীতি-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চা করতেন, তাঁরা হীনমন্যতার কম্বলে মাথা জড়িয়ে খাটের তলায় ঘুপ্‌টি মেরে অবস্থান করছেন। স্বাধীনভাবে

চিন্তা করবার সমস্ত বাসনা-প্রবৃত্তি বিসর্জন দিয়ে সর্বত্র এক হুঙ্কারউদ্রেককারী আর্যাবর্তপ্রীতি। হয়তো ভুল বললাম, বলা উচিত ছিল আর্যাবর্তভীতি। সেই যে তৃতীয় শ্রেণীর খোট্টা কবি একদা গান বেঁধেছিলেন, 'জাগে নবভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা', সেই জাগৃতির অশ্লীলতায় পৌঁছুতে খুব-একটা বাকি ছিল না যেন তখন।

১৯৬২ সালের অক্টোবর মাস থেকে যে-নবভারত নতুন দিল্লির কলকাঠি-নাড়ানেওয়ালারা বাস্তবে পরিণত করতে চাইছেন, তা বড়োই বীভৎস ব্যাপার: সেই ভারতবর্ষে হিন্দুয়ানির প্রচ্ছন্ন গোঁড়ামি, অন্ধতা, হিন্দিভাষার সার্বভৌমত্ব, বাইরের পৃথিবী সম্বন্ধে গভীর অনীহা, পরমতঅসহিষ্ণুতা, গোমাতার আরাধনা, যে-কোনো সাম্যভাবনা সম্বন্ধে উৎকীর্ণ সন্দেহ, মধ্যযুগে পুনঃপ্রস্থানের লালায়িত আগ্রহ। বর্বরতার প্রচ্ছায়ায় জোর ক'রে আমাদের হাত-পা বেঁধে একজাতি একপ্রাণ বানাবার এক মস্ত চেষ্টা চলছে। এমন নয় যে যাঁরা শাসনযন্ত্রের হাল ধ'রে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই স্পষ্ট অভিব্যক্তিতে এ-ধরনের উদ্দেশ্য বিবৃত করছেন, এমন কেউ-কেউও নিশ্চয়ই আছেন যাঁদের মানসিকতার অনুরাগ সম্পূর্ণ অন্য, কিন্তু তা হ'লেও মনে হয় প্রয়াসের মুখ্য প্রবণতা এই বলাৎকারসাধনের দিকে।

দেশের বুদ্ধিজীবীরা হয় চুপ, নয় শেয়ালের দলে নাম লিখিয়েছেন, অনেকেরই প্রাক্তন রাজনৈতিক সৎসাহস স্তিমিত অথবা মৃত. পাঁচ বছর আগে সত্যিই ভয় ঢুকেছিল বুঝি বা আমরা অচিরে অশ্লীলতার বন্যায় ডুবে যাবো, সত্তাপরিচয়হীন হয়ে যাবো; বাংলাদেশ, এমনকি এই দু'টুকরো-হওয়া বাংলাদেশও, আর থাকবে না, ভারতের এক সামান্য খণ্ডে পরিণত হবে; হয়তো পঁচিশ বছর, হয়তো পঞ্চাশ বছর, কোনোক্রমে ভাষার আলাদা রূপটা বজায় থাকবে, তারপর তা-ও হিন্দির অপভ্রংশে রূপান্তরিত হয়ে মিলিয়ে যাবে; রবীন্দ্রনাথের গানের হিন্দি অনুবাদ আমরা গাইবো; জনসংঘের নেতারা রাজা হবেন; মার্কিনরা আমাদের সভ্যতা শেখাবে; কুচকাওয়াজ করবো।

এরকম আতঙ্ক ১৯৬৩ সালে হওয়া খুব স্বাভাবিক ছিল। এমনকি বাংলাদেশেও পণ্ডিত-অধ্যাপকরা ভয়ে নীল হয়ে আছেন, নয়তো 'জাতীয়তাবাদী' খবরকাগজ-গুলির পূজা-আরাধনা ক'রে দু'পয়সার ব্যবস্থা করছেন, যা চিরাচরিত মধ্যবিত্ত প্রস্থান। সমর সেন 'নাউ' পত্রিকা মারফৎ মানসিকতার মোড় ফিরিয়ে দিলেন, নপুংসকরা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো। কিছুটা বিদ্রূপে, কিছুটা ব্যঙ্গে, কিছুটা তাচ্ছিল্যে, কিছুটা ঘৃণায়, আর্যাবর্তমন্ত্রতাকে দু'দিনেই নাজেহাল-নাস্তানাবুদ করলেন; যে-সাহসে আমাদের জন্মগত অধিকার, তাকে ফিরিয়ে আনলেন। সমাজতন্ত্রের যে-স্বপ্ন বাদ দিয়ে নতুন ব্যবস্থার বিন্যাস অসম্ভব, সেই স্বপ্ন তার নিটোলতা নিয়ে ফিরে এলো। মোহমান-ঘোর-থেকে-মুক্ত এই বাংলাদেশে গত তিন-চার বছরে তারপর অনেক-কিছুই ঘটেছে: অনেক দৃপ্ত ভঙ্গির কথাকলি,

অনেক বিপ্লবী বিন্যাসের তরবারি ঘুরোনো। কিন্তু নতুন ক'রে সাহসের সঞ্চার ক'রে দিয়েছিলেন সেই সমর সেন, যে-সমর সেন তিরিশ বছর আগে আরেক ধরনের সাহস দেখিয়েছিলেন, সেই কবিতার রাজ্যে।

এখনো অভিযোগ হবে, অতিকথন করছি। ব্যক্তি তথা বস্তু ইতিহাসের ক্রীড়নক মাত্র, যে-সাহস সমর সেন তখন যুগিয়েছিলেন তা ঘটনাচক্র একটু অন্যরকম হ'লে হয়তো অন্য-কেউ যোগাতেন, সে সাহসের ধারক 'নাউ' না হয়ে অন্য-কোনো পত্রিকা হতো। কিন্তু ইতিহাসে প্রত্যয় এবং ভবিতব্য-ভক্তি আলাদা ব্যাপার। পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে ভিড়ের অভাব হয় না, বিশেষ ক'রে মধ্যবিত্ততায় সংহত বাংলাদেশে হয় না। পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে তেমন লাভ নেই, লোক-পরিবাদে নেমেও নেই। ঠিক ঐ মুহূর্তে সমর সেন এগিয়ে না-এলে শ্রীযুক্ত অমুক কিংবা শ্রীমতী তমুক এগিয়ে আসতেন কিনা তা নিয়ে এখন তর্ক বৃথা, তাঁদের অন্তত সে-মুহূর্তে দেখা পাওয়া যায়নি। গবুচন্দ্রমন্ত্রীপ্রতিম হয়ে অনেকেই হয়তো এখন বলতে পারেন, তাঁদের মনেও বরাবরই সাহস দেখাবার সংকল্পটা ছিল, সমর সেন কী ক'রে টের পেয়ে আগে-ভাগে বাজার জমিয়ে বসেছিলেন, আসল কৃতিত্বটা কিন্তু তাঁদেরই প্রাপ্য। তাঁদের তৃপ্তিরোমন্থনে আমি ব্যাঘাত ঘটাবো না।

অবশ্য অন্য-একটি কথা বলতে হয়। বাঙালি সাহসের উত্তরাধিকার একা সমর সেনে নিশ্চয়ই বর্তায়নি, সেরকম অন্যায় দাবি করার অভিপ্রায়ও আমার নেই, এইমাত্র উপরে যা লিখেছি তা সত্ত্বেও নেই। কিন্তু 'নাউ'-তে সাহসের সঙ্গে আরেকটি উপাদানের অন্বয় ঘটেছিল : রচনার উজ্জ্বলতা। সমাজশত্রুদের গাল পাড়তে গেলেও যে লেখায় একটা বাঁধুনি দরকার, চিন্তার মূল সূত্রটি দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করতে গেলে ব্যাখ্যার মধ্যে যে সংহতি-প্রাঞ্জলতা-বস্তুণত্বজ্ঞান দরকার, অনেকেই তা ভুলে থাকেন। ফলে অনেক মহৎ ভাবনা অসংলগ্ন আবেগের আড়ালে ঢাকা পড়ে, যা স্থির অণ্বীক্ষায় ব্যক্ত করা প্রয়োজন ভাষার বিযুক্তিতে তা অনুক্ত থাকে। বামতাত্ত্বিকরা ভাষা তথা কলাকুশলতার এ-দিকটা নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাতে চান না, তাঁদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমনকি বাচনভঙ্গির ব্যবহারিক উপযোগিতা পর্যন্ত অস্বীকার ক'রে যাবেন। এ-ব্যাপারে সমর সেন পথপ্রদর্শক হয়ে রইলেন : ঘোর প্রতিক্রিয়াপন্থীরাও এটা, অনিচ্ছার সঙ্গে হ'লেও, স্বীকার করেছেন 'নাউ' পত্রিকার মতো সংস্কৃত, বুদ্ধিদীপ্ত সাংবাদিকতা গোটা ভারতবর্ষে এর আগে চোখে পড়েনি, নিহিত বক্তব্য প্রবল ভয়ংকরী হওয়া সত্ত্বেও সমর সেনের সম্পাদনা-উৎকর্ষের তুলনা নেই।

তিন বছরের একটু বেশি সময় 'নাউ' পত্রিকায় আমরা আসর জমিয়েছিলাম, পত্রিকার শুরু থেকে যে-তারিখে মালিকরা সমর সেনকে তাড়িয়ে দিলেন সেদিন পর্যন্ত। অবিমিশ্র সুখের সময় গেছে সেটা, অবিমিশ্র সাহসে বিস্ফোটিত হবার সুখ। কিন্তু আমরা নিয়তিকে অত্যন্ত বেশি প্রলুব্ধ করছিলাম, সুতরাং যা হবার তা-ই

হলো ; যে-পত্রিকার নিশ্বাসওংকার কোনো-কিছুই তাঁকে বাদ দিয়ে ভাবা যায় না, সমর সেনকে সেই পত্রিকা থেকেই গলাধাক্কা দিয়ে বিদায় করা হলো। এক হিশেবে অবশ্য আমি খুশিই হয়েছি : শ্রেণীসংঘাতের মৌল লক্ষণগুলি আস্তে-আস্তে বিকশিত হচ্ছে, সমর সেনকে 'নাউ' থেকে তাড়ানো তার স্পষ্ট প্রমাণ। আপনার শ্রেণীস্বার্থকে লোকটা-দিনের পর-দিন ব্যাঘাত ক'রে যাচ্ছে, অথচ আপনি মুখচোরা বিনয়ে সেটা সহ্য করছেন, এরকম হওয়াটাই প্রকৃতি-বহির্ভূত। আমাদেরও অন্দরমহলে, আমরা তৈরি কি অসংবৃত তা বাহ্য, শ্রেণীযুদ্ধ দামামা বাজিয়ে অনুপ্রবেশ করেছে : মস্ত শুভসংবাদ সেটা।

না, 'নাউ' থেকে সমর সেনের অপসারণে আমার বিন্দুমাত্র বিস্ময় সঞ্চার হয়নি, আমাকে যা ঈষৎ অবাক করেছে তা এই বিতাড়নের ব্যাপারে এই ভূখণ্ডের গুদোমঠাসা প্রগতিওয়ালা-বিপ্লবওয়ালাদের নিকত্তেজ ভাব। বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি, যিনি স্বীয় অবৈকল্য-নিষ্ঠা দিয়ে সাংবাদিকতার মান মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বহু উর্ধ্বে তুলে নিয়ে গেছেন, সেই সম্মানীয় ব্যক্তিকে, বলাকওয়া নেই, এরকম পত্রপাঠ বিদায়ের প্রসঙ্গে যেন তাঁদের কোনো সামাজিক কর্তব্য নেই ; এক আশ্চর্য-অদ্ভুত আসক্তিহীনতা, যেন পৃথিবীতে যথার্থই কোনো ব্যথা নেই, সমর সেনই শুধু অযথা মৃত্যু খোঁজেন। লোকসভা-রাজ্যসভায় যাঁরা টেবিল চাপড়ে প্রত্যহ দাপাদাপি করেন, তাঁদেরও মুখ দিয়ে রা'টি বেরোয়নি, ময়দানের পাটাতনে যাঁরা গোধূলিসন্ধ্যায় বিপ্লবের রক্তবন্যা বইয়ে দেন, তাঁরাও চুপ ; বুদ্ধিজীবী-অধ্যাপকদের যে-সংকুল সম্প্রদায় চেকোশ্লোভাকিয়ায় সব গেলো-সব গেলো ব'লে খবরকাগজে সুদীর্ঘ বিবৃতি সাতশো আশি স্বাক্ষর অলংকৃত ক'রে পাঠান, সমর সেনের ব্যাপারে তাঁরা নীরব, এবং সে-নীরবতায় রবীন্দ্রনাথ-কথিত পূর্ণিমানিশীথিনীর কোনো দ্যোতনা নেই।

হয়তো এই বিস্ময়েরও কোনো মানে নেই। আরো-কিছুদিন হয়তো এরকমই হবে। মধ্যবিত্তমদির বাংলাদেশ : ভদ্দলোকের ভয়, ভদ্দরলোকের ঈর্ষা, ভদ্দরলোকের লোভ, ভদ্দরলোকের পরশ্রীকাতরতা, ভদ্দরলোকের নিজের-বুঝ-আগে-বোঝবার প্রবণতা। এই সমাজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সমর সেন দৃপ্ত সাহস দেখিয়েছেন, সাহস দেখিয়েছেন ব'লে এখন জবাই হয়েছেন, কিন্তু তাতে আমার-আপনার কী : আমরা কলেজে-কি-অফিসে যাবো, পান চিবোবো, একে-ওকে খোশামোদ ক'রে বাড়তি দু-পয়সার ব্যবস্থা করবো, আখেরে সুবিধে হ'লে দুটি-তিনটি শৌখিন বক্তৃতা দেবো, রাত্রিতে আমাদের ঘুম খুব নিটোল হবে, প'ড়ে মরুকগে সমর সেন।

এক্ষণ, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৩

মণীন্দ্র রায়

আমার কালের কবিরা

…আলাপ হয়েছিল সমর সেনের সঙ্গে। যদ্দূর মনে পড়ে, বুদ্ধদেববাবুর বাড়িতেই। কিংবা বিষ্ণুবাবুর বাড়িতেও হতে পারে। কিন্তু প্রথম পরিচয়ের পর কাছাকাছি আসতে খুব দেরি হয় নি। তার একটা কারণ, তাঁর নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল আগেই। শুধু কবি হিসেবে নয়, সম্পাদক হিসেবেও। সেকালে 'শ্রীহর্ষ' বলে ছাত্রদের একটি কাগজ ছিল। কিংবা একটি না বলে বলা উচিত দুটি কাগজ। কেননা পরে ইংরেজী ও বাংলা দুই ভাষাতেই আলাদা দুটি কাগজ বেরিয়েছে।

যাই হোক তখনকার বাংলা শ্রীহর্ষের সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। ব্যবস্থাপনা ছিল ছাত্রগোষ্ঠীর হাতে। ফলে শ্রীহর্ষের সেই রমানাথ মজুমদার স্ট্রীটের অফিসে আনাগোনা ছিল সমস্ত মতের ছাত্রেরই, সকলেই স্বেচ্ছায় সাহায্য করতেন। আমিও ছিলাম তাদেরই একজন।

এইজন্যে সমরবাবুর সঙ্গে আলাপটা জমতে দেরি হয়নি। তাই কিছুকাল পরে আমি যখন পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চাকরির চেষ্টায় দিল্লির সেক্রেটারিয়েটে তদ্বির করতে যাই, তখন সে সময়কার দিল্লি প্রবাসী কবির পক্ষে হোটেল থেকে ডেকে নিয়ে বাড়িতে তোলাও হয়ে উঠেছিল সহজ ব্যাপার। সমরবাবু তখন দিল্লির রামযশ কলেজে অধ্যাপনা করতেন, থাকতেন দরিয়াগঞ্জে।

কামাক্ষীপ্রসাদও দিল্লীতে কাজ করতেন সেই সময়ে। সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে আবিষ্কার করি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আমারই মতো একই উদ্দেশ্যে গিয়ে হাজির হয়েছেন সেখানে। কামাক্ষীবাবু খবর পেয়ে মানিকবাবুকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়িতে। দিন কয়েক সমস্ত সন্ধ্যা ধরে চলল অবাধগতি সাহিত্যিক আড্ডা। সকলকেই রীতিমত কাছ থেকে দেখা গেল, প্রতিদিনের খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে চেনা গেল।

মানিকবাবু ছিলেন একরোখা ধরনের মানুষ। স্পষ্ট কথায়, সংক্ষিপ্তভাবে মতামত প্রকাশ করতেন, বাধা পেলে তর্ক করতেন। অন্যের মত শুনতেন, কিন্তু নিজের অবস্থান থেকে একচুলও সরে দাঁড়াতেন না। সমরবাবু কথা বলতেন কম, কিন্তু যখন বলতেন, তার মধ্যে ঠাট্টার আমেজ থাকত, ঈষৎ শ্লেষ এবং একটা ক্যাজুয়াল ভাবও ফুটে বেরোত। কামাক্ষীপ্রসাদ ছিলেন পুরোপুরি আড্ডাবাজ মানুষ, হাসিখুশি এবং আতিথ্যে ত্রুটিহীন।

ব্যক্তিগতভাবে সমরবাবুও ছিলেন খুবই সহৃদয় মানুষ। তখন গরমকাল, দিল্লিতে লু চলছে। সমরবাবুর সেই একতলা বাড়িতে শুতে হত চাতালের ওপর বাইরে, নেওয়ারের খাটে। পাশাপাশি শুতাম দুজন দুখানা আলাদা খাটে।

মাথার কাছে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় সারারাত চলত টেবিল ফ্যান। একদিন রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে অন্ধকারের মধ্যে চেয়ে দেখি, আমার গরম লাগছে মনে করে সমরবাবু টেবিল ফ্যানটি পুরোপুরি ঘুরিয়ে দিচ্ছেন আমার দিকে। মানুষের সত্যিকারের মনটাকে জানার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম সেদিন।

সমর সেন আধুনিক বাংলা কবিতার এক অতি উজ্জ্বল নাম। এত কম লিখে এত বেশি প্রতিষ্ঠা এক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছাড়া আর কোনো কবিই পান নি। প্রায় ছাত্র বয়সেই কিংবদন্তীর মতো জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন সমরবাবু। 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের প্রথম সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক আবু সয়ীদ আইয়ুব সমরবাবুর কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন, সেই বয়সেই সমর সেন কবিতা রচনার একটি নতুন স্কুল তৈরি করে ফেলেছেন। সত্যি বলতে কি নতুন কবি-যশঃপ্রার্থীদের ওপর তাঁর প্রভাব ছিল প্রায় ছোঁয়াচে অসুখের মতো।

সমর সেনের সমস্ত কবিতাই লিখিত হয়েছে গদ্যরীতিতে। এটা অবিশ্যি ঠিকই যে গদ্যকবিতা প্রথম লিখতে শুরু করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু কী আশ্চর্য প্রতিভা ছিল ঐ তরুণ কবির, কলম ধরেই তিনি রবীন্দ্রনাথের থেকে অন্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করলেন গদ্যকবিতার শরীরে।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা গীতিকবিতারই যমজ বোন, কবিতার সুর ও আবেগই তার একান্ত নির্ভর। কিন্তু সমরবাবুর গদ্যকবিতা গদ্যেরই এজমালি শরিক। তাতে গীতিকবিতার সুরেলা আবেগের চেয়ে বেশি করে কানে বাজে নাটকীয় স্বগতোক্তির সুর। কখনো তিনি তাই বিষণ্ণ গভীর, কখনো তীব্র বিদ্রূপ, ক্ষমাহীন। কিন্তু সব সময়েই বোঝা যায়, নিজেকেও তিনি বাদ দিচ্ছেন না। জীবনের দেউলেপনা ও অবক্ষয়ের ছবি তাঁর কবিতায় এক বিশেষ চরিতলক্ষণ বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। এবং এই ছবিগুলি নিতান্ত ছবিই নয়, কবির মন্তব্যও। যেমন ধরুন—

> তোমার ক্লান্ত উরুতে একদিন এসেছিলো
> কামনার বিশাল ইশারা!
> ট্যাঁকেতে টাকা নেই,
> রঙিন গণিকার দিন হলো শেষ,
> ...
> কাঁচা ডিম খেয়ে প্রতিদিন দুপুরে ঘুম,
> স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতীসাবিত্রী,
> আর বন্যার মতো পুত্র-কন্যা: অরণ্যে রোদন ;
> হে ঈশ্বর, একী অপরূপ!

এবং এরই সঙ্গে লক্ষ করুন নিচের লাইনগুলোও, সমর সেনকে চেনা অনেকটা সহজ হয়ে যাবে।—

তোমার বিষাণ বজ্রে বাজে।
নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত দুর্ভিক্ষের ধূপে।
কৃষ্ণবর্ণ লোলজিহ্বা, করালবদন।
পদপ্রান্তে নিরুদ্দেশ ধান আর গম,
আর পুঞ্জীভূত পুরুষের প্রাণহীন দেহ,
ছিন্ন শিশুর রক্তজবা।
ঘূর্ণিঝড়ে, বন্যায়, বিস্ফোরকে
জয়বাদ্য বাজে।

সমর সেনের কবিতায় উপমা বা অলঙ্কারের জাঁকজমক খুবই কম। তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব, টানটান গদ্যে নতুন ধরনের বিশেষণের চকিত দীপ্তি। যেমন—রাত্রির ঝাপসা গন্ধ, টেরিকাটা মসৃণ মানুষ, সবুজ গাছের নরম অপরূপ শব্দ, দিগন্তে জলন্ত চাঁদ, অনুর্বর আত্মার উচ্ছ্বাস, তপ্ত মুহূর্তের খড়্গ ইত্যাদি।

সেকালের এক কৃতী পুরুষ দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন সমরবাবুর পিতামহ। সমরবাবুর মুখে শুনেছি, দীনেশচন্দ্র তাঁর খ্যাতনামা পৌত্রের কবিতার বিষয়ে নীরব থাকলেও গদ্যের খুব প্রশংসা করতেন।

সমরবাবু তাঁর বন্ধু মহলে তো বটেই পারিবারিক গণ্ডিতেও রীতিমত স্নেহ ও মর্যাদার আসন পেয়েছেন। শোনা যায় তাঁর অধ্যাপক পিতা অরুণ সেন নিজের এই তৃতীয় পুত্রের বিষয়ে উল্লেখ করে বলতেন আমি হলাম একজন জিনিয়াস পিতার মিডিওকার ছেলে, এবং একজন জিনিয়াস ছেলের মিডিওকার পিতা।

অমৃত, ২০শে জানুয়ারি ১৯০৮

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

প্রসঙ্গ : সমর সেন

('একালের কবিতা : চল্লিশ দশক', অংশ)

সমর সেন চল্লিশের দশকের প্রথম প্রতিনিধিস্থানীয় নাগরিক কবি। পূর্ববর্তী তিরিশের কবিদের মধ্যেও কেউ কেউ কবিতায় নাগরিক পরিবেশকে স্পষ্ট করে এঁকেছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দে-র কোনো কোনো কবিতা স্মরণীয়। তৎসত্ত্বেও সমর সেনের কবিতায়ই এই প্রথম নাগরিক জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্তি ও হতাশা ব্যাপকরূপে প্রতিবিম্বিত হ'লো। রিক্সায় ক্লান্ত চিনে গণিকা, চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের উর্বর বিষণ্ণমুখ মেয়ে যেমন তাঁর নজর এড়ায়নি তেমনি মহুয়ার দেশের স্মৃতিচিত্রণ প্রসঙ্গে রোম্যান্টিক বেদনায়ও তাঁর সমাজচেতন কবিহৃদয় পরিপূর্ণ। কিসের ক্লান্ত দুঃস্বপ্ন থেকে থেকেই নাগরিক জীবনের তৃপ্তির অন্তরায়, যতোদূর তাকানো যায় ইঁটের অরণ্য, পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ। একটি কবিতার অংশ :

> কেন তুমি বাইরে যাও স্তব্ধরাত্রে
> আমাকে একলা ফেলে ?
> কেন তুমি চেয়ে থাকো ভাষাহীন, নিঃশব্দ পাথরের মতো ;
> আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার,
> বাতাসে গাছের পাতা নড়ে,
> আর দেবদারুগাছের পিছনে তারাটি কাঁপে আর কাঁপে ;
> আমাকে কেন ছেড়ে যাও
> মিলনের মুহূর্ত হতে বিরহের স্তব্ধতায় ?

(নিঃশব্দতার ছন্দ)

অপর একটি কবিতার অংশ :

> কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
> এই অন্ধকার আমাকে কি ক'রে ছোঁবে ?
> পাহাড়ের ধুসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
> আমার অন্ধকারে আমি
> নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

(মুক্তি)

নিঃসঙ্গতাবোধের এই অভিব্যক্তি সে সময় বাংলা কবিতায় কেমন যেন নতুন একটি অনুভূতিকে প্রকাশ করেছিল। 'নাগরিক' কবিতাটি গদ্য কবিতা। কিন্তু এমন একটি বাকভঙ্গী ও উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে যা সেই সময় পাঠকচিত্তকে

নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিল। জীবনানন্দ ইতিপূর্বেই আশ্চর্য সফলতা লাভ করে-ছিলেন গদ্যকবিতায়, তাঁর 'নগ্ন নির্জন হাত' 'বিড়াল' 'আদিম দেবতারা' 'হাওয়ার রাত' প্রভৃতি কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ যে নির্ভীক পরীক্ষা করেছিলেন তাতে বাংলা গদ্যকবিতার জগতে এক নতুন সফল বিন্যাসের সূচনা হয়েছিল। সমর সেনের গদ্য কবিতাও সম্পূর্ণরূপে তাঁর একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। তখনকার দিনে, অর্থাৎ তিরিশ দশকের শেষের দিকে, গদ্য কবিতা লেখার তাগিদ যেন কয়েকজন আধুনিক কবি অনুভব করেছিলেন, বুদ্ধদেব বসু এবং অংশত বিষ্ণু দে দৃষ্টান্ত। কিন্তু সমর সেন সদ্য-তরুণ বয়সে যে নিজস্বতা নিয়ে গদ্য কবিতায় দেখা দিয়েছিলেন তা অনভ্যস্ত কাব্যপাঠককেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। 'নাগরিক' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটি এখানে উদ্ধৃত হ'লো :

তবু মাঝে মাঝে মুহূর্তগুলি
আমাদের এই পথ
সোনালী সাপের মতো অতিক্রম করে ,
পাটের কলের উপরে আকাশ তখন
পাথরের মতো কঠিন,
মনে হয় যেন সামনে দেখি—
দুধারে গাছের সবুজ বন্যা,
মাঝখানে গেরুয়া পথ,
দূরে সূর্য অস্ত গেল ;
ভরা চাঁদ এল নদীর উপরে,
চারদিকে অন্ধকার—রাত্রের ঝাপসা গন্ধ,
কিছুক্ষণ পরে হাওয়ার জোয়ার আসবে
দূর সমুদ্রের কোনো দ্বীপ থেকে,
সেখানে নীল জল, ফেনায় ধোঁয়াটে-সবুজ জল,
সেখানে সমস্ত দিন সবুজ সমুদ্রের পরে
লাল সূর্যাস্ত,
আর বলিষ্ঠ মানুষ, স্পন্দমান স্বপ্ন—

(নাগরিক)

এবং অতঃপর সেই সব দিনে, যখন বিশ্বযুদ্ধ অতিমাত্রায় মুখব্যাদন করেছে এবং স্বদেশেও উত্তেজনা ও মনান্তরের কর্কশ কোলাহল সহজ সম্প্রীতির অন্তরায় সেই সময়েই বজ্রের গুরুগুরু প্রতিধ্বনি আধুনিক কবিও নিবিড়ভাবেই অনুভব করেছিলেন :

আজ শুধু মনে হয়,
ক্ষুধিত স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর,

পাথর-কঠিন যুগের যন্ত্রণার
আর পৃথিবীতে পুঞ্জীভূত শতাব্দীর স্তব্ধতার পর
সমুদ্রের শব্দের মতো শেষহীন বজ্রের গুরু গুরু ধ্বনি।

(কয়েকটি দিন)

বস্তুত, সমর সেনের কবিতা পাঠান্তে বিবেচক কাব্যপাঠকের পক্ষে আর যেন রবীন্দ্র-কাব্যের চিত্তহারী আনন্দনিকেতনে ফিরে যাবার উপায় রইলো না। শুধু গদ্য কবিতা বলেই নয় এই নতুন কবিতায় এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল যার প্রকাশ অগ্রণী কবিদের রচনায় তেমন ক'রে দেখা যায় নি। নাগরিক জীবনের ক্লান্তি, হতাশা, ক্ষোভ ছাড়াও সমাজচিন্তার এক সুপরিণত গভীর অনুভূতিতে এই কবিতা উদ্বুদ্ধ এবং সে-কারণেই এই কবিতায় পাঠক মনোযোগী হয়ে পড়েন। খুব সংক্ষিপ্ত বাক্য প্রয়োগে, বাকচাতুর্যে এবং রূপক ও সাংকেতিকতায় অনেক কবিতাই বিকীর্ণ। ইতিহাসের এক বিশেষ অবস্থায়, সমাজচিন্তা এবং জাতীয় জাগরণের নব-উদ্বোধনের মুহূর্তে সমর সেনের কবিতা শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর ক্ষোভ, হতাশা, প্রত্যাশা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে ক্ষীণ আশাবাদের স্মরণীয় দলিল। বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-কালীন ঘটনার পটভূমিকায় এই ক্ষোভ, হতাশা ও প্রত্যাশা সমর সেনের সমকালীন আরো কয়েকজন কবির কবিতাবলীতে পরিস্ফুট হয়েছিল, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মণীন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় যাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে বাংলা কবিতায় অপর একটি ধারাও যুক্ত হয়েছে যাতে রয়েছে সমাজ চেতনার প্রাবল্যের পরিবর্তে লিরিক সুরের, শান্ত রসের গুঞ্জন। অরুণকুমার সরকার নরেশ গুহ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী অরুণ ভট্টাচার্যকে কম-বেশি এই ধারার সঙ্গে যুক্ত করলে বোধ হয় ভুল হবে না।

চল্লিশের যুগের প্রান্তে পৌঁছেই সমর সেন স্তব্ধ। তৎসত্ত্বেও, কিছুকালের জন্যে মধ্যবিত্ত নিদ্রালস সংস্কারপ্রবণ বাঙালি সমাজকে তিনি নাড়া দিতে পেরেছিলেন, তাঁর কবিতা মোহগ্রস্ত, অপমানে অভ্যস্ত ক্ষয়িষ্ণু নির্লিপ্ত শিক্ষিত-সমাজকে, বাংলা কবিতার তরুণতম পাঠকসমাজকে সচকিত ক'রে তুলেছিল। তাঁর স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত গদ্যকবিতার ঋজু, তির্যক গদ্যভঙ্গি এই কবির বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলতে সাহায্যও করেছিল। প্রেমের কবিতায়, রাজনীতিসচেতন কবিতায়—সর্বত্রই তাঁর কাব্যশক্তির প্রকাশভঙ্গি বিশ্বস্ত অনুচরের মতোই তাঁর সহায়। কয়েকটি বিভিন্ন কবিতা থেকে নিচের স্তবক ক'টি এক্ষেত্রে [illegible]র্য।

আমার রক্তে খালি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম,
পার হয়ে এলাম
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসর ;

স্মৃতির দিগন্তে নেমে এল গভীর অন্ধকার,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার হাওয়া এল ধূসর পথ বেয়ে :
রুদ্ধশ্বাস, কত পথ পার হয়ে এলাম, কত মুহূর্ত,
শ্রান্ত হয়ে এল অগণিত কত প্রহরের ক্রন্দন,
তবু আমার রক্তে খালি তোমার স্বর বাজে।

(স্মৃতি)

তুমি যেখানেই যাও,
কোনো চকিত মুহূর্তের নিঃশব্দতায়
হঠাৎ শুনতে পাবে
মৃত্যুর গম্ভীর, অবিরাম পদক্ষেপ।

আর আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় যাবে ?
তুমি যেখানেই যাও
আকাশের মহাশূন্য হতে জুপিটারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি
লেডার শুভ্র বুকে পড়বে।

(তুমি যেখানেই যাও)

যখন ভেবেছি, নতুন মোড় নিলাম,
হাওয়ায় উড়েছে ধুলো,
মনের আহার্যে বসেছে মাছি,
আর আগেকার লজ্জা, ভয়, গর্ব
আর সব ব্যর্থতা নিয়েছে সঙ্গ ;
ঘানিটানা অদৃশ্যলিপি,
দিনশেষে কালের মেহেরবাণী যে মামুলি শান্তি,
তাতে হয়তো শুধু প্রভুদের অধিকার।

আজ আঁধির পর রুদ্ধমুখ আকাশ স্নিগ্ধ হয়ে আসে,
শরীরের খাঁজে নমনীয় অন্ধকার,
চোখে সুর্মা টেনে শৌখিন সন্ধ্যা এল ;
সর্বনাশা যত মেঘ দিগন্তে বন্দী,
এরি মধ্যে পুরাতন অস্বস্তি আমাকে ঘেরে,
দিনশেষের জানোয়ার।

(শবযাত্রা)

ভাষার ব্যঞ্জনায়, শব্দের নতুন নতুন অর্থময়তায়, রূপক ও প্রতীক নির্মাণের ক্ষেত্রে সমর সেনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। তাঁর কবিতার মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই বিষয়ের

বিশেষ উল্লেখ অনিবার্য। যেমন রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তেমনি অনেক বিদেশী কবির কবিতা থেকে ধারকরা স্মরণীয় পংক্তিবিন্যাস তাঁর কবিতায় নতুন আস্বাদ বহন ক'রে এনেছে। কবিতার উত্তরাধিকারের এই ব্যুৎপত্তি (acquirement) সমর সেনের কাব্যরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ববর্তী কবিদের মধ্যে বিষ্ণু দে-র কোনো কোনো কবিতায় অনুরূপ প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। সমর সেনের কবিতায় ক্ষুধিত, 'স্বেদাক্ত মুখের টর্চের লাল আলোর পর' পংক্তিটি এলিয়টের 'After the torch-light red on sweaty faces' পংক্তি-বিন্যাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'উজ্জ্বল, ক্ষুধিত জাগুয়ার যেন এপ্রিলের বসন্ত আজ' খুব সম্ভব এলিয়টের কাব্যপংক্তিরই রকমফের। এছাড়া 'লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ' কতকটা এলিয়টের 'I have lost my sight, smell, hearing' পংক্তির অনুবর্তী। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের কবিতাবলী থেকে বহু সর্বজনবিদিত পংক্তিকে সংগ্রহ ক'রে সম্পূর্ণ ভিন্ন পটভূমিকায় নিজের কবিতায় ব্যবহার করেছেন সমর সেন, বিপরীত কোনো কাব্য-মেজাজ বা অভিপ্রায়কে রূপ দেবার জন্যে। 'সূর্যদেব অস্ত গেল, সূর্যদেব কোন দেশে/এখানে সন্ধ্যা নামল,/শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূয়রের চামড়ার মতো', ('মৃত্যু') কিংবা 'ম্লান হয়ে এলো রুমালে/ইভনিং-ইন-প্যারিসের গন্ধ—হে শহর হে ধূসর শহর!' ('স্বর্গ হতে বিদায়') এবং অন্যত্র 'নাগরিক' নামের কবিতায় 'যদি কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে বসন্ত বাতাসে—স্কুল আর কলেজ হল শেষ, ক্লাইভ স্ট্রীট জনহীন/দশটা-পাঁচটার দীর্ঘশ্বাস গিয়েছে থেমে, সন্ধ্যা নামল :'/ইত্যাদি পংক্তি-সজ্জায় রবীন্দ্রকাব্যের ঐতিহ্য সম্পূর্ণ নিজ প্রয়োজনেই ভিন্নতর সুর ও প্রভাবসৃষ্টির কাজে এই কবি ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর বহু কবিতায় বিশেষ বিশেষ পংক্তিতে ব্যঞ্জনা বা suggestiveness অনুধাবনের বিষয়। যেমন 'অবসন্ন মানুষের শরীরে দেখি ধুলোর কলঙ্ক' কিংবা অন্য একটি পংক্তি 'নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে' অথবা 'স্ফীতোদর দাম্ভিক স্বামীর পিছনে গর্ভবতী সতী সাবিত্রী' এবং অন্যত্র : 'নবাবী আমল শুধু সূর্যাস্তের সোনা'। এছাড়া অন্যান্য কিছু কিছু পংক্তিবিন্যাস, যেমন, 'মনের আহার্যে বসেছে মাছি' 'বুড়ো দিন সোনার কলপ মাথায় লাগায়' ইত্যাদি কাব্যপাঠককে সচকিত ক'রে তোলে। নাগরিক পরিবেশে লালিত হলেও সমর সেনের কবিতায় নিসর্গচেতনা মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। প্রথম যৌবনে নিসর্গবিষয়ক কবিতা পূর্ববর্তী কবিদের অনেকেই লিখেছেন। কোনো কোনো কবির রচনায় তা প্রত্যক্ষভাবেই দেখা দিয়েছে (যেমন, জীবনানন্দ, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু)। আবার অন্যান্য কবিদের হাতে নিসর্গ রূপ পেয়েছে অন্য কোনো ভাবনার অনুষঙ্গরূপে (যেমন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অথবা বিষ্ণু দে)। সমর সেনের নিসর্গচিন্তাও দেখা দিয়েছে অন্য কোনো বক্তব্যের সূত্র ধরে। তাঁর কোনো কোনো কবিতায় নিসর্গবর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও ছবি সৃষ্টির দিক থেকে সার্থক। কয়েকটি দৃষ্টান্ত :

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য,
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।

(মহুয়ার দেশ)

একদা জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর
চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বল জ্বল করছিল বিশাল আকাশ।

(হাওয়ার রাত)

আর সমর সেন লিখলেন :

কোনো নগরে একদিন যেন ছিল
চারদিকে মেখলার মতো শালবনের অন্ধকার,
পাহাড়ের মতো মেঘবর্ণ প্রাসাদ, স্বয়ম্বরা প্রেম ;

(ঘরে বাইরে)

অথবা অন্য একটি কবিতায় :

রক্তিম প্রাণ গ্রীষ্মে কৃষ্ণচূড়া গাছে আসে ;
আজ শহর হতে বহুদূরে, শালবনের পথে
বালুতে অতিক্রান্ত দিনরাত্রির ভগ্নস্তূপ,
বিকেলে কাঁকরে রুক্ষ দিগন্তপ্লাবিত লাল সৌন্দর্য

(কয়েকটি দিন)

ইতিহাসচেতনায় স্পন্দিত, মানবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত জীবনানন্দ অনুভব করেছিলেন : 'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল, মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবেনা সময় ; সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।' এবং অন্যত্র 'মরণের পরপারে বড় অন্ধকার। এইসব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।' অথচ মাটি-পৃথিবীর টানে মানব জন্মের ঘরে যখন আসতে হয় তখন : 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়—শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'। সমর সেনের কবিতায় এরকম গভীরতর উপলব্ধি অনুপস্থিত কেননা তিনি শুধুই জেনেছিলেন 'বর্তমানে মুক্তকচ্ছ, ভবিষ্যৎ হোঁচটে ভরা'। অথবা 'সড়কের কলরোল, নতুন শিশুর কান্না, চিরকাল বেলাভূমির সমুদ্রের শেষহীন সঙ্গম'। যুদ্ধকালীন পৃথিবীর রক্ত-ক্ষয়কারী পরিবেশে, ক্ষুধা ও অতৃপ্তির আবর্তে জীবনানন্দ অগ্রগতির পথ অনুধাবন

করবার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর মনে জেগেছিল গভীরতর জিজ্ঞাসা যা তাঁর কবিতার ভাষাকেও যেন ক্রমশই রূপান্তরিত করেছিল। সমর সেনের মতো তিনিও মানুষের হৃদয়কে পাননি, দেখলেন স্বার্থসর্বস্ব অগভীর মানুষের সমাবেশ। কিন্তু জীবনানন্দের অভিজ্ঞতার জগৎ বহু-বিস্তৃত; মানুষের প্রকৃত মহিমায় তিনি আশ্বস্ত; 'নবনব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন' ইতিহাস ভুবনে নবীনতা ও মানবিক জাতীয় মিলনের উদ্বোধন করতে থাকে। 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয়; জয় অস্তসূর্য জয়, অলখ অরুণোদয় জয়" ('সময়ের কাছে')। সমর সেনের কবি-কল্পনা এতোটা অগ্রসর হতে পারেনি। কতকগুলো তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত অনেক সময়ই তাঁর কবিতাকে দূরদৃষ্টি থেকে চ্যুত করেছে। অথচ তাঁর বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত, অল্প দু'চার কথায় শহর বা গ্রাম যেখানকার চিত্রই তিনি এঁকেছেন তা ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপমিশ্রিত হলেও চিত্তাকর্ষক।

বিচিন্তা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৫

ইংরাজি রচনা

SELECTED POEMS OF SAMAR SEN

January, 1937

Past days haunt the present.
Remember
The barren years left in the darkness behind,
Remember the innumerable famines
That answered the yearnings of time,
Sick with hunger keen as the hissing sounds
Of a snake. In all this distraction of traffic
And tobacco-perfumes and
The enchantment of soft breasts
Do not forget the grey fields,
The howling deserts and the hard skeletons
Behind and in front of you.

An Evening Air

I go out in the grey evening
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

I go out into the hard loneliness of the barren field
in the grey evening
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

In the gathering darkness a long, swift train suddenly
Passes me like black lightning.
Hard and ponderous and loud are the wheels
As ponderous as the darkness, and as beautiful.

I look on, enchanted, and listen to the sounds of lamentation
In the soft, fragrant air.
The long rails, grey-dark, smooth as a serpent, shiver, and
A soft, low thing cries out in the distance,
But the sounds are hard and heavy,
In the air the odour of flowers and the sounds of lamentation.

The March of Time

"Do you ever hear the March of Time ?"

At nightfall, wailing sounds come from the grey sea, and on
The horizon the steel-grey sky thickens. Then in the
Sleepless darkness I hear the tired footsteps of a buffalo
On a street of hard steel, under the blazing mid-day sun.

Spring

Spring thunders over a mountain I cannot see.

Today, at the year's end, I stand on the border of the
yellow desert.
And with tired eyes look forward to *green flames* of corn
on a distant field.

The Last Ditch

Let us count our coins in this last ditch,
Let us catch something in the flood-waters
With the torn nets of our time.

Fields are flooded by rain water,
Yet the bright, green trees struggle to the top and breathe.
Afternoon light descends, bright gold to the eye,
And each day deathless beauty deepens in the clouds.

No Escape

Harsh light fills the afternoon world.
Scared crows are winging their way homewards,
Autumn is imminent,
And death stalks.

A solitary banyan stands
Like an ancestral ghost.

Carve my name on the rocks,
Write my name on the waters.
My frantic heart seeks solitude —
The immensities of Tibetan solitude.

Dusk falls,
The bloodless face of the day is masked in dimness.
The hills darkly brood
As a thin mist spreads over the Santhal village,
And the crows duped by the false dawn
Caw and caw till all sound
Is merged in Time.

The Land Of Mahuas

1

Sometimes the indolent sun
Paints on evening waters
Columns of light, bright as molten gold,
And fire spreads through the darkening foam.
The writhing breath of smoke
Hovers round that luminous stillness
Like a winter nightmare.

Far, far from here is the cloud-cool land of mahuas.
There the tall deodars
Shed all the time their mysteries on the roads.
The breath of the distant sea
Stirs the loneliness of the nights.
I wish the mahuas would fall on my weariness,
And their smell cover me.

2

Here in the deep, intolerable darkness
At times I hear
The ponderous sound of coal-mines.

Green and dew-wet is the morning
When I see
The disgrace of dust on the tired
Bodies of men.
What dim nightmare haunts their sleepless eyes ?

New Year Resolution

Winter. Snow covers the distant mountain. Thick fog in the town, the grand soiree is over and I return homewards. Here and there at street corners beggers light small fires with straw-heaps, and bake their evening bread. Where are the cottages ? A vast emptiness overhead, the northern wind sings fatal dirges.

And afterwards, what a terrible summer ! Masses of roses bloom and wither, genteel to the sight indeed. Happiness is scarce, but the days get long, and agonizing like an incurable sore. Gone are the times of feast ; around penniless, paralytic beggars hover the flies of memory.

The go-betweens die out. The starved unemployed, the worker and the beggar multiply as the days pass by. Files of red-faced soldiers march towards the wide gates of hell. What is this journey for, from one day to another, from one death to another ? What is the end of it ? A harrowing pestilence, a deathless hell ?

The sultry sky speaks after a long silence : Brave inheritors of ancestral selfishness, listen ! With what last straw will you build your homes now that an elemental flood sweeps across your world ? Tell me, who will light the spark of wisdom in this all-conquering darkness ?

Never to lose the sanctity of the individual self, is still the sustaining pride of the intellectuals. They do not dare disturb the universe. Worried spectators, perhaps they realise that business is low, dark is the bazaar, a sable silence reigns in the streets,

the saints have all taken to flight and night birds caper in the empty ways.

I return home, light a candle and ponder. Other darknesses gather in this darkness. At this turning point of time where should I anchor my boat ? Blue eyes and firm breasts and the darkness of the thighs—but no, I have lost faith in the paradise of the senses, I know that poison begets poison, that the uncontrollable unworried bodily urge, because it leads to a new birth, repeats the cycle of birth and desire and death. What after all, are the body's raptures worth, if we do not strive for, and create, a new world ?

I have tried many ports in the storm and now I realise that where the people are there the sun of a new consciousness is born, another tide sets in the muddy waters of time, the many cross and recross the flood, while deep in the waters sinks the corpse of the one, the individual.

—*translated by* Samar Sen

The Intellectual

'The nomadic clouds came to port on the hills
And on our ship came
The terrible storm from the impending mountain.'

No peace
The sun of plenty scatters a nightmare of poverty through the slum.
Old time
Has brought, through life's decay, the pain of age.
The silent vulture of nightmare
Flaps above the sodden body at midnight,
And the tuberculous lust burns on through barren days.

Therefore I muse upon the complete history of my ruin
Unnerved, like the blind Dhritarashtra,

And wail in futile delirium ;
We have no escape, no chance of victory.
The educated mind, impotent, suffers the putrefaction of decay,
Searches always at the root of all futility
Under the curse of sex-starved Urbashi.

Though high above this plot of earth
The purifying sky blots out the darkness
Yet to me the path of nights and depths alone is true ;
Barren earth, cruel horizon.

The terrible storm came from the threatening mountain—
The foreign sailor fumbles now in hell.

—*translated by* Martin Kirkman

Aftermath

In the next room a girl
Is droning a lullaby
Like leaves abandoned in the wind.
And in the dark forest of the skies
A red flame leaps and drops.

Storm before rain, flood after rain ;
And when the rains have swept away homes in hundreds,
Mute beasts and muted men,
And the Famine Relief Society, themselves famished,
Have filled the city streets with whining,
Then, O lily of love, will you
Return to conjugal concupiscence ?
O wan woman, flower love, is there
Any delight in love ? any joy in bearing children ?

1900

This is the end of the sea.
And the wild dark flaps its wings
Like flying birds :
This is the end of the sea.
Deer roam no more in forests,
The green birds have all died,
And in cold grey caves of the hills
The wild dark flaps its wings
Like flying snakes.
This is the end of the sea.
And in dim moonlight
Gleam the waste sands of Time.

– *translated by* Buddhadeva Bose

EDWARD THOMPSON

A LAND MADE FOR POETRY
NEW INDIA'S HOPES AND FEARS

...*Parichaya* now has a companion periodical, *Kavita* (Poetry), for verse only. Its first number sets itself with equal distinctness apart from the mass of traditional verse still being produced, the numerous books entitled 'Flower-garlands', 'A chaplet of pearls', or (more briefly) just 'Mother'. Its opening poem, by Premendra Mitra, well known already as a novelist, contrasts the mechanical universe, 'this dance of electrons', with the vivid and variegated show of illusions in which it reaches our senses. Another poem, by Mr Samar Sen, has for title Mr Ezra Pound's 'Amor stands upon you' :

> Where'er you go,
> In stillness of some startled moment know !
> Your breath will catch, to hear, with sudden dread,
> Of Death the muffled, undelaying tread !
>
> Leaving my side, you hope to go—ah, where ?
> Where'er you fare—
> On Leda's shining breast, from Heaven's expanse,
> Falls Jupiter's keen glance !

Ezra Pound, T. S. Eliot—another name that casts its shadow on these young Hindu poets is that of D. H. Lawrence. These influences are not solely emancipation. The *Parichay* poets are in danger of picking up an appearance of imitation and tricks and mannerisms—Mr Eliot's habit of repetition as an incantation is growing on them. Sometimes the old and traditional reassert themselves alongside the new, as when Mr Sen seems to mingle Lawrence's passionate earthiness and violence of imagery with the night of warm drowsy fragrances :

> The Dark came like a beast of prey. The burning
> sky of the west reddened like an oleander blossom.
> That darkness brought to the earth the
> scent of *Ketaki* flowers, and to the

eyes of some the languorous dreams of
night. That darkness lit the trembling
flame of desire in a girl's soft body.

* * *

Bengal is a land made for poetry, in its double simplicities—its two Bengals, that of the Ganges, immense and legendary, and that of the *Sāl*-forested uplands. Its people live with the sense of boundless horizons ; the word *diganta*, which may usually be translated 'horizon', is rarely long away from Bengali poetry. It is a word which almost seems to spring of itself, in that country of white skies preparing for the sun's precipitate setting, and of vast sandy river-beds and rolling plains and fields. Dawn comes with a shout and upleaping, and dusk falls almost with a downward plunge. "Darkness", writes Mr Sen, in a characteristic passage, "descended on memory's horizon, and a wind of forgetting rushed in along the dusty pathways."...

[An excerpt]
Times Literary Supplement, Saturday Feb 1, 1936

DHURJATI MUKHERJI

A MODERN POET, BUT NOT PROGRESSIVE

[*Kayekti Kabita* (Some Bengali Prose-poems), by Samar Sen, Pub. by the Author from Sagar Manna Rd. Behala Rs 1-4 as.]

When the first issue of the *Kabita* was published, the short pieces by Samar Sen occupied my attention by a kind of natural right. The editor had asked my opinion on the volume and I at once pointed out my favourite pieces, which were mostly by this writer. Since then many other poems of his have seen the light of print in the *Kabita* and the *Parichay*, and attracted a discriminating set of readers. We, too, have formed a small Poetry-cell at Lucknow where we make it a point to read and re-read Samar Sen. Naturally, I am glad to find his poems in one volume. It will be by my side to be dipped into when problems of social and economic theory cease to interest me and leave me lonely. By the way, our author received his meed of praise from the editorial pages of the Times Literary Supplement. But that is neither here nor there. The information is for those who care for it.

The notable facts about these pieces are : (1) They are *prose-poems*. Tagore had loosened many a knot of syllables, but that of metres has been his latest, and in the opinion of many, the most creatively revolutionary. I share this opinion, with an important caveat. A distinction has to be made between changes which are purely technical and those which are prompted by novel contents. Most of our prose-poems belong to the former class. They are clever and interesting, when they are successful. A few, like Samar Sen's belong to the latter, and as such, register a step ahead. When they attain a structural unity and establish an easy correspondence between the idea and the deed they become beautiful modern poems. I wish I could say the same about the recent endeavours of numerous other prose-poets. Inverted prose is not a prose-poem.

The second fact about Samar Sen's pieces is the newness of their mood and content. The newness is only comparative because

it is fairly old by now in Europe. In the post-war period of Europe, a dejection descended upon all refined minds. It was soon lifted by faith, which was either in the Marxist millennium or the ancient Christian one. Of late, the first has proved to be more active than the second, for the simple reason that the Christian call to action tends to degenerate into sentimental humanism, whereas the Socialist programme always keeps its believers on the alert. In other words, Socialism can explain away religiosity in terms of fatalism that is bred by misery, but Christianity leaves poverty and chronic distress unaccounted for. Thus it is that there is an unbridgeable gulf between the poems of Eliot and of Auden. How much wider the distance between the optimism of Tagore and even the mild cynicism of Jatin Sen, the righteous indignation of Sudhindra Dutta, the humanistic non-conformity of Premen Mitra, and the quiet denial of Samar Sen of all the good things of the earth, its milk and honey, its *Vaisnavite* sacharene [Sic] and its Upanishadic *anandam* in abstraction ! Samar Sen's contents are urban, and his mood *fin de siecle.* The city has destroyed all that has been taught to be beautiful. It is an inchoate mass reeking with patchouli and petrol. It has ignored humanity and generated snobbishness. Almost a cancer, a monster, a python, a passionate tiger. Nevertheless, it is a fact, which exacts no tribute of tears from the poet. The fact of ugliness, the reality of the sordidness is so typically up-to-date.

Yet, is Samar Sen truly creative ? I don't think so. No poet can be creative unless he is basically charged with the sense of history, with the dynamics of creation. I do believe that in Bengal today, the litterateur has a definitely creative social role to play through his pen. It cannot be done if he gets stuck at the recognition of a fact, that is, if he does not change it into an event, by which, I mean its double potentiality of destroying the past mood and building up the progressively new. My conclusion about Samar Sen is that he is a comparatively modern poet without being progressive. He has dedicated his first work to Muzaffar Ahmad. I pray that it should mean something more

than a mere personal allegiance. The cult of futility may just as well lead to the worst form of poetic disorder, viz., prettiness. But Samar Sen is young.

Within these limits the third fact about Samar Sen's work is to be placed. It relates to his style. Brevity is its soul. The rigid economy of expression makes the reader feel that at least the best pieces have sprung complete by a single spontaneous effort of imagination. The brush-strokes are broad and need no repetition. With less obtrusion of the poet's personal attitude, the poems would be Japanese. The longer pieces are unequal and invertebrate.

Naturally, with such equipment, one would expect images and symbols from Sen's poems. They are there. Yet nobody would call Samar Sen an imagist or a symbolist. Samar Sen does not dive deep into the subconscious to collect them. They rather belong to his fore-conscious. As such they are neither varied nor suggestive of unplumbed bottoms. Some are happy no doubt. Yet they recur too often. The danger of monotony is ever present.

To-dây, therefore, Samar Sen is an up-to-date representative poet. He needs to be progressive by informing himself with a sense of history. He has also yet to be symbolic. Still there is no doubt of his being a poet of a particular genre.

Amrita Bazar Patrika, June 13, 1937

SAMAR SEN

IN DEFENCE OF THE 'DECADENTS'

Certain critics point out with a sneer that 'Progress' is a Victorian word. Perhaps they are right : the Victorian belief in progress was based upon security and a rising level of production. Forebodings and uneasy apprehensions shadowed the late-Victorian period, because it was an age of finance unlike the early Victorian age of production. The relation between production and distribution is far less apparent in our age of finance, hence the sense of frustration marking the closing years of the last century. To the sceptical critics of progress it may be pointed out that though the present century has widened the gap between productive forces and social relations and to a certain extent justifies their enlightened scepticism, the latest powers of world prodution still permit a rational belief in progress. We find that the production power of man has still immense possibilities. So we are still for progress. It is not desirable in our day to reaffirm the medieval conception of human life, to declare that man's fate is inevitably tragic and all notions of progress an illusion. To assert this under the painful pressure of circumstances is a subterfuge, a means to shrink responsibility.

It is rather easy to talk about our belief in progress with reference to past history. But the moment we come to consider the present, to define the meaning of the progressive movement in literature, we seem to be in a melting pot, and confused voices of lamentation, denunciation and warning strike the ear. The modern Bengali poet is between two fires. If he tries to be honest with regard to the vices of his own class and voices his sense of decay, he falls under, and is found guilty of the charges of obscenity and obscurity. The eternal principles of art, he is told, are beauty and truth, truth and beauty, to deny which is bad taste, a perversion. On the other hand he is told from the progressive quarter, which emphasizes his defeatism and obscurity, that he is a decadent and damned petty bourgeois. The damning is thus complete. He then thinks of perhaps a dozen

or so of his admirers and continues to use a medium of expression whose beauties commend themselves only to the dozen or so, with confusing results both for the moralist and the progressive critic. A gentleman, sceptical of the progressive demands on poetry, when politely told that he was a decadent bourgeois, retorted : "you can call me a swine if you like, but I am what I am."

It is certainly time to clear up a host of misunderstandings. A really progressive critic will be a great force today. But a certain notion is gaining ground, fanned by some of the progressives and by the newspapers which have their own sentimental ideas about literature, that to be progressive means to write about mazdoors and kisans in a broad, sentimental vein, to depict all the glories of a possible proletarian revolution and to do all these in a way which would be understood by the man in the street. Away with defeatism and all bourgeois subtleties of expression ! Nothing is more important than direct propaganda. It may be that the results will be slightly disappointing for some time, but all will be well in the future society.

The progressive who proceeds in this manner is not an objective critic. He is a sentimental humanist. We must not forget in our new-born enthusiasm for the cause that literature has a tradition of its own and that there are many invisible gaps between the economic basis and the cultural superstructure. If we consider the changes effected in Bengali poetry in the last fifteen years we must admit that it has definitely 'progressed'. The best of it has almost got clear of that sickening vice bequeathed by the Tagorean tradition—sentimentalism. It has improved and made considerable changes in technique. From a loose and ineffective language to a highly polished and flexible one, from a mere turning loose of emotion to a consciousness of the disruptive forces threatening society,—these are considerable achievements. To sacrifice all these in order to widen the appeal and rouse the people by direct propaganda will be a dangerous sacrifice. It will mean a swing backward in literary tradition and will revive the sentimental age in a

changed garb. Such demands on poetry, backed by the news-papers and the progressives, will have dangerous consequences for the rising generation, which has every chance of being taken in by these easy methods of cheap and quick popularity. The critic who asks for such a literary change in the name of progress, we repeat, is at best a sentimental humanist.

What can be achieved if, in the immediate present, the Bengali poet tries to widen his appeal ? Mass-appeal is indeed a tremendous thing. It can at least help to fill up the empty pockets of the unfortunate writers. But how do the masses come in ? The vast majority of them is illiterate. The reading section consists entirely of the middle classes. To appeal to them is to pander to the tastes of a demoralised class, to turn poetry into simple wish-fulfilment. Consider the plight of the Indian film industry and the Radio, both of which are middle-class and popular. If the middle class had any vitality left it would have at least created something significant during and after the Civil Disobedience movement. But nothing of that kind happened, because at this late hour in history the colonial bourgeoisie has no life at all. With huge and vital sections of our population illiterate and dim in the background, we cannot really hope to effect a revolution with our writings. That would be putting the cart before the horse. We can at present only soliloquise, we cannot address the real audience.

To be really progressive in our time and in our country, where only a fraction is literate, is to preserve the integrity of what is good in our past tradition, to be true to oneself and at the same time to realise that poetry is a medium through which the individual tries to adjust his relations to society, to be conscious of the complex forces which are changing our world. To be able to preserve one's personal integrity as a poet will help the progressive cause in the long run. People consider Hopkins and Eliot to be among the real pioneers of modern English poetry. And it will not be superfluous to remind that Eliot is often condemned for his obscurity, and is the one poet who is convinced to his bones of the decay of all civilisation. In these times of

dereliction and dismay, of wars, unemployment and revolutions, the decayed side of things attracts us most. The boredom and the horror, rather than glory of life, is our immediate reality. Perhaps that is because we have our roots deep in the demoralised petty bourgeoisie and lack the vitality of a rising class. It is best to admit this and write about the class you know well than to exult in the future glories of a class-less society. Consciousness of decay is also power. We believe that mankind will undergo a far-reaching transformation in a class-less society, that only in a changed social order, politically free, and based on emancipation and equality of the peasant and the worker, will it again be possible to establish the vital links between literature and the people which have snapped, but at present we find ourselves unable to translate that belief into good poetry. We cannot do that unless we act. In the meantime we draw a distinction between the poetry of revolutionary struggle and the poetry of revolution as a literary fashion.

Consciousness of decay is certainly a power. But a critical situation arises when we find that at a certain stage this also is not enough even from the point of view of poetic integrity. We will reach that stage very soon, and we must make a choice if we are to continue as living writers. This involves an entire reconstruction of our ways of living. An active part in the mass-movement will certainly help that poet who has been able to preserve his integrity. He will be able best to combine literary tradition with social content and will act as a releasing force. He will then perhaps cease to soliloquise and will begin to be representative. Such a reconstruction of living is not an easy job for the present generation of Bengali poets, most of them settled in life and approaching the critical age of thirty. It would have been easier with the Congress out of office, and an active body in the anti-imperialist front. But now the problem is infinitely more complex in an atmosphere thick with sheepish pacifist slogans of truth and non-violence and all the accumulated rubbish of an out-of-date, constitutional nationalism. But no task is too difficult when it is a vital affair. If the modern

Bengali writer fails to make this difficult choice, we can take leave of him and ask him not to mourn any longer for the decay of society but rather to mourn for himself.

New Indian Literature, 1939

DEBIPRASAD CHATTOPADHYAYA

MODERN BENGALI POETRY

...The temporary revival of Western Capitalism cracked in the thirties and the entire foundation of the present social system seemed to tremble. The reaction of the crisis in the West in time came to India. The poets were bound to feel depressed. The older anti-Tagore group wanted to kill boredom in romantic escapism and Sudhindra Nath Dutta and Bishnu Dey formed a very small coterie round *Parichay*, the cultural quarterly which was their organ, comparable to that of Mallarme and his symbolists, and went on writing self-conscious poetry.

But the prospect in either direction was encouraging. Escapism in a desert atmosphere had only the mirage to live upon ; and esoteric poetry, like Valery's snake trying to feed upon itself, could not live either. Two facts seem to substantiate this remark : Premendra Mitra and Sudhindra Nath Dutta, the two eminent poets of the two groups, ultimately got disgusted and practically gave up writing poetry.

What, then was to be done ? That was the problem of the younger generation. Fortunately, however, something really refreshing, something really inspiring came to them—Marxism.

It came to Bengal, sometime before this no doubt, and even then it was taking shape in the sphere of practice in the form of an infant political party. But the political history of Marxism from 1929 to 1935 was not so encouraging as to rouse inspiration in the poets. For up to 1935 Marxism was a sort of a private cult theoretically discussed in a rather private coterie of a few young enthusiasts ! The practical application of Marx's doctrine to the concrete political context of the country was properly attempted only in about 1935 when these young Marxists raised the slogan of United Front and laid the foundation of the Communist Party of India. Indian Marxism outgrew its infancy and acquired reality. It took a few more years for the poets to absorb this new idea and respond to it emotionally. But things were moving fast. Calcutta witnessed the Progres-

sive writers Conference in 1938, an event which however insignificant it might have been to established writers, had tremendous emotional significance for the youngest poets. Things were moving fast. Marxist books were smuggled, read and discussed by the new generation. Poems of Auden, Spender, Day Lewis were hailed not so much for their poetic excellence but because of their Marxist possibilities. All these, aided by the historical tendency itself, encouraged a few young poets to experiment in a new line. The names of Samar Sen and Subhas Mukherji are specially to be mentioned here. Both are remarkably fresh and remarkably young, Sen born in 1916 and Subhas in 1920. Samar Sen is essentially an intellectual and Subhas over-enthusiastic, direct and without vacillation. Thus Samar Sen thought of the pros and cons, of the prospects as well as the difficulties of a new world, appealed to history and dreamt of the new order amidst the delirious vulgarities of his environment. Subhas had a robust imagination, he was straight-forward and had little doubt. Both of them were keenly satirical of the present position but Samar Sen neither sings of the proletarian victory nor proposes an immediate May Day march. Doubt and vacillation, the characteristics of middle-class intelligentsia, seemed to obsess him throughout. This does not mean that Subhas was deliberately false. With his vitality, his fresh vigour and his youthfulness, he seemed to be carried away by the prospects of a new world. Vacillation was out of the question. Victory was certain. "History is on our side."

But how about that problem—the problem of demolishing decisively the pseudo-Tagorite type of poetry ? New ideas alone cannot achieve it. It must be a total change of outlook, which includes within itself a revolution in form as well. Samar Sen therefore took up writing poems in prose. He is by no means the pioneer of this technique but he has used it in most effective manner......

[An excerpt]
Marxist Miscellany, Vol V, 1945

BUDDHADEVA BOSE

AN ACRE OF GREEN GRASS

A Review of Modern Bengali Literature, 1948

...Samar Sen is our only poet who has written only prose poems and no verse at all. His first (and still his finest) batch of poems, coming on the heels of *Punaścha*, revealed a new norm of the prose poem, which, by itself, was an achievement for one so young. They are little lyrics, pale, frail and wistful ; flowers of youth, or buds of adolescence, but not raw fruits of immaturity. And like all young and tender things, they have, under a vulnerable appearance, an inner and insidious strength that is hard to define or resist. In later years, he has been much inclined to make current politics his theme, ably demonstrating the essential incompatibility of poetry and politics. His output is meagre, his speech thin-lipped ; he lacks fervour, he does not take himself seriously enough. But the early lyrics are unaffected by the weaknesses of the poet whom, I venture to hope, they will continue to celebrate. Here is one typical passage :

> The Dark came like a beast of prey...
> ...That darkness lit the trembling flame
> of desire in a girl's soft body.
> [quoted from the T.L.S. February 1, 1936]

Bishnu Dey, Samar Sen's elder, and much more gifted and versatile a poet, was immediately persuaded by this young poet to adopt the prose poem and begin to take an interest in Marxian thought. That these two have admired and influenced one another has yielded happier results to the elder than the younger...

[An excerpt]

SYAMALENDU BANERJEE

REBEL WITHOUT A PAUSE

Poet, journalist, a political firebrand, Samar Sen at 67 has wrapped himself in a cocoon of reticence. He refuses to grant an interview to anyone, even to those who are very close to him. A few hours in the offices of *Frontier* in the morning and the rest of the day he stays at home, except for an evening stroll for a short while perhaps. A situation he had described himself in heady youth in these lines :

The triumphal march of life has ceased for one
who lives within the confines of a shuttered room ;

Try as he may, however, it is not entirely possible for him to be a recluse. 15C Swinhoe Street or the *Frontier* office tucked away in an alley off the noisy Lenin Sarani are still frequented by eminent visitors from abroad, not all of them ultra-Left. Tariq Ali called on him. So did Ved Mehta years ago and the meeting has been mentioned briefly in his *Portrait Of India.*

Samar Sen shuns publicity. But the emaciated ascetic face of the man has been captured by the polaroid cameras of many American intellectuals.

It is not difficult to understand why Samar Sen does not want to be interviewed. He presents a picture of sadness—not the kind of '*ceaseless unquiet sadness*' which he had attributed to the night, the darkness of which approaches like a ferocious beast. His sadness is the mellow fruitlessness of advanced age, an unpleasant recognition of the futility of things. I have often wondered how he would have tackled or evaded questions if he did grant an interview. Two themes would have reared their heads throughout. Illness, sheer physical illness. Samar Sen was in hospital for many months last year. He has accepted some family tragedies with philosophic detachment. But behind the smokescreen of illness, a small, niggling little question would have come up. About India or West Bengal for that matter, he might say very much the same thing that Auden wrote about

England : "What do you think about England, this country of ours where nobody is well ?"

Plucking at the grey hair thinning at the temples, he would say very hesitantly that there was nothing to be done in a state where the Left forces formed the establishment and where any note of dissent was construed as collaborationism with the Indira Congress. One might infuse some life into what he might cynically describe as a living corpse by saying that there was still a flicker of hope. Whereas the big fat glossy magazines of big business come and go, *Frontier* with hardly any advertising support to speak of, has not only survived a series of economic crises but also official wrath, and can be seen in the news stands all over the city.

Samar Sen, one is told, is now worried about money matters. No inconsistency with the philosophy enshrined in his garbling of Chandidas's famous line which reads :

'Above everything else is money and nothing beyond that' in a poem subtitled *For thine is the kingdom.* But one finds it somewhat saddening because in real life he had uncompromisingly spurned offers of the keys to that kingdom. His resignation from the post of Joint Editor of *Hindustan Standard* over the question of playing up the communal issue, his severance with *Now*—entirely his brainchild with the patron Humayun Kabir biding his time to get rid of this no-nonsense journalist, his stewardship of *Frontier* where he has imposed pay-cuts on himself time and again, his *sangfroid* when the magazine had to close down during the emergency, ("It gave me the opportunity to see the Ritwik Ghatak retrospective," he writes nonchalantly in his autobiographical piece called *Babu Brittanta*)—all this made him a legend, a crusader, however ineffectual, against modern money-dominated society. Things must be really bad if Samar Sen's tristesse is even partly due to the shadow of a fast-dwindling bank balance.

It is perfectly understandable that on the international questions, this one-time engagé journalist should like to preserve total taciturnity. A poet who wrote, *'When the roll of tanks*

cease, tractors move across the barren soil, comes Joseph Stalin' must have been sadly disappointed when he went to the Soviet Union for a few years as a translator only to find that his hero had been dislodged from his pedestal. After de-Stalinisation, the revolution in Soviet Russia became pot-bellied, he used to write in disillusionment. It is ironic that a staunch Stalinist quoted Trotsky in his *Babu Brittanta*—"There is no Pravda (truth) in Izvestia (news), there is no Izvestia in Pravda." In the sixties, he still had an unwavering faith in Mao's China and the heroic struggle in the swamps to Vietnam. But what now ? Mao is dead and gone, Nixon set foot in Peking in the seventies and today Beijing is saying *O la' la'* to Pierre Cardin.

...I suppose one would have then steered him on to the tricky subject of Bengali literature. His reply would doubtless be evasive, his pleading guilty to being unfamiliar with the peaks and troughs of contemporary writing. But as late as 1978 when he published *Babu Brittanta*, he regretted that Bengali literature had of late accumulated a great deal of rubbish. Incidentally, he wrote a piece captioned *Bande Mataram* in 1972, which appears to have anticipated the major debate in 1982, the centenary year of the novel *Ananda Math* and it is not hard to guess which side he was on.

I was of course familiar with some of Samar Sen's poetry even in my college days, years before I first met him. The sadness of old age had its incipience in his early poetry, his abhorrence of mercantile and industrial Calcutta, his wistful longing for the simple charm of mohua trees in the Santhal Parganas, his compassion for the tired woman who finds mysterious happiness in love and bearing children as also for the groups of unhappy women who gather near the bank of the Ganga at the crack of dawn. His earlier poems which in translation sound very Audenesque though he says it was Eliot who influenced him most, breathe the fragrance of romance. Consider these lines :

I remember
lazy passion in lovely eyes,

near-barren heart
other than occasional pride
and sensual intelligence that brought beauty to a sudden poise,
at times. Lines like these ring a bell, don't they ?
Here
a massive bridge stands
amidst the hint of imminent danger solitary
living in the country of the dead indestructible.

One is almost inclined to add "*Christopher.*" Unfortunately, this basically romantic soul was enslaved in his latter day poetry by Marx, Engels and Stalin. No wonder the stream soon went dry.

But the man was still very much a vital, dynamic force. Even his dissipation had about it an air of detachment. At the same time young writers or would-be writers could get away with murder in his Swinhoe Street home causing Sulekha Sen, his wife, considerable embarrassment. He had abandoned poetry but not the poets. I first met him at Olympia, a bar which was in those days frequented by journalists and creative writers who had started realising that the old spark was dying out. I was then quite young, twenty years younger but he sort of took me under his wing straightaway. I was job-hunting and my interest was very much journalism-oriented. It did not take him long to make me an offer. He wanted me to be his assistant on *Hindustan Standard* of which he was then Joint Editor. I even got the seal of approval from the late Ashok Sarkar who then ran the *Ananda Bazar* empire. But for some reason, I eventually did not take the job—I was then going through all kinds of mental stresses and strains which a lot of young men in their twenties experience. Anyway, it was through him and another friend of mine that I got to know a number of celebrities of yesteryear—Sunil Janah, the photographer who was considered by V. S. Naipaul to be one of the two geniuses he had met in this area of darkness, the other one being Satyajit Ray of course, Niranjan Majumder, Amalendu Das Gupta who is now editor of the Calcutta *Statesman.* They all accepted me as a good

companion, if not exactly a friend, despite the age-gap and we had a fun time as youngsters say nowadays, the murkier details of which had better remain unrelated.

But it was not all beer and skittles as I came to realise when I worked under him as assistant editor of *Now*. He taught me the basic principles of subbing—how to turn a seemingly unprintable piece into decent copy with the minimum of corrections. And he taught me the importance of being not only earnest but also dynamic. When I say he taught me these things, I do not mean that I learnt them fast. In fact, I proved a great disappointment to him and he occasionally showed it in a somewhat petulant manner. I remember that I had failed to return to work one Christmas eve after a somewhat Bachhanalian lunch. When I turned up the next morning I found a note on my desk saying that I could take Christmas day off too. But occasional tantrums soon evaporated and his affection returned. However, the principles that he taught me sunk in through layers of my delinquency and stood me in good stead when I became an older and perhaps more responsible person.

One thing about him struck me as rather odd. Perhaps because his early training was not at a reporter's desk but in the newsroom, he used to write his acid editorials by hand and never used a typewriter himself, though he could type just as well as any other leader writer. The supreme effortlessness with which he turned out headings took my breath away. Once I was wrestling with a heading. He called me over, took a quick look at the text and scribbled "The man who went away." Another heading of his which caused great leader writers to sit up was "The Moon and Sixpence"—the editorial being about the folly of spending billions of dollars on man's race for the moon in a world where most people starved.

The same man who in the office could be angry, sarcastic and painfully rude would be a different man in the evening, mellowed by a glass of rum and pleasant company. He could sometimes be offensive even on such occasions, especially if he had had one too many but he never meant any harm. With

disarming candour, he could laugh at himself as the publication of the following letter from Sobha Janah, Sunil Janah's beautiful wife, bears out :

For
Smar, the Albino Rat,
Arsenic Oxide.........102
To take liberally, preferably with potent alcoholic beverages till extinction is effected.
Patient to report to doctor this evening at 7 pm

SJ
11.1.55
(Babu Brittanta)

Happy days. Alas I had to use the past tense for while Samar Sen is very much there and would hopefully be so for years to come, meeting him in such a relaxed atmosphere is no longer possible. Yet '*the solitary banyan provides diffident shade*' and I know it.

Illustrated Weekly of India, January 15, 1984

AMITAVA MUKHERJEE

THE SAMUEL JOHNSON OF MODERN INDIA

About ten years ago, wellknown writer Mary McCarthy, while talking to me, had confessed she was groping for a suitable epithet that would describe Samar Sen. Till then, McCarthy had not come across *Frontier*, which Sen had been editing since 1969.

But *Now*, Sen's earlier journal, which McCarthy had read and made her ready reference to India, had left a deep impression on her mind. "I do not really know how I can describe Sen, whom I have been trying to know for several years through his writings. A poet, journalist, literary critic all rolled into one. Perhaps he is the Samuel Johnson of modern India," McCarthy had exclaimed.

The 70-year-old Sen, who has been ill for some months, is a veteran journalist. For 17 years, he has been commanding *Frontier*, the flagship of progressive and 'unshackled' journalism in the country. During these years, the weekly has gained both in stature and circulation if not in money. Born amidst the euphoria of the surging leftist movement in West Bengal during the late 1960s or to be more precise, their electoral success, *Frontier* has, of late clearly moved away from the ruling left in the state and earned their ire. Sen has now become a virulent critic of 'post-1977 revisionism.'

But is *Frontier* really professing 'ultra-leftism,' as it is accused of doing by the Left Front ? Or has it turned pro-Naxalite ? 'We can only say that over the last couple of years, we have not been able to live up to that reputation. This is because we have not been able to retain the former group of writers and contributors,' says Sen in reply.

True to his reputation of being self-effacing, Samar Sen refused to formally talk to *The Sunday Observer* in any interview form as that may hurt many small publications that have also been refused interviews earlier. Nor would he allow himself to be photographed. 'It is one of my principles that I do not talk

to newspapers and periodicals. Maybe I have become a pessimist,' he says carefully.

It is really this aspect of the man that has made him different from the tribe of journalists in India : non-conformist, non-believer in power and press bonhomie. Throughout the 17 years of its life, *Frontier* has distinguished itself by becoming one of the fiercest exposers of 'state terrorism.' From the very beginning, Samar Sen took pains to ensure that *Frontier* uninhibitedly exposed the real face of state and monopoly capital in the country, which according to the *Frontier* school of thought, is comprador in nature.

The direct fall-out from such a policy was, 'The total lack of co-operation from the government as well as agencies in matters of advertisement support,' Sen recalls in his autobiography, *Babu Brittanta*. Government advertisements stopped in 1971, when in the month of December, Radio Pakistan quoted from *Frontier* editorials that had hinted at Indian arms supplies to Bangladesh's liberation forces, long before the refugees had started pouring in.

It was really this independent spirit that had seen Samar Sen forced out of another weekly—*Now*, owned by Nation Trust but controlled largely by Humayun Kabir, the renowned Congress leader and a Union cabinet minister in the 1960s. With Sen as the editor, *Now* emerged in October 1964, with the purpose of 'strengthening democracy, secularism and nonalignment ; internally and externally,' and also dealing with broad political questions in so far as they issue out of the former.

Within a year, *Now* established itself as a forum for debate and a coveted channel for publication of thought-provoking pieces on social, political and economic problems. With his varied intellectual background, Samar Sen sought out and attracted a large number of intellectuals to contribute to *Now*. These included economist Ashok Mitra, Amalendu Das Gupta, former editor of *The Statesman,* Nirad Chowdhury, Satyajit Ray, Norris Lindsay Emmerson, and Jayanta Sarkar, currently resident editor of the *Economic Times*, Calcutta.

Protests from Humayun Kabir over *Now's* increasingly leftist shift (mainly due to Ashok Mitra's endeavour, as Samar Sen recalls), ultimately resulted in Kabir insisting on writing the editorials himself on the eve of the 1967 West Bengal Assembly elections. On his part, Kabir was also being pressurised by other trust members to get rid of Sen.

"I am feeling increasingly unhappy with the editorials of *Now*. It has almost become a mouthpiece of the CPI(M)...I believe in independent journalism but to do that, a journalist should be a freelancer. If Mr. Samar Sen has accepted employment with us he must carry out our policy," wrote M. R. Shervani, MP and a trust member, to Humayun Kabir on 22nd November 1967. Quite in line with the role Kabir played behind the scenes in the toppling of the United Front government, Samar Sen was ultimately sacked by the *Now* management.

Samar Sen's strong sense of commitment is rooted in the broadly leftist intellectual ambience he grew up amidst. Born in 1916, he grew up with such Titans of pre and post-war West Bengal's cultural life as Buddhadev Bose, Sudhindranath Datta, Bishnu Dey, painter Jamini Roy, and others. He graduated from the Scottish Church College, Calcutta and then took his M A degree from Calcutta University in 1938, earning a gold medal.

After dabbling in teaching for a few years Sen shifted to All India Radio at the end of 1944 and then joined *The Statesman* in 1949. In 1956, he went to Moscow to join the Soviet government's foreign literature translation department. While in the USSR, however, he failed to notice any "new man." Coming back to India, he became joint editor of the *Hindustan Standard* which he soon left, protesting against the management's interference in editorial policy. After a similar saga in *Now*, he set up *Frontier* as part of a private limited company, solely with contributions from friends and relatives.

By the end of 1971, *Frontier's* identification with the CPI(M) was over. Although the weekly had supported the CPI(M) at the time of the 1969 assembly election, the United Front govern-

ment's actions did not seem to agree with Samar Sen. "Murders and arsons had been started first by the Front constituents for expansion of power bases. Later it was carried down to the Naxalites. As the then home minister Jyoti Basu should admit, at least four Naxalites had to lay down their lives if one CPI(M) worker was killed. The police were in Basu's hands and not in the hands of Naxalites," Sen caustically comments in his autobiography. From then on, the magazine was transformed into an arguably pro-Naxalite one and that is how it has stayed till date.

Throughout the fag end of the 1970s and the early part of the 1980s, when the Naxalite themselves were torn ideologically and some even strayed into parliamentary politics, *Frontier* maintained its ideological proximity to the ultra radicals. It is argued that this was not because the magazine was editorially committed to that political stance, but because a large part of the Indian masses was veering round to that path and not to the 'mumbo-jumbo' of election politics.

And quite in keeping with the Samar Sen tradition, although the magazine is not tightly edited, a more or less straightjacket formula is followed within the basic precincts of Marxism. Today, unlike some other left-oriented journals, *Frontier* retains almost a total belief in continued breaking of capitalist forces and the consequent ushering-in of mass revolutionary upsurge.

But how can *Frontier*, with very little advertisment support and an obviously limited circulation, survive in the face of competition from expensive high profile publications ? The secret lies in the fact that with *Frontier*, the technological revolution in printing has failed to make any inroads. "We pay very little to our contributors and to them also journalism is not about power and pelf. And the skeletal staff we have is wedded to the idea that if the magazine has to survive, they would have to be content with far less compensation than they can earn in other big house publications," Samar Sen noted, among the few words he spoke to me. Today, most of *Frontier's* revenue comes from subscriptions and not from advertisements.

Indira Gandhi's emergency has been a dividing line in the life of Samar Sen. When almost every big newspaper in Calcutta, except *The Statesman,* clung to Mrs. Gandhi's petticoat, ***Frontier,*** amongst a few others, kept the colours flying on the belief that "it is necessary to live only to see the denouement." The denouement has come in the form of an atomising distraction of the radical left and the escapism of the middle-of-the-roaders. For Samar Sen, the end of the road is still not in sight.

The Sunday Observer, December 7, 1986

P. C. CHATTERJI

SAMAR : AS I KNEW HIM

I had been in the News department of the All India Radio in Delhi for nearly two years when Samar Sen joined as an Assistant News Editor. That was in 1945. He was shy and soft-spoken and it took some time before the reserve was broken and we started meeting in our homes and getting to know each other.

Samar did well as a radio editor. He wrote short, simple sentences, with no bombast which was just right for the spoken word. He had a discriminating sense for news values and his diction was precise. He got on well with his colleagues at all levels, who appreciated his naturalness and his sly sense of humour. He did well but also I should in all honesty add, that he did not do outstandingly well. The reason for this was, that for success in AIR's newsroom a certain brashness was required, which Samar lacked. The two major news bulletins, which were the basis for all else, the English news at 8 a.m. and 9·15 p.m. were a great race against time. Corrections had to be sent out to the language editions and one had to cope with the news readers, who made a lot of noise rehearsing while one was trying to dictate the headlines and raising objections to sentences which did not make good reading. Samar was somewhat nervous which made it difficult for him to grapple with this situation. The Directors, like, Charles Barns, succeeded by M. L. Chawla, realized this and kept him on the External Service bulletins most of the time, where one worked in a quieter atmosphere.

Samar was never afraid of authority. Our Chief News Editor was a Panjabi gentleman, a doughty worker but somewhat crude in his manners. Samar once applied for a couple of days' casual leave on the ground that he was unwell. When he came back to office after the leave the CNE remarked, "You look perfectly alright, was it just an excuse ?" Samar hit back "I was suffering from a boil on my a... I could not sit. Would you like to examine the part ?" Some of us who were a witness to this,

could not help giggling. Repartee of this kind did not endear him to the bosses.

My wife and I do not know Bengali and a third member of our group was a Panjabi youngster Hamid Jalal, barely twenty two (I myself was only three years older) who was known as baby Jalal. Our ignorance of Bengali meant that we did not know Samar's poetry. We learned a little about it but we never succeeded in persuading Samar to recite his poems and to translate them for us. All I remember is that we got from him an anthology of Bengali poems in English translation (Modern Bengali Poems, Signet) which included two or three of his poems.

We had jolly times together, laughing and joking about everyday affairs, reading the poetry of Auden, Spender, C Day Lewis and Macniece. Samar gave us some idea of the cultural scene in Bengal and we went to several exhibitions of the works of Bengali painters when they visited Delhi. I do not remember any lengthy or detailed discussion about Marxism or the CPI. In my college days I was (and still am despite much disillusion) a party sympathiser but never a party member. Several of my close friends were in the party. I used to keep their literature for them and help them with their college studies, for which they could spare little time. At that period Samar's political views were probably in the melting pot. What we did discuss a good deal was Sadat Hasan Munto's short stories. Hamid was translating them from Urdu into English. We often discussed Hamid's rendering. I read Urdu, but for Samar's benefit Hamid would read out passages, so that we could try and get the nuance of Munto's meaning into the translation. Munto's writing is realistic ; a vivid image conveys the atmosphere ; the sentences are short. This is just the sort of writing that Samar himself was superb at, chiseling, paring out anything spare, to get the sentence just right. I used to listen and watch. Came 1947 and Pakistan and the three of us were never together again. I believe that Hamid published at least one collection of short stories subsequently in Pakistan. He passed away some five years ago.

Samar and I met again when I was posted in Calcutta as Station Director of AIR in November 1956. Samar was then working in *The Statesman.* I had no contacts here and it was Samar who took me under his wing and introduced me to most of those who mattered in the literary world—Sudhin Dutta, Bishnu Dey, Buddhadeva Bose, Ayub, Sunil Janha, Debiprasad Chattopadhyaya and several others. These contacts were invaluable and they helped me to bring to the Calcutta station distinguished persons many of whom, for one reason or another, had not been broadcasting for some time. I realised a bit later, what an individualist Samar was. Some of these persons were hardly on speaking terms with each other and yet Samar could be at ease with each of them. But not long after my arrival Samar himself went off to Moscow and we didn't see much of him after that. However, after a four years' stint in Delhi I was posted back to Calcutta in 1965. Samar was here then, part of the time as Editor of *Now.* So we resumed our meetings. His political views had matured and he was very radical. I don't know how he lasted even those few years in *Now.*

In the last seventeen years or so when I went back finally to Delhi our meetings were occasional. We always met whenever he came to Delhi or I visited Calcutta. The bonds we had forged in our youth were strong and in a few minutes we would be talking of things, politics, books, people, trivialities in a heart to heart fashion. In 1986 when we met in Calcutta, he was despondent, the fight had gone out of him. He told me that he had to work to earn, though the bus ride to office was really too much for his waning physical powers. He was worried about Sulekha and his grand daughter. That was the last I saw of him. He will remain in my memory as a person of the highest integrity, not ever a false note.

SUNIL JANAH

MY FRIEND SAMAR

I came to know Samar Sen only in the early fifties although we were contemporaries in Calcutta colleges. As we both had English Literature as our honours subject I knew of and admired his academic brilliance, but more than that, like most young Bengalis with literary interests of that time, I was under the spell of his poetry. Our generation was reared under the shadow of Rabindranath Tagore, dreaming of sharing his reverent and splendid world. We were lost in and alienated from the emerging, crass and commercial city cultures being reshaped by technology. The unquiet despair, not without hopes and visions, mixed with eroticism and nostalgia for the primitive *Sal* and *Molua* forests was the stuff of Samar's poetry. It was the stuff of our souls, hidden as in his poems, under a guise of weary cynicism.

Samar stopped writing poetry and devoted his life to political journalism because he neither could nor wanted to suppress what he felt most deeply, but knew that he could no longer say it in poems. That marvellous faculty had left him, as unaccountably as it had come and he didn't complain. He could put his protest into cold prose and set out to do that. None of us, his friends, had ever tired of asking him why he didn't write poems any longer. His simple answer always was, 'Because I can't'. He had too strong a sense of the ridiculous to take himself or any one else, too seriously. He took great delight in demolishing myths and ideals and in putting pin-pricks in bloated egos. The more pompous the gathering, such as Embassy parties, the greater was his merriment. To me, the mischievous smile I happened to capture on his gentle, sensitive face, is Samar Sen, so well remembered by all of us.

I am fortunate to have known Samar as well as the two others, Sudhin Dutta and Bishnu Dey, who changed the structure and contents of Bengali poetry and as such the sensibilities of all of us speaking the language. But Sudhin and Bishnu

were elders and my Bengali upbringing always prompted me to treat them deferentially, distancing myself from them. Samar was my age and in the rebellious and exuberant sixties, when we were young enough to be able to participate in them wholeheartedly, he was one of my closest friends and drinking companions. Later, he became more of my wife Sobha's friend. She was less tensed up and neurotic than me and they were at ease in each other's company discussing domestic trivia while I was often away on assignments or else was around punishing myself for my failure to make small talk. They were wise enough to choose to be quite ordinary. I was not.

He had made it a habit to drop in on us often in the evenings on his way to or back from *The Statesman* office, depending on the shift he was working in and we used to visit him too in his Broad Street or Swinhoe Street flats. Others joined in from time to time, most often Debi Chatterjee, in the earlier years. Samar, however, had collected over the years a large group of very dissimilar people, to meet—or perhaps, they had found him to gather around—every Sunday evening, at his place or at his brother Dr. Amal Sen's nearby. Very soon, I became a regular to it and my studio in Rashbehari Avenue was added to their houses as an alternative venue. It was convenient, outside our main house, with a separate staircase but yet connected to it and my parents did not object to large assemblages having been used to them since my Communist Party days. Nor did they object to the drinking as long as it appeared to be moderate.

Apart from Dr. Sen, Dada to all of us and Gabu, Samar's next elder brother, his wife Sulekha and me, the other regulars in the group were, Debu Choudhury and his wife Hena, Ashoke and Ila Mukherjee, Niranjan Majumdar, Amalendu Dasgupta, a silent Radhamohan, an ever elegant and proper Prodyot and his opposite, the elderly and perpetually drunk Subodhda. Others joined in from time to time, one or the other or both the Ashok Mitras, the ICS and the finance minister, Snehangshu Acharya, Debi and Kamakshi Chatterjee, Sagarmoy Ghose, Kiran Raha and, of course, the friends and associates of this

strangely assorted group. We took turns to buy the drinks but never as allotted tasks, yet never were in short supply. I can no longer defend our drinking and lightly dismiss it, as it tended to become more of a way of getting rid of our emotional hang-ups than of promoting conversation and companionship. Three of our brilliant friends, Ritwik Ghatak, Gopal Ghose and Niranjan Majumdar, were killed by it too early but that has not taught us, the few survivors, abstinence yet.

This group at Samar's was certainly not an intellectual or a political 'in' group. We were good friends, drawn together perhaps by a common affection for him. We hardly ever talked about literature nor can I remember ever sinking to talking about sports and filmstars. Politics was unavoidable of course and so were fierce arguments. But most of all, we had a lot of fun and lots to laugh about even though it was ourselves. Once in one of my impecunious week-ends, I and Chittaprasad along with my wife, Sobha, had parked our decrepit car outside a country liquor shop near Jadubazar. As Chitta and I got out of it we noticed Subodhda about to go into the shop. We went right up to meet him, not anticipating his astonished embarrassment. "Don't tell the group you met me here", he said in his broad East Bengal dialect (আমারে এখানে দেখছ, এ কথা গ্রুপের কাছে কইয়ো না). "But we are here, even Sobha, as you can see", I told him. "It is different for you, you are, what they call, artists", he said (তোমাগো কথা আলাদা, তোমরা হইলে গিয়া, যারে কয় আর্টিস্ট). On the following week-end when we appeared at Samar's we were greeted with a chorus, 'Don't talk about your (female) friends, they drink Bangla (Bengali country liquor) but speak English' (তোমাগো বান্ধবীগোর কথা কইও না, তারা বাংলা খায় আর ইংরাজি কয়). We hadn't told anyone of them about this encounter, he had pleaded with us not to, but Subodhda himself had done it and that was hilarious.

I had moved away from Calcutta, but the group around Samar Sen remained delightful. Some dropped out, others I did not know at all but was privileged to meet when I dropped in during my brief visits to my home city. It was an institution, a club

which remained centred around him although the members changed. It will be missed and remembered as much as Samar himself will be by anyone who had at one time been close to him.

My old Calcutta heart mourns the demise of the best ever of Bengali addas as much as it grieves over the death of a very dear friend around whom so many of us gathered, so lovingly. Buddhadeva Bose, who recognised and nourished so many of the young poets of our generation had once said that Samar's imitators are a legion. It is so, even now, when his pioneering role is almost forgotten. Samar had rejected all his achievements, all ambitions to align himself to those who opposed a society that nauseated him. But he steered clear of joining any party factions and obeying its mandates. He tried to be as free as he could be.

I remember two holidays we had together, both on the sea, at Chandipore and at Puri, and sharing the delights of being unabashedly like children again with my wife, my son, then very small and in Chandipore Chitta was with us and we had a lot of fun.

LOLA CHATTERJI

THE SENS IN MOSCOW

In the summer of 1960 I got an opportunity to visit Moscow for a few days on my way to England. My husband and I had got to know Samar in the early '40's in Delhi, and knowing that he was working on some Tagore translations there for the Soviet government, wrote to him about my visit. He was living in a small apartment in a large block and as foreign visitors in those days were permitted to stay with friends I had the pleasure of living with the family.

I remember the arrival at the airport very well. It was early May. I had left the heat of Calcutta in the morning to arrive in the freezing dark. It was nearly midnight. It was the first time I had taken an international flight and was travelling alone. What a comfort to see a small familiar figure wrapped in a large overcoat and muffler and even wearing a hat ! As other passengers were looking harassed and lost, confused at the excessive formalities of arrival, Samar's knowledge of Russian and status there got me through in no time. I was no doubt helped by the fact that on the column *Occupation* on my passport was the formula 'Teacher'. A plus point there. Samar helped me into a large and impressive-looking taxi. Buses were available and as we were all hard up in those days I remonstrated with him. "Why be so extravagant ?" "Don't worry" he said, "you are my guest. And in any case I can't take out most of what I earn—and there's not much to spend it on here".

In the days that followed we certainly did our best to spend some of that money ! Both daughters, teenagers then, were studying, so Sulekha, Samar and I went gadding around by bus, tram, metro and on foot. Sulekha's colloquial knowledge of Russian was probably better than Samar's. Whilst he was searching in his mind for the correct inflectional suffixes, she was chattering away with people we met on the buses or metro, and in the queues in the stores. Memorable was our visit to the

GUM, a very extensive shopping complex on the lines of New Market with a glass roof; young couples walking arm-in-arm eating ice-cream with piped music providing a romantic atmosphere; plump ladies selling all sorts of things from open stalls. We also ate ice-cream, bought cognac (Samar said the vodka tasted like petrol !) and caviare. The Russian people were very friendly and excited to see *two* ladies wearing saris, and would come up and talk to us, and offer us paper badges with Soviet insignia on them.

After being out for hours in the cold streets we were happy to get back to the flat. Samar had made quite a few friends at the University including one or two Indians and the whole family had got to know their neighbours. So there was plenty of interest for me as a visitor to ask about the Soviet system and how it was working, and about the quality of life in Moscow. Everyone was employed and thus had a roof over his/her head, was fairly well clad, shod and had enough to eat. Bnt there were no frills; few cars in the streets and bureaucracy took its toll of wasted hours and frayed tempers. How familiar ! Samar, as always, was fair in his assessment. He realised the value of the enormous changes brought about by the Revolution for the ordinary man, and as a Marxist, must have been moved at the thought of a better and more just economic and political order. Nevertheless he was too honest to shut his eyes to some of the bitter realities he saw and heard of from day to day.

Unfortunately my stay had to be cut short. The extension of visa which I was hoping for, and which the officials in the Indian Embassy were confident of obtaining, didn't materialise. Two American pilots had been shot down over the Soviet Union some days before my visit. The ponderous workings of a centralised bureaucracy might have resulted in granting permission to a harmless young Indian female to extend her stay—some two to three weeks after I had been deported ! Alas ! Samar had bought tickets for the Bolshoi Ballet for the Friday of the week I had arrived, but I had to ieave on Thursday.

Anyway, we had a great party the evening before with Bengali food (I had taken rossogolas from Calcutta) and plenty of cognac. Both Samar and Sulekha went with me to the airport the next morning to see me off. They looked rather forlorn as I waved good-bye. I wasn't to see them for quite a few years. But I have never forgotten those few days in their home in Moscow.

GYAN KAPUR

MAN OF INTEGRITY

If a man be true to himself, he cannot be untrue to anyone else, wrote Ralph Waldo Emerson. This is the most clear cut definition of integrity I have ever read. It is a yardstick by which we can judge a man, his intellectual honesty and his intrinsic worth, whatever the trappings of wealth, power or position he may or may not have acquired during the course of his life.

Judged by this yardstick, Samar Sen was a highly successful man, for he was that rare commodity, a journalist of integrity in the strictest sense of the word. That does not mean any disrespect to others who do a good job but feel compelled at different times to compromise, a little here, a little there, till they find they are no longer what they supposed themselves to be.

According to the visible signs of material success Samar Sen was a failure. But this did not worry him. He knew that integrity in journalism and material success were becoming more and more antagonistic, and he had made a choice which he knew would lead to much hardship for himself and his family. Samar Sen believed in the old world values of decency and decorum which I think should be revived in certain spheres. Unlike many others in the profession, when differences arose with the owners, he chose to leave with good grace, after making his protest and did not consider the path of confrontation or politicking by taking recourse to the law courts or the help of the unions as is sometimes done by some journalists.

In the post-independence era there have been few, if any journalists who could match Samar Sen's integrity. The homage paid to him on his death is a recognition of this by his admirers some of whom were conscious, sometimes uncomfortably so, that he was true to himself while they, seduced by the temptations of money, power or position, were not.

I first met Samar Sen when he was Editor of *Now*. Attracted by what seemed to me something new in weeklies, I wrote a satirical piece on the Calcutta Corporation's scheme for a multi-

storeyed complex and sent it by post to *Now*. I got a handwritten reply informing me that it had been accepted and would be published soon. This personal touch was also something new and encouraged me to write more for *Now*. After some time I met him in his office. The meeting confirmed the impression I had formed of the man being a different type of journalist than I had been meeting earlier. It also served to disclose the fact that we had some common friends like Rabi Sen. In retrospect it seems strange that we had not met, though we had been so near each other in the time and space planes. I had spent long evenings in Bhowanipur on roadside adda just opposite where Samar Sen and his friends used to have theirs and again I was in Delhi doing my stint of undistinguished journalism while he was there.

How does one judge the ability of a journalist ? The tools or as the cynical would put it, the tricks of the trade are not difficult to acquire for any reasonably educated and intelligent person. But it all boils down to what use he puts these tools which again is a question of integrity. During the period he was editor of *Now* and till his death as Editor of *Frontier* Samar Sen encouraged new writers who rubbed shoulders with others who were already on their way to fame like Nirad C. Choudhury. Samar Sen was not a demonstrative man but he felt he had a duty to those who wrote for him and this was exhibited in a very remarkable way when he decided to leave *Now*.

I had no inkling of the crisis brewing in *Now* since I was not in the habit of meeting him frequently at that stage and was surprised to get a letter in the post one day. This briefly informed me that he would be leaving the paper from such and such a date and the paper owed me moneys as detailed below against the articles named. By this step he not only informed the contributors that he would be no longer with the paper, but also tried to see that they would be paid their dues. It is, of course, another thing that the management did not.

The last and the longest phase of Samar Sen's career as Editor of *Frontier* was in some respects the most rewarding and

successful. As far as independence was concerned he had a free hand and at least in the early years of *Frontier* it was a paper which no intellectual would be willing to own up to not having read. That a journalist could single-handedly build up such a reputation was as much a tribute to Samar Sen's journalistic abilities as to the fact that it met a felt want for a paper which could provide an outlet for the ferment of new ideas during the chaotic and turbulent sixties and seventies. Samar Sen deftly and with an unerring eye combined material and writings from diverse men and women and sources to give shape to a tone to *Frontier* which, though never defined in words, was never in doubt. That is no mean achievement for an Editor starting a paper from scratch. We should remember that *Frontier* was as different from *Now* as *Now* itself was from the *Illustrated Weekly.*

So far as professionalism is concerned, leaving aside his earlier career, about which I had no personal knowledge, but going by *Now* and *Frontier*, I came to have a high regard for it. Burdened by the cares of running the paper, he told me once, he did not always find time to write the editorials and occasionally these were written by a friend in a national daily. But try as I might, I never could make out any distinction between the style, outlook and approach of one editorial and another to guess which ones had been written by Samar Sen himself and which ones by someone else. This showed that in making his choice of the person to write occasionally the editorial, he had carefully chosen only someone who would naturally write in line with other editorials of *Frontier*, for there could not be any question of editing or rewriting these. For all that we could make a shrewd guess as to who wrote them, he never divulged the secret.

I think in spite of all the difficulties Samar Sen never missed a single issue of the *Frontier* till the end. This was due to his planning and attention to details, necessary qualities in a journalist as against a columnist who is free once he throws in his copy. Personally I had several examples of this thoroughness. Since

the start of *Frontier* I wrote a fortnightly column. There was a possibility of duplication and I knew he never liked the idea of deleting anything unless absolutely necessary. So Samar Sen himself undertook to tell me over phone every Wednesday what were the main topics to be covered in the rest of the issue so that I could avoid them. Initially he would insist on my giving him my column by Saturday morning, though I knew Monday morning would do as well. But the risk of being left with two empty pages to be filled up in a hurry he refused to take until from experience he came to know that I too could be relied upon to meet the Monday deadline and would not fail him.

If nursing other men's flowers is part of good journalism, as I think it is, Samar Sen was indisputably one of the best Editors of his times. Apart from the ideological framework of genuine left orientation and sympathy for the underdog which distinguished *Frontier*, nothing was barred. As a result a host of writers, new and old, made their contributions to *Frontier*. Unfortunately, some consciously or unconsciously made their writing in *Frontier* just a stepping stone to success as journalists, P. R. men or some other economically attractive job or profession. That is to be expected for not everyone can resist the lure of the rising trend of commercialization, the consumerist society and the worship of money above everything else. However, one should be at least grateful to those who were instrumental, even if partly in one's attaining the cherished goals. Sadly enough, as Samar Sen once told me, many of these 'successful' people could barely recognise him when they happened to meet anywhere. There was no question to Samar Sen asking anyone for a personal favour. But they were apparently afraid that he might ask them to do something for the paper.

They need not have been afraid. For even that was something he was never the man to do. He was forced to look after certain commercial aspects no doubt as otherwise he could not bring out the paper. But even when the paper's circulation started going down after the Emergency and advertisement reve-

nue dropped to almost nil, he followed his principle of attending the editorial work and leaving this to others. A few phone calls from him would have brought in much needed revenue for there were a large number of people who could never have refused a direct request from him. But then if he had made such requests, he would not have been the Samar Sen we knew and respected.

Towards the end, personal bereavement and ill health combined with crumbling of values all around, the division of the left into the parliamentary and revolutionary segments diametrically opposed to one another, did affect him. But I do not think it in any way meant any difference in his commitment. *Frontier* remained what it always had been ; only the perceptions of those who contributed or read it had changed. They had other pre-occupations, other axes to grind and found other papers more to their liking due to their changed outlook.

In one way, however, *Frontier* had become a little outdated and paradoxically it was also a measure of Samar Sen's success as a journalist. Articles and topics which were more or less taboo at the time *Frontier* was started in the sixties found their way into more prosperous media with their vast resources for which *Frontier* and its contributors were no match.

About three years ago I discussed this aspect with Samar Sen and found he had been thinking already of it. But never one to put on airs or pretend to what he was not, he told me frankly that though he felt a new orientation was needed for *Frontier*, he could not think of how to do it. We decided to hold a meeting with some other friends to discuss if we could lay greater stress on the environmental degradation which was fast growing and the principal sufferers of which are the poor and deprived, whose lot becomes all the more difficult. Unfortunately, the meeting could not be held as all the persons required did not attend. After that due to various factors no further progress could be made though since then environment problems were highlighted whenever sufficient material was available. I fondly believe that had his health been a little better, Samar

Sen could have blazed a new trail for prevention of environmental pollution and degradation from which the poor and the underprivileged suffer the most.

Samar Sen had a wry sense of humour. Once when I sent him an article after a long time and wrote that I had just recovered from an attack of jaundice he replied that he was glad that I had got it over ; but, he remarked, we cannot always avoid having a jaundiced view of life. It is a measure of Samar Sen's greatness as an editor that despite the tremendous odds against which he had to fight to bring out *Frontier*, he never developed a jaundiced view of life as a journalist and Editor of *Frontier.*

K. V. R.

THE FIGHTER I KNEW

To have started *Now* and then *Frontier* was itself an act of courage and to have persisted with them through thick and thin was a matter of conviction. Samar Sen did not obviously stand in need of either. Courage drew its sustenance from conviction or was it commitment to the cause of the people ? Whatever it was, here was a man whose calm exterior concealed an indomitable spirit.

Both a regular reader of and a contributor to *Frontier* over years, I however cannot claim any real familiarity with its Editor. I only used to pay courtesy calls on him whenever I had been to Calcutta. I can't really say that there was a dialogue between us both for more often than not I found myself in monopolising the talk much to my embarrassment. He put in a word or two at the most. Was he sizing you up ? What indeed was he thinking of you and your babble ? Samar Sen was looking at you alright with his large, kind eyes but not down upon you. He must be a man of few words as it looked.

I remember how he advised me in a short letter against adding more gloom to an already distressing picture presented by the Revolutionary Left in the country. It was and is not only splintered but each splinter was flying at the neck of another. Not content with mutual mud-slinging, they were waging, as it were, 'a war of each against all', indulging in murderous assaults at the cadre level. I could not but present the cruel and ugly facts of the Andhra political scene in one of my write-ups and it was this which had drawn Samar Sen's attention. I only concluded that he wished deep in himself for a much better order of things than what was actually obtaining. It all betrayed his sense of optimism which his depressed looks scarcely conveyed. Here then was a sensitive being who looked at the world from his corner in a much better light than it was clothed in.

It comes back to my mind how on another occasion too the workings of his mind revealed themselves to me. I had been

writing article after article for *Frontier* giving accounts of the barbaric repression by the state against people's struggles in my part of the country. It was an endless tale of human suffering. If it was depressing one could not help it for it was there for all to see. But were the people who were waging relentless struggles and so paying for it, were they that spineless as always condemned to take a beating and didn't they give one to their tormentors in their own fashion ? Was there no resistance at all ? This question came to me only when I saw Samar Sen's letter. He didn't put it in exactly the same words as the above. It was only a hint and I took the cue to act upon it. Again I could picture to myself what sort of a being Samar Sen was. He was not what met the eye. He must have been a fighter with nerve of steel, a fighter who could not be cowed down by adversity, a fighter who would hit back. And that is what precisely he has done in starting *Now* and *Frontier* and in running them so courageously.

GAUTAM NAVLAKHA

SAMAR SEN

I came to know Samar Sen rather late. This was at a period in his life when he had many admirers and fewer willing to help his *'Frontier'*. I met him for the first time in the winter of 1978. By then I had come to know him from his editorials in *Frontier* which I had been enjoying for a couple of years. I was familiar neither with his fame as a poet nor as editor of *'Now'*. Compared to the verbosity of Indian English writings his sparse but ironic editorials never failed to excite me. My image of Samar Sen however was nowhere near the real person. I imagined him to be thin and tall with bright burning eyes. But when I entered *Frontier* office I found a frail but a gentle-eyed person, He spoke little. Although if he had wanted to speak I gave him no chance. I rambled on and on about the importance of Three world theory and its correctness. All this while he did not show any sign of impatience. At the end of my monologue Samar Sen merely told me little apologetically that since he had not been keeping too well it was time for him to return home before the trams got too crowded in the early hours of afternoon. The next meetings were no improvement. I, like several others, promised to help *Frontier* in more ways than one. And despite going back on all the big talk and promises he continued to gently remind without remonstrating, but merely enquiring if there was something happening at my end in Bombay. We exchanged little information that would suggest intimacy.

And yet the simple fact of correspondence kept an unequal acquaintance alive—I got more out of it than he ever did. One evening spent with him at Sumanto's place in Calcutta along with Robida is my only claim to intimacy when I got a glimpse which aroused my curiosity. Somewhere during the second peg of rum Sumanto brought out a thick diary, bursting at its seams and filled with clippings and notes and read out a poem written by Samarda—'Urvashi'. What amazed me was what Samarda

said after Sumanto had finished and folded his reading glasses. 'You Know' he said 'I have no memory for my poems. I don't remember them'. He was not agitated. His voice was flat and sincere. I did not know him as well as others. But there was a mystery about him which drove me to read his poems, heard them also in Bengali with beautiful extempore translations by Sumanto. Read his autobiography. In short I got to know him better from his editorials and letters than anything else. I met him last during puja holidays in Delhi in 1986. It was then I asked him for permission to translate and publish one of the chapters of his autobiography. The issue of July 1987 carried this along with translations of four of his poems. This was the first time anything of his was published in Hindi. Samarda died before the issue hit the stands. Samarda was not one who thought ill of anyone, if he felt anything strongly it was put as a question which appeared to be addressed as much to himself. But he obviously held strong views about events and issues. The pungency of his comments made that clear. But the contrast between this public person as he emerges through his writing and my glimpse of the private person remains something of a mystery.

LAWRENCE LIFSCHULTZ

UNTIL THE LAST : AN AUTHENTIC MAN

We rarely encounter men who live up to our ideals. Most men of principle that one observes cut corners as the years pass and bit by bit lose the edge of the principles they once so sharply held. The practicalities of existence and the market forces of daily life bear down upon them. For many the dreams of earlier days are slowly chipped away. In *The Force of Circumstance* De Beauvoir remarked that it was a challenge throughout her life to advance in years and yet stay true to the essential ideals of her youth. How few are those who manage it until the last.

Some years ago I met a man of austere personal habits possessed of a light wit who managed from his small corner of the globe to keep a wry eye on the rest of the world. He lived on a side street in Calcutta. I suspected that when I met this man I had encountered a person of great rarity. Even though as years passed I heard him frequently disparage his own endeavour, I knew my first impressions were absolutely correct.

While some others prospered, he grew thinner. If it were at all possible to imagine, he seemed with each passing day to tighten the notches on his belt still further, living with increasing austerity amidst the turmoil and suffering he observed. While he regularly rendered observations of the world about him, he did so rather helplessly in his own view. Perhaps, when before one's eyes there are no clear victories, then all that can be done is to hold the line. To never concede one's integrity. In the achievement of this task, Samar Sen, editor of *Frontier*, had few parallels.

When I first encountered him, it was a time when India's social landscape had erupted with volcanic violence. Although the molten rock boiled over only to harden again, through these years Samar Sen kept a chronicle of his times. It was not a simple chronicle, but a critical and searching one. He never sought facile answers. At times this disturbed some of his more militant readers who knew all the answers.

I came to Calcutta in the early seventies bent on being a journalist and settled down near Ballygunge Phari. Three or four evenings a week I wandered along to Swinhoe Street to pass an hour or more just sitting and listening to Samar Babu's quips. On days when others came for 'adda', hours would easily pass as the world and Bengal was scrutinized between rum and smoke. Samar Babu's observations were always extraordinarily brief amidst the voluble crowd. But, there was more to be understood from a few terse words from this man, than pages in another's hand.

As I continued to live and work in India I encountered a strange phenomenon. I began to meet prominent writers and editors from the mainstream press and other 'personalities' who would tell me that if I wanted to know what they really thought about a certain question, I ought to look for a specific piece published under a given pseudonym which they had written for *Frontier*. What they could not write or would not write in their own pages for fear of recrimination Samar Sen put into print.

On one occasion I arrived in Calcutta from Dhaka and dropped in at Swinhoe Street. The night before the police had been there. As was their habit in those days they came in the middle of the night. They had pounded on the door and then entered searching for a 'fugitive' allegedly reported to have taken refuge in the Sen home. It was a typical set-up of the time, an attempt to induce fear. Samar Babu described the incident to me trying not to make much of it, but saying he thought in case anything else happened it might be useful as a precaution for a foreign journalist to know. He made me promise, however, not to mention it to anyone because he was already having a damn hard time getting articles for *Frontier* and he did not want any of his contributors scared off, thus satisfying the peversity of power. So I said nothing.

About the same time a senior police official told Samar Babu's eldest daughter when reviewing her application for a passport that they knew everything about her father's move-

ments down to the last detail. He said they even knew the exact moment when Samar Sen bought a packet of cigarettes. At the time Samar Babu had taken the same tram to work every day and returned by the same route for nearly a decade. He regularly bought cigarettes from a local pan shop. No doubt, however, to establish the complete outline and detail of this routine truly required an impressive deployment of massive police resources under the supervision of the most senior officials.

Samar Babu was not without his complaints. Many people seemed to let him down in small ways. He would often remark that quite a few persons had got their start writing in *Frontier* and then forgotten the weekly. But, at the same time he would belittle his personal troubles and complaints saying his concerns were that of a typical "petty bourgeois". Although usually forgiving to others, he was terribly hard on himself.

It seemed that the only time he ever had to think, and be momentarily free from daily troubles and weekly deadlines was sitting on the tram enroute to office. Once he recounted how in the midst of a jam caused by a peasant rally being held in Calcutta that day, he had looked out from the tram window and watched a young peasant woman carrying her small and hungry child against her shoulder. She had clearly come a long distance and as she made her way on tired feet with others to the meeting at the Maidan, her hardship could be seen in her features. She walked on and he thought there was the problem of India, not his own trifling concerns. As always, generous to others with nothing to spare for himself.

Those I think who he honoured most were people who had suffered, sacrificed, and taken risks for their beliefs to build a society better than the one which existed before them. I once brought him a Bangladeshi friend who had been in prison for five years and whose brother had been hanged for involvement in insurrection. The man had also fought with great distinction in the '71 Liberation War. He was not a theorist or a noted intellectual. Like Samar Babu he was a self-effacing man of few words. Yet, of all the men I had ever witnessed sit in Samar

Sen's home, none had I ever seen received with such dignified respect and regard.

Samar Sen had another quality which will always remain sharply etched in my memory. He maintained an intellectual capacity which was open and fresh, despite the weariness born of a family loss which held him in its grip during his last years. He had a capacity which Sartre once described as being able "to break the bones in one's head" so as to be able to honestly reassess one's own existing position, to look at an issue with fresh eyes. It was this quality, combined as it was with the utmost personal integrity, which attracted so many young people to him. In a society innundated by small and large hypocrisies, here was a man brutally honest about his own weaknesses, yet who never surrendered.

I once arrived in Calcutta after having spent seve al days with a colleague who had travelled for nearly two months across Kampuchea. I had been critical of an article which had appeared in *Frontier*. Samar Babu listened carefully to my report and simply said, "You know sitting here we really do not know what is going on." There was no strained defence of a formalized position.

To be in Calcutta and not be able to sit at Swinhoe Street with one's back to the wall on the low sedan, the fan circling above, and Samar Babu pulling on a cigarette will be like entering an empty street once inhabited by living souls. Something has gone out of the heart of the city.

We hear of modesty and self-effacement but rarely encounter the genuine form. I can already hear Samar Babu's disdain, "Words about my life are not worth the ink." I can see him shaking his head and scoffing, "Don't waste time." Perhaps, it is a selfish act to remember a unselfish man who lived a life free from the ordinary hypocrisies of other men. But then, Samar Sen was one of the most authentic men of our time—until the last.

TRIBUTES TO A CRUSADER

At the age of 71 a curtain was rung upon the chequered career of Samar Sen, a distinguished Bengali poet of the post-Tagorean era and a powerful and intrepid journalist. As the media carried the news of his passing away in Calcutta on August 23, 1987, it caused an instant shock wave. A number of memorial meetings were held in several places and Bengali little magazines have started bringing out special numbers. The national dailies paid tributes by writing obituary notes, editorials or by publishing interesting anecdotes.

Frontier received a number of letters and telegrams from several places in this country and abroad. They were not to be regarded as simple condolence messages. They reflect sincere outpouring of hearts. Those who sent telegrams include Dr S. M. Sen (Gujarat), Lawrence Lifschultz (London), Harihar Joshi (Kathmandu), Padmini Nirmal Thomson Pandian (Madras), Subir Roy (Darjeeling), Niranjan Zamindar (Indore City) and EPW (Economic and Political Weekly) family. The letters expressed genuine concern for the survival of the weekly founded by Sen. They voice the demand, that '*Frontier* must continue the orientation given by Samar Sen.'

Gautam Navlakha wrote from Delhi, "Life did not treat him too kindly, at least his death should not make us insensitive to his concern for survival of *Frontier* after his death." Almost identical concern was expressed by Dr Asok Mitra, Sumanta Banerjee, Nikhil Roy, Suniti Kumar Ghose and V. B. Talwar who gave assurance of all possible help and co-operation for the continuation of that magazine.

Vipin Arora (Kanpur), Dilip N Oza (Bombay), S Lakshmikanth (Cuddapah) and Ved Prakash Gupta (Bhatinda) are amongst those who may be safely considered as avid readers of Samar Sen's weekly. Some of these names were to be found in the subscribers' list of '*Now*'. Although they never had the opportunity to meet him, they were aligned to him through his paper. Samar Sen was to them "a great friend, a comrade". Lakshmikanth writes : 'Sri Sen has been a crusader all thro'

his life. His contribution to the growth of the leftist movement in the country is very significant'. The renowned psychiatrist Dr D. N. Ganguli, (Director, Pavlov Institute and Editor, *Manab Mon*) writes to say that Samar Sen's death has caused irreparable loss not only for *Frontier* but also for West Bengal. 'A section of the youth to whom he was a legendary figure has been terribly shocked, we share with them their grief and loss', Dr Ganguli writes.

Likewise, Shri Nimai Ghosh (Director of Photography, script writer and motion-picture director), though not deeply involved with *Frontier*, believes that Sen's death has been a great loss for the country. Shri Ghosh writes : 'Like all great men in the history of mankind he will be perpetually living in the consciousness and heart of every honest and upright man and woman of our country. He taught the young generation of journalists how to seek truth from facts and how to struggle incessantly to restore and preserve the values of life.'

The Progressive Democratic Students' Union (Andhra Pradesh) feels that Samar Sen's passing away has been a great loss to the leftist journalism. P. Ranga Rao, The General Secretary of the PDSU writes : '...the *Frontier* has been the mouthpiece of left, democratic and revolutionary forces for more than twenty years. Samar Sen's life and dedication should become an ideal to the leftist writers and journalists of today'.

Poet-journalist Samar Sen was a true friend of the revolutionary movement. That is why the CPI(ML) Party Unity 'shares the grief with his family members, countless friends and admirers. The party writes : 'He (Sen) wielded a pungent pen and his satire exposed the ugly features of this rotten society and often hit its top echelons. From the turbulent days of the sixties onwards, he fearlessly laid bare, through the journal he edited, the oppression let loose on the people by the state machinery. The revolutionary upsurge in Naxalbari made a deep impression on him and he remained a friend of the Communist Revolutionaries ever since. In particular, he played a courageous role during the Emergency when the voice of protest

among the intellectuals was rarely heard. Samar Sen was an eminent poet and an outstanding intellectual, but he steadfastly refused to succumb to the lure of a cosy life that would have meant compromising his pen. In our revolution we cherish the friendship of many a staunch democrat and progressive intellectuals like him.'

Vinod Mishra, leader of the Central Committee, CPI(ML) writes : 'With his (Samar Sen's) death, a whole chapter in the history of left intellectual movement in Bengal has come to an end. He symbolised the glory of the old generation of revolutionary Marxist intellectuals of Bengal as well as the aspirations of young Marxist-Leninists for regeneration of revolutionary left movement in India. On behalf of the Party Central Committee I pay my tributes to the memory of this brave fighter, the fearless journalist and the poet of revolutionary realism.' Mishra hopes that *Frontier* will continue to uphold the principles Samar Sen stood for.

On behalf of the West Bengal State Committee of the CPI-(ML), led by Sadhan Sarkar, Pradip Banerjee writes : 'We pay our homage to the bold, courageous revolutionary intellectual, Samar Sen. Mr Samar Sen fought throughout his life for the great cause of the Indian revolution. His immense contribution lies in publishing *Frontier* which always defended the great Naxalbari uprising. The magazine continues to be the torch-bearer of revolutionary ideas.'

Undoubtedly *Frontier* was Sen's creation and 'it was doing a great service in bringing the news of the left movement from the world over to those interested in it'. So Dr A. P. Shukla writes to inform that the Jan Vijnan Samiti (IIT, Kanpur) considers Samar Sen's death as a great loss to the left movement.

Sanghasena Singh, Professor and Head of the Department of Buddhist Studies (Delhi University) writes to inform that a cross-section of Delhi University community—employees, students and teachers—recorded with feeling and gratitude Sen's manifold activities—creative (as a poet) and revolutionary (as a genuine Marxist) at a meeting held in the Faculty of Arts semi-

nar room on August 28. The condolence resolution reads, 'As editor of *Frontier* he, undaunted by the ruling cliques' oppressive measures, allowed the columns of the paper to disseminate information about just struggles of different political activities. His own column was always a pleasure and a source of critical comments on topical matters and created commotion amongst the ruling classes of all sorts.'

Bharat Patankar and Gail Omvedt hold this opinion that as editor of *Frontier* Samar Sen 'helped the dissemination of ideas coming out of the post-independence period's greatest revolutionary era upto the present.' They write, 'Even after the great split and dispersal of this new dawn he continued with *Frontier*. Under his guidance *Frontier* always stood with changing realities and requirements of the revolutionary left as a whole ..We hope the '*Frontier* family' will continue with its tradition and enrich the process started by Com Samar Sen.'

Although T. Vijayendra (New Delhi) saw him but once, his regard for Sen has always been very high. 'He (Sen) has been a source of inspiration to all of us who have seen the stormy years of the late sixties. Now that we are on the threshold of another such period, his example becomes all the more important', Vijayendra writes.

Mr K. S. Sundaram writes from Bangalore : 'I have been reading *Frontier* since 1970 and have found it informative, stimulating and thought-provoking. In the editorials and through other articles, the weekly has consistently taken people-oriented ideological position on vital political issues of this country and other parts of the world – thus helping the cause of progressive and revolutionary mass movements in India and other Third World countries... Small magazines may come and go but *Frontier* should go on forever espousing the cause of the oppressed and the dispossessed.'

Fareed Cama of Pune goes one step further to suggest that 'Samar Sen's contribution and sacrifice of body and soul for the welfare of the Indian working people was second to none for he gave himself wholly to this task without compromise till the

very end. Mighty spirits such as his neither wither away or are forgotten for they remain alive in the hearts of men, generations after generations'.

Chaman Lal, a distinguished Punjabi writer (member of the editorial board of *Sardal*, literary magazine of Punjab People's Culture Forum) and a much-known activist of the democratic rights movement, had only one occasion to meet Samar Sen, that is, in 1981 on his way to Assam as a member of a PUDR fact finding team and 'that has left', he writes, 'a deep impact on me'. Mr Lal has been a reader of *Frontier* since his student days, from 1971-72. He writes, '*Frontier* always played a significant role in shaping my opinions about various social situations.' As the news of Samar Sen's passing away reached there, Chaman Lal writes : 'I and many of my friends here in Punjab really feel very sad, though we feel Samar Babu lived a glorious life. Till the end he stood like a rock against all odds. Even when the democratic movement showed signs of cracks, Samar Babu never wailed, though his anguish over the situation reflected in editorials could not have been missed'.

Samar Sen's contribution to fearless journalism in the context of the big Press's toeing the line of the Establishment was the theme of discussion at a condolence meeting held at Jhargram under the auspices of the Forum for the Concerned Rural Journalists. (The meeting was presided over by the radical poet Bhabatosh Satpathy.)

In the second half of August last year, Indian journalism lost three major personalities, Ramesh Thapar (editor of *Seminar*), G.K. Reddy (editor of the New Delhi edition of the *Hindu*) and Samar Sen. *The Times of India* wrote the main editorial captioned "Three Faces" (August 25, 1987) to pay tribute to these three leading figures. It wrote : 'For Samar Sen unlike for the other two, Doordarshan newscasters will not read out encomiums.... His milieu was far removed from the glittering court of the powerful in New Delhi. His was the radical, lonely though never shrill, voice of Indian society calling out from a small circulation paper (with a limited but a devoted band of

followers) which never compromised either in its views or in its search for financial support'.

R. P. Mullick (of Jaipur) whose contributions have appeared in the pages of *Frontier* several dozen times, is not prepared to take such descriptions as a "loner" or a "radical" quite kindly. Mullick writes : 'There should be no feeling of void, no sense of sorrowing that it is only a punctuation mark in the perennial struggle of Life, and that he (Samar Sen) had played the role of a liberation fighter as journalist in India's difficult world of press. Unfortunately the "big" shots in the profession with easy access to bureaucracy and the Establishment, would be apt to misread his functional role misinterpreting him as a "loner" or a "radical" among fellow professionals, since it is the facile way to denigrate contributions of writers dedicated to the cause of the people's liberation. Shunning the tendency to easy virtuosity of the petite bourgeoisie—into which class he was born—he could make his transition from the poet's to the liberation fighter's *tour de force* fairly early. Incisively ironical, the language of his poetry, and that of literary exposition of social realities, did presage the development of the questing poet (in him) into the restless political worker, struggling for ever against socio-political inertia and the hidden chains of mis-culture and counter-revolution holding the people in bondage. While his literary output has been allowed publicity by the established elite in the print media, his writings as the editor of the *Now*, later of the *Frontier* (after he had to part company of late Humayun Kabir, his one-time friend and admirer) have been ignored since these reflect the point of view, rigorously dialectical, of the political investigator of real life who would not compromise with truth come what may. He had to pay the utmost, in terms of personal and collective sacrifice, perpetual want, even attracting politically motivated oppression, but in the process had got together a group of cadre-workers of proletarian intelligentsia putting India among the international co-fraternity of revolutionist writers. However, his remarkably mild manners and tenor of writing hide the fire and steel of ideological recti-

tude, the unflinching objectivity of factual analysis and lucidity of approach (to the issues), the reason why India's ruling elite have thought they could play safe ignoring the legacy he has left behind.'

K. Ilaiah of Osmania University is one of the friends of *Frontier*. He writes, 'Most of us in Hyderabad were shocked to note that Mr Samar Sen is no more. In his death the country lost a great revolutionary reformer and a literary genius. In his death the poor masses of this country lost a great sympathiser who stood by them in every major struggle. I hope *Frontier* keeps the light Samar Sen lit to awaken the masses to fight their oppressors and exploiters.

The *Readers of Frontier in Mysore* paid tribute to Samar Sen in eloquent terms. The letter which they released to the press was signed among others by Narendra Singh, C. S. Chandrashekhar, B.A. Belliayappa, P. Veeraju, Kenneth Gonsalves, Dr. V. Lakshminarayana, Dr. Rathi Rao, D. R. Krishnamurthy, Krishna Vettam and G. H. Rama Rao. The letter runs as follows :

'Samar Sen died at an age which is not a ripe one, but for the pressures in India for the common man, in general, and more so the pressures on a socially and politically very involved one, in particular. And Samar Sen was no doubt very involved. We, especially the *Frontier* readers at Mysore, are shocked at the loss of this doyen of radical journalism in India. We know that he consistently stood against the authoritarian trends so glaringly emerging on the Indian socio-political scene since the early nineteen sixties. We call this trend as the glowing obscenity in populism of the stinking parliamentary politics perpetuated all these days. We remember that Samar Sen was singularly in the forefront to provide the forum of *Frontier* for fresh wind of revolutionary trend which erupted in the Indian communist movement in the late nineteen sixties. Since then pages of *Frontier* have been consistently open for the reports of the new movement, commonly known as the Naxalite struggles. Inspite of the ups and downs of that movement, *Frontier* has kept the flame

alive and also helped the ongoing debate to resolve the path of Indian revolution. We hope for, and call upon, the *Frontier* to sustain the tradition set by late Samar Sen.'

In Samar Sen's death the Krantikari Buddhijivi Sangh, Bihar has lost their sincere, beloved and dauntless friend. But, as Rajkishore Singh writes, 'we have no time to express our sorrow as we are anxious to see how to make good the loss. He was a highly learned intellectual. He is respected by all because he never compromised or surrendered to the enemies of the people, lackeys of imperialists, feudalists, comprador capitalists, even at the cost of his life unlike many other intellectuals who had sold away their intellect only in exchange for comforts of a cosy life. We were acquainted with him through his weekly *Frontier*. He took the side boldly of the oppressed and downtrodden people. His mighty pen was able to boost up the courage and honesty in our midst. He upheld the struggle of the workers and peasants and the people's upsurge in the context of the agrarian revolution and protected people's war as the axis of the new democratic revolution.'

K. V. Ramana Reddy the prominent Telegu writer (better known as Sudarshan or KVR) is the author of at least two hundred reports that appeared in *Frontier* in the last fifteen years. In a letter dated August 25, he writes from Hyderabad :

> 'A Telugu daily brought the saddest of the news today that venerable Samar Sen is no more with us. I broke down and am writing this with tears in my eyes. I feel personally I have lost a father-figure of poetry, a fearless but detached journalist and never-say-die fighter of all good but lost causes.'

KVR further writes :

> 'On behalf of the All-India League for Revolutionary Culture (AILRC), I, as its General Secretary, pay a red salute and a sorrow-laden but a comradely courageous salute to the indefatigable but calm and dignified being that Sri Samar Sen has been all through the vicissitudes in this crucial life. The AILRC takes a pledge to carry on what he had held dear—the cause of the oppressed—and to work relentlessly

for the noble ideal of his — a true and really human life for the dehumanised, self-alienated and downtrodden masses of all climes. Red Salute !'

The celebrated revolutionary Telugu poet, P. Varavara Rao whose latest detention has already exceeded a year writes from the Secunderabad district jail (in a letter dated August 25) :

'Just now I have seen in a remote corner of *Udayam*, a Telugu daily that Comrade Samar Sen is dead. Though I was alone all these days in this imprisonment, I felt lonely as the news struck my eyes, for there is nobody by my side to share my feelings for that relentless crusader. Incidentally, Ms. Hemalatha my wife came for interview and I shared my feelings with her. Com KVR is there in Hyderabad attending the trial of the Secunderabad Conspiracy Case. My wife told me that they have come to know about it and KVR is depressed.

'I thought of writing to *Frontier*, complementing it for its Special Number. ...Almost all the articles of *Frontier* are aptly representative. Samar Sen's *Babu's Tale* and editorials reflect the unique position of *Frontier*. Now that he is no more with us, I hope and wish that *Frontier* will continue as his cherished wish like a fire that never extinguishes. Keeping *Frontier* alive can be the fitting tribute to him.'

Compiled by Debabrata Panda
[Courtesy : *Frontier*]

কালের দর্পণে সমর সেন

কালের দর্পণে সমর সেন

১৯১৬

১০ই অক্টোবর জন্ম, কলকাতা, বাগবাজার বিশ্বকোষ লেন, পিতামহ দীনেশচন্দ্র সেন, আদি নিবাস ঢাকা মানিকগঞ্জ, সুয়াপুর, পিতা অরুণচন্দ্র সেন, মাতা চন্দ্রমুখী, বঙ্কিম-বান্ধব জগদীশনাথ রায়ের ('বিষবৃক্ষ' এঁকেই উৎসর্গ) দৌহিত্রী।

১৯২৮

মা-এর মৃত্যু, "নভেম্বর ১৯২৮-এ মা মারা যান সূতিকা রোগে, ৩৪ বা ৩৬ বছর বয়সে।...বিছানায় শুয়ে প্রার্থনা করলাম: 'ভগবান, তুমি থাকলে মা বেঁচে যাবেন।' ভোরবেলায় মা মারা গেলেন। ভগবান নিয়ে অতঃপর মাথা ঘামাইনি।" ...'বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ১৪।

স্কুলে ভর্তি, ক্লাস সিক্সে, কাশিমবাজার পলিটেকনিক স্কুল।

১৯৩১

পিতার দ্বিতীয় বিবাহ, "মা-র মৃত্যুকালে যে বোন তিন মাসের সে যখন তিন বছরের...তখন একদিন দেখলাম বাবা বেশ সেজেগুজে সন্ধ্যেবেলায় বেরচ্ছেন। পরিহাসচ্ছলে জিজ্ঞেস করলাম—বরের মতো দেখাচ্ছে, বিয়ে করতে যাচ্ছো নাকি? পরদিন এলেন নতুন বধূ...।" 'বাবু বৃত্তান্ত', পৃ. ২০।

১৯৩২

ম্যাট্রিক।

স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি।

বাসা বদল, বেহালায় ডায়মণ্ড হারবার রোডে বাড়ি।

১৯৩৩

'শ্রীহর্ষ', ছাত্র ছাত্রীদের আন্তবিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকায় প্রথম (?) মুদ্রিত কবিতা : 'তুমি ও আমি'। "তুমি বসে আছো, / বসে আছ স্তব্ধভাবে আমার পাশে। / আমি বসে আছি, / রক্ত মোর কাঁপিছে উল্লাসে। / তুমি বসে আছো, / তোমার দুই চোখে জাগে রাত্রির ভালবাসা। / আমি বসে আছি, / আমার চোখে কাঁপে প্রভাতের রক্তিম আশা।"

১৯৩৪

বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে পরিচয়, 'এক গ্রীষ্মের সকালে আমার ঘরে এলো একটি ক্ষীণাঙ্গ ছেলে—প্রায় বালক, সবে পা দিয়েছে যৌবনে—গায়ের রং হলদে-ঘেঁষা ফর্সা, ঠোঁটে গোঁফের ছায়া, চোখে চশমা, গালে একটি ব্রণের

উপর এক ফোঁটা চুন লাগানো। কিছু মাত্র ভূমিকা না ক'রে বললো, আমি আপনার 'শাপভ্রষ্ট' কবিতার একটা ইংরেজি করেছি—আপনি দেখবেন?' ...তর্জমাটি পড়ে চমক লাগলো আমার—এত অল্প বয়স, অথচ ইংরেজি ভাষায় তার দখল অসামান্য, কবিতার দিকে মনের টান আছে বোঝা যায়। লেখাটা আমি পাঠিয়ে দিলাম বম্বাইয়ের নতুন বেরোনো 'ওরিয়েণ্ট' পত্রিকায়, সম্পাদক সেটি সমাদরপূর্বক গ্রহণ করলেন।' —"আমার যৌবন", বুদ্ধদেব বসু, 'শারদীয় দেশ' ১৩৮০।

আই. এ.

১৯৩৫

ত্রৈমাসিক 'কবিতা' পত্রিকার প্রকাশ, বার্ষিক মূল্য দেড় টাকা, প্রতি সংখ্যা ছয় আনা, '৭১/১ নং মির্জাপুর স্ট্রীট, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস হইতে প্রভাত চন্দ্র রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত', সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু : প্রেমেন্দ্র মিত্র, সহকারী সম্পাদক সমর সেন।

['...আমার সেসময়কার ঘনিষ্ঠতম সাহিত্যিক বন্ধু প্রেমেন আমার সঙ্গী, প্রধান উৎসাহদাতা বিষ্ণু দে ও সমর সেন।'—বুদ্ধদেব বসু, "আমাদের কবিতা-ভবন", 'শারদীয় দেশ' ১৩৮১। 'শনিবারের চিঠি, জানুয়ারি (১৯৩৬) সংখ্যায় মন্তব্য, 'কবিতা' নামক একখানি নূতন ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে। ...শুধুই কবিতার একখানি পত্রিকা চালানো বাংলাদেশে যে কতবড় দুঃসাহসের কাজ তাহা পত্রিকা চালকদের অবিদিত নাই। সম্ভবত সেইজন্য সম্পাদক সংখ্যা তিন জন।...']

'কবিতা'র প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হল : Amor stands upon you, মুক্তি, স্মৃতি, প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে লিখলেন, "...সমর সেনের কবিতা কয়টিতে গদ্যের রূঢ়তার ভিতর দিয়ে কাব্যের লাবণ্য প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে এঁর লেখা টঁ্যাকসই হবে বলেই বোধ হচ্ছে।..." ['কবিতা', প্রথম বর্ষ : দ্বিতীয় সংখ্যা,]

বুদ্ধদেব বসু লিখলেন উত্তরে, "...সমর সেনের কবিতা আপনার ভালো লেগেছে জেনে বিশেষ খুসি হলাম। এঁর বয়েস অল্প, লিখছেন অল্প দিন ধরে, কিন্তু এঁর কবিতা প্রথম দেখেই আমার মনে হয়েছিলো বাঙলা গদ্যছন্দে সম্পূর্ণ নতুন একটি সুর ইনি ধরেছেন। তাছাড়া, যেটা প্রকৃত কাব্য-বস্তু, তারও অভাব নেই। এঁর পরিচয় দিলে আপনি চিনবেন, ইনি ডক্টর দীনেশ সেনের পৌত্র ও শ্রীযুক্ত অরুণ সেনের পুত্র। এখনও এঁর ছাত্রাবস্থা, এবং ছাত্র হিসেবেও ইনি পয়লা নম্বরের।" ১৬.১০.৩৫, ['দেশ,' সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১]

১৯৩৬

'শনিবারের চিঠি', জানুয়ারি, " 'গদ্য কবিতা' (না গদ্য না কবিতা ছন্দে): এখন থেকে যা লিখবো সে হবে না কবিতা, / হবে গদ্য-কবিতা। / অর্থাৎ কাঁঠালের আমসত্ত আর কি; / পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলা চলে: হোনার পিতলা কলস।" ···শ্রীরারগ শর্ম্মা।

লণ্ডনের *Times Literary Supplement* (TLS)-এর ১লা ফেব্রুয়ারি, শনিবারের সংখ্যায় আধুনিক ভারতীয় কবিতা নিয়ে এডোয়ার্ড টমসনের অস্বাক্ষরিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, **'A land made for poetry : New India's hopes and fears'**-এর আলোচনায় সমর সেনের দুটি কবিতার অনুবাদ ও প্রসঙ্গ। দ্র. ইংরাজি রচনা।

"আধুনিক কবিতা ও 'রাজহংস'', প্রবন্ধ, 'শনিবারের চিঠি', মে ১৯৩৬, '· গদ্য ও পদ্য আধুনিক হইলেও যে গদ্য. গদ্য; এবং কবিতা, কবিতা; এ কথা মানিতে হইবে। যাহারা মানে নাই, তাহারা ঘোর বিপদে পড়িয়াছে। 'কবিতা' নামক একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির হইয়াছে' ···এই 'কবিতা'র লেখকদের অধিকাংশের প্রেরণা কবিতার নহে, আধুনিকতার। আধুনিকগণ গদ্যকে পদ্য বলিবার সাহস রাখেন, সেই জন্যই পত্রিকার নাম 'কবিতা'। ···'কবিতা' ত্রৈমাসিক হইতে একটি সম্পূর্ণ 'গদ্য কবিতা' উদ্ধৃত করিতেছি—'ভোরের কলকাতা—রিকশার উপরে ক্লান্ত চীনে গণিকা যখন চোখ বোজে / সূর্যের অলস উত্তাপে, তখন দিন-রাত্রির নিঃশব্দতা / তোমার রক্তে আসে / নীল নদীর মতো। / কত উৎসুক চোখে অশ্লীল. নাগরিক আনন্দ / পিচের পথে / অগণিত মানুষের ক্লান্ত পদক্ষেপ।' [সমর সেন, "মৃত্যু" কবিতার ২য় অংশ]। যেকোন লোক ইচ্ছা করিলেই এরূপ 'কবিতা' সারা জীবন মিনিটে একটি করিয়া লিখিয়া যাইতে পারে। এই রূপ একটি লেখার খাতা হইতে নমুনা স্বরূপ দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। লেখক ঘড়ি ধরিয়া মিনিটে একটি করিয়া লিখিয়াছেন। এক ঘণ্টায় ৬০টি··· ।"

'শনিবারের চিঠি.' অগাস্ট সংখ্যা: "স্বপ্নে দেখিলাম, যীশু খ্রীষ্ট কলিকাতায় আসিয়াছেন, মোড়ে রসো মালাই খাইয়া এসপ্লানেডের আটচালায় মিনিট কয়েক দাঁড়াইয়া তিনি বাংলা সাপ্তাহিক মাসিক ও ত্রৈমাসিকগুলি দেখিয়া লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সোজা অক্টারলনি মনুমেণ্টের চূড়ায় গিয়া উঠিলেন এবং অকস্মাৎ তারস্বরে চীৎকার করিয়া গদ্য কবিতায় বলিতে লাগিলেন—'লাঞ্ছিত কর তাহাদের যাহাদের উন্মাদ প্রলাপ / তিন মাস অন্তর কবিতা হয়।'··· "সংবাদ সাহিত্য"। "ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের 'বৃহৎ বঙ্গ'-এ মধ্যবিত্ত রক্তের কেরামতি খুব এক চোট দেখিবার সুযোগ পাইয়াছি, 'কবিতা'য় সমর সেন 'উর্বশী'কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'তুমি কি আসবে মধ্যবিত্ত রক্তে /

দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো! / ···চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে / উর্বর মেয়েরা আসে!' মনে হইতেছে, বাংলার সকল মেয়েই অনুর্বর হইলেই ভাল হইত! হায় ধোয়ি কবি!" "সংবাদ সাহিত্য", ঐ।

'শনিবারের চিঠি', ডিসেম্বর সংখ্যা : "নাতি ঠাকুরদার...দ্বন্দ্ব চারিদিকেই সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ও সুভো ঠাকুরে বনিতেছে না, সমর সেন দীনেশ সেন ডুয়েল লড়িতেছেন। দীনেশ সেন বলিতেছেন—'কৌপীন পরিয়া আমরা শত শত যুগ টিঁকিয়া আছি, কিন্তু মোটর গাড়ী, এওরোপ্লেন প্রভৃতির মোহে পড়িয়া আমরা একদিনও বাঁচিব না।' সমর সেন ধমক দিয়া বলিতেছেন, চোপ রাও বৃদ্ধ—'আমাদের রক্তে আজ / কত পুরনো স্মৃতির বিষাক্ত সাপ / বিগত কতো বসন্তের উপবাসী / বিশাল অজগর···' মনে হয়, রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের স্মৃতিকথা 'ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্যে'র প্রতি ইঙ্গিত উপরোক্ত কয়েকটি পংক্তিতে আছে। বর্তমান যুগের ইহাই সমস্যা, নাতি বনাম ঠাকুরদা; এ যুগের বাপেরা বাতিল।" "সংবাদ সাহিত্য"।

বি. এ. ইংরেজি অনার্স, প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, প্রিয়নাথ ঘোষ ও গঙ্গাতারা দাসী পদক এবং জুবিলী পি. জি স্কলারশিপ লাভ।

১৯৩৭

'শনিবারের চিঠি', ফেব্রুয়ারি সংখ্যা : "ধোয়ী কবির বংশধরের বংশধর সমর সেন পৌষের 'কবিতা'য় এই হতভাগা শহরকে প্রশ্ন করিয়াছেন 'হে সহর হে ধূসর সহর / কালিঘাট ব্রিজের উপরে কখনো কি শুনতে পাও / লম্পটের পদধ্বনি', ধূসর সহরের উত্তর দেওয়ার ক্ষমতা থাকিলে বলিত—'শুনতে পাই বন্ধু, / কিন্তু কালীঘাট ব্রিজের ওপর নয়, / মাঝের হাট ব্রিজের ওপর— / লম্পটের গুষ্টির পদধ্বনি শুনতে পাই।' " "সংবাদ সাহিত্য"।

'শ্রীহর্ষ'-র ইংরেজী সংস্করণের সম্পাদক নির্বাচিত। "বাংলা [?] শ্রীহর্ষের সম্পাদক ছিলেন সমর সেন। ব্যবস্থাপনা ছিল ছাত্রগোষ্ঠীর হাতে।···" মণীন্দ্র রায়, 'অমৃত', ২০শে জানুয়ারি, ১৯৭৮।

'কয়েকটি কবিতা', কবিতা ভবন, দাম এক টাকা চার আনা, প্রকাশক সমর সেন, সাগর মান্না রোড, বেহালা, 'শ্রীহর্ষের তত্ত্বাবধানে পাইওনিয়র প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৭/১ অভয় হালদার লেন হইতে প্রবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত,' মার্চ, উৎসর্গ : মোজাফর আহ্‌মেদকে।'

'শনিবারের চিঠি', এপ্রিল সংখ্যা : '...এই প্রতিভাবান কবিদের আর একটি কৌশল—কবিতা লিখিতে লিখিতে অকস্মাৎ অকারণে এক একজন ভদ্রলোকের মেয়ের নাম করিয়া আমাদিগকে উৎসুক ও উৎসাহিত করিয়া,

তোলেন। 'ইকনমিক্স' লিখিতে লিখিতে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু অকারণে 'রাণি' কে টানিয়া আনিয়াছেন . 'বসন্তের গানে' শ্রীযুক্ত সমর সেন 'মাতলী রায়' নামক কোনও কামিনীর 'নরম শরীর' লইয়া যাহা করিবার নয় তাহাই করিয়াছেন। ইহার সূত্রপাত হইয়াছে নাটোরের 'বনলতা সেন'কে লইয়া।. " "সংবাদ সাহিত্য"।

'A modern poet, but not progressive', 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *Amrita Bazar Patrika*, 13th June " ..To day, therefore, Samar Sen is an up-to-date representative poet. He needs to be progressive by informing himself with a sense of history. He has also yet to be symbolic. Still there is no doubt of his being a poet of a particular genre." দ্র. ইংরাজি রচনা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনা, S. S. [সমর সেন], *Amrita Bazar Patrika*, 4th July, : "In our day the famous statement that the poetry of earth is never dead has become a paradox. Almost everywhere the earth is slowly dying, rotting, going to ruins. We have, for instance, in India not the growth but the decay of the soil, and the sense of this ruin has entered our blood. Ruin and decay, the inherent melancholy of the soil, can be worked up into magnificent poetry...Jibanananda Das looks at the world to repeat our University jargon, from a magic casement. The ceaseless struggle raging in the world does not touch him, but he can write memorable lines about the forlorn fairy lands .. ..But there is something more than this in an enduring work of art, it also has a social content. And men who are sceptical about the flattering, poetic view of poetry will perhaps be irritated by the escape-formula worked out in the last poem of *Dhusar Pandulipi*, the dream-cult and the rest of it. To-day we are all upon a wheel of fire, and there is a stronger temper in the air. We cannot possibly, step aside, retreat to an ivory tower."

নির্বাচনী প্রচারে বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়-এর পক্ষে আসানসোলে ; রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট।

"নবযৌবনের কবিতা", আষাঢ় ১৩৪৪ সংখ্যায় 'কয়েকটি কবিতা'র

বুদ্ধদেব বসু-কৃত সমালোচনা, দ্র. পুনর্মদ্রণ। "বুদ্ধদেব বসু যদি 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ না করতেন এবং সমর সেনের কবিতা নিয়ে উক্ত দীর্ঘ প্রবন্ধ না লিখতেন তা হলে হয়তো তাঁর কবিতার প্রতি বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি পড়তো না।..." কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, "কবিতা ভবন / দুশো দুই", 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা ১৩৮১।

'পরিচয়', ভাদ্র ১৩৪৪-এ 'কয়েকটি কবিতা'র বিষ্ণু দে-কৃত সমালোচনা, দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

মোহিতলাল মজুমদার ঢাকা থেকে বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়)-কে এক চিঠিতে (২০শে জুন): "...ছন্দোহীন কবিতা আর যাই হোক, খাঁটি কবিতা নয়, ভাবের যে সুর এবং কল্পনার যে আবেগ ভাষায় প্রকাশ করাকে কাব্য-নির্মাণ বলে—সেই সুর ও সেই আবেগ ছন্দোভিন্ন ভাষায় সংক্রামিত হয় না।...বোলপুর, বালীগঞ্জ ও বেহালা—এই তিন ব-কারের জ্বালায় বাংলার কাব্য সরস্বতীর এখনও কিছুকাল অজ্ঞাতবাস ছাড়া আর অন্য উপায় নাই।" 'বোলপুর, বালীগঞ্জ ও বেহালা', বলা বাহুল্য, যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু ও সমর সেনের তৎকালীন বাসস্থান।

'শনিবারের চিঠি', অগাস্ট সংখ্যা, "মাইকেল বধ-কাব্য", "মাইকেল মধুসূদন দত্ত অত্যন্ত হতভাগ্য ছিলেন এবং তিনি নিতান্ত অকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার কালে বাংলা কবিতার এমন ছন্দ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ...সুধীন্দ্রনাথ, সমর ও হীরালাল প্রভৃতি ছন্দবিদেরা তাঁহার পরবর্তীকালে জন্মিয়া 'ফ্লারিশ' করিয়াছেন...।" এরপর বিভিন্ন কবির কাব্যরীতির প্যারডি। ১৩নং প্যারডিটি সমর সেনের গদ্যছন্দের: "শৃণ্বন্তু (sic) বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ / ধূসর মহানগরীর চিৎপুরে ভিড় / বিক্রায় চীনে গণিকা / কলেরা আর কলের বাঁশী আর গণোরিয়া আর সিফিলিস / ধূসর নিওসালভার্সান / শ্রমিক আন্দোলন আর বেকার সমস্যা / ধূসর ক্যালকাটা কর্পোরেশন আর সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর / চেৎলা ব্রিজের উপরে লম্পট-গুষ্টির পদধ্বনি / ধূসর হক্-মিনিস্ট্রি, নলিনীরঞ্জন সরকার / এ সব কিছুই নয়। / নাহি জানে কেউ / রক্তে মোর নাচে আজি সমুদ্রের ঢেউ / মাস্তলের দীর্ঘরেখা দিগন্তে / জাহাজের অদ্ভুত শব্দ / দূর সমুদ্র থেকে ভেসে আসে বিষণ্ণ নাবিকের গান / কত মধুরাতি রভসে গোঙায়নু / ভারত মহাসমুদ্রে লঙ্কা দ্বীপ / রাবণের পুত্র বীরবাহু, রামের হাতে তার অপঘাত মৃত্যু / হে সরস্বতী নহ মাতা নহ কন্যা নহ বধূ সুন্দরী রূপসী / অন্ধকারে শুনতে পাও রাবণের বুকে বিবর্ণ পদক্ষেপ / বুকে চিত্ত আত্মহারা নাচে রক্তধারা / অন্য সেনাপতিকে পাঠায় সে যুদ্ধে / এ কথায়ও নয়। / আসল কথা, সুদূর আকাশে চিলের ডাক / আর মালতী রায়ের নরম উষ্ণ শরীর / স্বপ্নে দেখি

তার ধূসর পাহাড় / শুঁকি রুমালে ইভনিং ইন প্যারিসের গন্ধ / মাঝে মাঝে সবুজ গাছের অপরূপ শব্দ / হে বিরাট নদী। / ধূসর। * * কিন্তু সমর সেনের পরেও আছে অগ্রগতির হীরালাল / সমুদ্র বিশাল।..."

আশ্বিন ১৩৪৪ থেকে 'কবিতা'র যুগ্ম সম্পাদক।

'শনিবারের চিঠি', নভেম্বর সংখ্যা, " '...তবু জানি, ইতিহাসের গলিত গর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী / যুগে যুগে নতুন জন্ম আনে / তবু জানি / জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে / আকাশ গঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে / ততদিন / ততদিন নারীধর্ষণের ইতিহাস / পেস্তা চেরা চোখ মেলে শেষহীন পড়া / অন্ধকূপে স্তব্ধ ইঁদুরের মতো / ততদিন গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে / বণিকের মানদণ্ডের পিঙ্গল প্রহার।' কিন্তু হায় এই ঋষি-বালকটি গর্ভের ঘুমন্ত তপোবনে নিশ্চিন্ত হইয়া যদি সমিধ সংগ্রহ করিতে থাকিতেন! পিঙ্গল প্রহার কি ইয়েলো ...মল? কবি প্রারম্ভে যে ইংরেজী রচনাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান, 'I've been born, and once is enough.' Enough!" "সংবাদ সাহিত্য"।

১৯৩৮

এম. এ., ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম।

"কাব্যের বিপ্লব ও বিপ্লবের কাব্য," 'কবিতা', বৈশাখ ১৩৪৫, আবু সয়ীদ আইয়ুব, "...চিরাগত বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের ভিৎ গেছে ভেঙে, তার ভগ্ন-স্তূপের উপর নতুন যুগের ইমারত যতদিন না মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, ততদিন আমাদের কবিদের গলা শোনাবে 'শান্ত অর্থহীন, যেন শুকনো ঘাসে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস।' ততদিন আমরা কেবল চেয়ে দেখব চারিদিককার প্রাণস্পন্দিত শ্যামলিমা বিবর্ণ হয়েছে, যেখানে বনস্পতি ছায়া বিস্তার করে ছিল সেখানে রইল শুধু রিক্ত বিস্তৃত মরুভূমি। আর সে-মরুভূমির তৃষ্ণার্ত হাহাকারে রইল এ-যুগের ছন্দহীন প্রার্থনা: 'অনেক অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ / সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়া ফেলে / দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য, / আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস / রাত্রের নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে। / আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া-ফুল, / নামুক মহুয়ার গন্ধ।' "

সবান্ধব শান্তিনিকেতন ভ্রমণ, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা। " ..কামাক্ষী-প্রসাদ ও সমর সেনও সে যাত্রায় আমাদের সঙ্গী ছিলেন। একদিনেই যাবার কথা ছিলো, আমি সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওঁরা বোধ হয় আগের দিন নির্দিষ্ট ট্রেনে চলে গেলেন, আমরা গিয়ে পৌঁছলুম তার পরের দিন রাত দশ-টায়।...[বুদ্ধদেব] ঠিক ভেবে পাচ্ছেন না স্ত্রী এবং শিশুকন্যাটিকে নিয়ে এই রাতে এই দেশে তাঁর কোনো আশ্রয় মিলবে কিনা। সহসা দোতলার জানালায় একটি লণ্ঠনের দোলায়মান আলো ভেসে উঠলো, সেইটুকু ঝলকেই

কামাক্ষীপ্রসাদ এবং সমর সেনের গেঞ্জি পরা ঊর্দ্ধাঙ্গ দেখে আমরা ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠার আনন্দে প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। ওঁরা নেমে এলেন। ফিস ফিস ক'রে বললেন 'আসুন, ভীষণ মশা এখানে, মশারি আছে তো ?' " ..."পত্রাবলী প্রসঙ্গে," প্রতিভা বসু, 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, প্রাগুক্ত। বুদ্ধদেবও লিখেছেন একই প্রসঙ্গে, '...ঘটনাটি বিশেষ কিছু নয়, কিন্তু বন্ধুদের সঙ্গে মিলনের সে-মুহূর্তটি যে কী মধুর লেগেছিলো আজও তা মনে করতে ভালো লাগে।..." 'সব পেয়েছির দেশে'. ১৯৪১।

"বাংলা কবিতা", প্রবন্ধ, 'কবিতা', তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা।

'চতুরঙ্গ', আশ্বিন ১৩৪৫ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর গ্রন্থ-সমালোচনা প্রসঙ্গে অশোক মিত্র [I.C.S] "...গদ্যকাব্য লেখক বলতে প্রকৃত পক্ষে বোঝায় দুটি কবিকে, রবীন্দ্রনাথ ও সমর সেন।..." দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'কবিতা', আশ্বিন, ১৩৪৫ সংখ্যায় 'বাংলা কাব্যপরিচয়'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু : "...গদ্য কবিতা রবীন্দ্রনাথ নেননি ; না নেবার অধিকার তাঁর সম্পূর্ণই আছে। সেইজন্য সমর সেন বাদ পড়েছেন।...সমর সেনের প্রভাব পাওয়া যায়, এমন কবিতা 'বাংলা কাব্য পরিচয়'-এও আছে।..." দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'আমার সাহিত্য জীবন', প্রথম খণ্ড (১৯৫৩), ১৯৩৮ সালের একটি ঘটনা প্রসঙ্গে (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়), "...পৌত্র কবি সমর সেনকে ডেকে আমার পরিচয়...[দিলেন দীনেশচন্দ্র সেন]। সমর সেন সেকালে খ্যাতিমান আধুনিক কবি ; কাব্যে তাঁর আধুনিকতার উগ্রতা তাঁর সম্পর্কে কোন কল্পনা করতে গেলেই সে কল্পনাকে ঝাঁঝালো করে তুলত। কিন্তু তাঁকে দেখে ভারি ভালো লেগেছিল। সুন্দর মিষ্টি চেহারা, কথাগুলি মিষ্টি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বয়সে তখন তরুণ. তখন তাঁর পাণ্ডিত্য কাঁটাভরা ডালের মাথার বর্ণাঢ্য গোলাপ ফুলের মতোই হওয়া ছিল স্বাভাবিক। সেই ভয়ও ছিল আমার। কিন্তু কিছুক্ষণের আলাপেই দেখেছিলাম না—তা নয়। শুভ্র স্নিগ্ধ সৌরভময় যুঁই ফুলেরই সন্ধান মিলেছিল।.."

'শান্তি', আশ্বিন ১৩৪৫, ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক পত্রে 'কয়েকটি কবিতা'র সমালোচনা, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, "আলোচ্য পুস্তকটি একটি গদ্য-ছন্দের কবিতার বই। এবং এ-ধরণের কবিতা লিখে সমসাময়িক সাহিত্যে বর্তমান লেখক যে কি ধরণের খ্যাতি অর্জন করেছেন, তা যাঁরা আজকালকার কবিতার সঙ্গে পরিচিত আছেন তাদের অবিদিত থাকবার কথা নয়। রবীন্দ্র-নাথের গদ্যছন্দের সঙ্গে সমর সেনের গদ্যছন্দের তফাৎটা অবশ্য সুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য। আশৈশব রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আবহাওয়ায় প্রতিপালিত হয়ে

অথচ রবীন্দ্রসৃষ্ট ভিত্তির ওপরে তিনি যে নতুন সুরের আমদানি করেছেন তার ফলে শিক্ষিত পাঠক মাত্রেই একটি স্বতন্ত্র মননশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী হয়েছেন বলা চলে।...আজকাল গদ্যছন্দের কবিতায় সমর সেন যে নতুন সুরের গতিবেগ সঞ্চারিত করেছেন তজ্জন্য নবীন ও প্রবীণ নির্বিশেষে অনেকেই তাঁর রচনার পক্ষপাতী এবং অনেকেরই কবিতায় তাঁর প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিশেষ করে 'একটি বেকার প্রেমিক', 'শেষ রাত্রে', 'মহুয়ার দেশ', 'দুঃস্বপ্ন', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতা—অদূর ভবিষ্যতে যখন গদ্যছন্দের পরিধির আরো বিস্তার হবে —তখনো নিজ বিশেষত্বের জন্য পাঠক মনে হানা দেবে নিশ্চয়ই। সমর সেনের কবিতায় যে আরেকটি বিষয় লক্ষ করা চলে সেটি সমাজতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব। কয়েকটি কবিতায় এমন একটি বিদ্রোহের সুর ধ্বনিময় হয়ে উঠেছে, যাকে অন্যরকম কিছু বলে ভ্রম করা সম্ভবপর নয়।..."

"In defence of the Decadents", কলকাতায় ২৪-২৫শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

১৯৩৯

'In defence of the 'Decadents' ' প্রবন্ধটি 'Indian Progressive Writers' Association'-এর তরফে প্রকাশিত *New Indian Literature*-এর দ্বিতীয় সংকলনে মুদ্রিত। দ্র. ইংরাজি রচনা। ঐ সংখ্যার শেষে 'Commentary' অংশে সম্পাদকমণ্ডলীর তরফে (বাংলা বিভাগে ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বলা হল :

"We are glad to publish Samar Sen's 'Defence of Decadents'. He represents a valuable point of view and it will or at least should stimulate discussion ; we cannot but welcome such discussion.

Many will vehemently oppose the 'Defence'. They will insist that the Indian bourgeoisie is a spent force and no subject for a writer and they will sternly warn the Indian writer against Freudian musings and 'Ivory castles'. Let the writers turn to the living water of the masses, they will cry to quench their thirst and so be reintegrated. But this can not happen by merely wishing it to do so and Samar Sen's reference to 'sentimentality' is timely. One has seen so-called proletarian literature which belongs to the category of the Victorian novelette --everything is black or white, the workers are heroic, the bosses vile and all ends with the unfurling of

the red flag amidst the smoke of the barricades. Such writing is neither honest literature nor even good propaganda, because it is largely wish-fulfilment. Above all it is futile when faced with the struggle against Fascism which ruthlessly pricks all such pretentious literary balloons..."

"অতি-আধুনিক বাঙলা কবিতা", জ্যোতির্ময় দে, 'শান্তি', শ্রাবণ ১৩৪৬, "...নব-যৌবনের কবি হিসেবে সমর সেন একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছেন। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় একটা পরিণত বিদ্রোহের সুর। রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত এই তরুণ কবি তাঁর কাব্য-প্রচেষ্টায় দুঃসাহসী তো বটেই, অনেক স্থলে তিনি অভিনবতম। শ্রেণী-সংঘর্ষের হলাহল তাকে চঞ্চল ক'রে তুলেছে. কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থার পঙ্ককুণ্ড থেকে উদ্ধার করার জন্যই তার বিদ্রোহ। এবং প্রথম পর্যায়ের ক্ষীণ ব্যঙ্গোক্তি: 'নবাবী আমল যেন সূর্যাস্তের সোনা' ক্রমে জমাট বেঁধে উচ্চৈঃশ্রবা হয়ে উঠেছে—'তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে / দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো' (উর্বশী)। এটা যদি-ও পীড়িত যৌবনের নি ... প্রতিক্রিয়া, তবু পেছনের বিদ্রূপের সুরটুকু আধুনিক জীবনকে সচকিত না ক'রে থাকছে না। আধুনিক ইংরেজ কবিদের কারো কারো কল্পনা-উপলব্ধিতে এমন অভিজ্ঞতা প্রকট হয়েছে। এবং যুদ্ধপরবর্তী ইংরেজী কাব্য-ইতিহাসে ডি. এইচ. লরেন্স এমনি ধারা ক্ষত-বিক্ষত আলোড়নের মাঝখান দিয়ে পথ করেই অগ্রসর হয়েছিলেন। তার সৌন্দর্য-সন্ধানে কোন সুসংহত পদ্ধতি নেই। লরেন্স একান্ত করে জীবনের কবি, বন্ধুর ও জটিল সৌন্দর্য-স্রষ্টা। বড়ো আর্টিষ্ট তিনি, কল্পনার মৌলিক গাম্ভীর্য এবং উদ্দাম বলিষ্ঠতায় তিনি অমর। সমর সেনকে-ও একটা বিরাট বিপ্লবের ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে, সামাজিক মধ্যবিত্তভাব চিন্তা. কল্পনা, আদর্শ যখন রুদ্ধশ্বাসে মুক্তির আহ্বান ছড়াচ্ছে, কবি-মন তখন বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ আহরণ ক'রে বিরাট যজ্ঞশালার আয়োজনে ব্যস্ত হবেন, সেটা আদৌ আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। অতি-আধুনিক কবি সমর সেন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বাঁচাব কামনা করেন—'তবু জানি, ইতিহাসের গলিতগর্ভ থেকে বিপ্লবের ধাত্রী / যুগে যুগে নূতন জন্ম আনে, / তবু জানি— / জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে / আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।' এবং [এটাই] স্বাভাবিক।..."

'১৩৪৫-এর শ্রেষ্ঠ কবিতা', রমাপতি বসু সম্পাদিত, সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু, 'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৬, "...সমর সেনের অনুকারকদের কথা আর কী বলবো, তারা দস্তুর মতো পাব্লিক ডেঞ্জার হয়ে উঠছে, যদিও এ-বইয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের সে-খেতাব দিলে সমর সেন হয়তো আমার নামে মানহানির মামলা আনতে চাইবেন।..."

১৯৪০

'গ্রহণ', '১/১ প্রিন্স গোলাম মোহম্মদ রোড, কালিঘাট থেকে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত, ৬১, ধর্মতলা স্ট্রীট, রংমশাল প্রেস থেকে শ্রীকানাইলাল গুপ্ত কর্তৃক মুদ্রিত।' উৎসর্গ: বুদ্ধদেব বসু, রাধারমণ মিত্র ও বিষ্ণু দে-কে।

'চতুরঙ্গ', চৈত্র ১৩৪৬, 'গ্রহণ'-এর সমালোচনা লিখলেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'আধুনিক বাঙলা কবিতা', সম্পাদনা আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; সমর সেনের আটটি কবিতা (স্মৃতি, মুক্তি, একটি মেয়ে, মহুয়ার দেশ, নাগরিক, কয়েকটি দিন, *For thine is the Kingdom*, বকধার্মিক)। আবু সয়ীদ আইয়ুব তাঁর 'ভূমিকা'য়: "...আমাদের দেশে যাঁরা সাম্যবাদী কবিতা লিখতে শুরু করেছেন তাঁদের মধ্যে একদল হচ্ছেন যাঁরা ভাব কিংবা ভঙ্গি কোনোদিক থেকে কবি নন। এঁরা যে-কর্তব্যবোধের প্রবর্তনায় গোলদীঘি থেকে সুদূর পল্লীগ্রাম পর্যন্ত সভাসমিতি করে বেড়ান, দৈনিক সাপ্তাহিক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন, জেল খাটেন, সেই প্রবর্তনার বশেই কবিতা লিখছেন। এতে তাঁদের প্রোপাগাণ্ডার কাজ কতোখানি হাসিল হয় বলা শক্ত, তবে বিশুদ্ধ সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তি তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে সন্দেহের চোখে না-দেখে পারে না।...অন্যদিকে সাম্যবাদী দলে সমর সেনের মতো নিঃসন্দিগ্ধ কবিও রয়েছেন, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য কৌশল অত্যন্ত নির্বিকার বুর্জোয়া পাঠকদের কাছ থেকেও প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছে। এঁরা প্রায় বালক বয়সেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করে (সমর সেনের তো রীতিমত একটি স্কুল গড়ে উঠেছে) আধুনিক বাংলা কাব্যে আসন পাকা করেছেন। এঁদের সম্ভাবনা প্রচুর, কিন্তু সিদ্ধি এখনও এতোটা নিশ্চিত নয় যে তাঁদের লেখা সম্বন্ধে—তথা সাম্যবাদী বাঙলা কবিতা সম্বন্ধে—আমরা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারি। হয়তো এঁরাই অদূর ভবিষ্যতে প্রমাণ করবেন যে আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ কবিতা ব্যক্তিচেতনা-সম্ভূত নয়, সমাজবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। তার জন্য কবির চাই শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীর সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, চাই ডায়লেকটিক দৃষ্টি, চাই ইতিহাসের অর্থনীতিমূলক ব্যাখ্যায় বিশ্বাস।..."

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বতন্ত্র 'ভূমিকা'য়: "...নিষ্কপট ভাববিলাসকে অশ্রদ্ধেয় বলার লোভ সম্বরণই করা উচিত, আর স্বভাবজ ভাববিলাসের দ্রুত বিপর্যয়ের ফলে ভূরি ভূরি সাম্যবাদী রূপক ব্যবহারের প্রতি নির্মম ঔদাসীন্যও অহেতুক। কিন্তু সমর সেন বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো সাম্যবাদী কবি হিসাবে যাঁদের পরিচিতি, তাঁদের কবি যশ এখনই ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে বলে তাঁরা যেন প্রতি-সাম্যবাদীর প্রতিপাদ্য-অনুশাসন কবিতার ক্ষেত্রে অচল মনে না

করেন। সমর সেনের কাছে অভিযোগ করলে অন্যায় হবে না যে তাঁর লেখায় এক এক সময় সত্যই নৈরাশ্যের একটা বিকৃত সুর বেজে ওঠে, আর তাঁর অনুরাগীদের মনে সন্দেহ হয় যে হয়তো তিনি প্রায় আড়চোখে আর্ত সমাজের দিকে তাকিয়ে শুধু বহুজনের ব্যক্তিগত বিপত্তির ভিত্তিতে কাব্য রচনা করছেন, মার্কস-পন্থীর পক্ষে যা অকর্তব্য। ('অকর্তব্য' কথাটিতে তিনি অন্তত গুরুমশায়ী সুর পেয়ে বিরক্ত হবেন না আশা করি)। পুরাণো পৃথিবীর ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ার আগে সে পৃথিবীকে গণশক্তি বলে ধ্বংস করার ঔচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চিতি তাঁর বা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় যেন পাওয়া যায় না। বিপ্লবী মনোভাবকে আত্মস্থ না করাতে তাঁদের কবি ক্ষমতা কি ত্রিশঙ্কু রাজ্যেরই প্রতিভূ হয়ে থাকবে? সমর সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখায় নানাগুণ সত্ত্বেও দেখা যায় যে অনেক সময় তাঁদের কাব্যপ্রসঙ্গ ও প্রকরণের সঙ্গে বিপ্লবী সিদ্ধান্তের সঙ্গতি নেই, সে-সিদ্ধান্তকে যেন ক্রোড়পত্র করে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অরুণ মিত্রের 'লাল ইস্তাহারের' ক্ষুদ্র পরিধিতে যে অবৈকল্য আছে, তার সন্ধান ঐ দুই কৃতী কবির লেখাতে দুর্লভ।..."

'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র. সমালোচনা প্রসঙ্গে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, 'কবিতা', বিশেষ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৭, "...এ সংগ্রহে সংকলনের সংখ্যা-প্রমাণে আধুনিক বাঙ্গালী কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বে প্রথম তিনজন হচ্ছেন শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসমর সেন ও শ্রীবিষ্ণু দে। এঁদের সংকলিত কবিতার সংখ্যা যথাক্রমে ৯, ৮ ও ৭।. বুদ্ধদেব বসুর কবিতার সংখ্যাও ৭।...সম্পাদকীয় ভূমিকা পড়ে জানা যায় যে 'সাম্যবাদী দলে' শ্রীযুক্ত সমর সেন 'নিঃসন্দিগ্ধ কবি', এবং ইতিমধ্যেই তাঁর 'রীতিমত একটি স্কুল গড়ে উঠেছে'। এ সাম্যবাদ ও নিঃসন্দিগ্ধ কবিত্বে অজ্ঞতা স্বীকার করছি। চেষ্টা না করেছি তা নয়, কিন্তু নিরুপায়। এ গ্লানি নয়, 'অপটিক্ নার্ভ'।..."

'আধুনিক বাংলা কবিতা'-র, সমালোচনা প্রসঙ্গে অমিয় গঙ্গোপাধ্যায়, 'নিরুক্ত', আশ্বিন ১৩৪৭, "...যেখানে সমর সেনের আটটি কবিতার স্থান হয় সেখানে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মাত্র চারটি।..."

"ঝর্ণা-ছন্দের কাব্য", অমিয় চক্রবর্তী, 'কবিতা', কার্তিক ১৩৪৭, 'গ্রহণ'-এর সমালোচনা, দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'পরিচয়', অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭ সংখ্যায় 'কবিতা', কার্তিক সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে 'হ' [হিরণকুমার সান্যাল?] "...রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি: শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তের 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র সমালোচনা ও শ্রীযুক্ত অমিয় চক্রবর্তীর সমর সেন রচিত 'গ্রহণ' পুস্তকের সমালোচনা। 'গ্রহণ'-এর কবিতাকে অমিয়বাবু ঝর্ণাছন্দের কবিতা আখ্যা দিয়েছেন। এই আখ্যা আধুনিক গদ্যকবিতার মধ্যে একমাত্র সমর সেনের

কবিতা সম্বন্ধেই খাটে, কেন না একমাত্র তাঁর গদ্যকবিতায় ছন্দের দোল পাওয়া যায়। সমর বাবুর সৌভাগ্য যে অমিয় বাবুর পাকা হাতে তাঁর বই সমালোচনার ভার পড়েছিল। কেননা তাঁর কবিতার উৎকর্ষ বাছাই বাছাই উদ্ধৃতির সাহায্যে যে-ভাবে অমিয়বাবু আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন তা খুব কম সমালোচকই পারতেন।... অতুলবাবু আধুনিক কবিতার মধ্যে যেগুলি কিছুমাত্র আধুনিকতার দাবী রাখে সেইগুলির প্রতি একেবারেই বিমুখ। স্বধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে ও সমর সেন প্রভৃতি কবি সম্বন্ধে তিনি যে সকল মন্তব্য করেছেন তা তাঁদের পক্ষে হয়তো খুব প্রীতিকর হবে না। এতে আশ্চর্য হবার কিছু নাই। এই সব আধুনিক কবিদের কাব্যরসাস্বাদনে আরো অনেকেই অক্ষম—এবং তাঁদের অক্ষমতার যে-যে কারণ তাঁরা প্রচার ক'রে থাকেন, অতুলবাবু সেইগুলিরই পুনরুল্লেখ করেছেন, অবশ্য তাঁর সুনিপুণ ভাষায়।..."

'অগ্রণী', দ্বিতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যায় 'In defence of the 'decadents''-এর জবাবে সরোজকুমার দত্ত-র আক্রমণাত্মক প্রবন্ধ "অতি আধুনিক বাংলা কবিতা"। দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'অগ্রণী', দ্বিতীয় বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যায় সমর সেনের উত্তর এবং একই সঙ্গে সরোজকুমারের প্রত্যুত্তর। দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

অধ্যাপনার চাকরি, প্রভাতকুমার কলেজ, কাঁথি ('দু মাস', অগাস্ট—সেপ্টেম্বর)।

অক্টোবর, দিল্লি যাত্রা, নতুন চাকরি, কমার্সিয়াল কলেজ।

'নতুন সাহিত্য ও সমালোচনা', বিনয় ঘোষ, গ্রন্থের "সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা" অংশে: "...সমর সেনের কবিতাগুলির ভিতর থেকে যদি 'ধূসর' ও 'হাহাকার' শব্দ দুটি বাদ দিয়ে পড়া যায় তাহলে বাকি যা থাকবে তাতে মনোবৈজ্ঞানিকের কৌতূহল জাগতে পারে, সমালোচকের নয়।..." দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

১৯৪১

বিবাহ (২৮শে এপ্রিল), হরিপ্রসন্ন সেনের কন্যা সুলেখা সেনের সঙ্গে।

"বামপন্থী কবি", প্রবন্ধ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'নিরুক্ত' আষাঢ় ১৩৪৮, "আধুনিক বাংলা কাব্যে বামপন্থী কবিতা বলে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে শোনা যায়। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রের বামপন্থা যে সাহিত্যে আসতে পারে সে সম্বন্ধে আজকের দিনে সন্দেহ প্রকাশ করা নির্বুদ্ধিতা। কিন্তু সত্যিকারের বামপন্থা বাংলা কবিতায় প্রশ্রয় পেয়েছে কিনা বা প্রশ্রয় পেয়ে থাকলেও তা দিয়ে সত্যিকারের কবিতা হয়েছে কিনা তার নিখুঁত বিচার আজ পর্যন্ত কোনো সমালোচক করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না।...অনেক সমালোচক সংস্কারবাদকে,

এমন কি, দৃষ্টিভঙ্গীর সামান্য পরিবর্তনকেও বামপন্থা বলে আখ্যাত করেছেন। প্রচলিত আদর্শকে অস্বীকার করাই বামপন্থার লক্ষণ আর প্রচলিত আদর্শের অস্তিত্ব বজায় রেখে তার গাত্রমার্জনা করাই সংস্কারবাদ। কাজেই এ দুয়ের পার্থক্য আকাশ-পাতাল না হলেও অসামান্য। যে ভাবক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে বহুকাল যাবৎ কবিদের চিন্তাধারা, কল্পনা বা স্বপ্ন চারিদিকে প্রসারিত হয়েছে সংস্কারবাদ তার গায়ে বিন্দুমাত্রও আঘাত আনে না। কিন্তু বামপন্থা তাকে আঘাত দেয়; নূতন, স্বতন্ত্র ভাব-রাজ্য গড়ে তোলাই তার কাজ। উর্বশীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে-স্বপ্ন, যে-অনুভূতি তৈরী করেছিলেন সংস্কারবাদী কবি সে-স্বপ্ন বা অনুভূতির মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, উর্বশী-কামনা তার তেমনি আছে, সে তাই আকুল হয়ে প্রশ্ন করে উর্বশী তার 'মধ্যবিত্ত রক্তে' আসবে কিনা। এই মধ্যবিত্ত রক্তের অধিকারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শুধু এটুকু প্রভেদ যে দুজন উর্বশীকে দেখেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিতে, কল্পনার সামান্য পরিবর্তন ছাডা সংস্কারবাদী চেতনা আর কিছু করবার মত খুঁজে পায় না। কিন্তু বামপন্থী কবির মনে উর্বশী সম্বন্ধে সামান্য মোহও প্রশ্রয় পেতে পারে না; তার ধর্মই নয় অলীক কল্পনার গায়ে রঙ ফলানো, ভাব-বিলাসীর সঙ্গে সমানে একটি পা-ও হেঁটে যেতে সে নারাজ।...বাংলাদেশে দেখা যায় সাম্প্রতিক কবি মাত্রই উপাধি হিসেবে বামপন্থী কথাটা ব্যবহার করে চলেছে। দুর্বল, অনাসক্ত, পলায়নবাদী সমস্ত স্তরের কবিচিত্তই দায়িত্বহীন সমালোচকদের কাছ থেকে বামপন্থীর খেতাব লাভ ক'রে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে। বামপন্থা-ভ্রষ্ট এই পতিতদের মর্য্যাদা এমন কি প্রাচীনপন্থী, নিষ্ঠাবান ভাববাদীদেরও বহু নিম্নে, কারণ শেষোক্তরা অকারণে পাঠকদের বিভ্রান্ত ক'রে তোলেনা।"

১৯৪২

'নানাকথা', কবিতা ভবন, দাম বারো আনা, প্রকাশক সমর সেন, ২০২ রাসবিহারী এ্যাভেনিয়ু, মুদ্রাকর ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কলকাতা, মে; উৎসর্গ: 'বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় করকমলে, যদিদং সর্বং মৃত্যুনাপ্তং সর্বং মৃত্যুনাভিপন্নং / কেন যজমা শে মৃত্যোরপ্তিমতিমুচ্যত ইতি।'

'কবিতা', আশ্বিন ১৩৪৯, 'নানাকথা'র গ্রন্থ সমালোচনা, মণীন্দ্র রায়। দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'পরিচয়', ফাল্গুন, 'নানাকথা'র সমালোচনা, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দ্র. 'পুনর্মুদ্রণ'।

১৯৪৩

'Tendencies in Modern Bengali Poetry', Abu Sayeed Ayyub, *Longman's Miscellany*,

"The third phase of modern Bengali poetry, beginning

with the forties is the phase of communism and near communism. Marxists would of course characterise the development of these three phases as a dialectical movement; and even a non-Marxist will have to admit that the present return to extraversion is extraversion at a higher and more self-conscious level than the proletarian rhapsodies of its first phase. Bengali poetry has learnt a good deal during the intervening period of introspective analysis and preoccupation with technique. It is true, though, that leftism has become the literary fashion of the day and, the less competent a writer is, the more anxious he is to be meticulously *à la mode.* Amongst the genuine poets of the left Samar Sen writes with charm and intelligence and a refreshing freedom from ideological regimentation. . ."

'খোলা চিঠি', কবিতা ভবন. 'এক পয়সায় একটি গ্রন্থমালা'—১২ নং', দাম চার আনা. প্রকাশক সমর সেন, ১২বি দরিয়াগঞ্জ. দিল্লি. মুদ্রাকর: ব্রজেন্দ্রকিশোর সেন, মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস, ৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার. কলিকাতা, জুলাই।

'চতুরঙ্গ', পৌষ ১৩৫০. 'খোলা চিঠি'র সমালোচনা, সুরেশ মৈত্রেয়. দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

'শনিবারের চিঠি', অগ্রহায়ণ, ১৩৫০, "আত্মানং বিদ্ধি: আপনাকে জান —প্রাচীন ভারতবর্ষের তপোবনের ইহাই বাণী। সেকালের মুনি ঋষিরা যেরকম যুগযুগান্ত টাইম লইতেন, সেই তুলনায় কবি সমর সেনের 'আত্মসমালোচনা' বহু-বিলম্বিত নয়—'একদা আমরা ছিলাম বিমর্ষ বাঁদর / আজ আস্ফালনে মত্ত যেন বীর হনুমান। / সেতুবন্ধের অনেক বাকি।' এক, নিজেকে বুঝাই মুনি-জনোচিত অতিশয় কঠিন কাজ—তাহাতে স্বদলবলে নিজেকে বোঝা! কবি সমর সেন অল্প বয়সেই একটা ইতিহাস সৃষ্টি করিয়া গেলেন। কবির সবিনয় উক্তি আমরা মানিবনা, সেতুবন্ধের আর বাকি নাই। নল, নীল, গয়, গবাক্ষদের আত্মদর্শন যখন এত সহজেই ঘটিতেছে, তখন বাংলা কাব্য—সীতার উদ্ধারে আর বিলম্ব নাই। আধুনিক লঙ্কা 'কবিতা ভবন' হইতে মিত্র বিভীষণের সাহায্যে অচিরাৎ তিনি উদ্ধৃত হইবেন। তাহার পর অগ্নিপরীক্ষা।..."

১৯৪৪

সুকান্ত ভট্টাচার্য 'অরণি', ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "ছন্দ ও আবৃত্তি" প্রবন্ধে লিখলেন, ..."গদ্য ছন্দে সমর সেনই দেখা যাচ্ছে আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয়।"

'তিনপুরুষ', 'সংকেত ভবন, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট থেকে কামাক্ষী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও ২০এ, গৌর লাহা স্ট্রীট, এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স থেকে জিতেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক মুদ্রিত,' জুন।

কলেজের চাকরি ত্যাগ,
বিজ্ঞাপন অফিসের কাজ (দিন 'সাতেক')
দিল্লির অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে সংবাদ বিভাগে কাজ।

১৯৪৫

"কালের পুতুল", বুদ্ধদেব বসু, "…সমর সেন সম্বন্ধে এখন জিজ্ঞাসা করার ইচ্ছা হয় যে অত্যন্ত পরিণত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি কি যৌবনের পরিপূর্ণ ঋতুতেই নিঃশেষিত হ'য়ে গেলেন ?"

"কাব্য সৃষ্টিও সমর সেনের 'তিন পুরুষ'," 'পরিচয়', পৌষ ১৩৫২, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়. : "…সমরবাবুর সামনেও আজ এই মৌল প্রশ্ন : কাব্যবস্তুর অন্তর্বিরোধের গোলকধাঁধায় তিনি জীবনের এই ক্রমিক ধারাবাহিকতার যোগসূত্রটি খুঁজে পাবেন, না মাত্র কয়েকটি উজ্জ্বল expression-এর কবি-রূপেই তাঁর দুর্লভ কবিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে ? আজকাল তিনি ক্রমশই কম লিখছেন দেখে আমরা রীতিমত শঙ্কিত।" দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

Marxist Miscellary, Vol V, 'Modern Bengali Poetry.' Debiprasad Chattopadhaya. দ্র. ইংরাজি রচনা।

Modern Bengali poems, Edited by Debiprasad Chatterjee, Signet, 'Adolescent Poems' শিরোনামে সাতটি কবিতার অনুবাদ : An evening air, The march of time, Spring, The last ditch, The land of Mahuas, New year resolution, The Intellectuals. শেষোক্তটি Martin Kirkman-এর অনুবাদ, অন্য ছয়টি সমর সেন-কৃত। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, অনুবাদ কবিতাগুচ্ছের 'Adolescent Poems' শিরোনাম দিয়েছিলেন সমর সেন স্বয়ং।

১৯৪৮

An Acre of Green grass, Buddhadeva Bose, "…In later years, he has been much inclined to make current politics his theme, ably demonstrating the essential incompatibility of poetry and politics." দ্র. ইংরাজি রচনা।

১৯৪৯

কলকাতায় *The Statesman* পত্রিকায় সাব এডিটর।

'কবিতা', পৌষ ১৩৫৬ সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমির'-

এর গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে অশোক মিত্র "...রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতায় নতুন নিক্কন দিতে তখন যে নবস্থবিরা অগ্রসর হয়েছিলেন, আমাদের কিশোর কল্পনাকে মুগ্ধ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই। কিন্তু অভিভূত করেছিলেন সম্ভবত মাত্র দু-জন : জীবনানন্দ দাশ এবং সমর সেন। শেষোক্তজন আমাদের মনোহরণ করেছিলেন বোধহয় তাঁর নির্দয়তা দিয়ে...।"

১৯৫১

'The Alien Corn', *The Statesman*, 30 Sept-সংখ্যায় প্রকাশিত আধুনিক কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ।

১৯৫৩

"সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা", প্রবন্ধ, 'কৃত্তিবাস', প্রথম সংকলন, শ্রাবণ ১৩৬০।

১৯৫৪

'আধুনিক বাংলা কবিতা', বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত [সমর সেনের নয়টি কবিতা : রোমন্থন, স্মৃতি, মুক্তি, একটি মেয়ে, মহুয়ার দেশ, নাগরিক, কয়েকটি দিন, For thine is the Kingdom, বকধার্মিক]

'সমর সেনের কবিতা', সিগনেট, কবি পরিচিতিতে বলা হয়, "আধুনিক বাংলা কবিতায় নিজেই একটা যুগের প্রবর্তন করেছিলেন সমর সেন। তাঁর কবিতা এতই অভিনব এক গদ্যছন্দে লেখা যে তার উৎস খুঁজতে যাওয়া নিরর্থক। কবিতার বিষয় নগর, নগর জীবনের ক্লান্তি, বিকার, বিক্ষোভ, সামাজিক বিরোধ আর শ্রেণী সংঘর্ষ। সাম্প্রতিক নগর জীবনের সমগ্র স্বরটি যেন ধরা পড়েছে এই সব কবিতায়।..."

১৯৫৫

"সমর সেনের কবিতা" (আলোচনা), অতীন্দ্রকৃষ্ণ বসু, 'কৃত্তিবাস', ফেব্রুয়ারী।

১৯৫৬

'পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা', আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত [সমর সেনের পাঁচটি কবিতা : ইতিহাস, স্মৃতি, মুক্তি, শেষ বসন্ত, একটি মেয়ে]

১৯৫৭

মস্কোয় অনুবাদকের চাকরি, বিদেশী ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশনালয়-এ। নতুন ঠিকানা : Prospect Mira, Dom 118, Kvartira, 279 Moscow.

বোম্বের '*The Economic Weekly*'তে 'Moscow Letter'-এর অনিয়মিত প্রকাশ শুরু।

অনুবাদ গ্রন্থ : অন্ধ সুরকার (করলেঙ্কো), কসাকস্ (টলস্টয়), চেখভ (এবুমিলভ), স্টোরি অব এ রিয়েল ম্যান (পলভয়) ।

১৯৫৮

"সমর সেন" [কবিতা] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, "...ছন্দ / ছুঁড়ে দিয়েছিলে রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্যদের দিকে, তখন ভাবিনি / তুমি নিজেই কোনোদিন / সত্যেন দত্তের মতো নির্ভেজাল মাত্রাবৃত্ত কিংবা ত্রিপদী হয়ে যাবে ।..." 'কৃত্তিবাস', দশম সংকলন, ১৩৬৫ ।

'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, সুকুমার সেন, "...শ্রীযুক্ত সমর সেন (জন্ম ১৯১৬) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু ও শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক রূপে কাজ করিয়াছিলেন । এই বয়ঃকনিষ্ঠ কবির রচনা প্রথম হইতে 'কবিতা'য় বহুমানিত হইয়াছিল । নগরজীবনের নোংরামি ও ক্লান্তি সমরবাবুর কবিতায় বার বার প্রতিধ্বনিত, সেই সঙ্গে সাঁওতাল পরগণার শান্ত পরিবেশের মাধুর্যও । সুধীন্দ্রবাবুর মতো ইঁহারও মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতি অবজ্ঞা ও বিতৃষ্ণা, তবে সমরবাবুর তিক্ততা ঝাঁঝালো এবং তাহার একটা কারণ মার্কসবাদের দিকে ঝোঁক । (সুধীন্দ্রবাবু মার্কসবাদী ছিলেন না ।) কবিতাগুলি সাধারণত স্বল্পকায় গদ্যকবিতা । ছন্দ : স্পন্দ ও মিল এড়াইবার চেষ্টা এবং রবীন্দ্রনাথের লিপিকার ছন্দের অনুসরণ সুব্যক্ত । রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছত্রের যথেষ্ট ব্যবহার আছে এলিয়টের ধরণে..."

অনুবাদ গ্রন্থ : গোর্কির তিনটি নাটক 'পাতিবুর্জোয়া', 'মরসুমী লোক', 'শত্রুপক্ষ', টলস্টয়ের 'ইভান্ ইলিচের মৃত্যু', চেখভের 'তিন বোন', ইভান বুনিনের 'আপেল সৌরভ' ।

১৯৬০

History of Bengali Literature, Sukumar Sen, Sahitya Akademi, "Samar Sen (b. 1916), the youngest writer of the new school of poetry, succeeded in catching something of the dispassionate and somewhat pessimistic view of the lower middle class life of city. His attitude is satirical, and his cynicism a little precocious ."

১৯৬১

দেশে প্রত্যাবর্তন ও বিজ্ঞাপন সংস্থায় কাজ ('সাত মাস')

১৯৬২

'*The Lconomic Weekly*'-তে শেষ কিস্তির 'Moscow letter'-এর প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি।

H.ndusthan Standard-এ যোগদান, যুগ্ম সম্পাদক।

১৯৬৩

ব্রিটেন ভ্রমণ, রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণনের ব্রিটেন সফরকালে ব্রিটিশ সরকারের আমন্ত্রণে।

'একালের কবিতা', বিষ্ণু দে সম্পাদিত, [সমর সেনের তিনটি কবিতা : স্মৃতি, নাগরিক, জাতীয় সংকট]

১৯৬৪

Hindusthan Standard ত্যাগ, 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংবাদ পরিবেশন নিয়ে মতানৈক্য।'

'শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি', রঞ্জিত সিংহ [কবিতা বিষয়ক গ্রন্থ], সমর সেনের কবিতা নিয়ে আলোচনা, পৃ. ৯৫-১০৪।

Now-এর আত্মপ্রকাশ, অক্টোবর, হুমায়ুন কবিরের আহ্বানে সম্পাদক হিসেবে যোগদান। "...*Now* will be a forum for free discussion, not only on polilical social and economic affairs, but also on literature, the arts and entertainment. It will focus attention, on major events and issues, analyse them without fear...", First Editorial, *Now*, vol. I, No I, 1964.

১৯৬৫

"ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা", অশোক মিত্র 'কবিতা থেকে মিছিলে', ১৯৭৮, " প্রথম থেকেই সমর সেন-সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরাগী অনুকারকের সংখ্যা প্রচুর। অনুরাগাধিক্যের উচ্ছ্বাসে শেষোক্তরা এত পরিমাণ নকলনবিশি নিকৃষ্ট কবিতা লিখতে ব্যাপৃত হলেন যে তন্নিষ্ঠমনারা ভড়কে গেলেন।...সমর সেন, সম্ভবত আতঙ্কগ্রস্ত হয়েই, গদ্য ছন্দ বর্জন করে কিছু সময় ঈশ্বর গুপ্তের পয়ারের আড়ালে আত্মগোপন করলেন, তারপর একদিন তাঁর লেখা বন্ধ হয়ে গেলো। অক্ষম অনুকারকদের খর্পর থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই তিনি নীরবতা অবলম্বন করলেন কিনা সেটা বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটা মস্ত প্রশ্ন থেকে যাবে। তাছাড়া, যে-আবেগের তাড়নায় শাণিত, ক্লান্ত, বিদ্রূপ-অবিশ্বাস ছড়ানো লিরিকের উত্তর সময়ে নতুন সমাজের স্বপ্ন বুনতে তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, গোঁজামিল স্বাধীনতা প্রাপ্তি-দেশ বিভাগ-শরণার্থী সমস্যার রক্তরোলে তা আস্তে আস্তে সম্পূর্ণ মিলিয়ে আসে। পেশাদার আশাবাদী হলে তদ্‌সত্ত্বেও সমর সেন

লিখে যেতেন, কিন্তু, বরাবরই সাধুতার জন্য বিখ্যাত তিনি, হয়তো তিনি ভেবে ঠিক করলেন, কবিতা-লেখার প্রস্তাব অতঃপর প্রক্ষিপ্ত। . "

"একটি অপ্রকাশিত কবিতা", সমর সেন, 'চতুরঙ্গ' শ্রাবণ ১৩৭২। এটি-ই সম্ভবত পত্রিকায় প্রকাশিত সমর সেনের সর্বশেষ মৌলিক কবিতা। প্রথম পঙ্‌ক্তি : 'একদা বেজায় ক্ষমতা ছিল আমার নেতার!'

১৯৬৬

"রোমান্টিক কবি", অরুণকুমার সরকার, 'দৈনিক কবিতা', অক্টোবর-ডিসেম্বর, "সমর সেন কবিতাকে কিছু সিরিয়াসলি নিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। ফলত কবিতাকে দিয়ে কিছু ঠিকে কাজ করিয়ে নেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। রুদ্ধবতি আর রাজনীতিব সামান্য ফাইফরমাশ খেটেই তাঁর কবিতা আট বছরের মধ্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।...তেইশ বছর হল সমর সেন কবিতা লেখা বন্ধ করেছেন। ইতিমধ্যে বাংলা কবিতার চেহারা আপাদমস্তক পালটে গেছে; অনেকে উদ্বাস্তু হয়েছেন, কেউ কেউ ডোবা নালা পরিষ্কার করে নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছেন কিন্তু আশ্চর্য এই যে সমর সেনের প্রলম্বিত ছায়া এখনো আকাশে পা তুলে বেশ কিছু কবির ঘাড়ে, তাঁরা স্বীকার করুন চাই না করুন, ভর করে আছে। . কবুল করতেই হবে যে সমর সেন একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বয়ঃসন্ধিকালের ঔদ্ধত্য তাঁর কবিতায় যেমন সূচীমুখ, পরবর্তীকালের আর কারুর রচনাতেই তেমন নয়। তাছাড়া, এটাই হয়তো সমর সেন সম্বন্ধে সব থেকে বড়ো কথা, বাংলা কবিতাকে যাঁরা গদ্যের কাছাকাছি এবং আজকের অবস্থায় এসেছেন তিনিই নিঃসন্দেহে তাঁদের অগ্রগণ্য।...যে-সব কারণে সমর সেনের খ্যাতি তার জন্যে নয়, অন্য কারণে আমি তাঁর কবিতা পড়ে থাকি এবং পড়ব। একটি জাত রোমান্টিক কবিকেই তাঁর মধ্যে আমি খুঁজে পাই।..."

"কাশীধাম কতদূর" তারাপদ রায়, 'দৈনিক কবিতা' অক্টোবর-ডিসেম্বর, "...বাংলা কবিতার রাজ্য থেকে সমর সেনের স্বেচ্ছা-নির্বাসন, খ্যাতি ও ক্ষমতার চূড়া থেকে ফর্ম বজায় থাকতে থাকতে ভালো স্পোর্টসম্যানের মত খেলার মাঠ থেকে সরে যাওয়া—এ নিয়ে বাংলা কবিতার পাঠক-সমালোচক বহু নিন্দা-প্রশংসা করেছেন। সমর সেনের সম্বন্ধে শুনেছি তিনি এই সব নিন্দা প্রশংসার ধার ধারেন না। যে মাঠে তিনি খেলছেন না সেই মাঠের ব্যাপার নিয়ে নাকি তাঁর আর কোনো কৌতূহল উদ্বেগ নেই।

তাই একবার ভেবেছিলাম শোনা কথা যাচাই করে আসি। বেলা আড়াইটার সময় সমর সেনের সঙ্গে দেখা করতে তাঁর অফিসে গিয়েছিলাম। দেখলাম তিনি নেই, দুটোর সময় চলে গেছেন. প্রতিদিনই তাই। সমর সেনের দিন দুটোয় শেষ হয়ে যায়, তাঁর সপ্তাহের প্রতিদিনই শনিবার, আধা দিন।

ভীষণ জমজমাট অবস্থার মধ্য থেকে কি করে যে হঠাৎ বেলা দুপুরে তিনি একা একা ফাঁকা রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারেন, কে জানে ?..."

" 'মদনভস্মের প্রার্থনা' : সমর সেন", অরুণ সেন, 'কবিতা পরিচয়', আষাঢ় ১৩৭৩।

"সমর সেনের কবিতা", কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, 'বিচিত্রা', ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৩।

"সমর সেনের কবিতার ইমেজ", অশ্রুকুমার দিকদার, 'এক্ষণ', অক্টোবর।

১৯৬৭

"সমর সেনের কবিতা" ['আধুনিক সাহিত্য' বিভাগ], অমলেন্দু বসু, 'চতুরঙ্গ', শ্রাবণ ১৩৭৪, দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

১৯৬৮

মালিকপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ। অন্যতম স্বত্বাধিকারীর ভাষায় "...I am feeling increasingly unhappy at the Editorial of *Now*. It has almost become a mouthpiece of the C. P. I. M." 'বাবু বৃত্তান্ত'।

Now-এর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ। ১২ জানুয়ারি সংখ্যায় ঘোষণা, "I wish to inform all readers that with this issue I cease to be editor of *Now*."

এরপর অজিত রায় মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় *Now* প্রকাশিত হল।

Frontier সাপ্তাহিকের প্রকাশ, ১৪ই এপ্রিল, সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ। প্রথম সংখ্যায় 'Calcutta Diary'তে চরণ গুপ্ত [অশোক মিত্র], "Here we surface again. We have a different address and different masthead, otherwise everything is very nearly the same."

"একটি পত্রিকার কথা," অশোক মিত্র, 'এক্ষণ', ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৫, দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

"কার্ল মার্কসের কবিতা", মার্কসের চারটি কবিতার অনুবাদ, 'এক্ষণ', কার্ল মার্কস সংখ্যা ১৯৬৮।

১৯৬৯

Selected Poems of Samar Sen, Ed. by Pritish Nandy, Dialogue Calcutta.

"সমর সেনের কবিতা," কণককান্তি দে, 'অনুষ্টুপ', তৃতীয় বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৩৭৬।

১৯৭০

'দেশব্রতী,' ১০ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় "বাট্রাণ্ড রাসেল প্রসঙ্গে" রচনায়

'শশাঙ্ক' [সরোজ দত্ত], ''কলকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক 'ফ্রন্টিয়ার' কাগজ ভীষণ 'মাওপন্থী'। নানা রঙবেরঙের 'মাওপন্থী'র ভীড় সেখানে। তাদের একমাত্র কাজ মনে হয়, কি ভাবে চারু মজুমদারের নেতৃত্বে পরিচালিত সি. পি. আই. (এম. এল.) মাও সে তুঙের তত্ত্ব ও উপদেশ বিস্মৃত হয়ে বিপথে চলছে তা বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। কেরালার কুন্নিকল থেকে শুরু করে কলকাতার নাম ভাড়ানো মুচলেকাপন্থী নাট্যকার পর্যন্ত সবাই পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করে চলেছেন 'ফ্রন্টিয়ারের' পাতায়। আর মাঝে মাঝে এদের এই সব তাত্ত্বিক উদ্‌গারের বিরুদ্ধে কঁচাকঁচ কাঁচি চালানো একটু আধটু মৃদুমন্দ প্রতিবাদ পত্রাকারে পত্রিকাস্থ করে সম্পাদক মশাই তার 'বস্তুনিষ্ঠা' ও 'নিরপেক্ষতা'র পরিচয় দিয়ে সকলকে ধন্য করে থাকেন।...বুর্জোয়া ও প্রকাশ্য চীন-বিরোধী সংশোধনবাদী কাগজগুলোর কথা ছেড়েই দিলাম, ফ্রন্টিয়ারের মত যারা মাও-এর নামাবলি গায়ে জড়িয়ে থাকে এবং মাও সে তুঙ ও পিকিং-এর দোহাই পেড়ে সি. পি. আই. (এম. এল.) ও কমরেড চারু মজুমদারকে বাপান্ত করা যাদের পেশা, তারাও চীন বিরোধী যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে...।''

'স্বনির্বাচিত,' শান্তনু দাস, রুদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত-কবিতা সংকলনে নিজের কথায় : ''জন্মস্থান, জন্ম সাল, বর্তমান ঠিকানা : কলকাতা, ১৯১৬, ১৫ সি, সুইনহো স্ট্রীট, কলকাতা-১৯। জীবিকা : সাংবাদিক। প্রথম প্রকাশিত কবিতা : মনে নেই। প্রকাশ সময় : মনে নেই। কবিতাটি কোন পত্রিকায় মুদ্রিত : খুব সম্ভবত 'পূর্বাশায়'। প্রথম জীবনে কার কবিতা আপনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল ? বাল্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলাম। প্রিয় বিদেশী কবি : একাধিক। তিরিশের যুগে এলিয়ট ও ইয়েটস্। সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে কবির ভূমিকা : এখন ঔপন্যাসিকের চেয়ে কম। কবিতার ক্ষেত্রে তার প্রভাব : × । স্বরচিত প্রিয় কবিতাটি কবে, কোথায় প্রকাশিত : ['একমাত্র তোমাকে সত্য বলে জানি'] ১৯৩৭-৪০-র মধ্যে। কলকাতায়। 'কবিতা' পত্রিকায়। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক কবিতার স্থান : জানি না, কেননা সাহিত্যের সঙ্গে যোগাযোগ এখন বলতে গেলে নেই। আধুনিক কবিতার ভবিষ্যৎ : ভবিষ্যৎ ভাবি, বর্তমানে কেবা মরে ?''

Sanjoy ছদ্মনামে **'Frankly Speaking'** নিবন্ধে বিষ্ণু দে প্রসঙ্গে নিজের কবিজীবন সম্পর্কে, **"...the trouble is this writer has been out of touch with poetry for the last 24 years. Alas! It no longer rings a bell in him. When he is forced to look up some of his own stuff, weariness and boredom overtake him."** ***Frontier*****, April 11, 1970.** প্রবন্ধটি পরে ***'Water My Roots*** **:**

Essays by & on Bishnu Dey,' (Ed. by Samir Dasgupta)—গ্রন্থে 'The Still Centre' শিরোনামে মুদ্রিত।

The Complete Poems, Samar Sen, tr. and introduced by Pritish Nandy, Writers' Workshop.

১৯৭২

'সীমানা,' 'ফ্রন্টিয়ারে' প্রকাশিত প্রবন্ধের বাংলা সংকলন, প্রথম সংখ্যা, সম্পাদক সমর সেন। ঐ সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে দীপেন্দু চক্রবর্তী, 'সাম্প্রত', শ্রাবণ ১৩৭৯ সংখ্যায়, "...১৯৭০ সালে জাঁ পল সার্ত্র-সম্পাদিত 'লোতাঁ মদার্ণ' পত্রিকায় ফিলিপ গাভি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দৃশ্যপট বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 'ফ্রন্টিয়ার'-এর নির্ভীক ও চরমপন্থী মতাদর্শের উল্লেখ করেন।...'ফ্রন্টিয়ার'-এর বিশেষত্ব এবং গুরুত্বের কয়েকটি কারণ—এক, যখন অন্যান্য তথাকথিত নিরপেক্ষ সংবাদপত্র সরকারী কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কিছু নয়, তখন 'ফ্রন্টিয়ার' একটা স্বাধীন মনোভাব বজায় রাখতে পেরেছে, এবং এর ফলে বিভিন্ন মতামতের নাটকীয় সংঘাতের মঞ্চ হয়ে উঠতে পেরেছে; দুই, এস্ট্যাব্লিশমেন্ট-এর বিরোধিতা, যা শুধু লেবেল অন্যান্য সাংস্কৃতিক পত্রিকায় 'ফ্রন্টিয়ার'-এর ক্ষেত্রে তা জন্মগত স্বভাব; তিন, 'ফ্রন্টিয়ার'-এর আপোস-বিরোধিতা ও সেই কারণে বামপন্থী মনোভাবের জন্য তাকে ঘিরে একটি আত্মসচেতন মননশীল বামপন্থী সাংস্কৃতিক বৃত্ত গড়ে উঠেছে, ইদানীং তার পাতায় প্রগতিবাদী পত্রিকাগুলোর বিজ্ঞাপন এর প্রমাণ..." ঐ একই সংখ্যার সমালোচনা প্রসঙ্গে নিঃশঙ্ক গুপ্ত, 'অনুষ্টুপ', সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যায়, "...আমরা এমন একটি পত্রিকার সীমানা সন্ধান করলাম যার সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ভূমিকা বা নিরবচ্ছিন্ন প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা প্রমাণিত সত্য। কোন পত্রিকাই এদেশে আর নেই যা ফ্রন্টিয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে একই সাফল্য দাবি করতে পারে। এই বিশেষ সত্যটুকুই আমাদের ফ্রন্টিয়ার নিয়ে স্বপ্ন দেখতে উৎসাহিত করে; জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে, দেশের বিপ্লবী সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 'সীমানা'র মহৎ ভূমিকা কল্পনা করতে অনুপ্রাণিত করে। আমরা চাই ত্রুটি-বিচ্যুতির দ্বান্দ্বিক উত্তরণের মধ্য দিয়েই ফ্রন্টিয়ারের সীমানা বিপ্লবকে স্পর্শ করুক।"

"চন্দ্রবিন্দু বাদে," প্রবন্ধ, 'বুদ্ধিজীবী ও নানা প্রশ্ন,' সংকলন।

"বন্দেমাতরম্," প্রবন্ধ, 'এক্ষণ', অক্টোবর।

১৯৭৩

"আধুনিক কবিতার আততি—সমর সেন", সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সুমেরু-কুমেরু', কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮০।

১৯৭৪

'তরী হতে তীর,' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, '...সমর সেন (১৯৩৭-৩৮ সালেই যার তরুণ প্রতিভা গগন চুম্বনের ইঙ্গিত দিয়েছিল—ইচ্ছা করেই এভাবে বলছি তাকে যুগপৎ রুষ্ট এবং পুলকিত করবার আশায়—কিন্তু কবিকে তো হতে হয় স্থিতধী, চিত্তের প্রসাদ বিনা সৃষ্টির উর্বরতা নষ্ট হয়ে যায়, আর হয়ত তাই আমাদের অনেকের বহু প্রীতিভাজন এই গুণধর অতি দ্রুত নির্বাক হয়ে পড়লেন, বহু বৎসর ধরে বহু অবান্তর কর্মে লিপ্ত থাকলেন, পরভাষায় গদ্য লিখনে যশস্বী হলেন কিন্তু বাংলা কবিতা আর তাকে পেল না, অধুনা সমাজ বিপ্লব বিষয়ে তার গভীর ব্যগ্রতা তাই প্রকাশ হতে দেখি নিখাদ ইংরিজী প্রবন্ধে, যার দৌড় এদেশের জীবনে বেশিদূর কেমন করে হবে ?)…"

Sunday সাপ্তাহিকে 'Politics of Alcohol' ও অন্যান্য প্রবন্ধের প্রকাশ।

১৯৭৬

"প্রস্তুতিপর্ব," প্রবন্ধ, 'প্রস্তুতিপর্ব' পত্রিকা।

১৯৭৭

'এমার্জেন্সীয় অমাবস্যা ও আমাদের বুদ্ধিজীবীকুল', 'প্রস্তুতিপর্ব', এপ্রিল, শঙ্খ চৌধুরী : '...জ্যোতির্ময় দত্ত ও গৌরকিশোর ঘোষ হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে, সেনসরশিপকে অগ্রাহ্য করে কিছু নিষিদ্ধ রচনা প্রকাশ করে জেলে চলে যান। তাঁদের 'ব্যক্তিগত সাহস'টুকুকে সম্মান দিয়েও বলতে হয়, নেহাৎই 'আমরা' থেকে চিরকাল তাঁরা বিচ্ছিন্ন থেকেছেন বলেই 'আমি'-র এই এক ঝলকেই নিঃশেষিত বিদ্রোহ। অন্য কোন পথও হয়ত তাঁরা খুঁজে পান নি বা জানা ছিল না। তাঁদেরই মতন মারদাঙ্গা কোন লেখা লিখে সমর সেন যদি জেলে চলে যেতেন তাহলে স্থায়ী লাভ কতখানি হত জানি না, ক্ষতি হয়ে যেত অপরিসীম। ঐ অভূতপূর্ব সংকটের মুহূর্তে, সেনসরশিপের দাপট, প্রেস বদল, লেখক ও লেখার উপাদানের সমস্যা এবং সর্বোপরি বাম রাজনীতির বন্ধ্যাদশা জনিত হতাশা—ইত্যাদি বাধাকে অগ্রাহ্য করেও মাসের পর মাস যে দৃঢ়তা নিয়ে তিনি ফ্রন্টিয়ার প্রকাশ করে গিয়েছেন তার প্রকৃত মূল্যায়ন কোন না কোন সময়ে নিশ্চয়ই হবে। [অন্যদের কাছে যেটা] এক বিশেষ 'অপরিণামদর্শী' শাসকের সন্ত্রাসী রাজত্বকালের বিরুদ্ধেই শুধু বিদ্রোহ, সমর সেনের মতন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের কাছে সেটা একটাই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অংশ মাত্র, যে যুদ্ধ এমার্জেন্সীর আগেও ছিল, পরেও থাকবে। ..."

"জরুরী অবস্থায় বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা," প্রবন্ধ, 'আগামীকাল' পত্রিকা, অক্টোবর।

"জরুরী অবস্থা, বুদ্ধিজীবী ও সমর সেন," অমিতাভ দাশগুপ্ত, 'আগামী-কাল', অক্টোবর।

"শত্রু মিত্র" প্রবন্ধ, 'দর্পণ' (?)

"নির্বাচন মার্চ ১৯৭৭," 'আনন্দবাজার'।

"উড়ো খৈ", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩, ২৪ অগাস্ট, ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯ অক্টোবর, ৪ঠা ও ৩০শে নভেম্বর।

১৯৭৮

Naxalbari and After, a Frontier Anthology, (a moving Human document of a turbulent decade), two vols. Ed. by Samar Sen, Debabrata Panda, Ashish Lahiri : Kathashilpa. "...Naxalbari exploded a myth and restored faith in the courage and character of the revolutionary left in India. It seemed that the ever-yawning gap between precept and practice since Telengana would be bridged. Indeed, the upheaval was such that nothing remained the same after Naxalbari,...*Frontier* reflected the new trend. Many minds found expression in it—critical, brilliant, flamboyant, impetuous, analytical, crude, romantic, intrepid minds. Though not a participant, *Frontier* became associated with the movement. .." Foreword, Samar Sen, June 16 [Vol. I]

'Babes in Arms,' New Delhi, 30th Oct. সংখ্যায় '*Naxalbari and After*'-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে Marcus Franda, "...That so many controversial articles could appear in the pages of *Frontier* during precisely the period when Naxalism was such a red herring for the police and the state and central government is a tribute to the courage of Samar Sen and his associates. While Sen argues that *Frontier* was not a participant in the Naxalite movement, it is clear that he and his colleagues got as close to it—both in conviction and in coverage of the story—as was possible..."

'বাবু বৃত্তান্ত,' আশা প্রকাশনী, "...আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো—এবং এখনো হয়—যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে। চিন্তায় ও কর্মে সমন্বয় আনতে না পারলে বড় জোর 'বিপ্লবী' সাপ্তাহিক চালানো যায়, কিন্তু বিপ্লবী হওয়া যায় না।..." পৃ. ৩৫।

"আমার কালের কবিরা", মণীন্দ্র রায়, 'অমৃত', ২০শে জানুয়ারি

১৯৭৯

"সমর সেন : মদনভস্মের প্রার্থনা," অশ্রুকুমার সিকদার, 'পাহাড়তলী,' '৬'।

'মহাচীনের পথিক' (ডাক্তার নর্মান বেথুনের জীবনকাহিনী), অনুবাদ কল্যাণ চৌধুরী, কবিতাংশের অনুবাদ : সমর সেন, সুবর্ণরেখা।

'ঢেউয়ে ঢেউয়ে তলোয়ার', চেরবান্দারাজুর কবিতার বাংলা সংকলন, সমর সেনের অনূদিত কবিতা, 'জয় হবে আমাদের'।

১৯৮০

"মধ্যবিত্ত মানসের বিড়ম্বিত গ্লানি", শৈলেন মুখোপাধ্যায়, 'বালুকা', জুন।

"সমর সেন ও তাঁর কবিতা," অংশুমান বিশ্বাস, 'প্রস্তুতিপর্ব', অক্টোবর-ডিসেম্বর।

"সাগ্নিক কবি সমর সেন," মুক্তেশ বসু, 'রোচনা', ডিসেম্বর।

"চার্গাই", দেরেনিক দেমিরচান-এর গল্পের অনুবাদ, 'হরবোলা', শরৎ ১৩৮৭।

১৯৮১

'বিতর্কিকা,' মে-জুলাই, অন্য কয়েকটি বই-এর সঙ্গে 'বাবু বৃত্তান্ত' নিয়ে দুটি পৃথক রচনায় আলোচনা, আলোচক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও ইরাবান বসুরায়।

'শিলাদিত্য', সেপ্টেম্বর সংখ্যা, "বিশিষ্ট বাঙ্গালী কবি : নির্বাচিত কবিতা" পর্যায়ে "সমর সেন," পরিচিতি ও কিছু কবিতার পুনর্মুদ্রণ।

"সমর সেন," কবিতা, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভাতে পড়ল মাছি' (সংকলন) : "সবাই যখন রাজবাড়িতে/বেচতে গেলেন দাঁতের মাজন/একা তিনি চৌরাস্তায়/দাঁড়িয়ে শোনেন শিবের গাজন/ঢ্যাম-কুড় কুড় ঢ্যাম-কুড় কুড়/দূর থেকে সেই বাদ্যি আসে/বাদ্যি ঘিরে নাচছে আগুন/আগুন যে তাঁর শ্রদ্ধা-ভাজন।"

লণ্ডনের Monthly Review পত্রিকার Feb, 1981 সংখ্যায় *Naxalbari and After*-এর দুটি খণ্ডের একত্রে সমালোচনা-প্রসঙ্গে Lawrence Lifschultz : "...*Now* ran on a shoestring but served as a lifeline for progressive people in Calcutta and elsewhere in India Its (*Frontier's*) shoestring was even thinner but its readership was more avid than ever....Calcutta, indeed all of eastern India, was then being swept by mass agitations among its peasant and working classes, while students in Calcutta were

also on the edge of insurrection. The entire region seemed poised for a political explosion, and *Frontier* was the place where this was most clearly articulated...."

১৯৮২

'জীবন অন্বেষায় কবি সমর সেন,' নন্দরাণী চৌধুরী, পিপলস্ বুক পাবলিশিং, পৃ. ১৯১+৮। কবি সমর সেনের ওপর প্রথম পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ।

"বাংলা কবিতার অতিথিশিল্পী : সমর সেন", সুরজিৎ ঘোষ, 'প্রমা', অক্টোবর।

১৯৮৩

"সমর সেন : সাক্ষাৎকার", অমিতাভ সেন, সুভাষ বসু, 'কণ্ঠস্বর', মে।

১৯৮৫

'Rebel without a Pause', শ্যামলেন্দু ব্যানার্জির নিবন্ধ, সঙ্গে প্রীতিশ নন্দী-কৃত ৮টি কবিতার অনুবাদ ও 'বাবু বৃত্তান্ত'-র অংশ বিশেষ, *Illustrated Weekly of India*, 15th January, "Samar Sen has been fighting for years. As a poet, journalist and political firebrand. He has defied the system again and again, and often lost. And yet, in a strange kind of way, he has won. His magazine, *Frontier* survives, however precariously. His days as a poet are long over. What remains is a quiet reticence that hides his enormous strength, his convictions. Syamalendu Banerji profiles the man and his work,' দ্র. ইংরাজি রচনা।

"সমর সেনের কবিতা : দেয়ালের দিকে চলা", সুমিতা চক্রবর্তী, 'নান্দীমুখ', জানুয়ারি।

"সমর সেনের সঙ্গে আধঘণ্টা", সাক্ষাৎকার, সুমিতা চক্রবর্তী, 'এসময়,' এপ্রিল-জুলাই। "...প্রশ্ন: বুদ্ধদেব বসু ছাড়া আর কার কবিতা ভালো লাগতো আপনার ? উত্তর : বিষ্ণুবাবুর লেখা। প্রশ্ন : একজন সমালোচকের মতে—আপনার ও বিষ্ণু দে-র দুজনেরই লেখায় একটা সময়ে পরস্পরের প্রভাব পড়েছিলো। কথাটা কি ঠিক ? উত্তর : ঠিকই মনে হয়। প্রশ্ন : জীবনানন্দের লেখা কেমন লাগতো ? উত্তর : কিছু কিছু ভালো। প্রশ্ন : যেমন ? উত্তর : লাশ কাটা ঘরে—আরো দু'একটা। প্রশ্ন : তাঁর অন্য ধরণের কবিতা—প্রেম-প্রকৃতি—ধরুণ 'বনলতা সেন' ? উত্তর : না, ও রকম কবিতা—সে অনেক কথা বলতে হয়। আমি কোনো মন্তব্য করবো না। প্রশ্ন : রবীন্দ্রনাথ ? উত্তর : অল্প

বয়সে রবীন্দ্রনাথের লেখাকে খুব মূল্যবান মনে হয়নি। একটু স্পর্ধা ছিলো। এখন কেটে গেছে। এখন বুঝি তিনি বড় কবি।... প্রশ্ন : ...এখনকার বাংলা কবিতাচর্চা সম্পর্কে কিছু বলবেন ? উত্তর : না, কিছু বলবো না। প্রশ্ন : এখন আপনার কবিতা লিখতে ইচ্ছে করে না ? উত্তর : না। অনেকদিনই করে না। প্রশ্ন : কবিতার মধ্যে দিয়ে আজকের পাঠককে—আমাদের, কিছু বলার আছে বলে মনে হয়না আপনার ? উত্তর : কবিতা লিখে কি হবে ? ওতে কিছু হয়-না। প্রশ্ন : ...এই কাগজ—ফ্রন্টিয়ার করেই বা কি হবে ? কিছু হবে কি ? কিছু হচ্ছে ? তবু তো আপনি করছেন। এটা তো ছাড়েন নি। উত্তর : [বিরক্ত হলেন না। একটু হাসলেন। এতক্ষণের তুলনায় আর এক পর্দা বিষণ্ণ স্বরে বললেন—] একটা কিছু তো করতে হবে।..."

১৯৮৫

The Truth Unites, essays in tribute to Samar Sen, Edited by Ashok Mitra, Subarnarekha. "Samar Sen, I dare say, would hate this volume. He would detest the thought that has gone into the planning of the volume, as much as the pretentiousness he would claim to discern in some of the essays presented here. He fixes a jaundiced eye on all scholastic fare. Most of all, he abhors any ceremony, if that is not a mild way of putting it..." Ashok Mitra, 'Trapped in Integrity, an Introductory Note.'

'A Babu's Tale.' *The Telegraph* পত্রিকায় ১৭ই নভেম্বর থেকে রবিবারের ক্রোড়পত্রে 'বাবু বৃত্তান্ত'-র ইংরেজি অনুবাদের ধারাবাহিক প্রকাশের সূচনা, অনুবাদক অশোক মিত্র [আই. সি. এস.]।

'বিচিন্তা', সেপ্টেম্বর সংখ্যায় "একালের কবিতা : চল্লিশ দশক" প্রবন্ধে সমর সেন প্রসঙ্গ, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, দ্র. পুনর্মুদ্রণ।

১৯৮৬

"পুঁথি", নুরমুরাভ সারিখানভ-এর গল্পের অনুবাদ, 'হরবোলা', বসন্ত ১৩৯৩।

"গোধূলি প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা" [সমর সেনের কবিতা-বিষয়ক প্রবন্ধ] ইরাবান বসুরায়, 'অনুষ্টুপ', বিংশতি বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা।

"ত্রিশঙ্কু কবি সমর সেন", প্রভাস চন্দ্র চৌধুরী, 'সুরঞ্জনা', মে।

'The Samuel Johnson of Modern India', 'Samar Sen, Legendary Editor of *Frontier*, The Progressive Calcutta-based

Weekly'—বিষয়ে অমিতাভ মুখার্জির প্রতিবেদন, *The Sunday Observer*, December 7, দ্র. ইংরাজি রচনা।

১৯৮৭

The Statesman Miscellany, 15th August, "It's not in our line'-প্রতিবেদনের এক অংশে জ্যোতির্ময় দত্ত: "The wooden gates of 15C Swinhoe Street are falling apart and coming off their hinges. There is no electric bell at the door. I knock and wait, knock again and wait. After about a quarter hour's timid knocking, the door is opened. Samar Sen, that dazzling shooting star of modern Bengali Poetry, is now gravely sick. The body is frail, the hands and feet thin as the legs of a stork, those thick tresses of hair reduced to a thin silvery cascade, like the Hoodroo waterfalls in summer, but the eyes are still flashing with the old haughtiness of intellect. And his answer to my question was devastating in its nihilism.

'Interview ? I have nothing to say. It's a vacuum. I am suffering from a cancer of the mind. As for ideology, where does it serve to guide those in power ? No room for metaphysics left. It's an age of dull, solid, unrelieved pragmatism. It's a time when ideas no longer matter ; matter matters ; money in the pocket doesn't lie.'

Samar Sen himself has lived only for ideas, regardless of the hole in his pocket and the danger to his person. He stood by the Naxalites when all their former allies had deserted them. He believes in the pen..."

মৃত্যু, ২৩ অগাস্ট, বেলা ২-৩০ মি., ক্যালকাটা হসপিটালে।

সংকলন : পুলক চন্দ

—